জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

১৯৬৫

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৫

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাষিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৫

চিত্র সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৫

অষ্টাদশ বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৫

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাষিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৫

চিত্র সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৬৫ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে আজ অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই দীর্ঘ সতের বৎসর যাবৎ পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহাতে বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়েই কিছু না কিছু আলোচনা হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, গ্রাহক-সংখ্যা না হউক, অন্ততঃ ইহার পাঠক-সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পত্রিকাটি যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে, ইহা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে ও প্রেরণায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হইলেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেবল মাত্র আগ্রহ সৃষ্টিই নহে, বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া তাহাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারিলে তাহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সার্থকভাবে প্রয়োগ করিয়াই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। সেই হিসাবে আমাদের দেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও জীবনের কর্মধারার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই. যেখানে অনেকেই বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা সমাপনের পর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া আইন প্রভৃতি ব্যবসায় ও বিবিধ প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন।

অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলিতে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

যাহা হউক, আজকাল বিজ্ঞান-প্রচারের ব্যবস্থা অধিকতর প্রসারিত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেকেই হয়তো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন। এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে, যাহা গবেষণাগার ও উচ্চাঙ্গের যন্ত্রপাতির সহায়তা ব্যতিরেকেও অনুশীলন করা যাইতে পারে। কৃষি, শিল্প, কারিগরী-বিদ্যা এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে নিজস্ব রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া অপরকেও এই বিষয়ে উৎসাহী করিয়া তুলিতে সহায়তা করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্বেও আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র লেখকদের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছি এবং এখনও জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, সহজসাধ্য কারিগরী বিষয়, কুটির শিল্প, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণাদি পরিবেশন করিয়া পাঠকবর্গের উৎসাহ-বর্ধনে সহায়তা করেন।

এই উপলক্ষে আমরা পত্রিকার গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে যাঁহারা আমাদের সহায়তা ও সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমরা তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহায়তা ও সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইব না।

আয়নমণ্ডলের কথা

দীপক বসু

আজ থেকে অনেক দিন আগেকার কথা—১৯০১ সাল। এক ক্ষ্যাপা বৈজ্ঞানিক ইংল্যাণ্ডে তাঁর গবেষণাগারে বসে এক অদ্ভুত পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মতলব হলো আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও কর্ণোয়ালের মধ্যে বেতার সংযোগ স্থাপন করবেন। তাঁকে বৈজ্ঞানিক আখ্যা দিলে বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ বৈজ্ঞানিক তিনি ছিলেন না। আর বৈজ্ঞানিক ছিলেন না বলেই এরূপ একটা উদ্ভট পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন ইঞ্জিনীয়ার। বেতার-তরঙ্গের গুণাবলী সম্বন্ধে কিছু না জেনে সম্পূর্ণ খেয়ালখুশী বশেই তিনি এই পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন; তাই সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর এই কাণ্ড দেখে তাঁকে উপহাস করেছিলেন; কারণ বৈজ্ঞানিকেরা জানেন এবং তখনও জানতেন যে, আলোক-তরঙ্গের মত বেতার-তরঙ্গও সোজা সরল পথে চলে। পৃথিবীর কুব্জপৃষ্ঠের বরাবর আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হওয়া এই সব তরঙ্গের পক্ষে সম্ভব নয় (১নং চিত্র)। তাই ঐ পরীক্ষা কখনও কৃতকার্য হবে—এই রকম কল্পনা তাঁরা করতেন না। কিন্তু সব বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের হাসাহাসি বন্ধ হয়ে গেল ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বর, যখন সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও কর্ণোয়ালের মধ্যে সত্য সত্যই বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হলো। বেতারের ইতিহাসে অবশ্য ঐ ক্ষ্যাপা ভদ্রলোক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—তাঁর নাম গুগ্লিয়েলমো মার্কোনি। আজ আমরা জানি—পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত আয়ন-

মণ্ডলই হলো মার্কোনির সেদিনকার অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ এবং মার্কোনির সেই হাস্যকর পরীক্ষা থেকেই এর অস্তিত্বের বিষয়ে প্রথম সন্দেহ করা হয়। বেতার-তরঙ্গ ও আয়ন কাকে বলে, উচ্চ বায়ুমণ্ডলের গঠন কিরূপ, আয়নমণ্ডল আবিষ্কারের ইতিহাস, এই অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণা, দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগে আয়নমণ্ডলের ভূমিকা, আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণা ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ইত্যাদি সবই হলো বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

একেবারে আমাদের সৌরজগতের মত (২নং চিত্র)। সৌরজগতের মধ্যে যেমন—সূর্য রয়েছে মাঝামাঝি, আর গ্রহগুলি সব নিজ নিজ কক্ষপথে তার চারদিকে ঘুরছে, পরমাণুর ভিতরেও তেমনি—এর একটা কেন্দ্র আছে, যার নাম নিউক্লিয়াস। নিউট্রন ও প্রোটন কণিকাগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই কেন্দ্রে থাকে, ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যে কোন পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা এমন থাকে যে, এই দুই প্রকার কণিকার জন্যে
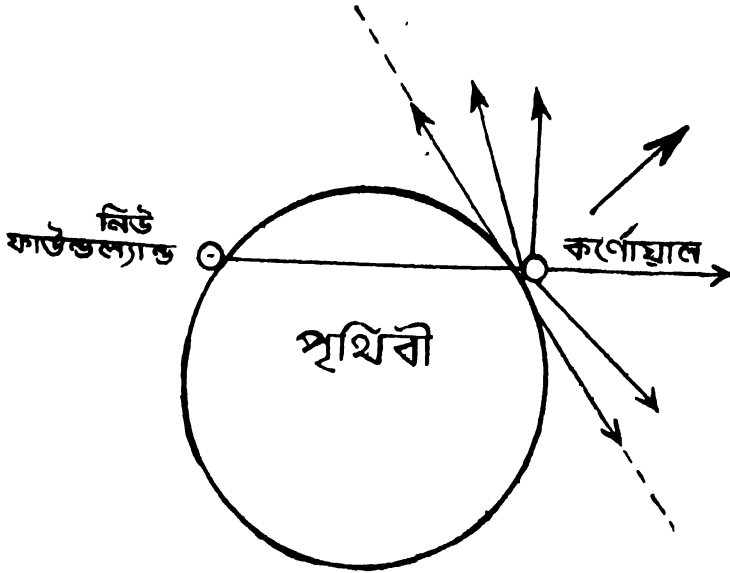
১নং চিত্র।
মার্কোনির পরীক্ষার সময়ে তখনকার বৈজ্ঞানিকদের ধারণা—সরল পথগামী বেতার-তরঙ্গ কখনই পৃথিবীর কুব্জপৃষ্ঠ অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে কর্ণোয়াল থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে যেতে পারে না।

আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে অনেকেরই বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের পরিচিত সকল পরমাণুই তিন প্রকার কণিকার দ্বারা গঠিত—ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এদের মধ্যে ইলেকট্রন হলো নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী, প্রোটন হলো পজিটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী আর নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। পরমাণুর ভিতরটা কিন্তু

উদ্ভূত দুই বিপরীত ধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পর সমান হয়। ফলে পরমাণুটি নিজে সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। কোন উপায়ে যদি পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যাবে—সে পজিটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী হয়ে পড়বে। বিদ্যুৎ-ধর্মবিশিষ্ট এরূপ পরমাণুকে বলা হয় আয়ন।

একটা সাধারণ ঘটনা সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, জলের মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে ঢিলটাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ঢেউ বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ৩নং চিত্রে অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। এছাড়া অবশ্য আরও অনেক রকম তরঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত; যেমন—ধানের ক্ষেতের উপর হাওয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করে। তাছাড়া যে কোন রকম শব্দ করলেই বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এসব ঘটনা আমাদের মোটামুটি জানা আছে। মধ্যে একমাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছাড়া আর কোন তফাৎ নেই—উভয়েই সমান বেগে সরল পথে ধাবিত হয়।

এদিকে আমরা জানি যে, আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপর বহুদূর পর্যন্ত একটা বাতাসের আস্তরণ আছে, যার নাম বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা—নিম্ন বায়ুমণ্ডল ও উচ্চ বায়ুমণ্ডল। নিম্ন বায়ুমণ্ডল হচ্ছে প্রধানতঃ আবহাওয়ার জন্যে দায়ী।
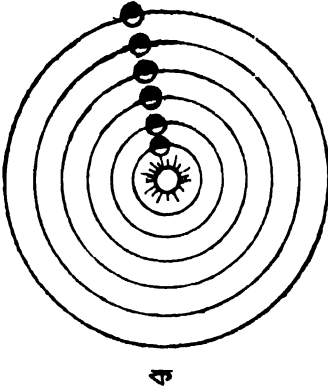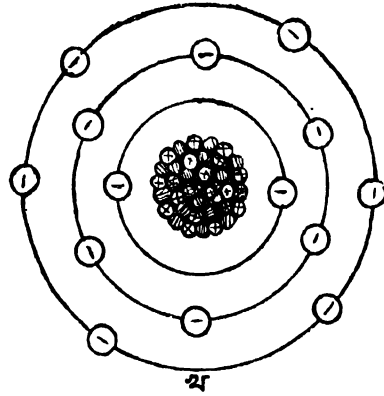
২নং চিত্র।

সৌরজগৎ ও পরমাণুর অভ্যন্তর একই রকম। (ক) সৌরজগতের গঠন—সূর্যকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গ্রহের কক্ষপথ। (খ) পরমাণুর গঠন—প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা গঠিত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনের কক্ষপথ।

তবে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, সূর্যের আলোক এবং অন্যান্য সব রকম আলোক-রশ্মিই একপ্রকার তরঙ্গবিশেষ। এর নাম হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। আলোক ছাড়া আরও অনেক রকমের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আছে (৪নং চিত্র)। চিত্র থেকে দেখা যাবে যে, বিরাট এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ জুড়ে রয়েছে আমাদের দৃশ্য আলোক। এই সব বিভিন্ন তরঙ্গের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্যই নেই। এদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে (৩নং চিত্র)। এজন্যেই গোড়ায় বলা হয়েছিল—বেতার-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গের অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ, তুষারপাত—ইত্যাদি আকাশের যে সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত—সে সবই এই অংশে ঘটে। পরীক্ষা-কার্য চালানো অনেকটা সহজ বলে বহুকাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের এই নিম্নাংশ নিয়েই বেশীর ভাগ অনুসন্ধান করা হয়েছে। অপর পক্ষে—মেরুজ্যোতি, বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন, চৌম্বক ঝটিকা ইত্যাদি যে সব ঘটনা আমাদের কাছে স্বল্প পরিচিত, সেগুলি ঘটে উচ্চ বায়ুমণ্ডলে। এই অঞ্চলে বাতাস অনেকটা হাল্কা এবং সেখানে আছে প্রধানতঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস। এই

অঞ্চল সৌরশক্তির একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করে বলে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের পৃথিবীতে জীবনধারণ সংক্রান্ত অধিকাংশ ঘটনাই সূর্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সূর্য থেকে আগত শক্তিশালী অতিবেগুনী

৩নং চিত্র।

জলে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি। পাশাপাশি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে।

রশ্মি ও রঞ্জেন রশ্মি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণুসমূহ থেকে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের আয়নে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর মোটামুটি ৫০ কিঃ মিঃ থেকে ৫০০

৪নং চিত্র।

সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালা এদের মধ্যে একমাত্র দৃশ্য আলোক ও বেতার-তরঙ্গ (সাদা অংশ) ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। পথে অন্যান্য সব তরঙ্গই বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়।

কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এরূপ আয়ন দ্বারা গঠিত এবং এরই নাম আয়নমণ্ডল। বিদ্যুৎকণার দ্বারা গঠিত বলে এই স্তর বিদ্যুৎ-পরিবাহী।

১৯০১ সালে মার্কোনির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যে সব বিজ্ঞানীরা তরঙ্গের গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তাঁরাই বিশেষ করে অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেকেই অনেক রকম মতবাদ প্রচার করলেন, কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত টিকলো না। তখন তাঁদের মনে এই সন্দেহের উদয় হলো—তবে কি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সরলরৈখিক পথে ভ্রমণ সম্বন্ধে এতকালের প্রচলিত মতবাদ সত্য নয়? শীঘ্রই সকল সন্দেহের অবসান ঘটলো। সমস্যার সমাধান করলেন আমেরিকার কেনেলী ও ইংল্যাণ্ডের হেভিসাইড। এই দুইজন বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রায় একই সঙ্গে ১৯০২ সালে ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবীর উচ্চ

বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-পরিবাহী একটি স্তর আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের গতিপথকে এই স্তর ঘুরিয়ে দিতে পারে। ফলে ঐ সব তরঙ্গমালা আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং এই ভাবে উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গের পক্ষে পৃথিবীর কুব্জপৃষ্ঠ অতিক্রম করা সম্ভব। হেভিসাইড আরও বললেন যে, সূর্য থেকে আগত নানাপ্রকার রশ্মির দ্বারা সৃষ্ট বিদ্যুৎ-কণিকার দ্বারা এই স্তর গঠিত হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব ঘটনার অনেক আগে ১৮৭৮ সালে ব্যালফার ষ্টুয়ার্ট নামে এক বিজ্ঞানী পৃথিবীর চৌম্বকত্বের দৈনন্দিন পরিবর্তনের বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরূপ একটি বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। যাহোক, এই স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে, ১৯২৫ সালে ইংল্যাণ্ডের অ্যাপ্‌ল্‌টন ও বারনেট থেকে। এরা দু-জন তখন কুণ্ডলীর আকৃতির এরিয়াল দিয়ে বেতার-তরঙ্গ ধরবার চেষ্টা করছিলেন। কুণ্ডলীর আকৃতির এরিয়ালের বিশেষ ধর্ম হলো—এর সাহায্যে বেতার-তরঙ্গ কোন্ দিক থেকে আসছে, তা নির্ধারণ করা যায়। অ্যাপ্‌ল্‌টন ও বারনেট দেখলেন যে, কুণ্ডলীর মত আকৃতির ও খাড়াভাবে দণ্ডায়মান—এই দুই প্রকার এরিয়ালে একই সঙ্গে গৃহীত বেতার-তরঙ্গের মধ্যে তীব্রতা বা জোরের তারতম্য আছে। এথেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, কিছু তরঙ্গ আকাশ-পথে তথাকথিত কেনেলী-হেভিসাইড স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে নীচে চলে আসে। এরপর আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২৬ সালে ব্রাইট ও তুর্ভের পরীক্ষা থেকে। তাঁরা দেখালেন যে, যদি কোন প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হয়, তবে কিছু দূরে অবস্থিত গ্রাহক-যন্ত্রে পরপর দু-বার সাড়া পাওয়া যায়। প্রথম সাড়া হচ্ছে, সোজাসুজি যে সব তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে চলে আসে, তাদের জন্যে; আর দ্বিতীয় সাড়া আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের জন্যে। এই হলো মোটামুটি আয়নমণ্ডল আবিষ্কারের ইতিহাস।

বর্তমান আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিম্নরূপ। উচ্চ বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র বাতাসের পরিমাণ সমান নয়, সূর্যরশ্মির প্রভাবও এক এক উচ্চতায় এক এক রকম। বাতাস ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরে সর্বপেক্ষা ঘন। আবার বিশাল বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করবার পর সূর্যরশ্মি এই অঞ্চলে এসে দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরের দিকের অবস্থা কিন্তু ঠিক বিপরীত। এই সব কারণে আয়নমণ্ডলের আয়নের ঘনত্বও সব জায়গায় সমান নয়। যে সব স্থানে বিদ্যুৎ-কণিকাসমূহের ভীড় অত্যন্ত বেশী, সে সব স্থানকে এক একটি স্তর বলে। প্রধানতঃ এরূপ চারটি স্তর আছে। D, E, F_1 এবং F_2—এই কয়টি ইংরেজী অক্ষর দিয়েই সেগুলিকে অভিহিত করা হয় ৫নং চিত্র)।

এদের মধ্যে D স্তরের উচ্চতা ৫০ থেকে ৭০ কিঃ মিঃ। এটিই হলো সর্বনিম্ন স্তর। E ও F_1 স্তরের নির্দিষ্ট উচ্চতা যথাক্রমে ১০০ ও ১৮০ কিঃ মিঃ। এদের উচ্চতা বেশী পরিবর্তিত হয় না। F_2 স্তরের অবস্থান পরিবর্তনশীল—মোটামুটি ২৫০ থেকে ৩৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বলা যেতে পারে। এটা হলো দিনের বেলার অবস্থা। রাত্রিকালে সূর্য নেই; কিন্তু সারা দিনের প্রখর কিরণে যে আয়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই কিয়দংশ থেকে যায়। কাজেই রাত্রিকালের অবস্থা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। তখন দুটি F স্তর (F_1, F_2) মিলে একটি স্তরে পরিণত হয়। E স্তরের প্রাধান্য ক্রমশঃ কমতে থাকে। D স্তর রাত্রিবেলায় প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। উপরিউক্ত E স্তর ছাড়া এর কাছেই কোন কোন সময়ে আর একটি ক্ষণস্থায়ী E স্তর পাওয়া যায়। ৯০ থেকে ১৩০ কিঃ মিঃ-এর মধ্যে যে কোন স্থানে এক কিঃ মিঃ থেকে কয়েক শত কিঃ মিঃ স্থান জুড়ে

একটা পাত্‌লা স্তররূপে এর আবির্ভাব হতে পারে। ব্যাঙের ছাতার মত কখন এর উদয় হবে এবং কখনই বা অদৃশ্য হবে, তা আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। ক্ষণস্থায়ী E স্তরটি সম্বন্ধে
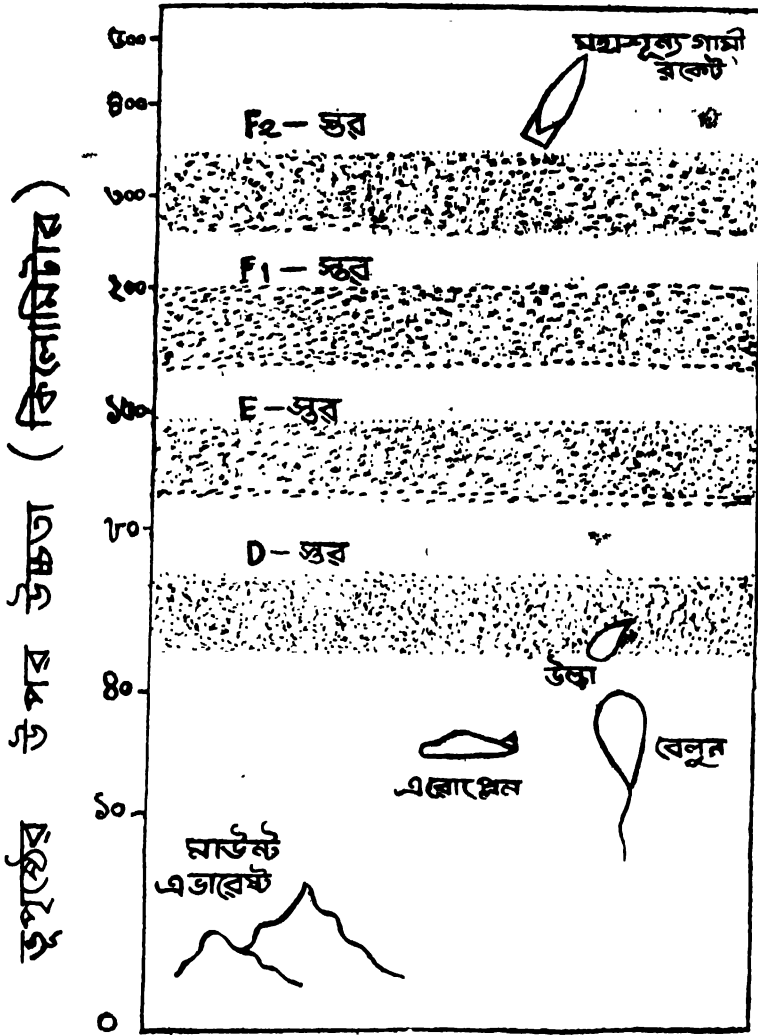
৫নং চিত্র।
আয়নমণ্ডলের চারটি স্তর। ছবিতে আকাশচারী অন্যান্য বস্তুর উচ্চতাও দেখান হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা কখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান নি।

এবার দেখা যাক, বেতার যোগাযোগের ব্যাপারে আয়নমণ্ডল কি ভাবে আমাদের সাহায্য করে। বহুদূরে রেডিও ষ্টেশনে কেউ গান-বাজনা করছেন, কেউ বা কথা বলছেন—আমরা তা ঘরে বসে শুনি। আগেই বলা হয়েছে, আমরা যখন মুখ দিয়ে কোন শব্দ করি তখন বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তরঙ্গগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে অনেকটা পরিবর্ধিত আকারে রেডিও ষ্টেশনে অবস্থিত প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়াল থেকে সব দিকে ছড়িয়ে

দেওয়া হয়। এরা বহু পথ অতিক্রম করে এসে অবশেষে আমাদের গ্রাহক-এরিয়ালে ধাক্কা দেয়। ফলে গ্রাহক-যন্ত্রে আমরা তাদের ধরতে পারি। তরঙ্গমালার বিচিত্র পথের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা, হিমালয়ের উচ্চতা, সাহারার তপ্ত বালুকা, সাইবেরিয়ার হিমশীতলতা—কিছুই এর গতিরোধ

৬নং চিত্র।

প্রেরকযন্ত্র থেকে বেরিয়ে বেতার-তরঙ্গের বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ।
(ক) ভূমিচারী-তরঙ্গ ও আকাশচারী-তরঙ্গ (খ) শূন্যচারী-তরঙ্গ।

করতে পারে না। কল্পনাতীত বেগে সব কিছু পার হয়ে তারা দূর-দূরান্তরে বার্তা পৌঁছে দেয়।

মোটামুটি তিন প্রকার পথে এই তরঙ্গমালা রেডিও ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছায় (৬নং চিত্র)। প্রথমতঃ, কিছু তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের বলা যেতে পারে ভূমিচারী তরঙ্গ এবং এটাই হলো সহজতম পথ। দ্বিতীয়তঃ, কিছু তরঙ্গ প্রেরক-এরিয়াল থেকে শূন্য পথে সোজা অথবা ভূপৃষ্ঠের উপরে একবার প্রতিফলিত হয়ে তারপর গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়ালে এসে ধরা পড়তে পারে। এদের নাম শূন্যচারী তরঙ্গ। তৃতীয় পথটি অভিনব। প্রেরক এরিয়ালের সঙ্গে কোণাকুণি-ভাবে যে সব তরঙ্গ উপরে আকাশের দিকে চলে যায়, তারা আয়নমণ্ডলে গিয়ে ধাক্কা দেয়। বিদ্যুৎ-কণিকার দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলের সংস্পর্শে এসে বেতার-তরঙ্গের গতিপথ ক্রমাগত একপাশে

বেঁকতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে দিক পরিবর্তন করে তরঙ্গমালা আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে এবং প্রেরক-যন্ত্র থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ে। এই ঘটনাকেই আমরা বলি 'আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন' এবং এই জাতীয় তরঙ্গকে বলা যায় 'আকাশচারী তরঙ্গ'।

মাটির উপর দিয়ে যে সব তরঙ্গ চলে, তারা বেশী দূরে যেতে পারে না। মাটির সংস্পর্শে পক্ষে, দূরবর্তী ষ্টেশন থেকে তরঙ্গমালা আসে আয়ন-মণ্ডল হয়ে। এক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক ছোট হতে হয় এবং এদের আমরা বলি সর্ট ওয়েভ। এছাড়া কোন কোন সময়ে বেতার যোগাযোগের জন্যে শূন্যচারী তরঙ্গেরও সাহায্য নেওয়া হয়। এরা প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেরিয়ে সোজা শূন্যের মধ্য দিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে চলে যায়; যেমন—রেডার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,রেডিওতে কোন ষ্টেশন ধরবার সময়ে যে 'মিটার'
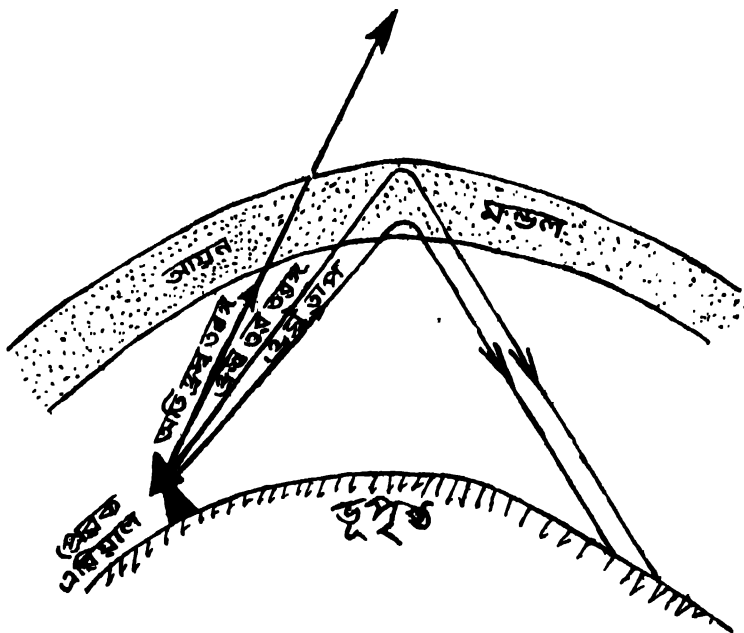
১নং চিত্র।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয়নমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কমবে. প্রতিফলনও তত উচ্চতর স্থান থেকে হবে। অবশেষে এক সময়ে তরঙ্গমালা আয়নমণ্ডল ভেদ করে বাইরে চলে যাবে।

এসে অতিক্রান্ত তারা তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলে। রেডিও ষ্টেশনের কাছাকাছি যে সব গ্রাহক-যন্ত্র থাকে, তারাই সাধারণতঃ এই পথে আগত তরঙ্গ ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় অপেক্ষাকৃত বড় এবং এই জাতীয় তরঙ্গকেই আমরা বলি মিডিয়াম ওয়েভ অপর শব্দটি ব্যবহার করা হয়, সেটা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সূচিত করে। যথা—কলকাতা 'ক' কেন্দ্র থেকে ৪৪৭.৮ মিটারে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। তার মানে হলো, কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মিডিয়াম ওয়েভের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো ৪৪৭.৮ মিটার আর সর্ট ওয়েভের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪১ মিটার। শুধু রেডিও ষ্টেশনই নয়,

অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে বেতারের প্রয়োগ আছে, যেমন—বেতার-টেলিগ্রাফ, বেতার-টেলিফোন, বেতারে ছবি আদান-প্রদান, বেতারে সংবাদ সরবরাহ, যুদ্ধের কাজে বেতারের ব্যবহার—ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই উপরের আলোচনা সত্য। কাজেই দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের জন্যে আয়নমণ্ডলের মাধ্যমে আকাশচারী তরঙ্গ অপরিহার্য। আয়নমণ্ডল না থাকলে কখনও এই প্রকার যোগাযোগ সম্ভব হতো না।

আয়নমণ্ডলের একাধিক স্তরের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—এদের মধ্যে কোন্ স্তরের ভূমিকা কিরূপ? বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের প্রতি আয়নমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া অতি বিচিত্র। তরঙ্গমালা থেকে শক্তি শোষণ ও প্রতিফলন—উভয়ই নির্ভর করে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও আয়নমণ্ডলে আয়নের ঘনত্বের উপর। আগেই বলা হয়েছে, D স্তর বেতার-তরঙ্গ থেকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি শোষণ করে নেয়। D স্তর শুধু শোষণই করে, প্রতিফলন কার্যে একেবারেই সাহায্য করে না। খুব বড় বড় দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ অবশ্য D স্তরে প্রতিফলিত করা যায়, তবে তা আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে আসে না। E, F_1 ও F_2—এই তিনটি স্তরেই আমাদের প্রয়োজনীয় বেতার-তরঙ্গ সাধারণতঃ প্রতিফলিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম, প্রতিফলনের উচ্চতাও ততই বেশী হতে থাকে (৭নং চিত্র)। এইভাবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একটি নির্দিষ্ট মানের কম হলে সে তরঙ্গের গতিপথ পরিবর্তন করা আয়নমণ্ডলের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। ফলে তারা আর ফিরেও আসে না—আয়নমণ্ডল ভেদ করে মহাশূন্যে চলে যায়। এই নির্দিষ্ট মান নির্ভর করে, আয়নমণ্ডলে আয়ন ও ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর। সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘনত্ব পরিবর্তিত হয়। ফলে সেই সঙ্গে তরঙ্গের শক্তি শোষণ ও প্রতিফলন উচ্চতারও তারতম্য ঘটে। ৫নং চিত্র থেকে দেখা যাবে যে, বেতার-তরঙ্গকে E ও F স্তরে যাবার ও ফেরবার পথে মোট দু-বার D স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাই দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের ব্যাপারে D স্তরের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনেক, যদিও তা প্রতিফলন কার্যে অংশগ্রহণ করে না।

আয়নমণ্ডলে একবার প্রতিফলন ঘটিয়ে হয়তো অনেক সময়ে বেতার-তরঙ্গকে বেশী দূর পাঠানো যায় না। কিন্তু তার জন্যে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। প্রেরক-যন্ত্র থেকে বেরিয়ে তরঙ্গমালা আয়নমণ্ডল হয়ে নীচে এসে ভূপৃষ্ঠের উপর একবার প্রতিফলিত হয়ে আবার উপরে চলে যেতে পারে। আয়নমণ্ডলে দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হবার পর তারা পুনরায় নীচে নেমে আসবে। এইভাবে বার বার প্রতিফলিত করিয়ে বেতার-তরঙ্গমালাকে প্রয়োজন অনুসারে বহুদূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া চলে (৮নং চিত্র)।

আগেই বলা হয়েছে, আয়নমণ্ডলের অবস্থা নির্ভর করে প্রায় সম্পূর্ণরূপে সূর্যের উপর। সূর্য ও পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানের জন্যেই পৃথিবীতে দেখা যায় দিন-রাত্রি, ঋতু-পরিবর্তন ইত্যাদি। দিনের বিভিন্ন সময়ে, বছরের বিভিন্ন ঋতুতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষরেখায় পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রভাব বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া সূর্যের উপর মাঝে মাঝে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের জন্যে তার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও পরিবর্তনশীল। ফলে আয়নমণ্ডলে আয়ন এবং ইলেকট্রনের ঘনত্বও একই ভাবে পরিবর্তিত হয়। সৌভাগ্যবশতঃ বিজ্ঞানীরা সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থানগত পরিস্থিতি এবং সূর্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আগে থেকেই জানতে পারেন। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে আয়নমণ্ডলের অবস্থা কি রকম থাকবে, তাও আগে থেকে বলা সম্ভব। এরই উপর ভিত্তি

করে যোগাযোগের জন্তে কখন কোন্ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারিত হয়। হাওয়া অফিস থেকে যেমন আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তেমনি বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্র থেকে 'বেতার আবহাওয়া' সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে থাকে। এরকম ববস্থা না থাকলে বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। সূর্যে বেশী বড় রকমের ঝড় হলে, সেখান থেকে আগত প্রচণ্ড শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মি D স্তরকে অতিরিক্ত আয়নিত করে। কাজেই সকল বেতার-তরঙ্গই এই স্তরে শোষিত হবার ফলে সারা পৃথিবীতে তখন বেতার যোগাযোগ বন্ধ

থেকে ডিসেম্বর (১৯৫৮)—এই আঠারো মাস-ব্যাপী সময়ে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ একযোগে পরীক্ষা-কার্য চালান সূর্য, পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডল ও ঐ জাতীয় নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। 'আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষ' নামে পরিচিত এই কর্মসূচী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার এক চরম নিদর্শন। এই সময়েই ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুট্নিক-১ আকাশে উঠেছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শতাধিক মহাশূন্যগামী যান সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এরা যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সে কথা আজ আর কারও অবিদিত
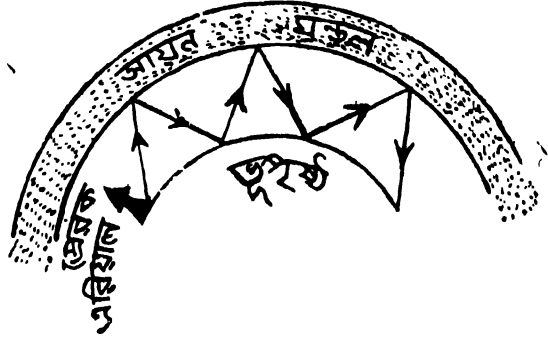
৮নং চিত্র।

আয়নমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের উপর পর্যায়ক্রমে বার বার প্রতিফলিত করিয়ে বেতার-তরঙ্গমালাকে বহুদূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে 'বেতার-অন্ধকার'।

আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে এতকাল গবেষণা চলেছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেতার-তরঙ্গ উপরে পাঠিয়ে এবং প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করে। এছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। ফলে F_2 স্তরের উপরে কি আছে, সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানতাম না। কারণ নীচে থেকে প্রেরিত এবং আয়ন-মণ্ডলে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গ কখনও F_2 স্তর অতিক্রম করে না। উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা-ক্ষেত্রে তাঁদের এই ক্রটি বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন। তাই জুলাই (১৯৫৭)

নেই। আয়নমণ্ডল-বিজ্ঞানীদের কাছে কিন্তু এই সকল কৃত্রিম উপগ্রহের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কারণ এদের কোনটা আয়নমণ্ডলের মধ্যেই ভ্রমণ করেছে, কোনটা বা সে অঞ্চলের অনেক উপরে চলে গেছে। এগুলি থেকে নিক্ষিপ্ত বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসবার পথে অনেক নতুন নতুন তথ্য বহন করে এনেছে—F_2 স্তরের উপরের অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছে। দেখা গেছে F_2 স্তরের উপরের ইলেকট্রনের ঘনত্ব সম্বন্ধে আগে আমরা যা জানতাম, প্রকৃতপক্ষে তাথেকে অনেক বেশী।

সর্বশেষে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করা

যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের এই অতীব চিত্তাকর্ষক বিষয় আয়নমণ্ডলের গবেষণা-ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষ কোন দিনই পিছিয়ে নেই। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সমান তাল রেখে সে এগিয়ে চলেছে, আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে জাতীয় অধ্যাপক স্বর্গীয় শিশিরকুমার মিত্রের নেতৃত্বে আয়নমণ্ডলের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গবেষণাগার প্রাচ্য দেশে এই জাতীয় গবেষণাগারের মধ্যে প্রথম এবং ১৯৩২-৩৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মেরু বছরের অনুষ্ঠান-সূচীতে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ভারতীয় কেন্দ্র। পরে অধ্যাপক মিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের অন্যান্য স্থানেও আজ একাধিক আয়নমণ্ডলের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আমেদাবাদ, দিল্লী ও ওয়ালটেয়ার উল্লেখযোগ্য। আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটনে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান অসামান্য। অধ্যাপক মিত্র কলকাতায় যে গবেষক-গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন, আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন মতবাদ সারা বিজ্ঞান-জগতে সমাদৃত হয়েছে।

আজকে আমরা যে যুগের মানুষ, সেটাকে বলা হয় বেতারের যুগ। বেতার পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের সংযোগ স্থাপন করেছে। বেতার ছাড়া আজকাল আমাদের একেবারেই চলে না। আর দূরপাল্লার এই বেতার যোগাযোগের জন্যে 'বেতার-দর্পণ' আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব যে অপরিহার্য—সে কথা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে। তারপর আবার কয়েক বছর ধরে স্পুটনিকের আগমনে উচ্চ বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ কৃত্রিম উপগ্রহের নিরাপদ চলাফেরার জন্যে তাদের সঙ্গে সর্বদা বেতারে যোগাযোগ রাখতে হয়, আর ঐ সব বেতার-তরঙ্গকে আয়নমণ্ডলের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হবে। যদিও বিংশ শতাব্দীর একেবারে সুরুতেই আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিল এবং গত অর্ধশতাব্দীকালেরও অধিক সময়ে বহু সমস্যার সমাধান হয়েছে, তবুও অনেক কিছুই এখনও অজানা থেকে গেছে। বিশাল এই অঞ্চল সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য চালানো কোন দেশের পক্ষেই এককভাবে সম্ভব নয়। এরই জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষের। সূর্য ছিল তখন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক, আবার ১৯৬৩-৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বর্ষ'। সূর্য এখন একেবারে শান্ত। সৌরকলঙ্ক প্রায় নেই বললেই চলে। আবার সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়েছেন সূর্য ও পৃথিবীর উপর যৌথ অভিযান চালাবার জন্যে। আবার সংগ্রহ করা হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, প্রচারিত হচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব ও মতবাদ। আশা করা যায়—আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে এখনও যে সব অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তা এবার উদ্ঘাটিত হবে।

ঋগ্বেদে বিজ্ঞান

জ্ঞানেন্দ্রকুমার পাল

প্রাচীন ভারতের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। তাহা সত্ত্বেও সুদূর অতীতে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি যে একদিন উন্নতির সুউচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত ছিল, সেই সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। শিশুপাঠ্য ছোট একটি দুই লাইনের কবিতায় তাই বলা হইয়াছে—

"অন্য জাতি যে কালে পরিত দিগ্বসন,
ভারতে ঋগ্বেদ-পাঠ হইত তখন।"

কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু লোকের ধারণা যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ বহু বিদ্যায় পারঙ্গম হইলেও বিচিত্র বিজ্ঞান-জগতে তাহাদের কোন প্রবেশাধিকারই ছিল না। রামায়ণে আছে, মেঘনাদ নাকি মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া বিমান মার্গে লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল এবং একই ভাবে মহাভারতে যুদ্ধের বিবরণে অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, বায়ুবাণ প্রভৃতির দ্বারা যথাক্রমে অগ্নি-প্রজ্জ্বলন, জল-প্লাবন, বায়ু-প্রবহন প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। তাহা হইতে আবার কেহ কেহ অত্যধিক কল্পনা-বিলাসে মনে করেন যে, প্রাচীন ভারতে এরো-প্লেন, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুই ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে উল্লিখিত ঐ সকল ব্যাপারকে কবি-কল্পনা বলিয়া ধরিয়া নেওয়া চলে। তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের তথ্য সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ বৎসর পর্যন্ত এমনি কোন সময়ে লেখা—বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ভিন্টারনিজের এইরূপ ধারণা। ইহারই আটটি অষ্টকে এবং আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত অষ্টকে যথাক্রমে প্রবিভক্ত বর্গগুলিতে ১০২৮টি সূক্তে, তৎকালীন ভারতীয়দের পূজার্চনা, কৃষ্টি, সামাজিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর জ্ঞানের উল্লেখ আছে। সিন্ধুনদের তীরবর্তী উত্তর-পশ্চিম ভারতই তখনকার ভারতীয় আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং প্রকৃতির নানা অংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ইন্দ্র, সবিতা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির আবাহন কিংবা পরিতুষ্টির জন্য ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে, যাহাতে সোজাসুজি না হইলেও কতকটা গৌণভাবেই ধারণা করা চলে যে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতির কোন কোন তথ্য তাহাদের জানা ছিল। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ঐ সকল উক্তি কোন কোন স্থলে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হইয়া অনেকটা রহস্যাবৃতভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে, নানা দেবদেবীর স্তুতি ও আবাহন মন্ত্রের মাধ্যমে। সুতরাং অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট হইলেও সেগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে।

নিম্নে এমনি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। দৃষ্টান্তগুলি উইলসনকৃত ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ব্র্যাকেটের মধ্যে রোমান ও ইংরেজী সংখ্যার দ্বারা মন্ত্রগুলির অবস্থান নির্দেশিত হইল।

(১) সূর্যের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—"ভাস্কর, তুমি সম্মানিত পৃথিবীকে আবর্তিত কর।" (VII, 3, 9, 7)। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, প্রীক প্রাজ্ঞ কোপার্নিকাসই নাকি প্রথমে ধারণা করেন যে, সূর্য নহে, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হইতেছে। চারি শত বৎসর আগে প্রখ্যাত

বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও এই মতবাদের জন্য কম নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই! অথচ এই সূক্তটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্তা হিসাবে সূর্যই পৃথিবীর আবর্তন ঘটাইতেছেন; অর্থাৎ কোপার্নিকাসের জন্মের দুই হাজার বৎসর আগেও ভারতবাসীদের নিকট এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি অজ্ঞাত ছিল না।

(২) (ক) "স্থাবর এবং জঙ্গম, সকলেরই আত্মা সূর্য" (I, 16, 10. 1) এবং (খ) "সবিতার বহু বিস্তারী স্বর্ণবাহু আকাশের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হউক।" (I, 16, 10. 1)

(৩) "সুপর্ণ বা সূর্যরশ্মি গভীর তরঙ্গায়িত ও জীবনপ্রদ" (VII, 3, 12, 2)

(৪) "প্রাণীমাত্রই সূর্যের প্রভাবে জীবন্ত হয় ও নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে" (I, 7, 5, 7)

(৫) (ক) "সূর্যের রথ সপ্তরশ্মিমণ্ডিত, (IV, 5 54), (খ) শব্দ ও সপ্তরশ্মিযুক্ত সপ্তানন" (সূর্য) [VI, 4, 2, 24] (গ) মারুতের সপ্তময়ূর হাতে সপ্তবল্লম অলঙ্কাররূপী সপ্তগৌরবে দীপ্যমান। (VIII, 4. 8. 5)

এইগুলি হইতে সূর্যই জড়বস্তু কিংবা জীব, সকলেরই শক্তির আধার, আলোক (সৌর) তরঙ্গায়িত, বহুপ্রসারী এবং জীবমাত্রেরই জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক এবং সাতটি রশ্মির সমাবেশে সূর্যালোক গঠিত—এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের ধারণা ও আভাস পাওয়া যায় নাকি?

(৬) বজ্র, বিদ্যুৎ ও ভূমিকে উর্বরা করে যে বৃষ্টিপাত, এই সকলই ইন্দ্রের আয়ুধ; যখন এক রাজার সঙ্গে অন্য রাজার কিংবা এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর যুদ্ধ হয়, তখন তিনি ঐগুলির সাহায্যেই তাঁহার বন্ধু ও আশ্রিতদের বিজয়-লাভে সহায়তা করেন (I, ভূমিকা xxx)।

(৭) তাঁহারা যথাবিধি যাগযজ্ঞের দ্বারা বারো মাসের প্রতিটি মাসে লভ্য বিশেষ বিশেষ ফসল লাভের জন্য যথাবিহিত ইন্দ্রের পরিতুষ্টি সাধন করিতেন। (I, ভূমিকা Pxl)

উইলসন মনে করেন যে, বৈদিক আর্যেরা সৌর ও চান্দ্রমাসের মধ্যপন্থী মাসে সারা বৎসরকে ভাগ করিবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যামূলক গণনায়ও অভ্যস্ত ছিলেন।

(৮) মেঘের সঞ্চার ও তাহা হইতে বারিপাত (পর্জন্য) এবং ভূমির উর্বরা শক্তির দ্বারা উদ্ভিদের দেহ বৃদ্ধিরও উল্লেখ আছে (V. 6. 11. 4)

(৯) তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের জন্য ধাতুর (ইস্পাত?) এবং আভরণ-হিসাবে স্বর্ণের ব্যবহারেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (V. 5. 1.5), (V. 5. 1. 6)

স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগনিরাময়ের দেবতারূপে কোন বিশেষ দেবতার পরিবর্তে ঋগ্বেদের নানাস্থানে নানা দেবতার স্তব-স্তুতি ও পরিতুষ্টি বিধানের উল্লেখ আছে। এই হিসাবে রুদ্রকে "ভিষগশ্রেষ্ঠ" একটি শ্লোকে (II, 7.16) বলা হইয়াছে। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

(ক) "রুদ্র সমুজ্জ্বল ও দুর্ধর্ষ হইলেও ফলপ্রদ রোগহর ঔষধ-পরিবেশনকারী" (VIII, 4.9)।

(খ) "রুদ্র! আমাদের সন্তান-সন্ততিদের নানা ওষধির দ্বারা শক্তিশালী কর, কারণ আমি শুনিয়াছি যে, তুমি বৈদ্যগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদ্যরাজ বলিয়া পরিচিত।" (II, 4, 1)।

(গ) "রুদ্র! সর্বরোগহর ও সর্বতুষ্টিবিধায়ক, আনন্দ বিতরণকারী তোমার সেই হস্তটি কোথায়?" (II.4.1)।

ঋগ্বেদ এবং বহু পরবর্তী আয়ুর্বেদেও যমজ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসার বিশিষ্ট দেবতা বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা সূর্যের ঔরসে সমুদ্রগর্ভসম্ভূত, এইরূপ উল্লেখ আছে। কোন কোন স্থলে "নাসত্য", অর্থাৎ মৃষাহীন (যাহারা কখনও মিথ্যাচরণ করেন না) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যেমন—

"রথারূঢ় নাসত্য, জীবন্ত দেহের প্রাণবায়ুরূপে

বহু দূরে থাকিলেও [illegible] জীর্ণমর্ম কর" (1.7.4)।

মনে হয় সেই অতীত যুগেও "নাসত্য" নামে চিকিৎসকের অত্যাবশ্যক চরিত্রনিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারদের সম্বন্ধে আরো উল্লেখ আছে—

(ক) যুগ্মদেবতা (অশ্বিনীকুমার যুগল)! আমাদের স্বর্গ, মর্ত্য ও নভস্তলের যত ঔষধ আছে, তিন তিন বার তাহাই দাও। আমাদের পুত্রদের রক্ত, শ্লেষ্মা ও পিত্তকে (Three humours) সুস্থ রাখিবার জন্যও উপকারী ওষধি-লতাসমূহ দান কর (I.7.4).।

(খ) আনন্দ ও স্বাস্থ্যের উৎস, অশ্বিনী কুমারেরা আমাদের নিকটে আগমন কর (VIII, 24)।

অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশ্বিনী কুমারেরা রাজকুমারী ঘোষার কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিয়াছিলেন, (i, II, 7, 19; X, 39, 3, 6, X, 40, 5, 9)। তাঁহাদের দ্বারা অন্ধতা, বধিরতা ও খঞ্জতা—এমন কি, পশুরোগ-নিরাময়ের কথাও উল্লেখ আছে (I, 112, 8, I. 116, 120, X,39, 134)। একই ভাবে অগ্নি, ইন্দ্র, মারুত, ব্রহ্মাস্পতি, সবিতা ও সোমকেও নানা স্থানে রোগ-নিরাময়ের দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন—

(ক) প্রাজ্ঞ, সত্যসন্ধ, সর্বরোগহর অগ্নি! হোমেতেই তোমার স্তুতি (I.4.1)।

(খ) যে শিখার দ্বারা জথুরকে জ্বররোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছ, সেই শিখার দ্বারাই আমাদের সকল শত্রুকে ভস্মীভূত কর (VII, 1.1)।

(গ) গাছের কাণ্ডের পর্বসন্ধিগুলিতে এবং অনুরূপভাবে আমাদের জানু ও গুল্‌ফসন্ধিতে সঞ্জাত বিষ ও তজ্জনিত রোগের সমুজ্জ্বল অগ্নির দ্বারা প্রতিষেধ ঘটুক (VII, 3, 18)।

(ঘ) হে ইন্দ্র! যুদ্ধকালে তুমি শুধু সূর্যের রথচক্রই হরণ কর নাই, প্রাণঘাতী ব্যাধিকেও (malignant) হনন্ করিয়াছ (VI, 3, 8)।

(ঙ) স্বর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত তোমার প্রোজ্জ্বল অস্ত্র পৃথিবী পরিক্রমা-কালে যেন আমাদের কোন ক্ষতি সাধন না করে; প্রভঞ্জনকে শান্ত করিবার মত বহু ঔষধ তোমার আয়ত্ত (VII, 3, 13)।

(চ) বহু সম্পত্তিসম্পন্ন, রোগ নিরাময়ক, ধনঞ্জয় ও পুষ্টিবর্ধক ব্রহ্মাস্পতি আমাদের প্রতি সদয় হউন (I.5.1)।

(ছ) সর্বদর্শী স্বর্ণকিরীটি সবিতা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে বিচরণ করেন এবং সকল রোগকে নাশ করেন (I.7,5)।

(জ) সর্বহিতকর জ্যোতির্ময় দিবাকর! আমার হৃদ্‌রোগ ও পাণ্ডুরোগকে নিরাময় কর (I. 10. 1)।

(ঝ) তাঁহার (সূর্যের) অমৃত, বীর্যোত্তেজক এবং অতিপুষ্টিকর দ্যুতির দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকবাসীরা রক্ষিত হউক (I. 5,1)।

(ঞ) হে মারুত! আমাদের বিশুদ্ধ ঔষধ দাও এবং রুদ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত রোগহর ও বিপদবারণ ঔষধগুলিও দাও (II, 4, 1)।

(চ) মহানুভব বন্ধু মারুত! ত্বরিত গতিতে বায়ুর সঙ্গে আগমন করিয়া আমাদের নানা প্রকারেব ঔষধ, বর দান কর (VIII, 3, 8)।

(ছ) হে মারুত, তোমার প্রেরিত বৃষ্টির সাহায্যে আমাদের পানীয়, গৃহপালিত পশু, ওষধি-লতা ও অবিমিশ্র আনন্দ লাভ হউক।

(জ) সোম আমাকে বলিয়াছেন, পৃথিবীতে যত কিছু ঔষধ আছে এবং ঐ সঙ্গে জগদহিত-কারী অগ্নিরও আবাস জলে—জলেই সকল ওষধি-লতার উৎপত্তি (I. 5. 6)। আমার শরীরের হিতের জন্য রোগহর যে সকল ঔষধ আছে, জলই তাদের উৎকর্ষ ও সৌকর্য বৃদ্ধি করে (I. 5. 6)।

দেবতাদের কাছে বরপ্রার্থী ভক্তগণ নিজের

যোগ্যতা সম্বন্ধেও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন—"আমার পিতাই চিকিৎসক, আমার জননী যাঁতার শস্য নিক্ষেপ করেন এবং আমি নিজেও সুগায়ক (9.7.9)।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলিতে শুধু যে তৎকালীন ভারতীয়দের নিকট জ্বররোগ, হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডুরোগ, প্রাণঘাতী (কর্কট?) রোগ, অস্থিসন্ধি-প্রদাহ বা বাতরোগ প্রভৃতিই পরিচিত ছিল এমন নয়, সৌরচিকিৎসা, জলচিকিৎসা, অগ্নিচিকিৎসা (Cauterisation) এবং ওষধি-নির্যাসের সাহায্যে রোগ-নিরাময়ের চিকিৎসার কথাও উল্লেখ আছে।

নিগূঢ় মন্ত্রশক্তি (Mysticism) এবং প্রবল ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে সম্মোহনের (Hypnotism) দ্বারা চিকিৎসার উল্লেখও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(১) তুমি দধ্যঞ্চের মনের তুষ্টি সাধন করিয়াছিলে, সে কারণে অশ্বমুণ্ড দধ্যঞ্চ তোমাকে নিগূঢ় তথ্য (Mysticism) শিক্ষা দান করিয়াছিলেন (I. 17, 4)।

(২) তুমি শান্তভাবে নিদ্রাবিষ্ট হও, মাতা নিদ্রাবিষ্টা হউন, পিতা নিদ্রাবিষ্ট হউন·· যে সকল নারীগণ উৎসববেশে সুবাসচর্চিত দেহে প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলেই আমাদের সম্মোহনশক্তির দ্বারা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল (VII, 3, 22)।

সোমরসের উল্লেখ আছে—শক্তিপ্রদ, মধুক্ষর এবং গৌর পুত্র-সন্তানদায়ক (IX, 5, 1) এবং বহুরোগহর বলিয়াও (IX. 4, 18) দেহ ও মনের পক্ষে অতি হিতকর ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষে উত্তেজনাকর এই সোমরস (X, 4, 5,) সূর্যের রশ্মির প্রভাবে সঞ্জাত (IX, 4, 17) এবং দধির সঙ্গে গ্রহণে রোগ-নিরাময়ে ভাস্করেরই সম ক্ষমতাসম্পন্ন (IX, 6, 5)। আরও বলা হইয়াছে যে, সোমরস নগ্নতাকে আবরিত করে, রুগ্নকে সুস্থ করে, অন্ধকে চক্ষুর্দান করে এবং খঞ্জকেও চলনশক্তি দান করে (VIII, 8, 10)। একই ভাবে সোমরস বন্ধ্যাত্ব দূর করে এবং দুগ্ধক্ষরণও ঘটায় (I. 17, 2)।

পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ঘটনারও উল্লেখ আছে, যথা—

(১) ভজরিভু ও বিভুন, যেহেতু তোমরা তোমাদের বৃদ্ধ ও অশক্ত পিতামাতাকে পুনরায় অল্প বয়স ও যদৃচ্ছা ভ্রমণের শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলে, সেই কারণেই দেবগণের মধ্যে তোমাদের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছিল।

(২) অশ্বিনীকুমার যুগল, তোমরা তোমাদের বিশেষ শক্তির দ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনর্যৌবন দান করিয়াছিলে (I, 17, 2)। এই দুইজন দেবতার দ্বারা পুনর্যৌবন বিধানের আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে (I ; 12, 15 ; V, 74, 5 ; V, 39, 8)।

গর্ভাধান সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আছে—(১) উদ্ভিদ, গাভী, অশ্বিনী ও নারীর গর্ভাধান হয় পর্জন্যের প্রভাবে (VII, 6, 13) ; (২) এই সুপ্রাচীন পথেই সকল দেবগণের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং গর্ভে পূর্ণ বর্ধিত অবস্থায় একই ভাবে তাহার প্রসব হউক, যাহাতে প্রসবকালে জননীর মৃত্যু না হয় (IV, 2, 8)।

(৩) জরায়ুর আভ্যন্তরীণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত দশম মাসের ভ্রূণ! নিম্নাবতরণ কর (V, 6, 6)।

(৪) সন্তান প্রসবকালে যে ভাবে সাহায্য-কারিণী প্রসূতির উরু দুইটিকে ফাঁক করিয়া রাখে, সেই ভাবেই উদ্ভিদেরও উপকার সাধিত হয় (V, 5, 5)।

(৫) অভিজ্ঞ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা জননীর গর্ভ হইতে বামদেবের প্রসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলে (I, 17, 4)।

(৫) সবুজবর্ণ উজ্জ্বল সোমরসের দ্বারা তাহারা নবজাতকের দেহ পরিষ্কার করেন (IX, 7, 6)।

এইগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদের যুগে গর্ভকাল দশমাস (চান্দ্রমাস ?), ভ্রূণের আবরণ, প্রসবের পদ্ধতি—এমন কি, Trendlerlinburg অবস্থানে সহজ প্রসবের কথাও সুপরিজ্ঞাত ছিল।

ঋগ্বেদের যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে উপনিবেশ সম্প্রসারণের জন্য আর্যদের সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সেই কারণে প্রয়োজনের তাগিদেই যুদ্ধে আহতদের সুচিকিৎসা সেই যুগেও প্রচলিত ছিল। অস্ত্রোপচারের চিকিৎসায়ও অশ্বিনীকুমারদের পারদর্শিতার উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত বিবরণগুলিই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

(১) তাঁহারা যুদ্ধে খণ্ডিতপদ বিশপালের জন্য লৌহময় কৃত্রিম পদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (I, 112, 10 ; X, 3, 9, 8) ; তাঁহারাই আবার ভদ্রমতীর নিকট তাহার পুত্র হিরণ্যহস্তকে (সুবর্ণনির্মিত কৃত্রিম হস্ত (?) যুক্ত) ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিন তিনবার মারাত্মকভাবে আহত শ্যাবকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন (I, 17, 2)।

(২) পুরাণে গণেশের হস্তীমুণ্ড এবং দক্ষরাজের ছাগমুণ্ড প্রাপ্তির মতই ঋগ্বেদেও দধ্যঞ্চের অশ্বমুণ্ডের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

(৩) এতদ্ব্যতীত তষ্টীর নিকট হইতে প্রাপ্ত গুপ্ত জ্ঞানলাভের কালে কটিদেশে বন্ধনী প্রয়োগের (Application of a ligature) কথাও আছে (I, 17, 4)।

যেমন হোমিওপ্যাথিতে আছে, কিম্বা আজও কোন কোন নরগোষ্ঠীতে কোন প্রাকৃতিক কারণে বিশিষ্ট রোগ-লক্ষণ (যেমন অতি খররৌদ্রতাপে জ্বর) দেখা দিলে তাহারই সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলিত, তেমনি ঋগ্বৈদিক যুগেও জ্বর-রোগের জন্য অগ্নির, পাণ্ডু রোগের জন্য সূর্যের এবং শোথ বা উদরী রোগের জন্য বরুণ দেবতার প্রসাদ যাচ্ঞা করা হইত।

দধ্যঞ্চের গ্রীবার উপরে অশ্বমুণ্ড স্থাপনের কথা অবিশ্বাস্য হইলেও অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের উৎকর্ষের পরিচায়ক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদে বর্ণিত ভেষজ-চিকিৎসা কিংবা অস্ত্রোপচার চিকিৎসার সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতার উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই। কিন্তু দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে, সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের যুগেও চিকিৎসকদের রোগীপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বর্তমানের চিকিৎসকদের মতই তীব্র ছিল! নিম্নলিখিত উক্তিটিই তার পরিচায়ক—"আমাদের কর্ম বিবিধ, মানুষের পেশাও সে কারণেই বিভিন্ন। সূত্রধরের যেমন উপযুক্ত কাষ্ঠ লাভের আকাঙ্ক্ষা, চিকিৎসকেরও তেমনি রোগের প্রতিবিধানের আকাঙ্ক্ষা" (IX, 7, 9)।

নির্বীজন

শ্রীশশধর বিশ্বাস

কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, যক্ষ্মা, জলাতঙ্ক প্রভৃতি ব্যাধির কারণ একমাত্র জীবাণু। জীবাণুর কার্যকারিতা নির্ভর করে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। প্রায়ই দেখা যায়, একই গৃহে একই খাদ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয় আর কেউ কেউ সুস্থ থাকে। ইহার জন্য দায়ী তাহাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রতিরোধ ক্ষমতার মানকে নিম্নাভিমুখী করে। প্রথমেই দেখা যাক, জীবাণু কি এবং তাহাদের কিভাবে নির্মূল করা যায়।

জীবের অণুতম পদার্থকে জীবাণু বলে। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজ দুই প্রকারেরই জীবাণু হইতে পারে। তবে সকল জীবাণুই ব্যাধির কারণ নহে। সকল প্রকারের জীবাণুকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সরলাকৃতি সকল জীবাণুকে ব্যাসিলাই বলে; যথা—অ্যানথ্রাক্স, টিটেনাস, প্লেগ প্রভৃতি রোগের জীবাণু। বক্রাকৃতি সকল জীবাণুকে কক্কাই বলে; যথা—মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগের জীবাণু। সাধারণতঃ জীবাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা হয়। কতকগুলিকে আবার সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না। তাহাদের জন্য অতিশয় শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এইরূপ জীবাণুকে আলট্রা-মাইক্রোস্কোপিক ভাইরাস বলে; যথা—বসন্ত, ইনফ্যানটাইল প্যারালিসিস। জীবাণুগুলির আবার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক প্রকার জীবাণু বায়ুর অভাবে নিস্তেজ হইয়া থাকে। তাহাদের বায়ব্য জীবাণু বা Aerobic Bacteria বলে, যথা—টিটেনাস, স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস প্রভৃতি। রবার্টসন কুক্‌সড্ মিট মিডিয়া ইহাদের উপযোগী মাধ্যম। কতকগুলি জীবাণু বায়ুর অভাবেও নিষ্ক্রিয় হয় না। সেগুলিকে অ-বায়ব্য বা Anaerobic Bacteria বলে। কতকগুলি জীবাণু আছে যাহারা মৃত জৈব পদার্থের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে—তাহাদিগকে স্যাপ্রোফাইটিক বলে। আবার কতকগুলি জীবাণু পরাশ্রয়ী বৃক্ষের মত অপরের দেহাশ্রয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহাদিগকে প্যারাসাইটিক জীবাণু বলে। বায়ু ও খাদ্যের অভাব ঘটিলে ব্যাসিলাসগুলি নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পাইলেই তাহারা সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসে এবং অসম্ভব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ২৪ ঘণ্টায় ২৪ লক্ষ জীবাণু সৃষ্টিকারী জীবাণুর' পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। জীবাণুগুলি দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একপ্রকার বিষের সৃষ্টি করে এবং ঐ বিষের দ্বারা দেহে ব্যাধির সৃষ্টি করে।

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবন্ত কণা ও স্পোর হইতে দ্রব্যাদি পৃথক করা যায়, তাহাকে নির্বীজন বলে। এই নির্বীজন দুই প্রকারে হইতে পারে; যথা—জীবাণু ধ্বংসকরণ এবং জীবাণু পৃথিকীকরণের দ্বারা।
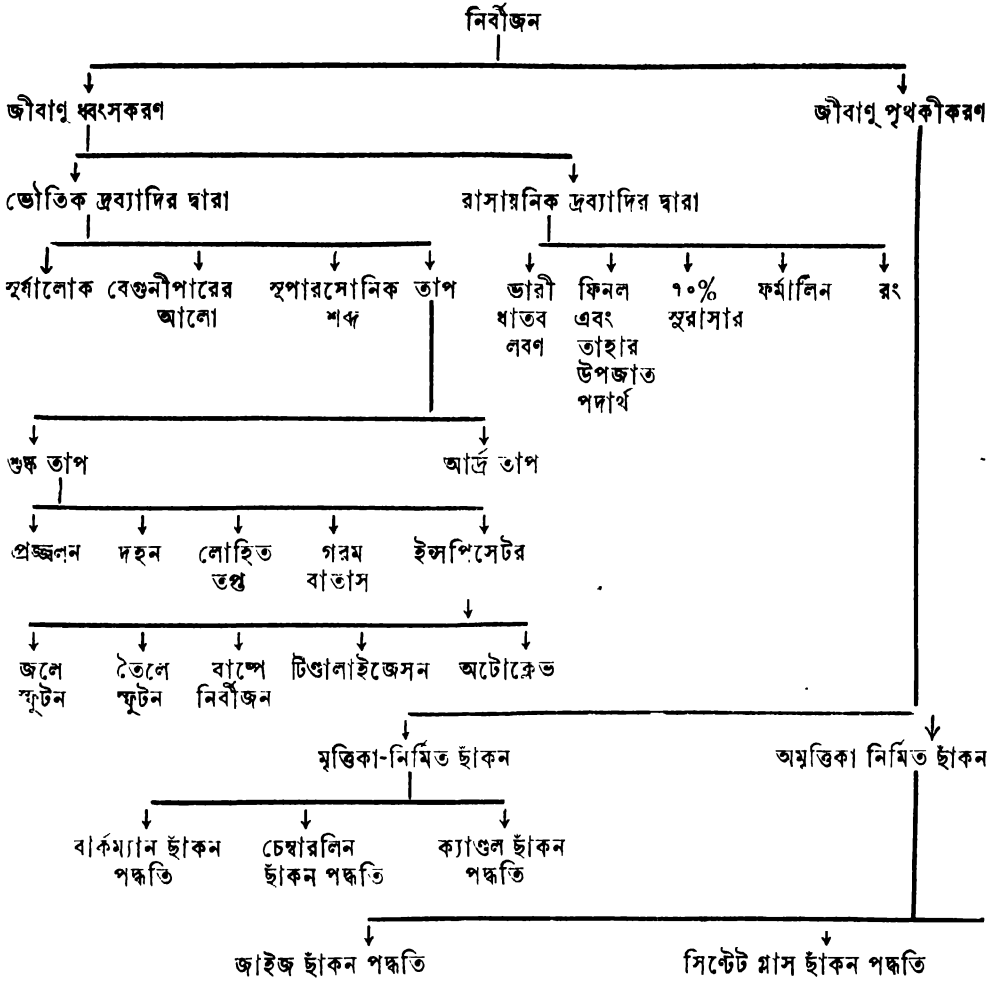
নির্বীজন দুই প্রকারে করা যায়। জীবাণু মারিয়া এবং জীবাণু ছাঁকিয়া। বীজাণুকে ভৌতিক ও রাসায়নিক—এই দুই প্রকার দ্রব্যের দ্বারা মারা যায়। ভৌতিক দ্রব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সূর্যালোক—প্রখর সূর্যকিরণে বহু জীবাণু বাঁচিতে পারে না। সূর্যালোকের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, ইনফ্রা রশ্মি প্রভৃতি জীবাণু নিধনে সহায়তা করে। স্পোরগুলির দেহ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকায় সূর্যালোক তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারে না। ইহার উপকারিতা হইল এই যে, ইহাতে কিছু বিকৃতি লাভ করে না। কিন্তু উত্তাপে প্রোটিন বিকৃতি লাভ করে।

(২) বেগুনীপারের আলো—ইহা সূর্যালোকে বা কৃত্রিমভাবে তৈয়ারী করা যায়। ইহা একটি শক্তিশালী বীজাণুনাশক। পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহার দ্বারা জল নির্বীজন করা হয়।

(৩) সুপারসোনিক শব্দ—জাপানীরা ইহাকে খুবই কাজে লাগায় জীবাণুনাশক হিসাবে। তাহারা কাচের তৈজসপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিষ্কার ও নির্বীজনের জন্য ইহা ব্যবহার করে। ইহাতে কিছুই বিকৃতি লাভ করে না।

(৪) তাপ—সকল প্রকার ভৌতিক নির্বীজন পদ্ধতির মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত। তবে সকল পদার্থই ইহার দ্বারা নির্বীজন করা যায়, এইরূপ কোন ধারণা থাকিলে ভুল হইবে। এই প্রকার নির্বীজন প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—শুষ্ক ও আর্দ্রতাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া। শুষ্ক তাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় তাপ শুষ্ক অবস্থায় থাকে।

(ক) দহন—আমাদের দেশে মৃতদেহ পোড়াইবার রীতি আছে। জীবাণুনাশ অথবা পরিশোধনের দিক দিয়া ইহা অত্যন্ত উত্তম প্রক্রিয়া। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগাক্রান্ত রোগীর কাপড়চোপড় এইভাবে পোড়াইয়া জীবাণুমুক্ত করা হয়।

(খ) প্রজ্জ্বলন—ইহা সকল সময় ব্যবহার করা যায় না। মাধ্যম পাত্রে জীবাণুর চাষ করিবার সময় ইহার সাহায্য লওয়া হয়। জীবাণু বসাইবার কাজও সকল সময়ই বার্ণারের পাশে করা হয়।

(গ) লোহিত তপ্ত—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন হয়। মাধ্যম লইয়া কাজ করিতে হইলে প্ল্যাটিনাম তারকে এই প্রকারে বীজাণুমুক্ত করা হয়।

(ঘ) গরম বাতাসে কাচের দ্রব্যাদি বীজাণু-মুক্ত করিতে হইলে এই প্রকারে করিতে হয়। এখানে এক ঘণ্টা ধরিয়া ১৬০° সেঃ তাপে রাখিতে হয়। এই যন্ত্রে একটি বদ্ধ আবরণ থাকে এবং তাহা অপর একটি আবরণের দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং দুই আবরণের মধ্যাংশের বাতাসকে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। নির্বীজন কালে কাচের সকল দ্রব্যাদিই কাগজের মোড়কের মধ্যে শুষ্ক অবস্থায় রাখিতে হয়। সমস্ত যন্ত্রটি গরম এবং ঠাণ্ডা অতি সাবধানে করিতে হইবে। ইহার ভেদ-শক্তি নাই।

(৬) ইন্সপিসেটর—ডিমের সিরামের মাধ্যমকে এই প্রকারে বীজাণুমুক্ত করা হয়। মাধ্যমকে অর্ধ ঘণ্টা ধরিয়া ৮০° সেঃ-এ পর পর তিন দিন রাখা হয়। এখানে কর্ক-স্ক্রু মত নলগুলিকে (যাহার মধ্যে ডিমের মাধ্যম থাকে) কাৎ করিয়া রাখা হয়। প্রথম দিনই সকল জীবাণু মারা যায় এবং তাহার পর ঐগুলিকে ৩৭° সেঃ-এ রাখা হয়। পরের দিন ঐ একই অবস্থায় অবশিষ্ট স্পোরগুলি মারা যায়। যদিও তৃতীয় দিনের তাপ নিষ্প্রয়োজন, তথাপি ইহা সাবধানের জন্য করা হয়। তিন দিনের বদলে ইহাকে ৪০° সেঃ-এ দুই ঘণ্টা রাখিলেও চলে।

আর্দ্রতাপ প্রক্রিয়া—এখানে তাপ আর্দ্র অবস্থায় থাকে।

(ক) জলে স্ফুটন—কালাজ্বর প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত কাচের সিরিঞ্জ এইভাবে নির্বীজন করা হয়।

(খ) তৈলে স্ফুটন—কতকগুলি তৈল জাতীয় দ্রব্য যাহাদের স্ফুটনাঙ্ক অত্যন্ত কম (যথা—প্যারাফিন), তাহাদের সাহায্য লওয়া হয় নির্বীজনের জন্য। কাচের সিরিঞ্জ এইভাবে নির্বীজন করা হয়।

(গ) বাষ্পে নির্বীজন—এখানে বাষ্পের দ্বারা নির্বীজন করা হয়। ১০০° সেঃ অবধি জল উত্তপ্ত করিলে প্রায় সকল জীবাণুই মারা যায়। সাধারণ-ভাবে ১০০° সেঃ উত্তাপে ½ ঘণ্টা রাখিতে হয়। কিন্তু স্পোরগুলিকে মারিতে হইলে ১½ ঘণ্টা রাখিতে হয়। টিণ্ডালাইজেশন প্রক্রিয়ায় ১০০° সেঃ ½ ঘণ্টা করিয়া ৩ দিন রাখা হয়। সুগার সিরাম এই ভাবে নির্বীজন করা হয়।

(ঘ) অটোক্লেভ—এখানে সকল প্রকার স্পোরই মারা যায়। যন্ত্রটি ভারী গান মেটালের তৈয়ারী। যন্ত্রে দুইটি মিটার যুক্ত থাকে। একটির দ্বারা অভ্যন্তরস্থ চাপ মাপা হয় এবং অপরটির দ্বারা অভ্যন্তরস্থ তাপ মাপা হয়। ইহাতে একটি নির্গমন নল এবং একটি সেফ্‌টি ভাল্‌ভ থাকে। দ্রব্যাদিকে ১২০° সেঃ তাপমাত্রায় ২০ মিঃ রাখিতে হয়। রেখা-ঙ্কিত পিপেট এবং ধাতু দ্রব্য সহযোগে তৈয়ারী সিরিঞ্জ এইভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। যন্ত্রটিকে উত্তপ্ত ও শীতল সাবধানে করিতে হয়। এখানে সর্বদা চাপ ১৫ পাঃ-এ রাখিতে হয়

রাসায়নিক দ্রব্যাদির দ্বারা নির্বীজন—নির্বীজন ও জীবাণুনাশক ঔষধপত্রাদির সাহায্যে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিশোধন করা হয়। ঔষধের কার্যকারিতা বীজাণুর প্রকার, সংখ্যা ও আক্রমণের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল।

১। ভারী ধাতুর লবণ—ভারী ধাতুর লবণের নির্বীজন ক্ষমতা থাকে ; যথা—স্বর্ণের লবণ, রৌপ্যের লবণ, পারদের লবণ ইত্যাদি। এইগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, কারণ এইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং জৈব পদার্থের ক্ষেত্রে এইগুলি নিষ্ক্রিয় (ব্যতিক্রম—মারথিউলেট)।

২। ফিনোল ও তাহার উপজাত—৩% লাইজলে কাচের টিউব এবং প্লেটগুলি ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া নির্বীজন করা হয়। কিন্তু ক্ষুরধার সার্জিক্যাল দ্রব্যগুলি বিশুদ্ধ লাইজলের দ্বারা নির্বীজন করা হয়। কোন ক্ষেত্রেই দেহের মধ্যে ইহার ব্যবহার করিতে নাই। দুর্গন্ধনাশকারী হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা হয়।

৩। অ্যালকোহল—বিশুদ্ধ সুরাসারের (অ্যালকোহল) নির্বীজন ক্ষমতা নাই। ৭০% অ্যালকোহলের নির্বীজন ক্ষমতা থাকে। টিকা দিবার পূর্বে ৭০% অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় চর্ম বীজাণুমুক্ত করিবার জন্য।

৪। ফর্ম্যালিন—ফর্ম্যালিন যক্ষার জীবাণু ধ্বংস করিবার জন্য প্রয়োজন হয়। যদি কোন কক্ষ যক্ষা জীবাণুদুষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে ৫০% ফরম্যালডিহাইডের দ্বারা ঘরটি স্প্রে করা হয়। ফরম্যালডিহাইড হইতে ফর্ম্যালিন তৈয়ারী হয় এবং তাহা অ্যামোনিয়ার দ্বারা নষ্ট করা হয়।

৫। বিবিধ রঞ্জক পদার্থ—কতকগুলি রঙের জীবাণু নিধনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্পোরগুলি ইহাদের দ্বারা মারা যায় না।

জীবাণু পৃথকীকরণ

চেম্বারলিন, বার্কম্যান ও ক্যাণ্ডেরস ফিল্টার জল নির্বীজনে ব্যবহৃত হয়। জাইজ ছাঁকন পদ্ধতি—এই পদ্ধতির দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বীজাণু পৃথক করা যায়। ইহার একমাত্র অসুবিধা হইল এই যে, এখানে অ্যাস্‌বেষ্টসের সাহায্যে ছাঁকন হওয়ায় সামান্য জিনিষ ইহার দ্বারা ছাঁকা যায় না। কারণ তাহা অ্যাস্‌বেষ্টসের দ্বারা শোষিত হয়। ইহার ছিদ্রগুলির আয়তন ৫μ, স্পোরের আকৃতির অপেক্ষা ছোট। ইহা তিন প্রকারের হয়। K, EK এবং সাধারণ।

ইন্সপিসেটরে সকল দ্রব্য পোড়ান হয়। কোন টিউবের মধ্যে জীবাণু থাকিলে তাহার ৩% লাইজল দিয়া পরিষ্কৃত হয় এবং তাহার পর সোডার জলের দ্বারা ধোয়া হয়। গরম সোডার জলে সারারাত্র রাখিলেও চলে। স্পোর থাকিলে প্রথমে অটোক্লেভ করিতে হয় এবং পরে প্লেটগুলি সোডার জলে ধুইয়া লইতে হয়। সিরামকে জাইজ ফিল্টার, অটোক্লেভ বা ৫% ক্লোরোফর্মের দ্বারা বীজাণুমুক্ত করা হয়। ডিমের মিডিয়া ইন্সপিসেটরে নির্বীজন করা হয়। ভাইরাস মুক্ত করিতে হইলে পাস্তুর ফিল্টার করিতে হয়। সার্জিক্যাল ড্রেসিং গরম বাতাসের দ্বারা নির্বীজন করা হয়। অক্সালিক অ্যাসিড, ডেটল প্রভৃতির কেবল দুর্গন্ধনাশের ক্ষমতাই আছে। টিঃ আয়োডিন সেপসিস প্রতিহত করে।

পরমাণু কেন্দ্রীনের মিলন কাহিনী

জয়ন্ত বসু

আপনারা নিশ্চয় এমন অনেক মিলন কাহিনীর কথা শুনেছেন, যার ফলে অমিতশক্তিসম্পন্ন নতুনের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বিস্ময়কর শক্তি উদ্ভূত হয় যে মিলনে, সেই মিলনের কাহিনী আজ আপনাদের শোনাব।

এই মিলন ঘটে দুটি হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রীনের পরস্পরের সঙ্গে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় Nuclear fusion বা কেন্দ্রীনের সংযোজন। এখানে হাল্কা পরমাণু অর্থে সাধারণভাবে সেই সব পরমাণু, যাদের কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা ২৪-এর থেকে কম। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, যে সব পরমাণু অপেক্ষাকৃত ভারী, তাদের কেন্দ্রীন থেকে সাধারণতঃ শক্তি উৎপন্ন হয় Nuclear fission বা কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পাঠক আপনারা, আপনাদের অবশ্যই জানা আছে যে, পারমাণবিক চুল্লীর শক্তির মূলে হলো ভারী পরমাণু ইউরেনিয়াম ২৩৩ বা ২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়াম ২৩৯-এর বিভাজন প্রক্রিয়া।

ভরের শক্তিতে রূপান্তর

সংযোজন বা বিভাজনের ফলে উদ্বৃত্ত সুবিপুল শক্তির জন্মরহস্যের উত্তর হলো এই—যে প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়ায় যে সব কেন্দ্রীন অংশগ্রহণ করে, তাদের সর্বসমেত ভরেরও সামান্য কিছু কমতি ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে কমতি ভরটুকুই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। ঐ সামান্য ভর থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হতে পারে, তা আমরা তো তত্ত্বগতভাবেও আইনস্টাইনের সেই অবাক-করা সূত্র $E=mc^2$ থেকে জানি—E সেখানে শক্তি, m হলো ভর, আর c আলোর গতিবেগ। সূত্রটি অনুযায়ী এক কিলোগ্র্যাম ভর যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে সেই শক্তিতে হাজারটি এক-কিলোওয়াট আলোকে একনাগাড়ে প্রায় ৩ হাজার বছর ধরে জ্বালানো চলবে।

প্রকৃতির রাজ্যে

প্রকৃতির রাজ্যে বহুস্থলেই কেন্দ্রীনের সংযোজনজাত শক্তি দেখা যায়। সূর্য যে প্রবল শক্তির আধার, তার মূলে হলো হাইড্রোজেনের সংযোজনপ্রক্রিয়া। সূর্যের যেখানে যেখানে কার্বন আছে, সেখানে আবার কার্বনের সহায়তায় হাইড্রোজেনের সংযোজন ত্বরান্বিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে তখন বলা হয় Carbon cycle বা কার্বন চক্র। সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে সংযোজন-প্রক্রিয়ায় ৬৫ কোটি ৭০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন ৬৫ কোটি ২৫ লক্ষ টন হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে, আর উদ্বৃত্ত ৪৫ লক্ষ টন রূপান্তরিত হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিতে। এই শক্তি যে কত প্রচণ্ড, তা আমরা ধারণা করতে পারি যখন জানি, পৃথিবীর সমস্ত বায়ুমণ্ডলে সূর্য থেকে যে শক্তি এসে পড়ে, সৌরশক্তির ২০০ কোটি ভাগের সেটা একভাগ মাত্র। সূর্যের মত অন্যান্য অনেক নক্ষত্রেও হাইড্রোজেনের সংযোজন বিপুল শক্তির সৃষ্টি করে চলেছে।

হাইড্রোজেন বোমা

প্রকৃতির অনুকরণে পৃথিবীর মানুষও কেন্দ্রীনের সংযোজনজনিত শক্তি সৃষ্টি করেছে, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে।

প্রথম যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের কথা আমরা জানি, তার শক্তিতে নাকি পানামা খালের মত ১৬টি খাল খুঁড়ে ফেলা যায়। সংবাদ পত্রের ঘোষণা অনুযায়ী—এমন সব সাংঘাতিক হাইড্রোজেন বোমাও প্রস্তুত হয়েছে, ধ্বংসের শক্তিতে যা ১০ কোটি টন TNT বিস্ফোরকের সমতুল্য।

হাইড্রোজেন বোমাতে অবশ্য সাধারণ হাইড্রোজেন নয়, হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়েটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডয়েটেরিয়ামকে ভাবা চলে যেন হাইড্রোজেনের মেজদাদা, আর ট্রিটিয়াম তাহলে বড়দাদা। হাইড্রোজেনের তুলনায় ডয়েটেরিয়াম একটু ভারিক্কি চাল-চলনের। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে যেখানে কেন্দ্রে এক প্রোটন ও তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান এক ইলেকট্রন, ডয়েটেরিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে সেখানে প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রনও বর্তমান। এদের মধ্যে ট্রিটিয়ামের চালচলনই সবচেয়ে ভারিক্কি—তার কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে দুটি নিউট্রন রয়েছে।

হাইড্রোজেন বোমার ভিতরে প্রথমতঃ একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অত্যধিক উত্তাপের সৃষ্টি করা হয় এবং তারপর ঐ উত্তাপের সাহায্যে বোমার ভিতরের ডয়েটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের কেন্দ্রীনের সংযোজন সাধিত হলে হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে।

নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী

সংযোজন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই শক্তির মঙ্গলজনক ব্যবহারে মানুষ কিন্তু এখনো সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এই সাফল্য অর্জনের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। এজন্যে তাঁরা যে যন্ত্রের উদ্ভাবনে উৎসুক, তার নাম Controlled fusion reactors বা নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী।

চুল্লীর জ্বালানী হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ডয়েটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম। তার কারণ—পৃথিবীর সমুদ্রের জলে যে প্রায় ২.৫×১০^{১৯} গ্র্যাম ডয়েটেরিয়াম আছে, তাকে সোজাসুজি যদি ব্যবহার করতে পারা যায় বা তাই থেকে তৈরী ট্রিটিয়ামের সঙ্গে যদি তাকে ব্যবহার করতে পারা যায়, তাহলে সমস্ত পৃথিবীতে বর্তমান উৎপন্ন শক্তির হাজার গুণ শক্তি ১০০ কোটি বছর ধরে সৃষ্টি করা চলবে।

মানুষের সভ্যতার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সংযোজন চুল্লীর প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। মনুষ্য-সভ্যতার ক্রমবর্ধমান ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানী এক-শ' বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এক শতাব্দী পরে শক্তির যা চাহিদা হবে, পৃথিবীর বুকে যত সৌরশক্তি সংগৃহীত হতে পারে, সমস্ত একত্র করলেও সে চাহিদা মেটানো যাবে না। তখন উপায় কেবল কেন্দ্রীনের বিভাজন বা সংযোজনজনিত শক্তি। কিন্তু বিভাজনের উপযুক্ত যত জ্বালানী পৃথিবীতে আছে, এক শতাব্দী পরে কয়েক দশকের মধ্যেই তা ফুরিয়ে যাবে। তাহলে ভরসা কেবল কেন্দ্রীনের সংযোজন। সুখের বিষয়, সমুদ্রের জলে যে ডয়েটেরিয়াম আছে, সংযোজনের জ্বালানী হিসাবে তা সভ্যতার দ্রুত বর্ধমান চাহিদাকেও অনায়াসে ১০০ কোটি বছর মেটাতে পারবে।

সংযোজন চুল্লীর জন্যে যে প্রক্রিয়াগুলির কথা বিজ্ঞানীরা এখন বিশেষভাবে চিন্তা করছেন, সেগুলি নীচে দেওয়া হলো।

(১) $D+D \rightarrow T+T+p+4{\cdot}03$ Mev

(২) $D+D \rightarrow He^{3}+n+3{\cdot}25$ Mev

(৩) $D+T \rightarrow He^{4}+n+17{\cdot}58$ Mev

(৪) $D+He^{3} \rightarrow He^{4}+p+18{\cdot}34$ Mev

(৫) $T+T \rightarrow He^{4}+2n+11{\cdot}30$ Mev
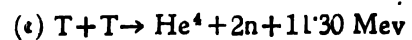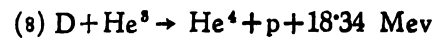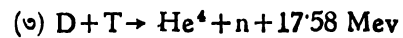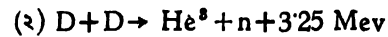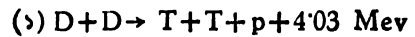
এখানে D হলো ডয়েটেরিয়ামের কেন্দ্রীন, T ট্রিটিয়ামের, He^{4} হিলিয়ামের। He^{3} হলো

হিলিয়ামের একটি আইসোটোপের কেন্দ্রীন। এই He^3-কে হিলিয়ামের ছোট ভাই বলা চলে —অপেক্ষাকৃত চঞ্চল এটি। হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে যেখানে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে, He^3-এর কেন্দ্রীনে সেখানে দুটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন। p হচ্ছে প্রোটন, n নিউট্রন। Mev হলো Mega (বা দশ লক্ষ) ইলেকট্রন ভোল্ট, শক্তির একক। বিদ্যুৎ-চাপের এক ভোল্ট বৈষম্যকে অতিক্রম করতে একটা ইলেকট্রনকে যতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয়, সেই শক্তির পরিমাণ হলো এক ইলেকট্রন ভোল্ট।

উত্তপ্ত জ্বালানী গ্যাস—প্লাজমা

সংযোজন চুল্লীর সার্থকতার জন্যে জ্বালানী গ্যাসকে অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। পরমাণুর কেন্দ্রীন ধনাত্মক বিদ্যুৎবিশিষ্ট; দুটি কেন্দ্রীনের মধ্যে তাই বিকর্ষণ রয়েছে। কেন্দ্রীনগুলি পরস্পরের খুব কাছে এলে কিন্তু তখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জ্বালানী অত্যধিক উত্তপ্ত হলে কেন্দ্রীনগুলি অত্যন্ত বেগসম্পন্ন হয় ও বেগের ফলে প্রাথমিক বিকর্ষণকে কাটিয়ে পরস্পরের নিকটস্থ হতে পারে, ফলে সংযোজন সম্ভবপর হয়। তাছাড়া জ্বালানীর ঐ অবস্থায় পরমাণু সাধারণতঃ সম্পূর্ণ আয়নিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ পরমাণুর সব ইলেকট্রন কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীনগুলির তাই পরস্পরের কাছে আসতে হলে ইলেকট্রনের বেড়াজাল পার হবার জন্যে শক্তিক্ষয় করতে হয় না।

জ্বালানীর এই আয়নিত অবস্থার নাম প্লাজমা (Plasma)। এতে রয়েছে পরস্পরের বন্ধনমুক্ত সমান সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রন। বর্তমানে প্লাজমা-বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে প্লাজমা দুষ্প্রাপ্য হলেও সমস্ত বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ বস্তুই প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে।

প্লাজমার তাপমাত্রা, আয়নের সংখ্যা ও স্থায়িত্বকাল

সংযোজন চুল্লীতে উত্তপ্ত প্লাজমার তাপমাত্রা বাড়ালে প্লাজমা থেকে বিকিরণের ফলে যে শক্তিক্ষয় হয়, তাও বাড়তে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে সংযোজনের ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা বাড়ে আরো দ্রুতহারে। হিসাব করে দেখা গেছে, বিকিরণের শক্তিক্ষয় ছাপিয়ে সংযোজনজনিত শক্তি যাতে উদ্বৃত্ত থাকে, তার জন্যে প্লাজমার তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মানের উপরে হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, উপরে উল্লিখিত DD প্রক্রিয়ার জন্যে প্রায় ৪১ কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন। DT প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজন প্রায় ৫ কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের।

যাই হোক, সংযোজন চুল্লীর সার্থকতার জন্যে শুধু প্লাজমার উচ্চ তাপমাত্রাই যথেষ্ট নয়, প্লাজমায় আয়ন (ও ইলেকট্রন) কণিকার সংখ্যা এবং প্লাজমার স্থায়িত্বকাল—এই দুটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়ন কণিকার সংখ্যা বেশী হলে তবে না যথেষ্ট পরিমাণ আয়ন সংযোজন-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে! আবার আয়নের সংখ্যা খুব বেশী হলে কিন্তু এত চাপের সৃষ্টি হয় যে, প্লাজমাকে ধরে রাখাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ প্লাজমার প্রতি ঘনসেণ্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা হওয়া উচিত $১০^{১৩}$ থেকে $১০^{১৭}$।

চুল্লীতে উত্তপ্ত প্লাজমা যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা থেকে তত বেশী শক্তি সংগ্রহ করা চলবে। কিন্তু এই প্লাজমাকে বেশীক্ষণ একত্র ধরে রাখা একটি দুরূহ সমস্যা। সাধারণ কোন পাত্রে তো তা অসম্ভব, কারণ ঐ তাপমাত্রায় পাত্রটি গলে যাবে, আর তা না গেলেও পাত্রের দেয়াল থেকে বিকিরণের ফলে সংযোজনজনিত শক্তি বহুল পরিমাণে নষ্ট হবে। প্লাজমাকে তাই ধরে

রাখবার জন্যে ব্যবহৃত হয় Magnetic cage বা চৌম্বক পিঞ্জর। যে সব আয়ন বা ইলেকট্রন প্লাজমা থেকে পলায়নপর হয়, চৌম্বক শক্তির সাহায্যে তাদের গতির পরিবর্তন করে এই অদৃশ্য পিঞ্জরের মধ্যে তাদের আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়। তবে অনেক চেষ্টা করেও সবচেয়ে দীর্ঘ যে সময় উত্তপ্ত প্লাজমাকে ধরে রাখতে পারা গেছে, তা হলো ½ সেকেণ্ড।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আয়নের সংখ্যা বা প্লাজমার স্থায়িত্বকাল, এককভাবে কোনটির উপরই সংযোজন প্রক্রিয়ার সার্থকতা নির্ভর করে না, নির্ভর করে n×t-এর উপর, n যেখানে প্লাজমার প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা ও t সেকেণ্ড প্লাজমার স্থায়িত্বকাল। উদাহরণস্বরূপ, DD প্রক্রিয়ার জন্যে $n \times t \approx ১০^{১৬}$ হওয়া প্রয়োজন, আর DT প্রক্রিয়ার জন্যে $n \times t \approx ১০^{১৪}$।

গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা

সংযোজন চুল্লী তৈরীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হয় ১৯৫৬-৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডের জিটা (ZETA) নামক যন্ত্রে। ১নং চিত্রে জিটার একটি আলোক চিত্র দেখানো হয়েছে। জিটা যন্ত্রটি এক বিরাট ফাঁপা নলের একটি প্রকাণ্ড কুণ্ডলী। বিশাল এক লৌহপিণ্ডের দ্বারা ঐ কুণ্ডলী বেষ্টিত। লৌহপিণ্ডে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে স্বল্পকালের জন্যে প্রচণ্ড এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ অতিবাহিত করে ফাঁপা নলের ভিতর অত্যন্ত উত্তপ্ত প্লাজমার সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই প্লাজমার তাপমাত্রা ছিল
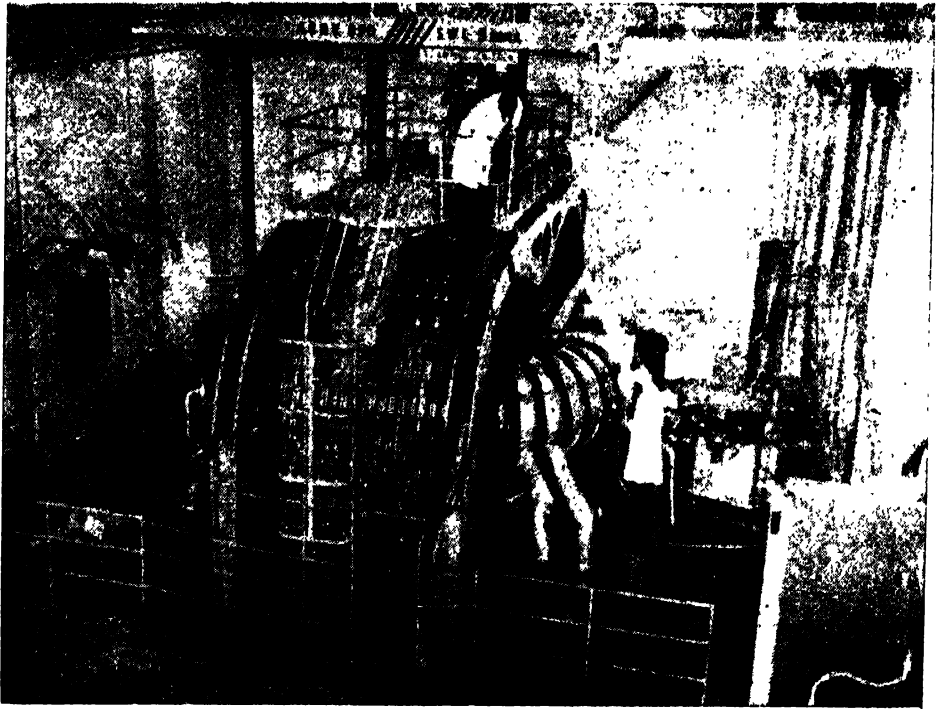
১নং চিত্র।

জিটা (ZETA): নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

প্রায় দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও স্থায়িত্বকাল এক সেকেণ্ডের কয়েক সহস্রাংশ। ফাঁপা নলটির চারদিকে ঘন করে মোটা তার জড়িয়ে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে একটি চৌম্বক শক্তিরও সৃষ্টি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্লাজমার স্থায়িত্বকালকে বড়ানো।

জিটা ছাড়াও রাশিয়ার ওগ্রা (Ogra), আমেরিকার স্টেলারেটর (Stellarator) প্রভৃতি যন্ত্রকে সংযোজন চুল্লী হিসাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ হলো, সোভিয়েট ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের ১৯৬৩ সালের কৃতিত্ব। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ডয়েটেরিয়াম-ট্রিটিয়াম প্লাজমাকে ৪ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১ সেকেণ্ডের কয়েক
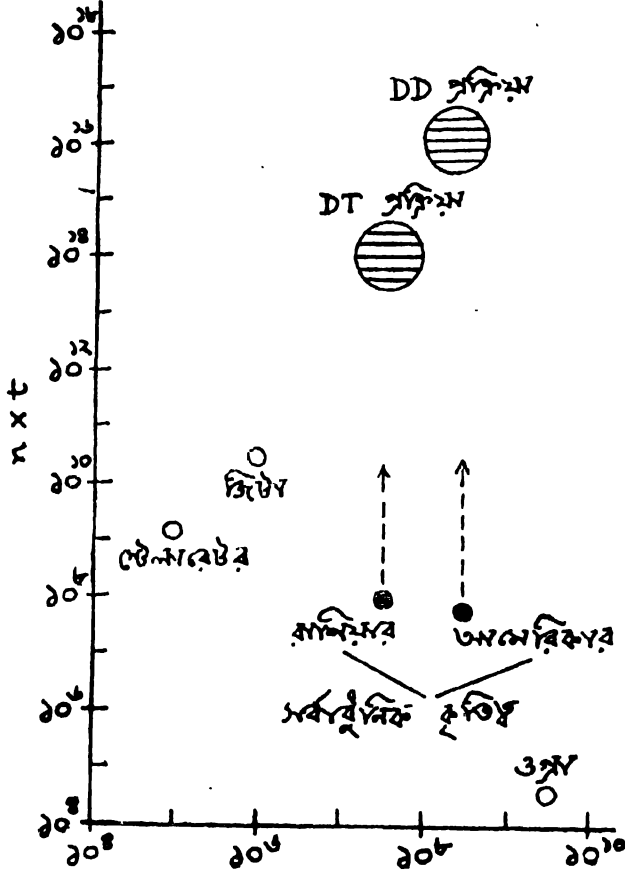
২নং চিত্র।

প্লাজমার বৈশিষ্ট্য। T° সেন্টিগ্রেড হলো প্লাজমার তাপমাত্রা, n প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা ও t সেকেণ্ড প্লাজমার স্থায়িত্বকাল। সংযোজন চুল্লীতে সার্থক DD ও DT প্রক্রিয়ার জন্যে প্লাজমার যে বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন এবং মানুষ আজ পর্যন্ত প্রধানতঃ যা অর্জন করতে পেরেছে, চিত্রে তাই দেখানো হয়েছে। তীর দুটি সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করছে।

শতাংশের জন্যে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। প্লাজমার প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা ছিল $১০^{১০}$। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ডয়েটেরিয়াম প্লাজমাকে ২০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রায় $\frac{১}{২}$ সেকেণ্ডের জন্যে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তবে এই প্লাজমা ছিল অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা; প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা $১০^{৮}$। সংযোজন চুল্লীর উদ্দেশ্যে এ-পর্যন্ত যত প্লাজমার সৃষ্টি হয়েছে, ২নং চিত্রে তাদের কয়েকটির বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো। DD ও DT প্রক্রিয়ার সার্থকতার জন্যে প্লাজমার কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, তাও চিত্রে দেখানো হয়েছে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আশ্চর্য অবদান যে লেজার (LASER), যার কথা আপনারা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় নিশ্চয় সম্প্রতি পড়ে থাকবেন, সংযোজনের উপযোগী প্লাজমা সৃষ্টি করবার জন্যে সেই লেজারকেও বর্তমানে নিয়োগ করা হচ্ছে।

প্লাজমার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

প্লাজমার তাপমাত্রা, প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা, স্থায়িত্বকাল, পরিবর্তনশীলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করবার জন্যে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। প্লাজমা থেকে নির্গত নিউট্রনগুলির সাহায্যে প্লাজমার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা জানতে পারি। প্লাজমা থেকে যে আলো বিকিরিত হয়, তাও এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। প্লাজমার কাছে যদি একটি তারের কুণ্ডলী ধরা যায়, তাহলে তার মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপশক্তির যে তারতম্য ঘটে, সেটা লক্ষ্য করে প্লাজমার পরিবর্তনশীলতার সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি। প্লাজমার বৈশিষ্ট্য জানবার আর এক ধরণের প্রণালী আছে, যাতে Microwave বা ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার করা হয়। ঐ তরঙ্গকে প্লাজমার মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়, ও সে তরঙ্গ-প্রবাহের উপর প্লাজমার যে প্রভাব, তাথেকে প্লাজমার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়।

উপসংহার

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, প্রকৃতির রাজ্যে পরমাণু-কেন্দ্রীনের মিলন ও তার ফলাফল বহুস্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতির অনুকরণে মানুষও যে ব্যর্থ হয়েছে, তা নয়। তার প্রমাণ হাইড্রোজেন বোমা। অবশ্য কেন্দ্রীনের মিলনকে মানুষ এ-পর্যন্ত কল্যাণকর শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করতে পারে নি। তবে সে জন্যে তার চেষ্টার বিরতি নেই। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভাতে "Atoms for Peace" বা "শান্তির জন্যে পরমাণু" নামে সম্মেলনের যে তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বলা হয়েছে, ১৯৫৮ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লীর সাফল্যের সম্ভাবনা যতটা উজ্জ্বল মনে হয়েছিল, এখন তা কিছুটা ম্লান হলেও গত ৬ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। আমরা জানি, যে দিন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হবে, মনুষ্য-সভ্যতার আসন্ন শক্তিসঙ্কট সমস্যার উত্তর সে দিন মিলবে, আর মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প্রগতির পথে সফলতা থেকে আরো সফলতায় যাবে এগিয়ে। বর্তমান পৃথিবীর বহুলাংশে এখনো যে অবস্থা, জ্ঞান-সমুদ্রে এসেছে জোয়ার, জীবনে কিন্তু চড়া—আমরা অবশ্যই আশা রাখি, সে অবস্থার ততদিনে আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

দেহে কোলেষ্টেরল উৎপাদন ও তার বিক্রিয়া সম্পর্কে ডাঃ ব্লকের অবদান

ঈপ্সিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রাণিদেহে কোলেষ্টেরল তৈরীর প্রক্রিয়া নির্দেশ করবার কৃতিত্বের জন্যে ১৯৬৪ সালে চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা বিভাগের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ কোনরাড ব্লক।

১৯১২ সালে জার্মেনীর নাইস নামক স্থানে ব্লকের জন্ম হয়। তিনি মিউনিকের একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ব্লক জার্মেনী ত্যাগ করে আমেরিকায় যান। ১৯৩৮ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাণ-রসায়নে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়েই সহকারী ও গবেষক হিসাবে কাজ করেন ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। এরপর ডাঃ ব্লক প্রাণ-রসায়নের সহকারী অধ্যাপকরূপে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে সহযোগী অধ্যাপকের পদ ও ১৯৫২-৫৪ সাল পর্যন্ত অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৪ সালে ডাঃ ব্লক প্রাণ-রসায়নের হিগিন্স অধ্যাপকরূপে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি এই পদেই আসীন আছেন।

বহুপূর্ব থেকেই জানা ছিল যে, প্রাণিদেহে কোলেষ্টেরল তৈরী হয়। খাদ্যে কোলেষ্টেরল না থাকলেও দেহে কোলেষ্টেরলের অভাব হয় না ; কারণ দেহের ভিতর প্রচুর পরিমাণে কোলেষ্টেরল উৎপন্ন হয়। কিন্তু কি ভাবে এই জটিল যৌগটি দেহের মধ্যে তৈরী হয়, সে বিষয়ে বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। ডাঃ ব্লক ও তাঁর সহকর্মীদের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিচক্ষণ আইসোটোপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের ফলে প্রাণিদেহে কোলেষ্টেরল উৎপাদনের বহু তথ্যই আজ সর্বজন-পরিচিত।

১৯৩৭ সালে রিটেনবার্গ ও শোয়েনহাইমার ইঁদুরকে কোলেষ্টেরলবিহীন খাদ্য আর ভারী জল (ডয়টেরিয়াম অক্সাইড) খাইয়ে দেখলেন, ইঁদুরের দেহে যে কোলেষ্টেরল তৈরী হয়েছে, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে ডয়টেরিয়াম রয়েছে। এথেকে তাঁরা ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ ছোট ছোট রাসায়নিক দ্রব্য থেকেই দেহে কোলেষ্টেরল তৈরী হয়। পরীক্ষালব্ধ এই ফলাফল অনুসরণ করে ১৯৪২ সালে ব্লক ও রিটেনবার্গ ডয়টেরো-অ্যাসিটেট ইঁদুরকে খাওয়ালেন এবং দেখলেন যে, দেহের কোলেষ্টেরলের বিভিন্ন অংশে ডয়টেরিয়াম পূর্বের চেয়ে আরও বহুল পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, অ্যাসিটেট যৌগ থেকেই কোলেষ্টেরল তৈরী হচ্ছে। এরপর কার্বনের ১৩ ও ১৪ অণুভার সম্বলিত আইসোটোপ দিয়ে বিভিন্নভাবে তৈরী অ্যাসিটেট যৌগ নিয়ে ব্লক পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ইঁদুরের যকৃতের অংশসমূহ ঐ সকল অ্যাসিটেটের বিভিন্ন দ্রবণে রাখলেন। তারপর যে সকল বিভিন্ন প্রকার কোলেষ্টেরল তৈরী হলো, সেগুলিকে পৃথক করে রাসায়নিকভাবে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে কোলেষ্টেরলের বিভিন্ন কার্বন অণুর প্রকৃতি ও উৎস নির্ণয় করেন। এই কাজ যেমন জটিল তেমনই মূল্যবান। এথেকে যে সকল তথ্য জানা গেল, তা হলো—

১। কোলেষ্টেরলের প্রত্যেকটি কার্বন অণু অ্যাসিটেট থেকে তৈরী হয়েছে

২। অ্যাসিটেটে যে দুইটি কার্বন অণু আছে, সে দুইটিই কোলেস্টেরল গঠনে ব্যয়িত হয়েছে।

পরবর্তী কাজ থেকে ব্লক দেখালেন যে, পাঁচটি কার্বন অণুবিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগও কোলেস্টেরল গঠনের পথিমধ্যবর্তী একটি যৌগ। তিনি দেখালেন যে, স্কোয়ালীন নামক আরও একটি যৌগ মধ্যবর্তী যৌগ হিসেবে তৈরী হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করবার ফলে দেখা গেল যে, স্কোয়ালীন থেকে ল্যানোস্টেরল নামক অন্য একটি যৌগ তৈরী হয়, যা পরে কোলেস্টেরলে রূপান্তরিত হয়। যে সকল এন্‌জাইম এই সকল রূপান্তরণে অংশগ্রহণ করে, ডাঃ ব্লক সে সকল এন্‌জাইম প্রদর্শন করে তাদের সাহায্যে উল্লিখিত রূপান্তরণ প্রমাণিত করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেহে অ্যাসিটেট থেকে কোলেস্টেরল উৎপাদন নিম্নক্রমে অনুষ্ঠিত হয় :—

অ্যাসিটেট → (আইসোপ্রিনোয়েড যৌগ) → স্কোয়ালীন → ল্যানোস্টেরল → কোলেস্টেরল।

তদুপরি ডাঃ ব্লক পরীক্ষার সাহায্যে একথাও প্রমাণ করেন যে, কোলেস্টেরল থেকে পিত্তরসের ফোলিক অ্যাসিড ও স্ত্রী যৌন-হর্মোন প্রেগ্নানে-ডায়োল তৈরী হয়। তিনি আরও নির্দেশ করলেন যে, বৃহৎ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং হিমোগ্লোবিনের হিমো নামক জটিল অংশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সরল অ্যাসিটেট যৌগ থেকেই তৈরী হয়।

কোলেস্টেরলের গবেষণায় ডাঃ ব্লকের অবদান প্রাণ-রসায়নে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

সঞ্চয়ন

জাতীয় পরিকল্পনায় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভূমিকা

ডাঃ এস. কে রায়চৌধুরী এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সুপরিকল্পিতভাবে দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে পঁচিশ বছরব্যাপী পরিকল্পনা (১৯৫১ সাল হইতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত) গৃহীত হয়। এই ২৫ বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচী আবার পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত। যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মত উন্নত দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির আনুপাতিক হার খনিজ উৎপাদন বৃদ্ধির হারেরই সমান। ১৯৫১ সালে তৈল ব্যতীত ১০৫ কোটি টাকার খনিজ দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৭৬ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। খনিজ সম্পদের সন্ধান করা এবং খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য সমীক্ষা চালানই ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রধান কাজ। তাহা ছাড়া আমাদের বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্পগুলির বাঁধ ও জলাধারের স্থানগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং শিল্প, কৃষি ও গৃহকার্যে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইবার দায়িত্বও এই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দপ্তরকে পালন করিতে হয়। কাজেই বলা যায়, এই দপ্তরের কাজ জাতীয় পরিকল্পনার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দপ্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়াছে।

আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কনের সাহায্যে

জানা যায় যে, উড়িষ্যার ঢেনকানল, কিয়োনঝোর, ময়ূরভঞ্জ ও কালাহান্দি এলাকার অনেক অজ্ঞাত স্থানে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ, গ্র্যানিট ও লৌহ আকরের পিণ্ড জমা আছে।

পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বারজোড়ায় নূতন কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলের নূতন মানচিত্রাঙ্কন ও ভূতাত্ত্বিক তথ্যের নূতন ব্যাখ্যান করিয়া জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলে যথাক্রমে ১৩২০ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ১২১৯ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা জমা আছে।

করণপুরা কয়লাখনি অঞ্চলের পুণর্সমীক্ষায় নূতন কয়লা-স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। খননের দ্বারা নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে যে, কচ্ছের ভূগর্ভে অনেক লিগনাইট জমা আছে। অনুমান করা যায় যে, এখানে ১ কোটি ১২ লক্ষ টন লিগনাইট জমা রহিয়াছে। পান্না ও হীরার খনির ভূতাত্ত্বিক মান অনুসন্ধান চালান হয় এবং এখানে আলট্রাবেসিক পাইপের (হীরাযুক্ত পাথর) সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজস্থানের আলোয়ার জেলার দরিয়ায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া তামার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরে ভারতীয় খনি সংস্থা জানিতে পারিয়াছেন যে, এখানে ৫০ লক্ষ টন তাম্র-খনিজ জমা আছে। তাহা ছাড়া জাওয়ারের সীসা-দস্তার খনির বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক মান-চিত্রাঙ্কনের ফলে এক কোটি টনেরও বেশী খনিজ সঞ্চিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিহারের আজমোরে পরীক্ষামূলকভাবে পাইরাইট খনিজ উত্তোলন করা হয়। প্রথমেই ৫০,৮০০ টনের সন্ধান পাওয়া যায় এবং অনুমান করা যায় যে, সেখানে জমার পরিমাণ আরও অনেক বেশী।

মধ্যপ্রদেশে ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কনের কাজ চালাইয়া প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ আকর-পিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে আনুমানিক ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ আকরের পিণ্ড জমা আছে। তাহার মধ্যে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন রপ্তানীযোগ্য। সিংভূম, কিওনঝোর ও বোনাই অঞ্চলে সমীক্ষা চালাইয়া প্রায় ২ কোটি টন জমার সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ আকর-পিণ্ডে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত আছে।

ক্যাম্বে অঞ্চলেও সমীক্ষা চালাইয়া সঞ্চিত তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন সেখানে কূপ খনন করিয়া সফল হন। মধ্যপ্রদেশে চৌম্বক পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালাইয়াও ম্যাঙ্গানিজ আকর-পিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। সমীক্ষার ফলে আরও জানা যায় যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক পরিমাণ লৌহের আকর-পিণ্ড জমা আছে। এই দেশে ঐ আকর-পিণ্ডের জমার পরিমাণ আনুমানিক ২১,৩৩ কোটি লক্ষ টন। পাঞ্জাবের জ্বালামুখী ও রাজস্থানের জয়সলমীরের তৈলাঞ্চলের বিস্তারিত মানচিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কনের কাজে বিমান হইতে আলোকচিত্র গ্রহণের সাহায্য লওয়া হয়। সমীক্ষার জন্য ব্যাপকহারে মানচিত্রাঙ্কন করা হয়। তাহা ছাড়া এই সময়ে খনিতে ভূগর্ভের মানচিত্রাঙ্কনের কাজ চালান হয়। ১৯৫৩ সালেই ভারতে সর্বপ্রথম ভূ-রাসায়নিক অনুসন্ধানের কাজ সুরু হয়। এই পদ্ধতিতে আকর-পিণ্ডের অস্তিত্ব জানা যায়।

বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ-কার্যে এবং নদী-উপত্যকা প্রকল্পের জন্য ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ইঞ্জিনীয়ারিং, ভূতত্ত্ব ও ভূগর্ভস্থ জল বিভাগ বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেন। বাঁধ নির্মাণের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁহারা প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। বিভিন্ন প্রকল্পে এই দপ্তরের ভূতত্ত্ববিদ্‌ ও ইঞ্জিনীয়ারগণ দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়া কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় কিছু রদ-বদলও করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের

কথামত বাঁধের আকার ও আয়তন কম-বেশী করিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে এই দপ্তরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হয়।

ভারত-মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচী (নং ১২) অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে জল-সন্ধান বিভাগটি গঠিত হয়। এই কর্মসূচী অনুযায়ী কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, পশ্চিম রাজস্থান, গুজরাট, নর্মদা, তাপ্তী ও পূর্ব উপত্যকায় এবং উপকূলীয় উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজে সমীক্ষা চালান হয়। ভূ-পদার্থ বিভাগের সহযোগিতায় এই বিভাগ ভূগর্ভস্থ জলের উৎস সন্ধান করে।

নেইভেলির লিগনাইট খনি অঞ্চলের জলের অবস্থান পরীক্ষার ব্যাপারেও এই বিভাগ কাজ করে। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত ঐ খনিতে কাজ সুরু করা অসম্ভব হইত।

এই পরিকল্পনার শেসাশেষি দেশের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানের জন্য তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন গঠিত হয়। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দপ্তরে কমিশনের কর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সময় কয়লাখনি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কাজ সুরু করা হয়। তালচির, করণপুরা, সিংগারেনী, ডালটনগঞ্জ, পেঁচ-কামহান, ঝিলিমিলি, রাণীগঞ্জ, সিঙ্গরৌলী, রামগড়, কালাকোট, জঙ্গলগলি ও ধরনগিরি কয়লাখনি এলাকায় ব্যাপক হারে মানচিত্রাঙ্কনের কাজ চলে।

এই সময় সিঙ্গরৌলী কয়লাখনি অঞ্চলে ২১-২১ মিটার পুরু কয়লা-স্তর, রায়গড় অঞ্চলে ২২.৫ মিটার এবং ৩·৯১ মিটার কয়লা-স্তর আবিষ্কৃত হয়। ডিসেরগড় অঞ্চলেও দামোদর নদের দক্ষিণে কয়লা-স্তরের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কুলটির কারখানার কাছে লায়কডিহি অঞ্চলেও ৬·১ মিটার কয়লা-স্তর আবিষ্কৃত হয়। ঝরিয়া অঞ্চলে গভীর ড্রিলিংয়ের সাহায্যে বরাকর কয়লার স্তরের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। করণপুরায় এন. সি. ডি সি-র নূতন খনি স্থাপনের জন্য ড্রিলিং করা হয়। অণ্ডাল পর্যন্ত রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের সম্প্রসারণের সুযোগ আছে বলিয়া জানা যায়। গারো পাহাড়ে কয়লা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে কয়লা ও লিগনাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। করণপুরা, ধরনগিরি, ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বারজোরা, রায়গড়, জঙ্গলগলি ও কালাকোট কংলা খনি অঞ্চলে মোট ১৬,২১০ মিটার ড্রিলিং করিয়া ৩০৪ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা জমা আছে বলিয়া জানা যায়।

বিজয়নগরের কাকুলায় ম্যাঙ্গানিজ খনি অঞ্চলের বিস্তারিত মানচিত্রাঙ্কন হয়। ইহার ফলে জানা যায় যে, সেখানে পাঁচ লক্ষাধিক টন ম্যাঙ্গানিজ জমা আছে। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর মধ্যপ্রদেশের ঝবুয়া, মহীশূরের উত্তর কানাড়া, গুজরাটের পাঁচ মহলে ৪৩·৪৬ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজবিশিষ্ট প্রায় ২৫ লক্ষ টনেরও বেশী আকরিক ম্যাঙ্গানিজের পিণ্ড জমা আছে বলিয়া হিসাব করা হয়।

কোলার স্বর্ণখনিতে ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। খনি-গর্ভেরও মানচিত্র তৈয়ারী করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের রামগিরি স্বর্ণখনিতে ব্যাপক মানচিত্রাঙ্কন ও অনুসন্ধান চালান হয়। এই খনিটির উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতীয় খনি সংস্থা এখনও সেখানে ট্রেঞ্চিং, ড্রিলিং প্রভৃতি পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালাইতেছেন। গদগ স্বর্ণখনির মানচিত্রাঙ্কনের কাজও সম্পূর্ণ করা হয়। এখানে সোনা খুব অল্প আছে বলিয়া অনুমান করা যায় এই খনির সদ্ব্যবহারের পূর্বে আরও অনুসন্ধান চালাইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উইনাদ স্বর্ণখনিতেও প্রাথমিক পরীক্ষা চালান হয়। পূর্বে সমীক্ষার সময় এখানে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় নাই বলিয়া অনুমান হয়। এখানে এখনও কাজ চলিতেছে।

মহীশূরের সুগ্‌গিহাল্লি ও মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি অঞ্চলে ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুই স্থানে যথাক্রমে ১১৪,৮০০ টন ও ৭২,১০০ টন ক্রোমাইট জমা আছে বলিয়া আশা করা যায়।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের উধমপুর জেলায় লৌহ খনিজ-পিণ্ডের সন্ধানের জন্য ব্যাপক মানচিত্রাঙ্কনের কাজ চালান হয়। বাস্তারের পাঁচটি স্থানে ৭৭ কোটি টন লৌহ খনিজ-পিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজস্থানের নাগাড়র অঞ্চলে ৬,০১৬.৪ মিটার ড্রিলিং চালাইয়া ৯৫ কোটি টন জিপ্‌সামের সন্ধান মিলিয়াছে। রামবন-দোবা-আসর অঞ্চলে সাড়ে চার কোটি টনেরও বেশী জিপ্‌সাম জমা আছে বলিয়া জানা যায়। এই সকল সমীক্ষার ফলে আমাদের জমা জিপ্‌সামের পরিমাণ আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সার কারখানার জন্য প্রচুর জিপ্‌সামের প্রয়োজন হয়।

গুজরাটের হালার জেলায় খুব উচ্চ শ্রেণীর বক্সাইটের (৬৬ লক্ষ টন) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কচ্ছেও প্রায় ৬০ লক্ষ টন বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অনন্তনাগ, বরমুলা ও শ্রীনগর জেলায় সিমেন্ট প্রস্তুতে ব্যবহারের উপযোগী চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শাহাবাদ ও হাজারিবাগ জেলা এবং মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের কয়েক স্থানেই প্রচুর পরিমাণ চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম বর্ণহীন করিবার উপযুক্ত দুই কোটি টনেরও বেশী বেণ্টোনাইটের সন্ধান পাওয়া যায় রাজস্থানের বারমার অঞ্চলে।

ক্ষেত্রীতে সিংঘানা-বাবাই খনি অঞ্চল ছাড়াও সাতকুই-পনোটা-উদনীপুর অঞ্চলে আর একটি খনিজ স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিগুণ্ডলায় ব্যাপক মানচিত্রাঙ্কন ও অনুসন্ধান চালাইয়া তামা ছাড়াও সীসার সন্ধান পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক বিচারে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উত্তর প্রদেশের চামোলি অঞ্চলে মানচিত্রাঙ্কন এবং অনুসন্ধানের ফলে সর্বপ্রথম এখানে অ্যান্টিমনির পিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলে অনুসন্ধান চালাইয়া সেখানে তৈল সঞ্চিত থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করা হয়। মধ্যপ্রদেশের পান্নায় ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে হীরকবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ত্রিবান্দ্রমের নিকট গ্র্যাফাইটের অবস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়—ইহার মধ্যে কিছু খুবই উচ্চ শ্রেণীর।

সারা ভারতে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ সদ্ব্যবহার কর্মসূচী অনুযায়ী ১৩টি রাজ্যে ৩০০টি পরীক্ষামূলক কূপ খনন করা হইয়াছে। ইহার ১৩৯টি কূপে জল উত্তোলন সুরু করা হয়। তাছাড়া সড়ক নির্মাণ, ভিত্তি স্থাপন, টানেল ও বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণের ব্যাপারে ১৬২টি প্রকল্পকে এই সংস্থা পরামর্শ দেয়। এই দপ্তর ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ এবং পূর্ব বোকারো কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রেণী অনুসারে সঞ্চিত কয়লার হিসাব করে।

ড্রিলিংয়ের সাহায্যে রাণীগঞ্জের ফতেপুর ডোম অঞ্চলে অতিরিক্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধাতুশিল্পে ব্যবহার্য কয়লার অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। বোকারো ইস্পাত কারখানার কাছাকাছি আনুমানিক আরও ৩ কোটি টন কোক কয়লার ২২ মিটার প্রশস্ত স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম বোকারোয় কিছু কোকিং ও সেমি-কোকিং কয়লার অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ২০ কোটি টন কয়লা আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে ৫৫ কোটি টন কয়লা উপরে পাওয়া যাইবে। কাহ্নর উপত্যকায় সেমি-কোকিং কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সিঙ্গরোলী কয়লাখনি অঞ্চলের ঝিনগুড়ায় ১৩৮ মিটার প্রশস্ত স্তরে ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। দক্ষিণ করণপুরার জয়নগর ব্লকে ৪৮ মিটার পুরু আরগাডা

কয়লা স্তরের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা জমা আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। সুদামদি কয়লাখনিতে পোল্যাণ্ডের সহযোগিতায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ষ্ট্রাকচারাল ড্রিলিং চালান হয়।

তাহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঝরিয়া, রামগড়, পশ্চিম বোকারো, রাণীগঞ্জ, তালচের, সিঙ্গরোলী, পেচ কাঁহার, দক্ষিণ করণপুরা, উত্তর করণপুরা অঞ্চলে মোট ৫৮,০০০ মিটার ড্রিলিং চালাইয়া ৬৫০ কোটি টন জমা কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। এই অঞ্চল ছাড়াও সোহাগপুর, ঝিলিমিলি ও বিশ্রামপুর কয়লাখনি অঞ্চলে আরও অনুসন্ধান চালান হইতেছে। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়াছে যে, তালচের, ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ বিশ্রামপুর ও বোকারোয় করাহরবাড়ী অঞ্চলেও কয়লা আছে। গিরিডিতে দেশের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক কয়লা আছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

সিংভূমের তাম্রখনি অঞ্চলের ব্যোম-সিদ্ধেশ্বরে ৫৩৭৫ মিটার ড্রিলিং করিয়া ৩০০ মিটারের মধ্যে ১-২ শতাংশ তামাবিশিষ্ট প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টন তামার খনিজপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ব্লকটিতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইবার জন্য ভারতীয় খনি সংস্থাকে ভার দেওয়া হইয়াছে নিকটবর্তী তামাপাহাড়ে সম্ভাবনাপূর্ণ খনিজ অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে ১ শতাংশ তামাবিশিষ্ট ১৫ লক্ষ টনেরও বেশী তামার খনিজপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

মাদ্রাজের মামন্দুর পার্বত্য এলাকায় ড্রিলিংয়ের সাহায্যে তামা, দস্তা ও সীসার খনির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে আনুমানিক ৮ লক্ষ টন খনিজ জমা আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। অগ্নিগুণ্ডলায় তামা ও সীসার খনি অঞ্চলে ড্রিলিংয়ের কাজ দ্রুত চালান হইতেছে। মহীশূরের হুট্টি স্বর্ণখনি ও অন্যান্য প্রাচীন পরিত্যক্ত খনিগুলিতে ব্যাপক ষ্ট্রাকচারাল ম্যাপিংয়ের কাজ চালান হয়। কোলার খনিতেও ব্যাপক পরীক্ষা চালান হয় এবং ভাল ফল পাওয়া যায়। সেখানে এবং ওয়াইনাদ স্বর্ণখনিতে এখন আরও অনুসন্ধান চালান হইতেছে।

বক্সাইট—অমরকণ্টক ও ফুটকাপাহাড়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে হাঙ্গেরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় যে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপন করা হইবে, তাহাতে ইহা ব্যবহার করা হইবে। ফুটকাপাহাড়ে ৪৫ শতাংশ অ্যালুমিনাবিশিষ্ট ৩০ লক্ষ টন এবং ৫০ শতাংশ অ্যালুমিনাবিশিষ্ট ১৯ লক্ষ টন বক্সাইট আছে এবং অমরকণ্টকে ৪৫ শতাংশ অ্যালুমিনাবিশিষ্ট ২৫ লক্ষ টনেরও বেশী বক্সাইট জমা আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। মহীশূরের বেলগাঁও জেলায় ৫০ শতাংশের বেশী অ্যালুমিনাবিশিষ্ট ৩ লক্ষ টনের বেশী বক্সাইট জমা আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ক্রোমাইট—কটক, ঢেনকানল অঞ্চলে কম পক্ষে ১০ লক্ষ টন ধাতুশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী ও ২০ লক্ষ টন নিম্নশ্রেণীর ক্রোমাইট জমা আছে। গুরজং এলাকায় উচ্চ শ্রেণীর গুঁড়া ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে সঞ্চিত খনিজের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টন। সিংভূমের জোজাহাতু অঞ্চলে এখনও ক্রোমাইটের সন্ধান চালান হইতেছে।

ফ্লুরাইট—গুজরাটের আমবাদোনগড় অঞ্চলে ড্রিলিং, ট্রেঞ্চিং, পিটিং প্রভৃতি পদ্ধতিতে ফ্লুরোস্পার প্রস্তরের ২৬টি পকেটের সন্ধান মিলিয়াছে। এখানে ৩৫ মিটার নীচে প্রায় ১ কোটি টন জমা আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। মধ্যপ্রদেশের চণ্ডি-ডুংরী অঞ্চলেও ফ্লুরোস্পার প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

চুনাপাথর (ফ্লাক্স)—ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দেশের ইস্পাত কারখানাগুলি হইতে

৪৮০ কিলোমিটারের মধ্যে ফ্লাক্স গ্রেডের চুনাপাথর সন্ধান করিতেছেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, ব্লাষ্ট ফার্নেসের জন্য চুনাপাথর ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট থাকিলেও এস. এন. এস. শ্রেণীর চুনাপাথর শুধু মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার সাতরা অঞ্চলেই পাওয়া যাইবে। ড্রিলিং-এর সাহায্যে এই অঞ্চলের বেলা ব্লকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন এস্. এম্. এস. শ্রেণীর এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন বি. এফ. শ্রেণীর চুনাপাথরের সন্ধান মিলিয়াছে। বাঁকুইয়াম ব্লকে চার কোটি টন করিয়া উভয় শ্রেণীর চুনাপাথরেরই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আচিবাল এলাকা এবং কাশ্মীরের অনন্তনাগে ঐ চুনাপাথরের সন্ধান মিলিয়াছে। ঐ সব অঞ্চলে সমীক্ষা দপ্তর আরও অনুসন্ধানের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

ফ্লাক্স গ্রেডের ডোলোমাইট—বাস্তারের মাচকোট তিরিয়া অঞ্চলে সাড়ে তিন কোটি টন এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর ৬০০ কোটি টন ডোলোমাইটের সন্ধান মিলিয়াছে। জলপাইগুড়িতে ফ্লাক্সগ্রেড ডোলোমাইট কোথায় কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

মৃত্তিকা—পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার অনেকগুলি স্থানে শ্বেত মৃত্তিকার জন্য অনুসন্ধান চালান হয় এবং বরঝোরে ৬ মিটার পুরু ৮০০০ বর্গমিটার স্থানে উহার সন্ধান পাওয়া যায়। ধাম পাহাড়ী ও মকতুমনগর প্রভৃতি অঞ্চলে শ্বেত মৃত্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলাতেও ৫০ লক্ষ টন কয়লার সন্ধান মিলিয়াছে।

জিপ্সাম—রাজস্থানের মাইবলী, পূর্ব পালনু, লাখোরা ও বিশ্রসার অঞ্চলে ট্রেঞ্চিং ও পিটিং পদ্ধতিতে জিপ্সামের অনুসন্ধান করিয়া ২৪৮ হাজার টন সার শ্রেণীর জিপ্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অ্যাজবেস্টস—অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিভেনডালায় ড্রিলিং চালাইয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অ্যাজবেস্টসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। লৌহ-খনিজপিণ্ড · আকরিক লৌহপিণ্ডের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য উড়িষ্যার মালংটোলি ব্লকে অনুন্ধান চালান হয় এবং প্রচুর পরিমাণ উচ্চ শ্রেণীর লৌহ· খনিজপিণ্ডের অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গোয়ায় ৫৮ শতাংশ লৌহবিশিষ্ট ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন আকরিক লৌহপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সমীক্ষার ইঞ্জিনীয়ারিং, ভূতত্ত্ব এবং ভূগর্ভস্থ জল-সম্পদ সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক কাজের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। সম্প্রতি এই দপ্তর সারা দেশের ভূগর্ভস্থ জলস্তর সমীক্ষার দায়িত্ব লইয়াছেন। ইহাতে ভবিষ্যতে সহর ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা রচনার সুবিধা হইবে।

ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা পৃথিবীর এই ধরণের অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সংস্থা। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর এই সমীক্ষার অনুসন্ধান সচেতনায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। তথাপি ইহার করণীয় অনেকখানি বাকী রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রচেষ্টার উপরই দেশের সার্থক শিল্পায়ন অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা—সেকালে ও একালে

জি. এন. দত্ত এই সম্পর্কে লিখেছেন—এদেশে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরম্ভ হইলেও ১৮৫১ সালের পূর্বে এজন্যে কোন উপযুক্ত সংগঠন ছিল না। ভারতের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের তাগিদে অনেক উৎসাহী বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এদেশে এসেছিলেন। কিন্তু

তৎকালীন ভারতের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং সংক্রামক ব্যাধির জন্যে বৃটিশ কোম্পানীগুলি তাঁদের জীবনবীমা করতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই বিজ্ঞানীদের উৎসাহ কমে আসে। তখনকার অবস্থা এমনই ছিল যে, বহু ভূতত্ত্ববিদ্ অনুসন্ধানের কাজ করতে করতেই মারা যান। ১৮৫৮ সালে এইচ. জিওগাগ মাদ্রাজে সদিগর্মী হয়ে মারা যান। ১৮৫৮ সালে ব্রহ্মদেশে গ্রীম্‌স্‌ও কলকাতায় চাইল্ড কলেরা রোগে মারা যান। ১৮৬১ সালে শোন উপত্যকায় থাইসিস রোগে আর. ট্রেফের মৃত্যু হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় থিওবোল্ড খুব অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে যান। বিশাখাপত্তনমে কাজ করবার সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ফেডার এবং দার্জিলিঙে আমাশয়ে ভুগে জোন্স মারা যান। ১৯২৫ সালে ওয়াকার ব্রহ্মদেশে কাজ করবার সময় বুনো মোষের আক্রমণে প্রাণ হারান। হুইগেস বাঘের আঁচড়ে অন্ধ হয়ে যান। এই হুইগেস্‌ই কমপক্ষে শতখানেক বাঘ ও শ'পাঁচেক ভালুক শিকার করেছিলেন। এ ছাড়াও ভারতে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে যাঁরা জীবন বিসর্জন দেন, তাঁদের মধ্যে চার্লস ওল্ডহ্যাম, অর্মস্‌বি ও ষ্টোলিক্স্কার নাম উল্লেখযোগ্য। ষ্টোলিক্স্কা মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লাডাকে কাজ করবার সময় মারা যান। লেতে আজও তাঁর সমাধিটি রয়েছে।

তাছাড়া তখনকার দিনে পরিবহন ব্যবস্থা এমন উন্নত ছিল না। কলকাতা থেকে হাতীর পিঠে পাঞ্জাব যেতে তিন মাস সময় লাগতো। বিজ্ঞানীদের প্রতি সন্ধ্যায় নতুন নতুন স্থানে তাঁবু খাটিয়ে অনেক রকম অসুবিধার মধ্যে রাত্রিবাস করতে হতো। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসী বিজ্ঞানীরা সারা ভারত ঘুরে কাজ করে বেড়াতেন। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তার নজির পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মেলে না। তাঁরা ভারতের বাইরে গিয়েও কাজ করতেন। তখন ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তান ভারতভূমিরই অংশ ছিল। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার অফিসারেরাই ঐ দুই দেশের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার বুনিয়াদ রচনা করে এসেছিলেন। তাঁরা সিংহল, সর্বক (মালয়েশিয়া) এবং তিব্বতেও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা আফগানিস্তান, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলিতেও বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ অনুসন্ধানের কাজ করেন। নেপাল এবং তুর্কীস্তানেও তাঁরা অনেক কাজ করেছিলেন।

ভূতাত্ত্বিক কাজ ছাড়াও এই সব বিজ্ঞানীরা আরও অনেক রকম মৌলিক গবেষণার কাজ করতেন। ওল্ডহ্যাম বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বয়লারের গঠন সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছিলেন। থিওবোল্ড ভারতবাসীর প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কাজ করেছিলেন। মেড্‌লিকট ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কনের অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তাছাড়া লেঃ জেঃ ম্যাকমেহন ও ওল্ডহাম যথাক্রমে ভারতীয় মূর্তি, প্রস্তর এবং বালি পাথরের ভাস্কর্য সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছিলেন। কোগিন ব্রাউন নেফার আবর অধিবাসীদের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর "এ মেময়ের" শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশক। পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এ. এম হীরনের নাম করা যায়। ১৯২১ এবং পরে ১৯২৪ সালে তিনি বৃটিশ এভারেষ্ট অভিযাত্রীদলের সদস্য ছিলেন ; বর্তমানে নীলগিরি পাহাড়ে জীবনযাপন করছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা প্রায় প্রত্যেক বছরই পর্বতারোহণ অভিযানের আয়োজন করেন। ১৯৫১ সালে জি. এন. দত্ত বৃটিশ এভারেষ্ট অভিযানে এবং ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে সি. পি. ভোরা ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রীদলের সদস্য ছিলেন। এই দপ্তরের বি. এন. রায়না ১৯.৬ সালে জাপানী মানাসাল অভিযানে...

অংশগ্রহণ করেন। ওই বছরেই ভি. কে. রায়না পাশের কাঙরির শীর্ষে উঠেছিলেন।

দেশের কয়লা সম্পদের সন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে এই দপ্তরটি গঠিত হয়েছিল। তখন মাত্র কয়েকজন কর্মী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ১১৩ বছরের মধ্যেই দপ্তরটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংগঠনে পরিণত হয়। আজ এই সমীক্ষায় কারিগরী কর্মীর সংখ্যা হাজারেরও বেশী এবং মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার।

কলকাতায় এই দপ্তরের সদর দপ্তর। কিন্তু প্রতিটি রাজ্যেই এই সমীক্ষার শাখা দপ্তর আছে। স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানই ঐগুলির প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া এই দপ্তরের তিনটি আঞ্চলিক—পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ—সদর দপ্তর আছে।

এই দপ্তরের প্রধান কাজ হলো নিয়মিতভাবে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কন, খনিজ সম্পদের সন্ধান, জমার পরিমাণ হিসাব করা এবং ভূগর্ভস্থ জলের হিসাব, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ভূতত্ত্বের কাজ করা। এই সমীক্ষার পরীক্ষাগারে পাথর ও খনিজ দ্রব্য পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজন হলে এক্স-রে ও স্পেকট্রোস্কোপের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দ্রুত বিশ্লেষণের জন্যে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আকর পিণ্ড পরীক্ষা করা হয়। কয়লা ও গ্যাস বিশ্লেষণের ব্যবস্থাও এখানে আছে।

জল ও খনিজ দ্রব্যের সার্থক সন্ধানের জন্যে এবং ভূগর্ভস্থ জল, ভূতত্ত্ব ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে সহায়তার জন্যে সমীক্ষায় বহু ভূ-পদার্থবিদ্ নিয়োগ করা হয়েছে। অনেক নক্সা এখানে তৈরী করা হয়েছে।

কয়লা অনুসন্ধান ও ড্রিলিং এই দপ্তরের দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। মানচিত্র, আলোকচিত্র, ডায়াগ্রাম প্রকাশনার জন্যে পৃথক পৃথক বিভাগ আছে। পৃথিবীর আরও তিন শত ভূতাত্ত্বিক সংস্থার সঙ্গে এই বিভাগটি পুস্তকাদি বিনিময় করে। এই বিভাগের গ্রন্থাগারে ২ লক্ষাধিক মূল্যবান গ্রন্থ আছে। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম ভূতাত্ত্বিক গ্রন্থাগার বলিয়া অনুমান করা যায়। এখানে মাইক্রোফিল্ম ও রিপ্রোগ্রাফিক যন্ত্রপাতিও আছে।

কিছুকাল যাবৎ এই দপ্তর দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূতাত্ত্বিক সচেতনতা সঞ্চারের জন্যে ইংরেজী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তিকাদি প্রকাশ করছেন। ঐ সব পুস্তিকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খনিজ-সম্পদের কথা সহজভাবে বিবৃত করা হয়েছে। তাছাড়া দপ্তরের বিজ্ঞানীরা শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন।

আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশন এদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতে এই ধরণের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন এই প্রথম। এশিয়ায় কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন। এই সম্মেলনের আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারতের সমীক্ষার। শতাধিক দেশের প্রায় ১৫০০ ভূতত্ত্ববিদ্, ভূ-পদার্থবিদ্ ও ভূ-রসায়নবিদ্ এই অধিবেশনে যোগদান করছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা এই ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন।

জীবনের সম্ভাবনায় মঙ্গল গ্রহ

অশেষকুমার দাস

মঙ্গল গ্রহটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে চিরকালই একটা আকর্ষণীয় ভূমিকা নিয়েছে। মহাকাশের কালো পটভূমিকায় গাঢ় কমলা রঙের এই গ্রহটি অন্য যে কোন গ্রহের চেয়ে রহস্যময়। তার প্রধান কারণ, মঙ্গলের প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অনেক কিছুই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে অথচ তাদের বেশীর ভাগেরই কোন সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তুষারকিরীট, চিরবিখ্যাত খাল আর রহস্যময় মারিয়া—এই তিনটিই প্রধানতঃ মঙ্গলের সব রহস্যের কারণ। এদের নিয়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানী থেকে জীব-বিজ্ঞানী—সবারই যত গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা। বিজ্ঞানের দপ্তরে এরাই জমা করতে বাধ্য করেছে পরস্পর-বিরোধী নানা মতবাদ। আর এই সব রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই পুরনো প্রশ্ন—মঙ্গল কি জীবন ধারণের উপযোগী? এই প্রশ্নের সমাধানের পথে আমরা কতদূর এগিয়েছি, তাই সংক্ষেপে আমরা জানতে চেষ্টা করবো এখানে।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল গ্রহটি বেশ ছোট ফলে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হওয়ায় মঙ্গল বহুকাল আগেই তার বায়ুমণ্ডলের অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে।

বিজ্ঞানীদের তুলনামূলক হিসেব হলো এই রকম :—(1959)

	পৃথিবী		মঙ্গল	
গ্যাস	পুরুত্ব m. STP	আয়তন %	পুরুত্ব m. STP	আয়তন %
N_2	6246	78·08	1650	93·0
O_2	1676	20·94	<2	<0·1
A	74	0·94	70(?)	4·0(?)
CO_2	2·2	0·03	40*	2·2*

*approx.

এই হিসেব থেকেই বোঝা যায়, মঙ্গলে অক্সিজেন কত কম! জীবনের সম্ভাবনাও তাই কম হয়ে পড়েছে। অবশ্য জল একটু আছে, যার সন্ধান দিচ্ছে তুষারকিরীট। কিন্তু সেটা কি জলের তুষার? সেটাও একটি প্রশ্ন।

অনেককাল থেকেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে আসছেন, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের তুষারকিরীটের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু পার্থিব ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন। সেটি হলো, মঙ্গলের তুষার আদৌ গলে না—সরাসরি সেটা বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কারণ গ্রীষ্মকালে বিষুব অঞ্চলে যেখানে তাপমাত্রা দিনে 80°F ওঠে, সেখানেই রাতে তা হয় -40°F সুতরাং উত্তাপে তুষার গলে জল হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই—রাতে সেই জল আবার জমে যাবে। মঙ্গলের এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। কিন্তু এজন্যে জীব-বিজ্ঞানীরা হয়েছেন আরও নিরাশ। প্রকৃতির এই রকম অবস্থায় জীবনের অস্তিত্ব কি সম্ভব? সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লাওয়েল আর একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিলেন। সেটি হলো, মেরু প্রদেশের জল গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পাম্পের সাহায্য নিয়ে সেই জল খালের মধ্য দিয়ে সারা মঙ্গলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাতে যাতে জল জমে না যায়, তার যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা করা হয়েছে; অর্থাৎ মঙ্গলে বাস করছে অতি উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান জীব! লাওয়েল আমৃত্যু বিশ্বাস করে গেছেন, বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বে। কেন না, গ্রহের খালগুলি খুবই জ্যামিতিক, বড়ই সুসংবদ্ধ—যেন নিখুঁত পরিকল্পনায় সারা গ্রহটিকে খালের জালে আটকে ফেলা হয়েছে। লাওয়েল মঙ্গলের বহু ম্যাপ এঁকেছেন। তাতে লাওয়েলের চোখে নিরবচ্ছিন্ন ও সমান্তরাল হয়ে ধরা পড়েছিল।

মঙ্গলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য হলো মারিয়া অর্থাৎ সাগর। 1559 খৃষ্টাব্দে হয়গেন্স মঙ্গলের গায়ে কিছু অংশ জুড়ে কালো ছাপের সন্ধান পান। এরই নাম দেওয়া হয়েছিল মারিয়া। পরবর্তী কালে মারিয়া 'কৃষ্ণক্ষেত্র' নামে সুপরিচিত
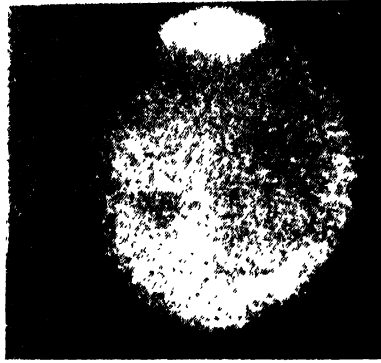
তুষারমুকুট আয়তনে ছোট হবার সঙ্গে সঙ্গে
মঙ্গলে কৃষ্ণক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটছে।

ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু খালের অস্তিত্ব। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের খালের কৃত্রিমতায় মোটেই আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁদের মতে, মঙ্গলের পিঠের ফাটলগুলিই দৃষ্টিবিভ্রমের জন্যে হয়েছে। এই কৃষ্ণক্ষেত্রের রহস্যের সমাধান হয় নি আজও। অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে মত পোষণ করেন, তা হলো—মঙ্গলের কৃষ্ণক্ষেত্রের কারণ উদ্ভিদের উপস্থিতি। এই সিদ্ধান্তের প্রথম কারণ—

ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন মঙ্গলের তুষারমুকুট আয়তনে হ্রাস পেতে থাকে, তখন কৃষ্ণক্ষেত্রের রং সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাতে থাকে। মঙ্গলে বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মরিয়াগুলির রং ঘন হতে থাকে। হাল্‌কা নীলাভ সবুজ থেকে গ্রীষ্মের সময় তারা গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে। মারিয়াগুলির রং পরিবর্তনের কারণ যে উদ্ভিদের উপস্থিতি—এটাই ছিল লাওয়েল ও তাঁর সমর্থকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। বর্ণালী-বিশ্লেষণের সাহায্যে জানা গেছে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল অতিবেগুনী রশ্মি প্রতিরোধ করে। বায়ুমণ্ডলের বিশেষ কোন অবস্থায় মঙ্গল এই প্রতিরোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। 1941 তার কালো বা গাঢ় সবুজ রং ফিরে পায়। একমাত্র সজীবের পক্ষেই ধূলার মধ্য থেকে এমন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সম্ভব। তাছাড়া মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনার সমর্থনে ডাঃ উইলিয়াম সিণ্টনের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবলোহিত রশ্মিতে মারিয়ার বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সিণ্টন এমন কতকগুলি শোষণ-রেখার সন্ধান পেয়েছেন, যা কার্বনের কয়েকটি যৌগের বেলাতেই দেখা যায়। সিণ্টনের পরীক্ষা মঙ্গলের মারিয়াতে মিথাইল ও অ্যালডিহাইড গোষ্ঠীর অণুগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। মারিয়ার বর্ণালী-বিশ্লেষণে সিণ্টন 3.4μ-তে ($\mu=10^{-6}$m) একটি শোষণ-ব্যাণ্ডের
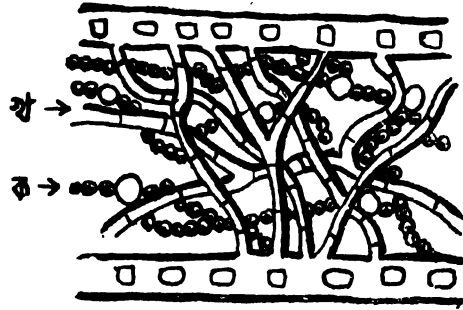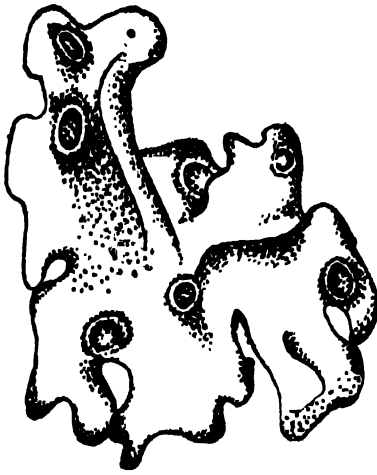
বামদিকে একটি লাইকেনকে সাধারণভাবে দেখানো হয়েছে। ডানদিকে তারই একটি আণুবীক্ষণিক ব্যবচ্ছেদ। ক—পিগমিণ্টেড অ্যালগার শেকল। খ—ফাঙ্গাসের ফিলামেণ্ট, এখানে অক্সিজেন জমা হয়ে থাকতে পারে।

এই রকম একটি অবস্থায় হেস্ লক্ষ্য করেন যে, মঙ্গলে কৃষ্ণক্ষেত্রের সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে গেছে। এথেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি মঙ্গলের পিঠে আঘাত করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রতিহত করে ফেলেছিল। কখনো বা মঙ্গলের ধূলিঝড়ের সময় মারিয়া হল্‌দে ধূলায় ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু কিছুকাল পরেই মারিয়া সন্ধান পান। পার্থিব উদ্ভিদের বেলায়ও তাই পাওয়া যায়। কেন না, জৈব অণুগুলির 3.4μ-তে শোষণ-ব্যাণ্ড থাকবেই—যা হলো কার্বন-হাইড্রোজেন বণ্ড রেজোনান্সের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। কিন্তু 3.4μ-এর সঙ্গে 3.6μ-তেও একটি জোরালো শোষণ-ব্যাণ্ডের অবস্থিতি কিছুটা আশ্চর্যজনক। পার্থিব উদ্ভিদে এটা অনুপস্থিত। সিণ্টনের মতে, প্রচুর

পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট জমা হয়ে থাকে বলে মঙ্গলের উদ্ভিদে এই বিশেষ শোষণ-ব্যাণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

মঙ্গলে সজীব পদার্থ থাকলে তারা কেমন হবে? তাদের পৃথিবীর সজীবের মতই জলের দ্রবণে, কার্বনের কাঠামোতে অক্সিজেন থেকে শক্তি নিয়ে গঠিত হতে হবে—এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্বাস-কার্য চালাবার মত একটুও স্বাধীন অক্সিজেন নেই মঙ্গলে। যেটুকু জল তুষার হয়ে আছে, তা সরাসরি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। অতএব বাতাস থেকেই তাদের শোষণ করে নিতে হয় জলীয় বাষ্প। আর গ্রীষ্মের রাতেও রয়েছে প্রচণ্ড শৈত্য। মঙ্গলের এই বিশেষ প্রকৃতিকে যারা মানিয়ে চলতে পারবে, তারা পৃথিবীর সজীবের চেয়ে ধরণে অনেকটা আলাদা—এটা ভাবাই স্বাভাবিক। ডলফাসের মতে, মঙ্গলের সজীবেরা পৃথিবীর লাইকেনের (Lichen) মত হতে পারে। ডলফাসের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, মারিয়া থেকে যে ধরণের পোলারাইজেশন-লেখ (Polarization curve) পাওয়া যায়, সেই ধরণের লেখই পাওয়া যায় পরীক্ষাগারে Pulvarized লাইমোনাইট ($HFeO_2$)-এর উপর লাইকেন ছড়িয়ে দিয়ে। মঙ্গলে লোহা আর অক্সিজেনের যৌগ বর্তমান, এরূপ মনে করা যেতে পারে, যে জন্যে গ্রহটিকে গাঢ় কমলা রঙের মনে হয়ে থাকে। তাছাড়া হিসেব করে দেখা গেছে, মঙ্গলে জলের যা পরিমাণ, তাতে সজীব পদার্থ থাকলে তার আকার লাইকেনের মতই হবে।

লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ যেন অ্যাল্‌গা ও ফাঙ্গাসের একটি সমাহার। এরা উভয়েই উভয়ের উপর জীবনধারণের জন্যে নির্ভরশীল। ফাঙ্গাসের ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ নেই, কাজেই খাবারের জন্যে একে নির্ভর করতে হয় ক্লোরোফিল-যুক্ত অ্যাল্‌গার উপর। আর প্রতিদানে ফাঙ্গাস একে বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করে রাখে। ক্ষেত্র-বিশেষে ফাঙ্গাসের মধ্যে অক্সিজেনও জমা হয়ে থাকতে পারে। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতির দরুণ লাইকেন বেঁচে থাকবার জন্যে প্রবল যুদ্ধ করে যেতে পারে। কাজেই এরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু। এই জন্যেই মঙ্গলে লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদের কথা চিন্তা করা হয়েছিল।

অ্যাল্‌গার ক্লোরোফিল থাকায় মনে হয় মঙ্গলের লাইকেনগুলি নিজেদের উপর একটা বিশেষ ধরণের রঙের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে নিয়েছে, যাতে তারা প্রচণ্ড শীত ও ক্ষতিকর রশ্মির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে। এই রঙের আচ্ছাদন তাদের বিশেষ কোন তরঙ্গ শোষণ করতেও সাহায্য করতে পারে। মনে হয় গ্রীষ্মকালে এই রঙের আচ্ছাদনটি সবুজ হয়ে ওঠে। সুতরাং পৃথিবীর সবুজ গাছপালা থেকে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর প্রতিফলন আমরা পাই, মারিয়া থেকেও সেই রকম আলোর প্রতিফলন পাওয়া যাবে—এটা স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে জাগতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, তা হয় না। ক্লোরোফিল 6700Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে নেয় আর 7000Å থেকে সমস্ত অবলোহিত রশ্মিমালাকে প্রতিফলিত করে; অথচ মারিয়ার বর্ণালী-বিশ্লেষণে বিশেষ কোন শোষণ-রেখাই পাওয়া গেল না।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী তিখভ্‌ এবং তাঁর সহকর্মীরা এর একটা নির্ভরযোগ্য কারণ দেখিয়েছেন। তিখভ্‌ ধরে নিয়েছেন যে, মঙ্গলের উদ্ভিদ মূলতঃ পার্থিব উদ্ভিদের মতই এবং পার্থিব উদ্ভিদের মতই তারা প্রকৃতির সঙ্গে বোঝা-পড়া করে টিকে আছে—যার ফলে মঙ্গলের প্রচণ্ড শৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সেখানকার উদ্ভিদ লাল এবং অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে নেবার বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেছে। অবলোহিত রশ্মির সঙ্গেই তাপ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে আসে। তিখভ্‌ এবং তাঁর সহকর্মীরা পূর্ব সোভিয়েট ইউনিয়নের আর্কটিক অঞ্চলের উদ্ভিদ পরীক্ষা করে দেখেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের

উদ্ভিদের চেয়ে সেখানকার উদ্ভিদের আলোক-প্রতিফলন ক্ষমতা অনেক কম। এই ব্যাপারই মারিয়াতে ঘটে থাকে—এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নয়। মারিয়ার চেয়ে আর্কটিক অঞ্চলের অবস্থা এমন কিছু উন্নত নয়।

মঙ্গলে উদ্ভিদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকলেও উন্নত জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা যে নেই, তা অনায়াসেই বলা যায়। যদি জীবাণুর সন্ধান মিলে, তবে তাকে হতে হবে পৃথিবীর আলোক-সংশ্লেষণক্ষম জীবাণুর মত—যারা বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ না করে সেটা জল তৈরীর কাজে লাগায়। মঙ্গলের দারুণ শৈত্য জীবাণুর বেঁচে থাকবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা নয়। তরল বায়ুতে জীবাণু রেখে তাদের বাঁচিয়ে তোলা গেছে সহজেই।

মঙ্গলে জীবাণু থাকতে পারে কি না, সে সম্পর্কে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন বৃটেনের প্যাট্রিক মুর এবং ফ্রান্সিস জ্যাকসন। লোহার অক্সাইড এবং সিলিকেটের সঙ্গে জীবাণুর উপযোগী কিছু জৈব পদার্থ মিশিয়ে 'মঙ্গলের মাটি' সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিভিন্ন জীবাণুসহ সেই মাটি সত্তর মিঃ মিঃ (Hg) চাপে নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ একটি পাত্রে রাখা হয়েছিল। দিনের তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়েছিল 20°c, আর রাতে -76°c-এর কাছাকাছি। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, কয়েক জাতের জীবাণু বেশ কয়েক দিন বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের পরীক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে জীবাণুসহ মাটি নিয়ে তাদের Pulvarize করা হয়। তারপর সমমাত্রায় এই মাটি মিশিয়ে
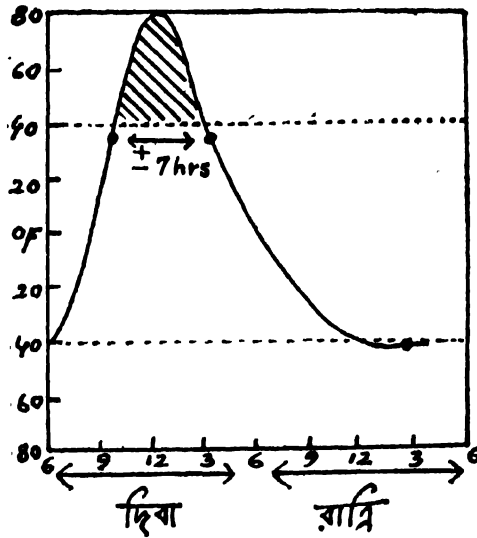
গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের এক দিনের তাপমাত্রার এই রেখাচিত্র থেকে দুটি জিনিষ সহজেই প্রতিভাত হয়। প্রথমতঃ তুষারমুকুট গলে জল হয়ে যাবার উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলের কাল্পনিক উদ্ভিদের বেঁচে থাকবার জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হচ্ছে শীতের সঙ্গে।

তার এক ভাগ সম্পূর্ণ জীবাণুশূন্য করে অপর ভাগের সঙ্গে মেশানো হয়। জল মিশিয়ে এই মাটির আর্দ্রতাকে 1% মাত্রায় এনে অক্সিজেনশূন্য একটি পাত্রে রাখা হয়। পাত্রের ভিতর মঙ্গল গ্রহের কৃত্রিম বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিন মাস পর পরীক্ষা করে দেখা গেল, পাত্রস্থিত জীবাণুগুলি কৃত্রিম মঙ্গলের প্রকৃতিকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা—তারা বংশবৃদ্ধি করতেও সক্ষম হয়েছিল। এসব পরীক্ষার ফলে মনে হয়, নিম্নজাতের উদ্ভিদ ও বিশেষ কোন ধরণের জীবাণু মঙ্গলে হয়তো বা বসবাস করছে! অবশ্য এমনো কেউ কেউ আছেন, যাঁরা মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। মঙ্গলে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাও নাকি কারো কারো চোখে পড়েছে! মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ—ফোবো ও ডিমো। তারা আকারে খুবই ছোট এবং ফাঁপা—এই জন্যে অনেকে মনে করেন, সেগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ। যদিও বেশীর ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানী তাঁদের বিপক্ষে, তবু তাঁদের ধারণা যে একেবারেই ভুল, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। চার বছর আগে রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডেভিডভ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন যে, মঙ্গলে জলের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় কম তো নয়ই বরং বেশী হতে পারে। তাঁর মতে, সারা বিষুব অঞ্চল দু-শ' মিটার গভীর বরফে আচ্ছন্ন এবং মেরু প্রদেশে সেই বরফের গভীরতা দাঁড়িয়েছে দু-হাজার মিটারে। তবে কেন মঙ্গলকে আমরা একটি বরফের গোলার মত দেখি না? ডেভিডভ বলেন, সম্ভবতঃ বিগত কয়েক লক্ষ বছরে দারুণ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে মঙ্গলের সারা পৃষ্ঠদেশ বালুকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ডেভিডভের ধারণা যদি সত্য হয়, তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মঙ্গলের খালের কৃত্রিমতার সম্ভাবনাকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে।

মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনার যে দিকটা আমরা দেখলাম, সেটা এক রকম জীবনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই। যাঁরা মঙ্গলে জীবনের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁরা বলেন মঙ্গলের তুষার-কিরীট N_2O_2-এর সাহায্যে গঠিত হতে পারে। মঙ্গলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ যে বেশী, তা আমরা আগেই জেনেছি। বর্ণালী-বিশ্লেষণে যে ধরণের রেখার সন্ধান পাওয়া যায়, তা নাইট্রোজেনের অক্সাইড থেকেও পাওয়া যেতে পারে। ধূলায় ঢাকা পড়লে লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে—মঙ্গলে যেমন দেখা যায়—তত তাড়াতাড়ি মাথা চাগিয়ে ওঠা অসম্ভব। মারিয়ার যে সমস্যা আজও রীতিমত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তা হলো, যখন মঙ্গলের তুষার-কিরীট দক্ষিণ দিকে গলতে থাকে, তখন কেন উত্তর দিকে মারিয়ার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে? মঙ্গল গ্রহটি আকারে ডাম্বেলের মত—এমন মনে করবার কারণ নেই নিশ্চয়ই। অবশ্য ডেভিডভের অভিমত অনুসারে তুষার-কিরীটে জলের পরিমাণ যদি দু-হাজার মিটার গভীর বরফের সমান হয়, তবে এর একটা সম্ভাব্য কারণ দর্শানো যেতে পারে।

এই সব সমস্যা থাকলেও মঙ্গলের নিকটতম প্রতিবেশী পৃথিবীর মানুষ নিশ্চয়ই আশা করতে পারে—একদিন সেখানে সজীবের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা সে যত অনুন্নত পর্যায়ের জীবনই হোক না কেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

গর্দভের পূর্বপুরুষ

ককেশাস অঞ্চলে আজ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে এমন এক ধরণের প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল, যাকে দেখে আজকের গর্দভের কথা মনে পড়ে। তবে সেই প্রাণীটির পায়ে খুরের বদলে ছিল থাবা। জর্জিয়ার প্রত্নজীব-বিজ্ঞানীদের একটি অনুসন্ধানী দল এই অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ৎবিলিসির কাছে পরবর্তী তৃতীয় যুগের (আপার টারশিয়ারি পিরিয়ড বা হিন্দু পুরাণে কথিত বরাহ যুগ) ভূস্তরে এই স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। এই বিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রাণী ছিল 'ক্যালিকোথেরিস' শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের অন্যতম। এই প্রাণী ছিল আর সব দিক থেকে বর্তমান কালের গর্দভের অনুরূপ, শুধু তার পায়ের থাবা খুরে পরিণত হতে আরও কয়েক হাজার বছর লেগেছে। খ্যাতনামা জর্জিয়ান প্রত্নজীব-বিজ্ঞানী লিওনিড গাবনিয়া বলেন, এই শ্রেণীর শিলীভূত কঙ্কাল এই পর্যন্ত যতগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন।

হাঁপানী রোগের অভিনব ঔষধ

আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টাস্থিত এগোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের শারীর ও ভেষজ-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আরও বুহাইজ হাঁপানী রোগীদের শ্বাসকষ্ট লাঘব করবার জন্যে বাঁশী বাজাতে বা গান করতে বলেছেন। গান কথা বলা ও বাঁশী বাজাবার জন্যে দমের প্রয়োজন হয়। ঐ সময়ে ফুসফুস ও বুকে শ্বাস নিয়ে তা নিয়মিত ভাবে ধীরে ধীরে ছাড়তে হয়; অর্থাৎ নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা তার যতটুকু আছে, ততটুকু প্রয়োগ করতে হয়। ফলে রোগীর নিঃশ্বাস গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সাধারণভাবে ঐ সকল রোগী বিশ্রামের সময়ে ঐ শক্তির মাত্র দশভাগ এবং কঠিন পরিশ্রমের কাজে মাত্র পঞ্চাশভাগ প্রয়োগ করে থাকে।

এই জন্যেই তিনি বলেছেন যে, যারা শ্বাসনালীর হাঁপানী রোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অন্যান্য ব্যায়াম যাদের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে, তারা সকলেই সঙ্গীত চর্চা ও বাঁশী বাজানোর দ্বারা উপকৃত হবে।

ইলেকট্রিক ষ্টেথোস্কোপ

আমেরিকায় এক ধরণের অভিনব ইলেকট্রনিক ষ্টেথোস্কোপ উদ্ভাবিত হয়েছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান ফার্ণেণ্ডোস্থিত ইণ্টারন্যাশন্যাল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কর্পোরেশনের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এর কার্যকারিতা ও গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখছেন।

এই যন্ত্রটির সাহায্যে কেবলমাত্র মানবদেহের নয়, মোটরগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের যান্ত্রিক গোলযোগও নিরূপণ করা যাবে। তাছাড়া মহাকাশযাত্রীদের মহাশূন্য ভ্রমণের ফলে দেহে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাও এর সাহায্যে জানা যাবে।

এই যন্ত্রটি মানবদেহের ব্যাপারে তার হৃদ্‌স্পন্দন, নাড়ীর স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর মোটরগাড়ীর ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে তার আওয়াজের প্রতি। মানবদেহে ও মোটরগাড়ীতে কোন গোলযোগ ঘটলে এই যন্ত্রে তা ধরা পড়ে এবং সঙ্কেতধ্বনি হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মোটর ইঞ্জিনীয়ারগণ

এই যন্ত্রের সাহায্যে চট করে ত্রুটি ধরতে পারবেন এবং মোটর শিল্পীদের দ্বারা সহজেই তা সংশোধন করা যাবে।

মানবদেহের স্নায়ু কুকুরের দেহে সংযোজন

লস্ এঞ্জেলেস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ লিওনার্ড মারমার মানুষের একটি কাটা পায়ের নার্ভ বা স্নায়ু একটি কুকুরের ছিন্ন স্নায়ু সংযোজনে প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। ডাঃ মারমার ইতিপূর্বে একটি মানুষের স্নায়ু অন্য মানুষের দেহে সাফল্যের সঙ্গে সংযোজন করেছেন। কিন্তু এক জাতের জীবের স্নায়ু অন্য জাতের জীব দেহে সংযোজন সম্ভব নয় বলেই বিজ্ঞানীরা এতকাল মনে করতেন। তাতে এই নার্ভ অন্য যে দেহে সংযোজন করা হতো, সেখানে দেখা দিত ভীষণ প্রদাহ। স্নায়ুটিকে হিমায়িত করে এবং বিশেষ ধরণের রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে শোধন করে প্রয়োগ করবার পর দেখা গেছে যে, প্রদাহ কম হয়ে থাকে এবং তা মারাত্মক হয় না। বর্তমানে গবাদিপশু এবং বানরের স্নায়ু নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে।

ডাঃ মারমার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, পশু দেহের স্নায়ু মানবদেহে সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে সংযোজন এখনই সম্ভব না হলেও মানবদেহের স্নায়ু কুকুরের দেহে সংযোজন করে এবং বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে এই বিষয়ে পরীক্ষা করে যে শিক্ষা লাভ হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন সম্ভব হতেও পারে। তখন হয়তো মানুষ যখন পশুখাদ্য বা মাংস গ্রহণ করে তখন ঐ সকল পশুর নার্ভসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং এজন্যে একটি নার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাইবেরিয়ার হ্রদে অতিকায় প্রাণী

টাস-এর এক সংবাদে জানা গেছে, সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞানীদের একটি দল সাইবেরিয়ার হায়ইর হ্রদে এক অজ্ঞাতপূর্ব অতিকায় প্রাণী দেখেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের মত দেখতে এই জন্তুটির সুদীর্ঘ চকচকে গলার উপরে মাথাটি খুব ছোট, চামড়ার রং মিশ কালো এবং পিঠের উপর খাড়া পাখ্না রয়েছে।

এই হায়ইর হ্রদটি ইয়াকুটিয়ার এলাকার ভিতরে লাপতেভিথ সমুদ্রের উপকূল থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। এই হ্রদে যে এক অতিকায় হিংস্রদর্শন প্রাণীর বাস, সেকথা এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত এবং এইজন্যে এই হ্রদের কাছে কেউ যায় না। তারা বলে, এই হ্রদে নাকি একটিও মাছ নেই; এমন কি, বুনো হাঁসও এই হ্রদকে এড়িয়ে যায়। লম্বায় প্রায় ৬০০ মিটার আর চওড়ায় প্রায় ৫০০ মিটার এই হ্রদের জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, শীতকালে অন্যান্য হ্রদের জল জমে যাওয়ায় বেশ কিছুটা পরে এই হায়ইর হ্রদের জল জমে। এ অঞ্চলের লোকজন প্রায়ই হ্রদের বুক থেকে ভেসে আসা এক অদ্ভুত গুম গুম আওয়াজ শুনতে পায়, কিন্তু কেউই প্রাণীটিকে ভাল ক'রে দেখেছে বলে মনে হয় না।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভূ-বিজ্ঞানীর দল এই অঞ্চলে এসেছিলেন ভূসম্পদ সংক্রান্ত ও ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে। এই দলের সদস্যেরা দুবার এই অতিকায় প্রাণীটিকে দেখতে পান। প্রথমবার দেখবার সময়ে প্রাণীটি ডাঙায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় বারে প্রাণীটি হ্রদের মাঝামাঝি জায়গায় হঠাৎ জলের উপরে মাথা উঁচিয়ে ওঠে আর লম্বা লেজ জলের বুকে আছড়াতে থাকে। ভূ বিজ্ঞানী দলের সঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যামেরা না থাকায় ছবি তুলে নেওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁরা জন্তুটির যে রেখাচিত্র এঁকে নেন, তা 'কমসোমলস্কাইয়া প্রাভদায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীটির সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে আর একটি বিজ্ঞানীদল শীঘ্রই এখানে যাবেন।

পরলোকে অধ্যাপক হলডেন

উড়িষ্যা সরকারের জীববিদ্যা ও প্রজনন-বিজ্ঞান গবেষণাগারের ডিরেক্টর বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন হলডেন গত ১লা ডিসেম্বর পূর্বাহ্ন ১১টা ৩৬ মিনিটের সময় ভুবনেশ্বরে তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর।

১৯৬২ সালের অগাষ্ট মাস হইতে তিনি ও তাঁহার পত্নী ডাঃ হেলেন স্পারওয়ে এখানে বসবাস করিতেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণার কার্যে ব্যবহার করিবার জন্য অধ্যাপক হলডেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ দিনই অপরাহ্নে তাঁহার শব কাকিনাড়ার রঙ্গরায়া মেডিক্যাল কলেজে গবেষণার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। সেখানে ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হইবে। ক্যান্সার রোগের অস্ত্রোপচারের জন্য ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে তিনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন।

১৯১৭সালে মেপোসোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া হলডেন যখন পুনার হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার ভারতবর্ষের নাগরিক হইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছিল—তবে স্বাধীন ভারতের নাগরিকত্ব লাভই তাঁহার কাম্য ছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৬১ সালে তাঁহার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

'১৮৯২ সালের ৫ই নভেম্বর হলডেন অক্সফোর্ডের চারওয়েলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জন স্কট হলডেন ছিলেন তখনকার একজন বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্।

১৯১১ সালে তিনি ইটন হইতে স্কলারসিপ পাইয়া অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৪ সালে হিউম্যানিটিজে ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেই বৎসরেই সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া ফ্রান্সের রণাঙ্গনে চলিয়া যান। তিনি ফ্রান্স ও ইরাকে কাজ করেন এবং যুদ্ধে দুইবার আহত হন। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধে আহত হইবার সময় তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন। আহত অবস্থায় তাঁহাকে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয় এবং পুণায় সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং ১৯১৯ সালে তিনি নিউ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁহার অধ্যাপনার সাফল্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার অন্ততঃ ২০ জন ছাত্র পরবর্তীকালে রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৯২২ সালে তিনি কেম্ব্রিজে বায়োকেমিষ্ট্রির সার উইলিয়াম ডুন রীডার নিযুক্ত হন এবং এখানে দশ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি রয়েল ইনষ্টিটিউ-সনে শারীরবিদ্যার ফুলেরিয়ান প্রোফেসররূপেও কাজ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির জেনেটিক্সের প্রোফেসরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (এই পদটি তাঁহার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছিল) এবং ১৯৩৭ সালে তিনি ঐ ইউনিভার্সিটির বায়োমেট্রির প্রোফেসর নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ২০ বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন।

১৯২৪ সালে অধ্যাপক হলডেন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচনের গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রথম সিরিজে অতি গুরুত্বপূর্ণ পেপার প্রকাশ করেন। ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁহার 'দি কজেজ অব

ইভোলিউসন' গ্রন্থে সর্বপ্রথম মানবজাতির পরিব্যক্তির (Mutation) হার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সাইটোক্রোম অক্সিডেজ নামে যে পদার্থটি অঙ্কুরোদ্গত উদ্ভিদ, মথ এবং ইঁদুরের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা অধ্যাপক হলডেনেরই আবিষ্কার। ১৯৫৬ সালে তিনি বৃটেন কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণের ব্যাপারে বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়া ইহাকে 'পোর্ট সৈয়দে গণহত্যা' বলিয়া উল্লেখ করেন এবং মাতৃভূমি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে অধ্যাপক হলডেন ছিলেন মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র 'ডেইলি ওয়ার্কারে'র সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি প্রধান ছিলেন।

১৯৫২ সালে অধ্যাপক হলডেন বিশেষ অতিথি হিসাবে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করেন। ইহার পর ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে কয়েকবার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে আসিয়া ছিলেন।

১৯৫৭ সালে তিনি ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি সহ ভারতে চলিয়া আসেন এবং পরের বৎসর তিনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষক প্রোফেসর হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হইবার ফলে চার বৎসর পরে তিনি উহার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তখন উড়িষ্যা সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভুবনেশ্বরে জেনেটিক্স অ্যাণ্ড বায়োকেমিষ্ট্রির গবেষণাগারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক হলডেন বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ডারুইন ও ডারুইন-ওয়ালেস মেডেল পুরস্কার দানেও সম্মানিত করা হয়। ১৯২৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের অন্ততঃ ছয়টি বিশিষ্ট অ্যাকাডেমির সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার গবেষণা বৃটেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনেক সহায়তা করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের রণকৌশল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বিজ্ঞান ও মানব-কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন।'

অধ্যাপক হলডেন

শ্রীনির্মলকুমার বসু

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় সায়েন্স কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে যে-সকল বিশিষ্ট বিদেশী বৈজ্ঞানিক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, অধ্যাপক হলডেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার খ্যাতি অবশ্য পূর্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম, কিছু কিছু লেখাও পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এইবার তাঁহার ভাষণ শুনিবার প্রথম সুযোগ ঘটিল। সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনকালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের জন্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকে। অধ্যাপক হলডেন যে বক্তৃতা দেন, তাহার মৌলিকত্বে এবং গুরুত্বে আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

জীববিদ্যার গবেষণা লইয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ

করিলেন। বলিলেন, প্রত্যেক দেশের বৈজ্ঞানিক-গণের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। সেই দেশের বা মানব-সমাজের কল্যাণের সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অবহিত থাকিতে হইবে এবং হয়তো গবেষণার ধারা কতকাংশে এই প্রয়োজনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

উদাহরণস্বরূপ তিনি ভারতে গোজাতির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। এখানে গোজাতির সংখ্যা অত্যধিক, অথচ গোরু দুগ্ধ বেশি দেয় না, বলদেরও দেহ ক্ষীণ, তাহার ফলে চাষী যথেষ্ট কাজ পায় না। ভারতের কোনও কোনও জীববিদ্যাবিশারদ অথবা অর্থশাস্ত্রজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি উত্তর পাইয়াছেন যে, গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন করিতে পারিলেই এই সংখ্যাধিক্যের প্রশ্নের সমাধান হইবে।

কিন্তু এরূপ সমাধানকে কিছুতেই বৈজ্ঞানিক সমাধান বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইল, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীজগতের সহিত মানুষের এক নিকট সম্পর্ক স্বীকার করা। এদেশে অপ্রয়োজনে কোনও জীবকে হত্যা করা বিশেষ নিন্দার্হ বলিয়া গণ্য হয়। এমন কি, কয়েকটি ধর্ম সম্প্রদায় কোনও কারণেই জীবহিংসা সমর্থন করেন না। জীব-জগতের প্রতি এই করুণা বা সহানুভূতির ভাব যে ভাল, ইহা অস্বীকার করা উচিত নয়। বহু শতাব্দীর শিক্ষার ফলে এরূপ একটি বিশ্বাস ব্যাপকভাবে বহুজনের দ্বারা অবলম্বিত হয়। অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ বিশ্বাসও সময়কালে অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে। তবু গোবংশের সংখ্যাধিক্যের মত নিতান্ত একটি সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বহু শতাব্দীর চেষ্টায় গঠিত একটি সৎশিক্ষার বিনাশ সাধনের কি প্রয়োজন আছে?

জীববিজ্ঞানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সন্তানদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতে ইতর বিশেষ ঘটানো যায়। মাছের বংশ সম্পর্কে কোন কোন বৈজ্ঞানিক এরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী উপরিউক্ত অনুপাতের নিয়ন্ত্রণ এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অবস্থা বিপর্যয়ে বিকৃত হয় কিনা, সে-বিষয়ে কেহ গবেষণা করেন নাই। যদি ভারত-বর্ষের জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হন তবে শুধু যে জীববিদ্যারই প্রসার হইবে তাহা নহে, ভারতও একটি কঠিন সমস্যা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। গোজাতির মধ্যে যদি স্ত্রীর সংখ্যা কমানো যায়, পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে চার-পাঁচ পুরুষের মধ্যেই গোজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি উত্তম লক্ষণকে অকারণে নষ্ট করিতে হইবে না।

অধ্যাপক হলডেনের এই বক্তৃতা শুনিয়া ভাল লাগিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, মানব সভ্যতার সম্পর্কে তাঁহার যে সচেতনতা প্রকাশ পাইল, তাহা বস্তুতঃ আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে হইল।

দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নিমন্ত্রণে হলডেন ভারতে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। অধ্যাপক মহলানবিশের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নির্মলাদেবী হলডেনের সহিত আমার পরিচয় ঘটাইয়া দেন। এই জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব।

অধ্যাপক হলডেন যখন বরাহনগরে অবস্থান করিতেছেন, তখন ভারতবর্ষে নৃতত্ত্বের গবেষণা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং বর্তমান শতাব্দীতে তাহার রূপান্তর লইয়া নানাবিধ আলোচনার সূত্রপাত হইত। তিনিও তখন যত্নসহকারে

মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করিলে তিনি একদিন বলিলেন যে, বিজ্ঞানে তাঁহার কোনও ডিগ্রি নাই। গণিতশাস্ত্রে অবশ্য আছে, কিন্তু কলেজে লাতিন ও গ্রীক তাঁহার প্রধান পাঠ্য ছিল। পাশে তাঁহার স্ত্রী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন, 'তোমার কি এখনও লাতিন মনে আছে?' উত্তেজিত হইয়া অধ্যাপক হলডেন দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ভার্জিলের লেখা হইতে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অধ্যাপক হলডেনের বিজ্ঞানের পাঠ তাঁহার পিতৃদেবের নিকটে আরম্ভ হয়। শুনিয়াছি, যখন তাঁহার মাত্র নয়-দশ বৎসর বয়স তখন পিতা ফিজিওলজি বিষয়ে স্বীয় গবেষণা-প্রসঙ্গগুলি শিশুপুত্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। বিজ্ঞানের ভিত্তি যে সমীক্ষা ও পরীক্ষা এবং এই জন্য সকল সময়ে যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, এই সকল কথা শিশু হলডেন পিতার গবেষণাগারে অধিকার করিয়াছিলেন। কয়লার খনিতে যে সকল বিষাক্ত গ্যাসের ফলে প্রাণহানি ঘটে, সেই বিষয়ে হলডেনের পিতা স্বীয় দেহের উপর কয়েকটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে হয়তো সেই উত্তরাধিকারের বশে পুত্রও স্বীয় দেহের উপর বহুবিধ বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়া এবং উচ্চ চাপযুক্ত অম্লজানের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করিয়া মানুষের প্রাণ রক্ষার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন।

একদিন এক গবেষণা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইঁদুর বা অন্য কোনও প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করিলেন না কেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—বাহির হইতে তাহাদের শরীরের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া অনুমান করা অপেক্ষা নিজের দেহের উপর পরীক্ষা করিলে কি বেশী সংবাদ পাওয়া যায় না?

একদিন আমরা খাইতে বসিয়াছি, একটি মাছি পাতের কাছে উড়িয়া উড়িয়া জ্বালাতন করিতেছে। অধ্যাপক বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু পাশে মাছি মারার একটি যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই তাহা ব্যবহার করিতেছেন না। কৌতূহলবশে প্রশ্ন করিতে তিনি উত্তর দিলেন—মাছিটিকে মারিতে গেলেই তাহার শরীরের মধ্যে বিচিত্র গঠনের চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, জীবটিকে হত্যা করিবার প্রবৃত্তি আর থাকে না।

বস্তুতঃ অধ্যাপক হলডেনের মন একদিকে যেমন বিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরূহ ভাবনিরপেক্ষ গণিতাশ্রয়ী সত্যসাধনায় ব্যাপৃত থাকিত, অন্যদিকে তেমনই শিল্পীর কোমলতম সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমানভাবে অনুপ্রাণিত হইত। ১৯৬১ সালে যখন অধ্যাপক হলডেন ভারতের নাগরিকত্ব স্বীকার করিলেন, তাহার পূর্ব হইতেই নিরামিষাশী হইয়া গিয়াছিলেন। বরাহনগরে তাঁহার বাড়িতে সম্পূর্ণ দেশী রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে আবার তিনি একা সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করিতেন। এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথচ শরীরের ওজন কয়েক বৎসরের মধ্যে হ্রাস পাইয়াছিল।

বিলাতে অবস্থানকালে, যখন পর্যন্ত তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তখন এক বিচিত্র পত্র আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাঠকগণের নিকটে তাহা প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নভেম্বর ১০, ১৯৫৫ তারিখে তিনি লেখেন:

In the next few months you will be receiving cheques for articles written by myself in the Hindu and elsewhere. They are intended to finance travel by yourself or your

pupils, I must now make excuses for this *yajna.*

1. If the money were paid to me here, over half of it would be paid to the British Government. They would spend it on making atomic bombs, killing people in Kenya and Cyprus and so on. Your Government will take less; and even if you do not approve of the five year plans, it will not kill many people!

2. My country has got enough money out of yours. Some of my ancestors, for example a great grandfather who was at one time captain of an "East Indiaman" (ship) got a lot. I do not suppose I shall lift his soul from *naraka.* But the kind of conduct recommended by Hinduism is sometimes justifiable on other grounds.

3. I think 100 rupees spent by you is likely to lead to greater increase in knowledge of a valuable kind than if it were spent by anyone else in India known to me.

For these reasons I venture to hope you will use any money sent to you to finance your research, and thus help me out of a moral difficulty. My wife and I will, we hope, be in Calcutta in July to September of next year. We are looking forward particularly to meeting you again. I ask you, if it is convenient, not to speak too much about my money which you receive from me. Too many there might ask me for money.

Yours Sincerely,

বলা বাহুল্য, ইহার পর নিয়মিতভাবে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহার লেখা প্রবন্ধের দক্ষিণা আমার নিকট এক স্বতন্ত্র তহবিলে জমা হইতে লাগিল এবং অল্পবয়স্ক কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদের গবেষণাকার্যে সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হইল।

অধ্যাপক হলডেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এক তরুণ নৃতত্ত্ববিদের গবেষণায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহাকে স্থায়ীভাবে স্বীয় গবেষণাগারে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কয়েকজন অখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে অল্প দিনের মধ্যে তিনি নিজের পাশে আকৃষ্ট করিয়া লন। বস্তুতঃ তাঁহার গুণগ্রাহিতার অন্ত ছিল না এবং এই বিষয়ে কর্মীর কৌতূহল, কর্মনিষ্ঠা ও অনুসন্ধানে যোগ্যতা দেখিয়াই তিনি তাহাদিগকে বাছিয়া লইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, পরীক্ষার ফলাফল, প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রভৃতির দ্বারা তিনি কাহারও বিচার করিতেন না।

একবার এক ছাত্র তাঁহার নিকটে গবেষণার কোনও সমস্যার সন্ধানে গিয়াছিলেন। তিনি পত্রপাঠ বলিলেন, যদি তোমার স্বীয় সমীক্ষা হইতে উদ্ভূত কোনও প্রশ্ন না থাকে তবে তোমাকে দিবার মত কোন সমস্যাই আমার ভাণ্ডারে নাই।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধনাই অধ্যাপক হলডেনের চরম লক্ষ্য ছিল। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তাঁহাকে বারংবার বিদেশে বিজ্ঞানের বক্তৃতা বা আলোচনার জন্য যাইতে হইয়াছিল। জাপান, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমন্ত্রণ আসিত। শেষের বার আমেরিকা হইতে

ইংল্যাণ্ড হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে লণ্ডনে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয় যে, তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রোপচারের পরে তিনি হাসপাতালে অবস্থানকালে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া একটি পত্রে লেখেন:

If anyone has to get cancer, I am glad that it is I. It does not distress me appreciably, and is quite interesting.

সেই পত্রের মধ্যেই তিনি স্ত্রী এবং তরুণ সহকর্মীদের কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু নির্দেশ দেন। মৃত্যুর সম্ভাবনা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার মনের মধ্যে বিজ্ঞানীর আদর্শ অত্যল্প মাত্রাতেও শিথিল হয় নাই। মৃত্যুর পরে তাঁহার শরীর লইয়া কি কি পরীক্ষা চলিতে পারে, সে বিষয়েও তিনি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্যান্সার রোগের এক নূতন চিকিৎসার সংবাদ দেওয়ায় তিনি খুশিমনে বলিলেন, যদি তাহার ফলাফল কিছু নাও হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? 'I am willing to be Dr. S's guinea pig'। এই চিকিৎসাই চলিতেছিল এবং রোগের লক্ষণাদির উপশম আরম্ভ হইয়াছিল। আহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ওজনও কয়েক কিলোগ্রাম বর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু বিগত বৎসরে শরীরের যে দুর্বলতা ঘটিয়াছিল, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় নাই।

একদিন খুশিমনে তিনি লাঠি ধরিয়া বাগানে ঘাসের উপরে সামান্য বেড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা ৬ই নভেম্বর তারিখে সংঘটিত হয়। সেদিন আরাম কেদারায় বারান্দায় শায়িত অবস্থায় তিনি সহকর্মীগণের গবেষণার বিষয়ে চর্চা করিতে লাগিলেন। গায়ে রোদ আসিয়া পড়িতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঘরের ভিতরে যাইবেন কি? তিনি নীল আকাশ ও বাগানের সামান্য কয়েকটি গাছপালার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এই খোলা আকাশ আমার বড় ভাল লাগে!' মৃত্যুর সকল আতঙ্ক, বিচ্ছেদের সমস্ত যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তিনি যে প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে মগ্ন ছিলেন, তাহার সৌন্দর্য শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার চিত্তে আনন্দের ডালা ভরিয়া দিয়াছিল।

ক্যান্সার রোগের উপশম হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপকের শরীর পূর্ববৎ দুর্বল হইয়া রহিল। একদিন শুইবার ঘরে খাট হইতে নামিবার সময়ে অকস্মাৎ তিনি পায়ে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যান। পাশে একটি আলমারিতে প্রচণ্ড চোট লাগে এবং মাথা জখম হইয়া যায়। কয়েক দিবস পরে রাত্রে নিদ্রার ঘোরে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলিতে থাকেন এবং সকালের দিকে ক্রমশঃ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন! অবশেষে সেই দিনই ১লা ডিসেম্বর বেলা ১১-৩৬ মিনিটের সময় তাঁহার দেহ নিস্পন্দ ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক হলডেনের নির্দেশ ছিল, শরীরটি যেন যথাসম্ভব শীঘ্র কাঁকিনাড়া মেডিক্যাল কলেজে প্রেরণ করা হয়। শরীরটি ব্যবচ্ছেদ করিয়া সর্বতোভাবে যেন বিজ্ঞানের সেবায় ব্যবহার করা হয়। গাছের শুষ্ক পত্র যেমন খসিয়া পড়ে, তাঁহার শরীরও তেমনভাবেই নিঃশেষিত হইবে। ইহার জন্য তাঁহার মন পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। ধূলার দেহ ধূলায় মিশাইবার পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণের সত্যসন্ধানের চেষ্টায় তাহা যেন প্রযুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার অন্তিম কামনা ছিল।

হয়তো দধিচী মুনির অভিপ্রায় এইরূপই ছিল। ইঁহাদেরই তপস্যার দ্বারা মানবজাতি নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যের এক কোটি হইতে অপর কোটিতে আরোহণ করিতেছে। ইহাদের জয় হউক। জয় হউক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
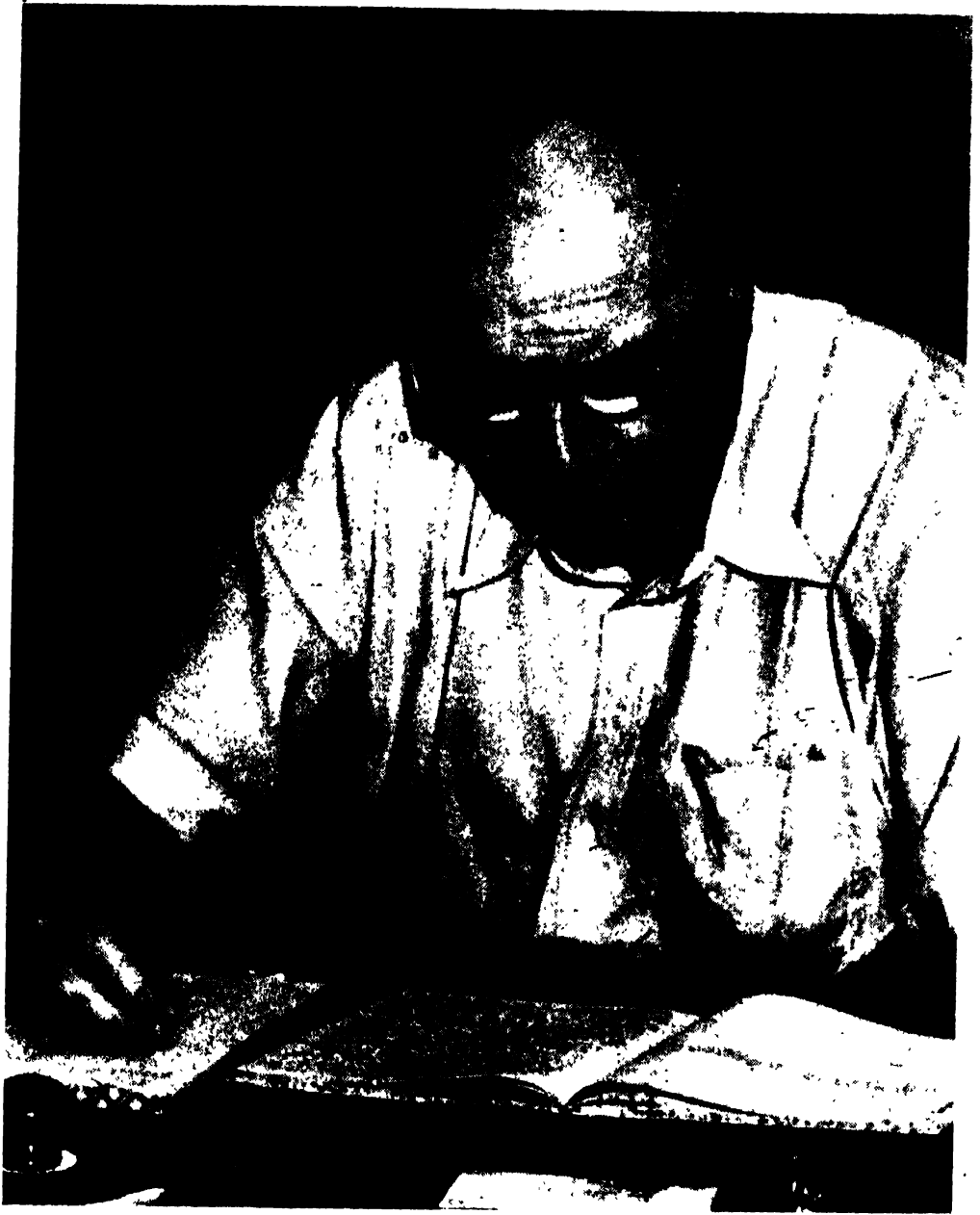
অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন

জন্ম—৫ই নভেম্বর, ১৮৯২ মৃত্যু—১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৪

করে দেখ

ঝুলন্ত চা'ল

তোমরা অনেকেই হয়তো বেদে যাদুকরদের ম্যাজিকের খেলা দেখেছ। এই যাদুকরেরা সময় সময় এমন সব অদ্ভুত খেলা দেখায়, সাধারণ বুদ্ধিতে যার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই রকমের একটা খেলার কথা বলছি। পেট-মোটা, চওড়া মুখওয়ালা একটা গোলাকার পাত্রের কানায় কানায় চা'ল ভর্তি করে যাদুকরের সামনে রাখা হলো।
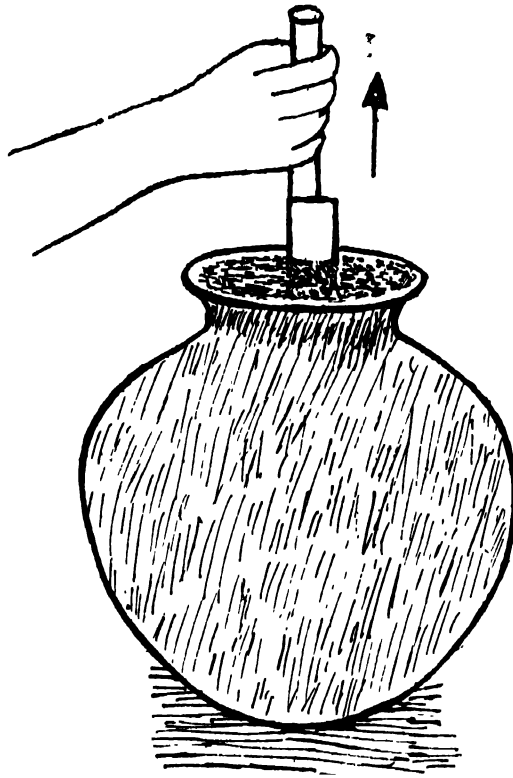
যাদুকর তার ঝোলার ভিতর থেকে বেশ চকচকে একখানা ছোরা বের করে সেটাকে খাড়াভাবে চা'লের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বের করে নিল। কিছুক্ষণ এরকম করবার পর ছোরাটাকে তুলে এনে সবাইকে দেখিয়ে গেল। তারপর—লেড়কালোক এক দফে হাততালি লাগাও—ভানুমতীকা খেল দেখো—বলেই ছোরাটাকে আবার সেই

চা'লের মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরার বাঁটটা ধরে উঁচুতে তুললো। অবাক কাণ্ড—ছোরার সঙ্গে চা'ল ভর্তি পাত্রটাও উঁচুতে ঝুলে রইলো।

কেমন করে এটা সম্ভব হলো? ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে তোমরাও এটা করে দেখতে পার। একটা শক্ত কাচের জার জোগাড় কর। জারের পেটের দিকটা যেন তার মুখের চেয়ে বেশ মোটা অর্থাৎ চওড়া হয়। জারটার কানায় কানায় চা'ল ভর্তি কর এবং বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে বেশ করে বসিয়ে দাও। এবার একখানা ছোরা নিয়ে সেটাকে বেশ একটু জোর দিয়েই সোজাসুজিভাবে চা'লের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার তুলে আন। কিছুক্ষণ ধরে বার বার এরকম করলেই দেখবে—জারের মধ্যে চা'লগুলি যেন শক্তভাবে পরস্পরের গায়ে এঁটে গেছে। তখন ছোরাটাকে আবার বেশ জোরের সঙ্গে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এবার ছোরার বাঁট ধরে উপরে তুললেই দেখবে—ফল, মূল, কাঠ ইত্যাদি নমনীয় শক্ত পদার্থের মধ্যে জোর করে ছোরা ঢুকিয়ে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই চা'লের জারটা ছোরার সঙ্গে আটকে ঝুলে আছে।

—গ—

ভারতের বিজ্ঞান সাধনা

প্রাচীন ভারত পৃথিবীকে শুধু বেদ, বেদান্ত, দর্শন ও উপনিষদের বাণীই শোনায় নি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক নতুন তত্ত্বও জানিয়েছে। বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত অসামান্য উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতের সেই বিজ্ঞান সাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের সবারই জানা দরকার।

প্রথমেই আসা যাক আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কথায়। ভারতীয় আয়ুর্বেদে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সেকালে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের একটি উপাঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আয়ুর্বেদের বিভিন্ন শাখা ছিল। যেমন—শস্ত্র-চিকিৎসা, কায়-চিকিৎসা, শিশুরোগ-চিকিৎসা, শারীরবিদ্যা, বিষ-চিকিৎসা প্রভৃতি। আয়ুর্বেদের সব বিভাগেই বহু গবেষণা হয়েছিল।

সেকালের আত্রেয়, কাশ্যপ, হারীত, অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের জনকরূপে পরিচিত ছিলেন। আর চরক, সুশ্রুত, ধন্বন্তরি প্রভৃতি বৈদ্যগণ এই শাস্ত্রের অনেক সংস্কার সাধন করেছিলেন। আয়ুর্বেদের দৌলতেই সেকালে পশু-চিকিৎসার সূত্রপাত হয়েছিল। সেকালে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপর কয়েকখানি ভাল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা উল্লেখযোগ্য।

চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় স্পষ্টভাবেই লেখা ছিল যে, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে ধমনীগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর সারা শরীর ঘুরে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। গর্ভস্থ শিশুর রক্তপ্রবাহ মায়ের হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়। সেখান থেকে আবার তা গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এসব তত্ত্ব যে ভারতে হাজার হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ তৈরিরও প্রয়োজন হয়েছিল। সেই প্রয়োজনের তাগিদে এদেশে ধীরে ধীরে রসায়নবিদ্যার চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। রসায়নশাস্ত্রে প্রাচীন ভারত খুবই উন্নতি করেছিল। একথা আমরা জানতে পারি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিরচিত 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থখানি পাঠ করে। নাগার্জুন ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ। তাঁর রচিত 'রসরত্নাকর' গ্রন্থখানি প্রাচীন ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

পারদ নিয়ে ভারতীয় রসায়নবিদেরা সেকালে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে, পারদের সঙ্গে গন্ধক যুক্ত হলে পারদের উপকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়। সে পারদ তখন ওষুধ হিসাবে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়।

সেকালের ভারতীয় রসায়নবিদেরা ঊর্ধ্বপাতন, পাতন, ছাঁকন প্রভৃতি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা সোনা, রূপা ও রত্নাদির পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ করতে জানতেন। জানতেন খনিজ আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে। জানতেন সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত করতে। বহুবিধ ধাতুর ব্যবহারও তাঁদের জানা ছিল। রঞ্জন শিল্পে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। দিল্লীর কুতবমিনারের কাছে মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দিরে ব্যবহৃত দীর্ঘ মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। হাজার হাজার বছর আগে বিজ্ঞানের শৈশবকালে ভারতে তৈরি হয়েছিল ঐসব মরিচাহীন ইস্পাত স্তম্ভ। ধাতুশিল্পে প্রাচীন ভারত যে উন্নত ছিল—এসব নিদর্শন তারই সাক্ষ্য দেয়।

ভারতের দার্শনিক কণাদ প্রথম পরমাণুবাদ প্রবর্তন করেন। আবার শব্দ-সঞ্চরণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত আজও বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যার অস্তিত্ব আছে, তার সর্বাঙ্গীন ধ্বংস কখনই সম্ভব নয়—এই উক্তির অস্তিত্ব আছে আমাদেরই সাংখ্যদর্শনে। সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্বই বর্তমান যুগে পদার্থের নিত্যতার সূত্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারত খুবই উন্নত ছিল। হিন্দুদের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের সূচনা হয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে। বৈদিক যুগে দেবতাদের পূজার জন্যে যে সব মন্ত্রপাঠ করা হতো তাতে পৃথিবীর আকার-প্রকার, নক্ষত্রদের গতিবিধি, কালগণনা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ থাকতো। বেলি বলেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব তিন

হাজার বছর 'আগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে জানতেন।

হিন্দুদের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে রচিত হয়। এতে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বিষয় উল্লেখ আছে। বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট বলে গেছেন—পৃথিবী নিজ কক্ষে নিজ মেরুদণ্ডের উপর প্রত্যহ ঘুরছে। আবার সে সূর্যের চারদিকে বছরে একবার করে ঘুরছে, আর তারকাগুলি আছে নিশ্চল হয়ে। পৃথিবীর গতি আছে বলেই নক্ষত্রসমূহের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান আমরা বুঝতে পারি। এইখানেই শেষ নয়। পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে আর্যভট্টের তত্ত্ব বিশ্বের জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও যে অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মনে স্থান পেয়েছিল, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বরাহমিহির বলে গেছেন—পৃথিবী সব বস্তুকেই কেন্দ্রের দিকে অবিরত আকর্ষণ করছে। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—প্রাকৃতিক নিয়মে সব বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হয়।

বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য আবির্ভূত হন ১১৫০ খৃষ্টাব্দে। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অয়নাংশ নির্ণয়, লম্ব নির্ণয়, গ্রহ গণনা প্রভৃতি অনেক দুরূহ বিষয় নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষের দু'খানি অনবদ্য গ্রন্থ হচ্ছে সূর্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি। এই দুই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, সেকালের ভারতীয় পণ্ডিতেরা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিখুঁত সময় এবং চন্দ্র ও সূর্যের পরিবর্তিত আকার নির্ধারণ করতে পারতেন। রাশি বিভাগের দ্বারা কাল গণনার পদ্ধতি হিন্দু জ্যোতির্বিদ্দেরই অবদান।

বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরা প্রায়ই যাগযজ্ঞ করতেন। তাঁদের যজ্ঞবেদী নানা আকৃতির হতো। শোনা যায় যে, এই সব যজ্ঞবেদী রচনা থেকেই জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির উৎপত্তি হয়েছে।

গণিতে প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে মৌলিক অবদান হচ্ছে ১ থেকে ০ পর্যন্ত দশটির চিহ্নের দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা লিখবার পদ্ধতি আবিষ্কার। মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে এই অবদানের কথা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আমাদেরই আর্যভট্ট বৃত্ত, ছায়া, ক্ষেত্রফল, মূলাকর্ষণ, জ্যামিতিক প্রগতি, বীজ-গাণিতিক অভেদ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করে গেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বর্গমূল, ঘনমূল, ত্রৈরাশিক, কুসীদ, সমকোণী ত্রিভুজ, বৃত্তাংশ, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশি বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। গণিতশাস্ত্রে এঁদের অনন্যসাধারণ অবদান সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করে।

মহেঞ্জোদারোতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাথেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারত সুদূর অতীতে বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তখনকার দিনের পয়ঃপ্রণালী, অট্টালিকা, নগর পত্তন প্রভৃতির নিদর্শনগুলি উন্নত ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞান-সাধনায় প্রাচীন ভারতের সেই উন্নত ঐতিহ্য আজও অব্যাহত আছে। গণিতশাস্ত্রে সাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীনিবাস রামানুজন। ভারতেরই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন পদার্থবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। বসু-আইনষ্টাইন পরিসংখ্যানের জন্যে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক গবেষণার জন্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

স্বাধীন ভারতে আজ অসংখ্য বিজ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই সকল কেন্দ্রে বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই আধুনিক পর্যায়ের গবেষণা হচ্ছে। এমন কি, পারমাণবিক শক্তি নিয়েও ভারতে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে ভারত শান্তি ও অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী। তাই সে পারমাণবিক শক্তিকে মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায় না—চায় মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করতে। বিজ্ঞানকে ভারতের মানুষ অভিশাপরূপে দেখতে চায় না—চায় আশীর্বাদরূপে দেখতে।

অমরনাথ রায়

গ্রামোফোন

গানবাজনা আমরা সবাই ভালবাসি। বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক সবার কাছেই এটা সমান প্রিয়। কোন প্রিয় শিল্পীর বিশেষ একটা গান শুনতে হলে সবচাইতে আগে যার প্রয়োজন, সেটা হলো গ্রামোফোন। কিন্তু শুধুমাত্র গানবাজনা নয়, শিক্ষার বাহক হিসেবেও গ্রামোফোন বর্তমানে অপরিহার্য। তাই বহুদূরস্থিত স্থানে ভাষা বা সঙ্গীত শিক্ষা দেবার কাজে গ্রামোফোন ব্যবহৃত হয়।

এ হেন প্রয়োজনীয় যন্ত্র কি করে আবিষ্কৃত হলো, এবার সে কথায় আসা যাক। ১৮৬৪ সালে স্কট ও কনিগ একরকম রেকর্ডিং-এর যন্ত্র বের করেছিলেন। এর নাম ছিল ফোনাটোগ্রাফ। যন্ত্রটা মোটেই সুবিধার ছিল না। আর একে ঠিক গ্রামোফোনের পর্যায়ে ফেলা চলতো না। এর পর উইলিয়াম হেনরী বারলো এর উন্নতি করেন এবং যন্ত্রের নাম রাখেন লোগোগ্রাফ। প্রথম গ্রামোফোন আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব হলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসনের।

১৮৪৮ সালে ওহিরওর মিলানে এডিসনের জন্ম। ছোট বেলায় এডিসন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেল কোম্পানীতে ট্রেন-বয়ের কাজ করতেন। সে সময় তিনি একটা ছোট ছেলেকে চলন্ত ট্রেনের মুখ থেকে বাঁচান। ছেলেটা ছিল ষ্টেশন মাষ্টারের। তাই তিনি তাঁর নেকনজরে পড়ে যান। এঁর দৌলতেই তিনি টেলিগ্রাফের কাজ শেখেন। কয়েক বছর পরে তিনি এক নতুন ধরণের টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বেশ কিছু টাকা পান ও নিউ জার্সিতে একটা নিজস্ব গবেষণাগার গড়ে তোলেন। একদিন তিনি তাঁর এই গবেষণাগারে সঙ্কেত পুনরাবৃত্তির একটা যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, পাশে একটা পিচবোর্ডের চাকৃতি ঘুরছিল। এই সময়ে হঠাৎ একটা কম্পন এসে একটা পিনকে বেশ করে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। ফলে পিনটা ঐ চাকৃতিটার উপব আঁচড় কেটে দেয়। এডিসন এই চাকৃতিটা ঘুরিয়ে দেখেন যে, ওটা থেকে এক বিচিত্র আওয়াজ বের হচ্ছে। এই ছোট্ট বিষয়টি থেকেই গ্রামোফোন তৈরীর কথা তাঁর মাথায় খেলে যায়। তিনি ঠিক করলেন যে, মানুষের গলার স্বরের কম্পন কোন সমতল জিনিষের উপর ফেলবেন। পরে ঘুরিয়ে এই কম্পনগুলি যদি আবার চালানো যায়, তবে মূল স্বরটি শোনা যেতে পারে। এবার এডিসন যন্ত্র তৈরীর কাজে হাত লাগালেন এবং যন্ত্রও তৈরী হলো। পাত্‌লা টিনের পাত্‌ দিয়ে মোড়া একটা সিলিণ্ডার এতে ছিল। হাতল দিয়ে এটা ঘোরানো হতো। যন্ত্রটার মাথায় একটা লম্বা চোঙ লাগানো ছিল। সুচালো একটা কাঠি এতে পিনের কাজ করতো। এডিসন এই অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রটির নাম দিলেন ফোনোগ্রাফ। এরপর ফোনোগ্রাফের পরীক্ষাপর্ব। সেটা ছিল ১৮৭৮ সাল। ফোনোগ্রাফও তৈরী। এডিসন চোঙে মুখ রেখে বাচ্চাদের সেই ছোট ছড়াটা বললেন, "Mery has a little lamb"। এরপর তিনি যন্ত্রের হাতল ঘোরালেন। ফোনোগ্রাফ তার কেরামতি দেখিয়ে ঘ্যানঘ্যানে গলায় বলে উঠলো "Mery has a little lamb"। তাজ্জব ব্যাপার—যন্ত্রও মানুষের মত কথা বলে! এরপর থেকেই ফোনোগ্রাফের জয়জয়কার।

ফোনোগ্রাফের কিন্তু বেশ কয়েকটা দোষ ছিল। এর আওয়াজ ছিল অস্পষ্ট ও বেসুরা। শব্দের ছাপ খুব নরম জিনিষের উপর নেওয়া হতো বলে কিছুদিন বাদে নষ্ট হয়ে যেত। তখনও পর্যন্ত গানের কোন রেকর্ড হয় নি। ফেরীওয়ালাদের হাঁকডাক, বিচিত্র আওয়াজ—এসব রেকর্ড করে নিয়ে বাজানো হতো।

এডিসনের ফোনোগ্রাফের সব দোষ শুধরে নিয়েছিলেন এমিল বার্লিনার। তাঁর তৈরী যন্ত্রেরই নাম গ্রামোফোন। এখনকার মত সমতল গোল চাকৃতির আকারের রেকর্ড তাঁরই আবিষ্কার। বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে বা হাতল ঘুরিয়ে এই রেকর্ড ঘোরানো হতো। এবার রেকর্ডিং-এর কথা। রেকর্ড করবার সময় প্রথমে শক্ত মোমের উপর শব্দের কম্পনের ছাপ নেওয়া হয়। এরপর ধাতব চাকৃতির উপর এই কম্পনযুক্ত মোমের ইলেকট্রোপ্লেট নেওয়া হতো। আগে থেকে তৈরী

রেকর্ডে এই ইলেট্রোপ্লেট থেকে ছাপ তুলে নিয়ে রেকর্ড তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করা হতো। আমরা রেকর্ডের গায়ে যে দাগগুলি দেখি, সেগুলি হচ্ছে শব্দের কম্পনের ছাপ। সাধারণতঃ প্রতি মিলিমিটারে এই ধরণের চারটি দাগ রেকর্ডের গায়ে থাকে। মোমের সঙ্গে অন্য কয়েক রকম জিনিষ মিশিয়ে রেকর্ড তৈরী করা হতো। এই ধরণের রেকর্ড বেশ শক্ত ছিল। আর এর উপর নেওয়া ছাপ সহজে নষ্ট হতো না। বার্লিনারের তৈরী গ্রামোফোনে আজকালের মত সরু ছোট পিন দিয়ে রেকর্ড বাজাবার ব্যবস্থা ছিল। এর সাহায্যে স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে মূল স্বর শোনা যেত।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, সে সময়ে রেডিও সেটের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাই গ্রামোফোন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে লাগলো। যন্ত্রটাও বেশ সুন্দর ছিল, কষ্ট করে দম দিয়ে একবার রেকর্ড বসালেই হলো—তারপরই গান শুরু হতো। এই সময়ে বড় বড় মার্কিন শিল্পীদের গানের রেকর্ড করে নেওয়া হতে লাগলো। এঁদের মধ্যে লুই হোমার, আর্ণষ্টাইন, কারুসো, নেলি মেলবা প্রভৃতি ছিলেন। এই সব শিল্পীদের রেকর্ড আমেরিকা ছাড়িয়ে ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। লণ্ডনের বৃটিশ যাদুঘর ও প্যারিসের গ্র্যাণ্ড অপেরায় নানা শিল্পীর বহু রেকর্ড সযত্নে রক্ষিত আছে। এরপর ইলেকট্রন টিউবের আবিষ্কার গ্রামোফোনের উন্নতিতে যুগান্তর আনয়ন করে।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

প্রাণী-জগতের বিচিত্র কথা

প্রাণীদের অর্থাৎ পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গ, মাছ, সরীসৃপ প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদের জানা আছে। এদের মধ্যে আবার কতকগুলি প্রাণী আমাদের এতই পরিচিত যে, তাদের সম্বন্ধে কোন অদ্ভুত কথা শুনলে তা সহজে আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। যাই হোক, এখন কয়েকটি প্রাণীর বিচিত্র আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি। তাদের এই বিচিত্র স্বভাব সহজাত, অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন করে আয়ত্ত করতে হয় না।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কালো রঙের একজাতের সোয়ালো মাছ পাওয়া যায়। এদের ভোজন-ক্ষমতা বড়ই অদ্ভুত। এদের দেহের ওজনের তুলনায় তিনগুণ বেশী ওজনের খাদ্য উদরস্থ করতে পারে। শুধু খাওয়া নয়—এরা রীতিমত সবটুকু খাদ্য হজমও করতে পারে। এদের পাকস্থলীটি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে পারে। সে জন্যে বেশী খাদ্যে এদের কোন অসুবিধা হয় না।

তোমরা সবাই জান—সাপ ব্যাং ধরে খায়। কিন্তু ব্যাং সাপ খায় শুনলে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হবে। অবশ্য সব জাতের ব্যাংই সাপ খায় না। আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে ব্যাঙের সাপ খাওয়ার অদ্ভুত ঘটনার কথা শোনা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতের বুনো ব্যাং ওজনে এক পাউণ্ডের মত হয়। এরা পাঁচ ফুট লম্বা গেছো-সাপ অনায়াসে শিকার করতে পারে। এদের লম্বা জিভটাকে সবেগে উল্টে বের করে সাপের মাথাটা সজোরে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে তার মুখের মধ্যে টেনে আনে। মাথাটা গিলে ফেলবার ফলে সাপটা বেশ কাবু হয়ে পড়ে। মুক্তি পাবার জন্যে কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে সাপটা মারা যায়। ব্যাং তখন সাপের দেহের বাদবাকী অংশটুকু ধীরে ধীরে গিলতে থাকে। এদের ভোজন-ক্রিয়া খুব আস্তে আস্তে চলে। একবার একটা বুনো ব্যাং একটা পাঁচ ফুট লম্বা গেছো-সাপকে দু-দিনে গিলে খেয়েছিল।

এক জাতের বহুরূপী আছে—যাদের জিভটা তাদের শরীরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড় হয়। জেকো-লিজার্ড নামক টিকটিকির জিভটা হয় খুব লম্বা। এই জিভের সাহায্যে এরা সর্বদা তাদের চোখ পরিষ্কার রাখে। ওকাপির জিভও বেশ লম্বা। এই লম্বা জিভের সাহায্যেই ওকাপি গাছের কচি লতাপাতা, ফলমূল জড়িয়ে ধরে টেনে এনে মুখের মধ্যে পুরে দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার পিপীলিকাভুক প্রাণীর জিভটাও বেজায় লম্বা। এরা বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ে-উদরসাৎ করে। লম্বা জিভটা এরা উইঢিপির মধ্যে চালান করে দিয়ে—উইপোকা ধরে খায়। পেঙ্গুইন পাখীর জিভ তার দাঁতের কাজও করে। এদের জিভে শক্ত কতকগুলি কাঁটা আছে। কাজেই এদের শিকার অর্থাৎ মাছ সহজে মুখ থেকে পিছ্‌লে পালিয়ে যেতে পারে না। ফ্লেমিঙ্গোর জিভ ছাঁকনির কাজ করে। এদের জিভও কাঁটাযুক্ত। কর্দমাক্ত জল থেকে ছোট ছোট মাছ প্রভৃতি ছেঁকে নেয়। ফ্লেমিঙ্গো জলসহ শিকারকে মুখে পুরে দেয়। তারপর জিভ দিয়ে ছাঁকনির কাজ করে। এক জাতের শামুকের (Garden snail) জিভ দাঁতের কাজ করে। অবশ্য এদের দাঁতগুলি জিভের মধ্যে সজ্জিত থাকে। এরা দাঁত দিয়ে উখার মত ঘষে ঘষে বাগানের চারা গাছ, লতা-পাতা প্রভৃতি খায়। এদের জিভে ১৩৫টি দাঁতের সারি আছে।

অনেক পাখী জলের উপর থেকে ছোঁ-মেরে শিকার ধরে নেয়। কিন্তু ডুবুরী পাখীরা ডুব দিয়ে জলের তলায় সাঁতার কেটে বেড়ায় শিকারের খোঁজে। ডুবুরী পাখীরা জলের নীচে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। মাঝে মাঝে শ্বাস নেবার জন্যে জলের উপর ভেসে ওঠে। এদের শরীরে তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় জলে এদের ডানা ভিজে যায় না।

দেশান্তরগামী পাখীরা হাজার হাজার মাইল দূরে নির্দিষ্ট স্থানে অনায়াসে উড়ে যায়। সুমেরুর টার্ণ পাখী বছরে প্রায় ২২,০০০ মাইল ভ্রমণ করে বেড়ায়। সময় সময় এরা সুমেরু থেকে কুমেরুতে উড়ে চলে যায়। শীয়ার ওয়াটার (Shear water) নামক সামুদ্রিক পাখীর একটা বাচ্চাকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে ৩০৫০ মাইল দূরবর্তী একটা স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, সাড়ে বারো দিন বাদে বাচ্চা পাখীটি তার নিজের বাসায় ফিরে আসে। একটা আলপাইন-সুইফ্‌ট পাখীকে জার্মেনী থেকে ধরে এনে লিসবনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৬৯ ঘণ্টা বাদে পাখীটি যথাস্থানে ফিরে গিয়েছিল।

স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও তাদের বহু দূরবর্তী বাসস্থান খুঁজে বের করতে পারে। জার্মান সামরিক বাহিনীর একটি ঘোড়াকে রেলে করে পটস্‌ডাম থেকে হিরসবার্গে নিয়ে যাওয়া হয়। দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ১৫৫ মাইল। ঘোড়াটি পাঁচদিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। কুকুরও ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে অনেক দূরে গন্তব্যস্থল চিনে যেতে পারে।

ক্যাঙারুর লাফাবার ক্ষমতা বিস্ময়কর। এরা এক লাফে ৩০ ফুট পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। এক জাতের হরিণ (Gazelle) এক লাফে ৪০ ফুট পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। আফ্রিকার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা জারবোয়া নামক প্রাণীর লাফাবার ক্ষমতা অদ্ভুত। এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটি এক লাফে অনায়াসে ১৫ ফুট অতিক্রম করতে পারে।

উত্তর আমেরিকার একজাতের হরিণ ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। চিতাবাঘের দৌড়াবার ক্ষমতা অসাধারণ। এক ঘণ্টায় চিতাবাঘ ৭০ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। কোন কোন পাখী ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে উড়তে পারে।

গেছো-ব্যাং বাতাসে ভেসে এক গাছ থেকে আর এক গাছে যায়। এদের পায়ের আঙ্গুলগুলি পাত্‌লা পর্দা বা চামড়ায় জোড়া থাকে এবং এর সাহায্যেই এরা অনায়াসে বেশ কিছুদূর বাতাসে ভেসে যেতে পারে। জাভার উড়ুক্কু ব্যাং অনায়াসে বাতাসে ভেসে ৪০ ফুট কি তারও বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এক জাতের উড়ুক্কু টিকটিকির (Droco volans) দেহের দুই দিকে পাত্‌লা পর্দা আছে। এই পাত্‌লা পর্দা প্রসারিত করে উড়ুক্কু টিকটিকি বাতাসে ভেসে এক গাছ থেকে আর এক গাছে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এদের শিকার হচ্ছে নানা জাতের কীট-পতঙ্গ। এদের দেহ লম্বায় প্রায় এক ফুট। প্রজাপতি দেখলে এরা চিলের মত ছোঁ-মেরে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

ধনেশ পাখীর ঠোঁট দেখবার মত। মনে হয় দেহের প্রায় সবটাই জুড়ে আছে তার ঐ বিচিত্র ঠোঁট। তাদের ঠোঁট খুব শক্ত নয়। কারণ বহু ফাঁপা কোষের সমবায়ে

ধনেশ পাখীর ঠোঁট গঠিত হয়েছে। হাতীর শুঁড়ও তার একটি বিচিত্র অঙ্গ—এদের শুঁড়ে আছে প্রায় ৪০,০০০ মাংসপেশী।

অনেক প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। ঈগল পাখী ১০০০ ফুট উচ্চতা থেকেও উড়ন্ত অবস্থায় মাঠের মধ্যে বিচরণকারী খুব ছোট একটা ইঁদুরকেও অনায়াসে দেখতে পায়। পাঁ্যাচা গভীর অন্ধকারের মধ্যেও তার শিকারকে ঠিক দেখতে পায়। এদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। শশকের চোখের এমনই গঠন যে, তাদের পিছনের দৃশ্যও তারা দেখতে পায়। অ্যানাব্লেপ নামক এক জাতের মাছের চোখ খুবই অদ্ভুত। এই চোখের সাহায্যে এরা একই সঙ্গে জলের উপরের এবং ভিতরের দৃশ্য দেখতে পায়। এরা যখন জলের উপরিভাগে সাঁতার কাটে, তখন চোখের অর্ধাংশ থাকে জলের উপরে এবং অর্ধাংশ থাকে জলের মধ্যে।

মাকড়সার শিকার ধরবার কায়দা বেশ মজার। কেউ কেউ জালের মধ্যেই ওৎ পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়। কেউ কেউ আবার জালের বাইরে থাকে; কিন্তু জালের সুতার সঙ্গে তাদের পা যুক্ত থাকে। শিকার জালে পড়লে সুতায় টান পড়ে। তখন দ্রুতবেগে সে শিকারকে আক্রমণ করে। কোন কোন জাতের মাকড়সা ডাকটিকেটের আকৃতির জাল তৈরী করে শিকারের সন্ধান পেলে ছুটে গিয়ে পিছনের পায়ের সাহায্যে জালটা শিকারের গায়ে নিক্ষেপ করে। এবং জালের মধ্যেই ভোজনপর্ব সমাধা করে। কিন্তু ব্রেজিলের এক জাতের শিকারী মাকড়সা শিকারকে ঘাড়ে কামড়ে বাসায় নিয়ে গিয়ে ভোজন করে। জালপাতা মাকড়সার জালে আঠালো চট্‌চটে পদার্থ থাকায় শিকার তাতে আট্‌কে যায়।

ব্লু-হোয়েল নামক তিমি ১১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজন হয় প্রায় ১৪০ টন। বৃহদাকৃতির প্রাণীদের মধ্যে এরা সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। এদের বাচ্চারাও খুব বড় হয়। সদ্যোজাত একটি বাচ্চা-তিমির দৈর্ঘ্য তার মায়ের প্রায় অর্ধেক হয়।

এখানে মাত্র কয়েকটি প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। এছাড়া আরও অনেক প্রাণীর আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীদেবব্রত মণ্ডল

বিবিধ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১-৫২তম অধিবেশন

৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১-৫২তম অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে বিদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীসহ ভারতের সহস্রাধিক বিজ্ঞানী, অধ্যাপক এবং গবেষক যোগদান করিয়াছেন।

এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং সাধারণ সভাপতির ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের) বিজ্ঞান কলেজে এই অধিবেশন হইতেছে। এই উপলক্ষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে।

এই অধিবেশনে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচনার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক পুরস্কৃত প্রথম ভারতীয় শ্রীজগজিৎ সিংকে কলিঙ্গ পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া জাতীয় অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনেকগুলি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হইয়াছে।

১৯১৪ সালে কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন সার আশুতোষ মুখার্জি। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের বৎসরেই কলিকাতায় পুনরায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব কংগ্রেস

রাষ্ট্রপতি ডাঃ এস. রাধাকৃষ্ণন ১৪ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশন উদ্বোধন করেন। ইহার পূর্বে ভারতে এইরূপ বৃহৎ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আর কখনও হয় নাই।

১০০টি দেশের প্রায় ১৫০০ জন ভূতত্ত্ববিদ, ভূ-পদার্থতত্ত্ববিদ, ভূ-রসায়নবিদ এবং খনি-ইঞ্জিনীয়ার ঐ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। অধিবেশনে ১৬টি বিষয়ে ৬৮০টি গবেষণাপত্র লইয়া আলোচনা হয়।

মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে রুশ রকেট

সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা টাস জানাইতেছে যে, রাশিয়া ৩০শে নভেম্বর মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বহু পর্যায়বিশিষ্ট রকেট উৎক্ষেপণ করিয়াছে। রকেটটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'জণ্ড-২'।

টাস আরও বলিয়াছে যে, তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইবার উপযোগী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এই মহাকাশযানে রহিয়াছে।

মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে রাশিয়া এই দ্বিতীয় বার রকেট পাঠাইল। প্রথমটি পাঠাইয়াছিল ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বর। ঐ রকেট প্রেরণের কয়েক মাস পরে ১৯৬৩ সালের ১৬ই মে ঘোষণা করা হয় যে, রকেটের সহিত বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সময় রকেটটি পৃথিবী হইতে ১২ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে ছিল।

৩০শে নভেম্বরের রকেট সম্পর্কে টাস জানাইতেছে যে, শেষ পর্যায়ের রকেটটি পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। তারপর কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে একটি রকেট মঙ্গলগ্রহের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়।

গামা গম

ভারতীয় কৃষিগবেষণা সংস্থা গামা-রশ্মি প্রয়োগ করিয়া কয়েক শ্রেণীর শস্যের চারায় প্রজনন

সংক্রান্ত এমন পরিবর্তন আনিয়াছে যে, সেগুলির ফসল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেগুলি এক নূতন শ্রেণীর শস্যের মর্যাদা পাইতে পারে।

গম, ধান, টোম্যাটো, তামাক ও তুলার ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষাগত চেহারার পরিবর্তন করিয়া ভিন্ন অবস্থা আনয়ন করা হইয়াছে।

কৃষি গবেষণা সংস্থার উদ্ভিদ বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট 'গামা বাগানে' আরও বহু শস্য লইয়া বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।

পারমাণবিক বিকিরণ তরুলতার বংশগত পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। পারমাণবিক শক্তির এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাইয়া ভারতীয় অবস্থার উপযোগী শস্য উদ্ভাবনের চেষ্টা ১৯৫৩ সালে সুরু হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সালে 'গামা বাগান' প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বিজ্ঞানীরা নূতন ধরণের শস্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রথম পরীক্ষা সুরু হয় গম লইয়া—বিজ্ঞানীরা শীষহীন গম হইতে শীষবিশিষ্ট গম সৃষ্টি করেন।

দুই বৎসর পূর্বে অত্যধিক ফলনবিশিষ্ট এই গমের বীজ উত্তর ভারতের চাষীগণকে সরবরাহ করা হয় এবং তখন হইতে এই নূতন ধরণের বীজের চাষ ব্যাপকভাবে সুরু হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর উদ্ভাবন হইতেছে খর্বাকৃতি ধরণের চারা। দুই বৎসরের মধ্যে এই ধানের চারার বীজ চাষীগণকে ব্যাপকভাবে সরবরাহ করা হইবে।

থুম্বা হইতে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ

৬ই ডিসেম্বর ত্রিবান্দ্রমের নিকটস্থ থুম্বা রকেট-ঘাঁটি হইতে একটি জুডি-ডার্ট রকেট ছাড়া হয়। থুম্বা হইতে পূর্বে আরও চারটি অনুরূপ রকেট ছাড়া হইয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বভাগের বায়ু সংক্রান্ত তথ্য আহরণের জন্যই এই রকেট ছাড়া হয়।

ভারতে সর্বাধিক পরিমাণ হর্মোনযুক্ত উদ্ভিদ আবিষ্কার

ভারতের উদ্ভিদতত্ত্ব সমীক্ষা বিশ্বের সর্বাধিক পরিমাণ হার্মোনের সূত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। একপ্রকার বেগুনজাতীয় গাছের ফলে এই হর্মোন পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম সোলানাম খাসিয়ানাম;—ভ্যারাইটি চ্যাটাজিয়া। কালিম্পং-এ এই উদ্ভিদ জংলী বীন, দক্ষিণ ভূটানে কারাছিন্র কারা ও তামিল ভাষায় মূল থুমবাই নামে পরিচিত। ইহার ফল হইতে সোলাসোডিন নিষ্কাশন করা হইয়াছে। এই সোলাসোডিন হইতে কর্টিসোন, টেস্টোস্টেরোন ও প্রজেস্টেরোন নামক হর্মোন প্রস্তুত করা হয়। পৃথিবীর সর্বত্র এই সকল হর্মোনের ব্যাপক চাহিদা রহিয়াছে।

ভারতীয় এই উদ্ভিদের ফলে শতকরা ৫ ভাগেরও অধিক সোলাসোডিন রহিয়াছে। এই পর্যন্ত পৃথিবীতে সোলানাম অ্যাভিকুলার নামক উদ্ভিদের পাতায় সর্বাধিক পরিমাণে এই দ্রব্য আছে বলিয়া জানা যায়। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মে। ইহার পাতায় শতকরা ১-৯ ভাগ মাত্র সোলা-সোডিন পাওয়া যায়। কাজেই ভারতের এই উদ্ভিদের ফল উক্ত শ্রেণীর অ্যালকালয়েডের উৎকৃষ্ট উৎস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ভারতে এই উদ্ভিদ খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, লোহিত, সুবনসিরি ও কামেং সীমান্ত ডিভিসন, পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, উড়িষ্যা, ময়ূরভঞ্জ ও নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই উদ্ভিদ সোলানাসিয়া বর্গের অন্তর্গত। এই বর্গের সাধারণ উদ্ভিদগুলি হইতেছে বেগুন, টোম্যাটো, লঙ্কা প্রভৃতি। এই উদ্ভিদগুলি দেখিতে ছোট বেগুন গাছের মত। ইহা এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ডাঁটায় ছোট ছোট কাঁটা থাকে। সারা বৎসরই এই গাছে ফল ধরে। ফলগুলি হলুদ রঙের।

উদ্ভিদতত্ত্ব সমীক্ষার ডাঃ পি. সি. মাইতি, কুমারী শিপ্রা মুখার্জি, শ্রীমতী রেবেকা ম্যাথু ও শ্রী এ. এন. হেনরিকে লইয়া গঠিত একটি দল এই সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা সমীক্ষার ডিরেক্টর ডাঃ এইচ. সান্তাপাওয়ের নেতৃত্বে কাজ করেন। তাঁহারা এই উদ্ভিদের ফল হইতে একটি সহজ পদ্ধতিতে সোলাসোডিন অ্যালকালয়েড প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বর্তমানে এই দল এই উদ্ভিদের সোলাসোডিনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পি. এল. ৪৮০ কর্মসূচীর আর্থিক সাহায্যে এই গবেষণা পরিচালিত হইতেছে।

হিমালয়ের

হিমালয় পর্বত একশত বৎসরে এক মিলিমিটার হারে বাড়িতেছে।

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ভূতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ভূতত্ত্ববিদ্‌দের এই 'বিশ্বাসের' সহিত তিনি একমত।

তিনি এই 'বিশ্বাসের' সমর্থনে একটি নজীর উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, কাশ্মীরের পীর পঞ্জাল শৃঙ্গটি সাত হাজার ফুট হইতে বাড়িয়া আট হাজার ফুট দাঁড়াইয়াছে।

উজবেকিস্তানে চতুর্থ শতকের বৌদ্ধ চৈত্য

টাশখন্দ থেকে কিছু দূরে আমুদরিয়া নদীর তীরে প্রাচীন একটি বৌদ্ধ চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করবার কালে উজবেক প্রত্ন-বিজ্ঞানীদের একটি দল চতুর্থ শতাব্দীর বহু মূল্যবান জিনিষপত্র আবিষ্কার করেছেন। এই অঞ্চলটি এক প্রাচীন বৌদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত। টাশখন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও উজবেক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ইতিহাস ও প্রত্নবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের একটি দল এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে খননকার্য চালাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে তাঁরা এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম-কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই চৈত্যটির গর্ভগৃহ, সুবিন্যস্ত অলিন্দ এবং সুন্দর দ্বারমণ্ডপ ও স্তম্ভশ্রেণী তৃতীয়-চতুর্থ শতকের উত্তর পশ্চিম ভারতীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক চমৎকার প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ। সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাংশ (ধ্যানী বুদ্ধ), অনেকগুলি লিপি-খোদিত প্রস্তরফলক এবং লিপি অঙ্কিত ভিত্তিফলক। এগুলির মধ্যে আছে ব্রাহ্মী ও সংস্কৃত—দুরকমের লিপি এবং গ্রীক হরফে লেখা অনেকগুলি কুশান বাক্য ও বাক্যাংশ—যা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এই শেষোক্ত আবিষ্কারটিকেই প্রত্ন-বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করছেন।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৩৫৪ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ | দ্বিতীয় সংখ্যা

অধ্যাপক হয়েলের নতুন বিশ্বসংস্থিতি

অত্রি মুখোপাধ্যায়

"মনে করুন, বিশ্বের যে কোন অংশ থেকে আমাদের এই ছবি তোলা হয়েছে। কালস্রোত বেয়ে সামনের দিকে আমাদের পথ—আমরা দেখছি, আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলের কাছ থেকে প্রতিবেশী অতিকায় নক্ষত্রপুঞ্জগুলি ক্রমশঃ দূরে গিয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল, তাদের স্থান এসে দখল করলো অন্য নক্ষত্রপুঞ্জের দল, ঠিক ততগুলিই যতগুলি সরে গেছে। নতুনদের সঙ্গে পুরনোর চেহারায় হয়তো মিল নেই, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যেন একই ছবি চলেছে, চলছে এবং চলতেই থাকবে চিরদিন।[১]"

এমনি করে অধ্যাপক হয়েল আমাদের সঙ্গে করে দেশ ও কালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বিশ্বলোকের ভবিষ্যতের পথে। এই যাত্রার কোথাও শেষ নেই, কোথাও আরম্ভ নেই—কেন না, কালস্রোত উজিয়ে পিছনের দিকেও তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন। সেখানেও "দেখছি, পর্দার বাইরে থেকে যেন অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জগুলি অস্বাভাবিক গতিতে আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে ধেয়ে আসছে - স্পষ্ট থেকে ক্রমশঃ স্পষ্টতর—যেন এবারে পিষে ফেলবে আমাদের নিজেদের নক্ষত্রমণ্ডলীকে—কিন্তু না—বিপদ-গণ্ডীর অনেক অনেক আগেই চোখের সামনে থেকে উবে যেতে লাগলো নীহারিকাগুলি। আর ঠিক এই ব্যাপারই ঘটতে থাকবে চিরদিন ধরে,

---

১। The Nature of the Universe, Hoyle (Heinmann) chap 6

যদি আমরা অতীতের পথ ধরে চলতেই থাকি। ৫০০০,০০০,০০০ বছর পরে আমাদের নক্ষত্র-মণ্ডলীরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না।"[২]

এই হলো অধ্যাপক ফ্রেড হয়েলের (১৯১৫—) দৃষ্টিতে বিশ্বের আদি এবং অন্ত। বয়স উনপঞ্চাশ, সদাপ্রফুল্ল ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল অপরিবর্তনীয় বিশ্বজগতের ধারণায় দৃঢ় বিশ্বাসী। এরই ভিত্তিতে তাঁর বিশ্বসংস্থিতির অন্যান্য মতবাদ গড়ে উঠেছে—'New Cosmology' (নব বিশ্বসংস্থিতি)-র নাম নিয়ে।

বহু বিন্দুচিহ্নিত রবারের বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলানো হচ্ছে; বিন্দুগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এই বেলুনের মতই বিস্ফারমান—সময় তার ব্যাসার্ধ—আর এরই ফলে নীহারিকাগুলি তীব্রবেগে একে অপরের কাছ থেকে ক্রমঅপসৃয়মান। অবশ্য উপমাটা একেবারে ঠিক হলো না—কেন না, বেলুনের ক্ষেত্রে বিন্দুগুলির আয়তন বাড়বার কথা, কিন্তু আসল জায়গাতে বিশ্বের বস্তুর আয়তনের কোন হেরফের হচ্ছে না, এই সম্প্রসারণের ফলে। বেলুনের এই উপমা একথাও বলে না যে, আমরা বিশ্বজগতের মধ্যমণি হয়ে আছি—ওই বহু বিন্দুর যেটাতেই আমাদের অবস্থান হোক না কেন, সব সময়েই মনে হবে, অপর সব বিন্দুগুলি যেন আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—যদিও তাদের পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়াটাই সত্য। বিশ্বলোকের নক্ষত্রমণ্ডলীগুলি একে অপরের কাছ থেকে শুধু দ্রুত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে—এই-ই একমাত্র তথ্য নয়, নক্ষত্রপুঞ্জগুলি আমাদের কাছ থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের সরে যাবার বেগও যেন তত বেশী হচ্ছে। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ডাঃ এডুইন পাওয়েল হাব্‌ল্ (১৮৮৯—১৯৫৩) এবং ডাঃ মিল্টন লাসেল হুমাসন (১৮৯১—) দুজনে এই মহাদৌড়ের (Recessional velocity) বেগ নিয়ে একটি সমীকরণ[৩] দিয়েছেন, তা হলো—[৩]

মহাদৌড়-বেগ = (ধ্রুব-রাশি) × দূরত্ব। দূরত্বকে আলোক-বর্ষে এবং বেগকে প্রতি সেকেণ্ডে কিলো-মিটারে প্রকাশ করলে এই ধ্রুবকটির মান হয় ১.৮×১০^{-৪}।

বিশ্ব বিস্ফারমান—এই তথ্য কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিককে আমাদের বিশ্বলোকের এক সম্ভাব্য আদিতে নিয়ে গেছে। এঁদের মতে—আদিতে বিশ্বলোকের সমগ্র বস্তুপুঞ্জ অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থায় (Super-dense) ছিল—যেখানে তাপ-মাত্রা অত্যন্ত বেশী এবং ঘনত্ব সমান। তারপর সংকোচন হয়েছে এবং এই সংকোচন চরমে পৌঁছুলে একটা স্থিতিস্থাপক প্রতিক্ষেপণের (Elastic Rebound) ফলে তীব্রবেগে এই সব বস্তু ছিট্‌কে বের হয়ে এসেছে ওর থেকে। প্রতিক্ষেপণ এই সব বিভিন্ন টুক্‌রাগুলিকে এমন একটা বহির্মুখী বল দিয়ে দিয়েছিল, যার জের আজও মেটে নি (যার জন্যেই এই বিস্ফারণ) এবং মিটবেও না কোন দিন। কেন না, বিশ্ব থামবার কোনই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হাব্‌ল্ এবং হুমাসনের সমীকরণ থেকে অঙ্ক কষে দেখানো যেতে পারে, এরকম ক্ষেত্রে নক্ষত্রপুঞ্জগুলি আমাদের কাছ থেকে যত দূরেই থাক না কেন, তাদের বিস্ফারণ-জাত গতিশক্তি, মাধ্যাকর্ষণজনিত স্থিতিশক্তির ৬৫০ গুণ হতে বাধ্য।[৪] এরকম অবস্থায় এই বিশ্বের বিস্ফারণ চিরদিন ধরে চলতে থাকবে—কোন দিনও থামবে না। আর এই সম্প্রসারণ যখন অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, তখন বিশ্বজগৎকে

২। Ibid

৩। "The Velocity-Distance Relation among the Extragalactic Nebula" Hubble & Humasan. Astro-Phy. Journal 74, 43-80 (1931)

৪ The Creation of the Universe [Viking] Gamow. Addendum to chap II

অতি স্বাভাবিকভাবেই অসীম হতে হয়, অবশ্য সবই হাব্‌লের সমীকরণের ভিত্তিতে।

আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদভিত্তিক বিশ্বসংস্থিতি (কসমোলজিক্যাল টার্ম λ না ধরে) দুটি বিশ্বছবি দিয়েছে, তার একটি হলো বিস্ফারমান (যা চিরদিন ধরেই বিস্ফারিত হতে থাকবে) এবং অপরটি অসিলেটিং (Oscillating)। প্রথমটি যদিও বিশ্ব অসীম, একথা অস্বীকার করে না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশ্ব আনবাউণ্ড (Unbound)··· অর্থাৎ কোন সীমারেখা নেই অথচ ফাইনাইট (Finite, আয়তনের দিক থেকে); অর্থাৎ কি না বিশ্বজগৎ একটা বুদ্‌বুদের মত ক্লোজ্‌ড্‌ (closed)। দেখানো যেতে পারে যে, বিশ্বজগৎ যখন দেশ-মাত্রায় ক্লোজ্‌ড্‌ এবং পীরিয়ডিক (Periodic) তখন কালমাত্রাতেও একে পীরিয়ডিক হতে হবে; অর্থাৎ এরকম বিশ্ব সামান্য বিক্ষোভেই বিস্ফারিত হতে থাকবে, কিন্তু তারও একটা মাত্রা থাকবে, যার পর এর সংকোচন আরম্ভ হয়ে যাবে। এরকম সংকোচন-বিস্ফারণ কালের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চলতেই থাকবে।

গ্যামো, রাইল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের ওই বোম্বাই-ঘন্টা (Bigbang) মতবাদ অপেক্ষবাদেরই প্রথম সমাধানটির পর্যায়ভুক্ত। এর মতে বিশ্ব-লোকের ভবিষ্যৎ অনন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং কালস্রোত উজিয়ে গেলে বিশ্বের নিশ্চিত এক আদিতে গিয়ে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু 'সেণ্ট অগাষ্টিন এরা' [St. Augustine Era] অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডের চরম সংকুচিত অবস্থার পূর্বের কথা সম্পর্কে এঁরা নীরব থেকেছেন।

এ-পর্যন্ত বিশ্বজগতের বিভিন্ন উপাদানের প্রাচুর্য সম্পর্কে যে সব তথ্য আমরা পেয়েছি, এই ধারণা তার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছে। এদের ধারণা বিস্ফারণের প্রথম ঘন্টাতেই বিশ্বের যাবতীয় মৌল পদার্থ গঠিত হয়ে গিয়েছিল—কেমন করে, সে 'ইলেম সূত্র' (Ylém theory) প্রসঙ্গ, যদিও এখানে বলা সম্ভব নয়।+

কত বছর আগে এই আদিম বস্তু থেকে বিশ্বসৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, হাব্‌লের সূত্র প্রয়োগ করে তাও এঁরা বের করে ফেলেছেন। সম্প্রতি বেরের (Berr) আন্তর্নাক্ষত্রমণ্ডলীয় (Inter-galactic) দূরত্ব সম্পর্কিত পড়াশুনার [নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে দূরত্ব আমাদের জানা আছে, নানান দিক থেকে তার পুনঃ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আসল দূরত্ব এর দ্বিগুণ হবে। ১৯৩২ সালেও ডাচ জ্যোতির্বিদ হেনড্রিক উর্টও (১৯০০—) এরকমই একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন] ভিত্তিতে বিশ্বজগৎকে ৩৪×১০^৯ বছরের পুরনো বলে ঘোষণা করা হয়েছে; ভূতত্ত্ববিদ হোম্‌স্‌-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর পূর্ণসঙ্গতি রয়েছে

বোম্বাই-ঘন্টার ধারণা একাধিক সমস্যাও নিয়ে এসেছে। যে তীব্র বিস্ফোরণের ফলে এই বিশ্বজগৎ বিস্ফারমান, তার কোন চিহ্নমাত্রই আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জে পাওয়া যায় না।[৫] তাছাড়া বিস্ফোরণের পর যে তীব্র গতিতে সমগ্র বস্তুপুঞ্জ ছিট্‌কে বের হয়ে এসেছিল এবং এখনো যার জের মেটে নি, তার মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের জন্ম হওয়া অসম্ভব। অথচ আধুনিক বিশ্বসংস্থিতির ধারণা, এই বিশ্বপরিব্যাপ্ত আন্তর্নাক্ষত্রিক বস্তু (Inter-stellar gas dust) থেকেই এদের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ছাড়াও বিস্ফারমান জগতের আরো একটা ব্যাখ্যা এসে পড়েছে, যা এই সমস্যা-মুক্ত নয়। আপেক্ষিকতাবাদ দেখিয়েছে, এই সম্পর্কে আকর্ষণ ছাড়াও বিশ্বজগতে বিকর্ষণ আছে, যার মূল্য

+ এ সম্পর্কে Gamow-র Creation of the Uiverse বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

৫ Hoyle : Frontiers of Astronomy (Heinmann)

দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। বস্তুতঃ আকর্ষণ একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব-মাত্রার ভিতরে সংঘটিত হয়, যা ছাড়িয়ে গেলে বস্তুপুঞ্জের মধ্যে বিকর্ষণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ধারণা বিশ্বজগতের বিস্ফারণের কারণ হতে পারে না, কেন না এখানেও নক্ষত্র সৃষ্টির ব্যাপারে সেই অসুবিধা থেকেই যাচ্ছে।

লাইচেনের অধ্যাপক আবে জর্জ লম্যাতরের অভিব্যক্তিবাদই[৭] শুধু এই সমস্যার নিখুঁত সমাধান করতে পারে। স্যার আর্থার ষ্ট্যানলি এডিংটনের কাছে এই বিশ্বের আদি কল্পনা করা দর্শনগত কারণে অরুচিকর[৮] বলে মনে হলেও স্যার জেমস জীন্সের মতই অধ্যাপক লম্যাতরের স্থির বিশ্বাস, অনতিদূরবর্তী কালমাত্রায় বিশ্বের নিশ্চিত এক সৃষ্টি ঘটে গেছে, যার প্রারম্ভে সমগ্র বিশ্বজগতের বস্তুপুঞ্জ এমন একটা অবস্থায় ছিল, যার সঙ্গে আজকের অবস্থার কোনই মিল নেই।

যে স্থির বিশ্বের (Static Universe) ছবি আইনস্টাইন দিয়েছিলেন (কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট ধরে), যেখানে নিউটনীয় ভারাবর্তন-জাত শক্তি কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্টজাত শক্তির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করেছিল, তা এডিংটনের মতে ভীষণ অস্থায়ী এবং এর ভিতরে যে কোন সামান্যতম বিক্ষোভ একে বিস্ফারমান হতে সাহায্য করবে। অবশ্য এরকম অস্থায়ী বিশ্ব সঙ্কুচিত না হয়ে বিস্ফারণই আরম্ভ করে দেবে কেন—এর পক্ষে কোন সবল যুক্তি তিনি রাখেন নি। যাই হোক, আইনষ্টাইনীয় বিশ্বকেই এই বিশ্বলোকের প্রারম্ভ বলে মেনে নিয়েছেন এডিংটন—লম্যাতর একথা প্রথমে স্বীকার করে নিলেও পরে একে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। এডিংটনের সঙ্গে লম্যাতরের এখানেই বিরোধ। লম্যাতর বিশ্বের আদিকে আরো অতীতে নিয়ে গেছেন এবং একথা মেনেছেন যে, ঘটনাক্রমে অতীতের বিশ্বকে এক সময় এই আইনষ্টাইনীয় বিশ্বের স্টেজ অতিক্রম করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বকে দীর্ঘকাল ধরে এই আইনষ্টাইনীয় বিশ্বে স্থির অবস্থাতে কাটাতে হয়েছে—নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্মও হয়েছে ওই সময়টিতেই। এরা গঠিত হবার দরুণ এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বে পুনর্বার তার বিস্ফারণ সুরু করে দিয়েছে—ছুটে চলেছে অনন্তের দিকে।

তাপগতিবিদ্যা এবং কণিকাবাদ বলেছে, একটি নির্দিষ্ট শক্তি কতক বিচ্ছিন্ন আলোক কণাতে বিভক্ত এবং এই বিচ্ছিন্ন আলোক কণিকার সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান। কালস্রোত উজিয়ে পিছনের দিকে যত যাব কণিকার সংখ্যা তত কমে কমে আসবে এবং সর্বশেষ আজকের বিশ্বের সমস্ত শক্তির প্রকাশ দেখবো অত্যল্প সংখ্যক অথবা একটিমাত্র কণিকাতে।

বিশ্বজগতের যাত্রা যদি এই একটিমাত্র কণিকা নিয়ে সুরু হয়ে থাকে, তাহলে সৃষ্টির প্রারম্ভে দেশ ও কালের কোনই গুরুত্ব ছিল না। এর গুরুত্ব আরোপ করা তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন একটি মাত্র কণিকা (Quantum) ভেঙে গিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক কণিকার জন্ম দিয়েছে। এই ধারণা সত্য হলে দেশ ও কালের সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব সৃষ্টির কিছু পরে।

আজকের বিশ্বের সমগ্র বস্তুসত্ত্ব যদি একটি মাত্র কণিকারও মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকে, তবে তার আয়তন আজকের বিশ্বজগতের তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক ছোট ছিল। অন্ততঃ অপেক্ষবাদ তাই বলে।

নিউক্লিয়াস-সূত্র যদি কোন দিন এই স্বীকৃতি দেয় যে, একটি মাত্র আদিম পরমাণুই (বস্তুতঃ নিউট্রন) এই এক এবং অদ্বিতীয় Quantum, তাহলে মানতে হয় বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে তার অস্তিত্ব ছিল একমুহূর্ত মাত্র। এর ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল এবং তাপমাত্রা ছিল নিউক্লীয়ার ফ্লুইডের ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার (Critical temperature of

৭। Nature 127, 706 (1931)
৮। Ibid 127, 447—453 (1931)

Nuclear fluid)-এর চেয়ে কম[৯]। এই ভীষণ অস্থায়ী পরমাণু পরমুহূর্তেই সুপার-রেডিও অ্যাকটিভ ডিজিন্টিগ্রেশন (Super radioactive disintegration) প্রক্রিয়ায়[১০] টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙে পড়েছিল—প্রত্যেক টুক্‌রা আবারও ভেঙে ছিল—এবং এই ভাঙার কাজ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে যতক্ষণ পর্যন্ত এরা অত্যন্ত ছোট না হয়ে পড়ে।[১১]

পরমাণুর এই স্বতঃবিস্ফোরণের ফলে দেশের ব্যাসার্ধ অতি দ্রুত বেড়ে গেছে, তার প্রত্যেকটি জায়গা এই সব টুক্‌রা সমভাবে দখল করেছে। এই সব টুক্‌রা থেকে বের হয়ে-এসেছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং আলফা-কণা—যারা আজকের অত্যন্ত শক্তিশালী নভোরশ্মির জন্ম দিয়েছে। এর ধর্মগত এবং মাত্রাগত অস্তিত্ব লম্যাতরের ছবি থেকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

স্বভাবতঃই বিশ্বজগতের সম্প্রসারণশীলতার ব্যাখ্যাও এখান থেকেই আসছে। এই বিস্ফারণের ফলে পরমাণুগুলির পারস্পরিক গতিবেগ এসেছে কমে, বিকিরণও কমে এসেছে। তারপর বিস্ফারণ এবং আকর্ষণের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচিত হয়ে গেছে। সুযোগ বুঝে পরমাণুগুলি পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে, কিন্তু সে ধাক্কা হয়েছে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। এর ফলে এসবের মধ্যে একটা পরিসংখ্যান স্থিতি (Statistical equilibrium) এসে গেছে, যার ফলস্বরূপ এই নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব।

এই হলো আবে লম্যাতরের বিস্ফারমান বিশ্বজগতের কার্যকারণবাদ, যা নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্মকে ব্যাখ্যা করেছে, নভোরশ্মির উৎপত্তি উপস্থাপিত করেছে, বিশ্বে ভারী উপাদানগুলির আপেক্ষিক প্রাচুর্যকেও (Relative abundances of heavy elements) ব্যাখ্যাত করেছে। কিন্তু আবে লম্যাতরের ধারণায় হাল্কা মৌলগুলির অস্তিত্বের কোন ব্যাখ্যাই নেই। মেয়ার এবং টেলারের মতে এই সব হাল্কা উপাদানগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে হলে 'ফ্রোজন্ ইকুইলিব্রিয়াম' (Frozen equilibrium) প্রসঙ্গ[১২] টেনে নিয়ে আসতে হবে – যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লম্যাতর বলেছেন "আমি নিশ্চয় করে একথা বলে ভণিতা করবো না যে, আমি এই আদিম পরমাণুর ধারণাকে প্রমাণ করতে পেরেছি। নীহারিকাদের মধ্যে বস্তুর ঘনত্ব সম্পর্কে যখন আরো বেশী করে জানতে পারা সম্ভব হবে, তখনই নিঃসন্দেহে এর বিপক্ষে অথবা স্বপক্ষে কথা বলা সম্ভব।"[১৩]

গ্যামোর বোম্বাই-ঘণ্টার ধারণাও বস্তুতঃ সেই আদিম পরমাণুর চিন্তাধারারই নামান্তর, তফাৎটা এইখানে যে, এদের আদিম পরমাণুর মধ্যে 'হাই টেম্পারেচার থার্মাল রেডিয়েশন (High temperaturethermal Radiation) রয়েছে। সম্প্রসারণের পাঁচ মিনিট পরে তাপমাত্রা নেমেছে ১০[৯] ডিগ্রীতে—আরো একদিন পর তাপমাত্রা হয়ে গেছে চার-শ' লক্ষ ডিগ্রী। এক কোটি বছর পরে তাপমাত্রা রুম টেম্পারেচারে (Room temperature) এ নেমে এসেছে। আরো একটা তফাৎ আছে—লম্যাতরের বিশ্বছবিতে যেমন আইনষ্টাইনীয় বিশ্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বলোককে

৯। Gamow : The Creation of the Universe.

১০। Lemaitre : L' Hypothise de e'Atome Primitif : Essai de Cosmosonie

১১। Revue des Questions Scientifiques, Nov. 31.

১২। এই সম্পর্কেও George Gamow's The Creation of the Unriverse-এ পাওয়া যাবে।

১৩। - ১০র মতই। অনুবাদ লেখকের।

আসতে হয়েছে, গ্যামোর চিন্তাধারায় সেই আইনষ্টাইনীয় বিশ্বের কোন উল্লেখই নেই।

সে যাহোক, বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই একটা মূল কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা হলো, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (Laws of Nature) অপরিবর্তনীয়; অর্থাৎ নিতান্তই যদি বিশ্বের আদি বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেই আদি থেকে অন্ত (যদি তারও অস্তিত্ব থাকে) পর্যন্ত বিশ্বের সবরকম অবস্থাতেই এই নিয়মগুলির প্রয়োগ চলতে পারে। কেম্‌ব্রিজের হারমান বণ্ডি এবং টমাস গোল্ডের দ্বৈতগবেষণা এই মূলকে নাড়া দিয়েছে। তাঁদের মতে, এই ধরে নেবার মধ্যেই প্রশ্নের অবকাশ আছে।[১৪]

এই প্রসঙ্গে তাঁরা মাকের সূত্র এনেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, যে কোন স্থানীয় গতি সম্পর্কিত পরীক্ষা বিশ্বের দূরবর্তী বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা এমন কোন গবেষণাগার তৈরী করতে পারি না, যা এই প্রভাবমুক্ত। সুতরাং প্রাকৃত নিয়মগুলি যে বিশ্বজগতের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না, তা বলবার কোন যুক্তিগত কারণ নেই।

কিন্তু যদি স্বীকার করে নিই যে, প্রাকৃত নিয়মগুলি বিশ্বের সঙ্গে-পরিবর্তনীয়, তাহলেও সমস্যা আসে। দূরের তারা থেকে যে আলো আমাদের কাছে পৌঁচেছে, তা এই বিশ্ব ছাড়া আলাদা বিশ্বেরও হতে পারে, আর আলাদা বিশ্বে কি করেই বা আমাদের জানা নিয়মগুলি খাটাতে পারি।

কস্‌মোলজিক্যাল প্রিন্সিপল (Cosmological Principle) এই সমস্যার সমাধান করেছে দেশমাত্রার বিচারে। বিশ্বের বিশাল জায়গা জুড়ে স্থূল গণনায় যদি একটা সমতা থেকে থাকে, তাহলে প্রাকৃত নিয়মগুলি একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় খাটাতে পারি, নইলে নয়। এই ধারণা পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠাও পেয়ে গেছে অনেক দিন।

কিন্তু কালমাত্রার বিচারে বিশ্বজগতে কোন সমতা থাকবে কিনা, কস্‌মোলজিক্যাল প্রিন্সিপল্ সে বিষয়ে নীরব থেকেছে। কালের স্রোতে ভেসে যাওয়া বিশ্বজগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রাকৃত নিয়মগুলি অনবরতই বদ্‌লাতে থাকে তাহলে দূরের তারাগুলির আলো থেকে কোন সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি না; কেন না যে সব আলো আজ আমরা দেখছি, তা বহু বছরের পুরনো অন্য-বিশ্বলোকের খবর নিয়ে এসেছে।

কেউ কেউ মনে করেন, প্রাকৃত নিয়মগুলি আজ অপরিবর্তনীয়। কেউ বা মনে করেন, তাদের স্বাভাবিক ধর্ম অপরিবর্তনীয়, শুধু ক্ষেত্রবিশেষে ধ্রুব রাশিটির মান বদ্‌লে যায়। কেউ আবার মাত্রাগত পরিবর্তনের কথাও তুলেছেন।

সে যাই হোক, বণ্ডি এবং গোল্ডের ধারণা অন্য রকমের। তাঁদের যুক্তি[১৫] এই—প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেহেতু বিশ্বের গঠনের উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু বিশ্বের গঠনও প্রাকৃতিক নিয়মগুলির উপর নির্ভর না করে পারে না, সেহেতু বলা যেতে পারে যে, বিশ্বজগৎ এমন একটা স্থায়ী অবস্থায় এসে পৌঁচেছে (যার কারণ না দিতে পারলেও সেটা যে এই অবস্থায় বিশ্বকে নীত হতে বাধ্য করছে, তা নিশ্চিত) সেখানে তার নিরন্তর গতিসম্পন্ন (Perpetual motion) হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বণ্ডি, গোল্ডের এই 'পারফেক্ট কস্‌মোলজিক্যাল প্রিন্সিপল্'ই বিশ্বজগতের একমাত্র ছবি, যা মানলে বিশ্বের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অনবরতই বদ্‌লাতে হয় না। এর বিস্তৃত বিবরণ হয়েলের প্রসঙ্গে দেওয়া হবে।

অধ্যাপক হয়েলের সিদ্ধান্তও[১৬] মোটামুটি একই

১৪। Monthly Notices of Royal Astronomical Society 108. 252-270 ('48)

১৫। Ibid

১৬। Monthly Notices of R. Astronomical Soc. 108, 372 ff ('48)

রকমের, যদিও তাঁর যুক্তি এসেছে অন্যদিক থেকে। অধ্যাপক হয়েলের মতে গ্যামোর বিগব্যাংগ থিওরী দর্শনগত কারণে অসম্পূর্ণ। তাছাড়া গ্যামোর বিরুদ্ধে এঁর প্রধান অভিযোগ হলো এই—বিজ্ঞানের ভাষা দিয়ে একে বর্ণনা করা যায় না[১৭] এবং এমনি এর মূল ভিত্তি, যাকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করবার কোন আবেদনই চলতে পারে না।[১৮] কোন্ অতীতে বিশ্বরচনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল, তা সত্যই মানবীয় পরীক্ষার গণ্ডীর অনেক বাইরে।

বিবর্তনবাদী বিশ্বসংস্থিতি নিয়ে এসেছে এই বিরাট বিশ্বের এক ঘৃণ্য ভবিষ্যৎ, কালের স্রোত বইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ ফাঁকা হতে থাকবে। মাত্র ১০,০০০,০০০,০০০ বছর পরে আমাদের আকাশে কোন তারাই আর দেখা যাবে না।

প্রথমেই হয়েলের নিজের একটি রূপক দিয়ে তাঁর মতবাদ উপস্থাপিত করেছি। এরই অনুসরণে কালস্রোতের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে গিয়েও কোন লাভ নেই, কেন না বিশ্বজগতের আদিতে কখনই পৌঁছানো যাবে না—বিশ্বজগতের অন্তও দুরধিগম্য অনন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে

রূপকাঠির নতুন নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম হচ্ছে বিশ্বপরিব্যাপ্ত এক সূক্ষ্ম গ্যাস থেকে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্টারষ্টেলার গ্যাস'। এই গ্যাসের প্রধান কাজই যেন নতুন বস্তু তৈরী করা —তাদেরই জায়গার দাবীতে পুরনো নক্ষত্র-মণ্ডলীর দূরে সরে যেতে হচ্ছে নতুনকে জায়গা ছেড়ে। বণ্ডি এবং গোল্ডের গণনানুসারে এক ঘণ্টায় এই মহাশূন্যের এক ঘনমাইল জায়গাতে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু জন্মানো দরকার।[১৯] এই হলো হয়েলের বিস্ফারমান বিশ্ব-জগতের কার্যকারণবাদ, যা বিশ্বকে অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষণা করেছে।

"বর্তমান নক্ষত্রের দল বিকিরণের অত্যধিক অপচয়ে ক্রমাগত ক্ষয়ের পথে চলেছে—একথা অস্বীকার না করলেও তাঁরা বলেন যে, বিশ্বলোকের গভীরতম গহনে কোথাও হয়তো আবার এই বিকিরণের পুনর্ব্যবস্থায় বস্তুসৃষ্টির কাজ চলেছে। এক নতুন স্বর্গ ও নতুন গ্রহলোক রচনার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, পুরনো বিশ্বের ভস্মাবশেষ থেকে নয়, তাদের দহনে মুক্ত বিকিরণ থেকে। তাঁরা এক চক্রাবর্ত বিশ্বের (Cyclic Universe) পক্ষপাতী। এক স্থানে এর খণ্ড প্রলয় ঘটলে সেই প্রলয়ে মুক্ত বস্তু ও বিকিরণ অন্যত্র আবার এক সৃষ্টি গড়ে তোলে।" এই প্রসঙ্গে সার জীন্‌সের এই উদ্ধৃতি[২০] তুলে দিয়ে বিবরণ সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস সংবরণ করা কষ্টকর।

নিরন্তর এই সৃষ্টির ধারণা একবারে কাল্পনিক নয়, কেন না অধ্যাপক হয়েল আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকেই এদিক-ওদিক করে এর গাণিতিক প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠা একটি মাত্র মূল কথা নিয়ে—'A division between space and time can be made and this division can be used throughout the whole of our Universe......it is important to take into account in forming the equations that decide the way in which matter is created'—Hoyle[২১]

চক্রাবর্ত বিশ্বের ছবি সুপ্রতিষ্ঠিত তাপগতি-বিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় বিরোধী। কেন না, ঠিক যে কারণে এবং যে উপায়ে চিরগতি-শীল যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব নয়, চক্রাবর্ত বিশ্ব ঠিক

১৭, ১৮। Hoyle—Nature of the Universe (Heinmann)

১৯। Gamow—Modern Cosmology (An essay). (New Astronomy, S. A)

২০। Jean's Mysterious Universe. অনুবাদ—প্রমথ সেনগুপ্ত [বিশ্বরহস্য]

২১। Hoyle's—Nature of the Universe (Heinmann) Chap. 6

একই কারণে অসম্ভব। আবার দ্বিতীয় নিয়মের মতে বিশ্বলোকের ভবিতব্য হচ্ছে তাপ-মৃত্যু (Heat-Death)। বিশ্বের তাপদান-বিমুখতা (Entropy) দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, যে দিন এর মূল্য সর্বোচ্চ শিখরে এসে পৌঁছাবে, সমগ্র বস্তুপুঞ্জ সে দিন এমন এক সম-উষ্ণতায় এসে পৌঁছাবে, যার মাত্রা হবে অত্যন্ত কম। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বিশ্বজগতের প্রগতি তখন চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

অথচ এক হিসাবে তাপগতিবিদ্যার প্রথম নিয়মের সঙ্গে এর পূর্ণসঙ্গতি। কালমাত্রায় এক সময়ে বিশ্বের এক জায়গাতে যে মোট শক্তি দেখেছি, সেখানে চিরদিন তাই দেখবো। বরং সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই চিরন্তর সৃষ্টির সহ-যোগিতা না থাকলেই যেন প্রথম নিয়ম অমান্য করা হয়। সেখানে কালের সঙ্গে সমগ্র শক্তি-সত্ত্বের কমে যাওয়ার সম্বন্ধ। কিন্তু নিরন্তন পরমাণু সৃষ্টি শক্তি সৃষ্টিরই নামান্তর। এইখানে ষ্টেডি ষ্টেট থিওরী তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে মনে হতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতেই একে বিরোধ বলা সমীচীন, কেন না আসলে এটা বিরোধই নয়। 'In fact, the principle of conservation of energy right down to the last place of decimals is not knowable at all as an exact law, because it has never been established in this precise way, In postulating a rate of creation that is far smaller than the most refined measures of the law of conservation, no conflict with empirical evidence has been introduced at all [Lyttleton][22] 'We have no evidence to suggest that the slight rate of creation required by the steady state theory does infringe the principle of conservation within the limits of experimental accuracy, [Bondi][23]

দ্বিতীয় নিয়ম প্রসঙ্গে ডাঃ বনরের কথা—'It would be wrong to take this too serious by, because it has never been properly shown how the second law of thermodynamics affects the Universe as a whole,[24]

মনে হতে পারে চক্রাবর্ত বিশ্বজগতের ছবি অন্যান্য বিবর্তনবাদের (Evolutionary Theory) মতই বিস্ফারমান বিশ্বজগতে নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম হওয়ার ব্যাপারে সেই একই অসুবিধা নিয়ে এসেছে। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, এরকম Inter-stellar gas-এর মধ্যে কোন সামান্যতম বিক্ষোভ হলেই নক্ষত্রমণ্ডলী রচনার পালা সুরু হয়ে যায়, আর এরকম বিক্ষোভ তো এখানে হামেশাই হচ্ছে। নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক ভারাবর্তনই এই বিক্ষোভ।

বিশ্বজগতের নানান উপাদানের আপেক্ষিক প্রাচুর্যও এই ছবির ব্যাখ্যা করবার কথা এবং হয়েল তা দিয়েছেনও। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি মহাশূন্যের 'কিছু-না' (Out of nothing) থেকে উৎপন্ন হচ্ছে আর ভারী উপাদানগুলির সৃষ্টি হচ্ছে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ফলে এই সব উপাদান মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সম্পর্কে বণ্ডি বলেছেন—'... In this way a theory has been created that is remarkably accurate in accounting for the abundances of elements.[25] গ্যামো অবশ্য একে

২২, ২৩, ২৪। Rival Theories of Cosmology (Oxford) page 42, 42, 10, respectively.

২৫। Rival Theories of Cosmology (Oxford) p 21

অবাস্তব[২৬] বলে আখ্যাত করেছেন এবং এই সম্পর্কে হয়েলকে ঠাট্টা করতেও ছাড়েন নি।[২৭]

চক্রাবর্ত বিশ্বের ধারণার বিপক্ষে গ্যামোর এই-ই একমাত্র অভিযোগ নয়। চক্রাবর্ত বিশ্বের ছবি বিশ্বের বয়সের হিসাব এড়িয়ে গেছে। যদি নিরন্তরই নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম হয়, তাহলে এই বিশ্বলোকে নতুন পুরনো সব রকমেরই নক্ষত্রমণ্ডলীর অস্তিত্ব আছে। এঁদের ধারণা এই-ই বলে যে, স্থূল গণনায় এই নক্ষত্রসংঘের বয়স গড়ে হাবল্-গণনার এক তৃতীয়াংশ (বেয়ের মতানুসারে নয়); অর্থাৎ ৬০০,০০ লক্ষ বছর। আবার যে নক্ষত্রপুঞ্জের একাধারে আমাদের সূর্যলোকের বাস, তারই বয়স কয়েক লক্ষ কোটি বছর, অর্থাৎ সাধারণের চেয়ে আমাদের নক্ষত্রচক্রবর্তীর (Galaxy) বয়স বেশ বেশী। তাই যদি হয়, আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর তারাগুলির অন্যান্য প্রতিবেশী নক্ষত্রচক্রবর্তী তারাগুলির চেয়ে বুড়ো হওয়া উচিত। কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে এরকম কোনও তফাৎ চোখে পড়ে নি।[২৮]

কিছুদিন আগে দুজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক স্টেবিন্স্ এবং হুইটফোর্ড দেখেছেন[২৯] দূরের নীহারিকাদের বিকিরিত আলো, সূর্য ওঠা ও ডোবার সময় যে রকম লাল্‌চে দেখায়, ঠিক সে রকম লাগে। মহাশূন্যের ধুলাবালিই (Interstellar dust particles) যদি এই লাল্‌চে হবার কারণ হয়, তাহলে এত পরিমাণ ধুলা মহাশূন্যে থাকতে হয়, যাতে কোন নিরীক্ষাই সম্ভবপর হতো না। তাছাড়া এই ধুলাবালির উপস্থিতির জন্যেই যদি লাল্‌চে দেখায় তাহলে লাল্‌চে হবার মাত্রা কোন নক্ষত্রমণ্ডলী-বিশেষে কম-বেশী হবার কথা নয়—এর জন্যে লাল্‌চে ভাব সবার ক্ষেত্রে একই হতো। কিন্তু নিরীক্ষণ দেখাচ্ছে, এই লাল্‌চে হওয়া শুধুই কুণ্ডলীচক্র-না-পাকানো (Non-spiral nebula) নীহারিকার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ — যাদের অবস্থিতি আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে। এই লাল্‌চে হবার কারণ এই হতে পারে যে, ওসব নীহারিকার সবে জন্ম হয়েছে; কেন না বেশী পরিমাণ Red Giant-এর জন্যে যদি এই লাল্‌চে হয়ে থাকে, তাহলে তা একমাত্র নীহারিকার শিশু অবস্থাতেই থাকতে পারে। এদের উপস্থিতিই যদি এই অতিরিক্ত লাল হবার কারণ হয়, তাহলে অধ্যাপক হয়েলের ধারণা নিঃসন্দেহে ভুল বলে প্রমাণিত হবে।

আজকে মোটামুটি দুটি মত—একটি বিবর্তনবাদী মতবাদ অপরটি অপরিবর্তনীয় বিশ্বের মতবাদ এই দুটির মধ্যে বিরোধ আজকের বিশ্বসংস্থিতিতে একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

মনে হয় গ্যামোর ধারণা দর্শনগত কারণে যতখানি অসম্পূর্ণ, হয়েলের বিশ্বসংস্থিতি তার চেয়ে বেশী নয় অন্ততঃ। গ্যামোর ধারণাকে বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে দাঁড় করানোতে কোথায় যেন একটা বাধা আছে—হয়েলের ছবি সে দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী। গাণিতিক প্রতিষ্ঠাই, বলা বাহুল্য একে জোরদার করেছে। অপর পক্ষে Evolutionary picture-এ 'The difficulty to be faced is that at the start of the expansion certain quantities (at the start of the expansion) become infinite,...A singularity in the mathematics describing a physical problem is usually an indication of the break down of the theory and the physicist's

২৬, ২৭। Gamow: Creation of the Universe, chap, III

২৮। Gamow: Modern Cosmology (New Astronomy, S, A,)

২৯। Gamow: Ibid, also Creation of the Universe,

normal response is to try to set a better one." (Bonnor)[৩০]

বস্তু সৃষ্টির ধারণাই যদি অধ্যাপক হয়েলের মতবাদের দুর্বলতা হয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে এই দুর্বলতামুক্ত কোন ধারণাই নয়। In fact, in the equations of Cosmologists a creation term already exists (Lorell)[৩১]। হাইড্রোজেন পরমাণু কোত্থেকে জন্ম নিচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তরে হয়েল বলেছেন 'Out of nothing'—এ নিয়ে ব্যঙ্গ করবারও কিছু নেই—কেন না, তাহলে অভিব্যক্তিবাদকেও এই আক্রমণ সহ্য করতে হবে। বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা এই 'Already existing matter' নিয়ে সুরু করতে হবে, যেখানেই পদার্থ-বিদ্যার সীমানা শেষ হয়েছে, তারই অপর পারে অধ্যাত্মবিদ্যার রাজ্য আরম্ভ হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁরা অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানীরা এই আশাই পোষণ করেন যে, এমন একদিন আসবে যখন বিজ্ঞান এই 'অলরেডী এক্জিষ্টিং ম্যাটারে'র জন্মও ব্যাখ্যা করতে পারবে। অবশ্য কেউ কেউ (গ্যামো) এর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। গ্যামো তো বলেইছেন—'আদিম পরমাণুই বিশ্বের প্রারম্ভ নয়, এটা বিশ্বের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র।

কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে এই বিশ্ব রচনার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছিল, অভিব্যক্তি-বাদ তাই নিয়ে ব্যস্ত। অভিব্যক্তিবাদ এমন কোন পথই খোলা রাখে নি, যাতে তার সত্যাসত্য বিচার করা যায় পরীক্ষামূলকভাবে। সেই সুদূর অতীতে মানুষের জ্ঞান হয়তো কোন দিনই পৌঁছাবে না। অপর পক্ষে হয়েল, বণ্ডি গোল্ডের মতে, বস্তুর নিরন্তরই সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই কারণেই এই ধারণা মানুষের পরীক্ষামূলক আওতার মধ্যে। এইটেই ষ্টেডি ষ্টেট থিওরীর মস্তবড় গুরুত্ব। এদিক থেকে ষ্টেডি ষ্টেট থিওরী অবশ্য ইভোলিউশনারী থিওরীর চাইতে বেশী বস্তুতান্ত্রিক।

সূত্র দুটিকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করবার জন্যে বিজ্ঞান বদ্ধপরিকর, নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী হবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। বিগত কয়েক বছরে রেডিও টেলিস্কোপের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবং স্যার বার্টাণ্ড লভেল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন—'আমার স্থির বিশ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে এই সব যন্ত্রপাতি অভিব্যক্তিবাদ এবং ষ্টেডি ষ্টেট থিওরীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে বলবে, কোন্টা ঠিক আর কোন্টা ভুল।[৩২]

আসলে পৃথিবীর তৈরী যন্ত্রপাতি যদি অতীতের আরো গহ্বরে প্রবেশ করে নব্বই হাজার কোটি বছরের পুরনো নীহারিকার খবর নিয়ে আসতে পারে, তাহলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। যদি অভিব্যক্তিবাদ সত্য হয়ে থাকে, বিশ্বলোকের একটা নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে আজকের বিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা সেই অতীতের সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক কম হবে। আর যদি তা না হয়, যদি এই দুই সংখ্যার মধ্যে কোন গড়মিল না থাকে, তাহলে ষ্টেডি স্টেট থিওরী নিঃসন্দেহে সত্য। এছাড়াও ষ্টেডি স্টেট থিওরী অনুসারে এক ঘন-মাইল দেশের মধ্যে বছরে যে কয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরী হচ্ছে, তাই স্যার লভেলের মতে—'May well be detectable in the near future by Radio Telescopes'[৩৩] শেষ পর্যন্ত বিশ্বসংস্থিতির কোন্ ছবি ঠিক থাকবে আর কাকে বিদায় নিতে হবে, তা কখনই ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কেন না, 'শেষ' বলতে নির্দিষ্ট কিছু আমরা বুঝি না।

৩০। Rival Theories of Cosmology (Oxford). p. 6

৩১। Lovell : The individual & the Universe (Oxford) p. 102

৩২। Lovell—'The Individual & the Universe (Oxford) p. 108 –

৩৩। Ibid. p. 107

সার জীন্‌সের কথাই এখানে অধিকতর প্রযোজ্য—"যে বিজ্ঞানী বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন, তাঁর পক্ষে একথা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ স্রোতধারা কোন দিকে প্রবাহিত হবে বা কোন্ দিকে গেলে বাস্তবতায় গিয়ে পৌঁছানো যাবে। আপন অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জানেন, কেমন করে এই জ্ঞান-নদী অবিরত বিস্তৃততর হয়ে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে, বহুবার নিরাশ হয়ে প্রত্যেক বাঁকের মুখে এসে তিনি এই চিন্তা ছেড়ে দিয়েছেন—'এই তো সামনে রয়েছে অনন্ত মহাসাগরের কল্লোল ও আভাস'[৩৪] এবং হুইট্রোর—"There was a monk indulging against the teaching of the Master in cosmological enquiries. In order to know where the world ends he began......interrogating the gods of the successive heavens......Finally, the great Brahma himself became the manifest, and the monk asked him where the world ends,...... The great Brahma took that monk by the arm, led him aside and said. These gods, my servants hold me to be such that there is nothing. I can not see, understand, realize. Therefore I gave no answer in their presence. But I do not know where the world ends..."[৩৫] সুতরাং এরকম আলোচনার সমাপ্তি প্রশ্নবোধক চিহ্নতেই টানতে হবে।

৩৪। বিশ্বরহস্য প্র-গা-সে ; পৃঃ ১৮৮ ;

৩৫। Dialogues of Budha, Whitrow : The Structure and Evolution of the Universe [Harper Text book] p. 197.

আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের স্মরণে

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

আজ থেকে ঠিক এক-শ' বছর আগেকার কথা। দিনটা ছিল ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ। অষ্ট্রিয়ার ব্রুণ সহরের এক স্কুল বাড়িতে ন্যাচারাল সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে এক সান্ধ্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বড় বড় পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রুণ মঠের এক সন্ন্যাসী মটর গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক ধারার যে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তারই গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি ওই সভায় পাঠ করবেন। সভার কাজ সুরু হলো। এক ঘণ্টা ধরে সেই সন্ন্যাসী তাঁর গবেষণার ফলাফল বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলেন, কিন্তু তাঁদের চোখেমুখে কোন চাঞ্চল্য বা উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না। বক্তৃতার শেষে কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না বা কোন আলোচনাও হলো না। আট বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যে বৈজ্ঞানিক সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তার গুরুত্ব কেউ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের উপর আঘাত পড়লো। যে আশা নিয়ে সভায় এসেছিলেন, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। গভীর ক্ষোভে তিনি মঠে ফিরে গেলেন। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের কোন মর্যাদা তিনি পেলেন না—কোন সম্মান তিনি লাভ করলেন না। তবু দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন—তাঁর সময় নিশ্চয়

একদিন আসবে। সময় এসেছিল—তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর পরে। এই মহাবিজ্ঞানীর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। ইনি হচ্ছেন প্রজনন-বিজ্ঞানের জনক—নাম গ্রেগর জন মেণ্ডেল।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই জন মেণ্ডেল অষ্ট্রিয়ার কুল্যাণ্ড জেলায় হাইনজেনড্রফ গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার সামান্য সম্পত্তি ছিল, জমিদারের ক্ষেত চাষ করে দিন কাটতো। ছোট বয়সেই মেণ্ডেল গ্রামের স্কুলে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর প্রতিভা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ধরা পড়েছিল। গ্রামের দুই বন্ধুর কাছে লিপনিক সহরের এক স্কুলের গল্প শুনে তাঁর সেখানে ভর্তি হবার ভীষণ বাসনা হলো। মা-বাবাকে রাজী করিয়ে মাত্র এগারো বছর বয়সে লিপনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে তিনি পড়াশুনায় এত সুনাম অর্জন করলেন যে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে তাঁর আগ্রহ বেড়ে গেল। অথচ পিতার আর্থিক অবস্থা এমন কিছু ভাল ছিল না যে, পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। মেণ্ডেল তখন তাঁর ছোট বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে Olmütz Philosophical Institute-এ ভর্তি হলেন। সেখানে দু-বছর পড়াশুনা করে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেল সেণ্ট টমাস মঠের অধীনে এক স্কুলে অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই মঠে ঢুকেই তিনি 'গ্রেগর নাম গ্রহণ করেন। স্কুলে তাঁকে গ্রীক ও গণিত পড়াতে হতো। কিন্তু শিক্ষকতায় প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকায় মেণ্ডেলকে স্থায়ী শিক্ষকের পদ দেওয়া হলো না। কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্বাস দিলেন—তিনি যদি টিচার্স লাইসেন্সিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাহলে তাঁকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হবে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি লাইসেন্সিয়েট পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক ট্রেনিং নেবার জন্যে পাঠালেন। সেখানে তিনি দু'বছর (১৮৫২-৫৩) থেকে গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে ব্রুণের এক টেক্‌নিক্যাল হাইস্কুলে বদ্‌লি (Substitute) শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। স্থায়ী শিক্ষকের পদে প্রমোশন পাবার জন্যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডেল আর একবার লাইসেন্সিয়েট পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু সেবারেও তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। তিনি আর ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্যে চেষ্টা করেন নি। তারপর থেকে যতদিন তিনি শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন বদ্‌লি শিক্ষক হিসাবেই কাজ করেছিলেন।

মেণ্ডেলের নিকট শিক্ষকতার জীবনই সবচেয়ে সুখকর হয়েছিল। ছাত্রদের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন—তাদের মনে পড়াশুনার উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতেন। দুর্বোধ্যকে সহজ ও সরল করে বলবার ও বুঝাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ছাত্রদের ঘরে ডেকে তাঁর অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আর তাঁর পোষা পশুপক্ষী, মৌমাছি ও সখের গাছপালাও আগ্রহের সঙ্গে দেখাতেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ওই বছরেই তিনি ব্রুণ মঠের প্রধান পুরোহিত হিসাবে নির্বাচিত হন।

ছোট বেলা থেকে মেণ্ডেলের গাছপালার প্রতি আগ্রহ ছিল অসীম। পিতার নিকট গাছের কলম করবার পদ্ধতি শিখেছিলেন। মঠের সংলগ্ন এক-টুক্‌রা জমিতে তাঁর ছোট একটা বাগান ছিল। সেখানে তিনি বিভিন্ন ধরণের ফল-ফুলের গাছ নিয়ে এসে লাগাতেন। এই বাগানেই তিনি মটর গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বংশধারা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছিলেন। মেণ্ডেলের সংগ্রহ করা চৌত্রিশ প্রকার মটর গছের মধ্যে কোনটা ছিল লম্বা, কোনটা ছিল বেঁটে, কোন গাছের বীজের খোসা ছিল মসৃণ আবার কোনটার ছিল কোঁচকানো। মেণ্ডেল দেখলেন—লম্বা গাছের বীজ থেকে লম্বা গাছ, আর বেঁটে গাছের বীজ থেকে বেঁটে গাছ জন্মায়। যে

গাছের বীজের রং হলদে, সেগুলি থেকে উৎপন্ন গাছের বীজের রং-ও হলদে। তখন তিনি যে গাছে হলদে রঙের বীজ হয় এবং যে গাছে সবুজ রঙের বীজ হয়—এই রকম দুই জাতের গাছের মধ্যে মিলন (Crossing) ঘটিয়ে বর্ণসঙ্কর (Hybrid) গাছের সৃষ্টি করলেন। মজার ব্যাপার দেখা গেল—এই সব সঙ্কর গাছের বীজের রং হলদে রয়েছে, সবুজ রঙের বীজ কোন গাছেই নেই। সেই সঙ্কর গাছের বীজ পরের বছর লাগিয়ে সব গাছের বীজের রং কিন্তু আর আগের মত একরকম হতে দেখা গেল না। তিন ভাগ গাছে হলদে রঙের বীজ আর বাকী একভাগ গাছে সবুজ রঙের বীজ পাওয়া গেল। মটর গাছের বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ে (Generation) এই রকম গাণিতিক নিয়মে যে আত্মপ্রকাশ করে, মেণ্ডেলের চোখে তা প্রথম ধরা পড়লো। তাঁর আগে অনেকেই বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে সঙ্কর গাছ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এক সঙ্গে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করবার ফলে বংশধারার সাধারণ গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু মেণ্ডেল একটি বা দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং সঙ্কর গাছ থেকে উৎপন্ন প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে পরীক্ষা করে বংশধারার সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

কিছুদিন তিনি বিভিন্ন জাতের রাণী-মৌমাছি সংগ্রহ করে মৌমাছির উপর গবেষণা করেছিলেন। বিভিন্ন জাতের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে মৌমাছির বৈশিষ্ট্যের বংশধারাও লক্ষ্য করেছিলেন—তবে সেই গবেষণার ফলাফল জানা যায় নি।

মঠের প্রধান পুরোহিত হবার পর থেকে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি ভালভাবে আর নজর দিতে পারেন নি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া সরকার এক আইন প্রণয়ন করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর করধার্যের ব্যবস্থা করেন। মেণ্ডেল এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেন তাঁকে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বশীভূত করবার চেষ্টা করা হলো; কিন্তু কিছুতেই তিনি নিজের মত ছাড়লেন না। সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্যে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্ব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্রুণ ন্যাচারাল সায়েন্স সোসাইটির সভায় প্রথম জানা যায় এবং পরবর্তী বছরে সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর ফলাফল প্রকাশিত হয়; কিন্তু যে সংখ্যায় সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, কালক্রমে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। আজও ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, কি করে এরূপ একটা মূল্যবান আবিষ্কার ৩৪ বছর ধরে জীববিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল! ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক লাইব্রেরীতে ব্রুণ সোসাইটির কার্যবিবরণী রাখা হতো, কিন্তু মেণ্ডেলের প্রবন্ধের উপর কারুর দৃষ্টি পড়ে নি। মেণ্ডেল যে সময় তাঁর আবিষ্কারের কথা ব্রুণ সোসাইটিতে প্রকাশ করেন, তার ঠিক ছ' বছর আগে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে চার্লস ডারুইন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'The Origin of Species' প্রকাশ করেছিলেন। জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে তখন ডারুইনের বিবর্তনবাদ প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইন মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তাঁর লাইব্রেরীতে মেণ্ডেলের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রও খুঁজে পাওয়া যায় নি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ডারুইনের 'Animals and Plants' নামক পুস্তকেও মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্বের কোন উল্লেখ দেখা যায় নি। মেণ্ডেল তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল তৎকালীন মিউনিকের বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী প্রোফেসর কার্ল নাগেলীকে (Carl Nageli) চিঠিপত্রের মাধ্যমে সবই জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাগেলী তাঁর কাজের বিশেষ মূল্য দেন নি। বংশধারা-তত্ত্ব পুনঃপরীক্ষার জন্যে তিনি মেণ্ডেলকে কিছু মটর বীজ পাঠাতে লিখেছিলেন। মেণ্ডেল ১৪০ প্যাকেট

মটর বীজ পাঠিয়েছিলেন এবং পরীক্ষা-পদ্ধতিও বিশদভাবে জানিয়েছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নাগেলী সেই বীজ জমিতে লাগিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ফলাফল কিছুই জানা যায় নি। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেণ্ডেল ও নাগেলীর মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল। নাগেলী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বংশধারার উপর এক পুস্তক লিখেছিলেন, কিন্তু সেই পুস্তকে তিনি মেণ্ডেলের গবেষণার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ফ'কে (Focke) বর্ণসঙ্কর উদ্ভিদের বিষয়ে এক গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেন। এই পুস্তকে মেণ্ডেলের গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থপঞ্জী থেকে তিনজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্বের আবিষ্কারের কথা প্রথম জানতে পারেন। এই তিনজন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর মধ্যে হল্যাণ্ডের হুগো ডি ভ্রিস (Hugo de Vries) পরিব্যক্তির (Mutation) উদ্ভাবক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Oenothera lamarckiana ও Oe. brevistylis-এর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে সঙ্কর উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সঙ্কর উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি মেণ্ডেলের গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী আলাদা হতে দেখতে পেলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি Reports of the German Botanical Society-তে মেণ্ডেলের কাজের সঙ্গে নিজের কাজের মিল দেখিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সময় জার্মেনীর কার্ল কোরেন্স (Carl Correns) ভুট্টা ও মটর গাছের উপর কাজ করছিলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে মেণ্ডেলের কাজের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ওই বছরে (অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে) মে মাসে তিনিও German Botanical Society-র পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পাঠান। ঠিক সেই সময় ভিয়েনায় এরিক ফন্ স্কারম্যাক (Erich von Tschermak) বিভিন্ন মটর গাছের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে হল্‌দে ও সবুজ রঙের বীজ এবং মসৃণ ও কোঁচকানো খোসার বীজের মধ্যে ৩ : ১ অনুপাতে বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ে আলাদা হতে দেখতে পেলেন। মটর গাছের উপর দু'বছর কাজ করে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এক থিসিস রচনা করেন। ইতিমধ্যে যখন ডি ভ্রিস ও কোরেন্সের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, তিনিও তাঁর কাজের অগ্রগণ্যতা লাভের জন্যে তাড়াতাড়ি তাঁর গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফলাফল একই বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় জুন সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই তিনজন বিজ্ঞানী আলাদাভাবে কাজ করে প্রায় একই সঙ্গে মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্বের সাধারণ সূত্র পুনরায় আবিষ্কার করেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডের জীববিজ্ঞানীরা তখনও পর্যন্ত মেণ্ডেলের আবিষ্কারের কথা জানতে পারেন নি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংল্যাণ্ডে গাছপালা ও পশুপক্ষীর বৈশিষ্ট্যের বংশধারা নিয়ে গবেষণা চলছিল। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে, পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় প্রকাশ পায় এবং বংশগতির সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণের গাঢ়ত্ব কমতে থাকে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই ইংল্যাণ্ডে রয়েল হর্টিকালচার্যাল সোসাইটি এক সভার আয়োজন করেন। পৃথিবীর বিখ্যাত উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানীরা সেই সভায় যোগদান করেন। সেখানে বেট্‌সন, মিস স্যাণ্ডারস্, হার্ষ্ট প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বংশধারা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁরা জানালেন, সন্তান-সন্ততির মধ্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যের যে মিশ্রণ আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়, তা পাকাপাকিভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়ে না। পরবর্তী পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যগুলি আবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রয়েল হর্টিকালচার্যাল সোসাইটির এক অধিবেশনে বেট্‌সন বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। ট্রেনে যাবার পথে তিনি

Reports of the German Botanical Society-তে প্রকাশিত ডি ভ্রিসের প্রবন্ধটি পাঠ করে মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্বের সাধারণ সূত্রের কথা জানতে পারেন। সেই আবিষ্কারের কথা সোসাইটির সভায় তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। সোসাইটির সেক্রেটারী অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে মেণ্ডেলের মূল প্রবন্ধটি সংগ্রহ করে তার ইংরেজী অনুবাদ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রয়েল হর্টিকালচার্যাল সোসাইটির পত্রিকার প্রথম প্রকাশ করেন। এই প্রথম মেণ্ডেলের কার্যাবলী বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত ও সমাদৃত হলো।

মেণ্ডেলের বংশধারার সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের পূর্বে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে বংশগত প্রভাবের কথা কেউই অস্বীকার করতেন না। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলি পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশ-পরম্পরায় কি ভাবে প্রতিফলিত হয়, সে সম্বন্ধে তেমন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। বংশধারার উপর মেণ্ডেল যে নতুন আলোকসম্পাত করেছিলেন, তার ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখা গেল। বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা জন্ম নিল—নাম হলো তার বংশধারা-তত্ত্ব বা প্রজননতত্ত্ব (Genetics)। মেণ্ডেলের সূত্র পুনরাবিষ্কৃত হবার পর থেকে বংশধারা সম্বন্ধে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ পেতে লাগলো ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বংশধারা-তত্ত্বের প্রয়োগ হতে দেখা গেল। তাঁর প্রদত্ত সূত্র শুধু গাছপালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—পশুপক্ষী, এমন কি মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক ধারার মধ্যেও তা লক্ষ্য করা গেল। বিভিন্ন জাতের গাছপালা ও বিভিন্ন জাতের পশুপক্ষীর সংমিশ্রণে উন্নত জাতের গাছপালা ও পশুপক্ষী সৃষ্টি করা সম্ভব হলো। মানুষ তাঁর নিজের কল্যাণের জন্যে বংশধারা-তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করলো। দুরারোগ্য বংশগত রোগের কারণ নির্ণয় ও তার প্রতিকারে ও নতুন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা দেখা গেল। এক-শ' বছর আগে ব্রুণের (এখন নাম হয়েছে ব্রুণো) স্কুল বাড়ীতে ব্রুণ মঠের এক সন্ন্যাসী মটর গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বংশধারা সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, তার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করলো। আজ সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের শতবর্ষপূর্তিতে প্রজনন-তত্ত্ববিদেরা প্রজনন-বিজ্ঞানের জনক গ্রেগর জন মেণ্ডেলকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

সাইক্লোট্রন

দেবীপ্রসাদ সরকার

সাইক্লোট্রন (Cyclotron) হচ্ছে নিউক্লীয় যন্ত্রমন্দিরের একটি কণাত্বরয়ক যন্ত্র। বস্তুকণাকে অদ্ভুত কৌশলে ক্রমশঃ ত্বরণসম্পন্ন করে তোলাই এই যন্ত্রের প্রধান কাজ। ...

ভূমিকা

পরমাণুগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর তো বটেই—এমন কি, মানুষের তৈরী সূক্ষ্ম যন্ত্রাদিতেও তাদের হদিশ পাওয়া যায় না। এই গহন জগতের খোঁজখবর নেবার জন্যে পদার্থবিদ্‌গণ তাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা, ইলেকট্রন প্রভৃতিকে গুপ্তচর নিয়োগ করেন। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে এই গুপ্তচর-গুলিকে পাঠানো হয় পরমাণু-সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে। যতটা শক্তি বিজ্ঞানী প্রয়োগ করতে পারেন, তাঁর অভিযান সেই অনুপাতে সফল হয়। জড়কণাগুলি বিশ্বস্ত অনুচরের মত পরমাণুর ঘরের খবর, কেন্দ্রীনের খবর প্রভৃতি বয়ে নিয়ে এসে বিজ্ঞানীর অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত করে। এভাবে যে উপাত্ত সংগৃহীত হয়, তার বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনের পথে এগিয়ে যান।

পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার অন্যতম সমস্যা হলো, এই সব জড়কণাগুলিকে কেমন করে প্রচণ্ড শক্তিমান করা যায়। জড়কণাকে ত্বরান্বিত বা ত্বরণসম্পন্ন করা হলে তার "শক্তি" (Energy) বেড়ে যায়; কাজেই বিভিন্ন গবেষণাগারে কণাত্বরয়ক (Particle Accelerator) যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই যন্ত্রগুলিতে তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে কণাকে শক্তিমান করা হয় আর চৌম্বক শক্তি প্রয়োগ করে এর বিস্তৃত গতিপথকে স্বল্প স্থানে আবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

সাইক্লোট্রন এমনি একটি কণাত্বরয়ক যন্ত্র। ১৯৩২ সালে অধ্যাপক লরেন্স (E. O. Lawrence) এটি প্রথম উদ্ভাবন করেন। পরে এর বহু বাহ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সাইক্লোট্রন কেমন দেখতে?

সাইক্লোট্রনের চেহারা দেখলে ভয় পেতে হয়। বিরাট চুম্বকটি দেখে মনে হবে যেন কোন অতিকায় দানব মুখ হাঁ করে রয়েছে, আর তার দুই চোয়ালের মধ্যে একটা ধাতব বাক্স বসানো। ঐ ধাতব বাক্সটি হচ্ছে কণাত্বরণের কারাগারবিশেষ। বাক্সটির মধ্যে কণাগুলিকে প্রবল বেগে সর্পিল পথে ঘুরতে হয়। কারাগার প্রায় বায়ুশূন্য। কণাগুলির গতিপথে নতুন সঙ্গী প্রায় মেলেই না—কদাচিৎ দু-একটা অণু-পরমাণুর সাক্ষাৎ হয়তো বা পাওয়া যায়—তাও ক্ষণিকের জন্যে।

কারাগারের গঠনপ্রণালীও কত বিচিত্র! দুটি অর্ধবৃত্তাকার ধাতব বাক্স মুখোমুখি বসানো রয়েছে এর ভিতরে—দেখতে D এর মত বলে এগুলিকে বলে 'ডী' (চিত্র-১ এবং চিত্র-২)। এই ডী দুটির সরল কিনারাগুলি সামান্য ব্যবধানে পরস্পর সমান্তরালভাবে রয়েছে। ডী দুটির এই ফাঁকের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি আয়ন উৎস ('O' চিত্র-২), যা থেকে আয়ন অর্থাৎ অনাবৃত বা অর্ধাবৃত কেন্দ্রীন স্বল্প শক্তি নিয়ে নির্গত হতে পারে। ডী দুটি একটি বেতার-কম্পনশীল স্পন্দকের (Radio-frequency Oscillator) তড়িৎ-মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত এবং অনেকটা পজিটিভ, নেগেটিভের মত। ডী দুটির মধ্যে ধ্রুব-কম্পাঙ্কের পরিবর্তী তড়িৎ-ক্ষেত্র (Alternating electric field) সঞ্চার করা হয়।

ফলে তড়িৎ-ক্ষেত্রটির অভিমুখ ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে এবং বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে চলে। সাইক্লোট্রনের ঘূর্ণ্যমান কণাগুলির আবর্তনকালের সঙ্গে এই পর্যায়কালকে সমলয়যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাব কিন্তু ডী দুটির অভ্যন্তরে অর্থাৎ প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বাইরের বাক্স সমেত যন্ত্রটিকে একটি বিরাট চুম্বকের সুমেরু ও কুমেরুর মধ্যবর্তী স্থানে বসানো হয় (চিত্র-৩)। চৌম্বক মেরু দুটি বাক্সটির পরিধি থেকে একটু বেশী বিস্তৃত, আর এমনভাবে তৈরী যেন ডী দুটি মোটামুটি সর্বত্র সমবলযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রে (Uniform magnetic field) অবস্থান করতে পারে।

১নং চিত্র। সাইক্লোট্রনের একটি ডী দেখানো হয়েছে

কণাত্বরণের রহস্য

আয়ন উৎস থেকে কণাগুলি বেরিয়ে আসে—সেখানকার প্রচণ্ড উত্তাপ আর শক্তির তাড়নায় কি আর স্থির থাকবার উপায় আছে! আবার যেমনি ডী দুটির ফাঁকে (A বিন্দুতে) এসে পড়া, অমনি কণাটি হয়তো ডানদিক থেকে একটা ধাক্কা অনুভব করলো—সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-দিক থেকে আবার একটা টান—ধাক্কা আর টানের ফলে কণাগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মত বাঁ-দিকের ডী-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো (চিত্র-২)। সেখানেও স্বাধীনভাবে চলবার উপায় নেই। এখানে তড়িৎ-ক্ষেত্রের ধাক্কা আর টান নেই বটে, কিন্তু চুম্বকের প্রবল চুম্বন কণাগুলিকে একটি অর্ধবৃত্তে ঘুরিয়ে আবার ডী'র ফাঁকে (B বিন্দুতে) এনে দেবে। বিজ্ঞানী তড়িৎ-ক্ষেত্রের যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে এইবার বাঁ-দিক থেকে ধাক্কা আর ডানদিক থেকে টান লাগবে (কেন না, সমলয়ের গুণে কণাগুলি আধপাক ঘুরে আসতেই তড়িৎ-ক্ষেত্রেরও দিক পরিবর্তন হয়েছে ঠিক ঐ সময়েই)। এই হঠাৎ টানে

কণাগুলি আর তাল সামলাতে না পেরে সামান্য একটু বাইরে ছিট্‌কে যাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গতিবেগ যাবে বেড়ে। সেই সঙ্গে শক্তিও বাড়বে, কাজেই চুম্বক আর তাকে আগের মত ছোট বৃত্তপথে ধরে রাখতে পারবে না। এই বড় ব্যাসার্ধের পথে (BCD বৃত্তচাপে) ঘুরে আবার যখন ডী-র ফাঁকে (D-বিন্দুতে) এসে উপস্থিত হবে, তখনো অমনি ধাক্কা আর টানের এই যে নিয়ন্ত্রিত গতিপথ, তা কণাগুলির পক্ষে কিন্তু বড়ই বিভীষিকাময়। কণাগুলি তো আর নিজেদের গতিশীল বলে বুঝতে পারে না, কাজেই ডী দুটির মাঝে পড়ে তারা কেবল একটা আচমকা ঝাঁকুনি খায়, আর ভাবে বোধ হয় তাদের উপর কোনও অদৃশ্য শক্তি ক্রিয়া করলো। ঠিক সেই সময়ে কারাগারের দেয়ালের দিকে তাকালে তারা দেখবে, দেয়ালটা তাদের চারদিকে

২নং চিত্র। সাইক্লোট্রন কক্ষের নক্সা চিত্র।
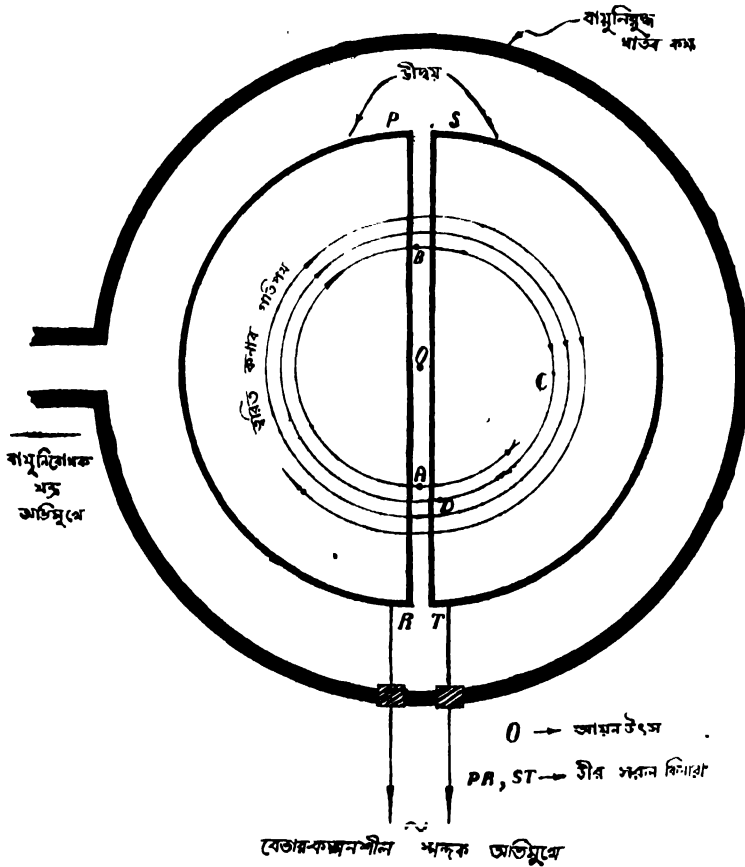
ফলে গতিপথের ব্যাসার্ধ আরও বেড়ে যাবে। এমনিভাবে কণাটি ক্রমশঃ ঘুরপাক খেতে খেতে একটি সর্পিল পথে অগ্রসর হয়ে আসবে ডী-প্রকোষ্ঠের দেয়ালের দিকে।

কারাগারের কেন্দ্র 'O' থেকে দেয়াল অবধি ঘুরছে। কিন্তু সে নিমেষ মাত্র! সহসা আর একটা ঝাঁকুনি—আর সেই সঙ্গে দেয়ালটা যেন তাদের দিকে কিছুটা এগিয়ে এলো। আবার সেই ঘূর্ণ্যমান দেয়াল, সেই ঝাঁকুনি, আবার দেয়ালের সেই এগিয়ে আসা। পলকে পলকে

কণাগুলি ঝাঁকুনি খাচ্ছে আর দেখছে যে, দেয়ালটা কেমন ভয়াবহভাবে কাছে এসে পড়েছে! হয়তো এরই মধ্যে গোটাকতক সঙ্গীসাথীকে তারা হারিয়েছে—কোথা থেকে উল্কার মত মাঝে মাঝে বিদেশী কণা এসে উদয় হয়, সেগুলির প্রচণ্ড আঘাতে তাদের প্রতিবেশী কণাগুলি যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করে গেল, তারা তা ঠাওর করতে পারে না। তারা ভাবে এটাই বোধ হয় তাদের মৃত্যু! তাদেরও মৃত্যু হয়তো ঘনিয়ে এলো। কারাগারের দেয়ালটা বিরাট পর্বতের মত এগিয়ে এসেছে—সেখানে তাদেরই মত বহু কণা-কণিকা রয়েছে দেখা গেল। এরপর সব শেষ—হঠাৎ কোথায় কি হয়ে গেল, হুড়মুড় করে কারা এসে আঘাত করলো, কত বিস্ফোরণ হলো, অগ্নিবৃষ্টি হলো, কণাগুলি নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললো।

কণাগুলি অচেতন না হলে তাদের এমনি অভিজ্ঞতা হতো। কিন্তু পরম নিরাসক্ত বিজ্ঞানী এই কণাগুলির জীবন-মৃত্যুর কথা একটুও ভাবেন না, বরং তাদের ধ্বংসে (অর্থাৎ রূপান্তরে) তিনি আনন্দে উল্লসিত হন—তাঁর ডমরু বেজে ওঠে, কেন না, তাঁর সাধনা সফল হতে চলেছে।

তাই অবিচলিত চিত্তে তিনি তাঁর যন্ত্র চালিয়ে যান। বাইরে থেকে তিনি দিব্যচক্ষে দেখেন যে, একগুচ্ছ কণা ঐ ডী-প্রকোষ্ঠ দুটির মধ্যে সর্পিল গতিতে ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ডী-এর দেয়ালের দিকে—তারা নির্দিষ্ট সময় পর পর ত্বরান্বিত হচ্ছে, তাদের শক্তি যাচ্ছে বেড়ে—কখনো কখনো ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল অণু-পরমাণুর সঙ্গে সংঘাত হওয়ায় কিছু কিছু কণা গতিপথ থেকে বিচ্যুতও হচ্ছে। ডী-এর দেয়ালের কাছে বিজ্ঞানী হয়তো পরীক্ষাধীন
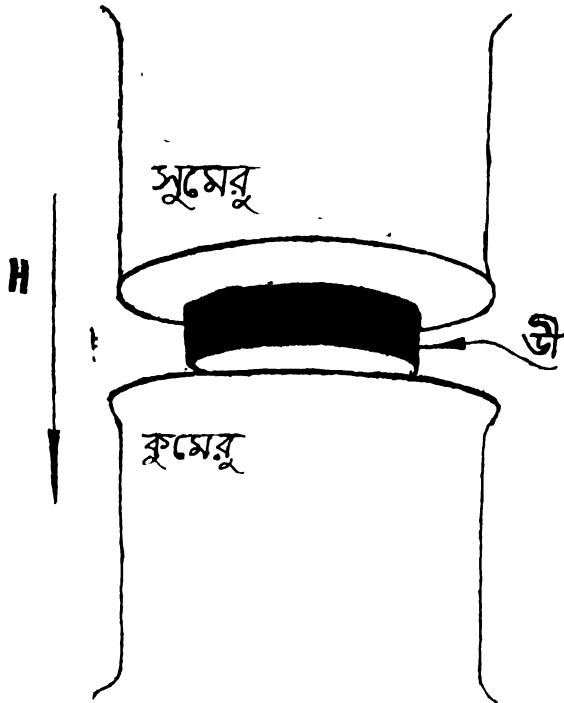
৩নং চিত্র। সাইক্লোট্রনের চুম্বক ও ডী-র অবস্থান।

বস্তুর একটি খণ্ড রেখে দিয়েছিলেন। ত্বরান্বিত কণাগুলি শেষ পাকে গিয়ে ঐ খণ্ডটিকে অর্থাৎ নিশানায় (Target) আঘাত করবে—সেখানে সংঘর্ষের ফলে যে কাণ্ডকারখানা ঘটবে, বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন নিউক্লীয় বিক্রিয়া (Nuclear Reaction)। এই নিউক্লীয় বিক্রিয়ার আদি, মধ্য ও অন্তফল কি, জানবার জন্যেই তো বিজ্ঞানীর এই মহাযজ্ঞের আয়োজন।

সাইক্লোট্রনের আনুষঙ্গিক অংশ

রূপকের ভাষায় সাইক্লোট্রনকে দানবের সঙ্গে তুলনা করেছি। বাস্তবিক পক্ষেই তা অতিকায়। কেন না, কেবল দু-টুকরা চুম্বক আর মধ্যে একটি বাক্স বসিয়েই তো সাইক্লোট্রন হয় না! চৌম্বক ক্ষেত্র চালাবার জন্যে প্রচণ্ড তড়িৎ-প্রবাহের প্রয়োজন, সেই তড়িৎ-প্রবাহকে আবার নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়। ডী-দুটির মধ্যে যে তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তার জন্যে উভয়ের মধ্যে উচ্চ তড়িৎ-বিভব সৃষ্টি করতে হয়। কিছুদূরে স্পন্দকের (Oscillator) সাহায্যে বেতার-কম্পনশীল তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় এবং তা সংযোগ-নালী (Transmission lines) দিয়ে নিয়ে এসে ডী-তে আরোপ করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রস্থলের আয়ন-উৎসটিরও বেশ তদারক করতে হয়। এছাড়া বায়ুনিরোধের (Vacuum) বিস্তৃত ব্যবস্থায় গবেষণাগৃহের একাংশ পূর্ণ হয়ে থাকে। আবার সাইক্লোট্রনের আয়নস্রোতকে তার ঘূর্ণী থেকে মুক্ত করে তবে নিশানায় আঘাত করাতে হয়। এসবের জন্যেও বহু কারুকৌশলের প্রয়োজন হয়। তার উপর এই যন্ত্রদানবকে আবরণে ঢেকে না রাখলে বিজ্ঞানীরই প্রাণ-সংশয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কোন কণা যে কোন পদার্থকে আঘাত করলেই বহু নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটবে। এই বিক্রিয়ার ফলে সাধারণতঃ নিউট্রন এবং গামারশ্মি নির্গত হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রীন থেকে আবার বিটারশ্মিও নির্গত হয়। এই ধরণের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও রশ্মির প্রবল বর্ষণে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এজন্যে সাইক্লোট্রনের চারদিকে বিরাট বিরাট আবরক প্রাচীর দিয়ে দেওয়া হয় এবং সাইক্লোট্রন পরিচালক দূরে বসে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

সাইক্লোট্রনঘটিত গবেষণা

কোনও বস্তুখণ্ডকে তড়িদাহিত বেগবান কণা দিয়ে আঘাত করাকে বলে অভিবেধ (Bombardment)। এই অভিবেধ প্রক্রিয়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পরীক্ষাধীন বস্তুটির বহু কেন্দ্রীনের গঠনপ্রকৃতি পাল্টে যায়। ফলে এক বস্তুর কেন্দ্রীন রূপান্তরিত হয়ে অন্য বস্তুতে পরিণত হয়। একে বলে Transmutation বা মৌলান্তরীকরণ। কোনও মৌলকে অভিবিদ্ধ করে তার আইসোটোপ উৎপন্ন করা চলে। আইসোটোপ হচ্ছে সেই সব পদার্থ, যাদের পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা একই, কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা বিভিন্ন।

রাসায়নিক শ্রেণীবিভাগে কোনও মৌলের কেন্দ্রীনগুলিতে প্রোটন সংখ্যা (অর্থাৎ পরমাণুক্রমাঙ্ক নির্দিষ্ট। যেমন—২০টি প্রোটনবিশিষ্ট কেন্দ্রীন রয়েছে যে বস্তুতে, তাকে আমরা বলি ক্যালসিয়াম, কিন্তু যার প্রোটন-সংখ্যা ৮, তাকে বলি অক্সিজেন। ক্যালসিয়াম (Ca) আর অক্সিজেনে (O) বহু প্রভেদ। কিন্তু ৮টি প্রোটন বিশিষ্ট কেন্দ্রীনে নিউট্রন ৮টিও থাকতে পারে আবার ১০টিও থাকতে পারে। নিউট্রন-সংখ্যার বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ৮টি নিউট্রনযুক্ত অক্সিজেনে মোট কণা ১৬টি, তাই একে বলে $_{৮}O^{১৬}$, আর ১০টি নিউট্রনের বেলায় একে বলে $_{৮}O^{১৮}$। বস্তুতঃ $_{৮}O^{১৬}$ এবং $_{৮}O^{১৮}$—এর মধ্যে রাসায়নিক কোনও তফাৎ নেই। এগুলিকে বলে আইসোটোপ। $_{৮}O^{১৭}$ ও অক্সিজেনের আর একটি আইসোটাপ। এই ধরণের আইসোটোপ

নিয়ে পরীক্ষা করা নিউক্লীয় বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই আইসোটোপগুলি কার্যতঃ প্রয়োগ করাও হয়েছে বহু ক্ষেত্রে; যেমন—রোগ নির্ণয়ে ও রোগ আরোগ্যে এবং নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদনে।

এছাড়া নিউক্লীয় বিজ্ঞানের বিবিধ গবেষণাকার্যে, যথা—নিউক্লীয় বিক্রিয়া ও বিক্ষেপণ (Nuclear Reaction and Scattering), নিউক্লীয় শক্তি-মাত্রার (Nuclear Energy level) গঠন ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতিতে সাইক্লোট্রনের ব্যবহার হয়েছে। অনেক সময় নিউট্রনের উৎস হিসাবে এবং বিকিরণের স্বাস্থ্যহানিকর প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্যেও এর ব্যবহার হয়েছে। তবে সাইক্লোট্রনে সাধারণতঃ ভারী কণাকেই ত্বরান্বিত করা চলে; লঘু কণা যথা—ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করা চলে না। আবার ভারী কণাকেও কেবল নন-আপেক্ষিকীয় শক্তি (Non-relativistic energy) পর্যন্তই ত্বরান্বিত করা চলে। ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করবার যন্ত্র হচ্ছে বিটাট্রন (Betatron), ইলেকট্রন সিনক্রোট্রন (Electron-synchrotron প্রভৃতি)। সিনক্রো-সাইক্লোট্রন যন্ত্রে (Synchrocyclotron) আপেক্ষিকীয় শক্তি পর্যন্ত কণাকে ত্বরান্বিত করা যায়, কিন্তু প্রচলিত সাইক্লোট্রনের সঙ্গে এর অনেক বৈসাদৃশ্যও আছে।

জীব ও তার পরিবেশ

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

জীবজগৎ একটা বিশেষ পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। সমগ্র পৃথিবীতে সেই পরিবেশের রূপটা মোটামুটি একই রকম হলেও স্থান এবং কালভেদে পরিবেশের মধ্যে সাম্য ও চরমতা দৃষ্ট হয়। সৃষ্টির আদি থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপাদানগুলির মধ্যে বস্তুগত ও পরিমাণগত পার্থক্য সাধিত হয়েছে। মৃত্তিকার উপাদানের প্রকৃতি এবং মৃত্তিকানিবদ্ধ জলের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়েছে। আদিম সৃষ্ট জীব আশ্রয় লাভ করেছিল সম্পূর্ণ জলীয় মাধ্যমে। পরবর্তী যুগে তাদের বহু জাতি-প্রজাতি জলের আশ্রয় ত্যাগ করে কঠিন মৃত্তিকার আশ্রয়ে এবং বায়বীয় মাধ্যমে স্থানলাভ করেছে। এই পরিবেশের মধ্যে মাঝে মাঝে বিপ্লব এনেছে তুষারযুগের চরম শৈত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন তাপমণ্ডলীয় এবং বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশে জীবকে জীবনযুদ্ধের জন্যে বিভিন্ন হাতিয়ার অনুসন্ধান করতে হয়েছে। একদিকে মেরুঅঞ্চলের চরম শৈত্য, মরু অঞ্চলের চরম উষ্ণতা ও রসদৈন্য এবং পার্বত্য ভূমির নিষ্ঠুর কাঠিন্য, অন্যদিকে মৌসুমী অঞ্চলের অজস্র রসদাক্ষিণ্য ও নদীমাতৃক দেশের অকৃপণ পালনিক ঔদার্য—সব কিছুই জীব সহজ ভাবে স্বীকার করে নিয়ে তার মধ্যে বাঁচবার পথ খুঁজে নিয়েছে।

অবশ্য প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রামে কখনও জীবের কোন কোন জাতি বা প্রজাতিকে মেনে নিতে হয়েছে চরম অবলুপ্তি। কিন্তু দেখা যায়, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফলে প্রায়ঃশই সে জয়ী হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীতে জীব-জগৎ বেঁচে আছে এবং বেঁচেও থাকবে, যতদিন না ক্রমাগত তাপমোক্ষণের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীতে নেমে আসে মৃত্যুর হিমশীতলতা।

জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন। জীব সর্বদাই পরিবেশের

সুযোগগুলি গ্রহণ করবার এবং অসুবিধাগুলি বর্জন করবার চেষ্টা করছে। এখন আমাদের বুঝে দেখতে হবে, এই পরিবেশের স্বরূপ কি এবং পরিবেশের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি, অর্থাৎ কিরূপ জৈব ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিবেশের মধ্যে জীব বাঁচবার পথ খুঁজে নিচ্ছে?

জীবের পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে চারটি প্রধান উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মৃত্তিকা বা ভূমি—যার উপর অধিকাংশ জীব দাঁড়িয়ে আছে; দ্বিতীয়তঃ জীবের মাধ্যম, অর্থাৎ জল বা বায়ুমণ্ডল, যার মধ্যে জীবজগৎ অবগাহন করে আছে; তৃতীয়তঃ ও চতুর্থতঃ উপাদান দুটি হলো আলোক ও উত্তাপ, যা জীবজগৎ তার পরিবেশ থেকে গ্রহণ করছে বা পরিবেশের মধ্যে বর্জন করছে।

জীবসৃষ্টির আদিযুগে পৃথিবীতে স্থলভাগের পরিমাণ যেমন অত্যল্প ছিল, তেমনই তার তীব্র উত্তাপ ও কঠিন শিলাময় প্রকৃতি জীবসৃষ্টির সহায়ক ছিল না। তাই আদি জীব স্থলভাগে আশ্রয় না পেয়ে সমুদ্র ও অন্যান্য বিস্তৃত জলরাশির মধ্যেই স্থান লাভ করেছিল। ঠিক কোন্ সময়ে স্থলভাগে জীবের আশ্রয়লাভ সম্ভব হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়, কেবল সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, কালক্রমে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কঠিন শিলা ক্ষয় পেয়ে শিথিলসংবদ্ধতা, কোমলতা ও জল ধারণ ক্ষমতা লাভ করলো এবং তার ফলে মৃত্তিকার তাপ পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পেলো এবং এইভাবে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের তীব্রতা ভূত্বকের উপরের স্তরে এসে অপেক্ষাকৃত সাম্য লাভ করলো। এদিকে তাপমোক্ষণের ফলে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপও হ্রাসপ্রাপ্ত হলো। এই রূপে ভূত্বকের উষ্ণতা ও অন্যান্য পরিবেশ যখন জীবনধারণের পক্ষে সহনীয় হয়ে এলো, তখনই স্থলভাগে জীবের আশ্রয় লাভ সম্ভব হলো। অবশ্য স্থলভূমিতে যে জলভাগ থেকে পৃথক করে জীবসৃষ্টি হয়েছিল, তা মনে করবার কারণ নেই। জীব-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি একবারই হয়েছিল এবং তা হয়েছিল সামুদ্রিক পরিবেশে—তারপর সমুদ্র থেকে অগভীর জলাভূমিতে এবং সেখান থেকে জল সন্নিহিত আর্দ্র স্থলভাগে। এই ভাবে জলচর জীব ধীরে ধীরে জল ছেড়ে কঠিন ভূভাগে আশ্রয় গ্রহণ করলো। অবশ্য ব্যাপারটা যতই সহজ মনে হোক না কেন, আশ্রয় পরিবর্তনের এই ইতিহাস অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী—এর সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু বলা যায় না। আবার এমনও দেখা গেছে, সৃষ্টির পরবর্তী যুগে কোন কোন স্থলচর প্রাণী সম্পূর্ণরূপে জলচর হয়ে জলে ফিরে গেছে—এর উদাহরণ সীল ও তিমি। আবার ব্যাঙের মত উভচর প্রাণীও কয়েকটি দেখা যায়।

জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, সৃষ্টির আদিম যুগে প্রথম যে জীব সৃষ্টি হয়েছিল তারা এককোষী, এদের প্রোটোজোয়া বা আদ্যজীব বলা হয়। একটি মাত্র কোষের সাহায্যেই তাদের আহার গ্রহণ, বিচরণ ও বংশবিস্তার ইত্যাদি সবই করতে হতো। আজও এদের প্রতিনিধিরূপে বেঁচে আছে অ্যামিবা নামক আদ্যপ্রাণী। আমরা এখন দেখছি, জীবজগৎ দুটি বৃহত্তর অংশে বিভক্ত—উদ্ভিদ ও প্রাণী; কিন্তু আদিতে এই পার্থক্য ছিল না। ক্রমবিকাশের কোন একটি স্তরে জীবজগৎ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আদ্যজীবের কতকগুলির দেহে ক্লোরোফিল বা সবুজ কণার সৃষ্টি হলো এবং এরাই হলো উদ্ভিদের আদিপুরুষ। বাকীরা হলো প্রাণীদের আদি-পুরুষ।

জীবের যে শাখাটি সর্বপ্রথম স্থলভাগে আশ্রয় গ্রহণ করলো, তা হচ্ছে উদ্ভিদ। জীবের মধ্যে এই উদ্ভিদই এক বিস্ময়কর ক্ষমতা লাভ করলো—সেটি হচ্ছে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করা। একমাত্র ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সাহায্যে

এই খাদ্য প্রস্তুত সম্ভব বলে আদি উদ্ভিদকে সূর্যের আলোর সন্ধানে অগভীর জলাভূমিতে সরে আসতে হলো। সূর্যতাপে জল শুকিয়ে যাওয়ায় এই আদি উদ্ভিদকে যখন বিনাশ ও অবলুপ্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তখনই বিবর্তনের পথে এদের মূল সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই মূল মৃত্তিকার অভ্যন্তরের রস সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। এই সময় ভূত্বকের কঠিন শিলা চূর্ণীকৃত হয়েছিল এবং জলধারণ ক্ষমতা লাভ করেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণ করে উদ্ভিদ প্রধানতঃ স্থলবাসী হয়ে গেল। এর বহু পরবর্তী কালে জীবজগতের অন্য শাখা—প্রাণী স্থলভাগে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে উদ্ভিদ তার খাদ্যসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডল থেকে বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অনেক পরিমাণে কমিয়ে এনেছিল এবং তার স্থান শ্বাসকার্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক অক্সিজেন গ্যাস দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিল; আবার প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করে পরবর্তী আগন্তুকদের জন্যে খাদ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করে রেখেছিল। বাস্তবিকই প্রথমে উদ্ভিদজগৎ স্থলভাগে আশ্রয় গ্রহণ না করলে প্রাণীজগৎ এবং তাদের বিজ্ঞতম প্রজাতি মানুষের পক্ষে পৃথিবীর বুকে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার সম্ভাবনাই থাকতো না।

জীববিজ্ঞানের বিচারে দেখা যায়, জলচর প্রাণীর জীবন স্থলচর প্রাণীর জীবনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সরল এবং অল্প আয়াসসাধ্য। স্থলচর জীবন যেমন অধিকতর জটিল, তেমনই কষ্টকর ও বিঘ্নসংকুল। তাহলে আদিজীব জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে এলো কেন? একি শুধু অসুবিধা-জনক অবস্থায় বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা মাত্র? বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, জীবের মধ্যে যুগে যুগে যে বিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে তার জনন-কোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নিহিত ক্রমোজোমের মধ্যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির ফলে। এই পরিব্যক্তি কোন পরিকল্পিত ধারায় আসে না, এটা আসে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে; কিন্তু যখন আসে তখন জীবের পূর্বের দেহাকৃতি, আহার-বিহার, স্বভাব-চরিত্র সবই একেবারে নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। এমনই কোন পরিব্যক্তির ফলে জীব জলচর জীবন থেকে স্থলচর জীবনে চলে এসেছিল। এই পরিব্যক্তির ফলেই জীব আদিম সরলতম জীবন থেকে জটিলতম জীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে। জলীয় পরিবেশে জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও স্থলচর জীবনেই জীব বিবর্তনের অধিক সুবিধা ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে—একথা অবশ্য স্বীকার্য। জলীয় মাধ্যমে আর যাই হোক, মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব সৃষ্টির কল্পনা বাতুলতা বলেই মনে হয়। তা যদি সম্ভব হতো, তবে সৃষ্টির সেই আদি যুগ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে সব লক্ষ লক্ষ জলচর প্রাণী আজও বেঁচে আছে ও বংশবিস্তার করছে, তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের বিশেষ উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায় নি কেন? পুরাণে ও লোককথায় যে জলকন্যা ও মৎস্যমানব প্রভৃতির কাহিনী শোনা যায়, সে শুধু আমাদের কল্পনাবিলাস মাত্র।

এখন দেখা যাক, জলচর প্রাণীরা জলীয় মাধ্যমের মধ্যে কি কি সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করে, জল তাদের জীবনযাত্রাকে কিরূপে প্রভাবান্বিত করে? জীব-কোষ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রোটোপ্লাজমের একটা প্রধান উপাদান হলো জল। জল ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের সমস্ত কার্য বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং আদিজীবের সৃষ্টি ও বংশবিস্তারের জন্যে জলীয় মাধ্যমের অনিবার্যভাবে প্রয়োজন ছিল।

জলচর জীবের জীবনযাত্রার পক্ষে জলীয় মাধ্যমের কতকগুলি সুবিধা আছে। জলের প্লবতা মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধ শক্তি বলে জলচর জীবদের ভেসে থাকা এবং জলের মধ্যে বিচরণ ও

আহার অনুসন্ধান করা বেশ সহজ। বংশবিস্তারের কাজটাও সরল ও নির্বিঘ্ন। স্ত্রীজাতীয় প্রাণীরা পরিণত ডিম্বাণু জলের মধ্যে নিশ্চিন্তে ত্যাগ করতে পারে, পুরুষ প্রাণীর পরিত্যক্ত শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষিক্ত হবার জন্যে।

আবার অসুবিধাও কিছু আছে। বাইরের জলের লবণাক্ততা প্রাণীকোষের আভ্যন্তরীণ জলের তুলনায় অধিক হলে বাহ্য অস্‌মোটিক চাপ বেশী হয়ে পড়ে। এতে বাইরে থেকে দেহের মধ্যে লবণ প্রবেশ করে আভ্যন্তরীণ লবণাক্ততা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার বাইরের লবণাক্ততা কম হলে এর বিপরীত অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে। তখন প্রাণী-কোষ তার প্রয়োজনীয় লবণাক্ততা হারিয়ে ফেলতে পারে। আভ্যন্তরীণ লবণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাস উভয়ই জৈবক্রিয়ার ভয়ানক পরিপন্থী। ঠিক এই কারণে সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ পরিষ্কার বা মিঠা জলে বাস করতে পারে না। অন্যদিকে পরিষ্কার জলের অধিবাসীদেরও লবণাক্ত জলে একই অবস্থায় পড়তে হয়।

আবার কতকগুলি জলচর প্রাণী দেখা যায়, যারা এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় নিজেদের ত্বকের প্রবেশ্যতা কমিয়ে ফেলতে পারে, যাতে অপ্রয়োজনীয় লবণ দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে অথবা প্রয়োজনীয় লবণ দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধা পায়। অধিকন্তু দেহের অপ্রয়োজনীয় লবণ বা জল বের করে দিয়েও এরা দেহের লবণ সাম্য বজায় রাখতে পারে।

জলচর জীবের প্রধান আশ্রয়স্থল তাদের মাধ্যম অর্থাৎ জলরাশি। এ-বিষয়ে জলনিমগ্ন মৃত্তিকার গুরুত্ব তেমন নেই। কিন্তু স্থলচর প্রাণীদের প্রধান আশ্রয় হলো কঠিন মৃত্তিকা। আগেই উল্লেখ করেছি, মৃত্তিকার আশ্রয়ে এসেই জীবের বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উন্নতিশীল বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। কঠিন বন্ধুর ভূপৃষ্ঠে জীবের বিচরণ, জলের মধ্যের বিচরণের মত এত সহজ ছিল না। তাই অভিব্যক্তির পথে এলো এক বিরাট পরিবর্তন। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হলো মেরুদণ্ড ও হাড়ের কঙ্কাল। প্রাণী এখন পায়ের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো। এই মেরুদণ্ড প্রাণীকে উন্নতির আর এক ধাপ উপরে তুলে দিল। এই মেরুদণ্ড হলো মৃত্তিকার এক মহান দান। আমাদের ভুললে চলবে না যে, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেই সম্ভব হয়েছে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের সৃষ্টি।

মৃত্তিকা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি পৃথিবীর উপরিতলের সেই অংশটুকু, যা স্থলচর জীবকে দিয়েছে তার আশ্রয় ও বাসস্থান, যা থেকে জীব লাভ করছে তার আহার ও সমৃদ্ধির উপাদান এবং যার মধ্যে ঘটে তার দেহের অন্তিম বিলুপ্তি। পৃথিবীর এই কোমল ও শিথিল সংলগ্ন শিলাকণার দ্বারা গঠিত স্তরটির গভীরতা মোটামুটি চল্লিশ মাইল; কিন্তু এর মাত্র পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যেই মানুষ ও অন্যান্য জীবের বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। মাটির উপর যেমন অসংখ্য জীব বাস করে, তেমনই এর মধ্যে গর্ত করেও অনেক মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী বাস করে। এরা একদিকে মৃত্তিকাকে ছিদ্রবহুল ও কোমল করে, অন্যদিকে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে মৃত্তিকাকে উর্বর করে। অসংখ্য রকমের জীবাণু ও শৈবাল মৃত্তিকার মধ্যে বাস করে। এদের কতকগুলি বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে পরিণত করে' মৃত্তিকার নাইট্রোজেনঘটিত সার বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদের সঙ্গে মাটির যোগ অত্যন্ত নিবিড়। উদ্ভিদের মূল রস ও খাদ্যের সন্ধানে মাটির বহু নীচে চলে যায় এবং কঠিন শিলার সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মৃত্তিকা উদ্ভিদকে আশ্রয়, আহার ও রস দান করে, প্রতিদানে উদ্ভিদও মৃত্তিকাকে কিছু দেয়। উদ্ভিদের ঝরা-পাতা এবং মৃতদেহের পচনের ফলে মাটির সরসতা ও

কোমলতা বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে মাটিতে জৈবসারও বৃদ্ধি পায়।

জীবের স্থলভাগে আশ্রয় লাভের ফলে আশ্রয় ভূমির সঙ্গে মাধ্যমের পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে এলো কয়েকটি অসুবিধা। বায়বীয় মাধ্যম জীবকে জলের মত আশ্রয় দান ও বিচরণ ক্ষমতা দিতে অক্ষম। বায়ুর মধ্যে আহারেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। বংশবিস্তারের জন্যে এখন আর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুগুলিকে মাধ্যমের মধ্যে নিশ্চিন্তে ত্যাগ করা যায় না। জলের মধ্যে শ্বাসগ্রহণের উপযোগী ফুল্‌কার সাহায্যে আর বায়ুর মধ্যে শ্বাস-গ্রহণ করা যায় না। এই সব অসুবিধা কিন্তু জীবকে বিবর্তনের পথে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল। বায়ুতে শ্বাসগ্রহণের উপযোগী ফুস্‌ফুস তৈরী হলো; বংশবিস্তারের জন্যে স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে নিষেকক্রিয়ার ব্যবস্থা হলো। কেবলমাত্র আমিষ আহারের বদলে প্রাণীকে অজস্র উদ্ভিদ আহারের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হলো।

জলের মধ্যে প্রাণীর দেহের লবণ-সাম্য বজায় রাখা যেমন একটা সমস্যা, স্থলচর জীবেরও অনুরূপ একটা সমস্যা আছে। বাইরের বায়ুর আর্দ্রতা যদি জীবকোষের আভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা অপেক্ষা কম হয়, তবে অস্বাভাবিক পরিমাণ জল ত্বকের মধ্য দিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে বাইরে চলে যেতে পারে, এর ফলে কোষগুলি শুষ্ক হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এর প্রতিকার করবার জন্যে মরুভূমি ও শুষ্ক আবহাওয়ার বাসিন্দা প্রাণী ও উদ্ভিদেরা তাদের ত্বকের প্রবেশ্যতা কমিয়ে ফেলে। এর ফলে খুব বেশী পরিমাণ জল দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না।

স্থলচর প্রাণীর দেহমধ্যস্থ বিষাক্ত নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ বর্জনের সমস্যাটিও গুরুতর। জলচর জীবের পক্ষে এই সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। জলচর প্রাণীর দেহের প্রোটিন ভেঙ্গে গিয়ে নানারূপ অ্যামোনিয়া যৌগ উৎপন্ন হয়। এরা চামড়ার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জলে মিশে যায়। স্থলচর জীবকে দূষিত নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ বর্জন করবার জন্যে মলমূত্র উৎপাদন ও ত্যাগের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, এক্ষেত্রে বায়ু তাকে মোটেই সাহায্য করে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিশেষ চাপটিও জীবের পক্ষে, বিশেষকরে ফুস্‌ফুসসম্পন্ন প্রাণীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চাপের ফলে প্রাণীর শ্বাস-গ্রহণ এবং তার ফলে রক্তশোধন সম্ভবপর হয়। এই চাপ খুব বেশী কমে গেলে শ্বাসরোধ হতে পারে, এই জন্যে উচ্চ পর্বত আরোহণ বিশেষ কষ্টকর।

বায়ুমণ্ডলের চাপ আবার প্রাণীর পক্ষে একটি সমস্যা। প্রতি বর্গইঞ্চি স্থানের উপর প্রায় ১৫ পাউণ্ড হারে একটি মানুষ বা কোন বৃহত্তর প্রাণীর সমগ্র দেহের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। কিন্তু এত চাপ বহন করেও প্রাণীরা কি করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য প্রাণীর ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে বায়ু আছে, তার চাপ বাইরের চাপের সমান বলে বাইরের চাপের প্রভাবটা কম হবার কথা। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ যুক্তি বলে মনে হয় না। বায়ুমণ্ডলের চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা জীবের একটা আদিম অভিযোজন বলেই মনে হয়, বিশেষ করে গভীর সমুদ্রের প্রাণী, যাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে জলেরও প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হচ্ছে—তাদের এই বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা চিন্তা করলে "অভি-যোজন" ছাড়া অন্য কিছু যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না।

জীবের উপর বায়ুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি হলো জীবের আহার্য আহরণ, সেই সঙ্গে জীবের শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়াটিও জড়িত। কিন্তু বায়ুর সঙ্গে এই সম্পর্কটি প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের—এর দান প্রাণীজগৎ পরোক্ষভাবে ভোগ করে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ভিদ-কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল নামক যে পদার্থটি রয়েছে, তার ক্ষমতা বিস্ময়কর। একমাত্র উদ্ভিদই এই ক্লোরোফিল সূর্যরশ্মির সান্নিধ্যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মৃত্তিকার জলের মধ্যে রাসায়নিক যোগ সাধন করে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে। এই খাদ্য উদ্ভিদ যেমন নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে, তেমনই অবশিষ্ট জীবজগৎকে দান করবার জন্যে নিজের মধ্যে খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলে। সুতরাং আহার্যের জন্যে সমগ্র জীব-জগতকে মূলতঃ বায়ুর উপর নির্ভর করতে হয়। আবার উদ্ভিদের খাদ্য সংশ্লেষণের পরিণামে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। সমগ্র জীব-জগৎকে এই অক্সিজেন প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করতে হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যক্ত হয়, তা বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণগত সাম্য রক্ষিত হয়।

জীবের পরিবেশের অন্য দুটি উপাদান হলো উত্তাপ ও আলোক। এদের প্রধান উৎস সূর্য। পার্থিব জীবের জীবনধারণের জন্যে যে শক্তি প্রয়োজন, তার সমস্তটাই আসছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্য থেকে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ ও পার্থিব দহন জনিত তাপ সবই মূলতঃ সূর্য থেকে লব্ধ। জীবের আলোক ও তাপ গ্রহণের একটা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক আছে। সূর্যের আলোতে অধিকাংশ জীব বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন ও আহার অনুসন্ধান করে। সূর্যের উত্তাপে জীব শীত নিবারণ করে। উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে আলোক না হলেও উত্তাপ অবশ্যই প্রয়োজন।

জীবের জৈবক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে যে আভ্যন্তরীণ তাপীয় শক্তির প্রয়োজন, তা সূর্য থেকে প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চিত হয়। প্রাণী-জগৎ এর ফল উদ্ভিদের মাধ্যমেই লাভ করে। পূর্বে যে উদ্ভিদের শর্করাজাতীয় খাদ্য সংশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে, তার জন্যে সূর্যের আলো ও উত্তাপ অবশ্য প্রয়োজন। এই তাপ উদ্ভিদ শোষণ করে উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখে। এই খাদ্য প্রাণীরা গ্রহণ করলে দেহের মধ্যে যে জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া চলে, তাতে জটিল গঠনের অণুগুলি ভেঙ্গে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের অণুতে পরিণত হয়। এর ফলে পদার্থের মধ্যে পূর্বনিহিত তাপ মুক্ত হয়। এই নির্গত তাপই জীবের সকল দৈহিক শক্তির উৎস।

জীবের পরিবেশে আর একটি অদৃশ্য শক্তি বিদ্যমান। এর অস্তিত্বের কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। কিন্তু পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বের উপর এর একটা মৌলিক গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর বিশেষ মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করেই সমস্ত জীবের দৈহিক গঠন নির্দিষ্ট হয়েছে, তার বিচরণ ও কর্মক্ষমতা, এমন কি রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-ক্রিয়া ও স্নায়বিক ক্রিয়া পর্যন্ত এর দ্বারা প্রভাবান্বিত। পৃথিবী অপেক্ষা অধিক বা অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে অথবা মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় পার্থিব জীব দীর্ঘকাল বাস করতে পারবে কিনা, অথবা বাস করতে পারলেও তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হয়ে যাবে কিনা, এই সম্বন্ধে এখনো সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মহাকাশযানে যে সকল মানবযাত্রী এ-পর্যন্ত প্রেরিত হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-থেকে জানা গেছে যে, মাধ্যা-কর্ষণহীন অবস্থায়ও মানুষের পক্ষে পার্থিব ক্রিয়া-কলাপ স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করা সম্ভব। অবশ্য যে সকল ব্যক্তি মহাকাশে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এই সম্বন্ধে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মহাকাশ ভ্রমণও খুব বেশী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।

এ-পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম, তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জীবের পরিবেশ তার পক্ষে

সর্বদাই সুবিধাজনক হয়ে ওঠে নি। স্থান ও কালভেদে জীবকে পুনঃ পুনঃ নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু জীবকোষের মধ্যে যে রহস্যময় অভিব্যক্তির ক্ষমতা রয়েছে, তা সকল সমস্যার সমাধান করে জীবকে উন্নত থেকে উন্নততর বিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। যুগের বিবর্তনে ভবিষ্যতে হয়তো জীবকে আরও নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং সে সকল সমস্যারও অনুরূপভাবে সমাধান হবে। শেষ কথা হয়তো বলা যায় "প্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী", জড় পরিবেশ তাকে জয় করতে পারে নি, বরং বারে বারে অমর প্রাণের কাছে তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

প্রাণী-কোষের ভাইরাস

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

নানারকম ভাইরাস প্রাণী-শরীরে যে সব রোগের সৃষ্টি করে তার মধ্যে হাম, বসন্ত, পানিবসন্ত, এশিয়াটিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, পলিওমায়েলাইটিস ও জলাতঙ্ক রোগ সর্বসাধারণের পরিচিত। এছাড়া মুর্গীর প্লেগ, শূকরের কলেরা এবং কয়েক রকম কর্কটরোগও ভাইরাসের আক্রমণে ঘটে বলে জানা গেছে।

হামরোগ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা ১৯০ খৃষ্টাব্দে সুরু হয়। এরও আগে হোম্ হামরোগীর রক্ত সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশের ফল লক্ষ্য করেন। ১৯০৫-১৯০৮ সালে নানা গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয় যে, রোগীর রক্তই রোগবীজের বাসস্থল। তাছাড়া রোগীর গলার শ্লেষ্মাতেও একে পাওয়া যায়। কোন ব্যাক্টিরিয়া যে এই রোগের সূচনা করে না, তাও বোঝা যায়। মানুষ ছাড়া অন্য অনেক প্রাণীর শরীরেই এই রোগ জন্মাতে পারে। প্রধানতঃ বানরের উপরেই এই রোগের আক্রম্যতা পরীক্ষা করা হয়। ১৯৩৪ সালে রাকে ও সেফরি দেখালেন যে, মুর্গীর ভ্রূণের মধ্যে এই ভাইরাস জন্মানো ও বাড়ানো যায়। বার বার এই মুর্গীর ভ্রূণ থেকে আর এক মুর্গীর ভ্রূণে সংক্রমণ অনেকটা কমে যায় এবং কোন শিশুর শরীরে প্রবেশ করালে রোগ খুব মৃদুভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৫৪ সালে এণ্ডার্স ও কাট্স মৃত মানুষের মূত্রগ্রন্থির তন্তুকে ট্রিপসিন নামক এনজাইমে জারিত করবার পর তার উপরে হামরোগীর রক্ত ও গলার শ্লেষ্মায় অবস্থিত ভাইরাসকে বাড়াতে সক্ষম হন। এর ফলে বানরের মত বৃহৎ এবং মূল্যবান প্রাণী নিয়ে পরীক্ষার অবশ্যকতা দূর হলো। তাঁরা দেখলেন যে, ভাইরাস আক্রমণের ফলে মাইক্রোস্কোপে দৃশ্যমান অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, প্রধানতঃ এপিথিলিয়াম তন্তুতে। সেখানে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট অনেকগুলি বিরাট কোষ বা কোষসমষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। ইওসিন নামক রঞ্জকে রং করলে এই নিউক্লিয়াসগুলির মধ্যে এবং প্রোটোপ্লাজমের কোন কোন অংশে কতকগুলি নতুন ধরণের দানা দেখা যাচ্ছে। এক কালচার থেকে আর এক কালচারে এবং সেখান থেকে অন্য কালচারে স্থানান্তরিত করলেও এই পরিবর্তনগুলি সমানভাবে ঘটছে। বানরের মূত্রগ্রন্থিতে প্রথমে এই পরীক্ষা চলে। মানুষের ভ্রূণের বহিরাবরণেও এই ভাইরাসকে বাড়ানো যায়। মানুষের নাকের ভিতরের এপিথিলিয়ামেও এই পরীক্ষায় ভাইরাসের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। পরে অন্য অনেক জন্তুর ভ্রূণের তন্তুতে একে বাড়ানো সম্ভব হয়।

এই পরীক্ষাগুলির মূল্য এই যে, এদের সাহায্যে ভাইরাসকে লেবরেটরিতে বাড়ানো গেল এবং

আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে তারা ঠিক হামের মতই রোগ সৃষ্টি করে কিনা এবং রোগীর শরীরে কোন অনাক্রম্যতা (Immunity) সৃষ্টি করে কিনা, তা জানা সম্ভব হয়। আবার কি পরিমাণে এক রোগীর রক্তে অবস্থিত অ্যান্টিবডি অন্য শিশুর রোগ নিবারণ বা অন্য রোগীর রোগ নিরাময় করতে পারে, সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করা গেল। ফিলিপাইনের জঙ্গল থেকে ধরা অনেকগুলি বানরের উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, তাদের রক্তে ভাইরাস বা পূর্বে ভাইরাস আক্রমণের ফলে জাত অ্যান্টিবডি কিছুই নেই। এদের মধ্যে কয়েকটি বানরের রক্তে জানা ভাইরাস সংক্রমণ করে ৫-৭ দিনের মধ্যেই রক্তে ভাইরাসের বিস্তারের লক্ষণ দেখা গেল। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা এই রোগে কমে, এদেরও রক্তে ৭ থেকে ১১ দিন পর্যন্ত তেমনি দেখা গেল। আর কয়েকটির গায়ে ৯-১০ দিনে হামের মত লাল পীড়কা বের হলো। ২-৩ সপ্তাহ পরে এদের সকলের রক্তে ভাইরাস প্রতিরোধক অ্যান্টিবডির লক্ষণও প্রকাশিত হয়। বানর ছাড়া অন্য জন্তুর গায়ে এরকম পীড়কা দেখা যায় নি।

পরপর এক বানরের রক্ত থেকে ভাইরাস আর এক বানরের রক্তে সংক্রমণের ফলে দেখা গেল যে, ভাইরাসের অক্রমণ-প্রাবল্য ক্রমশঃ কমে আসে, কিন্তু রক্তে অ্যান্টিবডি সৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষ কমে না; অর্থাৎ এই ভাবে দুর্বলীকৃত ভাইরাস ব্যাক্টিরিয়া-ঘটিত রোগে ভ্যাকসিনের মত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ বা আক্রমণ অতি মৃদু করতে সক্ষম। তবে এদের ব্যবহারে রক্তে ভাইরাসের আবির্ভাব বা বৃদ্ধি বন্ধ হলেও ৯ দিন পর্যন্ত নাক ও গলার শ্লেষ্মায় কিছু কিছু ভাইরাস রয়ে গেল। কিন্তু ছয় মাস পর্যন্ত আক্রম্যতা বজায় রইলো।

বলা বাহুল্য, এই সব পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাম রোগের ভ্যাক্সিন তৈরী করা। কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে অনেকেই দেখেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় এই প্রয়াস সম্প্রতি সফল হয়েছে এবং শীঘ্রই এই ভ্যাক্সিনের প্রচুর প্রস্তুতির ফলে হাম রোগ পলিওমায়েলাইটিসের মত প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হবে।

১৯৫৭ সালে পৃথিবীর নানাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের যে উপদ্রব ঘটে, তা নিয়ে বিভিন্ন দেশে বহু গবেষণা হয়। লণ্ডনের অধ্যাপক স্পুনার চীন দেশ থেকে ফিরে এসে প্রকাশ করেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের কোয়াইচেই জেলাতে এই রোগের প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। মার্চ মাসেই দেখতে দেখতে এই রোগ সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিশেষত্ব এই যে, এই রোগের প্রত্যেক এপিডেমিকের পর এর প্রকৃতি বদ্‌লে যায়, যার ফলে একবারের ভাইরাস থেকে তৈরী অ্যান্টিবডি আর একবারের রোগে কার্যকর হয় না। আবার দেখা যায় যে, কতকগুলি ভাইরাস মানুষের শরীর থেকে বেরিয়ে কোন ইতর প্রাণীর দেহে আশ্রয় নিতে পারে। সব সময়ে এই সব প্রাণীর শরীরে রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে না। চীনদেশে শূকরদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ ঘটবার কথা জানা ছিল বটে, কিন্তু তারাই ১৯৫৭ সালের আক্রমণ সুরু করেছিল কি না, ঠিক জানা যায় নি।

চীনদেশ থেকে এই রোগ কয়েক মাসেই সমগ্র এশিয়া পার হয়ে যায়। অগাষ্টের পরে মধ্য প্রাচ্যের কোন দেশে এই রোগের প্রকাশ দেখা যায় নি। পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, অষ্ট্রেলিয়া ও চিলিদেশেও জুলাই-অগাষ্টে এর প্রকোপ ঘটে। অগাষ্টের পর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রকোপ সুরু হয়। সুতরাং বছরের যে কোন মাসেই এর সূত্রপাত হতে পারে। তবে যেখানে ও যে অবস্থায় লোকের ঘনবসতি (যেমন সহরে) বা যেখানে লোক অনেকক্ষণ একসঙ্গে থাকে (যেমন স্কুলে, সিনেমায়) সেইখানে এই রোগের বিস্তার হয় বলে মনে করবার কারণ আছে।

ভাইরাস কোন রকম টিউমার বা ক্যান্সার

সৃষ্টি করে কিনা, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকলেও পরিষ্কার ধারণা আগে ছিল না। ১৯০৮ থেকে ১৯৩২ সালে শুধু মুর্গীর শরীরের একরকম ক্যান্সার একটি বিশেষ জাতীয় ভাইরাসের ফলে উৎপন্ন হয় বলে জানা ছিল। পরে জানা গেল যে, স্তন্যপায়ী জন্তুর শরীরেও ভাইরাস নানারকম টিউমার সৃষ্টি করে। খরগোসের চর্মে, স্ত্রী-ইঁদুরের স্তনে এবং ব্যাঙের মূত্রগ্রন্থিতে এই রকম ঘটতে দেখা যায়।

১৯৫২ সালের পর এই বিষয়ের অনেক নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয়। জানা গেছে ইঁদুরের লিউকেমিয়া রোগ অনেকগুলি ভাইরাসের ফলে ঘটতে পারে। এই সব ভাইরাসের প্রকৃতি জানবার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম পরীক্ষা এই সময়ে চলে। আবার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই সব ভাইরাসের গঠন, আয়তন ইত্যাদির সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর পাওয়া যায়। এই সব ভাইরাস সাধারণতঃ এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে সংক্রমণ করা যায় না। আবার মানুষের টিউমার থেকেও ভাইরাস প্রাণীর তন্তুতে স্থানান্তর করা কঠিন। নানা জাতীয় ব্যাক্টিরিয়াকে যেমন রোগীর শরীর থেকে সংগ্রহ করে কৃত্রিম দ্রবণে পুষ্ট ও বর্ধিত করে তাদের গুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যায় এবং তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায়, সদ্যমৃত প্রাণী-দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক তন্তুকে তেমনি কৃত্রিম দ্রবণে পুষ্ট ও বর্ধিত করার কৌশলকে 'টিস্যু কালচার' বলে। এই তন্তুর মধ্যে রোগবীজ সংক্রমণ করবার পর ফলাফল খালি চোখে, অণুবীক্ষণে এবং আলট্রামাইক্রোস্কোপে নানাভাবে পরীক্ষা করা এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইরাস সংক্রমণের ফলাফলও সেই ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে ও হচ্ছে। এতে লাভ এই যে, অল্পমাত্র জীবিত তন্তুকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তার ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে পরীক্ষা চলতে পারে। সুতরাং খরচ অতি অল্পই হয়। প্রত্যেক পরীক্ষায় এক বা একাধিক জীবিত প্রাণীকে (বিশেষতঃ বানরের মত মূল্যবান প্রাণীকে) রোগের ফলে অকর্মণ্য করতে হয় না বা তাকে মেরে ফেলতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন তন্তুর কোন্ কোন্‌টিতে রোগ সংক্রমণ সহজে হয়, তা এক সঙ্গেই জানা যায়। আবার জীবিত প্রাণী রোগবীজাণুকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে তার মৌলিক ক্রিয়াকে কোন কোন ক্ষেত্রে গোপন করে গোলমালের সৃষ্টি করে। টিস্যু কালচারে তা হয় না।

ভাইরাস প্রাণী-দেহে নানা রোগ সৃষ্টি করলেও টিউমার সৃষ্টির উদাহরণ সংখ্যায় অল্প। এর মধ্যে অনেক পাখীর রক্তে লিউকেমিয়া, শরীরের নানা স্থানে সার্কোমা এবং রুস সার্কোমা, হাঁস এবং মুর্গীর শরীরে রোগ উৎপাদন করে ও মানুষের অনেক আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়। শুধু এই কারণেই এই বিষয়ে বহু গবেষণা করা হয়েছে। ব্যাঙের মূত্রগ্রন্থিতে কার্সিনোমার কথা ১৯৩৮ সাল থেকেই জানা আছে। সকল জায়গায় কিন্তু এই রোগ ঘটে না।

গৃহপালিত নানা পশুর (গরু, ভেড়া, খরগোস, কুকুর) এবং মানুষের শরীরে প্যাপিলিওমা নামক যে টিউমার দেখা যায়, তা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভাইরাস থেকে জাত। এর আক্রমণ চর্ম ও মুখের ভিতরেই প্রথম ঘটে। এই থেকেই আসল ক্যান্সার বা কার্সিনোমার উৎপত্তি হতে পারে। তেমনি ভাইরাস ইঁদুরের রক্তে লিউকিমিয়া সৃষ্টি করে, তাই আবার স্ত্রী-ইঁদুরের স্তনে ক্যান্সার উৎপন্ন করতে পারে।

টিউমার বা ক্যান্সারগ্রস্ত তন্তুকোষ এত দ্রুতগতিতে বেড়ে যায় যে, তার ভিতর থেকে ভাইরাসকে বের করে নেওয়া কঠিন হয়। তবে কোন কোনটি কোন কোন প্রাণীর বিশেষ তন্তুতে আপনি বেশী পরিমাণে জমে ও সেই তন্তুর রস থেকে শক্তিশালী সেন্ট্রিফিউজের সাহায্যে অনেকটা বিশোধিত আকারে তাকে বের করা যায়। টিস্যু কালচারের সাহায্যেও এই কাজ করা সহজ। আবার আলট্রামাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তাদের আকার ও আয়তন নির্ভুলভাবে মাপা যায় এবং সেগুলিকে চেনবার সুবিধা হয়।

পারমাণবিক বোমার রহস্য

স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪, কমিউনিষ্ট চীন পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই নিয়ে ১৯৪৫ সাল থেকে পৃথিবীতে মোট ৪১৪ বার পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আগে থেকেই পারমাণবিক শক্তিতে শক্তিমান। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুইমিং পুল টাইপ অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরের উদ্ভাবক ডাঃ ভাবা ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী রামনের দেশ এই ভারতবর্ষ কি সেই মারণাস্ত্র নির্মাণ করে বিশ্বের পারমাণবিক ক্লাবের ষষ্ঠ সভ্য হতে পারে না? আমরা বিশ্বাস করি, ভারত ইচ্ছা করলে বহু পূর্বেই এই বোমা তৈরী করতে পারতো। ১৯৫৭ সাল থেকে যে দশ হাজার বৈজ্ঞানিক ভারতীয় অ্যাটমিক এনার্জী কমিশনে অক্লান্ত সাধনা করছেন; তাঁদের প্রচেষ্টা যুদ্ধকামী হলে পারমাণবিক বোমা বহু পূর্বেই ভারতের সংগ্রহশালায় রক্ষিত হতে পারতো।

পারমাণবিক বোমা বলতে আমরা কি বুঝি? পরমাণুই বা কাকে বলে? জৈব-অজৈব পদার্থের এই বাস্তব বিশ্বে বস্তুর ইয়ত্তা নেই। বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাকেই বলে পরমাণু। এই পরমাণুতে আছে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই সংস্থার সাধারণতঃ দুইটি সভ্য—প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী, আর নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণা। এই কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে এক বা একাধিক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। এরা ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী। ধারণাটিকে স্পষ্ট করবার জন্যে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় সূর্যের চতুর্দিকে যেন কতকগুলি গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রোটন ও নিউট্রনের তুলনায় ইলেকট্রনের ভর নগণ্য। এই কণা তিনটির ভর নিম্নরূপ—নিউট্রন ১·০০৮৯৩, প্রোটন ১·০০৭৫৭ ও ইলেকট্রন ০·০০০৫৪৮৬। কাজেই একটি ইলেকট্রনের ভর প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের প্রায় ১৮৫০ ভাগের একভাগ, অর্থাৎ খুবই নগণ্য। কাজেই পারমাণবিক ওজন বলতে আমরা কেবল নিউট্রন ও প্রোটনের সম্মিলিত ওজনই বুঝি। এই ওজনের প্রশ্নে এসে আমাদের পাঠশালার গণিতজ্ঞান একটা বিরাট বিপ্লবের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি অংশগুলির পৃথক পৃথক ওজনের যোগফল বস্তুটির সামগ্রিক ওজনের সমান হয়। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ পারমাণবিক ওজনের ক্ষেত্রে অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়, কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরমাণুর ওজন তার প্রোটন ও নিউট্রনের সম্মিলিত ওজন অপেক্ষা সর্বদাই কম হয়। যেমন, ডয়টেরিয়ামের কথাই ধরা যাক এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন। কাজেই এর পারমাণবিক ওজন হওয়া উচিত ১·০০৭৫৭+১·০০৮৯৩=২·০১৬৫০; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডয়টেরিয়া-মের পারমাণবিক ওজন ২·০১৪৭১, অর্থাৎ যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে ০·০০১৭৯ কম। একে বলা হয় পরমাণুর ভর-ত্রুটি (Mass defect)। এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, যখন প্রোটন ও নিউট্রন মিলিত হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রীন গঠন করে, তখন তাদের মোট ভরের কিছু

অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং ভর ও শক্তির এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি আইন-ষ্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ অনুসারে সংঘটিত হয়ে থাকে। ভর-ক্রটির তুল্যাঙ্ক পরিমাণ এই শক্তিকে বলা হয় বন্ধনশক্তি (Binding energy)। এই বন্ধন-শক্তিই কেন্দ্রীনের স্থায়িত্বের পরিমাপ নির্দেশ করে। যে কেন্দ্রীনের বন্ধন-শক্তি যত কম, সেই কেন্দ্রীন তত অস্থায়ী (Unstable) এবং তার সর্বদাই চেষ্টা থাকে অন্য কোন স্থায়ী কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হবার। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতির কেন্দ্রীনগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী এবং তাদের বন্ধন-শক্তিও কম। কাজেই প্রাকৃতিক উপায়ে বা ফিশন প্রক্রিয়ায় সহজেই তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও ক্ষুদ্র কেন্দ্রীন গঠন করে। বলা বাহুল্য, এতে অবশ্যই পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে থাকে, অর্থাৎ এক মৌল থেকে সৃষ্টি হয় অন্য মৌলের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হান ও ষ্ট্রাসম্যান লক্ষ্য করেন যে, ইউরেনিয়াম (২৩৫) পরমাণুর কেন্দ্রীনে যখন মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায়, তখন তা সহজেই দু-ভাগে ভাগ হয়ে সৃষ্টি করে দুটি নতুন মৌলের। সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসে ২টি বা ৩টি নিউট্রন এবং প্রচণ্ড শক্তি। এই প্রক্রিয়াটির নাম পারমাণবিক বিভাজন (Nuclear fission) এবং এই শক্তিই হলো পারমাণবিক বোমার মূল শক্তি।

ইউরেনিয়ামের এই বিভাজন (Fission) প্রক্রিয়াতে ভর-ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। এই ভর ক্ষতির (mass loss) পরিমাণ প্রায় •১%, অর্থাৎ যদি ১ কিলোগ্র্যাম ইউরেনিয়ামের সম্পূর্ণ বিভাজন ঘটানো সম্ভব হয়, তবে তার প্রায় ১ গ্র্যাম অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এই শক্তির পরিমাণ পরমাণু প্রতি ২০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট। সহজেই অনুমান করা যায় তা কি বিপুল বিধ্বংসী শক্তি! কিন্তু এই শেষ নয়। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে ২-৩টি নিউট্রন আবির্ভূত হয়, তাদের কয়েকটিকে U-২৩৮ পরমাণু শোষণ করে বটে, কিন্তু বাকী নিউট্রনগুলি অন্য U-২৩৫ কেন্দ্রীনে পুনরায় আঘাত করে আর একটি বিভাজনের সৃষ্টি করে ও শক্তি মুক্ত করে। এই বিভাজন প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে এবং প্রতিবারেই প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব ঘটে।

গণনায় দেখা গেছে যে, স্বয়ংক্রিয় বিভাজন-চক্র অব্যাহত রাখতে হলে বিভাজ্য (Fissionable পদার্থটির একটি নির্দিষ্ট ভর (Critical mass) থাকা প্রয়োজন। ঐ ভরের সঠিক পরিমাণ একটি সযত্ন-রক্ষিত গোপন বৈজ্ঞানিক তথ্য।

পারমাণবিক বিভাজন-প্রক্রিয়ার জন্যে আমাদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ U-২৩৫। কিন্তু ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৫-কে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর। এই কারণে অনেক বিজ্ঞানী প্লুটোনিয়াম বা থোরিয়াম ব্যবহার করে থাকেন। ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম তৈরী করবার জন্যে এবং পারমাণবিক শক্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর (Reactor)।

বর্তমানে ভারতের তিন রকমের রিয়্যাক্টর আছে। ভারতীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ ভাবা ১৯৫৬ সালে সুইমিং-পুল টাইপ রিয়্যাক্টর নামক এক ধরণের রিয়্যাক্টর উদ্ভাবন করেন। প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের ট্রম্বেতে যে রিয়্যাক্টরটি বসানো হয়েছে, তাতে প্লুটোনিয়ামের উৎপাদন বছরে প্রায় ১০ কিলোগ্র্যাম। এর দ্বারা প্রায় ৩-৪টি পারমাণবিক বোমা তৈরী করা যায়। বর্তমানে বিহারের যদুগুড়াতেও একটি প্লুটোনিয়াম তৈরী করবার

কারখানা হয়েছে। এখানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত এক অভিনব পদ্ধতিতে প্লটোনিয়াম তৈরী হচ্ছে।

১৯৫৮ সালে চীন রাশিয়ার সহায়তায় তার প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর প্রতিষ্ঠা করে পিকিং-এর উত্তরাঞ্চলে। এখানে বছরে ৫ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়। নিউইয়র্ক টাইমস্-এ প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে যে, চীন ইতি-মধ্যে আরও দুইটি রিয়্যাক্টর স্থাপন করেছে—একটি পাওতাউ-এ ও অন্যটি লানচাউ-এ। অন্য একটি খবরে প্রকাশ—ইয়েলো নদীর দক্ষিণ তীরে চীনের অন্ততঃ তিনটি পারমাণবিক কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া গবেষণা-কেন্দ্র রয়েছে পিকিং, হার্বিন, সাংহাই ও চুকিং-এ।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগি-তায় পারমাণবিক বোমাকে অতীতের একটি ঘটনা বা নিতান্ত প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলে মনে হবে। কারণ শক্তিশালী দেশগুলি এখন আরও ভয়ঙ্কর ও অধিকতর শক্তিশালী উদ্‌যান বোমা (Hydrogen bomb) তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এই বোমার নির্মাণ-পদ্ধতি পারমাণবিক বোমার ঠিক বিপরীত। পারমাণবিক বোমাতে ঘটে বিভাজন প্রক্রিয়া (Fission), আর হাইড্রো-জেন বোমায় ঘটাইতে হয় Fusion বা সংযুক্তি প্রক্রিয়া। দেখা গেছে যে, সূর্যে অনবরত চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্রীনের সংযুক্তিতে সৃষ্টি হচ্ছে একটি হিলিয়াম পরমাণু-কেন্দ্রীন, দুটি পজিট্রন ও সেই সঙ্গে নির্গত হচ্ছে বিপুল তাপশক্তি। একে নিম্নোক্ত সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা হয়—

$$4\,_1H^1 \rightarrow {}_2He^4 + 2\,_{+1}e^0 + \text{energy}$$
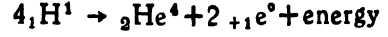
এই ধরণের বিক্রিয়া সংঘটিত হবার জন্যে প্রায় ১ কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন। কিন্তু এই সংযুক্তি (Fusion) প্রক্রিয়া একবার আরম্ভ করে দিতে পারলে তা চক্রাকারে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে এবং এই পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়াই সূর্যের অপরিমেয় তাপশক্তির উৎস।

এই প্রক্রিয়াই নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এতে একটি ডয়টেরিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের সঙ্গে একটি ট্রাইটিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের সংযুক্তি ঘটিয়ে পাওয়া যায় একটি হিলিয়ামের কেন্দ্রীন, একটি নিউট্রন ও বিপুল শক্তি।

$$_1H^2 + {}_1H^3 \rightarrow {}_2He^4 + {}_0n^1 + \text{energy}$$
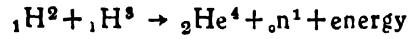
এতে ভর-ত্রুটি প্রায় ০·৪%। এই বিক্রিয়াটি ঘটাতে যে উচ্চ তাপমাত্রার (১ কোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড) প্রয়োজন হয়, তা পাওয়া যায় একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। সুতরাং হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে পারমাণবিক বোমা শুধুমাত্র একটা দেশলাইয়ের কাঠির কাজ করে। এথেকেই অনুমান করা যায়, কি বীভৎস, মারাত্মক ও প্রচণ্ড শক্তিধর এই হাইড্রোজেন বোমা।

সঞ্চয়ন

রোগ-চিকিৎসা ও শ্রমশিল্পে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগের ব্যাপারটি খুবই হাল আমলের। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই পদার্থটি প্রথম মানবদেহে প্রয়োগ করা হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর আগে। রোগ-নিদানে ও রোগ-চিকিৎসায় এই বস্তুটির প্রয়োগ বিজ্ঞানসম্মত বলে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রোগের লক্ষণ নিরূপণে এই আইসোটোপ অতি সামান্য পরিমাণে এবং রোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মারাত্মক রোগেই আইসোটোপ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ তৈরী করা হয়ে থাকে। ঐ সকল মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ তাদের আইসোটোপে তো থাকেই, তাছাড়া তারা আলো বিকিরণ করে থাকে। কোন রোগীকে কোন আইসোটোপ খাওয়াবার পর ঐ বস্তুটি তার দেহের কোন স্থানে কি পরিমাণে রয়েছে, তা বাইরে থেকে যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা যায়। এই সকল আইসোটোপের অবস্থিতি, পরিমাণ এবং রাসায়নিক ক্রিয়া সহজেই নিরূপণ করা যায় বলেই এই আইসোটোপ রোগ-নিদানে ও রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৯৩৬ সালেই প্রথম রোগ-চিকিৎসায় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ জন লরেন্স জনৈক রোগীর দেহে তেজস্ক্রিয় ফস্ফোরাস-৩২ প্রয়োগ করেন। ফস্ফোরাসের এই আইসোটোপ বার্কলেস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণু বিভাজনের যন্ত্র সাইক্লোট্রনের সাহায্যে তৈরী হয়েছিল।

তবে এই ঘটনার দশ বছর পরে ১৯৪৬ সাল থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে প্রচুর পরিমাণে রেডিও-আইসোটোপ তৈরী হতে থাকে। টেনেসীর ওকরীজস্থ রেডিও-আইসোটোপ গবেষণাগারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে এই সকল তৈরী হয়।

১৯৪২ সালে এন্‌রিকো ফের্মি ও তাঁর সহকর্মীগণ পারমাণবিক রিয়্যাক্টর আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন সম্ভব হয়। রিয়্যাক্টরের পারমাণবিক উপাদানের সাহায্যেই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী হয়ে থাকে

রোগ-নিদানে আইসোটোপের প্রয়োগ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। তার প্রমাণ, একমাত্র আমেরিকায়ই এক বছরে পাঁচ লাখেরও বেশী রোগীর রোগ-নিদানে আইসোটোপ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সমগ্র বিশ্বে প্রয়োগ করা হয়েছে সত্তরটিরও বেশী দেশের ২০ লক্ষ রোগীর উপরে। গত আঠারো বছরের মধ্যে ওকরীজ থেকে ৫০ লক্ষ কুরি তেজস্ক্রিয় উপাদান বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে। আমেরিকার ১২০০ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে এই সকল উপাদান প্রয়োগের জন্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন প্রায় ১১০০ জন।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বর্তমানে হাজার রোগীর রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় দেড়হাজার চিকিৎসা-কেন্দ্র আছে, যেখানে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ এবং সেসিয়াম প্রয়োগ করা হয়। এই দেড়হাজার কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচ-শ' রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সকল কেন্দ্রে সাধারণতঃ ক্যানসার রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে। এক্স-রে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চিকিৎসা যেভাবে হয়ে

থাকে, এই পদ্ধতিতে অনেকটা সেইভাবেই চিকিৎসা করা হয়। এতে সুবিধা রয়েছে অনেক।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা রেডিও আইসোটোপ চিকিৎসার যে অন্যতম উপাদান, তা পৃথিবীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে। তার প্রমাণ, বর্তমানে ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা সমাধানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ সম্পর্কে নানা আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলোচনা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬২ সালে রুমানিয়া ও নিউইয়র্কের, ১৯৬১ সালে জাপান ও ভিয়েনায় এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৬ সালে মস্কোর আন্তর্জাতিক আলোচনা বৈঠকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া বহু পত্রিকায় এর নতুন প্রয়োগ সম্পর্কেও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

নানা রোগ-নিদানে নানাপ্রকার আইসোটোপ প্রয়োগ করা হয়। যেমন থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি সংক্রান্ত ক্যানসার রোগ-নিদানে, গলগ্রন্থির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-১৩১, জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর বা বিপাক পরীক্ষা করে দেখাবার জন্যে আয়রন-৫৯, শ্বেতকণিকার স্থিতিশীলতা ও ভর নিরূপণের জন্যে সোডিয়াম-২৪ এবং পটাসিয়াম-৪২ এবং ভিটামিন-বি-১২-র কার্যকারিতা দেখবার জন্যে কোবাল্ট-৫৭ এবং-৫৮ ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া গোল্ড-১৯৮ এবং ইট্রিয়াম-৯০, পটাশিয়াম-৩২, কোবাল্ট-৬০, সেসিয়াম-১৩৭ প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ বহু মারাত্মক রোগ-চিকিৎসা ও রোগ-নিদানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যতীত কৃষি এবং শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৃষি-সারের গবেষণায়, জলসম্পদ সন্ধানে, আগাছা পরিষ্কারের ব্যাপারে, উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদনে, শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গের উচ্ছেদসাধনে এবং খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

সম্প্রতি হিমীকরণ ব্যবস্থায় কয়েক ধরণের ফল বীজাণুমুক্ত করবার ব্যাপারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিশেষ কাজে লাগছে। এই প্রক্রিয়ায় কেবল ফলই নয়, নানাপ্রকার মাছ ৩৩° ফারেনহাইট তাপে ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত টাট্‌কা রাখা যায়। এদের স্বাদের কোন তারতম্য হয় না। আমেরিকায় স্ট্রবেরী নামে একপ্রকার ফল এই প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হওয়ার আগে বাজারে বিক্রয়ের জন্যে পাঠাতে পাঠাতেই নষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে এই প্রক্রিয়ায় এই ফল সংরক্ষিত হচ্ছে। এখন যৎসামান্যই নষ্ট হয়ে থাকে।

তেজস্ক্রিয় বিভাজিত উপাদান স্ট্রনসিয়াম-৯০ এবং সেসিয়াম-১৩৭ থেকে সম্প্রতি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। আগে এই সকল অনাবশ্যক অথচ অপরিহার্য উপকরণ নিয়ে কি করা হবে, সেই ছিল এক সমস্যা। এই সকল উপকরণ অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশে থাকে। বর্তমানে ব্রুকলীন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীতে এদের পৃথক করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এই সকল আইসোটোপ স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর মেরুর এক্সেল হাইবার্জে একটি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া দপ্তর রয়েছে। এই কেন্দ্রটি তিন বছর ধরে তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুর গতির মাত্রা ও দিক সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে আসছে। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর এই কেন্দ্রটি ৮০০ মাইল দূরবর্তী একটি কেন্দ্রে এই সকল তথ্য সরবরাহ করছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ স্ট্রনসিয়াম-৯০ থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে এই কেন্দ্রটি চালু রয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ, ভেষজ ও কৃষি-বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার উদ্যোগে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায়ও এর প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

আণবিক ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীদের এক অভূতপূর্ব বিজ্ঞানচর্চার কাহিনী এই নিবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে আকারে খুব ছোট এবং ওজনে হাল্কা করে তৈরী করবার এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা নিয়ে বর্তমানে তাঁরা ব্যাপৃত আছেন। বিজ্ঞানীরা এদের এই বিশেষ আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন আণবিক ইলেকট্রনিক্স। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানী আর যন্ত্র-বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন "মাইক্রোমিনিয়েচারাইজেশন"। অর্থাৎ কোন জিনিষের ক্ষুদ্র প্রতিরূপকে আরও ক্ষুদ্র বলে বর্ণনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই শব্দটির মধ্যে।

কোন জিনিষকে ক্ষুদ্র রূপ দেবার চেষ্টায় এক বিরাট সফলতা এলো ট্র্যানজিষ্টর আবিষ্কারের ফলে। ট্র্যানজিষ্টর আকারে যেমন ক্ষুদ্র, ওজনে তেমনই হাল্কা। এছাড়া এর যান্ত্রিকতার দিকটাও খুবই সরল—তবে অপেক্ষাকৃত বড় বায়ুশূন্য টিউব যে কাজ করে, ট্র্যানজিষ্টরও সেই কাজ করে। এই ট্র্যানজিষ্টর দিয়েই তৈরী হচ্ছে ট্র্যানজিষ্টর রেডিও। এই অভিনব রেডিওগুলি একটি সিগারেটের বাক্সের চেয়ে নামমাত্র বড় ও ওজনে সামান্য কিছু ভারী। কিন্তু মাইক্রোমিনিয়েচারাইজেশনের নবতম পদ্ধতিতে যে রকমের রেডিও তৈরী করা সম্ভব হবে, তার তুলনায় আজকালকার সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও সবচেয়ে হাল্কা বেতার যন্ত্রও বিশালাকৃতি মনে হবে।

মাইক্রোমিনিয়েচার পদ্ধতির প্রাণবস্তু হলো মাইক্রোসার্কিট। একে সংহৃত সার্কিটও কেউ কেউ বলে থাকেন। এটি এত ক্ষুদ্র যে, একে খালি চোখে দেখাই যায় না। কিন্তু তাহলে কি হবে, এদের একটিই ট্র্যানজিষ্টর, ডায়োড্, ক্যাপাসিটর, রেজিষ্টর এবং অন্যান্য যন্ত্র ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে; অর্থাৎ এই সবগুলি মিলিত হয়ে যে কাজ করে, একটিমাত্র মাইক্রো-সার্কিট সেই কাজ করে থাকে। স্বরবিস্তার অথবা বৈদ্যুতিক সঙ্কেত পাঠানো প্রভৃতি ইলেকট্রনিকের সব কাজই এ করতে পারে; অথচ প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে কম বিদ্যুৎ খরচে মাইক্রোসার্কিট এসব কাজ করে, আর কাজে কোন ত্রুটিও হয় না।

কতকগুলি সংহৃত সার্কিট ৫০টি পর্যন্ত উপাদান নিয়ে গঠিত হলেও সেগুলি আকারে সাধারণতঃ দেশলাই কাঠির মাথার মত। এই রকমের ১৫০টি সার্কিট একটি সিলিকনের টুক্রার উপর বসানো যায়। সিলিকনের এই টুক্রাকে বলা হয় ওয়েফার। ছোট্ট একটি মুদ্রার সমান হলো এর ব্যাস, আর এর বেধ হলো এক ইঞ্চির হাজার ভাগের মাত্র ৮ ভাগ। (এক মিলিমিটারের প্রায় দশ ভাগের দু-ভাগ)।

বাল্টিমোরের ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন এই রকম ক্ষুদ্র ওয়েফার দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র টেলিভিশন ক্যামেরা তৈরী করেছে। প্রায় দু-সেলবিশিষ্ট ফ্ল্যাশ লাইটের মত এর আকৃতি। চন্দ্র পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে মহকাশ-যানে স্থাপনের জন্যেই এটি তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া, কক্ষপরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করা এবং ভূপৃষ্ঠে পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে মহাকাশচারীদের ও মহাকাশ অভিযানকালে তাঁদের যন্ত্রপাতি নিরীক্ষণ করতে পারে, তার জন্যেও এটি প্রয়োজনীয়।

এই ক্যামেরাটির ওজন মাত্র ২১ আউন্স। এটি মাত্র ৫০ ঘনইঞ্চি জায়গা জুড়ে থাকে। আর মাত্র ৪ ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি এর প্রয়োজন হয়। বর্তমানে যে সকল ক্যামেরা প্রচলিত আছে, তার তুলনায় সেগুলি দুই থেকে ১০ গুণ বেশী ভারী, আকারে দুই থেকে চার গুণ বড়। তার উপর এগুলিতে ৭ গুণ বেশী বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়।

অন্ততঃ সমান চমকপ্রদ একটি নতুন মডেলের বেতার গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে নিউইয়র্কের গ্রেট নেকের স্পেরি জাইরোস্কোপ কোম্পানী। এটি বিমান চালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আবিষ্কার। ভূপৃষ্ঠে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থিত বেতার প্রেরক যন্ত্র প্রেরিত বেতার-বার্তার মধ্যবর্তী বিরতির সময় পরিমাপ করে নিজের অবস্থান বুঝতে বিমানচালককে এই যন্ত্রটি সহায়তা করে।

আকার ও ওজনের দিক থেকে এটি আগের মডেলের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। এর ওজন মাত্র ১৯ পাউণ্ড। আর এটি ককপিটে মাত্র অর্ধ ঘন-ফুট জায়গা দখল করে।

এই সংহত সার্কিটগুলি তৈরী করবার সময় ওয়েফারগুলিতে প্রথমতঃ রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ ঘটানো হয়। তারপর ধাতুর ফিল বা অতিশয় পাত্‌লা আস্তরণ দিয়ে এগুলির উপর সার্কিটের ছাপ দেওয়া হয়। এরকমের ২৫০,০০০টি ধাতব ফিলকে উপর উপর সাজিয়ে রাখা হলে তা সংবাদপত্রের মাত্র একটি পাতার সমান পুরু হবে।

• বর্তমানে আণবিক ইলেকট্রনিক্‌স্ প্রায় পুরাপুরি আবহমণ্ডল আর মহাকাশ প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্যে প্রচুর পরিমাণে সংহত সার্কিট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কারখানাটি খোলা হয়। এই কারখানায় তৈরী বস্তু নতুন এক ধরণের কম্পিউটারের কাজেও লাগানো হবে। এই নতুন কম্পিউটার প্রতি সেকেণ্ডে ৩ কোটি ইউনিট তথ্যের হিসাব করতে পারবে।

জনৈক বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী করছেন :

"ট্রানজিষ্টর আবিষ্কারের ফলে রেডিও এখন জামার পকেটে স্থান পেয়েছে। মাইক্রোমিনিয়েচার সার্কিটের কল্যাণে সেই রেডিওকে একদিন জামার বোতামের মধ্যেই রাখা যাবে।"

পরজীবিতা

রমেন দেবনাথ

মনুষ্যসমাজে যারা জীবিকানির্বাহের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাদের পরান্নভোজী বা গলগ্রহ এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়। জীবজগতেও এই ধরণের জীব আছে, যারা নিজেদের খাদ্যের জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভর করে। এর ফলে যার উপর নির্ভর করা হয়, তার প্রকৃত ক্ষতি সাধিত হয়, কিন্তু যে নির্ভর করে সে লাভবান হয়। প্রথমোক্ত জীবকে পোষক (Host) বা আশ্রয়দাতা বলা হয় এবং দ্বিতীয় জীবটিকে পরজীবী বলা হয়। এই ভাবে একটি জীবের উপর নির্ভর করে এবং তার ক্ষতি সাধন করে আর একটি জীবের বেঁচে থাকবার যে প্রক্রিয়া, তাকেই পরজীবীতা বলা হয়। প্রায় সমস্ত পরজীবীই অমেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত। তার মধ্যে আবার প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী, চ্যাপটা ক্রিমি (Platy helminthes), ফিতা ক্রিমি (Nemathel miuthes), সন্ধিপদ প্রাণী (Arthropoda) ইত্যাদি পর্বের (Phylum) মধ্যেই বেশী পরজীবী থাকে। পরজীবী প্রাণীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—

বহিঃপরজীবী (Ectoparasite)—যে পরজীবী

প্রাণী পোষকের শরীরের উপরে বাস করে; যথা উকুন।

অন্তঃপরজীবী (Endoparasite)—যে পরজীবি—প্রাণী পোষকের শরীরাভ্যন্তরে বাস করে; যথা, ম্যালেরিয়া পরজীবী, ক্রিমি ইত্যাদি।

ঐচ্ছিক পরজীবী (Facultative)- অনেক সময় পোষক প্রাণীর অভাবে পরজীবী প্রাণী স্বাধীনভাবেও জীবননির্বাহ করে. অর্থাৎ এরা পোষকের উপর নির্ভর করে অথবা না করেও বাঁচতে পারে।

বাধ্যতামূলক পরজীবী (Obligatory)—যে পরজীবী প্রাণী পোষকের উপর নির্ভর না করে বাঁচতে পারে না।

অস্থায়ী বা স্বল্পকালীন পরজীবী (Temporary)—এই সব প্রাণী তাদের জীবনের কিছু অংশ পরজীবী হিসাবে এবং বাকী অংশ স্বাধীনজীবী হিসাবে কাটায়। যেমন বোলতা জাতীয় পতঙ্গ অন্য পতঙ্গের শরীরের ভিতর ডিম পেড়ে রাখে। ঐ ডিম থেকে যে কীড়ার জন্ম হয়, তা পরজীবী হিসাবে পোষকের ক্ষতি সাধন করে ও বাঁচে। কিন্তু ঐ পরজীবী কীড়া থেকে যে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের জন্ম হয়, তা আর পরজীবী নয়—
হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে।

স্থায়ী পরজীবী (Permanent)—যে পরজীবী প্রাণী জীবনের সমস্ত অংশই পোষকের উপর নির্ভর করে বাঁচে, তার কোন স্বাধীন অবস্থা নেই; যেমন—ক্রিমি।

পরজৈবিক অভিযোজন—অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করবার ফলে পরজীবীদের শরীরের কোন কোন অংশের বিলুপ্তি আবার কোন কোন অংশ বিশেষভাবে তৈরী হয়। পরজীবীর এই শারীরিক এবং শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের নাম পরজৈবিক অভিযোজন। অন্তঃপরজীবীদের ক্ষেত্রেই এই অভিযোজন বেশী দেখা যায়। নিম্নে এইগুলি দেওয়া হলো—

(১) চলৎ-শক্তির বিলুপ্তি—সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার জন্যেই প্রাণীর চলাফেরার দরকার হয়, কিন্তু যে সব প্রাণী অন্য প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরে থাকে এবং সেখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে, তাদের ক্ষেত্রে চলৎ-শক্তির প্রয়োজন হয় না। ফলে তাদের চলাফেরার অঙ্গের বিলুপ্তি ঘটে।

(২) পোষককে আঁকড়ে রাখবার জন্যে নতুন অঙ্গের উৎপত্তি—পরজীবীদের চলৎ-শক্তির যেমন বিলুপ্তি ঘটে, অপর পক্ষে তেমনি আবার পোষকের দেহে আঁকড়ে থাকবার জন্যে বিশেষ অঙ্গের জন্ম হয়; যেমন—শোষক (Sucker), সূচাল হুক, শুং (১ম চিত্র)। এদের সাহায্যে পরজীবী প্রাণী পোষকের দেহ আঁকড়ে রাখে। ফিতা ক্রিমির (যা মানুষের অন্ত্রে বাস করে) ক্ষেত্রে এইগুলি বিশেষভাবে তৈরী হয়।

(৩) পরিপাকতন্ত্রের সরলীকরণ বা বিলুপ্তি সাধন—যেহেতু পরজীবী প্রাণী পোষকের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে অথবা পোষকের রক্ত, আন্ত্রিক রস ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে, সে জন্যে এদের পরিপাক প্রণালী খুবই সরল থাকে, অনেক সময় পরিপাকতন্ত্র থাকেই না; যেমন—ফিতা ক্রিমি। সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাপনক্রিয়ার সাহায্যে তরল খাদ্য এরা গ্রহণ করে থাকে।

(৪) শ্বসন প্রণালীর সরলীকরণ—পোষকের শরীরাভ্যন্তরে থাকবার ফলে অন্তঃপরজীবীরা সোজাসুজি বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। পোষকের শরীরস্থ অক্সিজেন ব্যাপন ক্রিয়ার সাহায্যে এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের কোন শ্বসন-অঙ্গ নেই। আবার অনেক সময় এরা অক্সিজেন ছাড়াই শ্বসন-প্রক্রিয়া চালায় (Anaerobic respiration)।

(৫) স্নায়ুতন্ত্রের বিলুপ্তি—অন্তঃপরজীবী পোষকের শরীরের ভিতরে সম্পূর্ণ অন্ধকারে বাস করে। সে জন্যে এদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি

ইত্যাদির দরকার হয় না। এদের মস্তিষ্কও খুব সাধারণ রকমের।

(৬) জননতন্ত্রের সবিশেষ রূপান্তর—পরজীবীদের অনেকগুলি বিপাক প্রক্রিয়া (শ্বসন, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি) যেমন অকেজো অথবা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি আবার জননতন্ত্রের প্রকৃষ্ট বিকাশ ঘটে থাকে। ক্রিমিদের শরীরের বেশীর ভাগ অংশই জননতন্ত্রে ভর্তি থাকে। প্রধানতঃ এক জোড়া অণ্ডকোষ এবং ডিম্বকোষ মিলে একটি অনেকগুলি জননতন্ত্র থাকবার ফলে ঐ ক্রিমি ১ দিনে ২৪,০০০ থেকে ৫০,০০০ নিষিক্ত ডিম পাড়ে।

পরজীবীদের এই অসংখ্য ডিম পাড়বার প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্তঃপরজীবীরা এক পোষক থেকে অন্য পোষকে যায় ডিম এবং কীড়ার মাধ্যমে। ঐ সময় ডিম এবং কীড়া বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসে এবং অত্যধিক তাপ, শৈত্য এবং নানারকম শত্রু পরিবৃত প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়; ফলে বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে
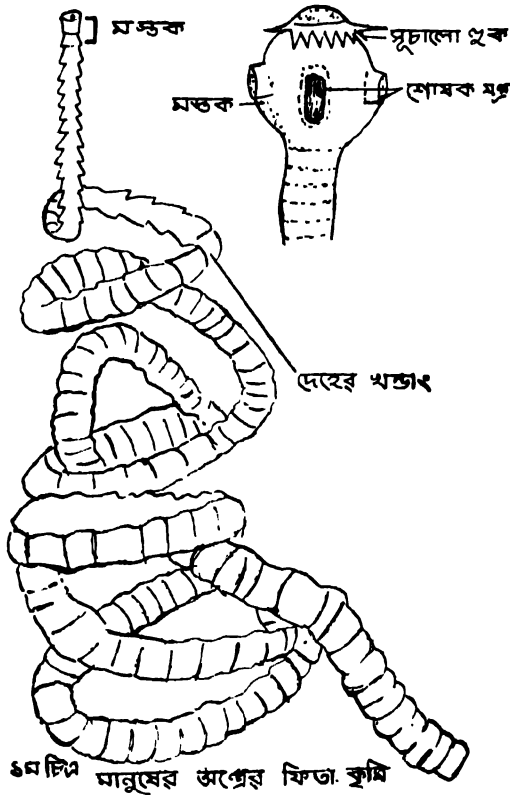
মানুষের অন্ত্রের ফিতাকৃমি

জননতন্ত্র তৈরী হয় এবং প্রত্যেক প্রাণীতেই এক একটি জননতন্ত্র থাকে। কিন্তু ফিতা ক্রিমির বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। একটি ক্রিমির ভিতর অসংখ্য জননতন্ত্র থাকে। এর শরীরের খণ্ড খণ্ড অংশে পৃথক পৃথক জননতন্ত্র থাকে। যাবার সম্ভাবনা থাকে। অসংখ্য ডিম পাড়বার ফলে সব ধ্বংস হতে পারে না, কিছু সংখ্যক ডিম বা কীড়া প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় এবং নতুন পোষককে আক্রমণ করে জীবন-চক্র সম্পূর্ণ করে।

(৭) উভয়-লিঙ্গত্ব—বেশীর ভাগ পরজীবিই উভয় লিঙ্গ, অর্থাৎ অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ একই প্রাণীতে থাকে, ফলে গর্ভাধানের জন্যে স্ত্রী-পুরুষ এই দুটি জীবের দরকার হয় না। এই উভয় লিঙ্গত্বের জন্যেই পরজীবীদের প্রজনন-ক্ষমতা বেশী।

(৮) ভ্রূণাবস্থায় জননক্রিয়া—সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্ক প্রাণীরাই জননক্রিয়া সমাধা করে, কিন্তু অনেক পরজীবীর ক্ষেত্রে তাদের ভ্রূণ বা কীড়াও জননকার্যে অংশ গ্রহণ করে এবং বংশবিস্তার করে। ভ্রূণের এই জননক্রিয়াকে পিডোজেনেসিস্ (Paedogenesis) বলে।

(৯) জীবনবৃত্তান্তের জটিলীকরণ—বেশীর ভাগ পরজীবীরই দুটি পোষক থাকে। একটিকে মুখ্য পোষক এবং অন্যটিকে গৌণ পোষক বলা হয়, (২য় চিত্র) যেমন—ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া এবং ডেঙ্গুজ্বর ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষ পরজীবীর প্রধান পোষক এবং মশা হলো গৌণ পোষক। জীবন-চক্র সম্পূর্ণ করবার জন্যে একটি পোষক থেকে দ্বিতীয় পোষকে যায়। একে পোষক পরিবর্তন বলে। এইভাবে পরজীবীর জীবনবৃত্তান্ত জটিল হয়ে ওঠে।

(১০) হজম নিরোধক রাসায়নিক পদার্থের জন্ম—যে সব অন্তঃপরজীবী পোষকের অন্ত্রে বাস করে, তারা যাতে পোষকের জারক রসের সাহায্যে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে হজম না হয়ে যায়, সে জন্যে তারা জারক রসের বিপরীত ধর্ম (Anti-enzyme) এবং হজম নিরোধক রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে।

মশার শরীর থেকে ম্যালেরিয়া পরজীবী মানুষের শরীরে যাচ্ছে এবং রক্ত-কণিকাকে আক্রমণ করছে।

(১১) দৈহিক আপজাত্য (Degeneration of body)—অনেক পরজীবীর দৈহিক আকৃতি এমনভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায় যে, তাদের-ঐ প্রাণী বলে চেনাই যায় না। সন্ধিপদ প্রাণীর অন্তর্গত পরজীবীদের বেলায়ই এই দৈহিক রূপান্তর বেশী দেখা যায়। কাঁকড়ার পরজীবি প্রাণী স্যাকুলিনা এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্ণাবস্থায় এই সন্ধিপদীয় পরজীবীটি কাঁকড়ার শরীরের অঙ্কদেশে একটি টিউমারের মত লেগে থাকে। দেহের খণ্ডাংশ, যুক্ত উপাঙ্গ—সন্ধিপদ প্রাণীর

এই সব লক্ষণ কিছুই তাতে থাকে না, তখন স্যাকুলিনাকে কোন প্রাণী বলেই মনে হয় না। কিন্তু প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এর জীবন-ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এরা সন্ধিপদ প্রাণীর অন্তর্গত।

স্যাকুলিনা দুটি কীড়া অবস্থার ভিতর দিয়ে ডিম থেকে পূর্ণাবস্থায় আসে। সে দুটি হলো—নপ্লিয়াস এবং সাইপ্রীস (৩য় চিত্র)।

নপ্লিয়াস—এর তিনজোড়া উপাঙ্গ এবং একটি চোখ আছে, কিন্তু কোন পরিপাক যন্ত্র নেই। সাইপ্রীস—এরা দুটি খোলের মধ্যে থাকে, এদের কোন চোখ নেই, তবে একজোড়া শুঁঙ্গ এবং অন্যান্য উপাঙ্গ আছে। কাঁকড়াকে সামনে পেলে শুঁঙ্গের সাহায্যে এই কীড়া কাঁকড়ার শরীরে লেগে থাকে। তারপর ঐ কীড়াটির মাথার দিক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন এরা একটি ছোট কোষের আকার ধারণ করে এবং সন্ধিপদীয় সমস্ত লক্ষণ-গুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই কোষটি রক্তের সঙ্গে মিশে কাঁকড়ার অন্ত্রে চলে যায়। একে আভ্যন্তরীণ স্যাকুলিনা বলে। পরে কাঁকড়া যখন খোলস পাল্টায়, তখন ভিতরকার স্যাকুলিনা বাইরে চলে আসে এবং কাঁকড়ার অঙ্কদেশে টিউমারের মত লেগে থাকে। এই টিউমার থেকে গাছের শিকড়ের ন্যায় অনেকগুলি শাখা-প্রশাখাযুক্ত অঙ্গ কাঁকড়ার শরীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং সেগুলির সাহায্যে কাঁকড়ার শরীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। বাইরেকার এই স্যাকুলিনাকে বহিস্থঃ স্যাকুলিনা বলে। এই পরজীবিতার ফলে কাঁকড়ার যৌনাঙ্গ অকেজো হয়ে পড়ে।

৩য় চিত্র—স্যাকুলিনার জীবন-চক্র

পোষকের উপর পরজীবীর প্রতিক্রিয়া—পরজীবী প্রাণী খাদ্যে ভাগ বসিয়ে রোগের সৃষ্টি করে এবং আরো নানাবিধ উপায়ে পোষকের ক্ষতিসাধন করে ; সেগুলি হলো—

(১) পোষকের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে।

(২) পোষকের রক্ত শোষণ করে।

(৩) পোষকের দেহ-কোষের ক্ষতিসাধন করে।

(৪) পোষকের শরীরে বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে।

(৫) ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, আমাশয়, প্লেগ ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি করে।

(৬) যৌন-অঙ্গকে অকেজো বা এর বিলুপ্তি সাধন করে।

যদিও পরজীবী প্রাণী উপরিউক্ত নানাপ্রকারে পোষকের ক্ষতি সাধন করে, তবু খুব কম সংখ্যক পরজীবীই পোষকের মৃত্যু আনয়ন করে। পোষকের মৃত্যু পরজীবীর কাছে খুবই ক্ষতিকর এবং আত্ম-হত্যার সামিল। কারণ যদি আশ্রয়দাতাই মরে যায়, তাহলে কার উপর নির্ভর করে পরজীবীরা বাঁচবে? সার্থক পরজীবী তারাই, যারা পোষকের নামমাত্র ক্ষতি করে থাকে।

পরজীবী প্রাণীর কথা অ্যারিষ্টটল, হিপোক্রেটস প্রমুখ জীব-বিজ্ঞানীগণ বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই আলোচনা করে গেছেন। তবে বিংশ শতাব্দীতেই পরজীবী প্রাণী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লব্ধ হয়েছে। স্বাধীনজীবী পূর্বপুরুষ থেকে বহু কোটি বছর পূর্বে পরজীবী প্রাণীর জন্ম হয়েছে এবং অন্যান্য প্রাণীর মত ক্রমবিবর্তনের ফলে এদেরও দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক নানা পরিবর্তন হয়েছে। পরজীবিতা যত উন্নত স্তরের হবে, পরজীবী প্রাণী স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে ততই দূরে সরে যাবে। জীব-বিজ্ঞানের প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, পরজীবিতা হলো জীবন-সংগ্রামের প্রতি নেতিমূলক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পরজীবীরা কঠিন জীবন-সংগ্রামকে সর্বদা এড়িয়ে চলে এবং তাই এরা বাধা-বন্ধকতা বিহীন সরল জীবনযাত্রার উপায় খুঁজে বের করে। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই কোন না কোন পরজীবী থাকে। ১৯৪৭ সালে গৃহীত বিজ্ঞানীদের একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, মানুষের পরজীবী প্রাণীর সংখ্যা হলো ২.২×১০^{৯} অর্থাৎ প্রায় পৃথিবীর লোক সংখ্যার সমান।

পরজীবিতাজনিত জীবজন্তু এবং মানুষের মৃত্যু সংখ্যা কম নয়! জীব এবং জীবনের প্রাকৃতিক সমতা রক্ষার জন্যে পরজীবিতা একটি অন্যতম উপায়।

শিক্ষণের উপযোগিতা

জয়া রায়

স্কুলে পড়বার সময় ছেলেদের স্বাভাবিক প্রতিভা কি ভাবে বজায় রাখা যায়, তা নিয়ে গত দশ বছরে অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা হয়েছে। সমস্যাটি সরল, কিন্তু এর সমাধান সহজ নয়। কোন বিশেষ দেশের নয়, সারা পৃথিবীর শিক্ষায়তনের আজ এই সমস্যা।

আমাদের দেশে শিক্ষাদানের প্রধানতঃ দুই রকম ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের পাঠশালায় এক গুরু মশায়ের কাছে ছেলেরা বেত এবং ভর্ৎসনা সহযোগে লিখতে পড়তে এবং সহজ অঙ্ক কষতে শিখতো। এই গুরুরা খুব উচ্চশিক্ষিত, গুণী, প্রতিভাশালী বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না এবং ছাত্রদের মধ্যে কোন্‌টির মাথায় সৃজনী শক্তির অজ্ঞাত বস্তুটি লুকিয়ে আছে, তার খোঁজ নেবার সময় বা সাধ্য তাঁদের ছিল না। এঁদের বেতনও ছিল খুবই নগণ্য। এছাড়া পণ্ডিতের টোলে যারা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি শিখতো, তাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাদের শিক্ষক অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হলেও কোন না কোন বিদ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত এবং শাস্ত্রচর্চায় নিরত থাকতেন। ছাত্রের মনে শিক্ষার আগ্রহ জাগাতে তাঁরা চেষ্টা

করতেন। ছাত্রেরা শিক্ষকের সঙ্গে বাস করে কতকাংশে তাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় অর্জন করতো।

সপ্তদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডের স্কুলে দেখা যেত যে, গ্রামের সবচেয়ে প্রতিভাবান বা বুদ্ধিমান ছেলেটিই যৎসামান্য সংস্থান নিয়ে রাজধানী এডিনবরায় চলে যেত। সেখানে অত্যন্ত কষ্ট ও অভাবের মধ্যে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়ে গ্রামে ফিরতো। গ্রামের স্কুলে কড়া শাসনে শিক্ষা দিয়ে নিজের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্রটিকে আবার এডিনবরায় পাঠাতো। সে আবার গ্রামে ফিরে আর একজন শিক্ষক হতো।

কয়েক শতাব্দী আগে চীনদেশে যে সব ছেলের পড়ায় খুব মন থাকতো না বা যারা পরীক্ষায় ভাল পাশ না করার ফলে সরকারী চাকরী পেত না, তারাই পরের যুগে গ্রামের শিক্ষক হতো। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে ইহুদী সমাজে স্কুলের যে শিক্ষকেরা বেত এবং দুর্বাক্য সহযোগে ক্লাসের শাসনবিধি অব্যাহত রাখতেন, তাঁদের নিজেদের পণ্ডিত হবার সৌভাগ্য হয় নি। তা সত্ত্বেও চীনে ও ইহুদী সমাজে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার যথেষ্ট আদর ছিল। সমাজে শিক্ষকদের খুব উচ্চস্থান ছিল না বটে, কিন্তু সমাজ আশা করতো যে, এই শিক্ষকেরা যে পাণ্ডিত্য নিজেরা অর্জন করতে পারেন নি, ছাত্রদের মধ্যে সেই পাণ্ডিত্য বা পাণ্ডিত্যস্পৃহা তাঁরা ফুটিয়ে তুলবেন।

আমেরিকার ইতিহাসের গোড়ার অবস্থায় শিক্ষকদের অনেকেই ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই কয়েক বছরের জন্যে শিক্ষকতায় লিপ্ত হন। তাঁরা নিজেদের নিষ্ফল, অচরিতার্থ বাসনার কথা ছেলেদের বলতেন না; বরং নিজেদের উচ্চ লক্ষ্য ও উচ্চ আদর্শের কথা বলে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করতেন। মেয়েদের স্কুলেও সবেমাত্র স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করা মেয়েটিই কয়েক বছরের জন্যে নিজের স্কুলে শিক্ষকতা করতো। বেতের সাহায্যে নয়, নিজের দৃঢ় চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরেই তারা স্কুলের শাসন অব্যাহত রাখতো।

কিন্তু সে যুগে স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার মাত্র। বর্তমানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বহু লক্ষে। এখন স্কুল থেকে বেরিয়েই শিক্ষকতা করবার দিন চলে গেছে। ছোট ছোট স্কুলেও এখন আর একটি মাত্র শিক্ষক দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয়। এখনকার শিক্ষকদের শিক্ষকতাকেই প্রধান বৃত্তি হিসাবে নিতে হয় এবং তার জন্যে বিশেষ যোগ্যতালাভ করতে হয়। নিজেরা স্কুলে পড়বার সময়েই তাঁদের এই যোগ্যতার লক্ষণ দেখা যায়। তবে আমেরিকার স্কুলের শিক্ষকেরা প্রধানতঃ মেয়ে। সমাজ তাদের বেতন বেশী দেয় না, সম্মানও দেয় অল্প। অনেকেই অনিচ্ছায় ঘটনাচক্রে অবিবাহিত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ স্কুলগুলিতে শিক্ষকের (প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রীর) সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ১৮ হাজারের বেশী। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এদের মধ্যে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ছিল মেয়ে, আবার এক লক্ষের কিছু কম পুরুষ। উচ্চতর শিক্ষালয়গুলিতে ২ লক্ষ ৩১ হাজার পুরুষ ও ২ লক্ষ ২১ হাজার জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

১৯৬১ সালে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু এই সংখ্যার শিক্ষক পাওয়া যায় নি। পুরুষ শিক্ষকেরা প্রধানতঃ গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন এবং প্রধান বা প্রবীণ শিক্ষকের স্থান দখল করেন।

অন্য দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রেও মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই বেশী। তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো, মিতব্যয়িতা, পরিচ্ছন্নতা, সাবধানতা এবং সুযত্নতা। এঁরা সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বলে সমাজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। সমাজের এই স্তর থেকেই অধিকাংশ শিক্ষকের উদ্ভব হয়েছে। এঁদের হাতেই আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যাঙ্কের কর্মচারী

এবং অন্য দেশ থেকে নতুন আগন্তুক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার পড়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, যে ছাত্রদের শিক্ষাকার্য চলছে, তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাদের বুদ্ধি, তাদের প্রতিভা বা মৌলিকতা অথবা তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মোটেই এক রকমের নয়। অথচ শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ খুবই অল্প। এঁরা যে প্রাচীন সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতে বা বিজ্ঞানের উচ্চশীর্ষে ওঠবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, এমন নয়। এঁরা শিক্ষক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই শিক্ষক হয়েছেন। সুতরাং এঁদের নিজেদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার দিকে ছাত্রদের উৎসাহ দেবার সম্ভাবনা অল্পই। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে কোন কোন শিক্ষক ইচ্ছা না থাকলেও দায়ে পড়ে শিক্ষক হয়েছেন। বিশেষতঃ মেয়েদের অনেকেই বিবাহাদি করে ঘর-সংসার করবার কল্পনায় শিক্ষকতায় যেন সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ দায়ে পড়ে অনিচ্ছায় শিক্ষকতার দায় নিয়ে নিজেদের উন্নতির পথে বিলম্ব হচ্ছে বলে ক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন।

অল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বর্তমান শিক্ষক তাঁর নিজের শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষাব্রতের উদ্দীপনা পেয়েছেন এবং পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের অন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজের খুসীতে শিক্ষাকার্যে যোগ দিয়েছেন।

বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রের এই চিত্র নৈরাশ্যজনক মনে হবে, যদি আমরা ছেলেমেয়েদের প্রতিভা উন্মেষের কথা ভাবি। কারণ প্রতিভা বললে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই মৌলিকতা, সহজ ব্যবহার, চলাফেরায় স্বাধীনতা এবং গতানুগতিক পথের বাইরে চিন্তার প্রবৃত্তির কথা ভাবি।

মৌলিকতা বা সৃজনী-শক্তি যে ছেলের থাকবে, সে ঠিক সাধারণ ছেলের মত হবে না—একথা বলা বাহুল্য। গল্পের আদর্শ ছেলেমেয়ের সঙ্গে সব সময়ে তাদের মিল হবে না। চারদিকে যা দেখে বা শোনে, তার সবটার সঙ্গে তাদের মত এক হয় না এবং ক্লাশের পড়াশুনায় তাদের মনোযোগ খুব বেশী থাকে না। সুতরাং কেমন করে আশা করা যায় যে, একটি অল্পবয়স্কা শিক্ষয়িত্রী ক্লাশের ২৫-৩০টি ছেলেমেয়েকে সুশাসনে রাখবেন, তাদের মন ভাল রাখবেন, পরীক্ষায় পাশ করাবেন, আবার প্রতিভাবান ছেলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবেন?

অনেকে মনে করেন, এই কারণেই ছাত্রেরা স্কুলের সব ক্লাশের পরীক্ষা-পাশ করে বেরিয়ে যেতে পারে, কোন প্রকৃত শিক্ষকের দেখা না পেয়েও। এই কারণে শিক্ষকের ট্রেনিং কলেজেও অধিকাংশ ছাত্রের মন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বাইরের জগতে যা সব ঘটছে, তার কোন খবর তারা রাখে না বা রাখতে চায় না। সুতরাং যেমন কোন নদী তার উৎসের চেয়ে উঁচুতে উঠতে পারে না, তেমনি এই রকম শিক্ষকের হাতে প্রতিভাশালী ছেলেও তৈরী হতে পারে না।

এই নৈরাশ্যের একটি কারণ এই যে, অধিকাংশ শিক্ষক নিজের উন্নতি সম্বন্ধে উৎসাহ পান না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাঁদের জীবন কাটাতে হয়। উচ্চস্তরের মেয়ে শিক্ষকেরাও গণিত বা বিজ্ঞান শেখাবার সুযোগ পান না। এজন্যে সাহিত্য, কাব্য এবং চারুশিল্প নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন এবং এই বিষয়গুলিকে ছাত্রেরাও মেয়েলি বিষয় বলে মনে করে। অথচ এই সব বিষয়েও মৌলিকতা বা প্রতিভা দেখাবার অবসর যথেষ্ট আছে।

দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষকদের এত অল্প বেতন দেওয়া হয় যে, ইচ্ছা থাকলেও সারাজীবন শিক্ষকতার কাজে লেগে থাকা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়। ভাগ্যক্রমে অনেক স্কুলের শিক্ষক নিজে যে বিষয় ভাল জানেন ও যে বিষয় শেখাতেও ভালবাসেন, সেই বিষয়েই শিক্ষকতা করবার সুযোগ পান। এঁদের হাতেই ছাত্রছাত্রীর গোপন প্রতিভা

ও সৃজনীশক্তি আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়ে পড়ে—তা সাহিত্যেই হোক বা বিজ্ঞানেই হোক। এঁদের সঙ্গেই তারা বই, ছবি, মিউজিয়ামে রক্ষিত বস্তুর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে পারে।

যদি প্রতিভার অর্থ হয় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ধারণা বা সৃষ্টি, তাহলে সৎ শিক্ষক নিজে উচ্চস্তরের শিল্পী, বিজ্ঞানী বা সমালোচক না হয়েও শুধু শিক্ষক হিসাবেই তার উন্মেষ ঘটাতে পারেন।

শিক্ষক ছাত্রের এই মৌলিকতা বা সৃজনীশক্তির সন্ধান করতে বা উৎসাহিত করতে চাইলেও কাজটি সহজ হয় না। কারণ তত্ত্বাবধায়কের ধারণা বা স্থানীয় রাজনৈতিক আবহাওয়া সে চেষ্টার পরিপন্থী হতে পারে। তাছাড়া, স্থানভাবে বা শিক্ষা দেবার মালমশলার অভাব সে চেষ্টাকে ব্যাহত করে। সুতরাং শিক্ষকের অধিকাংশ সময়ই শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় রাখবার চেষ্টায় কেটে যায়।

যে ছেলে ক্লাসে ভাল উদ্দেশ্যেই নানারকম উদ্ভট বা অদ্ভুত প্রশ্ন করে, অন্য ছেলেরা তার উপর খুসী হলেও শিক্ষকের পক্ষে তা বিঘ্নের সৃষ্টি করে। প্রোটন বা নিউট্রন কি? স্পুটনিক কি ভাবে চালানো হয়? —ইত্যাদি প্রশ্ন। আবার দুষ্ট ছেলেদের কেউ কেউ যে শিক্ষককে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করে না, এমন নয়। এদের সৃষ্ট সমস্যার সমাধান মোটেই সহজ নয়; অথচ ক্লাস থেকে এদের বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়।

এই সব সর্বজনবিদিত সমস্যার কতক সমাধান হতে পারে—(১) স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, ক্লাসে ছেলের সংখ্যা কমিয়ে; (২) কেরানী, দারোয়ান, চৌকিদার ইত্যাদির উপরে শিক্ষকের দায়িত্বের কতক অংশ সরিয়ে দিয়ে; (৩) শিক্ষকদের বেতন এমন পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া যাতে প্রকৃত শিক্ষাব্রতীরাই শিক্ষকের কাজে যোগ দেন; (৪) যাঁরা শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবেন তাঁদের মনেও অধ্যাপনার আদর্শের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকলে। তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস থাকা দরকার যে, শিক্ষাদান করাও সৃজন-কার্যের মতই চিত্তাকর্ষক। তাঁদের চক্ষে উজ্জ্বল আলোক আর কণ্ঠে আগ্রহপূর্ণ বাণী থাকা চাই। যেমন উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পীকে ছবি আঁকতে দেখেই নতুন শিল্পী অনুপ্রাণিত হয়, যেমন বড় সার্জনের সুকৌশল অস্ত্রোপচার দেখেই নতুন ছাত্র প্রেরণা পায়, তেমনি সুশিক্ষককে শিক্ষা দিতে দেখেই নতুন শিক্ষক উৎসাহিত হয়। শিক্ষণবিধি সম্পর্কে বই পড়ে শিক্ষক হওয়া তেমনি শক্ত, যেমন পাকপ্রণালী পড়ে ভাল পাচক হওয়া বা প্রেমপ্রণালী পড়ে প্রেমিক হওয়া শক্ত। যে শিক্ষক শিক্ষা দিতে আনন্দ পান, তাঁকে পড়াতে না দেখলে শিক্ষণের কৌশল বোঝা যায় না।

যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সুশিক্ষণের মূল্য উপলব্ধি না করেন এবং যতদিন শুধু ডিগ্রী ও গবেষণার রিপোর্টের সংখ্যার উপর ঝোঁক না কমে, ততদিন সুশিক্ষার মর্যাদা বাড়বে না।

বর্তমানে স্কুলের আয় নানাভাবে বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেক স্কুলের নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে ও নতুন শিক্ষক আসছেন। তবে এই নতুন শিক্ষকদের বেতন আগের তুলনায় বেশী হলেও তাঁরা সকলেই শিক্ষাব্রত নিয়ে আসছেন না। ছাত্রদের মধ্যে প্রতিভা বা অনুসন্ধিৎসা বাড়াবার চেষ্টা না করে তাঁদের কেউ কেউ নানারকম ক্ষুদ্র বৃহৎ রচনা প্রকাশ করে নিজেদের উন্নতির পথ সুগম করছেন। এসব স্কুলে অনেক সময় পুরাতন ও নতুন শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিপত্তি ও সম্মানের জন্যে দারুণ বিরোধ ও দলাদলি বেঁধে যায়। নতুন নতুন বিষয়গুলিকে পুরাতন ও নতুন শিক্ষকদের সহযোগে যেখানে শিক্ষা দেওয়া সহজ হতো, সেখানে বাগবিতণ্ডা ও মতদ্বৈধেই উভয় দলের সময় নষ্ট হয়।

স্কুলের লাইব্রেরি ছোট হলেও তা মানসিক exploration-এর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। স্কুল মিউজিয়াম ছোট হলেও সেখানে ছেলেরা অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিষ শিখতে পারে। যদি মিউজিয়াম

বা চিড়িয়াখানায় ছোটরা কোন কোন জিনিষ হাতে নিয়ে দেখতে পারে, শুধু দূর থেকে দেখা নয়, তাহলে সৃজনীশক্তি বা উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ সহজেই হয়। তেমনি হয় যদি খোলা মাঠে, বনে বা পাহাড়ে বেড়িয়ে নিজে নিজে সব দেখাশুনার সুযোগ পায়।

শিক্ষণের যে ব্যবস্থায় ছাত্রদের নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়, যেমন—হাঁটা-চলা, লেখা, ছবি আঁকা, জিনিস তৈরী করা এবং কথা বলা ইত্যাদি, তার সবটাই স্কুলে করবার দরকার নেই। তবে স্কুলের বাইরের কার্যকলাপের উপর বেশী ঝোঁক হলে স্কুলের নিজস্ব কাজে বাধা পড়ে। আবার একথাও মনে রাখা উচিত যে, ছেলেরা বছরের ৭।৮ মাস, সপ্তাহে ৫-৫½ দিন ঘন্টার পর ঘন্টা ছোট ক্লাসের ঘরে আটকে থাকে—ক্লাসের কাজ তাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক। আবার জানালাহীন স্কুলঘরে (Air conditioned) জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকবার প্রবৃত্তি দূর হতে পারে বটে, কিন্তু এই আটক থাকবার কষ্ট বেড়ে যায়। তার ফলে মন এবং শরীর অন্য দিকে ছুটে যেতে চায়। নতুন আবিষ্কৃত টেলিভিসন এবং শিক্ষাকলের সাহায্যে বহু ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়েছে বটে, কিন্তু মৌলিকতা বা প্রতিভা বিকাশের কল এখনও তৈরী হয় নি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে। কেউ চান আরও বিজ্ঞানী বা গণিতবিদ্ তৈরী করতে, কেউ চান আরও বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে, কেউ চান সুশৃঙ্খল স্বভাব ও দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক তৈরী করতে। কিন্তু শিক্ষা দেবার সুযোগগুলি বাড়াবার কথা অনেকেরই মনে পড়ে না। এখন আমরা শিক্ষকদের তাচ্ছিল্য করি না বটে বা তাঁদের গুণের পুরস্কার দিতে বিমুখ হই না বটে, কিন্তু শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি আমাদের অবহেলা যথেষ্ট।

যে সার্জন অস্ত্রোপচারে রুগ্ন শরীর থেকে টিউমার দূর করে তাকে নিরাময় করেন, তাঁর প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অভাব নেই। কিন্তু যে শিক্ষক অসংখ্য ছাত্রের মনের প্রেরণা জুগিয়ে তাদের সুপথে পরিচালিত করেন, তাঁর মূল্য কি কম? আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা সৃজনী-শক্তিসম্পন্ন হবে, তাদের স্বতস্ফূর্ত প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি থাকবে। কিন্তু যাঁদের সাহায্যে তাদের এমন করতে চাই, তাঁদের শত ভাবে লাঞ্ছিত করি, তাঁদের ঘাড়ে অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে, তাঁদের উৎসাহ না দিয়ে, তাঁদের সম্মান না দিয়ে এবং অল্প পারিশ্রমিক দিয়ে। চারুশিল্পেও আমরা দেখতে পাই যে, যদিও শিল্পীর হাতের ছবি বা ভাস্কর্য শিল্পীর মৃত্যুর পরে যথেষ্ট মূল্য এবং আদর পায়, তথাপি অধিকাংশ শিল্পীকে জীবিতকালে অতি দীন অবস্থায় কাটাতে হয়। না হয় তাঁকে তাঁর শিল্পকে ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের অঙ্গ হিসাবে পণ্যমূল্যে বিক্রয় করতে হয়। তেমনি শিক্ষাদানকে সৃষ্টিকার্যের মর্যাদা না দিয়েও আমরা শিক্ষার কলকে সৃজনধর্মী করে তুলতে চাই।

সুতরাং ছাত্রের সৃজনীশক্তি পেতে হলে তার শিক্ষাক্ষেত্রের প্রত্যেক অংশে মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষার বাইরের সহস্র রকম দায়িত্ব ও ভার থেকে মুক্ত করতে হবে—যদিও সে কাজগুলি ছাত্রপালনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষককে সময় দিতে হবে পড়াশুনা করতে, ভাবতে, প্ল্যান করতে এবং শিক্ষার মালমশলা সংগ্রহ করতে। আর সুযোগ দিতে হবে শিক্ষক ও ছাত্রের মানসিক আদান-প্রদানের। এটা সম্ভব হয় শুধু যদি ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা অতিরিক্ত বেশী না হয়। সুতরাং শিক্ষকের কাজকে সৃজন-কার্যের মর্যাদা না দিলে ছাত্রের মধ্যে সৃজনীশক্তির স্ফুরণ হবে না, এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১-৫২তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর

মূল সভাপতি

অধ্যাপক কবীর ১৯০৬ সালে (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাষ্টার ডিগ্রি লাভ করেন। ইহার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং ওয়ালটেয়ারে অবস্থিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শণ বিভাগে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শণ বিভাগে যোগ দেন এবং এক বৎসর পরে ইংরেজী বিভাগে বদলী হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবার সময় অধ্যাপক কবীর সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' এবং 'দৈনিক কৃষক' প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচয়িতা এবং কবি হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের যুগ্ম উপদেষ্টা হিসাবে কার্যে

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর

যোগদান করেন। ইউনেস্কোর (UNESCO) তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতীয় দর্শণ কংগ্রেসের দর্শণ বিভাগের ইতিহাসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ সালে অধ্যাপক কবীর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরের বৎসর তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৬২ সালে অধ্যাপক কবীর লোকসভায় নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৩ সালে ভারতের পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ডাঃ হংসরাজ গুপ্ত

সভাপতি—গণিত শাখা

অধ্যাপক হংসরাজ গুপ্ত ১৯০২ সালের ৯ই অক্টোবর রাওয়লপিণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন।
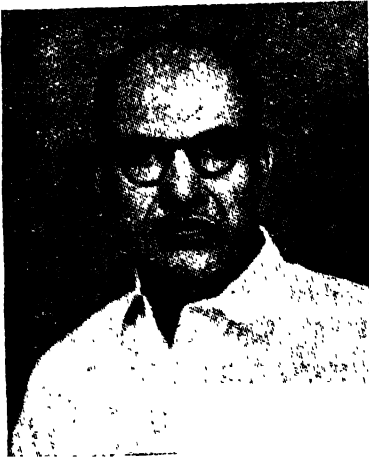
ডাঃ হংসরাজ গুপ্ত

১৯২৫ সালে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে ডক্টরেট ডিগ্রি তিনিই প্রথম লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে যোগ দান করেন। ১৯৫৪ সাল হইতে ডাঃ গুপ্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটেসন ও গণিত বিভাগের প্রধান এবং বিশুদ্ধ গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। "থিওরী অব নাম্বার্স্"-এর ক্ষেত্রে তাঁহার বিভিন্ন গবেষণা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে এবং এযাবৎ ১০০-র বেশী তাঁহার গবেষণা-পত্র বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্তী

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

অধ্যাপক মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট-

অধ্যাপক মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্তী
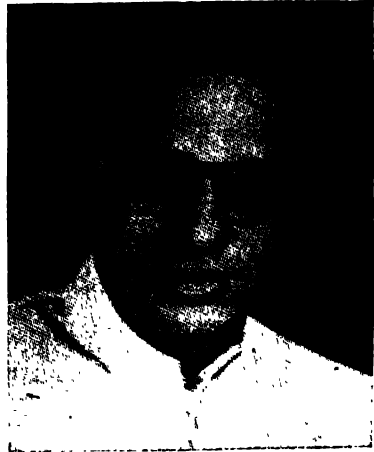
এ শিক্ষালাভ করেন। এম. এস-সি পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য ব্রেনাণ্ড পুরস্কার

লাভ করেন। গণিতশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি রামানুজম পুরস্কার অর্জন করেন। ঢাকা, কলিকাতা ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ বৎসর শিক্ষকতা-কার্যে অতিবাহিত করেন। ১৯৪৮ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগ খোলা হয় এবং তিনি সেই বিভাগের প্রধান ছিলেন। তাঁহার অনেক গবেষণা-পত্র বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী রয়েল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো। তিনি দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন-এর তিনি সম্পাদক ও প্রকাশক।

গোপালসমুদ্রম নারায়ণ রামচন্দ্রন

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক জি. এন রামচন্দ্রন ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি গবেষণা করিয়া
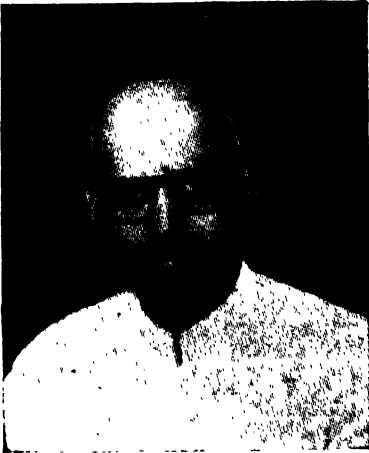
গোপালসমুদ্রম নারায়ণ রামচন্দ্রন

এম এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স হইতে ১৯৪৫ সালে গবেষণা করিয়া এ. আই. আই. এস-সি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "থার্মো-অপ্‌টিক বিহেভিয়ার অব সলিড্‌স্" সম্পর্কে গবেষণা করিয়া ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস এবং ১৯৬৩ সালে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৬১ সালের শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার লাভ করেন। প্রোটিনের গঠন এবং এক্স-রে ক্রিষ্টালোগ্রাফী সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ১০০-এর বেশী তাঁহার গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে কেম্ব্রিজে (মাস) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী কংগ্রেসে এবং ১৯৬১ সালে ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বায়োফিজিক্স কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেন। ইহা ছাড়াও তিনি অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

ডাঃ জগদীশ শঙ্কর

সভাপতি—রসায়ন শাখা

ডাঃ জগদীশ শঙ্কর ১৯১২ সালের ৩রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। আগ্রা কলেজ এবং বোম্বাই-এর রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিন তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওয়াশিংটনের (ডি. সি) ন্যাশান্যাল ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ডস-এ কাজ করেন। রয়েল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স (বোম্বে), সেন্ট জন্স কলেজ (আগ্রা), মহারাজার কলেজ (জয়পুর) এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৯ সাল হইতে পারমাণবিক শক্তিসংস্থার রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

ট্রম্বের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের উন্নতিতে তাঁহার অবদান সর্বজনস্বীকৃত। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রসায়ন বিভাগ অতিবিশুদ্ধ মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ—বিশেষতঃ যেগুলি ট্র্যানজিষ্টর টেক্‌নোলজী, সিন্টিলেসন ক্রিষ্টাল, রেডিও আইসোটোপ উৎপাদনে প্রয়োজন—প্রস্তুতে বিশেষ ভাবে দক্ষ একদল কর্মী গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালে ষ্টকহোমে আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের সম্মেলনে, ১৯৫৪ সালে অ্যান আরবরে এবং ১৯৫৫ সালে

ডাঃ জগদীশ শঙ্কর

মস্কোয় অনুষ্ঠিত পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, ১৯৫৫ ও ১৯৫৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে পিকিং-এ চীনা রিয়্যাক্টরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত রেডিয়েশন কেমিষ্ট্রি সংক্রান্ত এক আলোচনা-চক্রে তিনি বিশেষ নিমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সি-এস-আই-আর, ইউ-জি-সি-র বিভিন্ন কমিটি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য।

অধ্যাপক শিবসুন্দর দেব

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

অধ্যাপক শিবসুন্দর দেব প্রেসিডেন্সী কলেজ (কলিকাতা) হইতে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৭ সালে ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্‌স্‌-এ যোগ দেন। ১৯৩২ সালে তিনি বিদেশে যান এবং প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।
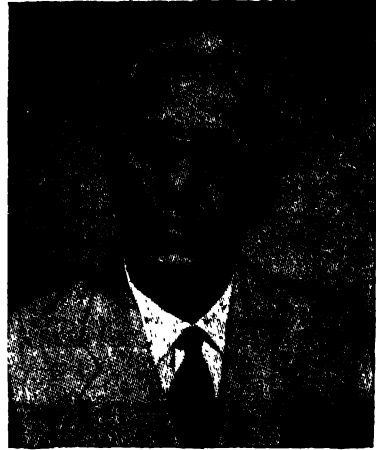
অধ্যাপক শিবসুন্দর দেব

স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপনের পর তিনি গবেষণায় নিযুক্ত হন। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিকটবর্তী অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র অঙ্কন এবং ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি প্রেরিত হন এবং এই কাজে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ষ্টেট ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন শিল্পসংস্থার ভূতাত্ত্বিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ১৯৫৭ সালে তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার ফেলো

নির্বাচিত হন। ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁহার ৩৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত পোষ্ট-ম্যাগনেটিক ওর-ডিপজিট্‌স্ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ওর-জেনেসিস শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি ফ্রান্সের উষ্ণ জলকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট প্রায় সবগুলি গবেষণাগার এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থায় সহিত জড়িত আছেন।

ডাঃ এইচ. শান্তাপাউ

সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

ডাঃ এইচ. শান্তাপাউ ১৯০৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর উত্তর-পূর্ব স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্পেন ও গ্রেট বৃটেনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৬

ডাঃ এইচ শান্তাপাউ

সালে রোমের গ্রেগোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি দর্শনশাস্ত্রে পি-এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। স্পেনের বার্সিলোনা এবং লণ্ডনে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাহাতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদবিদ্যায় পি-এইচ ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ফ্রান্সের মধ্য সেভেনীস, ইটালীয় আল্পস্ পর্বত এবং পাইরেনিজে উদ্ভিদ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান। ভারতে আসিয়া তিনি পশ্চিমঘাট অঞ্চল, বেলুচিস্থান, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, মধ্যপ্রদেশ, পূর্বঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে উদ্ভিদ সম্পর্কে যে সকল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলাফল কয়েকটি পুস্তকে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দুই বৎসর তিনি লণ্ডনের কিউ হার্বেরিয়ামে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন। ডাঃ শান্তাপাউ বোম্বাই ন্যাচার্যাল হিষ্টরি সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং এই সোসাইটির পত্রিকার উদ্ভিদ বিভাগের সম্পাদক। ১৯৪৭ সাল হইতে তিনি লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির ফেলো। ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটির তিনি প্রাক্তন সভাপতি। ১৯৫০ সালে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

অধ্যাপক আর. ভি. শেষাইয়া

সভাপতি—প্রাণী ও কীটতত্ত্ব শাখা

অধ্যাপক আর. ভি শেষাইয়া ১৮৯৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের
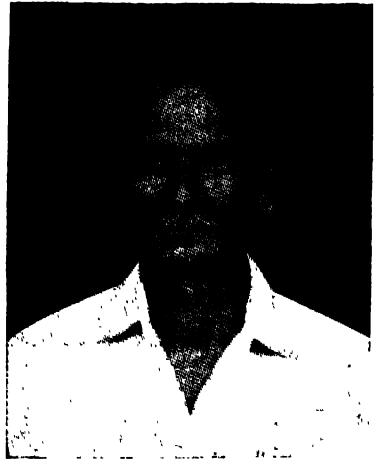
অধ্যাপক আর. ভি শেষাইয়া

প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্তমানে সামুদ্রিক জীববিদ্যা গবেষণা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। ভারতে সামুদ্রিক জীববিদ্যা গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনে এবং তাহার উন্নতিতে অধ্যাপক শেষাইয়ার দান স্মরণীয়। আধুনিক জীববিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। মৎস্য ও সামুদ্রিক প্রাণীর ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা নূতন আলোকপাত করিয়াছে। তিনি জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁহার গভীর উৎসাহ আছে।

ডাঃ দিলীপকুমার সেন

সভাপতি—নৃতত্ত্বশাখা

ডাঃ দিলীপকুমার সেন ১৯২১ সালে দিনাজপুরে (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল
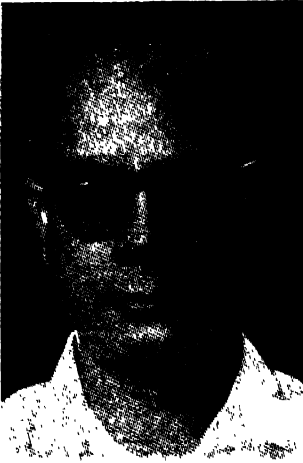
ডাঃ দিলীপকুমার সেন

এবং আশুতোষ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি নৃতত্ত্বে এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দুই বৎসর অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শিক্ষার্থী গবেষক হিসাবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি কেরল এবং ছোটনাগপুরের উপজাতীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে পর্যটন করেন। ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ডাঃ সেন লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের লেকচারার ছিলেন। ১৯৬২ সালেই তিনি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৬০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের (কলিকাতা) অফিসিয়েটিং অধ্যক্ষ হিসাবে কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কয়েকটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ জ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ জে. বি. চ্যাটার্জী ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে এম বি. বি. এস. এবং ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ

ডাঃ জ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জী

করেন। আধুনিক শোণিততত্ত্ব, বিশেষ করিয়া পুষ্টিগত রক্তহীনতা এবং মানবদেহের হিমোগ্লোবিনের বংশগত হেরফের সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার লেখা

অন্ততঃ ৪০টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক হিমাটোলজি কংগ্রেসে তিনি তুইবার (১৯৬৩ ও ১৯৬৪) সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটস্ স্বর্ণপদক, ১৯৬৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির বার্কলে স্মৃতিপদক এবং ১৯৬৪ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর বাসন্তী দেবী আমিরচাঁদ পুরস্কার তিনি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে জড়িত আছেন।

ডাঃ রঘুবীর প্রসাদ

সভাপতি—কৃষিবিদ্যা শাখা

ডাঃ রঘুবীর প্রসাদ ১৯০৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের চান্দাউসিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮, ১৯৩০ এবং ১৯৪৩ সালে তিনি যথাক্রমে বি. এস-সি, এম. এস-সি ও ডি. এস-সি

ডাঃ রঘুবীর প্রসাদ

ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ডাঃ প্রসাদ ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দিরে যোগদান করেন। ধান ও গমের চারায় ছাতা জন্মিয়া যে শস্যহানি ঘটায়—সেই সম্পর্কে বিশদ গবেষণার জন্য কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডাঃ প্রসাদের অবদান স্বীকৃত। পরলোকগত ডাঃ কে. সি. মেহতার সহিত একযোগে তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্রে ধান ও গমের চারার নানা রকম রোগ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করেন। ১৯৫৯ সালে ডাঃ প্রসাদ ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজি নামক জার্নালের প্রধান সম্পাদক। তাঁহার ৩০টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মাধবচন্দ্র নাথ

সভাপতি – শারীরবৃত্ত শাখা

অধ্যাপক মাধবচন্দ্র নাথ ঢাকা জেলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) হাঁসাড়া গ্রামে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরলোকগত

অধ্যাপক মাধবচন্দ্র নাথ

সার জে. সি. ঘোষ এবং ডাঃ কে. পি. বসুর অধীনে তিনি জৈবরসায়নে গবেষণা আরম্ভ

করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে অধ্যাপক নাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতাত্ত্বিক রসায়নের লেক্চারার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৩২ বাংলার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ইলিয়ট পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ওয়াটুমুল ফাউণ্ডেশনের ফেলোসিপ লাভ করেন। তিনি ঐ ফেলোসিপ গ্রহণ না করিয়া সেই বৎসরেই নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈবরসায়নের 'চিৎনবীশ অধ্যাপক' হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে অধ্যাপক নাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। তাঁহার '৮০টি গবেষণা-পত্র যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মেনী ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক নাথ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত জড়িত আছেন।

ডাঃ রাধানাথ রথ

সভাপতি—মনোবিদ্যা ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

ডাঃ রথ ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনা কলেজ হইতে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ

ডাঃ রাধানাথ রথ

করেন। ১৯৪৬ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি পাইয়া বিদেশে যান। ১৯৪৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি মনোবিদ্যার রীডার নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। শিশু অপরাধ ও শিশুদের দুষ্প্রবৃত্তি সংক্রান্ত তাঁর ২৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা।

ডাঃ সুধাংশুশেখর ব্যানার্জী

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

ডাঃ ব্যানার্জী ১৯০৮ সালের মে মাসে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে

ডাঃ সুধাংশুশেখর ব্যানার্জী

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারই উদ্যোগে ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। রেডিও ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে গবেষণার কেন্দ্র তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত ও উন্নত হয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁহার প্রায় ১০০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৯ ও ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে কেম্ব্রিজ ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'আয়নোস্ফিয়ার' ও 'প্রোপেগেশন অব রেডিও ওয়েভ' সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য ডাঃ ব্যানার্জী আমন্ত্রিত হন। তিনি কিছুদিন ইংল্যাণ্ডের রেডিও রিসার্চ ষ্টেশনে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ডাঃ ব্যানার্জী 'Design and Development of Electronic Instruments' বিষয়ক পুস্তকটির রচয়িতা।

[প্রবন্ধের ব্লকগুলি 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

বিজ্ঞান-সংবাদ

শব্দাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান-চালকের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা

শব্দের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী দ্রুতগামী যাত্রীবিমান নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে আমেরিকায়। এই সঙ্গে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আর একটা পরীক্ষাও চালাচ্ছেন। এই প্রচণ্ড গতিতে বিমান চলবার সময়, বিশেষ করে মাটি ছেড়ে ওঠবার সময় ও মাটিতে অবতরণের সময় বিমানের চালক ভূপৃষ্ঠের জিনিষগুলি কতখানি দেখতে ও চিনতে পারবেন, তা স্থির করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। তবে এই ধরণের দ্রুতগতি বিমান নির্মিত হবার আগেই বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার কাজ শেষ করতে চান। এজন্যে তাঁরা এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

৭৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটি টেবিলের উপর বিজ্ঞানীরা একটি শহরের মডেল তৈরি করেছেন। এতে বাড়ী, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, গাছপালা, টেলিফোন পোষ্ট, পথচারী সবই রয়েছে। এই টেবিলের উপর একটু উঁচুতে বসানো রয়েছে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা। ক্যামেরাটি এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে প্রয়োজনমত সেকেণ্ডে ১০ ফুট গতিতে এপাশ-ওপাশ বা উপর-নীচে সরানো যায়।

এই ক্যামেরার সাহায্যে ঐ সকল শহরের ছবি তোলা হয়। এই ছবি অতঃপর একটি পরীক্ষা-কক্ষের পর্দায় প্রক্ষেপ করা হয়। এই ছবি দেখবার সময় পরীক্ষকেরা বিমান-চালকের চোখে ঐ শহর দেখবার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ক্যামেরাটি প্রতি সেকেণ্ডে ১০ ফুট গতিতে নড়াচড়া করবার ফলে যে ছবি উঠেছে, তা পর্দায় দেখবার সময় চোখে যে উপলব্ধি জাগে, তা ঘণ্টায় ১৪০০ মাইল বেগে চলবার সময় বিমান-চালকের যে উপলব্ধি জাগে, তার সমান। ক্যালিফোর্ণিয়ার অ্যানাহাইমে নর্থ আমেরিকার এভিয়েশন কর্পোরেশনের অটোমেটিক্স ডাইনামিক ভিশন লেবরেটরীতে এই রকম মডেল নির্মাণ করে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রকৃত বিমান থেকে পরীক্ষা চালানো অপেক্ষা মডেলের সাহায্যে পরীক্ষায় অনেক সুবিধা এবং অর্থব্যয়ও অনেক কম।

কম্পিউটার চার সেকেণ্ডে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে

একটি যন্ত্র হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী অপর একটি যন্ত্রের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে পারে, তা সম্প্রতি নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায় হাতে-কলমে প্রদর্শিত হয়েছে।

মিজুরি সেণ্ট লুই শহরে অবস্থিত আমেরিকান লাইব্রেরী কনভেনশনের গ্রন্থাগারিক বিশ্বমেলায় মার্কিন মণ্ডপের গ্রন্থাগার তথা তথ্য-কেন্দ্রে রক্ষিত একটি ইউনিভ্যাক কম্পিউটার যন্ত্র থেকে একটি তথ্য জানবার জন্যে ইউনিভ্যাক কার্ড প্রসেসর যন্ত্রের মধ্যে একটি কার্ড প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কম্পিউটার তার স্মৃতিকোঠা হাতড়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেণ্ট লুইয়ের গ্রন্থাগারিকের কাছে ১০০ শব্দ সম্বলিত একটি রিপোর্ট পৌঁছে দিল।

শান্তিপূর্ণ বিশ্ব, গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও শিল্পকলা এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ৭৫টি বিভিন্ন বিষয়ের রচনা এই ইউনিভ্যাক যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় ১০০ শব্দ সম্বলিত এই রচনাগুলি প্রস্তুত করেছেন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা।

বিশ্বমেলার গ্রন্থাগারে কম্পিউটার যন্ত্রটি একটি কাচ দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে রয়েছে। দর্শকদের জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে গ্রন্থাগারিক সেই প্রশ্ন সম্বলিত কার্ডটি যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। এক মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রটি প্রশ্নের উত্তরটি বেছে নেয় এবং চার সেকেণ্ডের মধ্যে উত্তরটি যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

পকেট সংস্করণ এক্স রে ক্যামেরা

শিকাগোর ইলিনয় ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি একটি অতি ক্ষুদ্র এক্স-রে ইউনিট উদ্ভাবন করেছেন। এটির আকৃতি একটি সিগারেটের প্যাকেটের অনুরূপ।

এই ইউনিটটি হাতের মধ্যে রেখেই কাজ করা যায়, এজন্যে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয় না।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়ে যাবার পর তার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা নির্ধারণ করবার জন্যে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি খুবই কার্যকরী হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বৃহৎ এক্স-রে যন্ত্র ব্যবহার করবার অনেক অসুবিধা।

ফিল্মের পরিবর্তে এই যন্ত্রে তেজস্ক্রিয় প্রোমেথিয়াম ১৪৭-এর বটিকা ব্যবহার করা হয়। এই বটিকা ঐ যন্ত্রের খোলা শাটারের মধ্য দিয়ে রঞ্জেন-রশ্মি বিচ্ছুরিত করে।

এই পকেট সংস্করণ এক্স-রে ক্যামেরাটি দেহের অস্থি-র ব্যাধি ও অস্থিভঙ্গ প্রভৃতি নির্ধারণে কতখানি কার্যকরী, তা শিকাগোর মাইকেল রীস হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

থ্রম্বোসিস রোগের চিকিৎসায় সাপের বিষ

পিট্ ভাইপার নামক মালয়ের এক ধরণের বিষাক্ত সপের বিষ হয়তো শীঘ্রই থ্রম্বোসিস রোগীর চিকিৎসার কাজে লাগিতে পারে। বৃটিশ গবেষণা-কর্মীরা বিষের মধ্য হইতে এমন এক রকমের পদার্থ স্বতন্ত্র করিবার কাজে নিযুক্ত আছেন, যাহা রক্ত জমাট বাঁধিতে দিবে না। বিজ্ঞানীরা এই সঙ্গে কি ভাবে এই পদার্থটিকে কার্যকরী করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ধমনী বা শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধিলে রক্ত-প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয় এবং এই বাধার ফলে থ্রম্বোসিস দেখা দেয়। রোগটি মারাত্মক, ক্যান্সারের পরেই সর্বাধিক সংখ্যক লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যে পদার্থটি এখন আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা আবিষ্কৃত হইলে নিঃসন্দেহে এই কঠিন রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর আনিতে পারিবে।

পদার্থটিকে স্বতন্ত্র করিবার কাজ চলিয়াছে

অক্সফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারিতে। ডাণ্ডি এবং লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ চলিয়াছে।

বৃটেনের জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশনের সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে, উন্নয়ন কর্পোরেশন উক্ত গবেষণা পরিকল্পনায় নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই দিকে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে এবং যদিও সাফল্যের আশা করা যাইতেছে, তথাপি প্রথম পর্যায়ে এখনও অনেক কিছু করণীয় রহিয়াছে। যাহা হউক, রক্ত জমাট বাঁধা সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা হইয়াছে, তাহা বৃথা যাইবে না।

বর্ষাকালে নারকেল ঝুনো করবার জন্যে নতুন ধাঁচের চুল্লীর ব্যবহার

নারিকেলের যাঁরা চাষ করেন, তাঁরা বর্ষায় নারকেল ঝুনো করবার অসুবিধার কথা জানেন। এই অসুবিধা এখন সামান্য অর্থব্যয়ে দূর করা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কাসারগঞ্জে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নারিকেল গবেষণা-কেন্দ্র সম্প্রতি এক নতুন ধরণের চুল্লী আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা ১½ দিনে প্রায় দুই শত নারিকেল ঝুনো হতে পারে। মাত্র ১২০-১৫০ টাকা খরচ করে চাষীরা এই চুল্লী বসাতে পারবেন। সহজদাহ্য যে কোনও জিনিষ জ্বালানীর জন্যে এই চুল্লীতে ব্যবহার করা চলে।

এই চুল্লীতে তৈরী ঝুনো নারকেল, রৌদ্রে শুকানো ঝুনো নারকেলের চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়।

এর্ণাকুলামের ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোকোনাট কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় এই চুল্লীর প্রস্তুত-প্রণালী পাওয়া যাবে

ধানের নতুন শত্রু—রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে দমন

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় 'ডেলফাসিড' নামে চষীপোকা জাতীয় একরকমের পোকা ধানের যথেষ্ট ক্ষতি করছে। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার কৃষকেরা এই পোকাকে ভুসাদি আর গুদিয়া বলে।

পোকাগুলি দেখতে খুব ছোট, রং বাদামী ও ডানা সাদাটে—কেবল তফাৎ এই যে, চষী-পোকার উপরের ডানায় সবুজ রঙের উপর কালো দাগ থাকে।

ভাদ্র মাসের গোড়ার দিকে ধানক্ষেতে এই পোকার আক্রমণ দেখা যায় এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত এরা বেশ সক্রিয় থাকে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
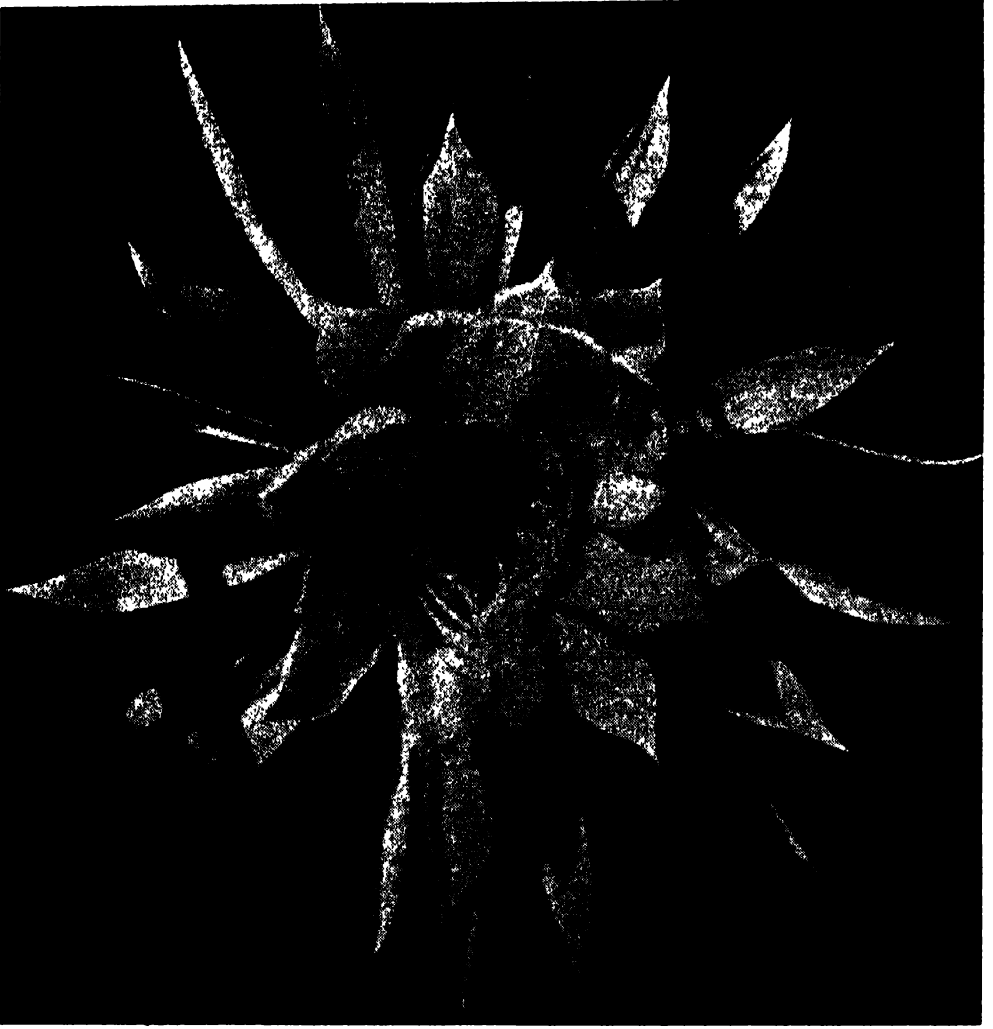
রাত্রে-ফোটা ক্যাকটাসের ফুল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপের এক জাতীয় মনসা গাছের (Cactus) ফুল। এই ফুল সন্ধ্যার পরে ফোটে এবং পরের দিন সকালে একেবারে বুজে যায়, আর খোলে না। ফুলগুলি অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। এক একটা ফুলের ব্যাস এক ফুটেরও বেশী।

করে দেখ

কেকের হারানো টুক্‌রা

এর পূর্বে চোখের ভুলের অনেক দৃষ্টান্তের কথা তোমাদের বলেছি। এবার দৃষ্টি-বিভ্রমকারী আর একটা ছবি দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো—এই রকম দৃষ্টিবিভ্রান্তিকর আর কোন ছবি আঁকতে পার কি না। ছবিটা আঁকা হয়েছে—যেন প্লেটের উপর একখানা কেক রাখা আছে এবং তার সামনের দিক থেকে তেকোণা একটু অংশ কেটে নেওয়া
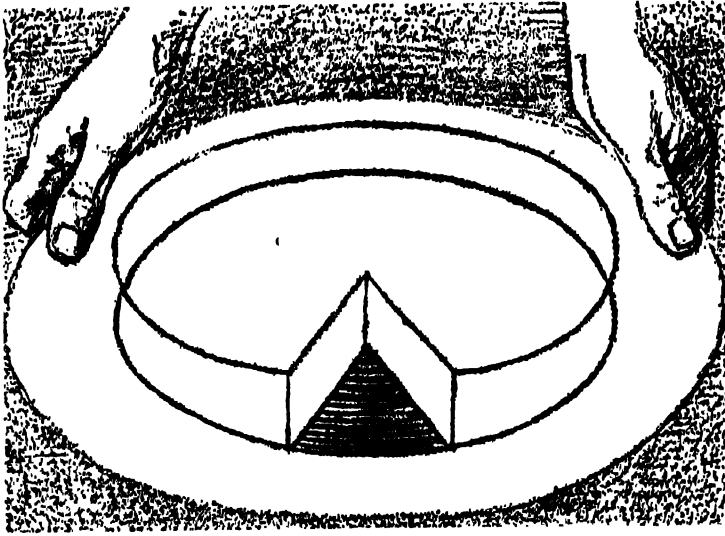
হয়েছে। কিন্তু কেটে নেওয়া টুক্‌রাটা গেল কোথায়? বইখানাকে উল্টে ধরে দেখ—দেখবে টুক্‌রাটা হারিয়ে যায় নি—ওখানেই রয়েছে। টুক্‌রাটার সোজা কালো রেখাগুলির জন্যে সামনে থেকে খালি জায়গা বলেই মনে হবে, কিন্তু উল্টে দেখলে ওই রেখাগুলির জন্যেই সেটাকে আবার নীরেট টুক্‌রা বলে মনে হবে। অবস্থানভেদে অথবা দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ফলে অনেক ব্যাপারে এই রকমের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে থাকে।

—গ—

আকাশে ওড়বার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন যাঁরা

বর্তমান শতাব্দী সবেমাত্র সুরু হয়েছে—এই জড়জগতের একজন মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন—পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে আকাশে উড়তে হবে। সত্যই মানুষটি দিনরাত চিন্তা করে এই নিয়ে। আকাশে ওড়বার কল্পনাকে তখন বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেত না। এক শীতের দিনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সেই দিন মানুষটির স্বপ্ন সত্যই বাস্তবে পরিণত হলো।

কাঠ আর মোটা কাপড় দিয়ে একটি বিমানের কাঠামো তৈরি হলো। তার সঙ্গে সংযুক্ত হলো পেট্রোলচালিত ইঞ্জিন। যন্ত্র চালানো হলো। দেখতে দেখতে সেটি মাটি ছেড়ে শূন্যে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠলো তার চালককে সঙ্গে নিয়ে, অল্পক্ষণ শূন্যে সোজা ভেসে চললো—তারপর নীচে পড়ে গেল।

চালকের নাম অরভিল রাইট। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। অরভিলের বয়স তখন ৩২। এই যুবক আমেরিকানটিই সর্বপ্রথম যন্ত্রচালিত বিমান নির্মাণ করে আকাশে উড়ে বিমানযাত্রার ইতিহাসে যুগপুরুষ বলে পরিগণিত হয়েছেন।

অরভিল শূন্যে ছিলেন মাত্র ১২ সেকেণ্ড। তিনি মাটি থেকে ১৪ ফুট উঁচু দিয়ে ১২০ ফুট ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এই বারো সেকেণ্ডের শূন্যযাত্রাই এক নতুন যুগেব সূচনা করলো। মানুষ ছাড়পত্র পেল এক রহস্যময় জগতে প্রবেশ করবার—এই জগৎ, চাঁদ-তারকার জগৎ। ঐ বারোটি সেকেণ্ড মহাকাশ-যুগের অভ্যুদয় ঘটালো।

অরভিল আর তাঁর ভাই উইলবার ঐ একই দিনে চারবার শূন্যে ওঠেন—প্রত্যেকে দু'বার করে। সবচেয়ে বেশীক্ষণ ছিলেন উইলবার। তিনি শূন্যে ছিলেন ৫৯ সেকেণ্ড এবং ৮৫২ ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন।

১৭ই ডিসেম্বর দিনটি তাই সারা যুক্তরাষ্ট্রে "রাইট ভ্রাতৃদ্বয়" নামে প্রতিপালিত হচ্ছে। ঐ দিন পতাকা উত্তোলন, বিমান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ঐ পুণ্যস্মৃতি ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণে আরও অনেক কিছু অনুষ্ঠান হয়। এই দুটি ভাইয়ের প্রতিভা ও উদ্যম, পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাষায় বলা যেতে পারে—"এই পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে এনে ফেলেছে এবং আমাদের জীবনের ধরণ বদ্‌লে দিয়েছে।"

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই প্রথম সাফল্যের দিনটি থেকে মাত্র ছয় দশকের মধ্যে মহাকাশ-বিজ্ঞানে আজকের এই বিপুল অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। বর্তমানে একখানি জেট বিমান মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মানুষকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতে পারে, অথচ

এই বিমান যেমন শব্দহীন, তেমনি তীব্র বেগে চলবার কালে এতে কোন ঝাঁকুনিও লাগে না।

এই সেদিন মাত্র প্রেসিডেণ্ট জনসন মনুষ্যচালিত একটি নতুন বিমানের কথা ঘোষণা করেছেন। এই বিমানটি শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশী বেগে ৮০ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু এই বিমানটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেও এর মূল নীতিগুলি কিন্তু রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নির্মিত প্রথম বিমানটিরই অনুরূপ।

উইলবার রাইট জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইণ্ডিয়ানার নিউ ক্যাসল থেকে আট মাইল দূরবর্তী একটি ছোট খামারে, ১৮৬৭ সালের ১৬ই এপ্রিল, আর অরভিল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওহিয়োর ডেটনে, ১৮৭১ সালের ১৯শে অগাষ্ট। এঁদের পিতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে খুব আগ্রহশীল ছিলেন এবং একটি টাইপ রাইটার তৈরি করে যন্ত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের মা'ও গণিতশাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শিণী ছিলেন। স্বামীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কিছুটা অংশ তিনিও লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে—এমন কি, নিজের রান্নাঘরটি গবেষণাগাররূপে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন পুত্রদের।

অরভিল একবার বলেছিলেন, "আমরা ভাগ্যবান যে, এরকম পরিবেশে বড় হতে পেরেছি। এই পরিবারে শিশুদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের জন্যে সর্বদা প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এরকম পরিবেশ না পেলে যা কিছু উৎসাহ ও কৌতূহল আমাদের মনে জেগেছিল, তা হয়তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো।

শৈশব থেকেই উইলবার ও অরভিল যন্ত্রপাতির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাড়ীতে তৈরী ছোটখাটো যান্ত্রিক খেলনা বিক্রী করে তাঁরা নিজেদের হাতখরচা জোগাড় করতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অরভিলের বয়স তখন সাত, আর উইলবারের এগারো। তখন এমন একটা ঘটনা ঘটলো, তা যে শুধু তাদের জীবনেই একটা বিরাট প্রভাব রেখে গেল তা নয়, একটা যুগ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে এল।

এদের পিতা একদিন ছেলেদের জন্যে একটা উপহার নিয়ে এলেন। উপহারটি হাতের আড়ালে লুকিয়ে রেখে তিনি সেটি ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, কিন্তু সেটি বাতাসে ভর করে সোজা উপর দিকে চলে গিয়ে ঘরের ছাদে এসে ঠেকলো, তারপর মাটিতে পড়ে গেল। এটি একটি খেলনা হেলিকপ্টার। এই খেলনাটি ঐ দুটি শিশুর মনে যে ছাপ রেখে গেল, তা কোন দিনই মুছে যায় নি।

অরভিল ও উইলবার হাই স্কুলে পড়াশুনা করলেও ডিপ্লোমার ছাপ তারা পায় নি। কিন্তু বই পড়া ছিল তাদের নেশা। সারা জীবনই তারা অজস্র পড়াশুনা করেছে।

তারা ছিল অক্লান্ত কর্মী। আজীবন তারা অবিবাহিত থেকেছে এবং মদ্য ও তামাকজাত দ্রব্যাদি কখনও স্পর্শ করে নি।

অরভিল আর উইলবার বিমান নির্মাণের স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইলো। জার্মেনীর লিলিয়েন্থালের লেখা পড়ে ওরা খুবই অনুপ্রাণিত হলো। লিলিয়েন্থাল গ্লাইডারে দু-হাজার বার আকাশ পাড়ি দেবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কার্যভার এল রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে।

রাইট ভ্রাতারা নিরলস সাধনা করে যেতে লাগলেন। বহু বাধার সম্মুখীন হতে লাগলেন তাঁরা। শুধু যে একটি জটিল যন্ত্রই তাঁরা তৈরি করতে চলেছেন তা নয়, যে সব যন্ত্রপাতির সাহায্য তাঁরা নিচ্ছেন, একাজে সেগুলিও তাঁদের তৈরি করে নিতে হচ্ছে নিজেদের হাতে। কিন্তু তাঁরা দমবার পাত্র নয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা চালাতে লাগলেন।

অবশেষে ১৯০২ সালের মধ্যে তাঁরা গ্লাইডার ওড়বার সময় তার ভারসাম্য রক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান করে ফেললেন। তারপর তাঁরা যন্ত্রশক্তির সাহায্যে চালিত বিমান নির্মাণের পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করলেন। ১৯০৩ সালেই তাঁরা একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন এবং এর জন্যে খরচ হলো ৫ হাজার টাকারও কম।

কিটিহকে আটলান্টিকের নির্জন উপকূলে সেই ঐতিহাসিক ১২ সেকেণ্ড শূন্য-ভ্রমণের দু' বছর পরে ১৯০৫ সালের ৫ই অক্টোবর রাইট ভ্রাতৃদ্বয় শূন্যপথে চক্রাকারে সওয়া ২৪ মাইল ঘুরে এলেন ৩৮ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে।

প্রথমে বিফল হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সালের ২২শে মে তাঁরা তাঁদের এই "উড়ন যন্ত্রের" জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট ল.ভ করেন। ১৯০৮ সালে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তরের পক্ষে প্রথম বিমান নির্মাণ করেন।

অরভিল ও উইলবার এরপর আকাশ পাড়ি দিয়ে কয়েক বার ইউরোপ ঘুরে এলেন। মানুষের বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না। নানা সম্মান-পুরস্কারে তাঁরা ভূষিত হলেন। প্রেসিডেন্ট টাফট হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের পদক দান করেন।

১৯১২ সালে বিমান-নির্মাণ যখন অগ্রগতির পথে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে উইলবার টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অরভিল একা গবেষণা চালাতে লাগলেন। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিমানের ভারসাম্য রক্ষার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করায় ১৯১৩ সালে অরভিল কোলিয়ার ট্রফি লাভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অরভিল সিগন্যাল কোর এভিয়েশন সার্ভিসে মেজর পদে অভিষিক্ত হন। বিমান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে অরভিল ১৯২৯ সালে ড্যানিয়েল গুগেনহাইম পদক লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে অরভিলের মৃত্যু হয়।

অদ্ভুত প্রাণী—স্কাঙ্ক

স্কাঙ্ক নামে বিড়াল জাতীয় এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী আছে, যারা শত্রুকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে। এরা কোন রকমে ভয় পেলে বা কোন শত্রুর সম্মুখীন হলে লেজের নীচে অবস্থিত দুটি গ্রন্থি থেকে উৎকট দুর্গন্ধময় একপ্রকার তরল পদার্থ 'স্প্রে'র মত তীব্র বেগে ছিটিয়ে দেয়। এই উৎকট দুর্গন্ধের দরুণ শত্রু আর তার দিকে এগোতে চায় না। এই তরল পদার্থ গায়ে লাগলে গা জ্বালা করে।

বৈজ্ঞানিকেরা স্কাঙ্ককে মেফিটিস বলে অভিহিত করেন। লাটিন শব্দ মেফিটিস-এর অর্থ হচ্ছে—ভূগর্ভ থেকে নিঃসৃত একপ্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প।

স্কাঙ্কের প্রধান আস্তানা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তবে মেক্সিকো ও ক্যানাডার অংশবিশেষেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের লেজটি বেশ লম্বা ও মোটা এবং দেখতে অনেকটা ঝাঁটার গোছার মত। দেহের লোম কালো চক্চকে। মেফিটিস শ্রেণীর স্কাঙ্কের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত পিঠের দিকে একটা সাদা দাগ থাকে এবং কপালের উপরও ওই রকম আর একটা সাদা দাগ দেখা যায়। স্কাঙ্কের নাক বেশ টিকালো, চোখ এবং কান দুটি ছোট। সামনের ও পিছনের উভয় পায়েই নখর আছে এবং দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ।

দোনলা বন্দুকে যেমন ঘোড়া টিপ্‌লে দুটি নল থেকে একসঙ্গে অগ্ন্যুদ্গার হয়, স্কাঙ্কও তেমনি পেশী সঙ্কোচনের দ্বারা গ্রন্থিমুখ দুটি প্রসারিত করে পীতবর্ণের তরল পদার্থ স্প্রের মত ছিটিয়ে দেয়। পর পর চার থেকে ছয় বার পর্যন্ত স্কাঙ্ক এই দুর্গন্ধময় পদার্থ ছিটিয়ে দিতে পারে। উৎক্ষিপ্ত তরল পদার্থের উৎকট দুর্গন্ধ এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত বাতাসে ভেসে থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায়, স্কাঙ্কের এই পীতবর্ণের তরল নিঃসরণ হচ্ছে 'বিউটাইল মারকাপটান' নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থের মূল উপাদান হচ্ছে গন্ধক এবং এই গন্ধকের দরুণই তরল পদার্থটির গন্ধ এত উৎকট হয়ে থাকে।

এরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় জীব। ভীত, সন্ত্রস্ত বা উত্যক্ত না হলে তারা সাধারণতঃ দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ উৎক্ষেপণ করে না। তবে ভয় পেলে নবজাত স্কাঙ্কও দুর্গন্ধ ছড়ায়, যদিও তখন তরল পদার্থ স্প্রে করবার মত ক্ষমতা তাদের জন্মায় না।

সাধারণতঃ স্ত্রী-স্কাঙ্ক এককালীন পাঁচটি থেকে সাতটি সন্তান প্রসব করে। এপ্রিল মাসের শেষভাগে অথবা মে মাসের গোড়ার দিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রসবকালে স্কাঙ্ক-শিশু মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। তখন ক্ষুধার্ত চড়ুই বাচ্চার মত কিচ্‌কিচ্‌ আওয়াজ করে। এক সপ্তাহ পরে স্কাঙ্ক-শিশুর দেহে অল্প অল্প লোম দেখা দেয় এবং এক মাসের মধ্যে তার চোখ ফোটে।

এদের জননী অত্যন্ত সন্তান-বৎসলা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সে তার কন্দর খড় ও পাতা দিয়ে নতুন করে সাজায়। তিন সপ্তাহ বয়স্কালে বাচ্চারা কন্দরের ভিতর এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। চার সপ্তাহের সময় কন্দরমুখে আলোর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় এবং পঞ্চম সপ্তাহ থেকে তাদের আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সাপ, ব্যাং, ফড়িং, গুবরে পোকা, পশুপক্ষীর ডিম এবং নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ হচ্ছে স্কাঙ্কের খাদ্য। ছয় সপ্তাহের সময় বাচ্চারা তাদের মায়ের সঙ্গে ছোটখাটো খাদ্য-অভিযানে বের হয়। এর কিছুকাল পরেই তাদের শিকার-শিক্ষা সুরু হয়।

বসন্তকালের শেষভাগে বাচ্চাদের শিকার শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব সুরু হয় এবং শরৎকালে তাদের শিকারের শেষ পর্ব সমাপ্ত হয়। স্কাঙ্ক-জননী নিজে সঙ্গে থেকে বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়—কেমন করে বালির মধ্যে লুকানো ডিমের ঘ্রাণ নিতে হয়, কেমন করে মজা-পুকুর থেকে মাছ ধরতে হয়, কেমন করে ফড়িং, গুবরে পোকা, সাপ ইত্যাদির সন্ধান করতে হয়।

শীতকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তারা কন্দরের মধ্যে ঢুকে মাটির তলায় নিদ্রা যায়। শিশুকালে সামান্য অস্ত্রোপচারের দ্বারা স্কাঙ্কের দুর্গন্ধ-নিঃস্রাবী গ্রন্থি অপসারিত করা যায়। তখন তারা আর দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ উৎক্ষেপ করতে পারে না। দুর্গন্ধ-নিঃস্রাবী গ্রন্থিবিহান স্কাঙ্কের অবস্থা হয় তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রহীন সৈনিকের মত অসহায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকে গন্ধবিমুক্ত স্কাঙ্ক গৃহে পালন করে থাকেন এবং গৃহপালিত প্রিয় জন্তুর মতই এরা পোষ মেনে থাকে।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

বিবিধ

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

ঐ পদক ইতিপুর্বে যাঁহারা পাইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে আছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

দেশের বারোজন বিজ্ঞানী সম্মানিত

নয়াদিল্লী ১৪ই জানুয়ারী—ভারতের বারোজন বিজ্ঞানীকে আজ এক অনুষ্ঠানে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতি পুরস্কারের মূল্য নগদ দশ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলা বলেন যে, দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে বিজ্ঞানের মর্যাদা ও বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি দিতে হইবে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা তরুণ বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরিত করিবেন এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের মতই তাঁহারা সারা বিশ্বে সম্মানের অধিকারী হইবেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

(১) ডাঃ এম. জি. কে. মেনন—সিনিয়র প্রোফেসর ও ডেপুটি ডিরেক্টর, টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, বোম্বাই।

(২) ডাঃ টি. আর. গোবিন্দচারী—ডিরেক্টর 'সিবা' রিসার্চ সেন্টার, বোম্বাই।

(৩) ডাঃ টি. এস. সদাশিবম—ডিরেক্টর, বোটানি লেবরেটরি, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

(৪) এইচ. এন. শেঠনা—পারমাণবিক শক্তি সংস্থা, বোম্বাই।

(৫) ডাঃ জি. এন. রামচন্দ্রন—পদার্থ-বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চতম ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষণা কেন্দ্র, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়

(৬) ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়—খয়রা অধ্যাপক, রসায়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৭) ডাঃ এম. এস. স্বামীনাথন—নয়া দিল্লীস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর।

(৮) ডাঃ আর. বি. অরোরা—অধ্যাপক ফার্মাকোলজি, নিখিল ভারত চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, নয়াদিল্লী।

(৯) ডাঃ বিক্রম এ. সরাভাই—অধ্যাপক মহাজাগতিক রশ্মি-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগার, আমেদাবাদ।

(১০) ডাঃ এস. সি. ভট্টাচার্য, বিজ্ঞানী, জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার, পুনা।

(১১) ডাঃ বি. কে. বাচাওয়াত—অধ্যাপক জৈব-রসায়ন, ক্রীশ্চান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ভেল্লোর।

(১২) এম. এম. সুরি—কেন্দ্রীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা ইনষ্টিটিউট, দুর্গাপুর।

প্রথম চারজনকে ১৯৬০ সনের, দ্বিতীয় চারজনকে ১৯৬১ সনের ও শেষ চারজনকে ১৯৬২ সনের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৮ সন হইতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিসদ, ঐ পরিসদের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্বর্গতঃ ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের স্মৃতিতে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দিতেছেন। বৎসরে চারটি পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল জাতীয় পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের ডিরেক্টর স্বর্গতঃ ডাঃ এ. এস. কৃষ্ণনকে।

অনুষ্ঠান হয় জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের অডিটোরিয়ামে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর-জেনারেল ডাঃ এস. এইচ. জহীর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

ভ্রম-সংশোধন—জানুয়ারী (১৯৬৫) সংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠায় ১ম প্যারার (১) নম্বরে—

$D+D\rightarrow T+p+4{\cdot}03$ Mev হইবে।

২৬ পৃষ্ঠার ২নং চিত্রের তলার দিকে 'T' হইবে।

৯ পৃষ্ঠায় ৭নং চিত্রের মধ্যে 'হ্রস্বতাপের' স্থলে 'হ্রস্বতরঙ্গ' হইবে

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৬৫ | তৃতীয় সংখ্যা

ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার ধারা

শ্রীমহাদেব দত্ত

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগে এদেশে বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণা হয়েছিল, ইতিহাসে তার স্বাক্ষর আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ আচার্যদের বিবরণে তার প্রকৃতি, ধরণ-ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই গবেষণার সম্পূর্ণ ধারাটির সম্যক পরিচয় সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

আধুনিক যুগে ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার এখনও শতবর্ষ পূর্ণ হয় নি, মনে হয়। গত শতাব্দীতে ভারতে ইউরোপীয় শাসকদের রাজ্য-শাসন ও রাজ্য-বিস্তারের সহায়তা করতে কিছু ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী. ভূ-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী, বাস্তুকার এদেশে আসেন। যে সব ইউরোপীয় মিশনারী এদেশে আসেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন। এঁদের কেউ কেউ এদেশের বিশেষ বিশেষ রোগ, ভূতত্ত্ব, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন ও এর কিছু কিছু পরে বিশেষ মূল্যবান বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু এসব গবেষণার ভাষা বিদেশী, প্রকাশের স্থান বিদেশী পত্রিকায়, লাভবান হয় বিদেশী সরকার। এই কারণে এই সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে এদেশের নাড়ীর যোগাযোগ ঘটে নি—এদেশের তরুণদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করে নি। ভারতীয় গবেষণার ইতিহাসে এসব গবেষণার স্থান ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা নির্ধারণ করবেন।

বিজ্ঞান-গবেষণা, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করবার জন্যে ১৮৭৬ সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

ফর কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা করেন। মনে হয়, বিজ্ঞান-গবেষণার উদ্দেশ্যে স্থাপিত এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে রামনের আবিষ্ক্রিয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে। এখানে কৃষ্ণানও উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন।

যতদূর জানা যায়, প্রথম ভারতীয় মৌলিক গবেষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষের বিজ্ঞান-গবেষণা অতি স্বল্পস্থায়ী, মাত্র ৩।৪ বছরের মত। অধ্যাপক গনেশপ্রসাদের মতে, আশুতোষের বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করলেও ইউরোপে এই বিষয়ে কি কি গবেষণা হয়েছে, তা জানা না থাকায় আশুতোষের গবেষণা প্রায়শঃ ইউরোপে কুড়ি বা পঁচিশ বছর পূর্বে যে গবেষণা হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি। ৩।৪ বছরের মধ্যেই আশুতোষ আইন ব্যবসায়ে তাঁর সব শক্তি ও সময় নিয়োগ করায় বিজ্ঞান-গবেষণার প্রথম ধারাটি প্রায় উৎস মুখেই হারিয়ে যায়, কিন্তু এখানেই সারা হয়ে যায় নি। প্রায় কুড়ি বছর পরে গবেষক আশুতোষকে দেখা যায় গবেষণা-সংগঠক হিসাবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা গণিত সমিতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই বিষয়ে পুনরায় যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এই ভাবেই ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার সূত্রপাত।

প্রায় এই সময়ে কয়েকজন ভারতীয় ইউরোপ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা করে এদেশে বিজ্ঞান-গবেষণা সুরু করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদার্থবিদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের উৎপাদন সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা আচার্য বসুর গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করেন। আচার্য রায়ের মারকিউরাস নাইট্রাইট পৃথকীকরণ ও তার গুণাগুণ পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য মৌলিক গবেষণারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এই দুই আচার্যের সাধনায় প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয়েরা ভারতীয় কারুশালায় মৌলিক গবেষণা করে মূল্যবান আবিষ্কার করতে সক্ষম। এঁদের দৃষ্টান্তে ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার তরুণ বিজ্ঞান-কর্মীরা প্রেরণা পায় ও আত্মবিশ্বাসী হয়। এভাবে ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণা সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার ধারার বহুদূরে, মাদ্রাজে বিজ্ঞান প্রতিভার এক অপূর্ব স্ফুরণ দেখা যায়। মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের এক অতি সাধারণ কর্মচারী কাজের অবসরে আপন খেয়ালে পাতার পর পাতা আঁক কষে চলছিলেন। যখন এসব কাগজ-পত্রের নকল কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ গাণিতিক অধ্যাপক হার্ডির কাছে পাঠানো হলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই যুবককে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে এঁর গণিত শিক্ষা ও গবেষণা সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করে দেন। এই যুবক বিশ্ববিখ্যাত গাণিতিক রামানুজন। অকাল মৃত্যুতে রামানুজনের গবেষণা অল্পকালেই শেষ হয়ে যায়। রামানুজনের গবেষণা স্বল্পস্থায়ী হলেও একদিকে যেমন সমৃদ্ধ ও প্রতিভাদীপ্ত, অপরদিকে ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে বহু গাণিতিককে মৌলিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণা চলতে থাকে।

যে ক্ষীণ তারাটি ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার আকাশে প্রকাশিত হয়েই নিবে গিয়েছিল, তা নবরূপে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হলো প্রায় কুড়ি বছর পরে, বিজ্ঞান-গবেষণার সংগঠক হিসাবে। আশুতোষের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্যোগে ১৯০৮ সালে কলিকাতা গণিত সমিতি স্থাপিত হয় ও ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেস স্থাপিত হয়। পরে ধীরে ধীরে অপরাপর সমিতি স্থাপিত হয়। এসব সমিতি বিজ্ঞানের মৌলিক প্রবন্ধের জন্যে মুখপত্র প্রকাশ করে এবং সভা, আলোচনা-চক্র প্রভৃতি

সংগঠন করে বিজ্ঞান-গবেষণার সহায়তা করে। ১৯১৪ সালে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন ও ১৯১৫ সাল থেকেই এখানে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও মৌলিক গবেষণার কাজ সুরু হয়। আশুতোষ তাঁর ছাত্রাবস্থার শেষে নিজে দু-তিন বছরের জন্যে মৌলিক গবেষণা করায় তাঁর স্থাপিত বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং তরুণ বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ আদর্শমত স্বাধীন কিন্তু নিরলসভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে গবেষণা করে যেতে উদ্বুদ্ধ হন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে যে জাগরণ এসেছিল, দেশকে মহৎ ও শক্তিশালী করবার যে বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিল—সেই জাগরণ, সেই বাসনা তরুণ বিজ্ঞানীদের ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণার প্রগতির জন্যে প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক রামন তাঁর নামে পরিচিত 'রামন রশ্মি' আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান, জ্ঞানচন্দ্র ঘোস বৈদ্যুতিক রসায়নে 'ঘোস তত্ত্ব' প্রকাশ করেন ও মেঘনাদ সাহা 'সাহা আয়নন' সূত্র দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেন। এই বিজ্ঞান কলেজেই সত্যেন বোস, শিশির মিত্র, গণেশপ্রসাদ, নিখিল সেন, নীলরতন ধর, জ্ঞান মুখার্জি, প্রিয়দা রায়, পুলিন সরকার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণা সুরু করেন। এই বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হবার বিশ বছরের মধ্যেই এই সব তরুণ বিজ্ঞানীরা এই কলেজেই বা পরে নিজ নিজ কর্মস্থলে গবেষণা করে বিজ্ঞানকে যে সব অবদানে সমৃদ্ধ করেন, তা পৃথিবীর যে কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব অনুভব করবার মত। ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে এই বিজ্ঞান কলেজের অবদান সমধিক। এই কলেজ ও বিজ্ঞান সমিতি স্থাপনা বিজ্ঞান-গবেষণার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এ সবের মধ্য দিয়ে সমষ্টির প্রয়াস সুরু হয়। আবার এই বিজ্ঞান কলেজের ইতিহাস লেখা হলে দেখা যাবে—বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যে আশুতোষ যে ব্যবস্থা করেন, যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত সংগঠন করেন, তা অতুলনীয়। পরে এই ব্যবস্থার প্রসার হয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নি, আর যে-টুকু পরিবর্তন হয়েছে, তা গবেষণার ক্ষতিকারক।

অধ্যাপক রামনের 'রামন রশ্মি'র আবিষ্কার কেবল কলিকাতার বিজ্ঞানীদের নয়, দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদেরও উদ্বুদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী করে। দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞান-গবেষকদের প্রেরণার উৎস রামানুজন ও রামন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির গবেষণার কাজ সুরু হয়। প্রায় এই সময়ে পাঞ্জাবে এক ছাত্র বিজ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার উদ্ভিদের নিদর্শন সংগ্রহ করতে থাকেন। পরে যখন বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্যে তিনি ইউরোপে যান, তখন সেখানের বিজ্ঞানীরা তাঁর সংগ্রহ ও সেসব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানে মুগ্ধ হন। ভারতে ফিরে এসেও তিনি নিরলস গবেষণা করে যান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। ইনি বীরবল সাহানি। এঁর সাহায্যে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যায় গবেষণা সুরু হয়।

মেঘনাদ সাহা কয়েক বছরের জন্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক থাকেন। এঁর পর ঐ পদে কৃষ্ণান যোগদান করেন। এখানে গণিতে অমিয় বন্দোপাধ্যায় ও বি. এন. প্রসাদ ছিলেন। এঁদের সাহচর্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে, বিশেষভাবে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে গবেষণার কাজ সুরু হয়। বর্তমান গ্র্যান্ট্‌স্ কমিশনের চেয়ারম্যান কোঠারী, ভাটনগর প্রমুখ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করেন। জ্ঞান ঘোষ ও সত্যেন বোসকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল তরুণ বিজ্ঞানী গবেষণা সুরু করেন। 'বসু সংখ্যায়ন' ঢাকায় বোস

থাকবার সময় প্রকাশিত হয়। প্রায় ১৯৩০ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ স্থানীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় ভারতীয় স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে গবেষণা করে মহলানবীশ, রাজচন্দ্র বসু, সমর রায়, সি. আর. রাও প্রমুখ গবেষকেরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

এই দেশের সামন্তরাজ ও বিত্তশালীদের বদান্যতায় ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়া অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স, বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞান-গবেষণায় পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ভাবা বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত হন। এই সময়ে বিজ্ঞান-গবেষণায় আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ সময় ও শক্তি নিয়োগ করতেন। দেশকে মহান, উন্নততর ও শক্তিশালী করবার স্বাদেশিকতায় যে উদ্দীপনা দেশের বাতাস ছেয়ে রেখেছিল, সেই স্বাদেশিকতাই এই যুগের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এঁদের মধ্যে যাঁদের অর্থ বা উচ্চ পদ জোটে, তাঁরা সমাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সম্মান ও সমাদর। এই কারণে বিত্তশালীরা এগিয়ে এসেছিলেন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপনে।

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলো। ভারতের ইংরেজ শাসকেরা অক্ষ শক্তির কাছে পেলেন কঠিন আঘাত। কেবল বৃটেনের সামরিক শক্তি ও বিজ্ঞান-শক্তির সাহায্যে এই আঘাতের প্রতিরোধ করবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না। এজন্যে এক দিকে ভারতে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে সামরিক শক্তি বাড়াবার চেষ্টা যেমন হলো, অন্যদিকে ভারতের বিজ্ঞানীদের কতদূর কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে ইংরেজ শাসকেরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব থেকে কয়েকটি বিজ্ঞান প্রকল্প সরকারীভাবে গ্রহণের জন্যে যে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, যুদ্ধজনিত অবস্থার জন্যে ইংরাজ সরকার এই সব প্রকল্পের কিছু কিছু গ্রহণ করলেন, বিজ্ঞান-গবেষণায় সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন।

১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারত সরকার অনেকগুলি বিজ্ঞান প্রকল্প গ্রহণ করেন ও বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যে বহু জাতীয় বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপন করেন এবং বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যে পূর্বের তুলনায় প্রচুর অর্থব্যয় করেন। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন এত দ্রুত ও জাঁকজমকপূর্ণ হয় যে, এক বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী একে ভারতের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "নেহেরু-ভাটনগর প্রভাব" (Nehru-Bhatnagar Effect) বলে রহস্য করেন। অবশ্য পূর্বের তুলনায় যে বিজ্ঞানীদের জন্যে অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও বিজ্ঞানীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে বিজ্ঞান-গবেষণার অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হচ্ছে। কেউ কেউ সমালোচনা করে বলছেন—আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ছিল অল্প, তখনই আমাদের দেশে বিজ্ঞান-প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল। আচার্য জগদীশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, শিশির মিত্র প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ পরাধীন ভারতেই তাঁদের অনন্যসাধারণ অবদানের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আর আজ? গবেষণার সুযোগ-সুবিধা এসেছে প্রচুর, কিন্তু সেই অনুপাতে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে কোথায়? প্রতি বছরই বহু গবেষক ডি. ফিল, ডি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করছেন। কিন্তু তাঁদের কয়জনের মৌলিক অবদান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে? এই সমালোচনায় কিছু সত্য আছে, বেশ কিছু অত্যুক্তি ও ভাবাবেগ আছে। এই বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হবে।

এদেশে পঁচিশ বছর আগের তুলনায় সুযোগ-

সুবিধার সৃষ্টি ও অর্থব্যয় হয়েছে প্রচুর—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এই পঁচিশ বছর অপরাপর দেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, উন্নত দেশগুলি এই পঁচিশ বছরে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে, অর্থব্যয় করেছে, তা এদেশের তুলনায় অনেক বেশী। মনে হয়, ঐ সব দেশের তুলনায় এদেশে বিজ্ঞান-গবেষণার সুযোগ-সুবিধা পঁচিশ বছর পূর্বে যা ছিল, তার তুলনায় মোটেই সুবিধা-জনক নয়। সামগ্রিক দিক থেকে এ দেশে বিজ্ঞান-গবেষণার অনুকূলে অবস্থা তুলনামূলকভাবে সন্তোষ-জনক নয়। ওসব দেশে বড় বড় বিজ্ঞান-গবেষণায় যে গোষ্ঠী-প্রচেষ্টা (Team work) হচ্ছে, এদেশে তা সুরু হয়েছে বলে মনে হয় না। আমরা এখনও এই বিষয়ে সচেতন নই বোধ হয়।

ব্যক্তিগত প্রতিভার স্বাক্ষরই আগের দিনের মত গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে। এই বিষয়ে একটি কথা মনে রাখা উচিত। আগের দিনের যে সব বিজ্ঞানীদের আমরা এক সঙ্গে স্মরণ করি, তাঁদের সবার অবদান বিজ্ঞানে একইরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। তাঁদের কারও কারও অবদান অবশ্যই বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁদের তুলনায় স্বাধীনোত্তর কালের বিজ্ঞানীদের অবদান নিষ্প্রভ। কিন্তু তাঁদের অপরাপরদের স্মরণ করা হয়, কারণ তাঁরা প্রবল প্রতিকূল অবস্থায় মৌলিক অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যে তদানীন্তন সমাজ তাঁদের সম্মান ও সমাদর জানিয়েছে। তাঁদের সমপ্রতিভাধর বিজ্ঞানী একালেও বিরল নয়। তবে যেহেতু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু বর্তমান সমাজ এঁদের আগের ন্যায় সম্মান ও সমাদর জানাতে প্রস্তুত নয়, যদিও এঁদের কাউকে কাউকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গবেষণা করতে হয়েছে। তবে এই বিষয় অনস্বীকার্য, যে আদর্শবাদ সে যুগে বিজ্ঞানীদের প্রেরণা জুগিয়েছে, এ যুগে সে আদর্শবাদ সমাজ থেকে বিদায় নিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এই সমাজের মানুষ, তাঁদের কাছেও আদর্শবাদ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সমাজে আগের মত আদর্শবাদ ধরে রাখলে বিড়ম্বনার বা হাস্যকর হবার ভয় আছে। অপর দিকে উন্নত পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় বিজ্ঞানীর কাজ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে নি। ভারতের তথা জগতের যে দু-একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে জাতীয় অধ্যাপক পদে বরণ করা হয়েছে, তাঁদের সম্মানীরূপে যা দেওয়া হচ্ছে, তা—এমন কি, সরকারী প্রশাসন, বিচার প্রভৃতি বিভাগের বহু ঊর্ধ্বতম কর্মচারীর চেয়ে কম। শিল্পে যাঁরা আছেন, তাঁদের কথা না-ই তোললাম। সাধারণ বিজ্ঞানীদের আয় ও প্রতিষ্ঠা সরকারী বিভিন্ন বিভাগে ও শিল্পের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের চেয়ে কম। যে সব দেশের বিজ্ঞান-গবেষণা আমাদের চোখের সামনে সদা জাগরূক, সেই আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের অবস্থা ভিন্নরূপ।

এছাড়া আরও অনেক অসুবিধা আছে, যা দূর করা অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার নিয়ামক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে আদর্শ-বাদ নেই। সমাজ থেকে আদর্শবাদ লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে (বোধ হয় আগেই) এঁরা আদর্শবাদ ছেড়ে দিয়েছেন। এঁরা এরূপ ব্যবস্থা নেন বা বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞদের এমনভাবে বসান যে, সুষ্ঠুভাবে আদর্শবাদ নিয়ে বিজ্ঞান-চর্চা বা গবেষণা করা অসম্ভব এবং করতে গেলে ভাগ্যে বিড়ম্বনা জোটে। আগের দিনে এরূপ ঘটলে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা সমাজের কাছে পাওয়া যেতো। বর্তমান সমাজে স্বদেশী কর্তাদের ক্ষেত্রে তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এজন্যে অনেক সময় অনেক বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-গবেষণা সুষ্ঠুভাবে, স্বাধীনভাবে চালাবার চেয়ে কর্তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে ব্যস্ত হন। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদান আশা করা যায় কি?

নানা পরিকল্পনায় মহাবিশ্ব

অমিয়কুমার মজুমদার

সাম্প্রতিক কালে ফ্রেড হয়েল এবং জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের মহলে হৈ চৈ চলছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে অধ্যাপক হয়েলের গবেষণা প্রচলিত ধারণাকে বেশ ভাল আঘাত হেনেছে। নানাকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের সমাধানে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই রহস্য এত জটিল যে, একটা জট্ খুলতে গিয়ে দেখা যায় আর একটা জট্ এসে গেছে। অধ্যাপক হয়েল তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন। অবশ্য যে সব বিজ্ঞানী সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন নানা সময়ে, তাঁরা সকলেই নিজেদের বক্তব্য সম্পর্কে সুদৃঢ় ছিলেন। সে যাই হোক, অধ্যাপক হয়েলের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করবার আগে তাঁর পূর্ববর্তীদের গবেষণা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা যাক।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি এবং দূরপাল্লার অনেক বস্তুনিচয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমানার বিষয়ে এখনও সবাই একমত হতে পারেন নি। বিশেষতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সসীম কি অসীম, তা নিয়েই যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। মতপার্থক্য আজকের নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অ্যারিষ্টটলের কথা ধরা যাক। তিনি বলেছিলেন, পদার্থবিদের পৃথিবী (এই ব্রহ্মাণ্ড) অবশ্যই সসীম। তার নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। আবার অন্য দিকে প্রাচীন কালের পরমাণু-তত্ত্ববিদ্‌দের অন্যতম লুক্রেসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম। আর এই অনন্ত শূন্যের মধ্যে রয়েছে পরমাণুর দল। লুক্রেসিয়াস তাঁর কবিতায় লিখেছেন—দেশ বা স্থান (Space) হলো সীমাহীন, আর তা চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

মধ্যযুগের চিন্তাবিদেরা অ্যারিষ্টটলকে অনুসরণ করে বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্ব সসীম। বিগত ১৫ ৬ সালে টমাস ডিগেস নামে এক ইংরেজ জ্যোতির্বিদ সর্বপ্রথম বলেন যে, আকাশের নক্ষত্র-সমূহ আমাদের সূর্যেরই মত, আর তারা সীমাহীন স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাঁর এই মতবাদকে সাদর অভ্যর্থনা করেন বিজ্ঞানী গিয়োর্ডানো ব্রুনো। তার পরিণাম হলো অতি ভয়াবহ। ব্রুনোকে আগুনে পুড়ে মরতে হলো ১৬০০ খৃষ্টাব্দে।

নিউটনের বিশ্ব

মহাকর্ষের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে নিউটন বললেন যে, এই বিশ্বজগৎ অসীম। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, সীমাহীন স্থানে (Infinite Space) যদি সসীম বিশ্ব থাকে তাহলে তার নিজের অভিকর্ষজ টানের (Gravitational attraction) ফলে সঙ্কুচিত হয়ে একতাল বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে। ১৬৯২ সালে তাঁর বন্ধু মিঃ বেন্টলীকে এক পত্রে তিনি জানান, যদি সমগ্র বস্তু অসীম শূন্যে (Infinite Space) সমভাবে ছড়িয়ে থাকতো, তাহলে তারা কখনো জমায়েত হয়ে একটি পিণ্ড সৃষ্টি করতো না। তাহলে কিছু অংশ মিলে একটা বস্তুপিণ্ড তৈরী হতো, আবার অন্য কিছু অংশ নিয়ে আর একটা পিণ্ড তৈরী হতো। এমনিভাবে অসংখ্য বড় বড় পিণ্ড সীমাহীন স্থানে ছড়িয়ে থাকতো।

নিউটনের গ্র্যাভিটেশনের সূত্র সর্বত্র প্রযোজ্য,

এমন সুস্পষ্ট ধারণা তখনকার বিজ্ঞানীদের ছিল না। সেই অস্পষ্টতা চললো আরো এক-শ' বছর ধরে। বিজ্ঞানী হার্শেল বললেন যে, সূত্রগুলি এই সৌরজগতের বাইরেকার জগতেও প্রযোজ্য।

১৮৯৫ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ সিলিগার নিউটনের যুক্তির একটি অংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। নিউটনের মত তিনিও গোড়াতেই মেনে নিলেন যে, অসীম ইউক্লিডীয় স্থানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বস্তুপুঞ্জ—কোথাও বা বেশী, কোথাও বা কম পরিমাণে। তিনি বললেন—সমগ্র বস্তুনিচয় যেন একটা বিরাট গোলকের মধ্যে আছে, তার ব্যাসার্ধ মনে করা যাক R। তাহলে এই গোলকের ভর তার আয়তনের সমানুপাতিক হবে এবং তদনুসারে তা ব্যাসার্ধের ঘনর সঙ্গেও সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $M \propto V$

এবং $M \propto R^3$

এখানে M = গোলকের ভর, V = গোলকের আয়তন।

এই গোলকের উপরে যে কোন বিন্দুতে কেন্দ্রমুখী টান (Gravitational attraction) ভরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সমানুপাতিক এবং কেন্দ্র থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বের অর্থাৎ ব্যাসার্ধের (R) বর্গের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতিক। তাহলে আকর্ষণ হবে ব্যাসার্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সমানুপাতিক। যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অসীমও হয় (যেমন নিউটন ভেবেছিলেন), তাহলে এই বিরাট গোলকের ব্যাসার্ধও হবে সীমাহীন। কিন্তু তাহলে কেন্দ্র থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত বিন্দুসমূহে বা স্থানে প্রচণ্ড অভিকর্ষজ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। এছাড়া আরও বলা হলো, যে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র মনে করা যেতে পারে।

সিলিগারের কাছে এই যুক্তি অসম্ভব বলে মনে হলো। তিনি বললেন—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র মহাকর্ষীয় পরিমাত্রা (Gravitational intensity) অসীম, একথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁর মতে, বহু দূরবর্তী স্থানের বেলায় নিউটনের সূত্রের কিছু অদলবদল করা দরকার। নিউটনের সূত্রে তিনি একটি নতুন 'টার্ম' জুড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন, যা কেবলমাত্র মহাজাগতিক পরিমাপে (Cosmical scale) কার্যকরী হবে।

আইনষ্টাইনের বিশ্ব

এর কুড়ি বছর বাদে আইনষ্টাইন তাঁর সুবিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাধারণ সূত্রে নিউটনের অভিকর্ষীয় সূত্রের (Law of gravitation) উল্লেখযোগ্য অদলবদল করেন। আইনষ্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যে নিউটনের সূত্র অবলম্বন করে যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে, তা তো করা হলোই, উপরন্তু আরো অনেক ঘটনার ব্যাখ্যাও করা গেল। এর কিছুদিন বাদে ১৯১৭ সালে আইনষ্টাইন তাঁর অভিকর্ষের নতুন তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বস্তুর উপর প্রয়োগ করলেন। তিনি সিলিগার এবং অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীর যুক্তিতে এমন আস্থাবান হয়েছিলেন যে, 'অসীম' কথাটাকেই মুছে দিলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, বিশ্ব সামগ্রিকভাবে সসীম (Finite) অথচ প্রচলিত জ্যামিতিক সীমারেখায় তাকে টানা যায় না, অর্থাৎ unbounded-এর জ্যামিতি ইউক্লীডের 'অসীম স্থানের জ্যামিতি' নয়, তার জন্যে প্রয়োজন অন্য ধরণের জ্যামিতির, যার মধ্যে আছে সসীম অথচ আপাত সীমাহীন স্থানের কথা। এই ধরণের স্থান ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ থ্রি-ডাইমেনশনের মত। কথাটা একটু পরিষ্কার করেই বলি। আইনষ্টাইনের কথিত বিশ্ব সসীম হলেও এক স্থান থেকে যাত্রা সুরু করে এমন কোন জায়গায় পৌঁছানো যায় না, যেখানে তার শেষ হয়েছে। অর্থাৎ সীমায়িত ব্রহ্মাণ্ডেরও কোন নির্দিষ্ট প্রান্তসীমা নেই।

আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে মনে করা যেতে পারে, সমগ্র বিশ্ব আদিতেও যা ছিল এখনও

তাই আছে—একই স্থিরাবস্থায় (Static state)। কালের গতিতে এর কোন পরিবর্তন হয় নি। আলোকের গতিবেগের তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর গতি অতি তুচ্ছ বলে আইনষ্টাইন খুব সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

১৯৩০ সালে এডিংটন আবিষ্কার করেন যে, আইনষ্টাইনের বিশ্ব অস্থায়ী এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। সৃষ্টির আদিতে বিশ্বের যে চেহারা ছিল, তা এখনও স্থির আছে—আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বে এডিংটন আস্থাশীল ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ভৌত ধর্মসমূহ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দ্বারা রচিত হয় এবং সেই নিয়মাবলী আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে শাসন করে। একটি Ingenious অথচ দুরূহ যুক্তির দ্বারা বিশ্বের ইলেকট্রন এবং নিউক্লিওনের সংখ্যার মান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। সংখ্যা হলো $১০^{৭৯}$ ধরণের এবং তার ভর প্রায় $১০^{৫৫}$ গ্র্যাম। এর মানে হলো যে, ব্রহ্মাণ্ডে প্রচুর দ্রব্য রয়েছে, যা দিয়ে প্রায় ১০০,০০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সি সৃষ্টি করা যায়। আর প্রতিটিতে থাকবে ১০০,০০০ মিলিয়ন নক্ষত্র, যাদের গড়পড়তা ভর প্রায় সূর্যের মত। এই ধরণের আইনষ্টাইনীয় বিশ্বের ব্যাসার্ধ হবে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন আলোক-বর্ষ। এডিংটন বললেন—যেহেতু বিশ্ব পরিবর্তনশীল, অতএব এই মান প্রারম্ভিক। এমনিভাবে হিসাব করে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করা সম্ভব।

আইনষ্টাইনের বিশ্ব স্থির, কিন্তু অস্থায়ী। বস্তুপুঞ্জে সামান্য ধাক্কা দিলেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—হয় প্রসারিত হবে অথবা সঙ্কুচিত হবে। আইনষ্টাইন যখন তাঁর তত্ত্ব পৃথিবীকে দিলেন, তারপর থেকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন—দেখা গেছে, এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বেলুনের মত ফুলে যাচ্ছে। ফলে নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবী থেকে এবং নিজেদের কাছ থেকেও দ্রুতবেগে সরে যাচ্ছে বিশ্বের বহিঃসীমার দিকে। সিডনীর রেডিও-টেলিস্কোপ এবং মাউণ্ট পালোমারের শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে কতকগুলি আধা তারকা বা কোয়াসি ষ্টার (সংক্ষেপে কোয়াসার) আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা প্রায় আলোকের গতির অর্ধেক হারে সরে যাচ্ছে। আইনষ্টাইনের বিশ্ব-পরিকল্পনায় এই দ্রুত ধাবমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জের স্থান ছিল না, অথচ নতুন যন্ত্রের সহায়তায় জ্যোতির্বিদের কাছে জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত হয়ে চলেছে।

বিশ্বের আকার ও প্রকৃতি

বিশ্ব অসীম বা সীমান্বিত, এ নিয়ে মতভেদ সর্বদাই আছে। কিন্তু এর বিরাটত্ব সম্বন্ধে শেষোক্ত মতে আস্থাবানদেরও কোন সংশয় নেই। একে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। তবে কয়েকটি সাধারণ তথ্য থেকে এর বিরাটত্বের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। আমাদের সৌরজগতের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যে নক্ষত্র আছে, তার দূরত্ব কয়েক কোটি মাইল। সেই নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে এখানে আলো এসে পৌঁছাতে প্রায় চার বছর লাগে। আমাদের সৌরজগৎ যে নীহারিকামণ্ডলীর অতি ক্ষুদ্র অংশ—সেই মণ্ডলে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে বলে জানা গেছে। এই ধরণের প্রায় দশ কোটি নীহারিকা দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণে এমন নক্ষত্রও দেখা গেছে, যা থেকে আলো আসতে এক-শ' কোটি বছর লাগে। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, এক-শ' কোটি বছর আগেও বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল। এই নক্ষত্র আমাদের কাছ থেকে কত লক্ষ কোটি মাইল দূরে আছে, তার হিসেব মেলে। তাহলে অনুমান করা শক্ত নয় যে, এই অভাবনীয় দূরত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের এলাকা প্রসারিত। আরো জোরালো টেলিস্কোপ দিয়ে হয়তো আরো দূরের নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। তার ফলে জানা যাবে, ব্রহ্মাণ্ড কত কোটি বছর আগে বিরাজিত

ছিল এবং তার এলাকা কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ যেন হলো—কিন্তু কয়েক শ' কোটি বছর আগে কি ছিল? কি ভাবে সৃষ্টি হলো এই বিশ্বের? এর মত জটিল প্রশ্ন খুব কমই আছে।

বিস্তারশীল বিশ্ব

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুয়িন হাব্‌ল আবিষ্কার করেন যে, বিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র এবং অগণিত নীহারিকা একে অপরের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দূরে চলে যাচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে বিশ্ব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। বিশ্ব যে প্রসরণশীল তা অনেক দিন ধরেই বিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন।

বিশ্বকে একটা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা যাক। ঐ বেলুনের গায়ে অনেক বিন্দু চিহ্ন দেওয়া আছে। বেলুন যখন চুপ্‌সে থাকে, তখন বিন্দুগুলি গায়ে গায়ে লেগে থাকবে। কিন্তু বেলুন যতই ফুলবে, বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্বও তত বাড়বে। বিশ্ব-বেলুনের গায়ে বিন্দু চিহ্নগুলি নক্ষত্র-নীহারিকার দল। তফাৎ এই যে, বেলুনের মধ্যে ফাঁপা আছে, কিন্তু বিশ্ব-বেলুনের মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা নেই। এই পরিকল্পনা মেনে নিলে বিশ্বকে সীমায়িত বলা চলে না, যেহেতু বিশ্বের বিস্তার শুরু হবার সঙ্গত কারণ নেই। এখানে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে—আদি কোথায়? নক্ষত্র-নীহারিকার দল একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে জিজ্ঞাস্য—যখন থেকে অপসারণ ক্রিয়া সুরু হলো, তার আগে বিশ্বের অবস্থা কি ছিল?

নানা পরিকল্পনা

বিগ্‌ ব্যাং থিয়োরী, পালসেটিং থিয়োরী বা প্রসারণ-সঙ্কোচন তত্ত্ব এবং ষ্টেডি-ষ্টেট থিয়োরী অথবা স্থির-তত্ত্ব—এই তিনটি পরিকল্পনা বহুদিন ধরে চলে আসছে। সব কয়টিই ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরী অব রিলেটিভিটি-র সাহায্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেকটির মধ্যেই নানা ফাঁক আছে। বিজ্ঞানী প্রবর সার উইলিয়াম হার্শেল টেলিস্কোপের সাহায্যে তাঁর দৃষ্টিকে নিয়ে গেলেন ছায়াপথের বাইরে। আশ্চর্য হলেন এক নতুন তারার জগৎ প্রত্যক্ষ করে। আইনস্টাইন তা নিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য গাণিতিক ছবি আঁকলেন। সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

(১) বিগ ব্যাং থিয়োরী—বিস্তারশীল বিশ্ব অধ্যায়ের শেষ প্রশ্নটির জবাব দিলেন বিগ্‌ ব্যাং থিয়োরীর সমর্থকেরা। এঁদের মধ্যে আছেন বার্নাড লভেল, মার্টিন রাইল, জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করেন—যখন থেকে বিশ্ব বিস্তৃত হতে আরম্ভ করলো, তার কোটি কোটি বছর আগে বিশ্বের সমগ্র বস্তুনিচয় ঘননিবদ্ধ ছিল—অনেকটা ডিমের মত। তাকে বলা হলো 'কসমিক এগ্‌'। তাঁদের মতে, ১০০০-১১০০ কোটি বছর আগে বিশ্ব জমাট বেঁধে ছিল। কয়েক বিলিয়ন বছর আগে আকস্মিকভাবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে তা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। এ-থেকেই এসেছে গ্যালাক্সি এবং সূর্যসমূহ। বিস্ফোরণের পরে মহাকর্ষের ফলে খণ্ড কণাগুলি আবার দানা বাঁধতে লাগলো। তাথেকেই প্রথমে নীহারিকা ও পরে তারার জন্ম। বিস্ফোরণের ফলে বস্তু-কণাগুলির মধ্যে এত অধিক মাত্রায় বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তার ফলে নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে।

বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী Abbe´ Lemaitre এই সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলেছেন—"The evolution of the world can be Compared to a display of fireworks that has just ended; some few red wisps, ashes and smoke...standing on a well-chilled cinder, we see the slow fading of the

suns and we try to recall the vanished brilliance of the origin of the worlds."

বিগ্ ব্যাং থিয়োরীর মধ্যে প্রসরণশীল বিশ্বের ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু একটি প্রশ্ন এখনও থেকে যাচ্ছে। তা হলো—বিস্ফোরণের আগে বিশ্ব জমাট অবস্থায় ছিল তা মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু তার আগে বিশ্বের বস্তুনিচয়ের অবস্থা কেমন ছিল? সে কথার জবাব প্রায় এড়িয়ে গিয়ে বিগ্ ব্যাং থিয়োরীর সমর্থকেরা বলেন, কোটি কোটি বছর আগে বিশ্বের যেমন চেহারা ছিল, আজ আর তা নেই। তাঁরা বলেন, বিশ্ব পরিবর্তনশীল। এক বস্তু ক্রমশঃই অপরের কাছ থেকে সরে যাবার ফলে বিশ্বের আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে।

(২) পালসেটিং থিয়োরী বা প্রসারণ-সঙ্কোচন তত্ত্ব :—এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রসরণশীলতা কমে আসছে এবং এক সময়ে তা বন্ধ হয়ে যাবে। তার পরে সুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। অবশেষে বিশ্ব এক ঘননিবদ্ধ বস্তুতে পরিণত হবে, তখন হবে আবার এক বিস্ফোরণ। পরেই প্রসারণ ক্রিয়া আরম্ভ হবে এবং শেষে পুনরায় সঙ্কোচন। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলেন যে, বিস্ফোরণের ফলেই জন্ম নিয়েছে তারকাপুঞ্জ। তারপরে তারা মহাকাশে ধাবিত হতে থাকে, জন্মক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে যায়; তবে তার একটা সীমা আছে। তারপরেই আবার সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বেকার ঘনত্বে ফিরে আসে।

এই প্রকল্প সত্য হলে একবার প্রসারণ-সঙ্কোচনের চক্র সম্পূর্ণ হতে প্রায় তিরিশ হাজার মিলিয়ন বছর লাগবে। তা মেনে নিলে দেখা যায় যে, এখন পর্যন্ত প্রসারণ পর্বের ⅓ অংশ সমাপ্ত হয়েছে মাত্র। এঁরা বলেন, পদার্থের ক্রমশঃ রূপান্তর ঘটছে—রূপান্তরণের পথে শক্তি উদ্ভূত হচ্ছে বা হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বের সামগ্রিক বস্তু বা শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। একথা বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। যদি আমরা ধরে নেই যে, পদার্থ (Matter) এবং শক্তি (Energy) উভয়ে উভয়ের জন্ম দিতে পারে, অর্থাৎ পদার্থ থেকে শক্তি আবার শক্তি থেকে পদার্থ জন্ম লাভ করতে পারে, তাহলেই গোল চুকে যায়।

কতিপয় জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে, সৃষ্টির মুহূর্তে যখন সমগ্র বিশ্ব বস্তুপিণ্ডরূপে অথবা অতি ঘননিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন তা ছিল, শুধু শক্তিপুঞ্জ। তারপর বিশ্ব যত প্রসারিত হতে লাগলো, তখন শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে আরম্ভ করলো। পূর্বেকার তত্ত্ব অনুসারে একথা ধারণা করা যেতে পারে, শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে বস্তুতে পরিণত হবে, তখন তার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে দেশ ও কাল লুপ্ত হবে।

পালসেটিং থিয়োরী অনুসারে জানা যায় যে, সর্বোত্তম বিস্তৃতির সময়েও অনেক শক্তি বাড়তি থাকে। তার ফলে গ্যালাক্সিপুঞ্জ (Cluster of Galaxies) তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের সাহায্যে (গ্র্যাভিটি) ফের চলতে সুরু করতে পারে এবং বিপরীত ক্রিয়া বা সঙ্কোচনের পালা আরম্ভ হয়।

(৩) স্থির-তত্ত্ব বা ষ্টেডি-ষ্টেট থিয়োরী—এই তত্ত্বের মোদ্দা কথা হচ্ছে, বিশ্ব অনন্ত কাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অন্তিমদশা প্রাপ্ত হলে তার জায়গায় নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই। আদিতে যে সংখ্যক নক্ষত্র ছিল এখনও তাই আছে।

ফ্রেড হয়েল

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের মতবাদ স্থির-তত্ত্বের অনুগামী। 'কোয়াসার'-এর আবিষ্কারের পর হয়েল এক নতুন তত্ত্ব পেশ করেছেন জগতের সামনে। তিনি সেই তত্ত্বের নাম দিয়েছেন সি-ফিল্ড অর্থাৎ ক্রিয়েশন ফিল্ড। হয়েল এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশ্বের কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করেন না। বিশ্ব

যে বিস্তারশীল, তা হয়েল স্বীকার করেন। তবে এর ফলে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে, তা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব সৃষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ধাক্কাতে বিশ্ব বেড়ে চলেছে। যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা স্থান মুহূর্তে ভর্তি করে দিচ্ছে নতুন বস্তু এসে।

বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী লামাত্রেঁর প্রকল্প থেকে হয়েলের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর পরিকল্পনায় কোন শোচনীয় অবস্থার ইঙ্গিত নেই। তিনি বলেন, মহাকাশ কখনো গ্যালাক্সিবর্জিত অবস্থায় থাকবে না। হয়তো দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেক গ্যালাক্সি দেখা যাবে না। কারণ তারা ক্রমশঃ হটে যাচ্ছে। তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে নতুন ব্রহ্মাণ্ড। যে হারে বস্তু সরে যাচ্ছে ঠিক সেই হারে নতুন বস্তু তৈরী হচ্ছে। এই হার খুব কম। বাস করবার ঘরের পরিমিত স্থানে একটি সম্পূর্ণ নতুন হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি হতে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর লাগে। তবে যেহেতু এই পদ্ধতি অনাদি কাল ধরে চলে আসছে, সেহেতু প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০ টন (প্রায় পঞ্চাশটি সূর্যের ওজনের সমান) প্রতি সেকেণ্ডে উদ্ভূত হচ্ছে। এই সৃষ্টির কাজ অতি রহস্যময়। কোন্ শক্তি থেকে এই বস্তুনিচয় সৃষ্টি হচ্ছে তা আগে বলা হয়েছে, কিন্তু এই শক্তি কোথা থেকে আসছে, তার হদিশ এখনও পাওয়া যায় নি। এ এক গভীরতর রহস্য।

এই যে অনবরত বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, তা আসছে কোথা থেকে? হয়েলের কথায় 'It dose not come from anywhere. Material simply appears, it is created'। এই প্রসঙ্গে অনেকেই বলতে বাধ্য হবেন, হয়েলের কথাটাই রহস্যময়। ক্রমাগত সৃষ্টির ফল কি? তার উত্তরে হয়েল বলছেন—তা খুব সম্ভবতঃ এই যে, পিছনের বস্তুপুঞ্জের (Background material) গড় ঘনত্ব ধ্রুব থাকে।

তাঁর মতে, নতুন বস্তু ঘননিবদ্ধ অবস্থায় স্বল্প স্থানে থাকে না, বরং তা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। নবসৃষ্ট বস্তুপুঞ্জ কল্পনাতীত পরিমাণে পারমাণবিক শক্তির জোগান দেয়।

বছর চারেক আগে হয়েলের সহকর্মী অধ্যাপক মার্টিন রাইল রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তার ফলে তিনি বলেছিলেন যে, কয়েক শ' কোটি বছর আগে নক্ষত্রবিন্যাস এখনকার চেয়ে অনেক ঘন ছিল। যদি এই তথ্য সত্য হয়, তাহলে বিশ্ব যে পরিবর্তনশীল, তাতে সন্দেহ থাকবে না। তাহলে হয়েলের তত্ত্ব টিকবে কি না সন্দেহ। অবশ্য হয়েলের তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁচেছেন এইচ. বণ্ডি ও টি. গোল্ড। হয়েল যে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে খুব সচেষ্ট হচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ম্যাক্‌ক্রিয়া

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়াল হলওয়ে কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম এইচ. ম্যাক ক্রিয়া 'Continual creation' তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেছেন। রয়াল অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক খবরাখবরে তিনি বলেছেন—যেখানে বস্তু সবচেয়ে ঘন, সেখান থেকেই নতুন বস্তুর সৃষ্টি হয়। তাঁর তত্ত্ব হচ্ছে 'Continual creation of new matter is a property of existing matter depending upon its physical state'।

তাঁর পরিকল্পিত বিশ্বে বস্তুর জন্মস্থান হচ্ছে গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির বক্ষের গভীরে নতুন পরমাণুর আবির্ভাব ঘটে। তারা একত্র মিলিত হয়ে নতুন তারা সৃষ্টি করে অথবা পুরাতন বস্তুর সঙ্গে নতুন বস্তুর মিলন ঘটায়। গ্যালাক্সি ফুলে

তার শেষ সীমায় উপনীত হয়। তাতে এবং বস্তুপিণ্ড ছিট্‌কে বাইরে ফেলে দেয়। ছিট্‌কে আসা খণ্ড থেকেই সৃষ্টি হয় নতুন গ্যালাক্সি। বিশ্বের বিস্তৃতির ফলে যে শূন্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তা পরিপূর্ণ করবার জন্যেই নতুন গ্যালাক্সির সৃষ্টি হচ্ছে, হয়েল বা আরো কয়েকজন বিজ্ঞানীর এই ধারণায় তিনি তেমন আস্থাশীল নন।

বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে নানা চেষ্টা চলছে। কত থিয়োরী আসছে আবার ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। হয়েল নিজেই বলেন—থিয়োরীগুলি বৃটেনের মার্চ মাসের মত। যখন আসে তখন তার বীরবিক্রম দেখে মনে হয়, এ নির্ঘাৎ সিংহ, যখন বেরিয়ে যায়, তখন মেষশাবকটি মাত্র। বিজ্ঞানীমহলে তর্কের ঢেউ উঠছে। একজন আর একজনকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করছেন। রহস্যময় মহাবিশ্ব চিররহস্যে আবৃত হয়ে থাকবে কি না কে জানে! আমরা আশা করবো—রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হোক।

কৃত্রিম রাবার

সোমনাথ চক্রবর্তী

রাবার নামক বস্তুটির সঙ্গে আধুনিক জগতের পরিচয় কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর। কলাম্বাস ভারতবর্ষে পৌঁছাবার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছালেন এবং সেই দেশকেই ভারতবর্ষ বলে ভাবলেন। সেখানকার অধিবাসীদের তিনি একরকম গাছের রস ব্যবহার করতে দেখেছিলেন, যার কয়েকটি বিশেষ গুণ তাঁকে আকৃষ্ট করে। যেমন—কোন বস্তুর উপর ওই রসের প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিলে সেটা জলে ভিজে যায় না অথবা ওই রসের জমানো টুক্‌রা মাটিতে ফেললে সেটা লাফিয়ে ওঠে—যে গুণকে পরে স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়েছে। ওই রসের জমানো টুক্‌রা দিয়ে ঘষে লেড পেন্সিলের দাগ মুছে ফেলা যায়, যার জন্যে বস্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে রাবার (Rubber)।

কলাম্বাসের যুগ বহুদিন কেটে গেছে। তারপর অনেক স্থানে রাবার গাছ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ হচ্ছে। রাবারের বহু প্রয়োজনীয় গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক মতে চাষ হচ্ছে। রাবারের বহু গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার জন্যে আজ রাবারের মূল্য ব্যবসায়িক এবং বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিতেই অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে প্রাকৃতিক রাবার না পাওয়ার ফলে এবং সব দেশে এই পদার্থটা পাওয়া যায় না অথবা চাষ করা সম্ভব নয় বলে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তা সুরু হলো।

প্রায় এক শতাব্দী ধরে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের একাংশ চিন্তা এবং পরিশ্রম করেছেন কৃত্রিম উপায়ে রাবার তৈরী করবার জন্যে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম প্রাকৃতিক রাবার বিশ্লেষণ করে দেখান যে, কার্বন (C) এবং হাইড্রোজেন (H)—এই দুটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা রাবার তৈরী এবং এদের অনুপাত ৫ : ৮। অর্থাৎ রাবারের প্রাথমিক সূত্র (Emperical formula) হলো C_5H_8। পরবর্তী কালে অনেক বৈজ্ঞানিক, যেমন—ডুমাস, হিমলি, লিবিগ, ড্যালটন প্রমুখ

বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কার সমর্থন করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গ্রেভিলে উইলিয়ামস্ প্রথম C_5H_8 বস্তুটি রাবার থেকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করেন এবং এর নাম দেন আইসোপ্রিন। রাবারে এই রূপ লক্ষাধিক আইসোপ্রিন একক (Unit) রয়েছে। যেহেতু রাবার থেকে লক্ষ আইসোপ্রিন পাওয়া যায়, সেহেতু যদি লক্ষ আইসোপ্রিন (কৃত্রিম উপায়ে তৈরী) সংযোগ করা যায়, তাহলে কৃত্রিম রাবার তৈরী করা যাবে। এইরূপ সংযোগ ক্রিয়াকে বহুযৌগিক ক্রিয়া (Polymerisation) বলে। এই ক্রিয়ার দ্বারা যে যৌগিক তৈরী হয় তাকে পলিমার বলে। পলিমার বহু এককের (Monomer unit) দ্বারা তৈরী এবং উভয়ের প্রাথমিক সূত্র এক কিন্তু অণুভার (Molecular weight) আলাদা; অর্থাৎ পলিমারের অণুভার তত গুণ, যত সংখ্যক একক (Monomer unit) লেগেছে পলিমারটি তৈরী হতে।

কৃত্রিম রাবার প্রথম তৈরী হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। ওয়ালাক (Wallach) নামে এক বৈজ্ঞানিক দেখান যে, অনেক দিন ধরে যদি আইসোপ্রিন (যা তিনি তারপিন তেল থেকে তৈরী করেছিলেন) আলোয় একটি বদ্ধ কাচের পাত্রে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা ধীরে ধীরে শক্ত রাবারের মত বস্তুতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে টিলডেনও আইসোপ্রিন থেকে কৃত্রিম রাবার তৈরী করেন।

আইসোপ্রিন যা থেকে তৈরী হতো, সেই তারপিন তেলের মাত্রা সীমাবদ্ধ হবার ফলে আইসোপ্রিন প্রস্তুতের জন্যে অন্য কৃত্রিম উপায়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হলো, যাতে প্রচুর মাত্রায় কৃত্রিম রাবার তৈরী করা যায়। জৈব রসায়নে আইসোপ্রিন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (Unsaturated hydrocarbon)-এর ডাইওলিফিন (Diolefins) শ্রেণীভুক্ত। অতএব রাসায়নিকেরা চিন্তা করে দেখলেন, যদি ডাইওলিফিন শ্রেণীর একটি পদার্থের দ্বারা কৃত্রিম রাবার তৈরী করা যায়, তবে নিশ্চয়ই অন্যান্যগুলির দ্বারাও কৃত্রিম রাবার তৈরী হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য সেই রাবার হয়তো ঠিক প্রাকৃতিক রাবারের মত হবে না, কিন্তু সেই রাবারগুলি উন্নততরও হতে পারে। পরে দেখা গেল তাঁদের চিন্তা ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ইতিমধ্যে মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ের উন্নতির জন্যে (যাতে প্রচুর রাবারের তৈরী অংশ থাকে) এবং বিশ্বযুদ্ধের জন্যে রাবারের চাহিদা খুবই বেড়ে গেল। প্রাকৃতিক রাবারের দ্বারা সে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। কাজেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর মাত্রায় রাবার প্রস্তুতের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত করা হলো।

জার্মেনীর বেয়ার কোম্পানীর হফ্ম্যান এবং কাউটেলি আইসোপ্রিনকে ২০০°C-এ ৮ দিন গরম করে কৃত্রিম রাবার তৈরী করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হ্যারিস অ্যাসেটিক অ্যাসিড-এর উপস্থিতিতে আইসোপ্রিনকে ১০০°C-এ গরম করে (৮দিন) কৃত্রিম রাবার তৈরী করেন। আইসোপ্রিন শ্রেণীর অন্য এক সভ্য হলো বুটাডাইন, যার প্রাথমিক সূত্র হলো C_4H_6। একে আইসোপ্রিনের ছোট ভাই বলা যায়। ১৯১০ সালে লেবেডেভ (Lebedev) এর থেকে কৃত্রিম রাবার (যার নাম বুটাডাইন রাবার) তৈরী করেন। রাশিয়ায় বেশীর ভাগ রাবার এই উপায়ে তৈরী হয়। আরেক জন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক অস্ট্রোমিস্লেনস্কি আইসোপ্রিন এবং অ্যালকোহল থেকে উন্নততর উপায়ে কৃত্রিম রাবার তৈরী করেন, যা পরে যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মেনীতে ব্যবহার করা হয়। যদিও কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের গবেষণা বিশেষ করে রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ডেই চলেছিল, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর উৎপাদন প্রথম জার্মেনিতেই হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মেনীতে প্রাকৃতিক রাবার রপ্তানী একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো। জার্মেনীর রাবার ব্যবসায়,

বিশেষ করে প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরীর কাজ শোচনীয় অবস্থার দিকে অগ্রসর হলো। এই অবস্থাই জার্মেনীকে কৃত্রিম রাবার তৈরীর দিকে বিশেষ নজর দিতে এবং দ্রুত সাফল্য লাভ করতে বাধ্য করলো। এই সময় জার্মেনীতে মিথাইল রাবার নামে এক রকম কৃত্রিম রাবার চালু হলো, যা ডাইমিথাইল বুটাডাইন (Dimethyl butadine) থেকে তৈরী করা হয়। কিন্তু এই রাবারের উপযুক্ত গুণাবলী না থাকায় পরে সেটি পরিত্যক্ত হয়। জার্মেনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় ২৩৫০ টন কৃত্রিম রাবার তৈরী করে। বিশ্বযুদ্ধের পর আবার যখন প্রাকৃতিক রাবার পাওয়া যেতে থাকে, তখন কৃত্রিম রাবার তৈরীর হার অনেক পড়ে যায়। জার্মানীতে সেই সময় যে কৃত্রিম রাবারগুলি তৈরী হতো, সেগুলির নাম নীচে দেওয়া হলো।

ব্যবসায়িক নাম	তৈরীর বছর	রাসায়নিক প্রকৃতি
বুনা ৮৫	১৯৩৫	বুটাডাইন থেকে
বুনা ১১৫	,,	প্রকৃতি একই কেবল অণুভার বেশী
বুনা এস	,,	বুটাডাইন ও স্টাইরিন থেকে
পারবুনান অথবা বুনা এন	১৯৩৬	বুটাডাইন ও এক্রাইলোনাইট্রাইল থেকে
পারডুরেন	১৯৩৭	ডাইক্লোরো ইথাইল ইথার থেকে

জার্মেনীতে কৃত্রিম রাবার তৈরীর মাত্রা (মেট্রিক টন)

	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪
বুনা এস	২,১১০	৩,৯৯৪	২০,৫৭৬	৩৭,১৩৭	৬৫,৮৮৯	৯৪,১৬৬	১১০,৫৬৯	৯৭,৫৯৩
বুনা এন	৪০০	৬৪০	১,১২৬	১,৮৯৮	২,৮৩১	২,৮২৪	৩,৬৫৬	৩,১১২

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বৃটেন বিশেষ মাত্রায় কোন কৃত্রিম রাবার তৈরী করে নি। বৃটেন আমেরিকা থেকে নিওপ্রিন নামে একরকম কৃত্রিম রাবার আমদানী করতো। যুদ্ধের সময় বৃটেনে সামান্য মাত্রায় নিওপ্রিন ও থায়কল নামক কৃত্রিম রাবার তৈরী করা হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগে যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রাবার তৈরীর দিকে কোন নজর ছিল না। জার্মেনী এবং রাশিয়ার এদিকে সাফল্য দেখে তারাও কৃত্রিম রাবার তৈরীর প্রতি মনোযোগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে তখন থায়কল (১৯৩০) এবং তারপর নিওপ্রিন (১৯৩১) নামে কৃত্রিম রাবার চালু হয়। এর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুটাইল রাবার এবং বুটাডাইন স্টাইরিন রাবার (১৯৪২) চালু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাই আমেরিকাকে কৃত্রিম রবার তৈরীর প্রতি বিশেষ শক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য করলো। ১৯৪৪ সালে সিলিকন রাবার, ১৯৪৬ সালে পলিইউরেথেন রাবার, ১৯৪৭ সালে কোল্ড রাবার ও ১৯৫১ সালে অয়েল এক্সটেনডেড রাবার তৈরী হয়। নীচে আমেরিকার কৃত্রিম রাবার তৈরীর মাত্রা দেওয়া হলো।

খৃঃ	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪২	১৯৪৫	১৯৪৮	১৯৫০	১৯৫২
মাত্রা (লং টন)	১,৭৫০	২,৫৫০	২২,৪৭৫	৮২০,৩৫২	৪৮২,৩৪৩	৪৭৬,১৮৪	৭৯৮,৫১১

ক্যানাডায় কৃত্রিম রাবার তৈরীর পরিমাণ (লং টন)

খৃঃ	১৯৪৩	১৯৪৫	১৯৪৭	১৯৫০	১৯৫২
পরিমাণ	২,৫২২	৪৫,৭১৭	৪২,৩৯৩	৫৮,৪৪০	৭৪,২৭২

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার দ্বারা জার্মেনীর কৃত্রিম রাবার (সোডিয়াম রাবার) তৈরীর অসাফল্যের অবস্থায় পরিত্যক্ত প্রথাকে উন্নত করে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রচুর কৃত্রিম রাবার উৎপাদন সুরু করে। এর নাম দেওয়া হয় এস. কে. রাবার (S. K. Rubber)। নীচে রাশিয়ার কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হলো।

সাল	১৯৩৪	১৯৩৬	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪৮
পরিমাণ (লং টন)	১১,১৩৯	৪৪,২০০	৫৩,০০০	৭৮,৫০০	১২৫,০০০

আধুনিক কালে রাশিয়া অনেক রকম কৃত্রিম রাবার উৎপাদন করে এবং উৎপাদনের পরিমাণও প্রচুর বেড়ে গেছে।

রাবার ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে কৃত্রিম রাবারের প্রয়োজনীয়তাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। নীচে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে আধুনিক কালে কৃত্রিম রাবারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

বিশ্বের কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের পরিমাণ (লং টন)

সাল	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪২	১৯৪৪	১৯৪৬	১৯৪৮	১৯৫০	১৯৫২
পরিমাণ	২৩,১৪৮	৪২,৫৮৬	১২০,৬১১	৯০০,৫২৫	৮০৬,৫১৪	৫৩২,১৮৬	৫৩৪,৬২৪	৮৭৭,৭৬৯

যদিও ভারতবর্ষের রাবার ব্যবসায় বিশেষ প্রসার লাভ করে নি তথাপি আধুনিক কালে এর প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেছেন। কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি নতুন রাবার ফ্যাক্টরী খোলা হয়েছে। অবশ্য এগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায়। উত্তর প্রদেশের বেরিলীতে সরকারের মালিকানায় একটি কৃত্রিম রাবার (বুটাডাইন ষ্টাইরিন) তৈরীর কারখানা খোলা হয়েছে। আশা করা যায় যে, ভারত একদিন যথেষ্ট মাত্রায় কৃত্রিম রাবার উৎপাদন করবে, যাতে তার রাবার ব্যবসায় অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে চলতে পারবে এবং অনেক বিদেশী মুদ্রা বাঁচাতে সক্ষম হবে।

আলোর রূপ ও তার ঘটনাবলীর তাত্ত্বিক ভিত্তি

হিরন্ময় চক্রবর্তী

আলো বলতে এমন একটা বিকিরণ শক্তিকে বোঝায়, যা যে কোন বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে। এর মধ্যে আরো কয়েক রকমের বিকিরণও আছে, যেগুলি কোন বস্তুকে সরাসরি দৃশ্যমান করে তোলে না; যেমন—রঞ্জেন রশ্মি, অতিবেগুনি ও অবলোহিত রশ্মি। এদের আর সব ধর্মই দৃশ্য আলোকের মত। বিজ্ঞানীরা আলোক-বিজ্ঞানকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন; যথা :—

(১) জ্যামিতিক আলোকবিদ্যা (Geometrical optics),

(২) ভৌত আলোকবিদ্যা (Physical optics),

(৩) কণিকা আলোকবিদ্যা (Quantum optics)।

জ্যামিতিক আলোকবিদ্যার মূল কথা হচ্ছে, আলো সরল পথে চলে। এর একটা উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক প্রমাণ হচ্ছে, সূচীছিদ্র ক্যামেরা (Pin-hole camera)। এটি ছবি তোলবার একটা অতি সাধারণ যন্ত্র—এতে কোনও লেন্সের সাহায্য নেওয়া হয় না। একটা চতুষ্কোণ বাক্স, ভিতরে কালো রং-করা, আর সামনের দিকে একটি মাত্র সূচীছিদ্র (এই ক্যামেরা দিয়ে তোলা চিত্তাকর্ষক একটা ছবি পাঠকেরা এস. ই. হোয়াইটের "ক্ল্যাশিক্যাল মিকানিক্স অ্যাণ্ড মডার্ন ফিজিক্স" নামক বইয়ের ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন)।

এছাড়া জ্যামিতিক আলোকবিদ্যায় আলোক রশ্মিকে আরও কতকগুলি নিয়মে বাঁধা হয়েছে—

(ক) আলোর প্রতিফলন (Reflection),

(খ) আলোর প্রতিসরণ (Refraction),

(গ) আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion)।

প্রতিফলনের জন্যে আমরা দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, ছায়াছবির পর্দায় প্রতিবিম্ব (বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ফলে) দেখতে পাই। এক্ষেত্রে আলোকরশ্মি আপতন বিন্দুর উপর অঙ্কিত অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণে নত হয়ে আসে, ঠিক সেই কোণ করেই তারা ফিরে যায় এবং ফিরে যাবার সময় অভিলম্ব আর আপতিত রশ্মির সঙ্গে এক সমতলে থাকে। প্রতিসরণের জন্যে জলের নীচে মাছ, স্থলভাগের গাছপালা আর মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। প্রতিসরণের অবস্থা হয় আলোকরশ্মির মাধ্যম পরিবর্তনের সময়ে। আমরা যেমন কোন তরল পদার্থকে ঘন এবং লঘু বলি তার অবস্থা লক্ষ্য করে, সে রকম আলোকের এই মাধ্যমও বিভিন্ন ঘনত্বের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আলোকরশ্মি আপতন বিন্দুতে পড়ে' ঐ বিন্দুর উপর অঙ্কিত অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণে থাকে, ঘনতর মাধ্যমে যাবার সময় সেই কোণ যায় ছোট হয়ে, আর তাই রশ্মি-সমূহ অভিলম্বকে ঘেঁষে থাকে। এক বিশেষ অবস্থায় আলোর প্রতিসরণ প্রতিফলনে রূপান্তরিত হয়, যাকে আমরা আভ্যন্তরীণ সম্পূর্ণ প্রতিফলন বলি। মরুভূমির মরীচিকা হচ্ছে এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আলোর বিচ্ছুরণের জন্যে আমরা সমসত্ত্ব বেলনাকৃতি (Cylindrical) কাচের দণ্ড দিয়ে সাদা আলোকে সাতটি বিভিন্ন রঙে দেখতে পাই।

ভৌত আলোকবিদ্যা হচ্ছে এক মজার মজার তত্ত্বের সমন্বয়। পিথাগোরাস মনে করতেন, আলো হচ্ছে স্বয়ংপ্রভ বস্তু থেকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার বিচ্ছুরণ। প্লেটো ভাবতেন, এটা চোখ

থেকে এক রকম নিঃসরণ, যা বস্তুকে তন্ন তন্ন করে খোঁজে। যেই মাত্র বস্তুটি তার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখনই দৃশ্য হয়ে ওঠে। অ্যারিষ্টটল বলতেন, অপার্থিব কিছু চোখ এবং বস্তুর দেশমধ্যস্থ হয়ে দৃষ্ট হয় যা—তাই আলো। এসবই আলো সম্বন্ধে অতি সাধারণ ধারণা। সপ্তদশ শতকে দুটি জোড়ালো তত্ত্বের অবতারণা করলেন দুইজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তত্ত্ব দুটি হলো—হাইগেন্সের তরঙ্গবাদ (Wave theory) আর নিউটনের কণিকাবাদ (Corpuscular theory)। কতকগুলি প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে তাঁরা আলোর বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করলেন, আর তাই থেকে পরীক্ষালব্ধ ফল আর বাস্তব ফলে যথেষ্ট সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন। নিউটনের তত্ত্বানুসারে আলো হচ্ছে—অদৃশ্য কতকগুলি উচ্চ-গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। স্বয়ংপ্রভ বস্তু থেকে সেগুলি নিঃসৃত হয়ে দর্শনগ্রাহ্য হয় এবং বিভিন্ন আকৃতির কণিকার জন্যে বিভিন্ন রং দেখা যায়। ডাচ্ বিজ্ঞানী হাইগেন্স তাঁর তরঙ্গবাদে বললেন, আলো হচ্ছে অসংখ্য অনুদৈর্ঘ্য (Longitudinal) স্পন্দন। তরঙ্গগতির জন্যে তার বাহকরূপে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেল শূন্য স্থানেও আলো প্রবাহিত হয়। হাইগেন্স মনে করলেন, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এমন কিছু বর্তমান, যার জন্যে আলোর গতি শূন্যে বলে যাকে মনে হয়, সেটা প্রকৃতই শূন্য নয়। বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এর নাম দিলেন তিনি ইথার। এভাবে তিনি আলোর রূপ দিলেন ইথারের মধ্যে অনুদৈর্ঘ্য-তরঙ্গের অবস্থানকে। এই সব তত্ত্বের মাধ্যমে আলোর ব্যতিকরণ (Interference), বিক্ষেপণ (Diffraction) সমস্তই ঠিক ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা গেল।

বৃহদাকার নিরেট কাচ-গোলক থেকে খুব পাতলা করে এক অংশ কেটে নিয়ে গোলাকার দিক (চিত্র ক) একটি সমতল কাচের উপর রেখে সমতল দিকে যদি লম্বভাবে সমান্তরাল আলোক-রশ্মি ফেলা যায় তবে লম্বভাবে ঐ কাচের সমতল দিকে তাকালে (যদিও এক্ষেত্রে অল্প ক্ষমতার অণুবীক্ষণ যন্ত্র একান্তই আবশ্যক) এককেন্দ্রিক (Concentric) কতকগুলি উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বৃত্ত দেখা যাবে (চিত্র খ)। এগুলি প্রথম দেখেছিলেন নিউটন; তাই তাঁর নামানুসারে এই বৃত্তগুলি নিউটনের-বৃত্ত নামে পরিচিত। এই ঘটনার নাম হচ্ছে আলোক ব্যতিকরণ। আলোক-রশ্মি সমসত্ত্ব কোন উৎস থেকে সমান্তরালভাবে এসে যদি কোন এক বিন্দুতে একই দশায় (Phase) মিলিত হয়, তবে উজ্জ্বল রেখা তৈরী করে, আর যদি বিপরীত

চিত্র ক

চিত্র খ

দশায় মিলিত হয়, তবে অনুজ্জ্বল রেখা (এক্ষেত্রে বৃত্ত) তৈরী করে। আলোক-রশ্মির এই দশা-বৈষম্য নির্ভর করে তাদের পথ পরিক্রমার বৈষম্যের (Path difference) উপর। উৎস থেকে অসংখ্য আলোক-রশ্মির বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় আলোর এই ব্যতিকরণ হয়। দুই বা ততোধিক আলোক-রশ্মি যুক্ত হওয়ায় প্রাবল্যের পরিবর্তনই (Modification of intensity) আলোর ব্যতিকরণ। অনুরূপ কারণেই জলের উপর তেল বা পেট্রোল পড়লে রামধনু-রং দেখা যায়।

প্রথম ক্ষেত্রে তারের মুখ্য ছায়ার দু'পাশে কতকগুলি উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল সমান্তরাল সরল রেখা দেখা যাবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একই ঘটনা দেখা যাবে ব্লেড দুটার মধ্যের ফাঁকা অংশের প্রতিবিম্বের দু'পাশে (চিত্র গ)। এই ঘটনাকেই বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ, আর রেখাগুলিকে বলা হয় বিক্ষেপণ রেখা। তারের বাধা অথবা ব্লেড দুটার মধ্যের ফাঁকা অংশ পার হওয়া মাত্র আগত আলোক-রশ্মি সমান্তরালভাবে তার দু'পাশে এক সমকোণ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

চিত্র গ

চিত্র ঘ
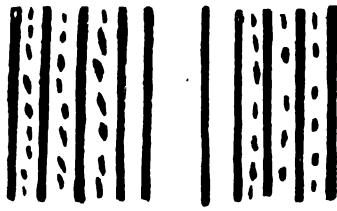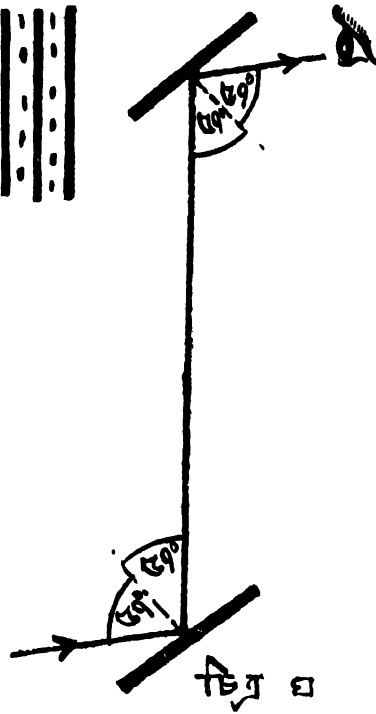
বৃহদাকারের কোন বস্তুকে আলোর গতিপথের মধ্যে রাখলে পর্দায় তার ছায়া দেখতে পাই তার জ্যামিতিক আকারে; কিন্তু যদি আমরা সরু একটা তার বা দুটা ব্লেডকে খুব পাশাপাশি একই উল্লম্বতলে (Vertical plane) রেখে পর্দা লক্ষ্য করি, তবে আমরা কি তাদের সেই জ্যামিতিক আকারের ছায়া দেখতে পাব? মোটেই নয়।

বিক্ষেপণ কোণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আগত আলোক-রশ্মির পথ পরিক্রমার পার্থক্য হয়, আর পূর্ব কারণানুযায়ী উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল রেখার উৎপত্তি হয়। বিক্ষেপণ কোণ যত বৃদ্ধি পায়, ঐ উজ্জ্বল রেখাগুলির প্রাবল্য তত কমতে থাকে। বিক্ষেপণ কোণ এক সমকোণ হলে অনুরূপ আর কোন রেখার উৎপত্তি হয় না। একই ভাবে

ব্লেডের ফাঁকা অংশের প্রতিবিম্ব সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আর তার দু'ধারে অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ফরাসী বিজ্ঞানী ম্যালাস্ আলোর আর এক বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। আলোর এই বিশেষ ঘটনার নাম সমবর্তন (Polarisation)। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব (Electromagnetic theory) ছাড়া এর প্রকৃতি উদ্ঘাটন করা গেল না। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বানুসারে আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ ও চুম্বক ভেক্টরের * সমষ্টি, যারা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত।

দুটি সমান্তরাল সমতল কাচের একটির উপর সমান্তরাল আলো এমন ভাবে ফেলা হলো, যাতে আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় কাচে পড়তে পারে (চিত্র ঘ)। এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রের প্রতিফলিত রশ্মি যথার্থই ঐ নির্গত রশ্মির দিকে তাকালে আমরা আলো দেখতে পাবো। কিন্তু যদি দ্বিতীয় কাচটিকে প্রথমটার সমান্তরাল রেখে ঘোরানো হয়, তবে এমন এক অবস্থা আসবে যখন আর ঐ প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি দেখা যাবে না। পুনরায় অনুরূপভাবে ঘোরালে আলো দেখতে পাওয়া যাবে। আরও দেখা যাবে যে, অন্ধকার অবস্থার পর ঘূর্ণন কোণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোর প্রাবল্যের বৃদ্ধি হবে। ঘূর্ণন কোণ যখন এক সমকোণের সমান, আলোর প্রাবল্য তখন সবচেয়ে বেশী হবে। এক্ষেত্রে আলোক-রশ্মির আপতন কোণ ৫৭° হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। আলোর এই অবস্থার নাম সমবর্তন। যে অবস্থায় প্রতিফলিত আলো একেবারেই দেখা যায় না, তার নাম পূর্ণ সমবর্তন।

বিদ্যুৎ বা চুম্বক ভেক্টরের কারও আংশিক বা পূর্ণ অনুপস্থিতিই সমবর্তনের কারণ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন টেলিগ্রাফ অপারেটার স্মিথ। তিনি দেখলেন যে, সূর্যের আলো পড়ায় সেলিনিয়ামের (মৌলিক ধাতু বিশেষ) প্রতিরোধকতার (Resistance) পরিবর্তন হচ্ছে। এলষ্টার এবং গাইটেল এর কিছুদিন পরে দেখলেন, বায়ুশূন্য কোয়ার্জ বাল্বের ভিতর দুটি দস্তার পাত্‌কে ব্যাটারীর ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যোগ করে যদি ঋণাত্মক পাতের উপর অতিবেগুনী রশ্মি ফেলা যায়, তবে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধনাত্মক পাতে ফেলে এরকম কোন বিদ্যুৎ-সৃষ্টি লক্ষ্য করা গেল না। এথেকে বোঝা গেল যে, আলোর প্রভাবে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার (Electron) উৎসরণ হয়। আলোর কারণে এর উৎপত্তি বলে এর নাম দেওয়া হলো আলোক-বিদ্যুৎ। ম্যাক্স-ওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের সাহায্যে গণনা করে দেখা গেল, এই বিদ্যুৎকণার নিঃসরণ আলো পড়বার পাঁচশত দিন পরে হওয়া উচিত যা পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে দেখা গেল যে, আলো পড়বার এক সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময় পরেই এই কণার উৎসরণ হয়। ১৯০৫ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এই তথ্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে প্ল্যাঙ্কের কণিকাবাদের (Quantum theory) সাহায্য নিলেন। তিনি বললেন, আলোক শক্তি তার সমস্ত তরঙ্গে সমান ভাবে বণ্টিত নয়, নির্দিষ্ট কতকগুলি কেন্দ্রে সঞ্চিত শক্তির সমষ্টি। কেন্দ্রীভূত এই শক্তিবিশিষ্ট কণাকে তিনি ফোটন বললেন। তিনি আরও বললেন যে, এর এক অতি সামান্য অংশ ব্যয়িত হয় ইলেকট্রনকে পাত থেকে নিঃসৃত করবার সময়, বাকী সমস্তই গতিশক্তিতে (Kinetic energy) রূপান্তরিত হয়। এই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মিলিকান প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক (Planck constant 'h') বের করে। পূর্বনির্ণীত মানের সঙ্গে তাঁর প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক মানের অদ্ভুত সামঞ্জস্য

---

* ভেক্টর এক প্রকার রাশি ; দিক ও মান উভয়ই বর্তমান।

দেখিয়ে তিনি আলোক-বৈদ্যুতিক ফলকে (Photo-electric effect) প্রবলভাবে সমর্থন করলেন।

আলোকবিদ্যার বিশাল সমুদ্র থেকে সঞ্চয় করা এই কয়টি উদাহরণ থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে, কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব দিয়েই আলোর সমস্ত ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ ঘটনার জন্যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন। গতকাল যে তত্ত্বকে সত্য বলে মনে করেছি, আজ তা আপাতভাবে সত্য নাও হতে পারে! বাস্তবিকই বুঝতে পারা যাচ্ছে, 'সত্য' আপেক্ষিক হয়ে যাচ্ছে। ব্যতিকরণে যে তত্ত্ব সত্য বলে মনে হয়েছে, বিক্ষেপণে তাকে কাজে লাগানো যায় নি—বিক্ষেপণে যাকে সত্য মনে হয়েছে, আলোক-বৈদ্যুতিক-ফলে তা কাজে লাগে নি। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের উদ্ভাবিত কোন তত্ত্বকেই প্রকৃতি মেনে চলে না। প্রকৃতির এই বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে নিজেদের মধ্যে বোঝাবার জন্যে যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা তত্ত্বের পর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তবে কি এক তত্ত্বের আবিষ্কারের পর পুরাতন তত্ত্বকে ফেলে দেব? মোটেই নয়, প্রত্যেক তত্ত্বই তার স্বাধীন সত্তায় সত্য। পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে যে কথা সামঞ্জস্য প্রদান করে, বিজ্ঞানে তাই সত্য; কারণ পরবর্তী অনুরূপ ক্ষেত্রে সেই কথাকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা ব্যতিরেকে ফল পাওয়া সম্ভব।

তাই কোন তত্ত্বকেই সত্য বা মিথ্যা আখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; প্রত্যেক তত্ত্বই তার সম্পর্ক-কাঠামোয় সত্য।

ম্যাসার ও ল্যাসার উদ্ভাবক ডাঃ টাউনেস

রণজিৎকুমার দত্ত

বৃহদাকার ল্যাসার যন্ত্র উদ্ভাবন করবার কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৪ সালের পদার্থ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির অধ্যাপক চার্লস টাউনেসকে। তৎসহ দু-জন রুশ বিজ্ঞানীকেও পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়েছে।

১৯১৫ সালে আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলিনায় টাউনেসের জন্ম হয়। ফুর্মান ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে টাউনেস শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি থেকে ১৩-অণুভার কার্বন সম্বন্ধে গবেষণা করে পি-এইচ ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের বেল টেলিফোন কোম্পানীর গবেষণাগারের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তৎপর পদার্থবিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক রূপে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ও বিভিন্ন গবেষণাগারের পরিচালক পদেও উন্নীত হন (১৯৫০-১৯৬০)। ওয়াশিংটনের রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ফর ডিফেন্স অ্যানালিসিস গবেষণাগারের পরিচালক পদেও তিনি আসীন ছিলেন। ১৯৬১ সাল থেকে ডাঃ টাউনেস ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইন অব টেকনোলজির পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ও পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৫৫ ও '৫৬ সালে ভ্রাম্যমান অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্যারিস ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ষ্টাণ্ডার্ডস্ ও ব্রুক-

ষ্টাণ্ডেন ন্যাশন্যাল লেবোরেটরীর সঙ্গে পরামর্শ-দাতা হিসাবে তিনি যুক্ত আছেন। ফিজিক্যাল রিভিউ ও জার্ণাল অব কেমিক্যাল ফিজিক্স নামক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি' নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা।

বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক হিসেবে ডাঃ টাউনেস খুবই পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেল টেলিফোন কোম্পানীর গবেষণাগারে ও রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রেডারের সাহায্যে বোমা নিক্ষেপ ও বিমান চালনার নতুন পদ্ধতি বের করেন। যুদ্ধের পর তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রেডিও অ্যাষ্ট্রোনোমি, মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রো-স্কোপি, অ্যাটমিক ক্লোক ও আপেক্ষিকতাবাদের সুষ্ঠু প্রমাণ। সূর্য, চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির উপর নির্ভরশীল নয়, এমন একটি ঘড়ি আবিষ্কারের জন্যে ডাঃ টাউনেসের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এই ঘড়ি খুবই সঠিক সময়রক্ষক হবে ও কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল হবে না। এই ঘড়িতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে—তার নাম ম্যাসার (MASER)। উত্তেজিত বিকিরণের দ্বারা সূক্ষ্ম তরঙ্গ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ইংরেজী শব্দগুলির আদ্যাক্ষরসমূহের সমষ্টি হচ্ছে ম্যাসার। এই পদ্ধতি-সম্মিলিত ঘড়ির সূক্ষ্মতা পূর্ববর্তী সকল ঘড়ি থেকে বেশী নির্ভুল। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তাতে প্রচলিত ঘড়ির সময়েরও তারতম্য ঘটে। কিন্তু ম্যাসার ঘড়ি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল নয় বলে এর সময়ের তারতম্য কিছুই হয় না। গণনা করে দেখা গেছে যে, ম্যাসার ঘড়ি দীর্ঘ ৩০০ বছর চললে মোট এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের তারতম্য হবে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্রহ-নক্ষত্রের-প্রকৃতি নিরূপণের কাজে খুবই সাহায্য হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ম্যাসার তৈরীর পর এর ব্যবহারের দ্বারা পৃথিবীর আবর্তনের সময় অতি সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে, অতি ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গ ধরা খুবই সহজ হয়েছে, দূরপাল্লার টেলিফোন ও টেলিভিশনের ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। ম্যাসারের সাহায্যে আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। এই গতি দর্শকের গতির ফলে পরিবর্তিত হয় না। এই মতবাদ আবার প্রমাণ করা হলো ম্যাসারের সাহায্যে আলোর গতি নির্ধারণ করে। ম্যাসারের অন্য প্রয়োগ হচ্ছে ল্যাসার (LASER—Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)। এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি অতি তীব্র আলোকরশ্মি নির্গত করা হয়। সাধারণ আলোক অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু ল্যাসারের আলোকে তা হয় না। এই আলো একটি জায়গায় সংহত করা যায়; যেমন—১০ লক্ষ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আলো এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে পাওয়া সম্ভব। এই ল্যাসার আলোক-রশ্মির সাহায্যে বেতার ও টেলিভিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, বিনা তারে টেলিফোনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এই তীব্র আলোকের সাহায্যে কঠিন ধাতু কাটা সহজ হয়েছে। কিছুদিন আগে লণ্ডনে একটি বিজ্ঞান সভায় ল্যাসারের সাহায্যে বিনাঅস্ত্রে অস্ত্রোপচার করবার পদ্ধতির বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। চোখের বিভিন্ন ব্যাধিতে এর সাহাযে চিকিৎসা সফল হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ল্যাসারের সাহায্যে অন্ধের চোখে আলো দান সম্ভব হবে। দাঁতের ক্ষয়রোগের চিকিৎসা ও দাঁতকে বীজাণু সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা ল্যাসারের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ল্যাসারের তীব্র

আলোর সাহায্যে ১৯৬২ সালের মে মাসে পৃথিবী থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আলোকপাতের এটি সর্বপ্রথম সফল পরীক্ষা। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা আজ সক্রিয়ভাবে ল্যাসারের বিভিন্ন ব্যবহার উদ্ভাবনের জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। এর ফলে মনে হয়, বহু অজানা জিনিষের আবিষ্কারে ল্যাসার নিশ্চয়ই আলোকপাতে সক্ষম হবে।

মাছের কথা

শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত

বাংলা দেশে মাছের বাজার এখন খুবই গরম। বাঙালীর খাবার পাতে অভাব হলেও বইয়ের পাতায় মাছের খবর অনেকই আছে। ব্যাপার দেখে আশঙ্কা হয়, হয়তো মাছ বাঙালীর খাদ্য-তালিকা ছেড়ে চিরতরে কেবল জীবতাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে।

বাজারে মাছের মতই আকাল পড়ছে, বাঙালীও ততই নতুন নতুন মাছের খোঁজে লেগে গেছে। এতদিন যারা ছিল ব্রাত্য, এখন তাদের নিয়েও পড়েছে টানাটানি। পট্‌কা মাছ (Globe fish) বাঙালীর অচেনা নয়, কিন্তু খাদ্য-তালিকায় তার এতদিন স্থান ছিল না। কেউ কেউ এদের খাবার পাতে তোলবার চেষ্টা করেন। ফল হাতে হাতে—বিষক্রিয়ার ফলে সটান হাসপাতালে চালান। পট্‌কা মাছ খেয়ে মৃত্যুর কথা খবরের কাগজের পাতায় দেখা গেছে। পট্‌কা মাছের দেহে এক ধরণের অ্যালকালয়েড বিষ পাওয়া যায়।

অহরহ গায়ের রং বদ্‌লায়, জীবজগতে এরূপ প্রাণী অনেক আছে। ডাঙায় গিরগিটি প্রায়ই রং বদ্‌লায়। জলের রাজ্যেও এরূপ অনেক মাছ পাওয়া যায়। সবুজ রঙের গায়ের উপর কমলারঙের ডোরাকাটা খলসে মাছকে এই বহুরূপীর দলেই ফেলা যায়। বহুরূপী মাছের ত্বকের ঠিক নীচেই এক বিশেষ ধরণের জীবকোষের মধ্যে থাকে রঙীন বস্তুকণা (Pigment)। রঙীন কোষগুলির সঙ্গে স্নায়ুসূত্রের সরাসরি সংযোগ থাকে ও স্নায়ুকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে কোষগুলি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হতে পারে এবং তারই ফলে এদের গাত্রবর্ণও প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

মাছের কথা প্রসঙ্গে তিমির কথা বলতেই হয়। তিমি কিন্তু মাছ নয় মোটেই। তিমি প্রকৃতপক্ষে স্তন্যপায়ী জন্তু। চিংড়িও তেমনি নাম ভাঁড়িয়ে মাছের দলে ভিড়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে কাঁকড়া বা কাঁকড়া-বিছারই আত্মীয়তা বেশী। আবার হাঙর হচ্ছে কোমলাস্থিবিশিষ্ট এক শ্রেণীর মাছ।

কথায় বলে 'কই মাছের প্রাণ'। জলের প্রাণী এই মাছটিকে জলের বাইরে আনলেও বেশ কয়েক ঘণ্টা দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে—তার কারণ শ্বাসকার্যের জন্যে কান্‌কো ছাড়াও এদের রয়েছে বাড়তি এক অঙ্গ। মাথার ঠিক নীচে ফুল্‌কার উপরে অবস্থিত একটি গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত স্পঞ্জের মত অঙ্গের সাহায্যে এরা বাতাস থেকেও অক্সিজেন নিতে পারে। জলে থাকবার সময় এরা মাঝে মাঝে জলের উপরে মাথা তুলে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে না

পারলে এরা মারা পড়ে।* অনেক সময় কই মাছ থাকে কাদাঘোলা জলে এবং ঐ জলে অক্সিজেনের পরিমাণ থাকে খুবই কম—সেই জন্যেই এই বাড়তি ব্যবস্থা। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের প্রয়োজনে এসেছে স্পঞ্জের মত অতিরিক্ত ফুল্‌কা, কিন্তু তারই ফলে হয়েছে এক অদ্ভুত ব্যাপার। জলে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকলেও কান্‌কোর ক্ষমতা নেই শরীরের সবটুকু প্রয়োজন মেটাবার মত অক্সিজেন যোগান দেবার। বাতাস থেকে অক্সিজেন তার চাই-ই। অন্যান্য জীওল মাছের মধ্যে মাগুর, সিঙ্গি আমাদের খুবই পরিচিত। মাগুর, সিঙ্গিও কই মাছের মতই বাতাস থেকে শ্বাসগ্রহণে সক্ষম। মাগুর মাছের শ্বাসগ্রহণে সহায়ক অঙ্গটি থাকে কান্‌কোর গহ্বরের পিছনে উপরের দিকের এক কোণে। একে দেখতে অনেকটা ডালপালা সমেত ছোট্ট গাছের মত। আসলে ছোট ছোট ডালপালাগুলি হচ্ছে অতি সরু সরু নালিকা। সিঙ্গি মাছের অনুরূপ অঙ্গটি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের—কান্‌কোর গহ্বর থেকে সুরু হয়ে এদের দেহের দু-পাশে অবস্থিত দুটি সরু লম্বা নল শ্বাসগ্রহণে সাহায্য করে। কুঁচে মাছের নলের বদলে আছে ছোট ছোট বায়ুপূর্ণ থলি। এদের সঙ্গে কান্‌কোর গহ্বরের যোগাযোগ থাকে। থলিগুলি থাকে মাথার পিছন দিকে, ঠিক গলার কাছে। এর ফলে যখন এরা বাইরে মাথা তোলে, তখনই থলিগুলি বায়ুপূর্ণ হয়ে যায় এবং দূর থেকে অনেক সময় তাই এদের ফণাওলা সাপ বলে ভুল হয়।

বায়ুশ্বাসী জীওল মাছগুলির প্রসঙ্গে এসে পড়ে ডিপনয় মাছের কথা। এই গোষ্ঠীর মাছগুলির বায়ু থেকে শ্বাসগ্রহণের জন্যে রীতিমত ফুস্‌ফুস রয়েছে। এরা থাকে জলা জায়গায়। গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে এরা কাদার ভিতরে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। ঐ গর্তের সঙ্গে সরু ফাটলের পথে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। এই সময় শ্বাসকার্যের জন্যে ডাঙ্গার প্রাণীর মত পুরাপুরিভাবে ফুস্‌ফুসের উপরই নির্ভর করে। বিজ্ঞানীদের কাছে এই মাছের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাঁদের বিশ্বাস এই গোষ্ঠীর মাছ থেকেই উভচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। কারণ ফুস্‌ফুস ছাড়াও এদের দেহ ও জীবনধারায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় Lepidoriyen আর মধ্য আফ্রিকার Protopteries মাছের মধ্যে দেখা যায়।

গেছো-মানুষ আছে, গেছো-ব্যাং আছে—এমন কি, গেছো-মাছও আছে। বাংলা দেশের ক্যানিং অঞ্চলের কাদাবেলে (Mudskipper) ওস্তাদ গেছো-মাছ। এই মাছের সামনের পাখ্‌না দুটি (Pectoral fins) লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে সাহায্য করে। পিছনের বা পেটের পাখ্‌না (Pelvic fins) দুটি জোড়া লেগে চাকৃতির মত হয়ে যায়, আর তারই সাহায্যে গেছো-মাছ জলের গাছপালায় নিজেদের আটকে রাখতে পারে। সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভ বনের গাছ-গাছালির ডালপালায় তাদের প্রায়ই দেখা যায়।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পাথুরে অঞ্চলে কাদাবেলের মাসতুতো ভাই আন্দামিয়া (Rockskipper) মাছের দেখা পাওয়া যায়। জল ছেড়ে জলের কাছাকাছি ভিজে পাথরের উপর এরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করে—সর্বদা জলে থাকে না।

জলের কাছে ঝুঁকে-পড়া গাছে প্রায়ই নানা রকমের কীট-পতঙ্গ ঘোরাফেরা করে। তীরন্দাজ মাছ (Taxotes jaculator) কুলকুচা করবার মত কৌশলে মুখ দিয়ে জল ছুঁড়ে পতঙ্গ শিকার করে। এই ব্যাপারে এরা ভারী ওস্তাদ, অদ্ভুত এদের নিশানা, ফুট চারেক দূর থেকে নিক্ষিপ্ত জল কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই বিচিত্র মাছ কেবল মাত্র ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই দেখা যায়।

বিচিত্র মাছের রাজ্যে আর এক অদ্ভুত মাছ হচ্ছে, আমেরিকার লোরিকোরিয়া (Loricoria parva)—এরা জলে পাখীর মত তা' দিয়ে ডিম ফোটায়।

Mullet হচ্ছে নোনা জলের মাছ—এদের যকৃৎটা বড় অদ্ভুত, বেশ পেশীবহুল—অনেকটা মুরগী বা পায়রারা গিজার্ডের (Gizzard) মত। মুরগী বা পায়রারা খাবারের সঙ্গে ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রা খায়—পাথরের টুক্‌রাগুলি যাঁতাকলের মতই খাবার পিষতে সাহায্য করে। এই মাছগুলিও তেমনি খাবারের সঙ্গে বালির টুক্‌রা উদরসাৎ করে।

নোনা জলেও মিঠা জলের মাছের অভাব নেই—চারদিকে সমুদ্রের অথৈ নোনা জল—তার মধ্যে মিঠা জলের মাছের বিচরণ আশ্চর্য লাগে বই কি! কিন্তু কেমন করে থাকে? ব্যাপারটা কিছুই নয়—এই সব মাছের বৃক্কগুলি (Kidney) লবণ দূরীকরণে অদ্ভুত রকমের সক্রিয়।

মাছের কথা শেষ করা যাক মাছের বাসা আর মাছের ভালবাসার কথা বলে। Stickleback (Gastrosteus) নামে একরকমের মাছ আছে, যারা জলজ লতাপাতা দিয়ে বাসা তৈরী করে। মাছের মায়ের ভালবাসা ডাইনীর ভালবাসার সঙ্গে তুলনা করাই আমাদের দেশে রেওয়াজ। বেচারীরা প্রায়ই না জেনে নিজেদের ডিম নিজেরাই খেয়ে ফেলে, তাই এদের এই অপবাদ। কিন্তু কোন কোন মাছের অপত্যস্নেহ খুবই প্রবল। ফোলিশ মাছ তার ডিমগুলিকে গোলাকারে জড় করে এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেউ না কেউ তাদের ফিতার মত দেহে জড়িয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে। দেহের উপর ডিম বহন করবার রীতি কোন কোন মাছের মধ্যেও দেখা যায়। ডিম পেট থেকে বের হবার পর সুতার মত একরকমের জিনিষ স্ত্রী বা পুরুষ মাছের মাথায় বা দেহের অন্য জায়গায় লেগে যায়। কখনও বা বুক ও পেটের উপর আঠার মত একপ্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং ডিমগুলি সেখানেই আট্‌কে থাকে। কুর্তীমাছের (Kurtus guliveri) মাথার খাঁজে আর নল মাছের পেটের নীচে ডিম আট্‌কে থাকে। এক রকমের নল মাছ (Syngnathus acus) আছে, যাদের ডিম ছাড়বার সময় পুরুষ মাছটির লেজের দিকে একটা থলি জন্মায় এবং তার মধ্যেই স্ত্রী-মাছ ডিম ছেড়ে দেয়।

শুধু ডিমের উপর নজর রেখেই সব মাছ কর্তব্য শেষ করে দেয় না—বাচ্চা রীতিমত বড় না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তাদের সব ঝামেলা সহ্য করে। এই ব্যাপারে শোল মাছের প্রশংসা করতেই হয়। শোল মাছেরা ছানা-পোনা খেতে বড়ই ওস্তাদ এবং সেই জন্যেই তারা নিজেদের বাচ্চাগুলিকে সর্বদাই আগ্‌লে রাখে। গাঁয়ের দিকে যাদের বাড়ী তাঁরা যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন, শোলের বাচ্চাগুলি কেমন মায়ের পিছু পিছু দলবেঁধে সাঁতার কেটে বেড়ায়! আর বিপদ বুঝলেই মায়ের সঙ্গে টুপ্‌ করে ডুবে যায়! কিন্তু সন্তান-পালনের ব্যাপারে সবার উপর টেক্কা দিয়েছে তিলাপিয়া। বিদেশী হলেও তিলাপিয়া মাছের সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পরিচয় আছে বেশ—মিলও আছে মন্দ নয়। পুকুরে বা ডোবায় একবার ছাড়লে আর দেখতে হবে না—হু-হু করে বংশ-বৃদ্ধি করে পুকুর ভরিয়ে ফেলবে। দু-মাসেই এরা প্রসবে সক্ষম। এক এক বারে ডিম ছাড়ে ২৫।৩০টা থেকে ৬০।৬৫টা করে। সন্তানস্নেহে এরা অবিকল বাঙ্গালী মায়েরই মত—নিজে না খেয়েও সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে। তিলাপিয়া-মা তার ডিমগুলিকে নিজের মুখের মধ্যেই রেখে দেয়, মুখের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়—বাচ্চারা বড় হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরায় সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত মায়ের মুখের ভিতরই থাকে—এমন কি, স্বাধীন হবার পরেও বেশ কিছু দিন মায়ের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করে, আর বিপদ বুঝলেই মায়ের মুখের ভিতর ঢুকে পড়ে। কাজেই তখন মায়ের খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ।

সঞ্চয়ন

প্রোটিনের অভাব দূরীকরণে অ্যালগীর ভূমিকা

আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর অ্যালগীর চাষ সম্পর্কে পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালানো হয়েছে। অ্যালগী হচ্ছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জলজ শ্যাওলা। প্রোটিনসমৃদ্ধ অ্যালগী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই বস্তুটি খুবই পুষ্টিকর। বিশ্বের জনসংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে মানুষের খাদ্যাভাব দূরীকরণে এই বস্তুটি ভবিষ্যতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বর্তমানে পশু-খাদ্য হিসাবে অ্যালগী উৎপাদনের উপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। তবে মানুষের খাদ্য হিসাবেও এই বস্তুটির উৎপাদন সম্পর্কে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যানফ্রান্সিসকোর নিকটবর্তী পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিত আলোক সংশ্লেষণ বা কন্ট্রোল্ড ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল বা পত্র-হরিৎ নামে রঙীন একরকম পদার্থ থাকে। এই ক্লোরোফিলের তন্তুসমূহ সূর্যকিরণের সংস্পর্শে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি করে, তাকেই বলে ফটোসিনথেসিস বা আলোক-সংশেষণ। এভাবে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট-এর সাহায্যেই উদ্ভিদের দেহ পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়ে থাকে।

উদ্ভিদের বিকাশের মূলে যে সব প্রক্রিয়া রয়েছে, তাদেরই অন্যতম হচ্ছে ফটোসিনথেসিস। এই প্রক্রিয়ায়ই বাতাসের জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাইঅক্সাইড সূর্যালোকের সংস্পর্শে শ্বেতসার ও চিনিতে পরিণত হয়। এই শ্বেতসার ও চিনি প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত থাকে। পরোক্ষভাবে তাই মানুষ ও পশুর খাদ্যের জোগান দেয়। এই মৌলিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এখনও অতি অল্পই উপলব্ধ হয়ে থাকে।

উদ্ভিদদেহে সূর্যকিরণ রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় এই শক্তিই আবার প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং উদ্ভিদের খাদ্যের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য পদার্থ গড়ে তোলে। ফটো-সিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট গড়ে তোলবার জন্যে উদ্ভিদদেহের ক্লোরোফিল বা পত্র-হরিৎ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছত্রাক প্রভৃতিতে পত্রহরিৎ থাকে না। ঐ জাতীয় উদ্ভিদের বেঁচে থাকবার জন্যে অন্যান্য জিনিষেব উপর নির্ভর করতে হয়।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালগী চাষের ব্যাপারে যে গবেষণা চালানো হচ্ছে, তাতে গবেষকগণ এই ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করবার পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টায় রয়েছেন এবং এর কার্যকারিতা কি ভাবে বাড়ানো যেতে পারে, তারও সন্ধান করছেন। সহরের নালা থেকে নিঃসৃত ময়লা জলের মধ্যে এই প্রোটিনসমৃদ্ধ পশুখাদ্যের অতি দ্রুত বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই বিষয়টি তাঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন।

নিকটবর্তী সহরের নালা থেকে নিঃসৃত ময়লা জল একটি অগভীর জলাশয়ে এসে পড়ে। সেখানে সবুজ শ্যাওলা বা গ্রীন অ্যালগী রয়েছে। জলা-শয়ের জলে যে জৈব পদার্থ রয়েছে, তারা ঐ ময়লা জলের জীবাণুর জন্যে পচে যায় এবং অ্যালগীর খাদ্যে পরিণত হয়। তারপর আলোক-সংশ্লেষণ

বা ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

বেশ বেড়ে যাবার পর অ্যালগী জল থেকে তুলে এনে শুকিয়ে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঐ জলাশয়ের অ্যালগী জন্মানোর ফলে জলাশয়ের জলও শোধিত হয়ে যায় এবং ঐ জলের সংস্পর্শে অন্য জলাশয়ের জল দূষিত হবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না। তারপর আবার ময়লা জল দিয়ে তাতে অ্যালগী জন্মানো ও তার ফলে ময়লা জলের শোধন ও ঐ জলের অপসারণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের ধারণা, অন্যান্য ফসলের তুলনায় অ্যালগী পঞ্চাশ গুণ বেশী সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে থাকে। খাদ্যমূল্য ও গুণাগুণের দিক থেকে অ্যালগী অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ। একমাত্র ক্লোরেলা জাতীয় অ্যালগী থেকে প্রতি বছরে একর প্রতি বারো টন পর্যন্ত প্রোটিন পাওয়া যায়। জমিতে উৎপন্ন ফসল ও খাদ্যের মধ্যে সয়াবীন সর্বাধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য। কিন্তু এই পরিমাণ প্রোটিন সয়াবীনেও পাওয়া যায় না। সয়াবীনের তুলনায় দশ গুণ বেশী প্রোটিন পাওয়া যায় ক্লোরেলা জাতীয় অ্যালগী থেকে।

ইউগ্লেনা নামে আর এক ধরণের অ্যালগী আছে। এসব অ্যালগীর সঙ্গে জীবের সাদৃশ্য অনেক বেশী। এই ধরণের অ্যালগী থেকে প্রতি একরে দশ টন পর্যন্ত প্রোটিন পাওয়া যায়। আমরা যে হারে জৈব প্রোটিন পেয়ে থাকি, তার তুলনায় একশ' গুণ বেশী ঐ ধরণের অ্যালগী থেকে পাওয়া যায়। প্রচলিত চাষ-আবাদের সাহায্যে আমরা যে পরিমাণ প্রোটিন সংগ্রহ করে থাকি, তার তুলনায় অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দশ থেকে একশ' গুণ বেশী প্রোটিন অ্যালগী চাষ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

তবে খাদ্য হিসাবে অ্যালগী চাষের বিষয়টি এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায়ই রয়েছে। তা-হলেও মানুষের খাদ্য গ্রহণের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে, তা সহজে বদ্‌লানো যায় না। যে খাদ্য মানুষ কোন দিন দেখে নি, যার সঙ্গে তাদের আদৌ কোন পরিচয় নেই, প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকলেও মানুষ তা গ্রহণ করতে সহজে রাজী হয় না। তাই প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষ অভুক্ত থাকে। সুতরাং ঐ পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জিত হলেও খাদ্যের অভ্যাস গুরুতর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

তবে কোন কোন ধরণের অ্যালগী, যেমন—সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার সমুদ্রোপকূলবর্তী কোন কোন দেশের অধিবাসীরা অনেক কাল থেকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে আসছে। কেল্‌প্‌ নামে একপ্রকার সামুদ্রিক গুল্মের ভস্ম থেকে আয়োডীন সংগৃহীত হয়ে থাকে। কেল্‌প্‌ও একজাতীয় অ্যালগী।

অ্যালগী যেদিন সাধারণ খাদ্য হিসাবে গৃহীত হবে, সে দিন চাষ-আবাদের চিরাচরিত পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটবে। সে দিন রসায়ন-বিজ্ঞানী ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারাই খামারসমূহ পরিচালিত হবে।

আর অ্যালগীর চাষ তো এই পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—চন্দ্রলোকেও অ্যালগীর খামার গড়ে তোলা যাবে। অ্যালগী চাষ করে খাদ্য, অক্সিজেন এবং পানীয় জল পাওয়া যাবে। তাছাড়া দেহ-নিঃসৃত মলমূত্র প্রভৃতি ফেলা নিয়েও কোন সমস্যা হবে না।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দূর পথের মহাকাশযাত্রীর খাদ্য নিয়েও গবেষণা করছেন।

আমাদের দেহের বৃদ্ধি কি ভাবে ঘটে

সাধারণতঃ বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহেরও বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু কি ভাবে যে আমরা বেড়ে উঠি, দেহের মধ্যে কি পরিবর্তনের ফলে যে এই বৃদ্ধি ঘটে—সে বিষয়ে সঠিক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নি। এই বিষয়ে আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড রাজ্যের বালটিমোরের জন্স্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। ডাঃ ডোনাল্ড চীক নামে জনৈক অষ্ট্রেলিয়াজাত মার্কিন বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানেই এই গবেষণা চলছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু-চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ রবার্ট কুকের সহযোগিতায় তিনি কয়েক বছর ধরে এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রয়েছেন। এই পরিকল্পনায় চারটি শিশুকে নিয়ে একই সময়ে এই বিষয়ে পরীক্ষা চলে। এদের দু-সপ্তাহের জন্যে পরীক্ষা ও পর্যালোচনাধীনে রাখা হয়। এই চারটি শিশুর মধ্যে দুটির জন্ম থেকেই হৃদ্‌রোগ রয়েছে অথবা তাদের পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড বা শ্লেষ্মাস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ ঠিকমত হচ্ছে না। ফলে এদের শারীরিক বৃদ্ধি যে রকম হওয়া উচিত সে রকম হয় না। এসব শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরে আবার গবেষণাগারে নিয়ে এসে ঐ চিকিৎসার ফলে দেহের ও দেহের কোষের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এদেরই আর দুটি ভাইবোন—যাদের শারীরিক ক্রিয়া ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া স্বাভাবিক, তাদেরও দেহের বৃদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা হয়।

এই গবেষণার ফলে দেখা গেছে, জন্ম থেকেই যারা হৃদ্‌রোগে ভোগে, তাদের ঐ রোগের দরুণ দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের শল্যচিকিৎসা করা হলে, স্বাভাবিক অবস্থায় চার বছরের মধ্যে যতখানি তারা বাড়তো, ঐ চিকিৎসার পর ছয় মাসের মধ্যে ততখানিই বাড়ে। তারপর সুস্থ থাকলে বয়সানুপাতে সে যে ভাবে বাড়তো, সেই ভাবেই তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

শল্যচিকিৎসার পর শিশুর দেহের দ্রুত বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে, এই বিষয়টি ডাঃ চীক পরীক্ষা করে দেখছেন। তিনি প্রথমতঃ জন্ম থেকেই যারা হৃদ্‌রোগে ভোগে, তাদের বয়সের স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে, তারা সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে কি না, তা পর্যালোচনা করছেন।

দেহের বৃদ্ধি-সম্পর্কে এতকাল যে ধারণা ছিল, ডাঃ চীক এবং তাঁর সহকর্মীদের গবেষণার ফলে সেই ধারণার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁরা বলেছেন, জন্মের পর থেকে শিশুর দেহের বৃদ্ধি, কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে প্রধানতঃ প্রত্যেকটি কোষের আকার বৃদ্ধির জন্যেই ঘটে থাকে।

তাঁরা আরও বলেছেন যে, মাংসপেশীর কোষ-সমূহের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায় আর তাদের আকার বেড়ে যায় আরও বেশী। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি অতি দ্রুতই হয়ে থাকে। কিন্তু কোষের আকারের বৃদ্ধি ঘটে ধীরে ধীরে।

ডাঃ চীক প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধির পরিমাপ করবারও একটা ভিত্তি বের করেছেন! তবে যে সকল বিষয় এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে এবং বৃদ্ধির ফলে দেহের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করাই বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কিশোর বয়স থেকে দেহের বৃদ্ধির হার খুবই বেড়ে যায়। অনেকেরই ধারণা, পুরুষের সেক্স হরমোন-

জনিত দেহজ রসবিশেষ, যা রক্তের সঙ্গে মিশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সক্রিয় করে তোলে, সেই হরমোনের এই বৃদ্ধির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। এই বিষয়টিও ক্লড মিগিয়ন ও রবার্ট ব্লিজার্ড নামে দুজন চিকিৎসক বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখছেন। রক্তের সঙ্গে কি পরিমাণে হরমোন মিশ্রিত হয়, তার পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে।

হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে শিশুদের ভেষজ ও শল্যচিকিৎসার জন্যে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগে কয়েকটি শিশুর দেহের রাসায়নিক রূপান্তর বা দেহের পরিবর্তন (মেটাবলিজম) কি কারণে ঘটে, তা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা ও গবেষণা চলছে। তাদের সকল রকম খাদ্য, পানীয়, মল-মূত্র সকলই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সর্বদাই তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। ঐ হাসপাতালে শিশুদের জন্যে খেলার ঘর ও তাদের নার্সদের থাকবার জায়গা রয়েছে। শিশুরা মল-মূত্র পরিত্যাগ করবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলেই একটি ঘণ্টা বেজে ওঠে এবং নার্সরা তা জানতে পারেন।

এই তথ্যানুসন্ধানের কাজ দু-বছরের মধ্যে শেষ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ডাঃ চীক এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এই গবেষণা ও পর্যালোচনার ফলে যে সকল রোগের জন্যে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে, সেই রকল রোগ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাবে।

জীবাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

প্রাণীরা সাধারণ জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাণিদেহের রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত এই বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। মানুষ, পশু এবং উদ্ভিদের জীবন্ত কোষ বা সেলে যে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি সৃষ্ট হয়ে থাকে, তার স্বরূপ উপলব্ধি এবং ঐ বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগাবার বিষয়ে তাঁরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

দীর্ঘপথযাত্রী মার্কিন মহাকাশ-যাত্রীদের মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞানী ঠাট্টা করে বলেছিলেন—কেন, বৈদ্যুতিক ইল মাছ আর ঐ ধরণের দু-চারটি মাছ নিয়ে গেলেই তো এই সমস্যা চুকে যায়! মহাকাশ-যাত্রার সময়ে এদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে। এরাই হবে স্থায়ী ব্যাটারী। ঐগুলিকে চার্জ করবারও প্রয়োজন হবে না।

এদের ঠাট্টাই একদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কারণ এটি আশ্চর্যের ব্যাপারও কিছু নয় এবং অসম্ভবও নয়। মানবদেহের মাংসপেশী ও রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ-শক্তি। বিজ্ঞানীরা এই তড়িৎ-শক্তি ইলেকট্রোডের সাহায্যে সংগ্রহ করেন।

পেনসিলভ্যানিয়ার ভ্যালিফর্জস্থিত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর মহাকাশ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা ১৯৬৩ সালে প্রাণিদেহের এই বিদ্যুৎ-শক্তি একটি সামান্য ও সহজ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তাঁদের গবেষণার আধার ছিল ইঁদুর। তাঁরা ইঁদুরের পেটের গহ্বরের মধ্যে দুটি ইলেকট্রোড বসিয়েছিলেন এবং ঐ ইঁদুরের দেহের ১৫৫ মাইক্রোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে তাঁরা একটি রেডিও ট্রান্সমিটার বা বেতারবার্তা প্রেরক-যন্ত্র চালিয়েছিলেন।

মানবদেহের বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র চালু করা যেতে

পারে এবং চিকিৎসকগণ এসব বেতারবার্তার সমীক্ষার সাহায্যে রোগী ঘুমিয়ে থাকলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

তবে এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা জীবাণু নিয়ে যে গবেষণা চালিয়েছেন, তা খুবই আকর্ষণীয় এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর। এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন ওয়াশিংটনের ডাঃ ফ্রেডারিক সিস্লার। যে সকল জীবাণু ক্ষতিকারক নয় এবং অতি সাধারণ, তাদের তিনি সমুদ্রের জলে ভর্তি কাচের নল বা টেষ্ট টিউবের মধ্যে রাখলেন এবং ঐ নলের মধ্যে দুটি ইলেকট্রোড বসিয়ে দিলেন। এদের খেতে দিলেন চিনি। তারপর পরীক্ষায় দেখা গেল, ঐ তারের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ হলেও বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে।

এর পরে জেনারেল সায়েন্টিফিক কর্পোরেশনের ডাঃ রবার্ট আই. সারবাচেরের গবেষণার ফলে জীবাণু থেকে এই বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়। তিনি জীবাণু থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে, একটি ক্ষুদ্র ট্রানজিষ্টর রেডিও সেট ও একটি খেল্না নৌকা চালু করতে সক্ষম হন। এই বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগানো যায় কি না, সে বিষয়েই তিনি গবেষণা করছেন।

এই ধরণের জৈব বিদ্যুতের এক একটি সেল বর্তমানে আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা হচ্ছে। ঐ সেলের জীবাণুসমূহকে খেতে দেওয়া হয় তুষ ও জল। জীবাণুর সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের খরচ খুবই কম। আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যে স্যান অ্যানটোনিওর সি. এম নর্টন এবং লায়েল ডি অ্যাটকিন্স এই জৈব বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বা সেল তৈরী করেছেন। ওয়াশিংটনের ট্যাকোমস্থিত বাক্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স কর্পোরেশন এই সেল বিক্রয় করে থাকেন।

বর্তমানে ডাঃ সিস্লার এবং ডাঃ সারবেচার এই ধরণের ব্যাটারীর বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে গবেষণা করছেন। শিল্প কারখানায় ও ঘরবাড়ীসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এবং তাপ ও আলোর জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি জৈব বিদ্যুতের ব্যাটারী থেকে সরবরাহ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন।

তাত্ত্বিক দিক থেকে জৈব বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াবার কোন সীমা নেই এবং অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এই শক্তি উৎপাদনও সম্ভব। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে যে সব জৈব বিদ্যুতের ব্যাটারী তৈরী হয়েছে, তাতে ঐ সকল জীবাণুর খাদ্য হিসাবে এক গ্র্যাম চিনি দিলে তা দুই মাসের জন্যে দুই ভোল্ট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করতে পারে। অপচয় ও আবর্জনাসহ যে কোন প্রকার জৈব পদার্থই জীবাণুর খাদ্য।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভবিষ্যতে সহরের আবর্জনার স্তুপ ও কারখানার পাশের নালার ময়লা জল বিশুদ্ধ জলে পরিণত হবে। ঐ জৈব বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে কারখানা চালানো যেতে পারে। তা-ছাড়া সমুদ্রে যে জীবাণু ও অপচয় রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে ঐ বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্র পারাপারের জন্যে জাহাজ চলাচলেও ব্যবহৃত হতে পারে। অধিকাংশ সমুদ্রে, পৃথিবীর স্থলভাগে এবং যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় ইন্ধন দুষ্প্রাপ্য, সে সকল স্থানেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী অপচয় ও জীবাণু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান এবং মহাকাশ সংস্থা এই বিষয়ে গবেষণার জন্যে তৎপর হয়েছেন। কারণ মহাকাশযানে ভর ও স্থান সমস্যা রয়েছে বলে জৈব বিদ্যুৎ মহাকাশযাত্রায় বিশেষভাবে কাজে লাগতে পারে।

যাদের কয়েক মাস—এমন কি, কয়েক বছর পর্যন্ত গ্রহান্তর গমন-পথে মহাকাশে অতিবাহিত করতে হবে, সেই দূরপথযাত্রীদের পক্ষে এই ব্যবস্থা হবে

বিশেষ উপযোগী। কারণ এর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমতঃ অপচয় ও জল নিষ্কাশন সমস্যার সমাধান হবে, দ্বিতীয়তঃ ঐ অপচয় ও জলের জীবাণু থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম চালিত হবে।

ভারত মহাসাগরে তথ্যানুসন্ধান-অভিযান

এই পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগেই রয়েছে সমুদ্র। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও সমুদ্রের বিপুল জলরাশি ভেদ করে সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান, কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্ভবই ছিল; আর কার্যকরী দৃষ্টি থেকে এই প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয় বলেই গণ্য হতো। সাম্প্রতিক-কালে কারিগরি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হওয়ার ফলে সমুদ্রে নিয়মিতভাবে তথ্যানুসন্ধান ও সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও মানুষকে খাদ্য ও কাঁচামালের জন্যে নতুন উৎসের সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে।

কিছুকাল হয় সমুদ্র ও সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্রের সদস্য নিয়ে ইণ্টারন্যাশন্যাল ওশ্যানোগ্র্যাফিক কমিশন নামে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়েছে

সমুদ্রের বিশালতা এবং এই বিষয়ে গবেষণার জটিলতা বিবেচনা করে এই সকল রাষ্ট্র তাদের গবেষণার ফলাফল ও তথ্যাদি পরস্পরের কল্যাণের জন্যে অবাধে বিনিময় করছে এবং কোন কোন বৃহত্তম ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল তথ্যাভিযান পরিকল্পনার রূপায়ণে সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করছে।

বহু বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগর সম্পর্কে সমীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়েছে। ভারত মহাসাগর সম্পর্কেও একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই ইণ্টারন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান ওশ্যান এক্সপিডিশন বা ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান অভিযানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বত্রিশটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করছে।

ঐ সকল রাষ্ট্রের মিলিত উদ্যোগে ভারত মহাসাগরে ১৯৬০ সাল থেকে যে তথ্যানুসন্ধান সুরু হয়েছে, ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে তার সমাপ্তি ঘটলেও এই সময়ে সংগৃহীত তথ্য ও নিদর্শনসমূহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে লাগবে আরও কুড়ি বছর।

দু'কোটি ৮০ লক্ষ বর্গমাইল স্থান জুড়ে রয়েছে ভারত মহাসাগর। এর আয়তন এশিয়া ও আফ্রিকার সমান। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ এই মহাসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহে বাস করে। এই তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা এই অঞ্চলের খাদ্যাভাব পূরণে এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনে সহায়ক হবে।

চল্লিশটি তথ্যানুসন্ধানী জাহাজ এই কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সকল জাহাজ পাঁচ লক্ষ মাইল ভ্রমণ করেছে। এই অভিযানের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী কাজ সম্পন্ন হয়েছে মার্কিন বিজ্ঞানীদের দ্বারা এবং এতে চৌদ্দটি মার্কিন জাহাজ অংশ গ্রহণ করেছে।

সমুদ্রের তলায় তথ্যানুসন্ধানে ২৩টি জাহাজ নিয়োগ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে একটি ছিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লামণ্ট জিওলোজিক্যাল অবজারভেটরীর। এই সকল জাহাজের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলার গঠন-প্রণালী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। এর ফলে সমুদ্রের তলায় যে সকল সমতলভূমি, পাহাড়-পর্বত ও খাদ রয়েছে, তাদের কথা জানা গেছে।

ম্যাসাচুসেটস্-এর উড্স্হোল ওশ্যানোগ্র্যাফিক ইনষ্টিটিউসন, ক্যালিফোর্ণিয়ার স্ক্রিপস ইনষ্টিটিউসন এবং ইউ. এস. কোস্ট অ্যাণ্ড জিওডেটিক সার্ভের বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলদেশ খনন করে জীবাশ্ম, সমুদ্রের পলল বা তলানি সংগ্রহ করেছেন। বিজ্ঞানীরা এথেকে পৃথিবীর প্রাণীর বিবর্তনের ধারার উৎসের সন্ধান পাওয়ার আশা করছেন।

বাতাস, বৃষ্টি ও আবহাওয়া সৃষ্টির মূলে যে শক্তি ক্রিয়া করে, তা ভূপৃষ্ঠ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন বিজ্ঞানী একটি বয়ার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রেখে বয়াটি ভারত মহাসাগরে ভাসিয়ে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অভিনব তথ্যসন্ধান ভারতে এই প্রথম। এই বয়াটির নামকরণ করা হয়েছে—মেজারমেণ্ট অব এনার্জি ট্র্যান্সফার ইন ওশ্যানিক বিজ্নেস, অর্থাৎ সমুদ্র অঞ্চলে শক্তি স্থানান্তরের পরিমাণ নিরূপণের ব্যবস্থা।

আমেরিকার আবহদপ্তরের বিমানগুলি এবং অষ্টম টাইরস নামে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহও এই গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমুদ্র স্পর্শ করবার পর বাতাসের তাপমাত্রা কিভাবে পরিবর্তিত হয়, বিমানগুলি ওশিয়ান নামে একটি মার্কিন জাহাজের চার পাশে নানাভাবে উড়ে সে সব তথ্য সংগ্রহ করছে। সমুদ্রের জলের তাপ বায়ুমণ্ডলে কি ভাবে সঞ্চারিত হয়, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ঐ জাহাজের বিজ্ঞানীরা। সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান সম্পর্কেও তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর ঐ সকল বিমান সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৫০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উড়ে বাতাসের গতিবেগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে।

আমেরিকার অষ্টম টাইরস নামে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ঐ এলাকার আবহাওয়া সম্পর্কে গৃহীত আলোকচিত্রসমূহ এই ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়েছে। ওয়াশিংটনের ন্যাশন্যাল ওয়েদার স্যাটেলাইট সেণ্টারের নির্দেশেই অষ্টম টাইরসের সাহায্যে ভারত মহাসাগরে মেঘলোকের আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে। এই সকল তথ্য সংগ্রহের ফলে জানা গেছে যে, এই অঞ্চলের গ্রীষ্ম-কালীন মৌসুমী বায়ু এত প্রবল যে, এই বায়ু সমগ্র উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

সামুদ্রিক জীবজন্তু এবং মৎস্যাদি সম্পর্কেও বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। অ্যাণ্টন ব্রন নামে একটি মার্কিন জাহাজের বিজ্ঞানীরা আন্দামান সাগরে বহু মাছের সন্ধান পেয়েছেন। বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলে ঐ এলাকা মৎস্য চাষের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

পৃথিবীর খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়াও এই তথ্যানুসন্ধান প্রচেষ্টায় মানুষের বহু রকমের কল্যাণ সাধিত হবে। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের জল থেকে অল্প খরচে মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যাদি কিভাবে উদ্ধার করতে হয়, তা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করছেন। সমুদ্র প্রবাহ, আবহাওয়া, সামুদ্রিক জীবজন্তু ও সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের ফলে সমুদ্রভ্রমণ হবে আরও নিরাপদ, আরও দ্রুত। তারপর ভূকম্পনের ফলে সমুদ্রে যে তরঙ্গ দেখা দেয়, এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই বিষয়ে আরও সঠিক পূর্বাভাস জ্ঞাপন এবং তা নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

দক্ষিণ মেরুর পেঙ্গুইন পাখী

চির তুষারাবৃত কুমেরু অঞ্চলের সীমাহীন বরফাচ্ছাদিত প্রান্তরে অন্যান্য নানা জীবজন্তুর মধ্যে পেঙ্গুইন নামে একপ্রকার পাখীর বাস। তাদের পাখা আছে, সে পাখা দিয়ে তারা জলে ভেসে চলে, আকাশে উড়তে পারে না। তারা প্রধানতঃ জলচর প্রাণী। স্থলে তারা দু-পায়ে ভর

দিয়ে হেলেদুলে চলে। এরা থাকে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ফোকল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডে। অষ্ট্রেলিয়ায়ও পেঙ্গুইন পাখী দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বড় জাতের পেঙ্গুইন রয়েছে ঐ চির তুষারাবৃত এলাকায়। কিং পেঙ্গুইনের এক-একটি দৈর্ঘ্যে তিন ফুটের চেয়ে বেশী বড় হয়ে থাকে।

ঘরের মায়া, ঘরের টান এদের এত বেশী যে, ঐ এলাকার হাজার মাইল দূরে এদের রেখেও দেখা গেছে যে, এরা দিনের পর দিন নিয়মিতভাবে হেঁটে, সাঁতরে আবার সেই পুরনো আবাসে ফিরে এসেছে। ডাঃ পেনী নামে জনৈক জীববিজ্ঞানী ১৯৩৯ সালে পাঁচটি পেঙ্গুইন পাখীকে তাদের দক্ষিণ মেরুর বাসস্থান থেকে ২৪০০ মাইল দূরে ম্যাককার্ডো সাউণ্ড নামক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসেন। তারপর তিনি তাদের উপর নজর রাখতেন—ওরা কোন্ পথে কি ভাবে আবার তাদের ঘরে ফিরে যায়। ডাঃ পেনীকে অবাক করে তিনটি পাখী আট মাসের মধ্যে স্বস্থানে ফিরে আসে। এরা রাতের বেলায় বেরোয় না।. এরা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আট মাইল হেঁটে ও সাঁতরে নিজের জায়গায় এসে পৌছায়। কিন্তু কি ভাবে এবং কোন্ পথে তারা এসে পৌছালো তাঁর সেই প্রথমবারের গবেষণায় তিনি তার পুরা হদিশ পেলেন না।

১৯৬৩ সালে ডাঃ পেনী অ্যাডিলী পেঙ্গুইন নামে আর এক জাতের পেঙ্গুইন নিয়ে আবার পরীক্ষা সুরু করেন। এই সকল পাখীদের এক-একটির ওজন পনেরো পাউণ্ড। এবারেও দেখলেন যে, ঘরের দিকে মুখ করেই তারা সমুদ্রের কিনারা ধরে যাত্রা করে। তারপর একদিন আবার ঘরে ফিরে আসে। মনে হয়, সূর্যের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে তারা সচেতন। এজন্যে এবং তাদের দেহের মধ্যে এমন কিছু হয়তো আছে, যার জন্যে তারা দিক নির্ণয় করতে পারে। তবে তারা কি পথ হারিয়ে ফেলে না? যেমন—দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রের কিনারায় পেঙ্গুইনের বাসা—সমুদ্র থেকে অনেক দূরে। দিক হারা হয়ে তারা সোজা বাড়ীর দিকে যাত্রা না করে তারা যাত্রা করলো উত্তর-মুখী হয়ে, শেষে গিয়ে পৌছলো সমুদ্রে। তারপর সমুদ্রের কিনারা ধরে ঘরে এসে পৌছলো।

আমেরিকার জন্স হপ্‌কিন্স স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের বিজ্ঞানী ডাঃ রিচার্ড এল. পেনী এদের জীবনধারা নিয়ে এখনও গবেষণা করে যাচ্ছেন। এরা কেন এবং কি ভাবে ঘরের পথ সমুদ্রের কিনারা ধরে খুঁজে পায়, সে বিষয়ে এখনও তথ্য সংগ্রহ করছেন।

এবার কুড়িটি পেঙ্গুইনকে তাদের বাসস্থান থেকে নিয়ে এসে হাজার হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে তাদের প্রত্যেকটির ডানার তলায় বিশেষ ধরণের ছোট রেডিও সেট বেঁধে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি পেঙ্গুইনের গতিবিধির খবরাখবর একটি কেন্দ্র থেকে ঐ সকল রেডিওর সাহায্যে জানা যাবে এবং ছোট বিমানে তাদের অনুসরণ করে তাদের চলবার পথ ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর ফলে জানা যাবে, বাসস্থান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়ে পেঙ্গুইনরা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কি ভাবে বেঁচে থাকে এবং দক্ষিণ মেরুর বরফের উপর দিয়ে তারা কি ভাবে চলে। তারা বাসস্থানে থাকবার সময় যে ভাবে ঘরে ফেরবার সময় চলে, ঠিক সেই ভাবেই না অন্যভাবে চলে, সে বিষয়ে এবং চলবার ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হবে।

পেঙ্গুইন সম্পর্কে এই তথ্যানুসন্ধানী অভিযানে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও ডাঃ পেনীর আলাপ-আলোচনা চালাতে হচ্ছে। দক্ষিণ মেরুর রাশিয়ার মিরনী ঘাঁটিতে যে সকল পেঙ্গুইন রয়েছে, তাদের নিয়েও পরীক্ষা চালাতে ইচ্ছুক।

এই পরীক্ষা ও গবেষণা সমাপ্তির পরে হিমাঙ্কেরও নীচের তাপমাত্রায় চলবার সময়ে পেঙ্গুইন পাখীর দেহের পরিবর্তন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্যে কয়েকটি পাখীকে হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে নিয়ে আসা হবে।

পাখীর ভাষা

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষ নিজের মনের কথা সহজেই ভাষায় প্রকাশ করে। এক এক জাতের মানুষের আবার এক এক রকম ভাষা। জন্তু-জানোয়ারও নানারকম শব্দের সাহায্যে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে। পাখীর জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। মনের নানা অবস্থার কথা পাখীও নানা শব্দের সাহায্যে জানাতে পারে।

জানা গেছে যে, পৃথিবীতে ৮,৬০০ রকমের পাখী আছে। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই সুন্দর গানের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সব পাখী গান করতে পারে না। অবশ্য সব পাখীই শব্দ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে গাইয়ে পাখীদের কথাই আলোচনা করছি।

পক্ষিতত্ত্ববিদেরা নানা পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রায় সব পাখীরই দু-রকম শব্দ করবার ক্ষমতা আছে। এই সব করা হয়েছে চুম্বক ফিতা আর স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে। এই সব পরীক্ষা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ও পরিশ্রমলভ্য ব্যাপার। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ গেরহার্ড থিকের মতে, পাখীর গানের বিষয় বুঝতে হলে পাখীদের মন নিয়ে আসা দরকার। মানুষের গানের সঙ্গে এদের গানের কোন মিল নেই। ডাঃ গেরহার্ড বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ, তাই তাঁর মতেরও যথেষ্ট মূল্য আছে বিজ্ঞানী-মহলে।

বিশেষ বিশেষ জাতের পাখী চেনবার উপায় হচ্ছে, সই সব পাখীদের গান। প্রত্যেক জাতের পাখী তাদের নিজস্ব সুর আর ঝঙ্কারে গান গেয়ে থাকে। ঐ গান প্রত্যেক বিশেষ জাতের পাখীর বংশকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা পরে বলা হবে। পাখীর গান সম্বন্ধে পরীক্ষা বেশ আনন্দ ও উত্তেজনাপূর্ণই হয়ে থাকে। পাখীর গান গাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সঙ্গীকে আকর্ষণ করা। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে সাধারণতঃ পুরুষ পাখীরাই গান গেয়ে থাকে। যে সকল পাখী জোড় বাঁধতে সক্ষম হয় নি, তারাই অনেক বেশী গান গেয়ে থাকে। অবশ্য গান বলতে বোঝায় সুমিষ্ট সুর, যা বিভিন্ন পাখীর বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এই পাখীরা বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসে সুমিষ্ট সুরে গান গাইতে থাকে। এই সময় সে অন্য পাখীদেরও যুদ্ধের আহ্বান জানায়। অবশ্য ঐ সুর প্রধানতঃ স্ত্রী-পাখীর প্রতি আহ্বান। ঐ সময়ে তার কণ্ঠস্বর স্পেকট্রোগ্রাফের সাহায্যে গ্রহণ করে দেখা গেছে যে, এদের বিশেষ ধরণের আকৃতি আছে। এগুলি দেখতে অনেকটা সর্টহ্যাণ্ড লেখার মত। একটি বিশেষ জাতের পাখীর সুর সেই জাতের পাখীরাই শুধু বুঝতে পারে, অন্য জাতের পাখী তা বুঝতে পারে না। একাকী-থাকা কোন স্ত্রী-পাখী ঐ সুর শুনে বুঝতে পারে, কোন পুরুষ পাখী কাছেই আছে। এর ফলে ঐ পাখী দুটি জোড় বাঁধতে পারে এবং ঐ জাতের পাখীর বংশধারা ঠিক থাকতে পারে। জোড় বাঁধবার পর ঐ দুটি পাখী কাছাকাছি কোন গাছে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে।

পাখীর গানের আর একটি উদ্দেশ্য হলো, দুটি

পুরুষ পাখীর পরস্পরের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান। যে কোন অঞ্চলের কোন পুরুষ পাখী অন্য পুরুষ পাখীকে জানাতে চায়, এই অঞ্চলের মালিক বা অধিকর্তা সেই। এর ফলে অন্য পাখীটি আর ঐ অঞ্চলে ঢোকবার চেষ্টা করে না। যখন দুটি পুরুষ পাখী এক নাগাড়ে উত্তেজিত ভাবে ডেকে চলে, তখন বোঝা যায় ওরা পরস্পরের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। এই ডাকের মধ্যে বিশেষ ধরণের ভঙ্গীও আছে। এই ধরণের ডাক পশুদের মধ্যেও আছে। এর ফলে বেশীর ভাগ সময়েই আগন্তুক পাখীটি আর সংঘর্ষের মধ্যে প্রবেশের কোন চেষ্টা করে না। ব্যাপারটা ভাল করে পরীক্ষার দ্বারাই প্রমাণ করা হয়েছে। জোড়বিশিষ্ট পুরুষ পাখী যে ধরণের গান বা শব্দ করে, কোন নিঃসঙ্গ পাখী তার চেয়ে আরও দ্রুত লয়ে শব্দ করে থাকে। শব্দগ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যেই একথা জানা গেছে। সাধারণ পাখীরা, যেমন—আমাদের দেশের দোয়েল, চড়ুই ইত্যাদি প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে দিতে বা স্ত্রী-পাখীকে আকর্ষণ করতে একই ধরণের সঙ্গীতের মূর্ছনা প্রকাশ করে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আমেরিকার সাভানার একরকম ছোট্ট পাখী, যার ল্যাটিন নাম অ্যামোড্রামাস সাভানোরাম (Ammodramus Savannorum) স্ত্রী-পাখীকে আকর্ষণ করতে এবং প্রতিপক্ষকে সাবধান করতে দু-রকমের সুর সৃষ্টি করতে পারে।

দুটি যুযুধান পাখী সাধারণতঃ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের সীমারেখাতেই পরস্পরকে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে। পাখীরা কিন্তু এই বিষয়ে মানুষের চেয়ে ঢের বেশী সহনশীল। তারা প্রায়ই কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় না। তাই মনে হয় পাখীর কাছে মানুষ এই বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা করতে পারে।

পক্ষিতত্ত্ববিদেরা পাখীর কণ্ঠস্বর টেপ রেকর্ডে তুলে তার সামনে অন্য একটি পুরুষ পাখীকে ছেড়ে দিয়ে ঐ রেকর্ডার চালিয়ে দেখেছেন। এতে ঐ পাখীটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রথমে সে খুব ছটফট করে তারপর নিজেই প্রচণ্ড স্বরে চেঁচাতে থাকে। ডাঃ থিক একবার দেখে আশ্চর্য হয়ে যান যে, একটা পুরুষ পাখী ঐ রেকর্ডারে নিজের মত কণ্ঠস্বর শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে যন্ত্রটাকে ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, অন্য কোন জাতের পাখী ঐ সুর শুনে গ্রাহ্যই করে না। এর কারণ, এক জাতের পাখীর স্বর অন্য কোন জাতের পাখী মোটেই বুঝতে পারে না; যেমন—এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের ভাষায় অজ্ঞ।

কোন জাতের পাখী জোড় বাঁধার পরেও একসঙ্গে গান গাইতে পারে। বিশেষ করে যখন একের সঙ্গে অন্যের ছাড়াছাড়ি হয়, তখন অপরকে খোঁজ করবার জন্যেও গান বা সুর তোলে। এর ফলে জোড়ের কোন একটি পাখী হঠাৎ দূরে কোথাও চলে গেলে ঐ সুর শুনে আবার তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এটা সাধারণতঃ হয় খাদ্য-অন্বেষণ করবার সময়। যে সব পাখী রাত্রিচর, তারাই সাধারণতঃ এই ধরণের সঙ্গীতের আশ্রয় নেয়। পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ স্বরের বৈশিষ্ট্য আছে।

এতক্ষণ পাখীর কতকগুলি বিশেষ সময়ের সঙ্গীতের কথা বলা হলো। সাধারণভাবে পাখীরা যে সব শব্দ করে, তারও উদ্দেশ্য আছে; যেমন—পাখী ক্রুদ্ধ হলে এক রকম শব্দ করে—আবার ক্ষিদে পেলে অন্য ধরণের শব্দ করে। পরীক্ষার সাহায্যে জানা গেছে, কোন এক জাতের পাখী খুব বেশী হলে পনেরোটি মাত্র বিভিন্ন শব্দ করতে পারে। আবার অনেক পাখী আছে, যারা খুব ভালভাবে কানে শুনতে পায় না। এরা সর্বদাই প্রচণ্ড কলরব করে থাকে। এই ধরণের

পাখীরা, যেমন — ইংল্যাণ্ডের ব্ল্যাক বার্ড তাদের বাচ্চাদের মুখনাড়া দেখেই বুঝতে পারে, তারা কি চায়।

ডাঃ থিক বিশেষ পরিশ্রম করে পরীক্ষার পর প্রমাণ করেছেন যে, এক এক জাতের পাখী এক এক রকম সুর প্রকাশ করে— একথা আগেই বলা হয়েছে। পাখীদের মধ্যে অনেক জাতের পাখী এক একটি সম্পূর্ণ ছন্দের সুর সৃষ্টি করতে পারে; অর্থাৎ তাদের সৃষ্ট সুর একটি নির্দিষ্ট কবিতার মত। কোন কোন পাখী তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের ছন্দ সৃষ্টি করতে পারে। টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে এই সুরের ধ্বনি গ্রহণের পর আবার স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ যন্ত্রের সামনে রেকর্ডার চালাবার পরই এর বিভিন্নতা ধরা সম্ভব।

একটি বিষয়ে বিভিন্ন জাতের পাখীর শব্দের খুব মিল দেখা গেছে। যেমন, কোন রাত্রিচর পাখীর দেখা পেলে ছোট পাখীরা ভয়ে আর্তনাদ করে বা অন্যকে সাবধান করে দেয়। এই সময়ের ছবি স্পেক্‌ট্রোগ্রাফে তুলে দেখা গেছে, তারা প্রায় একই রকমের। এই শব্দ খুব উচ্চ গ্রামের হয়ে থাকে। এই শব্দের ফলে নিশাচর পাখীরা এই ছোট পাখীদের ধরতে সক্ষম হয় না। ঐ শব্দের ফলেই ছোট পাখীরা সময়মত লুকিয়ে পড়তে পারে। আবার আশ্চর্যের কথা, এই পাখীরা যখন দিনের বেলায় কোন রাত্রিচর পাখী দেখে, তখন অন্য রকম শব্দ করে—যেমন, ঐ পাখীরা পেঁচাকে দেখলে করে থাকে। পেঁচা দিনের বেলায় ভাল দেখতে পায় না বলেই ঐ পাখীরা প্রায় পেঁচার কাছাকাছি থেকেই ঐ রকম শব্দ করে। এটাকে এক ধরণের তামাসাই বলা যেতে পারে।

সারা বছর ধরে পাখীরা এক ধরণের গান গায় না বা সর্বদাই সুর সৃষ্টি করে না। সাধরণতঃ গ্রীষ্মকালে পাখীরা কম সুর সৃষ্টি করে। বসন্তের আগমনে আবার পাখীদের মধ্যে আলোড়ন জাগে, তারা সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকে, যেমন দেখা যায় ভারতবর্ষের কোকিলের মধ্যে। কোকিল সাধারণতঃ বসন্তেরই অগ্রদুত। এই সময়েই এদের গান শোনা যায়। গ্রীষ্মকালে কোকিল প্রায় নিশ্চুপ অবস্থাতেই থাকে।

পাখীদের মধ্যে আবার একটা মজার ব্যাপার ঘটে। যেমন—কোন বিশেষ জাতের পাখীর সামনে রেকর্ডের সাহায্যে বারবার কোন বাজনা বা বিশেষ সুর বাজানো হলে ঐ পাখী সেই সুর অবিকল নকল করতে পারে। আমাদের দেশে ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া—এমন কি, শালিকও মানুষের ভাষা নকল করতে পারে। যদিও এর মানে এরা ধরতে পারে না। অবশ্য এই ধরণের ব্যাপার পোষা পাখীদের ক্ষেত্রেই ঘটে। স্বাধীন জীবনে পাখীদের মানুষের ভাষা বা শব্দ নকল করতে দেখা যায় নি।

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবার কলিকাতা মহানগরীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১তম ও ৫২তম সংযুক্ত অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। আশুতোষ ও বিজ্ঞান কংগ্রেস উভয়েরই জন্মস্থান এই কলিকাতা মহানগরী। সে কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ আহ্বানে এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এই নগরীতে আয়োজনের সুযোগ দান করায় কলিকাতাবাসী হিসাবে আমরা সকলেই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু সার আশুতোষের জন্মশতবর্ষ ১৯৬৪ সালে পড়ায় ঐ বছরের শেষ দিনটিতে এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন সুরু হয়ে ৬ই জানুয়ারীতে শেষ হয়। আর একটি প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম এবারের অধিবেশনে ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এযাবৎকাল প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অথবা রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করতেন। এবার এই রীতি পরিহার করে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্বোধকরূপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর দ্বারা বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই উদ্বোধন খুবই সঙ্গত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছেন।

৩১শে ডিসেম্বর সকালে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে ৩৫ জন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৫ হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন আচার্য বসু। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে সার আশুতোষের দূরদৃষ্টি এবং এবারের অধিবেশনে শ্রীনেহরুর অনুপস্থিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। উপসংহারে বিদেশী বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি বলেন—'বিজ্ঞানীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন করে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই পথ রচনা করছেন, যখন মানুষের মন থেকে জাতিধর্মের সকল বাধা ও সংশয় বিদূরিত হয়ে যাবে।'

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, বর্তমানে জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যা বিজ্ঞানের দ্বারা সহজ হতে পারে না। মানব সমাজের ভাগ্য বিজ্ঞানীদের উপরই নির্ভর করছে। ভারত নিজেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া এই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বিধুভূষণ মালিক তাঁর ভাষণে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সার আশুতোষের সবিশেষ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন।

এবারকার অধিবেশনের মূল সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর ভাষণে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের

পুনরুদ্ধার এবং ভারতে বৈজ্ঞানিক মনীষা আবিষ্কারের জন্যে সাত দফা প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, গত দুই বা তিন দশকে রুশ ও মার্কিন দেশে প্রধানতঃ সমবেত গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। উভয় দেশেই দলবদ্ধ গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার ফলে গবেষকের একক গবেষণা অপেক্ষা দলবদ্ধ গবেষণা বিজ্ঞানকে উল্লেখযোগ্য অবদানে সমৃদ্ধ করে থাকে। ভারতেও দলবদ্ধ গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে তরুণ বিজ্ঞান-প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

অধ্যাপক কবির তাঁর ভাষণে দলবদ্ধ গবেষণা ও তরুণ গবেষকদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেবার সম্বন্ধে যে গুরুত্ব আরোপ করেন, তা স্বভাবতঃই সকলের অভিনন্দন লাভ করে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনায় পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হলডেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতি শ্রীকবির কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী প্রথম এশিয়াবাসী শ্রীজগজিৎ সিংকে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা প্রদত্ত পুরস্কার অর্পণ করেন।

প্রথম দিনে মূল অধিবেশনের পর দ্বিতীয় দিন থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ১৩টি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন হয় এবং যথারীতি শাখা-সভাপতির ভাষণ, গবেষণা-পত্র পাঠ, বিশেষ বক্তৃতা ও আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং লোকরঞ্জক বক্তৃতার আয়োজন বিজ্ঞান কংগ্রেসের কার্যসূচীর একটি নিয়মিত অঙ্গ। এবারেও এরূপ একাধিক বক্তৃতায় আয়োজন করা হয়েছিল। যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রসায়নবিদ্যায় অধ্যাপক এইচ. সি ব্রাউন এবং অধ্যাপক ডাবলিউ. সীর্মার, পদার্থবিদ্যায় অ্যাকাডেমিশিয়ান গেজা বোগনার এবং ডাঃ আর. কে. মিত্র, উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপক

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর বামে উপাচার্য ডাঃ বি. মালিক, দক্ষিণে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় উপবিষ্ট। ফটো—শ্রীশশাঙ্কশেখর দত্ত

জে. ট্রুব্, গণিতশাস্ত্রে অধ্যাপক জি. হিগমান, অধ্যাপক জে. এল. কেলি এবং অ্যাকাডেমিশিয়ান ইউ. ভি. লিন্নিক, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলে অধ্যাপক কে. সি. ডানহাম এবং ডাঃ সি. জে. ষ্টবল্‌ফেল্ড, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানে অধ্যাপক সি. হুইটওয়ার্থ, যন্ত্রবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যায় অধ্যাপক ডি জি. বুটেক। লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন শ্রীজগজিৎ সিং, অধ্যাপক আফজল হুসেন, অধ্যাপক হুইট-ওয়ার্থ, ডাঃ জে. বি চাটার্জী, অধ্যাপক ডানহাম, অধ্যাপক এস. পি. চাটার্জী, ডাঃ স্টবলফেল্ড, অধ্যাপক এস. ডেডিজার, ডাঃ নীলরতন ধর এবং ডাঃ বি. ডি নাগচৌধুরী। এ ছাড়া, ডাঃ জে. সি. রায় প্রথম বার্ষিক বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা এবং ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী বক্তৃতা প্রদান করেন। এবারের অধিবেশনে যে সকল আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সপ্ততিতম জন্মোৎসব কমিটির সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'বোস সংখ্যায়নের ৪০ বৎসর' এবং 'একক ক্ষেত্রতত্ত্ব' সম্পর্কিত আলোচনা এবং 'ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি-প্রকৃতি' ও 'জাতীয় অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকার কয়েকটি দিক' বিষয়ক আলোচনা দুটি। এছাড়া প্রতিটি শাখায় নানা বিষয়ের আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়েছিল।

সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে সারাদিনের গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা বা আলোচনার পর প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আনন্দানুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনে শ্রী এ. সি. সরকার ইন্দ্রজাল প্রদর্শন, সুরমন্দির 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্য, গীতবিতান 'বাল্মীকি প্রতিভা', শিশু রঙমহল 'ভারতের সঙ্গীত' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা 'মহুয়া' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন। এছাড়া, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউ. এস. আই. এস. এবং ফিলিপ্‌স্ ইণ্ডিয়াবি ভিন্ন দিনে বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কলকাতার পৌরপ্রধান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। কলিকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি এবং বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শনের যথারীতি ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে প্রতি বছর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এবারও বিজ্ঞান কলেজের বিপরীত দিকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনের দিনে কলিকাতার পৌরপ্রধান শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাঁদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহের একটি স্টল করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এবারের অধিবেশনে 'কি পেয়েছি আর কি পাই নি' তার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে এটুকু শুধু বলতে চাই, সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ছোটখাটো ত্রুটি হয়তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ছিল ধন্যবাদার্হ। এই উপলক্ষে তাঁরা যে সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত তথ্যপূর্ণ স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। এবারের অধিবেশনে আগত কয়েকজন বিদেশী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় একটি অনুযোগের সুর শুনে ছিলাম যে, তাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং এতৎসম্পর্কিত গবেষণাগার দেখবার সুযোগ তেমন পান নি। সেই সঙ্গে একটি সাধারণ অনুযোগ বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্পর্কে কিছু কাল থেকে উঠেছে, বিজ্ঞান কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানীদের

একটি বাৎসরিক 'মেলা'র রূপ পেয়েছে। এই অনুযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন—একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি এই বাৎসরিক অধিবেশনে বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিজ্ঞান-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের অন্ততঃ একটা মূল্য আছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না।

বাড়ীর জল সরবরাহ-ব্যবস্থা ও নলকূপ

শ্রীকরুণানিধান চট্টোপাধ্যায়

যতই নিত্য নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, জলের চাহিদা দিন দিন ততই বাড়িয়া যাইতেছে আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান মারফৎ জলের সরবরাহ আশানুরূপ না হওয়ায় নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন নলকূপের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু ভাল নলকূপ করিবার মত ঠিকাদার বা মিস্ত্রী আমাদের দেশে কম আছে। আমরা দেখিতে পাই খুব সস্তার মাল-মশলা নলকূপ করিতে ব্যবহার করা হইয়াছে, যদিও বাড়ীর মালিকের নিকট হইতে ভাল মালের দাম ও চড়া মজুরীর লওয়া হইয়াছে। আজকাল বাজারে যে সকল নল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোনও কোনও নলের অবস্থা এতই খারাপ যে, একবার হাতুড়ীর আঘাতেই তুবড়াইয়া যায় এবং এইরূপ নল ব্যবহারে নলকূপ তিন-চার বৎসরের বেশী টিকে না।

এই সমস্ত অসুবিধা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে প্রথমে নলকূপ বসাইতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা নূতন নলকূপ বসাইতেছেন ইহা শুধু তাঁহাদের জন্য নহে, যাঁহারা নলকূপ বসাইয়াছেন তাঁহাদেরও কাজে লাগিবে—কারণ পুরাতন নলকূপকে ভবিষ্যতে গভীরে পুনঃপ্রোথিত করিবার বা বদ্‌লাইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

বাড়ীর নলকূপ বসাইতে হইলে গৃহনির্মাণ-কারী মিস্ত্রী বা ঠিকাদার মারফৎ নলকূপের মিস্ত্রীর ব্যবস্থা করা হয়। যদি গৃহনির্মাণের ঠিকাদার ভাল হয়, তবে হয়তো নলকূপ ভাল হইতে পারে; নচেৎ তিনি সস্তায় যে নলকূপ বসাইবার মিস্ত্রী পাইবেন তাহাকে দিয়াই নলকূপ বসাইবেন এবং সে সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নলকূপটি অচল না হইয়া যায়।

বাড়ীর জন্য জমি কিনিবার পূর্বেই ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে যে, কত ফুট নীচে ভাল জলবাহী বালুকাস্তর আছে। কারণ অনেক সময় জলবাহী বালুকাস্তর পাওয়া গেলেও তাহা লবণাক্ত হইবার আশঙ্কা আছে। আবার কোনও স্থানে ৩০০ ফুটের মধ্যে পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে এবং কোনও স্থানে ১০০ ফুট গভীর নলকূপ খনন না করিলে পানীয় জল পাওয়া যাইবে না। জমি কিনিবার পূর্বে ভাল ঠিকাদার, স্থানীয় প্রতিবেশী ও জনস্বাস্থ্য বাস্তু-কারদের সহিত আলোচনা করিয়া জানিয়া লইতে হইবে যে, কত গভীরতায় ভাল নলকূপ হইতে পারে, জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে কি না, গ্রীষ্মকালে জল নামিয়া যায় কি না ও নামিলে জমি হইতে কত ফুট নীচে নামিয়া যায়—ইত্যাদি।

যেহেতু নলকূপ মাটির নীচে প্রোথিত থাকে সেহেতু অসৎ ঠিকাদার বা মিস্ত্রী আপনাকে নানা-ভাবে প্রতারিত করিতে পারে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর নল, ছাঁকনী ইত্যাদি ব্যবহার করা ছাড়াও ১০০ ফুট

খনন করিয়া আপনার নিকট ১৫০ ফুট খননের মজুরী আদায় করিতে পারে, কারণ আপনি নলকূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই সকল ক্ষেত্রে নলকূপের ভিতর তার নামাইয়া মাপিয়া দেখা উচিত যে, ঠিকাদার কত ফুট নীচে নলকূপ বসাইয়াছে। পাথরের স্তর খনন না করিয়াও পাথর কাটিয়াছে বলিয়া অত্যধিক মজুরী আদায়ের চেষ্টা করিতে পারে। সে বাঁকা নলকূপ বসাইতে পারে, যাহা পরে মেরামত করা খুবই কঠিন। সে প্রয়োজনীয় সাবধানতার জন্য বেনটোনাইট পাথর চূর্ণ (Bentonite Powder) ও ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার নাও করিতে পারে, যাহার জন্য আপনার পরিবারের লোকজনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে। বেনটোনাইট পাথর চূর্ণ খনন করিবার সময় ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার ঠিকাদার তাহার পরিবর্তে কাদা ও গোবর ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে পারে। নলকূপ বসাইবার পর তাহা শতকরা ২০ ভাগ ব্লিচিং পাউডার ও জল মিশাইয়া ভালভাবে ধৌত করা উচিত; কারণ ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

নলকূপ বসাইবার স্থান সর্বদা জমির উচ্চ স্থানে নির্দিষ্ট করা বিধেয়। সাধারণতঃ নলকূপ মলশোধ-নাশয় (Septic Tank) হইতে ৫০ ফুট দূরে বসান উচিত ও ঢালুর উচ্চতার দিকে বসান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বলিয়াই জনস্বাস্থ্য অধিকর্তাদের (Public Health Authorities) ধারণা। যদিও সরন্ধ্র জমিতে (Porous Soil) আরও দূরে নলকূপ স্থাপন করা ভাল, তবু এই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে।

নলকূপ করিতে কত খরচ পড়িবে, তাহাও আপনার জানা প্রয়োজন। ইহা নির্ভর করিতেছে এই সকল বিষয়ে উপর যে, কত গভীর নলকূপ করিবেন, কত ব্যাসবিশিষ্ট নলকূপ করিবেন, সেইস্থানে পাথরের স্তর আছে কিনা অথবা শুধু বালুকাস্তর বা কাদাস্তর রহিয়াছে কিনা। কারণ পাথর কাটিতে খরচ অনেক বেশী পড়ে, কিন্তু বালুকাস্তর ও কাদাস্তর খুব সহজেই কাটা যায়। সাধারণতঃ ১½" ব্যসের নলকূপ বসাইতে ফুট প্রতি এক টাকার মত মজুরী পড়ে ও নলের দাম ফুট প্রতি দুই টাকার মত পড়ে। ইহা ছাড়া পাম্পের দাম, ছাঁকনীর দাম ইত্যাদি আলাদাভাবে ধরিতে হইবে।

কত ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপের প্রয়োজন, তাহা নির্ভর করিতেছে দৈনিক কি পরিমাণ জলের আপনার প্রয়োজন হইবে, তাহার উপর। সাধারণভাবে পরিবারের জনপ্রতি প্রতিদিন ৫০ গ্যালন হিসাবে জলের ব্যবস্থা করা ভাল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ভবিষ্যতে আপনার পরিবার বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য ও ব্যবস্থা রাখা উচিত। ইহা ছাড়াও যদি আপনি বাগান, ঝরণা ইত্যাদি করিতে ইচ্ছুক হন, তবে ইহার উপর জনপ্রতি প্রতিদিন আরও ২৫ গ্যালন হিসাবে জলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ইহা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অত্যধিক মনে হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ করিলে ভবিষ্যতে কোন দিন কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

নিম্নে একটি উদাহরণ আপনাদের সুবিধার্থে দেওয়া হইল। ধরুন, আপনার পরিবারের লোকসংখ্যা ৫ জন। তাহা হইলে উক্ত হিসাব অনুযায়ী আপনার দৈনিক জলের প্রয়োজন হইবে নিম্নরূপ—

৫ জন × ৫০ গ্যালন জনপ্রতি = ২৫০ গ্যালন
বাগান ইত্যাদির দরুণ ৫ × ২৫ = ১২৫ গ্যালন
সর্বসমেত ৩৭৫ গ্যালন

যেহেতু আপনার দৈনিক ৩৭৫ গ্যালন জলের প্রয়োজন, সেহেতু একটি ১½ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ আপনার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

সাধারণতঃ ঘণ্টায় যখন ৩০০ গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ১½" ব্যাসের নলকূপ করা যাইতে পারে। ঘণ্টায় ১০০০ গ্যালন অবধি জলের জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপের প্রয়োজন

হইতে পারে। ঘণ্টায় ১০০০ গ্যালনের বেশী জলের চাহিদা হইলে ৩ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ বসানোই শ্রেয়, যদিও একটি ৩ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০০০ গ্যালন জল সরবাহ করিতে সক্ষম।

বাড়ীর জন্য জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকাও আপনার প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ দুই রকম ভাবে জল ধরিয়া রাখা যাইতে পারে—(১) বড আকারের দস্তা-কলাইকরা লৌহের ট্যাঙ্ক ও (২) স্বয়ংক্রিয় উচ্চচাপের ট্যাঙ্ক (Automatic Pressure Tank)। আমাদের দেশে ঘন ঘন বৈদ্যুতিক শক্তি বন্ধ হইয়া যায়, ইহা বিবেচনা করিয়া বড আকারের ট্যাঙ্ক বসানই ভাল, তবে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি থাকিলে স্বয়ংক্রিয় উচ্চচাপের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা রাখিলে ভাল হয়, কারণ তাহা সুবিধাজনক ও তাহার দাম তুলনামূলকভাবে বড় আকারের ট্যাঙ্ক হইতে সস্তা। যেখানে একটি ৪২ গ্যালনের স্বয়ংক্রিয় ট্যাঙ্কে কাজ চলিয়া যায়, সেখানে একটি বড় আকারের ৩০০ গ্যালন লৌহের ট্যাঙ্কের প্রয়োজন হয়।

যাহা হউক, বাড়ীর জল সরবরাহ-ব্যবস্থা সকল দিক হইতে ভাল ভাবে করিতে হইলে জল-সরবরাহ-বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে খরচ কম হইবে ও উপযুক্ত কাজ পাওয়া যাইবে।

বজ্র

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

দৈত্যদের রাজা বৃত্রাসুর। সে দৈববলে বলীয়ান। একদিন সে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করলো। দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হলেন, পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ব্রহ্মার কাছে। তাঁকে অনুনয় করে বললেন—প্রভু কেমন করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করবো বলুন।

ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন নারায়ণের কাছে। সব কথা শুনে নারায়ণ ইন্দ্রকে বললেন—দধীচি মুনির কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাও। তিনি যদি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন, তবে তাঁর অস্থি নিয়ে যাবে বিশ্বকর্মার কাছে। এই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা এক ভয়ঙ্কর বজ্র তৈরি করবেন। সেই বজ্রের আঘাতে তুমি বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

দধীচির আশ্রমে গিয়ে ইন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়ে। মুনিকে প্রণাম করে বিনীতভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুনিবর তাঁকে আসন গ্রহণ করতে এবং তাঁর সেখানের আগমনের হেতু কি, তা জানাতে বললেন। তখন ইন্দ্র বললেন—মুনিবর দেবতাদের আজ বড দুর্দিন। বৃত্রাসুর স্বর্গ কেড়ে নিয়েছে। একমাত্র আপনিই এখন স্বর্গ রক্ষা করতে পারেন। তাই নারায়ণের আদেশে আমি আপনার কাছে এসেছি।

মুনি জিজ্ঞেস করলেন—বলুন, আপনি আমার কাঁছে কি চান ?

ইন্দ্র বললেন—আমরা আপনার অস্থি চাই। এই অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি হবে। একমাত্র সেই বজ্র দিয়েই বৃত্রাসুরকে বধ করা সম্ভব হবে।

একথা শুনে দধীচির মুখখানি প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এতদিনে তার তপস্যা বুঝি সার্থক হলো। স্বয়ং দেবরাজ এসেছেন তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে। দেবতাদের হিতার্থে জীবন বিসর্জন দেবার চেয়ে মহত্তর কাজ আর কি হতে পারে? তখনই তিনি যোগাসনে বসে দেহত্যাগ করলেন।

দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি হলো। ইন্দ্র সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। বৃত্রাসুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অসুরেরা স্বর্গরাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল। দেবতারা আবার স্বর্গে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন।

এ তো গেল পুরাণের গল্প। কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর কষ্টসাধ্য গবেষণাদ্বারা প্রমাণ করেছেন—এ শুধু একটা কাল্পনিক কাহিনী নয়। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর অনেকখানি মিল আছে। প্রাচীন ঋষিরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তাই তাঁরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন এই রকম গল্পের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুলি আমরা বিচার করে দেখতে পারি নি, তাই এর সারমর্মও আমরা এতকাল ঠিক উপলব্ধি করতে পারি নি। এই সম্পর্কে আচার্য রায়ের অভিমত কি, তাই এখন আলোচনা করছি।

তাঁর মতে সূর্যই ইন্দ্র। কিন্তু প্রতিদিনের সূর্য ইন্দ্র হতে পারেন না। তিনি বৃষ্টির দেবতা, তাঁর জন্মকালে কখনও কখনও মেঘ ডাকতো। তিনি বজ্রহস্তে বৃষ্টি-রোধকারী দানব বৃত্রাসুরকে হত্যা করে রুদ্ধ বারি মোচন করেন, আর দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে বায়ু তাঁর সহায় হন। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এসব লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তার পরেই বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব হয়। ইন্দ্র সূর্যকে পরাভূত করে তাঁর রথচক্র হরণ করেছিলেন; সুতরাং সে সময়ে সূর্য নিশ্চল হয়েছিলেন। এসব লক্ষণ দেখে রায় মহাশয় বলছেন, সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ণ আরম্ভের দিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হয়, তাই ইন্দ্র। আর বজ্রই হলো তাঁর প্রধান আয়ুধ।

রায় মহাশয়ের মতে, আকাশে সর্পাকৃতি যে বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলটি আছে, তাকেই বৃত্র বলে মনে করা যায়। ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে আরও বোঝা যায় যে, হস্তার পাঁচটি নক্ষত্রে বৃত্রের মস্তক এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে তার পুচ্ছ।

বৃত্রবধের অর্থ, বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র দেহ সূর্যোদয়ের আগে অল্পক্ষণের জন্যে দৃষ্ট হয়েই উদীয়মান সূর্যের কিরণ-প্রভায় অদৃশ্য হয়েছিল বৃত্র-বধকালে সূর্য ছিলেন চিত্রা নক্ষত্রে। হিসেব করে দেখা গেছে, খৃঃ পূঃ ৬৩০০ অব্দে চিত্রা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হয়েছিল। সে বছর ২৪শে মার্চ সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে পশ্চিমাকাশে বৃত্রের সমগ্র দেহটি দেখা গিয়েছিল। পরদিন ঐ সময়ে বৃত্রের দেহের কিছু অংশ অস্ত ও অদৃশ্য হয়েছিল। এমনি ভাবে প্রতিদিনই একটু একটু করে মোট এক-শ' দিনে বৃত্রের সমগ্র দেহটি অদৃশ্য হয়। এরপর ৩রা জুলাই দেখা যায়, সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত সমগ্র দেহ পূর্বাকাশে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উদীয়মান সূর্যের কিরণ-প্রভায় বৃত্র অদৃশ্য হয়ে যায়। একেই 'বৃত্রহত্যা' বলা হয়েছে।

জুলাই থেকে তিন মাস বৃত্রকে আকাশে দেখা যেত না, আর এই তিন মাস ধরে বৃষ্টি হতো। তাই ঋষিগণ কল্পনা করেছিলেন, বৃত্র বৃষ্টি রোধ করে রেখেছিল। ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করে বারি মোচন করেন। তাছাড়া এই সময় বজ্রপাতের ঘটনা দেখে এবং তার অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তি প্রত্যক্ষ করেই যে, বজ্রকে ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধরূপে কল্পনা করা হয়েছিল, এবিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে বল তো মনে করি না!

বজ্র-বিদ্যুৎও যে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলার অন্তর্গত, সে বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর কি খেয়াল হলো—একটা ঘুড়ি উড়ালেন রেশমের সুতায় বেঁধে। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হলো। দেখলেন, যেই বিদ্যুৎ চমকায়, অমনি তাঁর হাতে ঝাঁকুনি (শক্) লাগে। তিনি এই ভাবে আকাশের মেঘ থেকে তড়িৎ নামিয়ে আনলেন মাটিতে। বোঝা গেল, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদিনে বজ্র সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

এখন প্রশ্ন, আকাশের মেঘে এমন বিপুল পরিমাণ তড়িতের সঞ্চার হয় কি করে? সূর্যের আলো আসে উপরের বায়ুস্তর ভেদ করে। সূর্য কিরণের অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet rays) এবং মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic rays) ক্রিয়ায় সেখানে অসংখ্য তড়িতাবিষ্ট বা আয়নিত (Ionised) কণিকার সৃষ্টি হয়। এদের কেন্দ্র করেই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানী সিম্প্‌সনের মতে, একটি বড় জলকণা যখন উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের ভিতর দিয়ে পড়তে থাকে, তখন তা ভেঙ্গে আরও ছোট ছোট অনেকগুলি জলকণায় পরিণত হয়। এই সময় জলের সঙ্গে বায়ুর ঘর্ষণে জলকণাগুলি পজিটিভ তড়িৎ-ভাবাপন্ন হয়, অপর দিকে চারপাশের বায়ুকণাগুলি নেগেটিভ তড়িৎ-ভাবাপন্ন হয়। এরূপ হওয়া যে সম্ভব, তা পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা গেছে। এইভাবে জলকণাগুলি যত নীচের দিকে নামতে থাকে, ততই তা ভেঙ্গে আকারে আরও ছোট হতে থাকে এবং তাতে পজিটিভ তড়িতের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এইভাবে জলকণার আকার ক্রমশঃ এত ছোট হয়ে পড়ে যে, তা উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে আবার উপর দিকে উঠে যায়। উপরে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, এজন্যে সেখানে একে কেন্দ্র করেই আরও জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়। এর ফলে জলকণার আকার আবার বড় হয় এবং ভারবশতঃ তা আবার নীচের দিকে পড়তে থাকে। এমনি করে জলকণাগুলি বায়ুপ্রবাহে বারে বারে উপরে-নীচে ওঠা-নামা করতে থাকে। এর ফলে এদের মধ্যে পজিটিভ তড়িতের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। শেষে ঐ মেঘে তড়িতের পরিমাণ এত বেশী হয়ে পড়ে যে, এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে অথবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর তড়িৎ-ক্ষরণ হয়—যাকে আমরা বাজ পড়া বলি।

ধরা যাক, পাশাপাশি দুটি চৌবাচ্চা আছে, একটি উঁচুতে, অন্যটি একটু নীচুতে। উপরের চৌবাচ্চাটি জলে ভর্তি। এখন একটি রবারের নল দিয়ে চৌবাচ্চা দুটি জুড়ে দেওয়া হলো। দেখা যাবে, উপরের চৌবাচ্চা থেকে জল নীচের চৌবাচ্চায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে সবটা জল নীচের চৌবাচ্চায় যেতে পারবে না। খানিকক্ষণ পরে যখন দুটো চৌবাচ্চাতেই জল এক সমতলে আসবে, তখন জলের প্রবাহ আপনা থেকেই থেমে যাবে।

বজ্রগর্ভ মেঘ বায়ুস্রোতে ভেসে যাবার সময় নীচের ভূপৃষ্ঠে বিপরীত-ধর্মী তড়িতের আবেশ হয়। আর এই দুই বিপরীত-ধর্মী তড়িতের মধ্যে আকর্ষণ হয়। তখন আকাশের মেঘ থেকে তড়িৎ নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজে হতে পারে না। কারণ, এই উভয়ের মধ্যে বায়ুস্তর আছে, আর বায়ু অত্যন্ত কুপরিবাহী (Bad conductor)। তবে মেঘে যদি তড়িতের পরিমাণ খুব বেশী হয়, তবে বায়ুর ভিতর দিয়েই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। ভূপৃষ্ঠে যে বস্তুটি খুব উঁচু (যেমন তাল বা নারকেল গাছ, মন্দির, মসজিদ বা গির্জার চূড়া ইত্যাদি) তার উপরকার আবিষ্ট তড়িৎই বজ্রগর্ভ মেঘের সবচেয়ে কাছে থাকে, এজন্যে আকাশের মেঘ থেকে একটা বিরাট বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ধেয়ে আসে ঐ বস্তুটির দিকে।

ব্যাপারটি আরও একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে

বলছি। বাতাস তড়িৎ-পরিবাহী নয়। এজন্যে তামার তারের ভিতর দিয়ে যত সহজে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, বাতাসের ভিতর দিয়ে তত সহজে প্রবাহিত হতে পারে না। কিন্তু মেঘে যখন প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চিত হয়, তখন সেখান থেকে অনেক তড়িৎ-কণা বেরোতে থাকে। এরা বেরিয়ে এসে বায়ুকণাগুলিকে সজোরে ধাক্কা মারে, তাতে বায়ুকণা ভেঙ্গে আবার দু-জাতের তড়িৎ-কণায় পরিণত হয়। দু-দিকের বিপরীত-ধর্মী তড়িতের আকর্ষণে এরা প্রবলবেগে দু'দিকে ছুটে যেতে চায় এবং অন্য বায়ুকণাকে জোরে ধাক্কা মারে। এইভাবে মাঝের বায়ুস্তর ক্রমশঃ আয়নিত হতে থাকে। এখন মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে তড়িতাধানের বৈষম্য যদি খুব বেশী হয়ে থাকে, তবে মাঝের বায়ুস্তর তড়িৎপ্রবাহের বেগ সামলাতে পারে না। এজন্যে তখন মেঘ থেকে পৃথিবীর দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এদিকে তড়িৎ-কণাগুলির ছুটাছুটির ফলে একটা নির্দিষ্ট পথের বায়ুকণাগুলি সব ভেঙ্গে যায় এবং অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই তাপ হঠাৎ আলো হয়ে ফুটে বেরোয়। আমরা দেখি, বিদ্যুৎ চমকালো। আবার এই ভয়ঙ্কর তাপের প্রভাবে অনেকটা জায়গার বায়ু হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে প্রসারিত হবার চেষ্টা করে, তাই হঠাৎ একটা বোমা ফাটার মত বিকট আওয়াজ হয়। এই হলো বাজ পড়বার শব্দ। একেই আমরা মেঘের ডাক বলি। এই শব্দ বিভিন্ন স্তরের মেঘ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে আসতে থাকে। এর ফলে একাধিক প্রতিধ্বনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের কানে পৌঁছাতে থাকে। তাই আমরা মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি শুনতে পাই।

আর একটা কথা, বিদ্যুৎ চমকাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজ পড়ে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা বিদ্যুতের ঝলকানি দেখবার বেশ কিছুক্ষণ পরে মেঘের ডাক শুনতে পাই। এর কারণ কি? আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে, কাজেই ৮।১০ মাইল দূরে অবস্থিত দর্শকের কাছে আলো পৌঁছাতে যে সময় লাগে, তা উপেক্ষণীয়। কিন্তু সে তুলনায় শব্দের বেগ অত্যন্ত কম, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,১২০ ফুট মাত্র। কাজেই আলোর ঝল্‌কানি দেখা এবং মেঘের ডাক শোনবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। বলা বাহুল্য, মেঘের দূরত্ব যত বেশী হবে, এই ব্যবধান তত বেড়ে যাবে।

সাধারণতঃ একজন শ্রোতার কাছে বজ্রনাদ পৌঁছাতে যে সময় লাগে, তার আগেই বজ্রপাত শেষ হয়ে যায়। কাজেই বজ্রনাদ শোনা গেলেই বুঝতে হবে যে, সেই বজ্রপাত থেকে শ্রোতার প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই।

ঘরের বাইরে থাকতে হঠাৎ বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হলে তাল, নারিকেল বা ঐরূপ উঁচু কোন গাছের নীচে আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে কাছাকাছি সেটাই যদি একমাত্র উঁচু বস্তু হয়। কারণ তারই উপর বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশী। আশেপাশে কোন আশ্রয় না পেলে খোলা মাঠেই উবুড় হয়ে শুয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ, তাতে বিপদের আশঙ্কা বিশেষ থাকে না।

মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা উঁচু ঘর-বাড়ী বজ্রপাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বজ্ররক্ষী (Lightning conductor) ব্যবহার করা হয়। এটা একটা ধাতব দণ্ড এবং এর উপরের প্রান্তে কতকগুলি তীক্ষ্ণ সূচীমুখ থাকে। এই প্রান্তটি ঘর-বাড়ীর সর্বোচ্চ অংশ থেকে আরও কিছু উপরে আকাশের দিকে মুখ করে রাখা হয়।

দণ্ডের অপর প্রান্তটি মাটির অনেক নীচে পুঁতে রাখা হয়। আহিত মেঘ ঐ ঘর-বাড়ীর উপর

এলে নীচে যে বিদ্যুৎ আবেশের সৃষ্টি হয়, তা অত্যন্ত দ্রুত ঐ সূচীমুখে ক্ষরিত হয়ে যায় বলে সেখানে আর বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে না। আর দৈবাৎ বজ্রপাত হলেও তড়িৎপ্রবাহ ঐ দণ্ডের ভিতর দিয়েই সবচেয়ে সহজে মাটিতে প্রবেশ করতে পারে, তাই তখন ঐ ঘর-বাড়ীর বা তার বাসিন্দাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হতে পারে না।

বিজ্ঞান-সংবাদ

কাচতন্তুর সাহায্যে নানা রহস্য উদ্ঘাটন

অতি সূক্ষ্ম কাচতন্তুর সাহায্যে এখন শল্য-চিকিৎসকেরা জীবন্ত রক্তকোষ ও চর্মতন্তু পরীক্ষা করে দেখছেন। এই কাচতন্তু এত সূক্ষ্ম যে, এর এক গোছা একটি ইঞ্জেকশনের সূচের মধ্য দিয়ে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়।

এই তন্তু দিয়ে তৈরী নলের মধ্য দিয়ে অতি তেজসম্পন্ন ল্যাসার বিকিরণ চালনা করে গবেষণা ও রোগ-চিকিৎসার কাজ সম্ভব হতে পারে।

ফাইবার অপ্‌টিক্স নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে বর্তমানে গবেষণা চলছে। এই অতি সূক্ষ্ম কাচতন্তুগুলি সেই গবেষণারই ফল। ফাইবার অপটিক্স হলো অপ্‌টিক্যাল নল বা অতি মসৃণ ও স্বচ্ছ নলের মধ্য দিয়ে এমন ভাবে আলো চালনা করা হয়, যাতে সেই আলো নলের ভিতরকার গায়ে বারবার প্রতিফলিত হয়ে সামনে এগিয়ে চলে।

টেলিভিশনের অন্যতম আবিষ্কর্তা জন বেয়ার্ড সর্বপ্রথম এই রকম নলের মধ্য দিয়ে আলো চালিয়ে সেই আলোর মোড় ঘুরিয়ে দেবার এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি এই পদ্ধতির এক পেটেন্ট নেন। নেদারল্যাণ্ডস্‌ ও যুক্তরাষ্ট্রেও এই সম্পর্কে কাজ হয়। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার জন্যে ১৯৫০ সালের আগে এই পদ্ধতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫৫ সালের পর থেকে ফাইবার অপটিক্সের গবেষণায় দ্রুত উন্নতি ঘটে।

সাধারণ কাচ বা পার্সপেক্সের মত পদার্থের মাধ্যমে আলো পাঠানো মোটেই শক্ত নয়, কিন্তু কয়েক ফুট দূরেও একটি ছবিকে নিখুঁতভাবে পাঠানো বেশ কঠিন কাজ। এর কারণ হলো এই যে, ছবি থেকে যে আলোকরশ্মিগুলি বের হয়ে আসে, যাবার পথে সেগুলি হাজার হাজার বার প্রতিফলিত হয়।

কাচতন্তুর গোছার সাহায্যে ছবি পাঠাবার পদ্ধতি টেলিভিশন পদ্ধতিরই অনুরূপ। এই পদ্ধতি হলো ছবিটিকে পাঠাবার প্রান্তে, অসংখ্য টুক্‌রায় ভাগ করে সেই টুক্‌রাগুলিকে পাঠানো এবং অন্য প্রান্তে সেই টুক্‌রাগুলিকে জোড়া দিয়ে ছবিটিকে তৈরী করে নেওয়া।

ফাইবার অপটিক্স সম্পর্কে গবেষণার ফলে ফাইবারস্কোপ বা ফ্লেক্‌সিস্কোপ নামে যে একটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, তার সাহায্যে কোন জিনিষের গভীর অগম্য অভ্যন্তরে কি আছে, তা দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

কাচতন্তুর গোছার অন্য প্রান্তে একটি আলো জ্বলবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রান্তটিকে ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে ঢুকিয়ে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তেলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে তেলের স্তর পরীক্ষা করা যায় এবং কলকজার ভিতরকার ত্রুটি ইত্যাদি সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা যায়।

পাকস্থলী বা ফুস্‌ফুসের মধ্যকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে শল্য-চিকিৎসকেরাও এর ব্যবহার করতে পারেন।

সমুদ্রের পরমাণুশক্তি-চালিত আবহাওয়া প্রচার কেন্দ্র

মেক্সিকো উপসাগরে স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি পরমাণুশক্তি থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত হচ্ছে। এর আগে এই ধরণের কোন তথ্যজ্ঞাপক কেন্দ্র গভীর সমুদ্রে স্থাপিত হয় নি।

মার্কিন নৌবাহিনীর গভীর সমুদ্রে কয়েকটি আবহাওয়া সংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা আছে, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই এটি স্থাপিত হয়েছে এবং সমুদ্র থেকে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য প্রচারের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বা নেভী ওশ্যানোগ্র্যাফিক মিটিওরোলোজিক্যাল অটোমেটিক ডিভাইস উদ্ভাবিত হবার ফলে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

এর মূলে যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে, তার নামকরণ করা হয়েছে সিস্টেম্‌স্ ফর নিউক্লিয়ার অগ্‌জিলীয়ারী পাওয়ার, সংক্ষেপে 'স্ন্যাপ'। এতে ৬০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে এবং এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দশ বছর পর্যন্ত চালু থাকবে। এটিকে সমুদ্রে চালু রাখবার জন্যে কোন লোকজনের প্রয়োজন হবে না। ফলে এতে রক্ষণাবেক্ষণের কোন খরচ লাগবে না।

এই স্ন্যাপ জেনারেটরটির ব্যাস ২২ ইঞ্চি, উচ্চতা ৩৪ ইঞ্চি এবং ওজন ৪০০০ পাউণ্ড। এই আধারটিকে একটি বোটের মাঝখানে একটি গর্তের ভিতরে সিল করে রাখা হয়েছে। ঐ আধারের মাঝখানে আছে ষ্ট্রনসিয়াম টাইটেনেট নামে পারমাণবিক উপাদান। এর পরিমাণ হবে প্রায় বিশ পাউণ্ড। ষ্ট্রনসিয়াম টাইটেনেট আছে পনেরোটি ক্যাপস্থলের মধ্যে এবং ক্যাপস্থলগুলিকে ঘিরে রয়েছে ১২০ জোড়া থার্মোকাপল্। এরাই তাপশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে। বায়ুর চাপ, দিক, গতি ও তাপমাত্রা নিরূপক যন্ত্র এবং জলের তাপমাত্রা নিরূপক যন্ত্রপাতি এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালিত হয় এবং সমুদ্রে জাহাজের দিক সন্ধানী বাতি জ্বলে ও রেডিও ট্র্যান্সমিটার চালু থাকে। তবে বেতার-বার্তার জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি ব্যাটারীতে সঞ্চিত থাকে।

স্ন্যাপের তেজস্ক্রিয় পদার্থটি অতি শক্ত ধাতুতে নির্মিত একটি আধারে সম্পূর্ণভাবে এঁটে রাখা হয়। পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই আধার ভেদ করে তেজস্ক্রিয় শক্তি বেরুতে পারবে না। তাছাড়া পারমাণবিক উপাদানটি অতি উচ্চতাপেও গলবে না অথবা লবণাক্ত জলেও দ্রবীভূত হবে না। তাই তেজস্ক্রিয়তার বিপদ এতে তেমন নেই। ২০ নট গতিতে ধাবমান ২০ হাজার টনের কোন জাহাজের আঘাতে সমুদ্রে ভাসমান এই কেন্দ্রটি ভেঙ্গে গেলেও তাতে কারো কোন যাতে ক্ষতি না হয়, সে ভাবেই এটি তৈরী হয়েছে।

রকেটের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের উদ্যোগ

পৃথিবী থেকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং আকাশে বেলুনের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। আকাশে বেলুন যতদূর যায়, তার উপরের স্তরের উর্ধ্বাকাশের তথ্যাদি ও গঠন-প্রণালী জানবার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে।

আলাস্কার পয়েন্ট ব্যারো থেকে রকেট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রকেটের সাহায্যে সংগৃহীত এসব তথ্য আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস জ্ঞাপনে সহায়ক হবে।

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছেন যে, এই উদ্দেশ্যে পয়েন্ট ব্যারো থেকে প্রায় বারোটি রকেট ছাড়া হবে।

পয়েন্ট ব্যারো সুমেরু বৃত্তের ৩০০ মাইলের মধ্যে এবং উত্তর মেরু থেকে ১১০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পরমাণুশক্তি-চালিত রকেট ইঞ্জিন

গ্রহান্তর যাত্রার উপযোগী মহাকাশযানে পরমাণু-শক্তির সাহায্যে চালিত ইঞ্জিন ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা যে কার্যকরী এবং বিপজ্জনক নয় তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে গত ১২ই জানুয়ারী নাভাডা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে একটি পারমাণবিক রকেট সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ীই এই পরীক্ষাটি করা হয়েছে। তবে এই পরীক্ষার প্রকৃত মূল্যায়নে আরও কিছু সময় লাগবে। এখনও সকল তথ্য সংগৃহীত হয় নি।

এই পরমাণুশক্তি-চালিত রকেট ইঞ্জিনে কিউই রিয়্যাক্টর ব্যবহৃত হয়। রিয়্যাক্টরটি চালু হওয়া মাত্র তীব্র আলোকচ্ছটা দেখা দেয়। পারমাণবিক শক্তি সংস্থার জনৈক মুখপাত্র এই প্রসঙ্গে বলেন যে, পুরাপুরি চালু করবার জন্যে এতে যে তাপ সঞ্চারিত হয়, তাতে রিয়্যাক্টরটি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঐ তাপশক্তিই আলোকচ্ছটারূপ দেখা যায়, কিন্তু ইঞ্জিনের মধ্যে পৌনঃপুনিক পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকে।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন—যা-ই ঘটুক না কেন, পারমাণবিক রকেট ইঞ্জিন ব্যবহারে যে কোন বিপদ নেই, আমরা আশা করি তা দেখাতে পারবো।

নারিকেলের চাষে ম্যাগ্নেসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা

নারিকেলের চাষে পটাসের প্রয়োজনের কথা সব চাষীই জানেন। জমিতে পটাস প্রয়োগের ফলে সাময়িকভাবে নারিকেলের ফলন বৃদ্ধি পেলেও শেষ পর্যন্ত ফলনের হার কমে আসে।

জমিতে ক্রমাগত পটাস প্রয়োগ করবার ফলে নারিকেল গাছ বেশী মাত্রায় ম্যাগ্নেসিয়াম গ্রহণ করে, ফলে জমিতে ম্যাগ্নেসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। জমিতে বেশী সেচের দরুণ বা জমি অম্লাত্মক হওয়ার ফলে ম্যাগ্নেসিয়াম ঘাটতি হতে পারে।

কৃষি-বিজ্ঞানীদের মতে, নারিকেলের ভাল ফলন পেতে হলে, জমিতে পটাসের অর্ধেক পরিমাণ ম্যাগ্নেসিয়াম থাকা বাঞ্ছনীয়।

কেরালার কেন্দ্রীয় নারিকেল গবেষণা কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি জানানো হয়েছে যে, নারিকেল বাগানে নির্দিষ্ট সারের তালিকায় সামান্য অদল-বদল করে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ম্যাগ্নেসিয়াম দিলে বহুদিন ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বানরের ভাষার অভিধান রচনা

বানরের ভাষার এক অভিধান রচনা করা হইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বানরদের বহু ইঙ্গিত ও শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থ বহন করে। কেম্ব্রিজশায়ারে ২৫টি বানরকে দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করিয়া বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই তাহাদের প্রায় ৬০টি শব্দ, দেহভঙ্গীমা ও হস্ত সঞ্চালনের অনুবাদ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ ও ভঙ্গীমার সাহায্যে তাহারা ক্রোধ, ভয় ও হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

রয়েল সোসাইটির বাৎসরিক রিপোর্টে উপরিউক্ত তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। এই রিপোর্টে অধ্যাপক রবার্ট হাইণ্ডের গবেষণার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক হাইণ্ড গত চার বৎসর ধরিয়া বানরদের হাবভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। মেডিক্যাল রিসার্চ

ফাউণ্ডেশন্ তাঁহার এই কাজে সহযোগিতা করিতেছেন।

অধ্যাপক হাইণ্ড বলেন যে, বানরদের সংলাপের ভাষা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই তালিকা আরও বিস্তৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যে ৩০টি শব্দ ও আরও ৩০টি ভঙ্গীমার একটি অভিধান প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বানরদের ভাষা নয়, বানরদের আচরণই হইল অধ্যাপক হাইণ্ডের প্রধান গবেষণার বিষয়। বানরদের মধ্যে মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা চালাইতেছেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তাহার ফলাফল মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণার কাজেও ব্যবহার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। ডাঃ হাইণ্ড দেখেন যে, বানরী মাতারা তাহাদের সন্তানদের সর্বদা নিজের কাছে আগ্‌লাইয়া রাখিতে চাহিলে সন্তানেরা স্নায়ু রোগগ্রস্ত মানুষের মত হইয়া পড়ে। তিনি বলেন—অন্যান্য বানরেরা শিশুকে আদর করিলে তাহার মাতার নিকট প্রাপ্য ভালবাসা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহার ফলে মাতার মনোভাব বদ্‌লাইয়া যায় এবং সে সর্বদা শিশুকে আগ্‌লাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। ফলে শিশুর মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফল ভাল হয়, না খারাপ হয়, তাহা শিশু বড় না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নহে।

পরিপাক-ক্রিয়া সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার

খাদ্য পরিপাকের সহজতম ক্রিয়াটি দেখতে পাওয়া যায় অ্যামিবার ক্ষেত্রে। এরা খাদ্য (সাধারণতঃ ব্যাক্টিরিয়া) হজম করে শোষণের দ্বারা—সে খাদ্য সরাসরি তাদের দেহসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এছাড়াও আরেক ধরণের পরিপাক-ক্রিয়া আছে, যাকে বলা হয় রন্ধ্র পরিপাক বা ক্যাভিটি ডাইজেস্‌শন। এক্ষেত্রে খাদ্যবস্তুটাকে গিলে (চিবিয়ে বা না চিবিয়ে) খাওয়া হয় এবং পাচনযন্ত্রের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তার একাংশের আত্তীকরণ ঘটে ও বাকী অংশ মলের আকারে বেরিয়ে যায়।

এ-পর্যন্ত মনে করা হচ্ছিল যে, সমস্ত উচ্চতর অঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী ও মানুষ এই ক্যাভিটি ডাইজেস্‌শনের নিয়মেই খাদ্য হজম করে, কিন্তু বিশিষ্ট সোভিয়েট জীববিজ্ঞানী ডাঃ আলেক্সি উগোলেফের একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে এই ধারণার অবসান ঘটেছে। বিজ্ঞানের আরও অনেক বড় আবিষ্কারের মত ডাঃ উগোলেফের এই আবিষ্কারটিও ঘটে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে।

খাদ্য গ্রহণ করবার পর মানুষের বা অন্য কোন প্রাণীর পাচনযন্ত্র ও পাকস্থলীতে যে সব বিক্রিয়া ঘটে এবং যেভাবে খাদ্যবস্তু হজম হয়, তার সমস্ত প্রক্রিয়াই কৃত্রিম উপায়ে লেবরেটরিতে ঘটানো যায়। পরিপাক-সহায়ক (ডাইজেষ্টিভ) যে সব রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহে তৈরী হয়, সেগুলি সবই জৈব রসায়নের উন্নতির ফলে কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে তৈরি করা গেছে। তাই টেষ্ট-টিউবের ভিতরে সম্পূর্ণ পরিপাক-ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটানোও সম্ভব। কিন্তু তবু প্রাণী-দেহের ভিতরে আর তার বাইরে টেষ্ট-টিউবে পরিপাক-ক্রিয়ার মধ্যে কিছুটা তফাৎ ঘটে—স্বাভাবিক পরিপাকের কাজটা কৃত্রিম পরিপাকের চেয়ে সব ক্ষেত্রেই দ্রুততর হারে ঘটে—সব রকমের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও।

কেন তা হয়—তাপ, চাপ, রস-নিঃসরণ ইত্যাদি সব কিছু অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও টেস্ট-টিউবের পরিপাক-ক্রিয়া কেন প্রাণী-দেহের পাচনযন্ত্রের চেয়ে মন্থর গতিতে ঘটে—এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যেই ডাঃ উগোলেফ

গবেষণায় রত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল চাপলো, বিশেষ কিছু না ভেবেই তিনি ওই টেস্ট-টিউবের ভিতরে সাদা ইঁদুরের ক্ষুদ্রঅন্ত্রের একটা টুক্‌রা ফেলে দিলেন এবং বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, পরিপাকের হার রীতিমত বেড়ে গেল। অনেকবার এবং অনেক ভাবে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে উগোলেফ সিদ্ধান্তে এলেন যে, জৈবক্রিয়ার দিক থেকে সজীব ওই ক্ষুদ্রঅন্ত্রের টিস্যুই পরিপাক-ক্রিয়ার হারকে দ্রুততর করে তুলছে।

কিন্তু ক্ষুদ্রঅন্ত্র তার নানা অংশ নিয়ে এক জটিল জৈব-অঙ্গ। সব মিলিয়ে গোটা ক্ষুদ্র-অন্ত্রটাই এই পরিপাকের কাজটাকে ত্বরান্বিত করে তুলছে অথবা তার কোন অংশবিশেষ এই দ্রুততর পরিপাক-ক্রিয়ার জন্যে দায়ী—সে সম্পর্কে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে ডাঃ উগোলেফের গবেষণার পরবর্তী পর্যায়।

ক্ষুদ্রঅন্ত্রের একটা টুক্‌রা অণুবীক্ষণের নীচে ফেলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—তার উপর লম্বালম্বি অসংখ্য ভাঁজ আর ওই ভাঁজের উপরে অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য লোম—যার দরুণ ক্ষুদ্রঅন্ত্রটা দেখায় ভেলভেটের মত। ওই লোমকে বলে ভিলি। উগোলেফ এক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে শুধু ওই ভিলি-কে মেরে ফেললেন, কিন্তু ওই অন্ত্রের বাকী অংশ যেমন জৈবধর্মের দিক থেকে সক্রিয় ছিল তাই থাকলো। এই ভিলি-বিহীন অন্ত্রের টুক্‌রা টেষ্ট-টিউবে প্রয়োগ করে কোন ফলই পাওয়া গেল না; অর্থাৎ পরিপাক-ক্রিয়ার কাজ মোটেই দ্রুততর হলো না। প্রমাণিত হলো যে, ওই ভিলি-ই হজমের কাজটিকে প্রাণী-দেহের ভিতরে স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত করে থাকে।

ডাঃ আলেক্সি উগোলেফের এই আবিষ্কারটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর ১৫ নম্বর পেটেন্ট হিসাবে সরকারী নথিপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর এই আবিষ্কার বিশ্বের সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগিয়েছে। পরিপাকের এই ক্রিয়াটির নামকরণ করা হয়েছে মেম্ব্রেনাস ডাইজেস্‌শন বা ঝৈল্লিক পরিপাক।

আলেক্সি উগোলেফের এই আবিষ্কারের বাস্তব প্রযোগগত তাৎপর্য কতখানি? চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পাকস্থলীর সমগ্র পাচনযন্ত্র ও পরিপাক-ক্রিয়ার যাবতীয় ব্যাধি ও অস্বাভাবিকতা নিরাময়ে উগোলেফের এই আবিষ্কার অত্যন্ত কার্যকরী হবে। বলা বাহুল্য ডাঃ উগোলেফ এবং তাঁর সোভিয়েট ও বিদেশী সহযোগী বিজ্ঞানীরা এই লক্ষ্য সামনে রেখেই এক্ষেত্রে আরও গবেষণা করে চলেছেন।

আমের আঁশপোকা

আঁশপোকা আমের শত্রু। সময়ে প্রতিকার করলে এই পোকার উপদ্রব দমন করা সম্ভব।

প্রথমতঃ আম গাছের গুঁড়ির কাছে মাটি চষে সাফ করে ফেলা উচিত। বর্ষাকালে বা বর্ষার ঠিক পরেই গাছের গুঁড়ির কাছে মাটি কুপিয়ে চষে ফেলতে হয় এবং গুঁড়ির চারপাশে ঝুরঝুরে শুক্‌নো বালি ছড়িয়ে ফেলা উচিত। এরপর শীতকালে ডিসেম্বর মাসে মাটি থেকে দুই ফুট উঁচুতে গুঁড়ির উপর চারদিকে ৬ ইঞ্চি চওড়া ফিতার মত করে 'নামহর' লাগিয়ে দিতে হবে।

এছাড়া ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ডায়াজিনন (০.০৬%) মিশ্রণ গাছ প্রতি ৪৫ লিটার দেওয়া উচিত। ১৫ দিন বাদে আরও এক দফা 'স্প্রে' করা ভাল।

'মামহর' তৈরী করবার পদ্ধতি নিম্নরূপ :—

১ পাউণ্ড (আধ সের) ক্যাস্টর অয়েল, ½ পাউণ্ড কমার্সিয়াল কন্‌সেন্‌ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড (আপেক্ষিক গুরুত্ব-১.৮২) ওজন হিসাবে নিয়ে একত্রে এই মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। ১৪ দিন পরে এই মিশ্রণের সঙ্গে ৩ পাউণ্ড রোজিন, ১ পাউণ্ড গ্রীজ ও দুই আউন্স গ্লিসারিন মিশিয়ে নেওয়া দরকার।

আখের খড় থেকে আবর্জনা সার

আখের খড় পুড়িয়ে নষ্ট না করে তাথেকে ভাল আবর্জনা সার তৈরি করা চলে। খুব তাড়াতাড়ি পচিয়ে আবর্জনা সারে পরিণত করতে হলে শূকরের বিষ্ঠা এর সঙ্গে মিশাতে হয়। চিনির কলের ফেলে দেওয়া জিনিস, ছিব্‌ড়ে, ক্বাথ ইত্যাদিও পচাবার জন্যে ব্যবহার করা চলে। এগুলি আলাদা আলাদাভাবে বা একসঙ্গে মিশিয়েও পচাবার জন্যে ব্যবহার করা যায়।

এই আবর্জনা সার তৈরি করবার সহজ পদ্ধতি হলো—একটি অগভীর গর্তে স্তরে স্তরে পর পর আখের খড়, শূকরের বিষ্ঠা, আবর্জনা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখতে হয়। প্রতিমাসে একবার করে ঐ আবর্জনা সারের স্তূপকে উল্‌টেপাল্‌টে দিতে হয়। বৃষ্টি বেশী না হলে ঐ স্তূপকে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত।

উন্নত জাতের মটর শুঁটি

ইদানীং এক কৃষি-গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, দিল্লী আর পাঞ্জাবের কৃষকেরা খরিফ আর রবি-খন্দের মাঝখানে মটরশুঁটির একটা ফসল বেশ ভাল ভাবে ক্ষেত থেকে তুলতে পারেন। প্রধান খরিফ ফসল তুলে নেবার পর দু-একবার সেচ দিয়েই এই উন্নত জাতের 'টি ১৬৩' মটরশুঁটির চাষ করা যেতে পারে।

সির্সা'র (পাঞ্জাব) অন্তর্গত পীরকম কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তুলার চাষের পর মটরশুঁটির চাষ করলে ফলন ভাল হয় এবং লাভও বেশী হয়। গম, মুশুর, বরসীমের পর চাষ করলে তত ভাল হয় না। তুলার পর চাষের ক্ষেতে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঐ শুঁটি বোনা হলে একর প্রতি ৫৪০ কিলো বা সাড়ে ১৪ মণ শুঁটি পাওয়া যায়, আর তার দাম হয় প্রায় ১৮৯ টাকা। পরের এপ্রিলে এর ফসল ক্ষেত থেকে তুলে নেওয়া চলে।

এই মটরশুঁটি যে কেবল প্রচুর ফলে তাই নয়, এর শুঁটিও বেশ বড় বড় এবং বাজারে দামও ভাল পাওয়া যায়।

এই উন্নত জাতের মটরশুঁটির বীজ নীচের ঠিকানায় পাওয়া যায়। ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ, ।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

পিপড়েদের বাসার নিকটে একটা অপ্রশস্ত পরিষ্কার জায়গায় কয়েকটি হাল্কা রঙের পিপড়েকে ঘিরে অসংখ্য সৈনিক পিঁপড়ে ব্যূহ রচনা করেছে।

করে দেখ

স্বয়ংক্রিয় মোমবাতির খেলা

এপর্যন্ত তেমাদের অনেক রকম খেলনা যন্ত্র তৈরির কথা বলেছি। তাদের মধ্যে কোন কোনটা তৈরি করতে হয়তো কিছুটা দক্ষতার প্রয়োজন; কিন্তু এখন তোমাদিগকে এমন একটা স্বয়ংক্রিয় খেলনা তৈরির কথা বলছি, যেটা তৈরি করা সবচেয়ে সহজ। ইচ্ছা করলে অল্প সময়ের মধ্যেই খেলনাটা তৈরি করে পরীক্ষা রেক দেখতে পারবে।

লম্বা একটা মোমবাতি সংগ্রহ কর। মোমবাতির মাথার দিকের সরু মুখটায় খানিকটা পল্‌তে বের করা থাকে। অপর দিকটা থাকে সমতল। সমতল দিকটার কিছুটা মোম ছুরি দিয়ে কেটে পল্‌তে বের করে দাও। এবার মোম-বাতিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সূচ বা ছোট্ট একটা লোহার তার পাশাপাশিভাবে
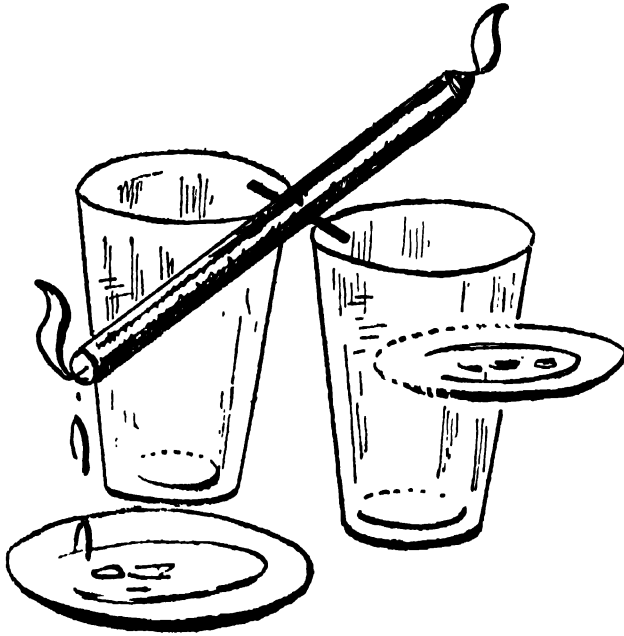
এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও। সমান মাপের ছুটা কাচের গ্লাস পাশাপাশি রেখে মোমবাতিতে বেঁধা সূচটাকে তাদের কানার উপর বসিয়ে দাও। মোমবাতিটা এখন ঢেঁকিকলের মত শয়ানভাবে অবস্থান করবে। যে কোন দিকের মোম একটু কেটে নিলেই বাতির অপর দিকটা একটু নীচে ঝুলে পড়বে। এবার বাতিটার উভয় দিকের পল্‌তে ছুটাই জ্বেলে দাও। যে দিকটা নীচে ঝুলে

আছে, সেদিকটার মোম অপর দিকের মোমের চেয়ে কিছুটা বেশী পরিমাণে গলে নীচে পড়বে। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেদিকটা হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যাবে। তখন আবার অপর দিকের মোম বেশী পরিমাণে গলতে থাকবে। এভাবে বাতিটা যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

—গ—

বাঘ-সিংহ

বাঘ-সিংহের নাম শোনে নি, তোমাদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেউ-ই নেই। তাদের ছবি দেখেছ, তাদের সম্বন্ধে নানা গল্প পড়েছ, স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকে তাদের বিষয়ে নানা কথা পড়েছ, কখনো হয়তো সার্কাসেও তাদের দেখেছ। যারা কলকাতায় থাক বা কলকাতা গিয়েছ, তারা হয়তো চিড়িয়াখানায় তাদের দেখেছ, আর যদি তোমাদের এমন কেউ লোক থাকে, যারা বৃহৎ বন-জঙ্গলের ধারের কাছে থাকে, তারা হয়তো কখনো জঙ্গলে তাদের খোলা অবস্থায়ও দেখেছে কিম্বা কখনো দু'একটাকে মেরে আনা তো দেখে থাকবেই!

প্রাণী-বিজ্ঞানীরা বাঘ-সিংহদের ফেলেছেন বেড়ালের দলে, অর্থাৎ এরা বেড়াল গোষ্ঠীভুক্ত। সমস্ত প্রাণী-জগৎকেই প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এক একটি গোষ্ঠীতে ফেলেছেন—সে বিচার হয় তাদের আকৃতি, স্বভাব, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি নানা রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে। বেড়ালের সঙ্গে এদের সেদিক থেকে সম্পূর্ণ মিল।

সিংহ—বেড়াল গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবার মধ্যে সুন্দর হচ্ছে সিংহ। তাই তাকে বলা হয় পশুরাজ। এক সময় পৃথিবীতে সিংহ অনেক জায়গায়ই দেখা যেত, কিন্তু মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ফলে আর জায়গার প্রয়োজনে বন-বাঁদাড় কেটে বসতি স্থান তৈরী করায় তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বর্তমানে সিংহ আছে কেবল দুটি জায়গায়—আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষে। অবশ্য এদের সংখ্যাও নিতান্তই অল্প, বিশেষ ভারতবর্ষে তো বটেই—তাই তাদের বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে সিংহ আছে মাত্র একটি জায়গায়—গুজরাটের কাথিওয়ার জেলায় গির নামক জায়গার বনে। মানুষের অত্যাচারে তারা নিতান্তই কমে এসেছিল—সংখ্যায় হয়ে গিয়েছিল দু-শ'য়েরও নীচে, কিন্তু বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে এখন তারা আবার তিন-শ'য়ের কাছাকাছি হয়েছে।

আফ্রিকার সিংহ যদিও অতটা কমে আসে নি, তবু তারাও আগেকার মত সংখ্যায় অত বেশী নেই, তাই তাদেরও সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিংহ পারিবারিক জীবনযাপন করে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। সাধারণতঃ এক একটি পরিবারে থাকে একটি সিংহ, দুটি সিংহী, আর গোটা চারেক বাচ্চা। এরা এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সিংহের বাচ্চারা দু'বছর পর্যন্ত বাপ-মার সঙ্গে থাকে, তারপর সরে পড়তে থাকে একটি একটি করে। তখন নিজেরাই আবার এক-একটি পরিবারের মালিক হয়।

সিংহ গভীর জঙ্গলের চেয়ে ছোট জঙ্গল, বিশেষতঃ লম্বা ঘাস-ওয়ালা জঙ্গলই পছন্দ করে বেশী। এদের খাদ্য হলো বুনো শুয়োর, বুনো মোষ, সম্বর, হরিণ ইত্যাদি। অবশ্য সব সময়ে এসব না মিললে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারও এরা শিকার করে থাকে। আফ্রিকার সিংহ জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি শিকার করে জীবিকানির্বাহ করে।

সিংহের গায়ের রং হয় ধোঁয়াটে সাদা, তবে একেবারে পরিষ্কার সাদা রঙের সিংহও আছে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অঞ্চলের সিংহের রং ধোঁয়াটে সাদা। ঐ জায়গার বালুকাময় অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক রঙের সঙ্গে মিশে আত্মগোপন করে থাকতে সুবিধা হয় বলেই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা।

সিংহের মাথা ও মুখমণ্ডল নিবিড় কেশজালে আচ্ছন্ন। এই কেশ-সম্ভারকে বলা হয় কেশর। এটা হয় শুধু পুরুষ সিংহেরই। স্ত্রী সিংহের কিন্তু কেশর নেই। লক্ষ্য করে দেখা গেছে—চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় সিংহের কেশর হয় অনেক দীর্ঘ। এটা হয় এই কারণে যে, বন্য সিংহকে বন-বাঁদাড়ে শিকারের পিছনে ছুটতে হয় বলে কাঁটা গাছ ও অন্যান্য ঝোপ-ঝাড়ের আঘাতে ওদের কেশর ছিড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক সিংহ আকারে হয় আট-নয় ফুট, আর ওজনে হয় প্রায় পাঁচ-ছয় মণ। স্ত্রী-সিংহ ওজনে হয় একটু কম।

বাঘ—বাঘের রাজা অর্থাৎ ডোরাকাটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শুধু ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার অধিবাসী। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বাঘ হয় বাংলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে। সে জন্যে এর নাম দেওয়া হয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবন ছাড়াও দার্জিলিং-এর কাছাকাছি হিমালয়ের অরণ্য অঞ্চলেও এই বাঘ যথেষ্ট রয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, কাশ্মীর থেকে আসামের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ ঘেঁষে বিস্তৃত বন্য এলাকায় এদের দেখা যায়। ভারতবর্ষে আর দেখা যায় মহীশুরের শিমোগা অঞ্চলের বনে। হলদে—প্রায় কমলা রং বলা চলে, যার উপরে থাকে কালো কালো ডোরা। এই গায়ের রং পারিপার্শ্বিক ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে মিশে থাকতে এদের সাহায্য করে। শরীরের উপরের দিককার রং বেশী গভীর, আর

ক্রমে পাতলা হয়ে এসে পেটের কাছে কিছুটা জায়গা একেবারেই শাদা। সেখানে ডোরাও বহুলাংশে কম, প্রায়ই নেই-ই বলা যায়।

বাঘ বাস করে গভীর জঙ্গলে এবং তাদের খাদ্য প্রধানতঃ হরিণ। তবে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারও প্রয়োজনমত এরা উদরস্থ করে। মনুষ্য-বসতির কাছাকাছি হলে এরা প্রায়ই গৃহপালিত ছাগল-গরু মেরে খায়। নিতান্ত দায়ে না পড়লে এরা মানুষকে আক্রমণ করে না। মানুষ-খেকো বলে যে সব বাঘ দুর্নাম কিনেছে, মারা পড়বার পর দেখা গেছে, তারা অনেকেই মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সেটা বোঝা গেছে তাদের গায়ে বন্দুকের গুলির দাগ দেখে, বন্দুকের গুলিও পাওয়া গেছে অনেক ক্ষেত্রেই। তাথেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের উপর আক্রোশই তাদের মানুষ-খেকো হবার কারণ। বার্ধক্যের দরুণ শিকার ধরবার শক্তির অভাবেও বাঘ মানুষ-খেকো হয়, এমন অভিমতও প্রচলিত আছে।

আয়তনে বাঘও হয় প্রায় সিংহেরই মত, অর্থাৎ আকারে প্রায় আট-নয় ফুট এবং ওজনেও প্রায় একই, অর্থাৎ পাঁচ-ছয় মণ।

চিতা—চিতাবাঘ আছে দু'রকমের। কিন্তু বাংলায় তাদের দুটি নাম নেই। দুটিকেই চিতাবাঘ বলা হয়। কিন্তু এরা চরিত্রে ও চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের রং বাঘের মতই হলদে, কিন্তু গায়ে ডোরার পরিবর্তে আছে কালো কালো গুটি বা চক্র। বড় চিতাবাঘ, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Leopard (লেপার্ড), তার গায়ে থাকে কালো কালো চক্র। এদের পাওয়া যায় আফ্রিকা এবং এশিয়া দুই জায়গাতেই। ভারতবর্ষে এরা বিস্তর আছে এবং সংখ্যায় এরা বাঘ বা সিংহের চেয়ে এখনও অনেক বেশী। এরা দৈর্ঘ্যে হয় প্রায় সাত ফুট, কিন্তু ওজনে হয় বাঘ-সিংহের চেয়ে অনেক কম, প্রায় দুই মণের কাছাকাছি। এদের খাদ্য হরিণ, শুয়োর, বানর ও অন্যান্য ছোট ছোট জন্তু। এরা অত্যন্ত ধূর্ত, তাই এদের শিকার করা খুবই কঠিন।

লেপার্ডকে প্যান্থারও বলা হয়, কিন্তু যে আসল প্যান্থার, সে হচ্ছে চিতার কালো জাতভাই। তারা স্বভাবে এবং চেহারায় একেবারে চিতারই মত, কেবল রংটি আগাগোড়া কালো। এদের পাওয়া যায় মালয় দেশে। যেহেতু সে ভারতীয় জন্তু নয়, সেহেতু বাংলায় তার কোন নাম নেই। কালো চিতা কথাটা ঠিক খাপ খায় না। কারণ চিতার সঙ্গে চিত্র-কার্যের সম্পর্ক আছে। কালো বাঘ হয়তো চলতে পারে।

ছোট চিতা লেপার্ডের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। তাদের বসবাস পৃথিবীর কেবল দুটি জায়গায়—আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ। এদেরও শরীরের রং হলদে আর গায়ে টিকার মত কালো কালো দাগ। এদের শিকরে-চিতাও বলা হয়। কারণ এরা সহজেই

মানুষের পোষ মানে এবং এদের দিয়ে শিক্‌রে-বাজ বা কুকুরের মত—অন্য জন্তু শিকার করানো যায়। মোগল বাদশারা প্রচুর সংখ্যায় এই জাতীয় চিতা শিকারের কাজে ব্যবহার করতেন। সেটা অনেকটা শিক্‌রে-বাজের মতই। তাদের চোখ বেঁধে শিকারের জন্তুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে চোখ খুলে ছেড়ে দেওয়া হতো। অমনি তারা শিকারের পিছনে ছুটে গিয়ে সেটিকে মেরে প্রভুর কাছে টেনে নিয়ে আসতো।

এরা সবচেয়ে দ্রুতগামী জন্তু—ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে ছুটতে পারে, কিন্তু সেটা প্রথম কয়েক মিনিট এবং প্রথম কয়েক মাইল মাত্র। পনেরো-বিশ মিনিট বা পঁচিশ-ত্রিশ মাইল ছুটেই এরা হাঁফিয়ে পড়ে। তখন থেকে এদের গতিবেগ কমে আসতে থাকে, তাই মোটরে বা ঘোড়ায় চেপে সহজেই এদের শিকার করা যায়।

ভারতবর্ষে এখন আর এই চিতা নেই বলেই প্রাণী-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, কিন্তু আফ্রিকায় আছে প্রচুর।

পৃথিবীতে সুবৃহৎ জঙ্গল এখনও আছে মাত্র দুটি জায়গায়। এক আফ্রিকায় আর দক্ষিণ আমেরিকায়। দক্ষিণ আমেরিকায় বাঘের দুটি জাতভাই আছে—একটির নাম পুমা ও আর একটি জাগুয়ার।

পুমা—পুমাকে Black Panther-এর মত White Panther-ও বলা যায়। কারণ এদের রং আগাগোড়াই সাদা। একমাত্র রংটি ছাড়া স্বভাব, আকার এবং আয়তনে সম্পূর্ণভাবেই চিতার সমপর্যায়ী। এদের খাদ্য বুনো শুয়োর ও অন্যান্য ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ার। এরা কখনো কখনো লোকালয়ের কাছে এসে গৃহপালিত গরু-ভেড়ার অত্যন্ত ক্ষতি করে। যদিও এদের প্রধান আবাসস্থল দক্ষিণ আমেরিকা, তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও কোথাও এবং মেক্সিকো ও ক্যানাডাতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

জাগুয়ার—জাগুয়ার একান্তভাবেই বড় চিতার জাতভাই, তাদের মতই হলুদ রং ও চক্রওয়ালা। ওজন, আকার, আয়তনে সমান, স্বভাবেও তাই। এদের বিশেষ খাদ্য হলো—শুয়োর, শ্লথ ও ক্যাপিয়ারা নামে শুয়োরের মতই এক ধরণের ছোট ছোট জানোয়ার। অবশ্য প্রয়োজন এবং সুবিধামত এরা অন্যান্য জন্তুও ভক্ষণ করে থাকে। এমন কি, তাদের কখনো কখনো কুমীর খেতেও দেখা গেছে, যা দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে।

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

ইস্পাতের চেয়ে শক্ত

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা কয়েকটা বিশেষ যুগে চিহ্নিত করতে পারি। সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ের লোকেরা জীবনধারণের জন্যে পাথরের উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতো। সেই জন্যে ওই যুগকে প্রস্তর যুগ বলা হয়। এরপর আসে ব্রোঞ্জ যুগ। এইভাবে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ ইস্পাতের ব্যবহার শেখে। তাই বলে বর্তমান যুগকে ইস্পাতের যুগ বললে ভুল বলা হবে। বিজ্ঞানের দানে মানুষ এখন ইস্পাতের চেয়ে অনেক শক্ত ধাতু তৈরী করেছে। এই ধাতুর নাম হলো টাংস্টেন কার্বাইড। তাই বর্তমান যুগকে টাংষ্টেন কার্বাইড যুগ বললে মোটেই ভুল বলা হবে না।

এবার টাংস্টেন কার্বাইডের কথায় আসছি। সবচেয়ে শক্ত এই ধাতু। এর আবিষ্কারের ঘটনাটি অনেকটা গল্পের মত। আমেরিকার অ্যারিজোনায় এক সময় একটা উল্কাপিণ্ড পাওয়া যায়। এই উল্কার লোহার অংশে ছোট ছোট হীরার টুক্‌রা ছিল। তা দেখে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা হয় যে, প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফলে কার্বন হীরায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনরী মইসন কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরী করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ঠিক করলেন যে, প্রচণ্ড তাপ ও চাপ দিয়ে কার্বনকে হীরায় রূপান্তরিত করবেন। কাজে হাত দিয়ে তিনি প্রথমে একটা নতুন ধরণের বৈদ্যুতিক চুল্লী তৈরী করেন। এই চুল্লীর প্রচণ্ড উত্তাপে (৩০০০° সে.) লোহা গলানো হলো। এরপর চিনি পুড়িয়ে কার্বন তৈরী করে তিনি তা এই গলন্ত লোহাতে ফেলে দিলেন। এবার এই উত্তপ্ত লোহাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করা হলো। এতে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হলো। এই তাপ ও চাপের ফলে কার্বন হীরায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিন্তু হীরা তৈরী হলে কি হবে? সেগুলি এতই ছোট যে, খালি চোখে সহজে তাদের দেখা যায় না। এই পরীক্ষার ফল দেখে মইসন ভাবলেন যে, যদি আরও বেশী তাপ দেওয়া সম্ভব হয়, তবে নিশ্চয়ই বড় আকারের হীরা তৈরী করা যাবে। লোহার বদলে তিনি এবার টাংস্টেন নিলেন। টাংস্টেন নেবার কারণ ছিল এই যে, টাংস্টেনের গলনাঙ্ক লোহার গলনাঙ্কের চেয়ে বেশী। এবারের পরীক্ষায় কিন্তু মোটেই হীরা তৈরী হলো না। হীরার বদলে তিনি একরকম ছোট ছোট নিষ্প্রভ নুড়ি পেলেন। এগুলিই হলো টাংস্টেন কার্বাইড। মইসন কিন্তু সেগুলিকে চিনতে পারলেন না। তিনি সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এর বছর দশেক পর তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারটা কিন্তু হীরা তৈরীর জন্যে নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কলকারখানার কাজের জন্যে হীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা আবার কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরী করবার কথা ভাবতে সুরু করেন। জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা সবার আগে কাজ আরম্ভ করেন। কৃত্রিম হীরা তৈরীর জন্যে তাঁরা মইসেনের পদ্ধতিই বেছে নিলেন। কিন্তু মইসন যা পারেন নি, তাঁরা তা পারবেন কি করে? তাই হীরার বদলে সেই পুরনো টাংস্টেন কার্বাইডই তৈরী হলো। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু মইসনের মত এই টাংস্টেন কার্বাইড ফেলে দিলেন না, বরং এর গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তাঁরা দেখলেন যে, এই টাংস্টেন কার্বাইডকে যদি ভাল করে গুঁড়া করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিকেলের সঙ্গে মেশানো যায়, তাহলে অসম্ভব শক্ত একরকম মিশ্র ধাতু তৈরী হয়। কিন্তু এই মিশ্র ধাতু এতই শক্ত হলো যে, তাকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। এই অসুবিধা দূর করবার দায়িত্ব নিলেন জেনারেল ইলেকট্রিকের বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁরা কাজে হাত দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে। বর্তমানে তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে আমরা পছন্দমত যে কোন রকমের টাংস্টেন কার্বাইড পেতে পারি।

কার্বাইড কাকে বলে, তা জানা দরকার। কার্বনের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় এক বা একাধিক ধাতু, যেমন—টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, টাইটানিয়াম মিলিত হলে যে নতুন মিশ্র ধাতুর সৃষ্টি হয়, তাকে আমরা কার্বাইড বলি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কার্বাইড তার অঙ্গীভূত মৌলিক ধাতুদের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্ত।

কার্বাইডের আবিষ্কার শিল্প-ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। এর আবিষ্কারের আগে খনিতে কয়লা খননের জন্যে লোহার তৈরী যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। আমেরিকার কোন একটি কয়লা খনিতে কার্বাইডের তৈরী নতুন একটি খনন যন্ত্র আনা হয়। কিছুদিন কাজের পর দেখা গেল গেল যে, লোহার তৈরী ২৮৪টি খনন যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কার্বাইডে তৈরী নতুন যন্ত্রটি তখনও কার্যক্ষম রয়েছে। এই ঘটনার পর সমস্ত খনির কাজে কার্বাইডের যন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। লাঙ্গলের ফলা থেকে সুরু করে বুলডোজারের ব্লেড প্রভৃতি সব জায়গাতেই বর্তমানে কার্বাইড ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিসংখ্যানবিদেরা হিসেব করে বলেছেন যে, কার্বাইড দিয়ে তৈরী যন্ত্রপাতি মানুষের পরিশ্রম শতকরা ৬৫ ভাগ কমিয়ে দিয়েছে।

জনৈক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ধাতুর উপর কার্বাইডের আস্তরণ দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে ধাতুর উপর এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগ পুরু আস্তরণ দেওয়া চলতে পারে। এরোপ্লেনের জন্যে এমন ধাতুর প্রয়োজন, যা খুব হাল্কা অথচ দৃঢ়। তাই অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেশিয়াম প্রভৃতি হাল্কা ধাতুর উপর কার্বাইডের আস্তরণ জমিয়ে প্লেনের জন্যে

হাল্কা ও শক্ত মিশ্র ধাতু তৈরী করা হয়। আজকালকার দিনে অতি শক্ত মিশ্র ধাতু দিয়ে জেট প্লেনের কাঠামো তৈরী করা হয়ে থাকে। একমাত্র কার্বাইডের তৈরী যন্ত্রই এই নিরেট শক্ত ধাতুর পছন্দমত আকার দিতে পারে।

আমেরিকা ও বৃটেনের বৈজ্ঞানিকেরা কয়েক বছর আগে কার্বন ও টাইটানিয়ামের রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে এক নতুন মিশ্র ধাতু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ধাতুর নাম হলো টাইটানিয়াম কার্বাইড। এটা টাংস্টেন কার্বাইডের চেয়ে হাল্কা, কিন্তু অনেকাংশে বেশী শক্ত। আজকের পৃথিবীতে এই টাইটানিয়াম কার্বাইডই হলো মানুষের তৈরী কঠিনতম ধাতু।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

পিঁপড়ের কথা

পিঁপড়ের কথা তোমরা সকলেই কিছু-না-কিছু জান। বাড়ী, ঘর, বাগান, মাঠ প্রভৃতি স্থানে সর্বদাই এদের দেখা পাওয়া যায়। অমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ে আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদে-পিঁপড়ে, ডেঁয়ো-পিঁপড়ে, সুড়সুড়ে-পিঁপড়ে, বিষ-পিঁপড়ে, কাঠ-পিঁপড়ে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এযাবৎ প্রায় দু-হাজারেরও বেশী বিভিন্ন জাতের পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কোন কোন জাতের পিঁপড়ের আকৃতি-প্রকৃতি রীতিমত বিস্ময়কর।

সব জাতের পিঁপড়ের সাধারণ জীবনযাত্রা-প্রণালী মোটামুটি একই রকম। সাধারণতঃ আমরা যে সব পিঁপড়ে দেখি, তারা কর্মী-পিঁপড়ে। এরা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয় এবং ডানাশূন্য। পিঁপড়ের বাসার মধ্যে কর্মীর সংখ্যাই খুব বেশী। রাণী আর পুরুষ পিঁপড়ের সংখ্যা খুবই কম। এদের উভয়েরই ডানা আছে। স্ত্রী-পিঁপড়ের দেহাকৃতি পুরুষের চেয়ে বড়। রাণী ও পুরুষ পিঁপড়ের একমাত্র কাজ হচ্ছে বংশবৃদ্ধি করা। আর কোন কাজ এরা করে না। এছাড়া আর সব কাজই করে কর্মীরা। এদের কাজকর্মের মধ্যে অদ্ভুত নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। যার যা কাজ, সে শুধু তাই করে—অন্য ব্যাপারে মাথা গলাতে যায় না।

বাসা-নির্মাণ, খাদ্য-সংগ্রহ, সন্তান-পালন, শত্রুর সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি কাজ কর্মীরাই করে। বাসা বদ্‌লাবার সময় কর্মীরা মুখে করে ডিম, বাচ্চা, স্ত্রী-পুরুষকে নতুন বাসায় নিয়ে যায়। এমন কি, কর্মী-পিঁপড়ে রাণী ও পুরুষ পিঁপড়ের খাবার তাদের মুখের কাছে নিয়ে খাওয়ায়। বাচ্চাদের দিকে কর্মীরা সর্বদাই সতর্ক নজর রাখে।

রাণী কিছুদিন পর পরই একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি ডেলা বেঁধে থাকে। দু একদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চা বড় হবার পর তাদের পৃথকভাবে যত্ন করতে হয়। কতকগুলি কর্মী-পিঁপড়ের উপর একাজের দায়িত্ব দেওয়া থাকে। বিভিন্ন পরিমাণে খাদ্য দিয়ে বাচ্চাগুলিকে কর্মী, পুরুষ ও রাণী-পিঁপড়েয় পরিণত করা হয়। পিঁপড়ের সমাজে কর্মী-পিঁপড়ের প্রয়োজন বেশী, সে জন্যে তারা বেশী সংখ্যক কর্মী-পিঁপড়েই উৎপাদন করে। কর্মীদের অল্প খাদ্য হলেই চলে যায়। তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে। বিশ্রাম এরা করে না বললেই চলে। অনেক সময় এরা নিজেরা না খেয়ে প্রথমে বাচ্চা, রাণী ও পুরুষ পিঁপড়েদের খাওয়ায়, তার পর খাদ্য কিছু উদ্বৃত্ত হলে নিজেরা খায়। যত বিপদই আসুক না কেন, কর্মীরা কখনও তাদের কর্তব্যে অহেলা করে না। শত্রুর আক্রমণে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হলেও কর্মীরা তাদের হেপাজতের ডিম, বাচ্চা বা অন্য কোন জিনিষ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে না।

এদের ডিম পাড়বার সময় সাধারণতঃ গ্রীষ্মকাল। তখন রাণী ও পুরুষ বাসা ছেড়ে বাইরে এসে দলে দলে আকাশে উড়তে থাকে। উড়ন্ত অবস্থায় এদের মিলন হয়। মিলনের পর রাণীর ডানা খসে পড়ে যায়। রাণী পুরাতন বাসায় বা নূতন স্থানে বাসা তৈরী করে সেখানে ডিম পাড়তে সুরু করে। এই সময় নানা কারণে পুরুষ-পিঁপড়ের মৃত্যু হয়। অবশ্য কদাচিৎ দু-একটা বাঁচে। সাধারণতঃ রাণী কয়েক বছর বাঁচে। সাধারণতঃ মিলনের পর পুরুষদের মৃত্যু হয়।

পৃথিবীতে নানাজাতের যে সব পিঁপড়ে দেখা যায়, তাদের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ থেকে দু-ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গায়ের রং লাল, কালো, বাদামী প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের। কোন কোন জাতের পিঁপড়ে খুব দুর্ধর্ষ, আবার কোন কোন জাতের পিঁপড়ে খুবই শান্ত। এদের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর এবং ঘ্রাণের সাহায্যে এরা বহুদূরবর্তী স্থানের খাদ্যের গন্ধ পায়।

পিঁপড়েরা মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গের মত গর্ত করে বাসা তৈরী করে। কেউ আবার কাঠের মধ্যে গর্ত করে বাস করে। মাটির মধ্যে গর্ত তৈরীর ফলে মাটি আলগা হয় এবং বৃষ্টির জল শুষে নেয়। ফলে জমির জল সংরক্ষণশক্তি অব্যাহত থাকে। তাছাড়া শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর নানা কীট-পতঙ্গের ডিম বা কীড়া এরা খেয়ে নষ্ট করে দেয়। এভাবেই এরা মানুষের উপকার করে। অবশ্য কোন কোন জাতের পিঁপড়ে ফসলের মারাত্মক শত্রু। তারা গাছপালা, ফসল প্রভৃতি কুরে কুরে খেয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করে।

কারপেণ্টার-অ্যাণ্ট বা ছুতোর-পিঁপড়ে মরা এবং শুক্‌নো গাছ বা কাঠের দরজা-জানালা, কড়ি-বড়গা প্রভৃতিতে গর্ত করে বাসা তৈরী করে। ছুতোর-পিঁপড়ে

আধ ইঞ্চির মত লম্বা হয় এবং এদের গায়ের রং কালো। এরা খাদ্যের সন্ধানে দলবদ্ধভাবে অভিযান চালায়। এরা সর্বভুক্, অর্থাৎ যা পায় তাই খায়—কোন বাছবিচার নেই। এরা ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে খাদ্যের অবস্থিতি জানতে পারে। একজন খাবারের সন্ধান পেলে সবাই সেখানে উপস্থিত হয়।

পিঁপড়ের লড়াই খুব সাংঘাতিক। নানা কারণে এদের মধ্যে লড়াই বাঁধে। সাধারণতঃ ডিম-বা বাচ্চা চুরি, বাসা দখল, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কারণে উভয় দলের মধ্যে লড়াই বাঁধে। ডিম এদের অতি মূল্যবান সম্পত্তি। বিজয়ী দল বিজিত দলের ডিম কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

আফ্রিকার ড্রাইভার-অ্যাণ্ট এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্মি-অ্যাণ্ট এবং আমাদের দেশের নালসো পিঁপড়ে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। এদের লড়াই অতি গুরুতর। অসংখ্য সৈনিক পিঁপড়ে জীবনপণ করে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। এক বাসা থেকে অন্য বাসায় যাবার সময় এরা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় অত্যন্ত সতর্ক থাকে। ডিম ও বাচ্চাবাহী কর্মীদের সৈনিক পিঁপড়েরা পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। রাত্রিতে এদের কাজ সুরু হয় এবং দিনের বেলা বিশ্রাম। বাসায় থাকবার সময় সৈনিক পিঁপড়েরা বাসার চারদিকে পাহারা দেয়। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে তাকে মারাত্মক চোয়ালের সাহায্যে আক্রমণ করে। এদের যাত্রাপথে কেউ পড়লে তার আর রক্ষা নেই—মরিয়া হয়ে তাকে আক্রমণ করে। ট্যারানটুলার মত বিষধর মাকড়সা, বড় অজগর সাপও ড্রাইভার-অ্যাণ্ট ও আর্মি-অ্যাণ্টের আক্রমণে কখনও কখনও মারা যায়। সময় সময় এরা শত্রুকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ফেলে। উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে বিজিত দলের দু-একজন ছাড়া কেউ আর অক্ষত বা জীবিত থাকে না, বিজিত দলের বাসা একেবারে তচনচ করে দেয়। সময় সময় এরা গাছের উপর চড়াও হয়ে পাখীর বাচ্চাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। বোল্‌তা এদের কাছে খুব অসহায়। বোলতার চোখের সামনে এরা তাদের বাচ্চা, ডিম নিয়ে চলে যায়। বোল্‌তা এদের সঙ্গে লড়াই করতে ভরসা পায় না। শত্রুর মৃতদেহ কর্মীরা সংগ্রহ করে নিয়ে বাসায় ভাড়ার ঘরে মজুত করে রাখে, খাদ্য হিসাবে। কোন কোন বিজ্ঞানী ড্রাইভার-অ্যাণ্ট ও আর্মি-অ্যাণ্টকে হুণ ও তাতারদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পত্র-ছেদক বা লিফ-কাটার অ্যাণ্ট গাছপালার সাংঘাতিক শত্রু। এরা প্যারাসোল অ্যাণ্ট (Parasol ant) নামেও পরিচিত। এরা পাতাকে কেটে নিয়ে চোয়াল দিয়ে কামড়ে নিয়ে যায় তাদের বাসায়। পাতাকে এভাবে নিয়ে যাবার সময় তাকে ছোট ছাতার মত দেখায়। দূর থেকে চলমান ছাতাগুলিকে দেখতে অদ্ভুত লাগে এবং বাহক অর্থাৎ পিঁপড়েরা পাতার নীচে অদৃশ্য থাকে। পত্র-ছেদক পিঁপড়ের তুলনায় তাদের ছাতা অর্থাৎ কর্তিত পাতা অনেক বড় হয়। পাতাগুলিকে তারা

বাসায় জমা করে রাখে এবং তাতে এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ছত্রাক জন্মায়—যা এদের খাদ্য। এভাবে খাদ্য উৎপাদনের কৌশল অবলম্বন করায় এই পিঁপড়েদের কৃষক-পিঁপড়েও বলা হয়।

কোন কোন জাতের পিঁপড়ে একরকম কীট পালন করে। এদের দেহ-নিঃসৃত মিষ্টি রস পিঁপড়েদের উপাদেয় খাদ্য। এই কীটের উপর কর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। শত্রু যাতে এদের নিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে রক্ষাব্যূহ তৈরী করে। ডিম ও বাচ্চার মত এই কীটও এদের মূল্যবান সম্পত্তি।

কয়েকটি পিঁপড়ে সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলা হলো। এছাড়া আরও বিভিন্ন জাতের বহু পিঁপড়ে আছে, যাদের কাহিনীও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী

বিবিধ

পৃথিবীর জনসংখ্যা

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৩৩০ কোটি। ১৯৮০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা আরও ১০০ কোটি বৃদ্ধি পাইবে। মার্কিন ব্যুরো অব পপুলেশনের বার্ষিক রিপোর্টে ঐ সংখ্যাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতি বছর পৃথিবীতে সাড়ে ছয় কোটি করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার জনসংখ্যা ২০ কোটি। ১৯৮০ সালে ল্যাটিন আমেরিকায় জনসংখ্যা দাঁড়াইবে ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষে। চীনের বর্তমান লোকসংখ্যা ৭০ কোটি। ১৯৮০ সালে উহা ৮৫ কোটিতে পৌঁছিবে। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৪৭ কোটি। ভারতে প্রতি বছর ১০ কোটি করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

চন্দ্রে মহাকাশযান প্রেরণ

পাসাডেনা, ক্যালিফোর্ণিয়া, ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৫)—চন্দ্রগামী মার্কিন মহাকাশযান রেঞ্জার-৮ চন্দ্রের জলহীন শান্ত সমুদ্রে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইবার পূর্বে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রায় সাত হাজার চিত্র প্রেরণ করিয়াছে।

চন্দ্র-অভিযান প্রকল্পের ম্যানেজার মিঃ হ্যারিস স্কুরেমায়ার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, গত জুলাই মাসে মহাকাশযান রেঞ্জার-৭ যেরূপ চিত্র প্রেরণ করিয়াছিল, এই মহাকাশযানটিও সেইরূপ অনেক সুন্দর চিত্র প্রেরণ করিয়াছে।

রেঞ্জার-৮-এর পাঁচ ফুট দীর্ঘ নাসিকাগ্রভাগে যে ছয়টি টেলিভিশন ক্যামেরা ছিল, সেইগুলি ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূর হইতে মহাকাশের মধ্য দিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে বেতার-চিত্র প্রেরণ করিয়াছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার "সন্ধানী" কেন্দ্রে এই চিত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

স্বর্ণ-রৌপ্যে নির্মিত ৮০৮ পাউণ্ড ওজনের মহাকাশযানটি ঘণ্টায় ৫৯০০ মাইল বেগে গিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে ধাক্কা মারিয়াছে। অনুমিত লক্ষ্যস্থলের মাত্র ১৫ মাইল দূরে উহা চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে। কেপ কেনেডির ঘাঁটি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার ৬৪

ঘণ্টা ৫২ মিনিটে উহা চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছায়। মনুষ্য-প্রেরিত বস্তুগুলির মধ্যে ইহা পঞ্চম, যাহা চন্দ্রে পৌঁছাইয়াছে।

যানটি যখন চন্দ্র হইতে ২৩ মিনিট দূরে ছিল, তখন ক্যামেরাগুলি সক্রিয় করিয়া দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে ইহা করা হয়।

রাশিয়ায় যুগপৎ তিনটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

রাশিয়া (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫) একটি রকেট-যোগে যুগপৎ তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাইয়া দিয়াছে। ঐগুলিতে কোন আরোহী নাই। ছয় মাসের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার রাশিয়া এইরূপ কৃতিত্বের অধিকারী হইল। উপগ্রহগুলিতে (কস্‌মস্‌ ৫৪, ৫৫ ও ৫৬) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আছে। মহাকাশে সমীক্ষা চালানই উহার উদ্দেশ্য।

বিদেশে নারিকেল ছিব্‌ড়ার চাহিদা

নারিকেলের শুষ্ক বহিরাংশকে ছিব্‌ড়া বলা হয়। কেরালার মালয়ালম ভাষায় ইহাকে কয়ার বলে। বোধহয় সেই কারণেই ইংরেজীতেও ইহার নাম কয়ার।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর নারিকেল জন্মায়। সমুদ্র হইতে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষের দৃশ্য সত্যই চমৎকার। ভারতে প্রায় ১৬ লক্ষ একর জমিতে নারিকেল চাষ হয়। পশ্চিম উপকূল ছাড়া পশ্চিম বাংলা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উড়িষ্যা, আসাম এবং আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ ও আমিনিডিভি দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল জন্মায়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত প্রায় ৭০ লক্ষ একর ভূমিতে নারিকেল হয়। ভারতে প্রায় ১৬ লক্ষ একর ভূমিতে এই চাষ হয়। পৃথিবীতে নারিকেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। কেরালার জনজীবনের সহিত নারিকেলের নিবিড় সম্পর্ক।

নারিকেল ছিব্‌ড়া বহু প্রয়োজনে আসে। ইহা হইতে প্রস্তুত সামগ্রী শক্ত মজবুত এবং জল-ঝড়ে খারাপ হয় না। শিল্প ও কৃষিকার্যে নারিকেল ছিব্‌ড়া হইতে প্রস্তুত জিনিষপত্র বহু কাজে লাগে। নারিকেলের দড়ি, মাদুর ইত্যাদি বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৪৭৬ কোটির মত নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কেরালা রাজ্যেই পাওয়া যায় ৩৩৬ কোটির মত। নারিকেল হইতে ইহা হাত দিয়া বাহির করা হয়। দড়ি পাকাইবার কাজ হাতেও করা হয়, আবার চরকার মত মেশিনও ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা এই কাজ করিয়া থাকেন। প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া ছিব্‌ড়া-শিল্পের কাজ হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মত ছিব্‌ড়াজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানীর কথা ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই ইহা অপেক্ষা বেশী টাকার জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। চেকো-শ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড, ইটালী, পশ্চিম জার্মেনী এবং বৃটেনে ইহার প্রধান চাহিদা। একমাত্র বৃটেনেই আমাদের ছিব্‌ড়া রপ্তানীর অর্ধেক যায়। এই জিনিষের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৫ কোটি টাকার এবং ১৯৭০-৭১ সালে ২০ কোটি টাকার মত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে এই শিল্পে আরও বেশী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে রবার মিশ্রিত ছিব্‌ড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুতের চেষ্টাও চলিতেছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬৫ | চতুর্থ সংখ্যা

ডায়াবেটিস মিলিটাস ও বিপাক

বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান যুগে শারীরবিজ্ঞানীরা যে সব রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং যে সব রোগ অতি সাধারণ অথচ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে, ডায়াবেটিস মিলিটাস তাদের মধ্যে অন্যতম। হিসেব করে দেখা গেছে, এক মাত্র গ্রেট বৃটেনে এই রোগের রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫০,০০০। সম্ভবতঃ আরো ঐরূপ সংখ্যক রোগী আছে, যাদের হিসেবের মধ্যে এখনো ধরা হয় নি। আমাদের দেশেও এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

ইনসুলিনের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। এই ইনসুলিন হচ্ছে একরকম উত্তেজক রস বা হর্মোন। এর উৎপত্তি-স্থল অগ্ন্যাশয়ের বিটা নামক একপ্রকার বিশেষ কোষ। কোন কারণে যদি বিটা কোষের ইনসুলিন ক্ষরণের ক্ষমতা কমে যায় অথবা বন্ধ হয়ে যায়, তখনই এই ব্যাধির সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সময় থাকতে এই ব্যাধির ঠিকমত চিকিৎসা না করালে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। ইনসুলিনই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা, যদিও আজকাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের উপর এই রোগ প্রতিকারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ ফল পাওয়ার নজির আছে।

এই রোগের প্রধান উপসর্গ হলো—রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, যাকে হাইপার গ্লাইসেমিয়া বলে, আর প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হওয়া—যাকে গ্লাইকোসুরিয়া বলা হয়।

এই রোগকে অনেক সময় বিপাকের গোলযোগ

অর্থাৎ Metabolic disorder-ও বলা হয়। কারণ, দেখা যায় এই রোগে শরীরের সমস্ত কিছুর বিপাকেই নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হয়; যেমন—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, জল এবং ইলেকট্রোলাইট।

অনেক বয়স্ক রোগীদের মধ্যে এর বংশগত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু অল্পবয়স্ক রোগীদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ তাদের কোন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে এসেছে বলে জানা যায়। এই কারণেই অনেকে ডায়াবেটিস মিলিটাসকে বংশগত ব্যাধি বলেও বর্ণনা করে থাকেন। এই রোগ জু-দের মধ্যে বেশী দেখা যায়, আবার চীনাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বয়সের ব্যক্তিরই এই রোগ হতে পারে। তবে ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সের ব্যক্তিরাই এতে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। বয়সের তুলনায় কম বয়সের পুরুষ এবং মধ্যবয়সের স্ত্রীলোকদের মধ্যেই এই রোগ বেশী দেখা যায়। মধ্যবয়সের স্ত্রীলোকদের শরীরে চর্বির অংশ একটু বেশী থাকাও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ বলে অনেকেই মনে করেন। যে সব পুরুষের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়, রোগ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তাদেব শরীরে খুব বেশী চর্বি ছিল বলে জানা যায়। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকাশ এতই দ্রুত যে, তাদের জন্যে জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রক্তে চিনির পরিমাণের সঙ্গে ইনসুলিন ক্ষরণের একটা আশ্চর্য সম্পর্ক আছে। সাধারণ সুস্থ ব্যক্তিদের যদি কোন কারণে চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক লেভেলের মধ্যে বেড়ে যায়, তাহলে ইনসুলিনের ক্ষরণও সেই অনুপাতে বাড়তে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তে চিনির একটা স্বাভাবিক লেভেল এসে পড়ে। কিন্তু ডায়াবেটিস মিলিটাস রোগীদের ইনসুলিন ক্ষরণ ঠিকমত না হওয়ায় রক্তে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইনসুলিনের ক্ষরণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না; আর সেই কারণে রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই ভাবে রক্তে চিনির পরিমাণ যখন বৃক্কের চিনি ধরে রাখবার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন প্রস্রাবের সঙ্গেও চিনি বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

একটা মজার জিনিষ এই যে, যদি কোন কারণে একবার চিনি বিপাকের কোন গোলযোগ আরম্ভ হয়, তখন অন্যান্য পদার্থ, যেমন—প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থের বিপাকেও গোলযোগ দেখা যায়।

কারণ শরীরের যে কোন একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে অন্য একটা প্রক্রিয়ার অখণ্ডনীয় যোগ আছে। একটার উপর চাপ পড়লে অথবা কোন গোলযোগ দেখা দিলে অপরগুলিও এতে অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করে।

আসলে এই রোগের কারণ হলো, ইনসুলিনের ঠিকমত ক্ষরণ না হওয়া। আর অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলির স্বাভাবিক কার্য-ক্ষমতার উপর এই রোগের উৎপত্তি নির্ভর করছে। কিন্তু কি সে কারণ, যা এই কোষগুলিকে তাদের স্বাভাবিক কাজ করতে বাধা দেয়? বিজ্ঞানীরা এর কারণ নিরূপণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, কিন্তু আজও এর সঠিক কারণ জানা সম্ভব হয় নি।

এবার আমরা দেখবো—এই রোগে রোগীর বিপাকের কি গোলযোগ ঘটে। আমরা যে সকল রান্না-করা বা রান্না না-করা খাদ্য গ্রহণ করি, আমাদের শরীর সেগুলিকে ঐ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই সেগুলিকে শরীরের ভিতর পুনরায় বিপাক-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর এই বিপাক-ক্রিয়ার জন্যে নানাপ্রকার

উৎসেচক, উত্তেজক রস এবং নানাপ্রকার মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন হয়।

ইনসুলিন একটা উত্তেজক রস, যার অনুপস্থিতি অথবা স্বল্পতা প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেটের বিপাক-ক্রিয়াকে ভীষণভাবে ব্যাহত করে; অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটের বিপাকের জন্যে এর একান্ত প্রয়োজন। এর অভাবে রক্তের চিনি বিপাকের জন্যে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সম্ভবতঃ উৎসেচক হেক্সোকাইনেজের (Hexokinase) কার্যক্ষমতা ইনসুলিন বাড়িয়ে দিতে পারে। এই উৎসেচক চিনির ফরমুলার ষষ্ঠ স্থানে একটি ফস্‌ফেট গ্রুপ যোগ করে দিতে সাহায্য করে। বর্তমানে ইনসুলিনের চিনিকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করাবার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ইনসুলিনের অভাবে চিনি কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আর কোষের মধ্যে প্রবেশ না করলে চিনির বিপাকও সম্ভব হয় না। কারণ এর বিপাকের জন্যে যে সকল উৎসেচকের প্রয়োজন, সেগুলি কোষের মধ্যেই থাকে। চিনির এই প্রবেশ-পথ সুগম করে দেয় ইনসুলিন। এই ইনসুলিনের হাতে প্রবেশ-পথের চাবিকাঠি যেন অতন্দ্র প্রহরী। ইনসুলিন থাকলে কাউকে প্রবেশ করতে বাধা দেয় না অথচ না থাকলে প্রবেশ-পথ যেন চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায়। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শরীরের প্রতিটি কোষের ক্ষেত্রেই যে ইনসুলিনের হাতে চাবিকাঠি, সে কথা ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ শরীরে এমন অনেক জায়গা আছে, যারা ইনসুলিনের উপর নির্ভর করে না। যেমন—(ক) মস্তিষ্ক, (খ) বৃক্ক, (গ) পাকস্থলি-অন্ননালী এবং (ঘ) রক্তের লোহিত কণিকা। অপর পক্ষে আবার এমন কতকগুলি স্থান আছে, যাদের কাছে ইনসুলিন একান্ত প্রয়োজনীয়; যেমন—(ক) স্কেলিট্যাল মাংসপেশী, (খ) হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশী, (গ) এডিপোস টিস্যু, (ঘ) ফাইব্রোব্লাস্ট, (ঙ) রক্তের শ্বেত কণিকা, (চ) সিলিয়ারী বডি, (ছ) এণ্ডোথেলিয়াল কোষ (Endothelial cell), অপ্‌টিক লেন্স এবং (জ) সম্ভবতঃ যকৃৎ।

ইনসুলিন ছাড়া আরো অনেক উত্তেজক রস আছে, সেগুলি ইনসুলিনের মত কোষের মধ্যে চিনি প্রবেশের পথকে সহজ করে দেয়। গ্রোথ হর্মোন বা বৃদ্ধি-উত্তেজক রস এদের মধ্যে অন্যতম। যদিও চিনি প্রবেশের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য এখনো বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের অগোচরেই রয়ে গেছে, তথাপি ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে অনেকেই দেখাতে চেয়েছেন যে, কোষে চিনি প্রবেশের জন্যে পিনোসাইটোসিস (Pinocytocys) নামে একটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে বলা হয় যে, কোষ মেম্ব্রেনের ইনভেজিনেশনের জন্যে এটা দেখতে ঠিক কতকটা আঙ্গুলের মত হয়। আর এই আঙ্গুলের ফাঁকগুলিতে যে বস্তুটাকে এই কোষ গ্রহণ করতে চায়, তা প্রথমে এসে লাগে। তারপর ঐ বস্তুটাকে কোষ মেম্ব্রেন ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলে। পরে বস্তুটা কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সম্ভবতঃ ইনসুলিন এই পদ্ধতিটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

ইনসুলিন যে চিনিকেই একমাত্র এভাবে কোষের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করে তা নয়, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং স্নেহাক্ত অ্যাসিডকেও কোষের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করে থাকে। আইসোটোপের সাহায্যে আমরা যদি কোষের ভিতর চিনির রূপান্তর অনুসরণ করি, তাহলে দেখতে পাব, কোষের মধ্যে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনি কোষের অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্‌ফেটের (সংক্ষেপে A.T.P) সঙ্গে ক্রিয়া আরম্ভ করে। এই ক্রিয়ার সহায়ক হিসাবে হেক্সোকাইনেজ (Hexokinase) নামক একপ্রকার উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। এই উৎসেচক ম্যাগ্‌নেসিয়ামের সাহায্যে চিনির ফরমুলার ৬ষ্ঠ স্থানে A.T.P-র কাছ থেকে একটি

ফস্ফেট গ্রুপ যোগ করে দেয়। পূর্বেই বলেছি, অনেকে বিশ্বাস করেন ইনসুলিন এই রাসায়নিক ক্রিয়াটিকেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। এখন এই চিনির ফরমূলার ৬ষ্ঠ স্থানে ফস্ফেটযুক্ত বস্তুটি (যাকে গ্লুকোসঙ্কিস ফস্ফেট বলে) কোষের ভিতরের উপযুক্ত উৎসেচকের সাহায্যে জল ও ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে (এনা-রোবিকেলি) এবং এতে প্রতি অণু চিনি বিপাকের জন্যে দুই অণু অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্ফেট এবং অতিরিক্ত ৬ অণু ডাইফস্ফোপিরিডিন নিউক্লিও-টাইড অক্সিডাইজড্ সংক্ষেপে D.P.N.H-এর জারণ-ক্রিয়া থেকে তৈরি হয়। এখানে শুধু এই কথাটাই মনে রাখতে হবে যে, অ্যাডি-নোসিন ট্রাইফস্ফেটই আমাদের কাজ করবার শক্তি যোগায়; অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়ায় যদি আমরা A.T.P-কে ভাঙতে পারি, তাহলে ঐ ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত শক্তি আমাদের কার্যক্ষমতাকে সচল রাখবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতি অণু A.T.P. থেকে ১১,৫০০ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। এরোবিকেলি পাইরুভেট অক্সিডেটিভ ডিকার্বোক্সিলেসন পদ্ধতিতে অ্যাসিটাইলকো-এ তৈরি করতে পারে। পাইরুভেট ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্রের উপাদানের (সংক্ষেপে T.C.A. চক্র) জনক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্রে যে সব উৎসেচকের প্রয়োজন হয়, তা সবই মাইটো-কণ্ড্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে আমাদের জানা প্রয়োজন, শরীরের বেশীর ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইডই এই T.C.A. চক্র দিয়ে তৈরি হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই চক্রের প্রতিটি বিবর্তনের সঙ্গে ১৫টি করে A.T.P. তৈরী হয়, আর গ্লাইকোলাইটিক ও T.C.A. চক্র দিয়ে মোট ৩৮টি A.T.P. তৈরি হয়। গ্লুকোজ সিক্স ফস্ফেট T.C.A. চক্র ছাড়াও অন্য আরেকটি পথ দিয়ে বিপাক হতে পারে, যাকে হেক্সোস মনোফস্ফেট পথ (সংক্ষেপে H.M P.) বলে। ঐ পথটা নিম্নরূপ :—

গ্লুকোজ সিক্স ফস্ফেট → সিক্স ফস্ফোগ্লুকোনিক অ্যাসিড
↓
রাইবিউলোস ফাইভ ফস্ফেট।

এই পথটাকে সচল রাখতে হলে ট্রাইফস্ফো-পিরিডিন নিউক্লিওটাইড (সংক্ষেপে T.P.N.)-এর প্রয়োজন হয়, আর এই T.P.N.-এর জারণ-ক্রিয়ার ফলে T.P.N.H-এ পরিবর্তিত হয়। এই T.P.N.H আবার শরীরে স্নেহাক্ত অ্যাসিড এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ তৈরি করবার কাজে দরকার হয়।

ডায়াবেটিক রোগীদের ইনসুলিনের অভাবে এই পথগুলি স্বাভাবিক সচল থাকে না।

শরীরে কার্বোহাইড্রেট প্রধানতঃ গ্লাইকোজেন হিসাবে জমা থাকে। ঐ গ্লাইকোজেন তৈরি করতে গ্লাইকোজেন সিনথেটেজ নামক এক-প্রকার উৎসেচকের বিশেষ প্রয়োজন হয়। লিলোইর (Leloir) পরীক্ষা করে দেখান যে, ইনসুলিন উক্ত উৎসেচকের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। ডায়াবেটিক ইঁদুরকে ইনসুলিন ইঞ্জেকসন করে তার যকৃতের গ্লাইকোজেন পরিমাপ করে দেখানো হয়েছে যে, যকৃতের গ্লাইকোজেনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

এবার আমরা দেখবো, স্নেহজাতীয় পদার্থ বিপাকের জন্যে ইনসুলিন কি ভাবে কাজে লাগে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডায়াবেটিক রোগীদের শরীরে স্নেহজাতীয় পদার্থ তৈরি করবার ক্ষমতা কমে যায় বা থাকে না। অপর পক্ষে স্নেহজাতীয় পদার্থ ভাঙবার ব্যাপারটা অতি দ্রুত হয়ে যায়। কারণ কার্বোহাইড্রেট থেকে সাধারণ ব্যক্তিরা যে শক্তি পায়, এরা তাথেকে শক্তি নিতে পারে না। তাই তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি স্নেহ জাতীয় পদার্থের বিপাকের থেকেই নিতে হয়।

দেখা যায়, একটি বয়স্ক নীরোগ ইঁদুর তার খাদ্যের চিনির অতি সামান্য অংশ—শতকরা ৩ ভাগ

যকৃৎ ও মাংসপেশীতে গ্লাইকোজেন হিসাবে জমা করতে পারে। অন্যত্র চিনির শতকরা ৩০ ভাগ জমা করে স্নেহজাতীয় পদার্থ হিসাবে। এই স্নেহ জাতীয় পদার্থ যদিও অ্যাসিটাইলকো-এ-তে (Acetylco A) রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু চিনিতে পুনরায় ফিরে আসতে পারে না।

ইনসুলিনের স্বল্পতার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে T.P.N.H তৈরিও ঠিকমত হয় না। আর উপযুক্ত পরিমাণে T.P.N.H তৈরি না হলে স্নেহজাতীয় পদার্থ তৈরির কাজটাতেও ঢিলা পড়ে যায়।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, সম্ভবতঃ বয়স্ক ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক বাদে, কোলেষ্টেরল তৈরি করতে সক্ষম; কিন্তু এদের মধ্যে যকৃতেরই অবদান সবচেয়ে বেশী।

কোলেষ্টেরল এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ তৈরির পথ অ্যাসিটাইলকো-এ পর্যন্ত একই। কিন্তু কোলেষ্টেরলের ক্ষেত্রে তৃতীয় একটা অ্যাসিটাইলকো-এ যোগ হয়, আর বিটা হাইড্রোক্সি বিটা মিথাইল গ্লুটারিলকো-এ তৈরি হয়। এথেকেই কোলেষ্টেরল ও কিটোন বডি তৈরি হয়। বিটা হাইড্রোক্সি বিটা মিথাইল গ্লুটারিলকো-এ থেকে কো-এ পৃথক এবং T.P.N.H দিয়ে বিজারিত হয়ে মেভালোনিক অ্যাসিড তৈরি হয়।

এই সব রোগীদের কার্বোহাইড্রেটের বিপাক কমে যায় অথবা বন্ধ হয়ে যাবার জন্যে রক্তে কিটোন বডির পরিমাণও অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, যাকে কিটোনেমিয়া বলে। কিটোনেমিয়া হবার ফলে কিটোন বডি প্রস্রাবের সঙ্গেও বেরুতে থাকে। তখন একে কিটোনিউরিয়া বলে। কিটোন বডিগুলির মধ্যে পড়ে অ্যাসিটোন, অ্যাসিটো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড।

সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সমতা থাকবার জন্যে যতটা পরিমাণ কিটোন বডি তৈরি হয়, ঠিক ততটাই বিপাকে লেগে যায়। সেই জন্যে রক্তে এদের পরিমাণ বাড়তে পারে না। ডায়াবেটিকদের কিটোন বডি তৈরির গতি বিপাকের গতি অপেক্ষা অনেক গুণ বেড়ে যাওয়ায় সব সময় এদের একটা অতিরিক্ত অংশ রক্তের মধ্যে জমা হতে থাকে।

কোষের অন্যান্য বস্তু তৈরির জন্যে যে কার্বন পরমাণুর প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজন মেটায় T.C.A. চক্র। সাধারণ ব্যক্তি বা প্রাণীর মধ্যে যে চার কার্বন যৌগ ঐ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তা অক্সালোঅ্যাসিটেট রূপে আবার ঐ চক্রে ফিরে যায়—কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেসন, ফস্‌ফোএনোল পাইরুভেট অথবা পাইরুভেট থেকে ম্যালেট দিয়ে।

কোন কোন শারীরবিজ্ঞানীদের মতে, ডায়াবেটিক রোগীদের মধ্যে উল্লিখিত পদার্থের স্বল্পতার জন্যে অক্সালোঅ্যসিটেট তৈরি কমে যায়। কিন্তু বর্তমানে ফোর্টারের (Forter) মতে, এই রোগীদের যকৃতে ঐ সব পদার্থের পরিমাণ কমে না অথবা ব্যাহতও হয় না।

সংক্ষেপে ডায়াবেটিকদের কিটোঅ্যাসিডোসিসের কারণ বলতে গেলে মনে রাখতে হবে—ইনসুলিনের অভাবে এই সব রোগীদের কোষের মধ্যে চিনির প্রবেশের পথ প্রায় বন্ধই হয়ে পড়ে; কাজেই চিনির বিপাকও বন্ধ হয়ে পড়ে, যার জন্যে চিনির পরিবর্তে কার্যক্ষমতা যোগাতে হয় শরীরের স্নেহজাতীয় পদার্থকে। চিনির বিপাক ব্যাহত হওয়ায় T.P.N.H. তৈরিও ব্যাহত হয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। T.P.N.H. ব্যতীত স্নেহজাতীয় পদার্থ তৈরির কাজটাও ব্যাহত হয়। ওদিকে পাইরুভেট এবং ফস্‌ফোএনোল পাইরুভেটের স্বল্পতার জন্যে অক্সালোঅ্যাসিটেটের পরিমাণ কমতে থাকে। অন্য দিকে এটা হচ্ছে আবার T.C.A. চক্রের একটা বিশেষ উপাদান না থাকায়

অথবা স্বল্পতার জন্যে এই চক্রের কাজও বেশ কিছুটা মন্থর হয়ে পড়তে চায়। অপর পক্ষে স্নেহজাতীয় পদার্থের দ্রুত বিপাকের জন্যে অ্যাসিটাইলকো-এ অনেক বেশী পরিমাণে তৈরি হতে থাকে। এই অ্যাসিটাইলকো-এ সচল রাখতে চেষ্টা করে এবং প্রচুর পরিমাণে বিটা হাইড্রক্সি, বিটা মিথাইল গ্লুটারিলকো-এ তৈরি হতে থাকে। অতিরিক্ত কিটোন বডি ও অনেক সময় অতিরিক্ত কোলেস্টেরলও তৈরি হয় ঐ বিটা হাইড্রক্সি, বিটা মিথাইল গ্লুটারিলকোএ থেকে। যখন কিটোন বডিগুলির তৈরির গতি সারা শরীরে বিপাকের গতির চেয়ে বেড়ে যায়, তখন এরা রক্তে জমা হতে থাকে। তখন একে কিটোঅ্যাসিডোসিস বলে। কোলেস্টেরল তৈরি যখন বেড়ে যায় আর্টারিওস্ক্লেরোসিস (Arteriosclerosis) হওয়াও কিছু বিচিত্র নয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হতে দেখা যায়।

কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের কথা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। এবার প্রোটিন বিপাকে ইনসুলিন কি ভাবে কাজ করে, সংক্ষেপে তারই কথা আলোচনা করবো।

স্নেহজাতীয় পদার্থের মত প্রোটিনের ক্ষেত্রেও ইনসুলিন না থাকলে প্রোটিন তৈরির কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। অন্য দিকে এর খরচের দিকটা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এই কারণেই শিশুদের দেহের বৃদ্ধি হয় না এবং বয়স্কেরা অস্থি-চর্মসার হয়। এই সব রোগীদের একবার ঘা হলে তা সারতে দেরী হওয়াও এর অপর একটা কারণ।

এই ব্যাধি যখন খুব উগ্রভাবে প্রকাশ পায় তখন প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি ও নাইট্রোজেন বের হতে দেখা যায়। এদের D : N অনুপাত ৩৬৫। এটা এমন একটা সংখ্যা, যা যে সব চিনি প্রোটিন থেকে আসছে, তা নির্দেশ করে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, প্রোটিন কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমষ্টি মাত্র। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড-গুলির মধ্যে এমন কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, যাদের রূপান্তরে শরীরে চিনি তৈরি হয়। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে গ্লাইকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে; যেমন—অ্যালানিন, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, আরজিনিন, গ্লুটামিন ইত্যাদি। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে কোষে ঢুকতে ইনসুলিন বিশেষভাবে সাহায্য করে। এছাড়া প্রোটিন তৈরির কাজেও ইনসুলিনের অবদান কম নয়। একটা মজার জিনিষ হচ্ছে, ইনসুলিনের প্রোটিন তৈরির কাজে সহায়তাটা আবার অনেকাংশে নির্ভর ক'রছে চিনির বিপাকের উপর। কারণ চিনির বিপাক থেকে T.P.N H এবং A.T.P তৈরি হয়। প্রোটিন তৈরির কাজে এদেরও বিশেষ প্রয়োজন।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ডায়াবেটিক রোগীদের ঘা সারতে দেরী হয় কেন? অন্যান্য কারণ বাদ দিয়ে ইনসুলিনের এতে কতখানি প্রভাব আছে, তাই আমরা এবার আলোচনা করবো।

কানেকটিভ টিস্যুর একটি সাধারণ অংশের নাম অ্যাসিড মিউকো-পলিস্যাকারাইড। এটা একটা পলিইলেকট্রোলাইট, যার আণবিক ভার অনেক বেশী এবং মোটামুটি গঠনের মধ্যে একটা অ্যাসিটি-লেটেড অ্যামাইনো সুগার। তারপর একটা ইউরোনিক অ্যাসিড পর পর সাজানো থাকে।

অ্যামাইনো সুগারের মধ্যে থাকে এন-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এন-অ্যাসিটাইল গ্যালাক্টোসামাইন অথবা গ্লুকোসামাইন। আর ইউরোনিক অ্যাসিডের মধ্যে থাকে গ্লুকিউরোনিক অ্যাসিড অথবা আইডুরোনিক অ্যাসিড।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিডের কথা। এর মধ্যে থাকে এন-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এবং গ্লুকিউরোনিক অ্যাসিড। চিনির বিপাক থেকে এই দুই হেক্সোসামাইন এবং

ইউরোনিক অ্যাসিড প্রোটিন তৈরি হয়। হাইয়া-লুরোনিক অ্যাসিড তৈরি করতে হলে চিনিকে A.T.P-র সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া করতে হয়; আর এই ক্রিয়া হয় কোষের মধ্যে। কাজেই চিনিকে কোষের মধ্যে আসতে হবে। ইনসুলিনের অভাবে চিনি কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই চিনিও A.T.P-র সঙ্গে ক্রিয়া করতে পারে না। ফলে মিউকো-পলিস্যাকারাইডগুলি তৈরি হতে পারে না। ঘায়ের জায়গায় নতুন টিস্যুর দরকার হয় এবং এই নতুন টিস্যুর জন্যে অ্যাসিড মিউকো-পলিস্যাকারাইডের প্রয়োজন। এটা তৈরি হতে সময় লাগে বলেই ডায়াবেটিক রোগীদের ঘা সারতে দেরী হয়। এই অ্যাসিড মিউকো-পলিস্যাকারাইডগুলি আবার শরীরকে রোগ-জীবাণুর হাত থেকেও রক্ষা করতে অনেকখানি সাহায্য করে।
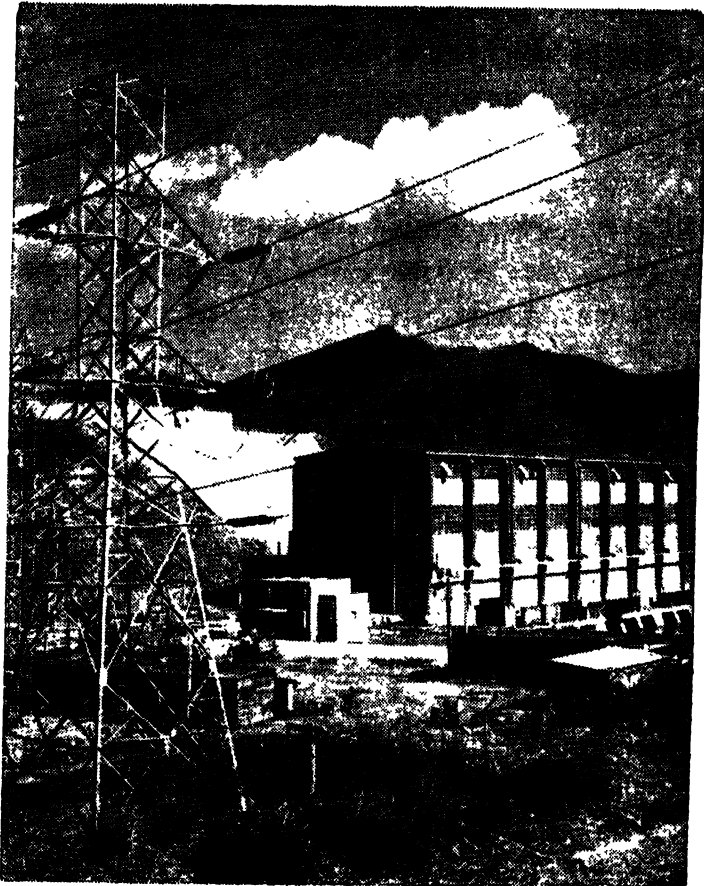
গাঙ্গুয়াল পাওয়ার হাউসের দৃশ্য

আইসোটোপ ও কৃষিবিজ্ঞান

শ্রীদিলীপকুমার হোতা

আইসোটোপ কথাটা এখন আর নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই এই কথাটা জড়-বিজ্ঞানের শব্দকোষে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়।

প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার আইসোটোপ বস্তুটা কি ?

আইসোটোপের পরিচয় পেতে হলে আমাদের যে দুটি কথা জানতে হবে, তা হলো পরমাণু-ভর ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক (Atomic number)

আমরা জানি যে, প্রত্যেক পরমাণুতে আছে নিউট্রন, প্রোটন এবং ইলেকট্রন। পরমাণুর মাঝখানে থাকে নিউক্লিয়াস, অর্থাৎ যুক্তভাবে নিউট্রন ও প্রোটন এবং এর চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে ইলেক্‌ট্রনগুলি। ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা সমান। নিউক্লিয়াসের ওজনের তুলনায় ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনগুলির ওজন নগণ্য। তাই নিউক্লিয়াসের ওজনই হচ্ছে পরমাণুর ওজন বা পরমাণু-ভর (Atomic mass)। পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক (Atomic number) হলো পরমাণুতে যতগুলি ইলেক্‌ট্রন বা প্রোটন থাকে তার সংখ্যা। সোডিয়ামের পরমাণুর কথাই ধরা যাক। এর পরমাণু-ভর ২৩। এখন যেহেতু এর নিউট্রনের সংখ্যা ১২, তাই প্রোটনের সংখ্যা (২৩-১২) অর্থাৎ ১১। সুতরাং ইলেকট্রনের সংখ্যাও ১১; অর্থাৎ এর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ১১।

কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণ (Chemical property) নির্ভর করে কেবল মাত্র পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের উপর। তাই যদি একাধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, যাদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক সমান, কিন্তু পরমাণু-ভর সমান নয়, তাহলে তাদের রাসায়নিক গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু এদের পরমাণু-ভর বিভিন্ন হওয়ায় ভৌতিক গুণের (Physical proprties) মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

এমনি কতকগুলি মৌলিক পদার্থ, যাদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক সমান অথচ পরমাণু-ভর অসমান, তাদেরই বলা হয় আইসোটোপ। লেড-এর কথাই ধরা যাক। ইউরেনিয়াম ধাতুর তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনের (Radioactive transformation) ফলে এর উৎপত্তি হয়; আবার থোরিয়ামের বেলায়ও তাই। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে উৎপন্ন লেডের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক সমান হলেও পরমাণু-ভর সমান নয়। তাই রাসায়নিক গুণাবলীর ভিত্তিতে এই দুই লেডের পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং আইসোটোপের সংজ্ঞা অনুসারে এদের আমরা লেডের আইসোটোপ বলবো।

মাস-স্পেক্‌ট্রোগ্রাফের সাহায্যে দেখা গেছে, অধিকাংশ মৌলিক পদার্থই দুই বা ততোধিক আইসোটোপের মিশ্রণ।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করবার আগে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। তেজস্ক্রিয় বস্তু কাকে বলে এবং তেজস্ক্রিয়তা কি ? কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আপনা থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় শক্তিকে (Energy) বিকিরণের (Radiation) রূপে মুক্ত করে দেয়। এই স্বয়ংক্রিয় শক্তি বিকিরণের ক্ষমতা সব পদার্থের নেই এবং যে সব পদার্থের আছে, তাদের

বিকিরণের মাত্রাও বিভিন্ন। বিকিরণ তিন ভাবে হতে পারে, যেমন—আল্‌ফা ও বিটা বস্তুকণা (Alpha and Beta particles) বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ও গামা রশ্মি (Gama Rays) বিকিরণের ফলে।

এই রকমের বিকিরণকে বলে তেজস্ক্রিয়তা এবং এই বিকিরণ-ক্ষমতা যে সব বস্তুর থাকে, তাদের বলা হয় তেজস্ক্রিয়।

তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তুর নিউক্লিয়াসের ভর বা পরমাণু-ভরের উপর নির্ভর করে সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সব আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় নয়। কতকগুলি তেজস্ক্রিয় আবার কতকগুলির তেজস্ক্রিয়তা নেই। যেহেতু তেজস্ক্রিয়তা পরমাণু-ভরের উপর নির্ভর করে, সেহেতু একই পদার্থের বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা বিভিন্ন। অ্যাটমিক পাইল ও রিয়্যাক্টরের মধ্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে আমরা প্রথমে তাপ-শক্তি (Thermal energy) পাই ও তাকে বিদ্যুৎশক্তি বা অন্য যে কোন শক্তিতে রূপান্তরিত করে নানারকম কাজে লাগাতে পারি।

আবার কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বহুল ব্যবহার আছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি পাওয়া যায়, কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন আইসোটোপের বিকিরণ ক্ষমতাও বিভিন্ন। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিকিরণ আমরা যে কোন একটি বিশেষ আইসোটোপ থেকে পেতে পারি ও তাকে কাজে লাগাতে পারি। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের আর একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো এর সুলভতা। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়েই এদের পাওয়া যেতে পারে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সময় উপজাত (Bye product) পদার্থ হিসেবে রিয়্যাক্টরে এদের পাওয়া যায় এবং অনেক পরিমাণে। এই সব বিশেষত্বের জন্যেই শিল্প, ঔষধ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি ইত্যাদিতে আইসোটোপ ব্যবহারের এত বাহুল্য।

প্রত্যেকটি দিকের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে, তাছাড়া সে সব বলবার মত স্থানও নেই। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো কৃষিবিজ্ঞানে আইসোটেপের ব্যবহার। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এর দ্বারা তাদের ফলন অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। খুব কম পরিমাণ আইসোটোপকে (তেজস্ক্রিয়) সার (Micro-fertilizer) হিসেবে ব্যবহার করে উদ্ভিদকে তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা প্রভাবিত (Irradiated) করা যেতে পারে।

রাশিয়ায় অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কোবাল্টকে মাইক্রো-ফার্টিলাইজার রূপে ব্যবহার করে দেখা গেছে, এর দ্বারা ভুট্টার ফলন ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু এর জীবনকাল সাধারণ ভুট্টার জীবনকালের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং খুব কম সময়ের মধ্যে উদ্ভিদ ফুল ও ফল জন্মাবার ক্ষমতা পায়। বীজকে অনুরূপভাবে প্রভাবিত করে দেখা গেছে, তার ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতার (Germinating power) কোন ক্ষতি হয় না এবং তাথেকে যে চারা উৎপন্ন হয়, তা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক দ্রুত বড় হতে থাকে; এমন কি, এর পুষ্টি, ফলন-ক্ষমতা, আকার, জীবনকাল ইত্যাদি এবং অনেক মৌলিক গুণেরও পরিবর্তন হয়। উপযুক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা উদ্ভিদকে অধিক শীত বা গ্রীষ্ম-সহনশীল করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ফল পাকবার জন্যে প্রয়োজনীয় সময়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

এই একই প্রণালীর ভিন্ন প্রয়োগের দ্বারা

উদ্ভিদের নতুন প্রজাতির (Species) সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়েছে।

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক L. P. Breslavets পরীক্ষা করে দেখেছেন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রভাবিত উদ্ভিদের কোষ-বিভাজন (Cell division) অপ্রভাবিত উদ্ভিদের তুলনায় অনেক দ্রুততর। প্রভাবিত উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এথেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

কয়েক ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের দ্রবণ (Solution) তৈরি করে বীজকে ভিজিয়ে নিতে হয়। এতেও ফলন বেড়ে যায়, কারণ এখানে আইসোটোপের দ্রবীভূত অণুগুলি বীজকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা প্রভাবিত করে। এই ব্যবস্থা করা হয় সাধারণতঃ আখ, গম, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

আলুকে বহুদিন ধরে সংরক্ষণ করবার অসুবিধার কথা আমাদের কারো অজানা নেই। কয়েক মাসের মধ্যেই আলুর অঙ্কুর উঠতে থাকে। এর ফলে স্টার্চ বা শ্বেতসার ও ভিটামিন-সি কমে যায়; কাজেই আলু স্বাদহীন হয়ে পড়ে।

কোল্ড স্টোরেজে রাখলেও এর সম্পূর্ণ প্রতিকার হয় না। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যদি স্টোরেজের মধ্যে ছোট অ্যালুমিনিয়াম টিউব তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট আইসোটোপের দ্বারা ভর্তি করে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে এর ফলে যে অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে একই অবস্থায় আলুকে কয়েক বছর ধরে সহজেই রাখা যেতে পারে। অঙ্কুর তো নষ্ট হয়ই না, অধিকন্তু আলু সব সময় তাজা ও রসে পূর্ণ থাকে এবং পুষ্টি গুণেরও হ্রাস হয় না। অল্প তেজস্ক্রিয়তার ফলে আলুর জীবন সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলিকে আমরা আরও অনেক ভাবে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা সে সব প্রয়োগের উপযোগিতা সম্বন্ধে পুরাপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারেন নি।

কারণ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি প্রাণীর শরীরের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। সুতরাং এদের বহুল ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। কিন্তু অপর পক্ষে দেখা গেছে, প্রকৃতির বহু আইসোটোপের সংস্পর্শে থেকেও প্রাণীদের কোন ক্ষতি হয় না। সামান্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রাণীদের খুব ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-প্রভাবিত বীজ ও তাথেকে উৎপন্ন উদ্ভিদের ফসল খেয়েও প্রাণীদের কোন ক্ষতি হতে দেখা যায় নি।

আশা করা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির কাছে এই সব বাধাগুলিকে মাথা নত করতেই হবে।

নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

কোনও থিওরী বা মতবাদ কখনও ধ্রুব সত্য হতে পারে না। আসলে থিওরী হচ্ছে—An approach to reality, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে কি ঘটছে, তা কোন থিওরীই বলতে পারে না। থিওরী কতকগুলি অনুমানকে (Assumption) ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং তা দিয়ে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হয়। সেদিক থেকে দেখলে কোনও থিওরীকেই সঠিক বা ভুল বলার মানে হয় না। যে থিওরী বেশী পর্যবেক্ষণকে (Observation) ব্যাখ্যা করতে পারে, সেটাই সর্বজনগ্রাহ্য হয়। এইভাবে নতুন মতবাদ এসে যখন এমন কতকগুলি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে, যেগুলি আগের মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না, তখন নতুন মতবাদটাই গ্রাহ্য হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার—সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান কখনও কোনও ঘটনার কারণ (Why) বলতে পারে না, বলতে পারে কেমন করে (How) ব্যাপারটা ঘটছে।

আইনষ্টাইন অথবা হয়েল-নারলিকারের মহাকর্ষ-তত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। তাই আজই কোনও বিশেষ মতবাদকে অগ্রাহ্য করবার সময় আসে নি। আরও অনেক নতুন পরীক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে কোন্ মতবাদ তাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা যে সব পরীক্ষা করেছেন, তা মোটামুটি দুটি থিওরী দিয়েই সমানভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ সমীকরণে একটি ঋণাত্মক চিহ্ন আসে, সমীকরণটি একটু সাজিয়ে লিখলে সেখানে ধনাত্মক চিহ্নও হতে পারে। এর ফল হলো আইনষ্টাইনের মতবাদ বীর যেমন কোনও বস্তুকে আকর্ষণ করা সম্ভব, তেমনি বিকর্ষণও করা সম্ভব। অথচ নারলিকারের সূত্র অনুযায়ী কেবল আকর্ষণই হওয়া উচিত। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি একমাত্র আকর্ষণই সম্ভব। তাছাড়া ঐ সমীকরণে আইনষ্টাইন একটি পদকে ধ্রুবক বলে মনে করেছিলেন, যেটা নারলিকারের অনুরূপ সমীকরণে ধ্রুবক নয়, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল।

মতবাদের দিক থেকে প্রধান পার্থক্যগুলিকে মোটামুটি সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আইনষ্টাইনের মতবাদে দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের কারণ দেশ-কালের জ্যামিতি (Geometry of space-time)। যখনই কোনও জায়গায় কোনও বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তুর চারদিকে একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (Gravitational field) সৃষ্টি হয় এবং ঐ বস্তুর কাছে দ্বিতীয় বস্তু এলেই উক্ত মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তনে দেশ-কালের বক্রতার (Curvature of space-time) জন্যেই দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ হয়।

নারলিকারের মতবাদ মাখ-এর "দূরবর্তী পদার্থের উপর ক্রিয়া" (Mach's principle of action at a distance) এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই নতুন মতবাদ অনুযায়ী দূরবর্তী যে কোন দুই বস্তুর মধ্যে একটি অপরটির উপর সরাসরি যে প্রভাব বিস্তার করে, তার ফলেই উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হয়। এখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনও স্থান নেই। সেদিক থেকে—দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বস্তুর ধর্ম। এটাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) বলেও মনে করতে পারি। ইলেকট্রন ঋণাত্মক

কণার একক এবং প্রোটন ধনাত্মক কণার একক। কেন, কি ভাবে যে এই দুই ভিন্ন তড়িতাধানের (Charge) মধ্যে আকর্ষণের উদ্ভব হয়, তা যেমন আমরা বলতে পারি না, কেবল পরীক্ষালব্ধ সত্য মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও তাই। নারলিকারের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল—তখন তিনি বললেন, বিজ্ঞানে প্রত্যেক ব্যাপারে কেমন করে হয়—এটা বলতে পারবার একটা সীমা আছে, যার পরে আমরা আর "কি করে হচ্ছে"—তার ব্যাখ্যা দিতে পারি না। মহাকর্ষ এই রকম একটা ব্যাপার। অবশ্য তিনি বললেন যে, যদি কোনও দিন তিনি এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পান, তবে তিনি খুবই খুশী হবেন। তাছাড়া তাঁর মতে, আইনষ্টাইনের সমীকরণ, কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের সমীকরণের একটি বিশেষ রূপ (Particular case)।

এই নতুন মতবাদের যে ফলটি আমাদের পূর্বলব্ধ জ্ঞান থেকে মূলগত ভিন্ন এবং যেটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে বেশ অদ্ভুত লাগে, সেটা হলো এই যে, এতদিন আমরা জানতাম ভর (mass) বস্তুর জন্মগত ধর্ম, অর্থাৎ বস্তু থাকলেই তার ভর থাকবে। কিন্তু নতুন মতবাদ অনুযায়ী তা আর সত্য নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত বস্তু আছে, সকলের প্রভাবের (Contribution) মিলিত ক্রিয়ায় কোনও বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মের (Property) সৃষ্টি হয়। এই ধর্মের নামই বস্তুর ভর। ভরের এই নতুন সংজ্ঞাকে আমরা সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারি না; কারণ ভর বলতে যে সঠিক কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। আমরা মোটামুটি এই জানতাম যে, কোনও বস্তুর ভর ঐ বস্তুর জড়তার পরিমাণ নির্দেশ করে (Measure of its inertia)। এই দুটি কথাকে সমন্বয় করলে দাঁড়ায় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত বস্তুর প্রভাবে একটি বস্তুর মধ্যে এমন ধর্মের (জড়তা) সঞ্চার হয়, যার ফলে ঐ বস্তু তার স্থিতি বা গতির অবস্থার পরিবর্তনকে বাধা দেয় এবং ঐ বস্তুর মধ্যে এই ধর্মের পরিমাণই হচ্ছে তার ভর (mass)।

নারলিকারের মতে, ব্রহ্মাণ্ডের একটি বস্তুকে রেখে যদি বাকী সমস্ত বস্তুকে অপসারিত করা হয়, তবে ঐ বস্তুর ভর হয় শূন্য। সাধারণ ভাবে ভাবলে বড় আশ্চর্য মনে হয়, কারণ বস্তু আছে অথচ ভর নেই—কি করে সম্ভব? কিন্তু ভরের নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও অসুবিধা হয় না। কারণ ঐ বস্তু ছাড়া আর কোনও বস্তু না থাকায় ওর উপর অন্য বস্তুর প্রভাব শূন্য—অতএব ভরও শূন্য। অন্য ভাবে বলা যায়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি একটি মাত্রই বস্তু থাকে, তবে তার উপর বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল শূন্য। অতএব বস্তুর জড়তা সোজাসুজি মাপা সম্ভব নয়। এটা শূন্যও হতে পারে আবার অন্য কোন মানেরও হতে পারে। তবে আমরা জানি যে, যখন কোনও বস্তু স্থির থাকে, তখন তাকে গতিসম্পন্ন করতে গেলে যদি বেশী বল প্রয়োগ করতে হয়, তবে বুঝতে হবে তার জড়তাও বেশী, অর্থাৎ ভর বেশী। এখানে আমরা দেখছি, এই জড়তার কারণ—যার উপর বস্তুটি রয়েছে তার সঙ্গে বস্তুর স্পর্শতলে উদ্ভূত বিপরীতমুখী চরম ঘর্ষণ বল (Limiting friction), যেটা নির্ভর করছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত নিম্নাভিমুখী বলের উপর। এক্ষেত্রে বস্তুটি ছাড়া আর কোনও বল (ঘর্ষণজনিত বা মাধ্যাকর্ষণজনিত) নেই। সুতরাং বস্তুর জড়তা শূন্য অর্থাৎ ভরও শূন্য। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, বস্তুটির ভর যে শূন্য, তা পরীক্ষা করে প্রমাণ করা সম্ভব নয়; কারণ, যে মুহূর্তে ঐ বস্তুর উপর জড়তা পরিমাপের জন্যে বলপ্রয়োগ করা হবে, তখনই দ্বিতীয় বস্তু এসে যাবে। কাজেই বস্তুর ভর আর শূন্য থাকবে না আর জড়তাও শূন্য হবে না।

গণিতের ভাষায় বলা যায়, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী $P = mf$.

এখানে $P =$ প্রযুক্ত বল, $m =$ ভর, $f =$ সৃষ্ট

ত্বরণ। এক্ষেত্রে P=o ; অতএব হয় m=o নয় f=o। f বা ত্বরণ মাপবার জন্যে কোনও নির্দিষ্ট কাঠামো (Reference frame) দরকার, যার সাপেক্ষে বস্তুর ত্বরণ মাপা হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন বস্তু না থাকায় সে রকম কোন Frame নেই। কাজেই f-এর মান o বলা সম্ভব নয়। অতএব f-এর মান অমেয় (Indeterminate)

∴ o= m× (অমেয়)

এটা সম্ভব হয় একমাত্র তখনই যখন m=o হয়। অতএব গণিতের ভাষায় ভরের সংজ্ঞা $m = \frac{P}{f}, f \neq o$. বা ভর= $\frac{\text{বল}}{\text{ত্বরণ}}$, যেখানে ত্বরণ ≠ o।

এছাড়া আমরা ভাবতে পারি, কোনও বস্তুর ভর যখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্য বস্তুর প্রভাবে হচ্ছে, তখন একটা বস্তুর ভর বেশী ও অন্য কোন বস্তুর ভর কম কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, কোনও বস্তুকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমষ্টি ভাবতে পারি। এই ক্ষুদ্র কণাগুলির প্রত্যেকটির উপর ব্রহ্মাণ্ডের প্রভাব সমান। এজন্যে এদের ভরও সমান। যে বস্তুর মধ্যে এই ক্ষুদ্র কণার সংখ্যা অনেক বেশী, স্বভাবতঃই তার ভর, যার মধ্যে কণার সংখ্যা কম, তার ভরের চেয়ে কম।

এই মতবাদ কি ভাবে তাঁর মাথায় এসেছিল, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তিনি ও ডাঃ হয়েল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের (Electro-magnetic Theory) সাহায্যে জড়তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছিলেন এবং নতুন মহাকর্ষ মতবাদ এই প্রচেষ্টার অন্যতম ফলস্বরূপ। তিনি এখনও এই বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন এবং আশা করেন যে, ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র, মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র এবং সৃষ্টি ক্ষেত্র (Creation field)—এই তিনটিকে একই সূত্রে গাঁথা সম্ভব হবে (Unified field)।

হয়েলের থিওরী অনুযায়ী আমাদের ক্রমবর্ধমান ব্রহ্মাণ্ডে (Expanding Universe) যে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, তা সর্বদাই নতুন বস্তু সৃষ্টির ফলে পূর্ণ হচ্ছে এবং এর জন্যে দায়ী হচ্ছে সৃষ্টি ক্ষেত্র। নব আবিষ্কৃত "কোয়াসার"-গুলি অদৃশ্য হয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন সৃষ্টি ক্ষেত্র, আর এই নতুন সৃষ্টি ক্ষেত্র থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন বস্তু। এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু-বিন্যাস একই রকম থেকে যাচ্ছে। নতুন মহাকর্ষ মতবাদ এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নারলিকারের বক্তৃতা শুনে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি ভবনে (তাঁর কলিকাতা থাকাকালীন বাসস্থান) তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মতবাদ যতটুকু বুঝেছি, তাই সরলভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন

অমিয়কুমার মজুমদার

পৃথিবীতে এমন মনীষী কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের কীর্ত্তি কালোত্তর, যাঁরা যুগ যুগ ধরে স্মরিত ও বিধৃত হন, দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণতার বেড়া ডিঙিয়ে। জাতি ও বর্ণের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে তাঁরা সার্বজনীন। আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এমনি এক বিরল প্রতিভার মানুষ। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যখনই কোন আবিষ্কার হয়েছে, বিজ্ঞানের সমুদ্র থেকে কোন রত্ন যে কোন প্রান্তে আহরিত হোক না কেন, তার ফলভোগ করেছে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র স্থাবর নয়—জঙ্গম ; কাজেই স্থানের ব্যবধান পেরিয়ে বিদেশের বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশের মানুষ হয়েছেন। তেমনি আইনষ্টাইন। তিনি কোন বিশেষ দেশের অধিবাসী নন, তাঁর কোন জাত নেই, তিনি সর্বদেশের।

আমাদের দেশের পুরাণের কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, ঋষি বিশ্বামিত্র যোগবলে, তপস্যার শক্তিবলে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন স্বর্গ—প্রচলিত নিয়ম-ব্যবস্থার অন্যথাচরণ। এই শতাব্দীর মহা-মনীষী আইনষ্টাইন বিপ্লব সৃষ্টি করলেন প্রতিষ্ঠিত "নিউটনীয় জগতে"। বিজ্ঞানের চিরাচরিত নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে ধরলো ফাটল। গণিতের কষ্টিপাথরে বিবিধ সমীকরণের আঁচড় দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, নিউটনের বিজ্ঞান সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। জন্ম নিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, আর এরই ঔরসে সৃষ্টি হলো নতুন বিজ্ঞান। পরিবর্তিত হলো প্রাচীন সংজ্ঞা। এতদিন যা জানতাম, তার ভিত্তি টলে উঠলো। তাই বলে একথা সত্য নয় যে, এই তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে নিউটনের বিরাট সৃষ্টি তার আসনচ্যুত হবে। আইনষ্টাইন বলেছেন—তাঁর (নিউটনের) সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত আদর্শগুলি চিরকাল তাদের বিশেষত্ব বজায় রেখে চলবে ভিত্তিমূল হিসাবে, যার উপর আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ জোহানেজ কেপলারের জন্মভূমি দক্ষিণ-পূর্ব জার্মেনীর উল্‌ম শহরে বিগত ১৮৭৯ সালের চৌদ্দই মার্চ রাত্রে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জন্ম। এঁরা ইহুদী। জাতিগত ভাবে কোন নির্দিষ্ট মাটির উপর আকর্ষণ নেই। অর্থ ও মনীষা—এই দুইয়ের আকর্ষণ এবং প্রেরণায় পিতা হারমান আইনষ্টাইন এলেন উল্‌মে।

ছেলেবেলায় অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছিলেন একটু বোকাটে ধরণের। মা পলিন এ নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলেন। অনেকে ডাক্তার দেখাতে বললেন। যে যা-ই বলুক না কেন, হারমান আইনষ্টাইনের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর ছেলে এক দিন কেপলারের মত বড় হবে।

শৈশব থেকেই অ্যালবার্টের গণিতের প্রতি প্রবল ঝোঁক। কাকা জ্যাক প্রথমে মাষ্টারীর ভার নিলেন। দশ বছর যখন তাঁর বয়স, তখন জ্যাক আর সামাল দিয়ে উঠতে পারেন না। তাঁর ঝুলির সব বিদ্যা ঐ বালকের কাছে চলে গেছে—তাঁকে ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে। নিজের তাগিদে অ্যালবার্ট আবিষ্কার করতে লাগলেন জ্যামিতির জানা উপপাদ্য কোন সাহায্য না নিয়ে, আর বীজগণিতের জটিল অঙ্ক নিয়ে সমাধান করতে লেগে গেলেন। ন' বছর বয়সে মাইনর স্কুলে ভর্তি হলেন। ভাল লাগে না স্কুলের ধরাবাঁধা নিয়ম। স্কুলের শিক্ষকেরা বললেন

'ছেলেটা বোকা'। তবে অঙ্কের মাষ্টার মশাই বললেন, অঙ্কে তাঁর আশ্চর্য মাথা। রুয়েস নামে একজন শিক্ষক কেবল বুঝতেন ছেলেটিকে। বালক আইনষ্টাইনকে ডেকে শোনান গ্যেটে, সেক্সপিয়ার, শিলারের কথা।

এঁদের বাড়ীতে ম্যাক্স টালমে নামে একজন ডাক্তারী ছাত্র ঘন ঘন বেড়াতে আসতেন। তাঁর বয়স বালক আইনষ্টাইনের দ্বিগুণ। কিন্তু তাতেও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অঙ্কে অ্যালবার্টের ঝোঁক আছে দেখে তিনি তাঁকে উপহার দিলেন একখানা জ্যামিতি। তাই নিয়ে মেতে উঠলেন আইনষ্টাইন। তের বছর বয়সে কাণ্টের দর্শন পড়তে লাগলেন। পড়ে ফেললেন কাণ্টের 'ক্রিটিক অব পিওর রিজ্‌ন'। 'ইহুদী' বলে অনেকেই তাঁকে অবজ্ঞা করতো স্কুলে। মিউনিকের উপকণ্ঠে নিজেদের বাগান বাড়ীতে তাঁর একমাত্র স্বাভাবিক পরিবেশ। মিউনিকের উপকণ্ঠের নির্জনতা, বড় বড় গাছের জন্যে আলো-আঁধারিতে ভরা পথ তাঁর মনে ছন্দ জাগাতো। ঐ পরিবেশে তাঁর মনে চলতো বীজগণিতের দুরূহ সমস্যা, হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক আর তারকার দুর্বোধ্য প্রশ্নের সমাধানের প্রক্রিয়া।

আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটায় আইনষ্টাইন পরিবার চলে গেলেন ইটালীতে। অ্যালবার্টও কৌশলে মিউনিকের স্কুল থেকে চলে এলেন—পাড়ি জমালেন সুইজারল্যাণ্ডে। জুরিখে পলিটেক্‌নিক অ্যাকাডেমীতে ভর্তি হতে গিয়ে মুস্কিল হলো। অ্যালবার্ট প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে আসেন নি; কাজেই সেখান থেকে চলে এলেন কাছাকাছি এক স্কুলে ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেটের জন্যে। এখানে তাঁর ভাল লেগে গেল। ভিন্‌টেলার নামে এক শিক্ষকের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। এই শিক্ষক মশাই আইনষ্টাইনকে বেশ ভালবাসতেন। সেও একটা কারণ বটে, তবে আরও আকর্ষণীয় ছিল তাঁর সুন্দরী কিশোরী মেয়েটি। আইনষ্টাইনের মনে বেশ দোলা লাগে। কিন্তু লাভ হলো না—মুখ ফুটে নিজের মনের কথা জানাতে পারলেন না। তা না হলেও দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো। ওই মেয়েটির ভাই বিয়ে করলো আইনষ্টাইনের বোন মাজাকে।

জুরিখ অ্যাকাডেমিতে পড়বার সময় গণিত ও পদার্থবিদ্যায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, তা আইনষ্টাইনের প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। এখানে যা পড়ানো হয়, তার চেয়ে তিনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। একই সঙ্গে তিনি দর্শন ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানও পড়তেন। শোপেনহাওয়ার, ডারউইন, হিউম, বার্কলে প্রভৃতির রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। এই বিদ্যালয়ে সার্বিয়া থেকে আসা একজন ছাত্রী মিলেভিয়া মারিক আইনষ্টাইনের সহযোগী ছিলেন। দু'জনেরই অঙ্কে প্রবল ঝোঁক। এখানে পড়তে পড়তেই তাঁরা ঠিক করে ফেললেন যে, তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন। এখানে আরো একজন ছাত্র মার্শেল গ্রস্‌ম্যানের সঙ্গে আইনষ্টাইনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ইনিও পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানীরূপে নাম করেছিলেন।

১৯০০ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি গ্রাজুয়েট হন। এতদিন কয়েকজন আত্মীয়ের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে পড়া চালাতে হতো। এবারে স্বাবলম্বী হবার পালা। ইহুদী-বিদ্বেষ তখন প্রবল থাকবার ফলে অধ্যাপকের চাকুরী সংগ্রহ করা শক্ত হয়ে উঠলো। বেকার অবস্থায় ছ'মাস কেটে গেল। অবশেষে জুরিখ থেকে সতেরো মাইল দূরে ভিনটাতুর শহরে এক কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পেলেন। আইনষ্টাইনের সাহচর্যে সেখানকার বয়স্ক ছাত্রেরাও তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলো।

এখানে কয়েক মাস কাজ করবার পর এক স্কুল-শিক্ষকের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতার কাজ নিলেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ঐ কাজটি পেয়েছিলেন। আইনষ্টাইনের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল পড়ুয়া

ছেলেদের—আর এটাই হলো কাল। সেখান থেকে চাকুরী গেল। আবার কপর্দকহীন অবস্থায় পথে নেমে এলেন। জুরিখের সেই বন্ধু মার্শাল গ্রস্‌ম্যানের বাবা তাঁকে একটি কাজ জুটিয়ে দিলেন—বার্ন শহরে পেটেণ্ট পরীক্ষকের কাজ। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। কাজের অবসরে যতটুকু সময় তিনি মুক্ত থাকতেন, সেই সময়টুকুর তিনি সদ্ব্যবহার করতেন গবেষণার কাজে। এখানে তিনি মাইনে যা পেতেন, তা খুবই কম। বছর খানেক বাদে মাইনে বাড়লো আর বিয়েও করলেন। কলেজের প্রেম পরিণত হলো বিবাহে। সাংসারিক এবং অফিসের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও এরই মধ্যে প্রস্তুতি চললো পি-এইচ ডি-এর থিসিস্ তৈরির কাজে।

বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। পঁচিশ বছরে তাঁর ছেলে হলো আর ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি আবিষ্কার করেন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। 'অ্যানালেণ্ডার ফিজিক' পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুললো। দেশ, কাল, আলো, বস্তু, বিশ্বজগৎ—সব কিছু সম্বন্ধে এতদিনকার পুরনো ধারণার মূলে এল এক প্রচণ্ড আঘাত। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন এই তরুণ বিজ্ঞানীকে। উদীয়মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স ফন্ লাওয়ে নিজেই গেলেন আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। এবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অযাচিতভাবে অনুরোধ আসতে লাগলো অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করবার জন্যে। ইতিমধ্যে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। অনেক অনুরোধ, উপরোধের পর রাজী হলেন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে। ১৯০৮ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সালে প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। ১৯১১ সালে তাঁর 'জেনারেল থিয়োরী অফ্ রিলেটিভিটি'র প্রাথমিক সূত্রগুলি প্রকাশিত হয়। প্রাগেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য খুব বেশী ছিল না। তবুও তিনি ব্যাপৃত থাকতেন ব্যাপক গবেষণার মধ্যে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায়। সাংসারিক জীবনের সঙ্গে আর খাপ খাইয়ে চলতে পারেন না। স্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন নানা কর্তব্যের কথা। কিন্তু তখন তাঁর মনের মধ্যে চলেছে বীজগণিতের নানা রাশির খেলা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন পরিচিত গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে রূপান্তরিত হচ্ছে পুরনো দিনের পৃথিবী। সিনেমার ছবির মত যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে নিউটনের অবধারিত জগৎ, যে জগতের উপর সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। তাঁরই উপলব্ধির প্রজ্ঞালোকে স্তব্ধ হলো চলমান চিন্তাধারা।

হঠাৎ বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা ইউরোপের রণাঙ্গনে। নানা কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রাগ ছাড়তে হলো। আবার সেই জুরিখ। ১৯১২ সালে জুরিখের কনফিডারেট পলিটেক্‌নিক অ্যাকাডেমীতে অধ্যাপক ও পরিচালক হয়ে এলেন। এই কলেজেই তিনি এককালে সসঙ্কোচে ভর্তি হতে এসেছিলেন।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী লিব্‌নিৎস্ প্রুশিয়ায় 'অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মেনীর নামকরা বৈজ্ঞানিকেরা এর সদস্য। পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র এই চারটি বিভাগে এই পরিষদ বিভক্ত। ১৯১৪ সালে অধ্যাপক উইফ্ মারা যাবার পরে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের চেষ্টায় আইনষ্টাইন ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। এখানে কেবল গবেষণার কাজ। এর মধ্যেই তাঁর সাংসারিক জীবনে বিপর্যয় ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এর পরে তিনি আবার বিয়ে

করেন। নতুন স্ত্রীর নাম এল্‌সা। বহুদিনের পরিচিতা। স্বামীসেবা ইনি স্বাভাবিক কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। আইনষ্টাইনের এরূপ সহধর্মিণীরই প্রয়োজন ছিল। বাহুল্য বর্জিত তাঁদের জীবনধারা খুবই সরল ও সহজ ছিল।

তাঁর বার্লিনে আসবার সময় থেকে সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধের বিভীষিকা চলছিল। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধের এই কোলাহল তাঁর নির্জন কক্ষে এসে পৌঁছাতো না—দৈনন্দিন জীবনের ছোঁয়াচ তাঁকে বিব্রত করতে পারতো না। এই সময়ে তিনি তাঁর 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' সম্পূর্ণ করবার পথে। বিকিরণ ও বস্তুরূপ সম্বন্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন এই সময়ে। ১৯১৫ সালে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে প্রকাশিত হলো। এর যুক্তির প্রখরতা বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হলেও তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আইনষ্টাইন বললেন, পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় গৃহীত ফটোগ্রাফ তাঁর তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করবে। তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে তিনি বলেছেন যে, বস্তুর উপস্থিতিতে নিকটবর্তী সমস্ত 'দেশে' বক্রতার সৃষ্টি হয়। এই বক্রতার পরিমাণ নির্ভর করে নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষেত্র অনুযায়ী। বস্তুর পরিমাণ এবং তার বিস্তৃতির উপরে এই বক্রতার পরিবর্তন ঘটে। এই বক্রতার জন্তেই আকাশের নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সমগ্র চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির গতিবেগে তার প্রভাব পড়ে।

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা নক্ষত্রের আলো নিশ্চয় সূর্যের সান্নিধ্যে এসে দিক পরিবর্তন করে। সবচেয়ে বড় কথা 'দেশ' যদি বেঁকে যায়, তাহলে জ্যামিতিক হিসেবেও এই পরিণতি ঘটবে। দূরের এই নক্ষত্রের আলোকরশ্মি কতটা বিচ্যুত হবে, আইনষ্টাইন তা আগেই অঙ্ক কষে বের করেছিলেন। অবশেষে ১৯১৯ সালের ২৯শে মে এই তথ্য প্রমাণ করবার উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হলো। লণ্ডনের বিজ্ঞানীরা নানারকম ছবি তুলে দেখলেন, আইনষ্টাইনের তথ্য ঠিক। দেখা গেল সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে নক্ষত্রালোকের বক্রতা ঘটা সম্ভব। এর কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে আরো একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মূলসূত্রগুলিকে আঘাত হানলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন যুগেরও অবতারণা হলো। আইনষ্টাইনের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠলো নতুন দর্শন, নতুন চিন্তা। মানুষের চিন্তা-জগতের রূপ গেল বদ্‌লে।

১৯২১ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এই বিরাট অঙ্ক থেকে মাত্র এক পেনি রেখে বাকী সব টাকা দান করে দিলেন। ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটি তাঁকে একটি পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। চারদিক থেকে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, পদক প্রভৃতি আসতে লাগলো। এতে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

নব্যবিজ্ঞান : আপেক্ষিকতা তত্ত্ব

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। একটি বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং এরই উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয়টি—সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্সওয়েল এবং লোরেনৎস্‌-এর বিদ্যুৎ-গতি তত্ত্বের বিস্তৃতি মাত্র। কিন্তু এর পরিণতি যা দাঁড়িয়েছে, তা এই তত্ত্বকে প্রায় সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গেছে।

আইনষ্টাইন বলেন যে, 'দেশের' চরম বা অ্যাবসলিউট কাঠামোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। একজন নক্ষত্রবাসী দর্শকের কাছে দেশের কাঠামো, নীহারিকাবাসী দর্শকের দেশের কাঠামো এবং সূর্যলোকবাসী অথবা পৃথিবীর অধিবাসীর দেশের কাঠামো এক নয়। প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে দেশের গঠন। এই রিলেটিভ বা আপেক্ষিক

দূরত্ব, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি, যা দিয়ে 'দেশ' মাপা যায়, তাও এই ধরণের আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত। একটি নক্ষত্র থেকে দেখা কোন বস্তুর দূরত্ব যেমন সে দিক থেকে অভ্রান্ত, তেমনি ঐ বস্তুটির দূরত্বের হিসেব অন্য একটি নক্ষত্র থেকে বের করলেও তাদের কাছে তা সত্য। অ্যাবসলিউট দূরত্ব বলে কিছু নেই। আল্‌ফা নক্ষত্র থেকে ক-বাবু যে হিসেব দাখিল করলেন, তাও সত্য আবার বিটা নক্ষত্র থেকে খ-বাবুর পরিমাপও সত্য। তারপরেও কথা হলো—একটি দেশের কাঠামো অনুযায়ী সেই দেশের পদার্থের পরিমাপ বিচার করা হবে। অতএব পদার্থের পরিমাপও আপেক্ষিক। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আপনার পড়বার ঘরে যে টেবিল আছে, তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর অধিবাসী না হয়ে অন্য কোন নক্ষত্রলোকের অধিবাসী হন, তাহলে আপনার মাপের হিসেব বদ্‌লাবে। এই টেবিলটি যদি সেখানে থাকে, তখন তার মাপ হবে তাদের হিসেব অনুসারে।

মনে করুন, এই পৃথিবীর মধ্যেই কোন স্থির-বস্তুতে বৈদ্যুতিক আবেশ ঘটানো হলো। তড়িতাবিষ্ট অবস্থায় এথেকে সৃষ্টি হলো বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্র নয়। কিন্তু নীহারিকা থেকে যদি কোন কৌতূহলী দর্শক পৃথিবীর এই বস্তুটিকে দেখে, তাহলে তার মনে হবে যে, এই বস্তুটি সেকেণ্ডে এক হাজার মাইল বেগে চলছে, অবশ্য যদি নীহারিকার নিজের গতিবেগ সেকেণ্ডে এক হাজার মাইল হয়। যেহেতু বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন কোন বস্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে, সেহেতু ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজমের নিয়মানুসারে এস্থলে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। কি অদ্ভুত কথা ভাবুন তো! একই বস্তু চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে আবার করছে না। আমাদের পুরনো বিদ্যা দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, একটাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে দুটাই ঠিক। পৃথিবীর হিসেবে চৌম্বক ক্ষেত্র নেই, কিন্তু নীহারিকাবাসীর মাপকাঠি অনুসারে আছে। সেই দেশের বিজ্ঞানী তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রে পৃথিবীস্থ এই বস্তুটির চৌম্বক ক্ষেত্র ধরতে পারবেন, কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানীর যন্ত্রে ধরা পড়বে না। তাহলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, প্রকৃতপক্ষেই কি কোন চৌম্বক ক্ষেত্র নেই? আইনষ্টাইন বলছেন, আছে বৈ কি! তবে আপেক্ষিক বা সম্বন্ধযুক্ত ভাবে। অ্যাবসলিউট বা চরম সত্য বলে কিছু নেই। জগৎ যদি নিশ্চল থাকতো তবে পরিমাপের কোন পার্থক্য হতো না। সব কিছুই এক হিসেবে মেপে তার সঠিক দূরত্ব, ওজন, আকৃতি দেখানো সম্ভবপর হতো।

আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে দেশ ও কাল পরস্পর বিজড়িত। 'কাল'কে বাদ দিয়ে দেশের অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়। দেশ, কাল ও চলমান বস্তুপিণ্ডের গতিবেগ—এরা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, একটাকে বাদ দিয়ে অন্য-টাকে কল্পনা করা যায় না। ঘড়ির মাপে আমরা পৃথিবীর সময় নির্ণয় করতে পারি, কিন্তু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সময় গণনা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রে তাদের নিজস্ব স্থানীয় সময় আছে এবং এই সময় তাদের নিজেদের গতিবেগের উপর নির্ভর করে।

একথা সকলেই জানেন যে, আমরা দেখি আলোর সাহায্যে। পৃথিবী থেকে কোন নক্ষত্রে আলো যেতে বা সেই নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে বহু আলোক-বছর লাগে। কয়েক দিন আগে আমাদের এখানে যে ঘটনা ঘটলো, তা উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে পৌঁছাতে কয়েক আলোক-বর্ষ লাগবে। আমাদের হিসেবে যে ঘটনা মাত্র কয়েক দিন আগেকার, ঐ বিশেষ নক্ষত্র-বাসীর কাছে সেটা লক্ষ বা কোটি বছর পরেকার ঘটনা। কাজেই যে সময় নক্ষত্রবাসীর চোখে পৃথিবীর এই ঘটনা পরিস্ফুট হবে, তখনই তারা

ভাববে যে, সেই বিশেষ মুহূর্তে পৃথিবীর এক বিশেষ অংশে এই ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলোর গতিবেগ এবং যার যে ধরণের ঘড়ি, তার উপরে নির্ভর করে সময়ের হিসেব। সময় এভাবে নির্ভরশীল বলেই সম্বন্ধযুক্ত বা আপেক্ষিক।

আইনষ্টাইন বলেন যে, সময়কে মাপবার পন্থা হলো কোন গতিশীল বস্তু কতদূর গেল, তার হিসেব দিয়ে। সময়ের পরিমাপ নির্ভর করে কোন বিশেষ বস্তুর গতিবেগের উপর। গতি-বেগের বিস্তারের জন্যে প্রয়োজন দেশ বা স্পেস। সেহেতু দেশ ও গতির সঙ্গে সময় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মাধ্যাকর্ষণ ব্যাখ্যা করবার সময় তিনি বলেন যে, নিউটনের 'বল' কথাটির কোন মানে নেই। একের আকর্ষণে আর একটি কাছে আসে, এই থিয়োরী ভুল। আমাদের এই জগতে এই নিয়ম খাটলেও প্রকৃতপক্ষে এর কোন মূল্য নেই। আপেল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্যে পড়ে না, সহজ সরল পথ বেয়ে নীচে নেমে আসে মাত্র। কোন বস্তু যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্রের মত এক ধরণের মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে লোহা যেমন সোজাভাবে চলে আসে, তেমনি আপেলও। সূর্যের চারদিকে যে সব গ্রহ অবিরাম চক্রবৎ ঘুরছে, সেটা মাধ্যাকর্ষণের জন্যে নয়। এদের উপস্থিতিতে 'দেশের' মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বক্রতার, সৃষ্টি হয়েছে পাহাড় ও উপত্যকার, তারই মধ্যে সহজ পথ ধরে এরা গড়িয়ে যাচ্ছে। আর একটু সহজ করে বলছি, কোন বস্তু চলতে আরম্ভ করলে তাকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্রের মত মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। লোহা যেমন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এসে সোজা চলে আসে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের মধ্যে আপেলও তেমনিভাবে মাটিতে পড়ে। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকবার ফলেই সমস্ত গ্রহগুলি ঘূর্ণায়মান। প্রকৃতপক্ষে মাধ্যাকর্ষণের টানে এরা ঘুরছে না। এদের উপস্থিতির জন্যে সৃষ্টি হয়েছে বক্রতা, সৃষ্টি হয়েছে পাহাড় ও উপত্যকার 'দেশের' বিস্তৃতির মধ্যে, তারই মধ্যেকার সহজ পথ ধরে এরা চলেছে মাত্র।

এই যে বক্রতার কথা বলা হলো, সেটা সর্বত্র সমান নয়। বস্তুর পরিমাণ ও কেমন ভাবে বস্তুটি বিস্তৃত হয়ে আছে, তার উপর নির্ভর করে বক্রতার স্বরূপ। সূর্যের মত বিরাট ঘনীভূত বস্তুপিণ্ডের চারদিকে এই বক্রতা অত্যন্ত বেশী। সেহেতু সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকৃতি কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে চলেছে গ্রহরাজি। দেশের বক্রতার জন্যে আলোকরশ্মিও বেঁকে যাবে, একথা আইনষ্টাইন বললেন এবং তার প্রমাণও পাওয়া গেল সূর্যগ্রহণের সময়। আলোকরশ্মি যে সরল রেখায় চলে, এই প্রচলিত ধারণা নড়বড়ে হয়ে গেল। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কার তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অন্তর্গত।

আইনষ্টাইন গাণিতিক হিসেব করে দেখিয়েছেন —ওজন, গতিবেগ, মাধ্যাকর্ষণ—সবগুলিই আপেক্ষিক। স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসবেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলেন যে, মাধ্যাকর্ষণ ও ক্রমবেগের মধ্যে সেহেতু কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আইনষ্টাইনের সমমূল্যতা বাদ বা 'ল অব্ ইকুয়িভ্যালেন্স'।

আইনষ্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্য দিয়ে দেশ-কাল ও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রকে সমপর্যায়-ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে গ্র্যাভিটেশন্যাল ফিল্ড এবং ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের মধ্যে যে পার্থক্য রয়ে যাচ্ছিল, তা দূরীভূত হয় ১৯২৯ সালে। ঐ বছরে তিনি আবিষ্কার করেন 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী'। অবশ্য ১৯৫২

সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই থিয়োরীর অনেক জটিলতা সহজ করেন।

মানুষ-আইনষ্টাইন

সকাল আটটায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে কলম আর প্যাড্ নিয়ে বসতেন গবেষণায়। বলতেন, আমি চার ঘণ্টার বেশী কাজ করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সারাক্ষণই কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

একজন উৎসুক ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার যন্ত্রপাতি কোথায়?

আইনষ্টাইন নিজের মাথায় টোকা মেরে বললেন—এই আমার যন্ত্রপাতি।

পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কোনদিনই ছিল না। বড় নিমন্ত্রণেও পুরা স্যুট না পরেই যেতেন। একবার এক বিরাট সম্মেলনে তিনি অসম্পূর্ণ পোষাক পরে গেছেন। সবারই চোখে পড়ছে, কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই। পরে যখন খেয়াল হলো তখন হেসে বললেন—আমার কোটটা যদি ব্রাস করা মনে না হয়, তাহলে একটা নোটিস সেঁটে দিলেই হয় যে, এক্ষুনি এটিকে ব্রাস করা হয়েছে—এই বলেই তিনি সবাইকে দেখিয়ে হাত দিয়ে কোট ঝেড়ে নিলেন।

নমস্কার, প্রতিনমস্কার বা ভদ্র সমাজের বহু কায়দা-কানুন তিনি মেনে চলতেন না। এজন্যে অনেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তা বুঝতে পেরে তিনি তাদের পিঠ চাপড়ে বলতেন—ভাই ওটা ফর্মালিটি ছাড়া তো কিছু নয়, আর ফর্মালিটি মানেই তো অভিনয়।

একবার এক জায়গায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কথা ছিল মাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব থাকবেন মাত্র। কিন্তু গিয়ে দেখেন বিরাট আয়োজন। আর ঘর ভর্ত্তি সমাজের বড় বড় ধনীর দল। মুহূর্তে মন বিষিয়ে উঠলো। দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে এলেন, আর ওমুখো হলেন না।

বেলজিয়ামের রাণী একবার তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ব্রুসেলস্ শহরে ট্রেন থেকে নেমে একহাতে স্যুটকেস আর এক হাতে বেহালা নিয়ে হেঁটেই চললেন রাণীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর খেয়ালই হয় নি যে, রাজবাড়ী থেকে একদল কেতাদুরস্ত লোক আসবে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। রাজবাড়ীর কর্মচারীরা ভেবেছিলেন, আইনষ্টাইন নিশ্চয় হোমরা চোমরা কেউ হবেন। সেরকম কাউকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা চলে গেলেন। রাণীর কাছে গিয়ে বললেন, আইনষ্টাইন আসেন নি। ঠিক এমনি সময়ে রাণী দেখতে পেলেন, মলিন পোষাকে আবৃত হয়ে একজন হেঁটে আসছেন তাঁর দিকে। কাছে আসতেই চিনতে পারলেন—আইনষ্টাইন স্বয়ং। রাণী বললেন—আমি যে আপনার জন্যে গাড়ী পাঠিয়ে ছিলাম!

মৃদু হেসে আইনষ্টাইন বললেন, তাই নাকি! আমার জন্যে গাড়ী যাবে একথা আমার মনেই হয় নি—তবে হেঁটে আসতে বেশ ভালই লাগলো।

টাকা পয়সার প্রতি কোন লোভ তাঁর ছিল না। তাঁর একটা মূল্যবান বক্তৃতা পুনঃপ্রকাশের জন্যে একটি জার্মান সাময়িক পত্রের সম্পাদক তাঁকে অনুরোধ জানান। তিনি পত্রে একথাও জানিয়ে দেন যে, প্রবন্ধটির জন্যে তিনি এক হাজার মার্ক পারিশ্রমিক দেবেন। প্রত্যুত্তরে আইনষ্টাইন লিখলেন—ঐ প্রবন্ধের জন্যে এক হাজার মার্ক খুব বেশী। যদি আপনি ৬০০ মার্ক দেন তবে আমি ছাপবার অনুমতি দিতে পারি। জার্মান কাগজে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে একটি আমেরিকান কাগজের সম্পাদক তাঁকে জানান যে, কোন একটি বিষয়ের উপর যদি কোন প্রবন্ধ তাঁকে অনুগ্রহ করে দেন, তাহলে তিনি আইনষ্টাইনকে

কয়েক সহস্র ডলার দিতেও প্রস্তুত। এই চিঠি পেয়ে আইনষ্টাইনের চোখে জল এল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এ তো রীতিমত অপমান, এরা কি ভাবে যে আমি সিনেমার ষ্টার, না প্রাইজ নিয়ে লড়ি!' তাকে কোন জবাবই দিলেন না তিনি। এমনি বহু ঘটনা আছে তাঁর জীবনে। কলম্বোতে ভারতীয়দের দেখে তিনি বলেছিলেন—এদের চেহারা ও চলাফেরার মধ্যে আভিজাত্যের গর্ব আছে। কিন্তু এদের ব্যবহারে কেমন যেন নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ পায়। আসলে এরা অভিজাত, কিন্তু পরিণত হয়েছে ভিক্ষুকে।

দর্শন ও সাহিত্যের দিকে তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল। তাঁর প্রিয় দার্শনিকেরা হলেন—প্লেটো, হিউম, স্পিনোজা, শোপেনহাওয়ার। সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি পছন্দ করতেন টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কী, আনাতোল ফ্রাঁস ও বার্নার্ড শ'কে। কবিদের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিলেন—গ্যটে, হাউপ্টম্যান ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র দর্শনেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুর-শিল্পীদের মধ্যে মোজার্ট, বেটোভেন, বাক্-কে তাঁর ভাললাগতো। সবচেয়ে ভালবাসতেন ছোট ছেলেমেয়েদের। তাদের মধ্যে তিনিও ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন। একবার প্রিন্সটনের নাশাও স্ট্রীট দিয়ে চলেছেন—সঙ্গে কয়েকজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক। পথে যেতে দেখলেন একটা লোক আইসক্রীম বিক্রী করছে। হঠাৎ সখ হলো আইসক্রীম খাবার। একটা কিনে ছোট ছেলেদের মত আরাম করে খেতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গী বিজ্ঞানীরা তো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। কিন্তু আইনষ্টাইনের সেদিকে খেয়াল নেই—আইসক্রীম চুষছেন তো চুষছেনই। এই ছিলেন আইনষ্টাইন।

যে জার্মানদের একান্ত অনুরোধে তিনি সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই জার্মেনী থেকেই তিনি নির্বাসিত হলেন, কারণ তিনি ইহুদী। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিল নিজেদের দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকেই তিনি বেছে নিলেন। ১৯৩৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি কোর্টে গিয়ে আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন—আমার কোন দেশ নেই, সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা আমাকে সুইজ বলে, জার্মানরা বলে জার্মান, জার্মান বিরোধীরা বলে সুইজ ইহুদী। অনেক দেশ আমাকে নাগরিক অধিকার দিতে আগ্রহী। আসলে আমি সকল দেশের অধিবাসী, ব্যক্তিগতভাবেও আমি পৃথিবীর সব দেশের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির পরে তিনি বার বার বিশ্বকে জানিয়েছেন বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের কথা। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করবার জন্যে তিনি আবেদন জানিয়েছেন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে। তাঁকে পুরোধা করে লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কর্মধারা সর্বজনবিদিত। আইনষ্টাইনের পরিচয়—তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তিকামী বিজ্ঞানী।

আমেরিকার রকফেলারদের আনুকূল্যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি মনোরম এবং সুবৃহৎ গীর্জা নির্মিত হয়েছে। সেখানে সমস্ত যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ঋষিদের মূর্তি সাজানো আছে। এখানে আছেন যীশু খ্রীষ্ট, মোজেজ, কনফিউসিয়াস, বুদ্ধ প্রভৃতি। এঁদেরই পাশে যে মনীষীর প্রতিমূর্তি বসানো হয়েছে—সেটি আইনষ্টাইনের। এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর শান্তির মহান আদর্শ এবং তাঁর বিশ্বমানবতা তাঁকে ঐ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

ভাইরাসঘটিত রোগ নিবারণ ও চিকিৎসা

• শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

যে সকল উদ্ভিদ থেকে আমরা খাদ্য বা আচ্ছাদন পেয়ে থাকি বা যারা অন্যভাবে আমাদের উপকারে আসে, তাদের মধ্যে কতকগুলির ভাইরাসঘটিত রোগ জন্মে। এই সব রোগ হলে একদিকে তাদের উৎপাদিকা শক্তি, অন্যদিকে তাদের খাদ্য বা অর্থনৈতিক মূল্য কমে যায়। দুটি উপায়ে এই ক্ষতি নিবারণ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে, কতকগুলি গাছকে তাদের শৈশব থেকেই ভাইরাস-মুক্ত অবস্থায় পালন করে তাদের বীজ থেকে ভাইরাস-মুক্ত নতুন গাছ তৈরি করা এবং এইভাবে উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি করে তাদের রক্ষা করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—যে শস্যে ভাইরাসের আক্রমণ সুরু হয়েছে, তাতে ভাইরাস-প্রতিরোধক বা ভাইরাস-নাশক ওষুধের দ্রাবণ 'স্প্রে' করে প্রয়োগ করে ভাইরাসের প্রসার বন্ধ করা। প্রত্যেক গাছেরই একটি নির্দিষ্ট বয়সে ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে, কারণ এই সময়েই বিশেষ জাতীয় কীট বা পতঙ্গ আহার পাবার আশায় গাছকে আক্রমণ করে। সুতরাং কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্যে এই ব্যাপারটি বন্ধ রাখতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। যে বীট গাছের কন্দ থেকে ইউরোপে চিনি তৈরি করা হয়, তার বৃদ্ধিকালের এক অবস্থায় অ্যাফিড জাতীয় পতঙ্গের আক্রমণ নিয়মিতভাবে ঘটে। তাদের বাহিত ভাইরাস বৃদ্ধির ফলে এই গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়। একে হলদে রোগ (Yellow disease) বলে। সুতরাং অ্যাফিডগুলিকে ধ্বংস করাই সিদ্ধিলাভের সহজ উপায়।

অন্য পক্ষে, কোকো ও লেবু গাছে—যা বহু বছর বেঁচে থাকে ও ফল উৎপাদন করে, তাদের পাতায়ও প্রতি বছরেই পোকার আক্রমণ ঘটে। এক্ষেত্রে ভাইরাসকে নির্মূল করা কঠিন হয়, কারণ বীটের মত ক্ষেত থেকে গাছগুলিকে উঠিয়ে ফেলা যায় না ও সেই ভাবে পোকা ও ভাইরাসকে গাছ এবং ক্ষেতের মাটি থেকে দূর করবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

১৯৫৪ সালে হোমস্ (Holmes) দেখান যে, তামাক গাছের মোজেক রোগের ভাইরাস T. M. V-কে দূর করা যায়—এক ভাগ থায়োইউরাসিল ১০,০০০ ভাগ জলে গুলে সেই জল দিনে একবার করে ৪ দিন ধরে পাতায় স্প্রে করলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ হবার একটু আগেই এই কাজ সুরু করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই সব গাছ থেকে যে বীজ পাওয়া যায়, তাথেকে সুস্থদেহ চারাই উৎপন্ন হয়। এজাগুয়ানিন-এর দ্রাবণ প্রয়োগেও এই ফল পাওয়া গেছে। মনুষ্যেতর প্রাণী বা মানব-শরীরে ভাইরাস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই এমন ওষুধ দেওয়া দরকার, যা স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ শক্তি নষ্ট না করে উপসর্গগুলি দূর করতে পারে। এই উপসর্গগুলি ভালভাবে প্রকাশের আগেই ওষুধ ব্যবহারে আরও সুফল ঘটে। ম্যালেরিয়ার ওষুধ মেপাক্রিনের সাহায্যে হার্ষ্ট ও তাঁর সহকর্মীরা এই কাজে প্রথম সাফল্য লাভ করেন।

মানব-শরীরে ভাইরাস রোগের মধ্যে হামজ্বর, মাম্প্স্, হুপিংকাশি, বসন্ত ও জলবসন্ত যুগযুগ ধরে আক্রমণ করে আসছে। কুকুরের দংশনজনিত জলাতঙ্ক রোগও যথেষ্ট পুরাতন। বসন্তের টিকা

বসন্ত রোগকে সহজেই প্রতিরোধ করে, কিন্তু অন্যগুলির উপযুক্ত টিকা বা ভ্যাক্‌সিন বা অন্য প্রকার সাধারণ ওষুধ এতদিন জানা ছিল না। রোগগুলি নিজের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বাড়তো, বিভিন্ন শরীরে প্রবল বা মৃদু উপসর্গের সৃষ্টি করতো এবং কতক রোগীর মৃত্যুও ঘটাতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কতকগুলি আধুনিক ভাইরাস রোগের নাম শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে যকৃৎ প্রদাহ (Infective Hepatitis), হার্পিস এবং ডেঙ্গুজাতীয় কতকগুলি জ্বর, পলিওমায়েলাইটিস, এশিয়াটিক ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং বিশেষ প্রকারের অন্ত্র-প্রদাহ (Enteritis) প্রধান। এছাড়া টিয়াজাতীয় পাখীর কামড়ে জাত সিটাকোসিস (Psitacosis) এবং লিম্ফোগ্র্যান্যুলোমার পরিচয়ও এখন অনেকে পেয়েছেন। এই সঙ্গে কক্স্যাকি ভাইরাসের (Coxsackie A & B) নামও এখন মাঝে মাঝে কানে আসছে

১৯৫৭ সালে সারা পৃথিবীতে এশিয়াটিক ইনফ্লুয়েঞ্জার বিস্তারের ফলে ভাইরাস-ঘটিত রোগ সম্বন্ধে কৌতুহল অতিশয় বাড়ে। এই সম্বন্ধে এই পর্যায়ের তৃতীয় প্রবন্ধে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। কক্স্যাকি ভাইরাসের প্রথম সন্ধান মিলে নিউইয়র্কের কাছে Coxsackie সহরে। শীঘ্রই এর দুইটি প্রকারের কথা জানা যায়। প্রথমটি জ্বরে মাথা ধরা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটবার পর যে দুর্বলতার সৃষ্টি করে, তা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

দ্বিতীয়টি নানারকম পেশী, বেদনা, প্লুরিয়া, বুক ও পেটে দারুণ বেদনা ঘটায়। এই সব লক্ষণ ২।৩ মাস স্থায়ী হতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানতঃ উদরাময়, বমি ইত্যাদিই প্রবল হয়।

সালফা এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলি ব্যাক্টি-রিয়া-ঘটিত রোগে যথেষ্ট উপকার করে বলে ভাইরাস রোগেও তাদের প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সালফা প্রয়োগে সুফলের বদলে কুফলের সম্ভাবনাই বেশী। অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিকও এসব রোগে নিষ্ফল। একমাত্র সিটাকোসিস ও লিম্ফোগ্র্যান্যুলোমা রোগে ক্লোরোমাইসেটিন এবং টেট্রাসাইক্লিন পর্যায়ের ওষুধগুলির সুফল প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুসারে পুরাতন মতে চিকিৎসাই অধিকাংশ ডাক্তারের মতে ভাল।

সিটাকোসিস রোগ টিয়া ও কাকাতুয়া জাতীয় অনেক পাখীর কামড়ে হয়। যাঁরা এদের পোষেন, তাঁরা অনেক সময় আদর করে এদের চুমো দিতে গিয়ে কামড় খান। তার ফলে কয়েক দিন পরে জ্বর সুরু হয়, ক্রমে ফুস্‌ফুস-প্রদাহ এবং গুরুতর নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। টিয়া ছাড়া অন্য গৃহপালিত পাখী—এমন কি, পায়রা থেকেও এই রোগ মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

লিম্ফোগ্র্যান্যুলোমার আগে নাম ছিল হজকিন্স রোগ। পুরুষ বা স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের কাছে ক্ষতের আকারে প্রথমে প্রকাশ পায়, স্থানীয় লিম্ফ গ্রন্থিগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে তাদের প্রদাহ সৃষ্টি করে। এতেও জ্বর হয়। সাধারণ ওষুধে কোন উপকার ঘটে না।

পলিওমায়েলাইটিস প্রধানতঃ শিশু ও বালকের রোগ। সাধারণতঃ শ্বাসযন্ত্র বা পাকনালীতে প্রদাহের আকারে এর প্রথম প্রকাশ। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক দিনের পরে আপনিও সারে বা লক্ষণ অনুসারে সাধারণ ওষুধে সারে। কিন্তু অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে এই রোগ মস্তিক ও স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। কারুর কারুর এই প্রদাহ পক্ষাঘাত ঘটায়। একে Anterior Poliomyelitis বলে। অনেক দেশেই একসঙ্গে এই রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। এর ফলে কয়েকটি মাংসপেশী বা কোন অঙ্গের পক্ষাঘাত ঘটে। রোগের গোড়ায় জ্বর, পেটের গোলমাল এবং আক্রান্ত পেশীতে বেদনা হবার পর অঙ্গের পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। পেশী-

গুলি ক্রমে অবশ, শীর্ণ, দুর্বল এবং অক্ষম হয়ে পড়ে। আক্রান্ত পেশীগুলির সঙ্কোচনের ফলে অঙ্গটি বেঁকে যায় ও বেঁকে থাকে। আগে একেই Infantile paralysis বলা হতো।

পলিওমায়েলাইটিসের জন্যে দুই রকম ভ্যাকসিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বছর পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হয়েছে। এদের নাম স্যাল্ক ভ্যাক্সিন ও সেবিন ভ্যাক্সিন। দুটিই বহু লক্ষ শিশু ও বালককে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাতে কোন রকম কুফল দেখা যায় নি, পরন্তু এই সব শিশু ও তরুণকে ভ্যাক্সিন দেবার পরে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় নি। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এই ভ্যাক্সিন যথেষ্ট তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে অনেকেই দেখেছেন যে, রুশ সরকার ভ্যাক্সিন ভারতে পাঠিয়েছেন।

সম্প্রতি হামজ্বরের উপযুক্ত ভ্যাক্সিন তৈরির চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র সফল হয়েছে। যদিও এখনও পরীক্ষামূলকভাবে এর প্রয়োগ হচ্ছে। কিন্তু আশা আছে যে, শীঘ্রই প্রচুর প্রস্তুতির ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই একে পরীক্ষা ও ব্যবহারের জন্যে পাঠানো হবে। এতেও কোন কুফলের কথা এ-পর্যন্ত শোনা যায় নি। মুর্গীর ডিমের মধ্যে এই রোগের ভাইরাসকে বারবার কালচার করবার ফলে ক্ষীণীকৃত ভাইরাস এই ভ্যাক্সিনের প্রধান উপাদান।

ডেঙ্গু, সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কক্সাকি বা এন্টারো-ভাইরাস প্রতিষেধক ওষুধ বা ভ্যাক্সিনের কথা এখনও শোনা যায় নি। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্দির উপযুক্ত ভ্যাক্সিন তৈরির চেষ্টা যথেষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু এই দুটি ভাইরাস নিজেদের প্রকৃতি এমন পরিবর্তন করতে পারে যে, এক আক্রমণের সময়ে তৈরি ভাইরাস পরের আক্রমণের সময় কার্যকরী হয় না। বলা বাহুল্য এই রোগগুলি পৃথিবীর সকল দেশে অসংখ্য লোককে আক্রমণ করে, সুতরাং প্রকৃতই উপকার করে, এমন ওষুধের চাহিদাও প্রচুর হবে এবং তার প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা লাভবান হবেন যথেষ্ট।

স্থলপথে অনধিগম্য স্থানে রসদাদি পরিবহনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের লোকেরা ফাইবার-গ্লাসে নির্মিত একপ্রকার পরিবহন-যানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখছেন। গভীর জলে লোক পারাপারের জন্যেও এটিকে জোড়া বোটের মত ব্যবহার করা যায়।

সঞ্চয়ন

কলেরা-চিকিৎসার ক্ষেত্রে উন্নতি

বর্তমান যুগে রোগ নিরাময়ের মূলে রয়েছে দুটি বিষয়—নতুন নতুন আবিষ্কার এবং চিকিৎসা-পদ্ধতির কার্যকরী প্রয়োগ। কিন্তু কোন কোন রোগ, যেমন—ক্যান্সার আজও রহস্যই রয়ে গেছে। অন্যান্য অনেক রোগের চিকিৎসা ও নিরাময়ের পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ এবং তার প্রতিরোধের উপায় আমরা এখন জানি। কিন্তু কার্যকরীভাবে তার প্রয়োগই হচ্ছে সমস্যা। ট্রকোমা রোগ সম্পর্কেও একথা খাটে। এই রোগ নিরাময়ের পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু কার্যকরীভাবে তাদের প্রয়োগের পথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধরণের আর একটি রোগ হচ্ছে কলেরা। সম্প্রতি ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রে এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। এরকম মহামারী কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়ায় দেখা যায় নি। মার্কিন নৌবাহিনীর ছয় জন চিকিৎসককে নিয়ে ডাঃ রবার্ট ফিলিপ্‌স্ রোগসংক্রমণ, প্রতিরোধ ও রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্যে বিমানযোগে সায়গনে যান। তিনি বলেছেন, ভিয়েৎনাম এবং সায়গনে ১৬০০০ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ১৩ হাজার রোগীর মৃত্যু ঘটেছে; অর্থাৎ মৃত্যুর হার শতকরা আশী জন।

কলেরা যখন মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন সাধারণতঃ এরকমই হয়ে থাকে। রোগের আক্রমণ অতি দ্রুত হয়ে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে এত দ্রুত মৃত্যুর কোন কারণই থাকে না। এবিষয়ে অনেক কিছুই করবার আছে।

এই রোগের চিকিৎসা-প্রণালীও অপেক্ষাকৃত সহজ। মানবদেহের লবণসমূহ, যাকে বলা হয় ইলেকট্রোলাইট এবং কলেরারোগীর দেহ থেকে যে জল বেরিয়ে যায়, সেই জল পূরণ করাই হচ্ছে এই রোগের চিকিৎসা। যখন মহামারী লাগে, তখন চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলাই হচ্ছে সমস্যা। কলেরা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। প্রথম প্রাদুর্ভাবের দু-একদিনের মধ্যেই এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে। এই রোগীর দেহ থেকে যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়ে যায়, তা পূরণ করবার জন্যে চিকিৎসা-কেন্দ্রসমূহের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬২ সালে কলিকাতায় কলেরার প্রকোপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সময়ে বালটিমোরের জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনুসারে আমেরিকার ন্যাশন্যাল হেল্‌থ্‌ ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় পাঁচজন ভারতীয় এবং পাঁচজন মার্কিন চিকিৎসক কলিকাতার সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালসমূহে কলেরারোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। মার্কিন চিকিৎসকদের নেতা জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ডাঃ সি. সি. জে. কার্পেন্টার কলেরার চিকিৎসা সম্পর্কে বলেছেন যে, এই রোগ-চিকিৎসায় সফল হতে হলে রোগীর দেহ থেকে যে পরিমাণ তরল পদার্থ নির্গত হয়ে থাকে, তা পূরণ করবার ব্যবস্থা করতেই হবে—এটি একান্ত আবশ্যক। তিনি দেখেছেন, আইসোটোনিক সেলাইন এবং আইসোটোনিক ল্যাকটিক ইনজেকশন এই রোগ-চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে রোগীকে ডাবের জল খেতে দিতে হবে। যথোপযুক্ত পরিমাণ লবণ মিশিয়ে ইনজেকশন দিলে

তা রক্তের লোহিত কণিকাকে অপরিবর্তিত রাখে, অর্থাৎ তার রঞ্জক উপাদানকে বের হতে দেয় না। তাছাড়া রোগীর দেহ থেকে মলের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে জল ও ইলেকট্রোলাইট নির্গত হবার ফলে রক্তের চাপ হ্রাস পেয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সেলাইন ইনজেকশনে রক্তের চাপ আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। আর ল্যাকটেট বা ল্যাকটিক অ্যাসিডের লবণ ইনজেকশন দেবার ফলে রক্তের ক্ষারীয় অংশের পূরণ হয়ে থাকে। বাইকার্বোনেট নিঃসৃত হবার জন্যে কলেরারোগীর রক্তে ক্ষারীয় অংশও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

সায়গনে কলেরারোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে, এই খবর আমেরিকায় পৌঁছবার পর মার্কিন সাহায্য-মিশন রোগার্তদের সাহায্যের জন্যে পাঁচ লক্ষ ডলার প্রেরণ করেন। এই অর্থ-সাহায্য ব্যতীত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাও বিপুল পরিমাণে ঔষধ-পত্র ঐ অঞ্চলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন এবং ভিয়েৎনামী চিকিৎসককে এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ভারত, জাপান, ফিলিপাইন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মাত্রার কলেরারোগের টিকা ভিয়েৎনাম ও সায়গনে প্রেরিত হয়। এছাড়া আমেরিকার বহু বেসরকারী ভেষজ সংস্থা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রোগ-চিকিৎসার অন্যান্য বহু সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। এই মহামারীর খবর পেয়েই তাইপেস্থিত মার্কিম নৌবাহিনীর রিসার্চ ইউনিটের ছয় জন চিকিৎসকের একটি দল নিয়ে ডাঃ ফিলিপ্‌স্‌ সায়গনে আসেন। প্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাদেরই অন্যতম ছিলেন ডাঃ ফিলিপ্‌স্‌। এখানে এসেই অন্যান্য চিকিৎসক দলের সঙ্গে তাঁরা অবিলম্বে সায়গনের চো কোয়ান সংক্রামক রোগের হাসপাতালে এই রোগের চিকিৎসা যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, তার ব্যবস্থা করেন এবং ভিয়েৎনামী চিকিৎসকবর্গকে সর্বাধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ট্রেনিং দেন।

ডাঃ ফিলিপসের নেতৃত্বাধীনে চিকিৎসকের এই দলটি দশ বছর ধরে নিকট ও দূরপ্রাচ্যে সাক্রামক ব্যাধি নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন। ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, তাইওয়ান, ফিলিপাইনস্‌, হংকং, বোর্ণিও, মালয় এবং মিশরে হাজার হাজার কলেরারোগীর চিকিৎসা তাঁরা করেছেন। এশীয় চিকিৎসকেরাও তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এই বিপুল অভিজ্ঞতার ফলে এবং ডাঃ ফিলিপ্‌স্‌ও তাঁর দলবলের চেষ্টায় কলেরা-চিকিৎসার আর এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

ডাঃ ফিলিপ্‌স্‌ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ১৯৪৭ সালে কায়রোতে, ১৯৫৮ সালে ব্যাংকক ও ঢাকায়, তারপর থেকে ম্যানিলা এবং অন্যান্য দেশের মহামারীকালে কলেরা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ফলে কলেরারোগীর দেহ থেকে জল ও ইলেকট্রোলাইট নিঃসরণের প্রকৃত কারণ ও অর্থ যে কি, তা আমরাই প্রথম সঠিকভাবে নির্ধারণ ও উপলব্ধি করতে পেরেছি। এজন্যে দেহের ঐ ক্ষতি পূরণ করবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনও সম্ভব হয়েছে। একেবারে সঠিক চিকিৎসা-পদ্ধতিই উদ্ভাবিত হয়েছে। পদ্ধতিটি খুব সহজও বটে। আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি, রোগী যদি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত না হয় অথবা তার যকৃৎ বা বুকের কোন রোগ না থাকে, তবে কলেরারোগী মাত্র প্রাণটুকু নিয়ে হাসপাতালে এলেও বর্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সে বেঁচে যাবে; অর্থাৎ রোগীর দেহে কি পরিমাণ জল ও কত প্রকার লবণের প্রয়োজন, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করে ইনজেকশনের সাহায্যে ঐ পরিমাণে ঐ সব লবণ রোগীকে দেওয়াই হলো এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। এতে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

বর্তমানে চিকিৎসকেরা ঐ রোগের চিকিৎসা-

পদ্ধতি ভাল করে জানা সত্ত্বেও কেন কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়? চিকিৎসার যথেষ্ট উপকরণ ও যথেষ্ট সুশিক্ষিত চিকিৎসকের অভাবই এই সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বার কারণ। এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গেই সঙ্গে গ্রাম ও সহর থেকে সহজে যাতায়াত করা যায়, এরকম স্থানে সুশিক্ষিত চিকিৎকের অধীনে চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত চিকিৎসার উপকরণ রাখাও আবশ্যক।

সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি নতুন প্রকল্প

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাশূন্যাভিযানের ক্ষেত্রে যে সব বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার ফলে গ্রহমণ্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে—বিশেষতঃ উল্কাকণা আর গ্রহাণুপুঞ্জের কণা এবং গ্রহান্তরে প্রেরিত ও সেখান থেকে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের অনুশীলন থেকে এরকম মনে করবার কারণ ঘটেছে যে, সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে একটি কোন একক প্রক্রিয়ার ফলে। এই প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে কোন এক অতি-তারকার (সুপারনোভা) বিস্ফোরণজনিত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয়।

আমাদের এই সৌরমণ্ডল যে ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত, তার বয়স অন্ততঃ ১০ থেকে ১২ শত কোটি বছর। অন্যান্য ছায়াপথের মত এই ছায়াপথেও অনবরত নতুন নতুন তারকার সৃষ্টি হচ্ছে—হাল্কা উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে ভারী বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। যেমন সাধারণ তারকার অভ্যন্তরে—যেখানে তাপাঙ্ক হলো কয়েক লক্ষ ডিগ্রি, সেখানে হাইড্রোজেন অনবরত হিলিয়ামে এবং হিলিয়াম থেকে আরও ভারী পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। সবচেয়ে ভারী তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির উদ্ভব হয় কোটি কোটি ডিগ্রি তাপাঙ্ক ও প্রচণ্ড চাপে। ছায়াপথে এসব ব্যাপার ঘটতে পারে একমাত্র সুপারনোভা বা অতি-তারকার বিস্ফোরণের ফলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় যেগুলিকে 'নোভা' বলা হয়, সেই সব তারকা, যেগুলিকে পৃথিবী থেকে দেখবার সময় হঠাৎ সাময়িকভাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল আর স্ফীতকায় হয়ে ওঠে, তাদের অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কারণ হলো আকস্মিক আভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপ বৃদ্ধিজনিত বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলে বিপুল পরিমাণে গ্যাসীয় পদার্থ ও শক্তি মুক্তি পায় এবং তারপরে নোভাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বামন-তারকা বা 'ডোয়ার্ফ ষ্টার'-এ পরিণত হয়। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে সেই নিঃসরিত গ্যাসীয় পদার্থ শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। ভারী তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি হয় সুপারনোভার বিস্ফোরণের ফলে—যেটা কল্পনাতীত রকমের প্রচণ্ড। আমাদের ছায়াপথে এই রকম সুপার-নোভার বিস্ফোরণ ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে।

এই অতি-তারকা বা সুপোরনোভার বিস্ফোরণের ফলে ইউরেনিয়ামের ভারী আইসোটোপ ইউ-২৩৮-এর চেয়ে হাল্কা আইসোটোপ ইউ-২৩৫ বেশী পরিমাণে উদ্ভূত হয়। এই দুই আইসোটোপের আপেক্ষিক পরিমাণ আর ক্ষয়ের হার সম্পর্কে হিসেব করা যায়। সৌরমণ্ডলের আবির্ভাবের কয়েক শত-কোটি বছর আগে যে ওই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা মনে রেখে ওই হিসেব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়—উল্কাপিণ্ড আর পৃথিবীর ত্বক যে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসে গঠিত, তার শেষ প্রক্রিয়াটি ঘটে গেছে ৪·৫ থেকে ৫ শত-

কোটি বছর আগে। দেখা যাচ্ছে, গ্রহাণুপুঞ্জের ক্ষয়-পাওয়া পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে উল্কাপিণ্ড, তারও সর্বোচ্চ বয়স প্রায় ৪৫ শত কোটি বছর।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে, উল্কাপিণ্ডের বয়সের সঙ্গে সেই উল্কা, পৃথিবী ও সূর্যের উপাদানের ভারী মৌলিক পদার্থগুলির গঠনের তারিখের আশ্চর্য মিল আছে। অর্থাৎ সূর্য ও গ্রহগুলির জন্ম হয়ে থাকবে নিশ্চয় কোন একক প্রক্রিয়ার ফলে এবং সেই একক প্রক্রিয়াটির সহায়তা করেছে এক অতি-তারকার বিস্ফোরণ।

এই ব্যাপারটিকে মিলিয়ে দেখা হয় কতকগুলি ক্ষয়শীল বস্তু থেকে উদ্ভূত ক্ষণস্থায়ী এবং বর্তমানে বিলুপ্ত আইসোটোপের অনুশীলন করে। যেমন, ট্যালিয়াম-২০৫—যেটা বিটা-ক্ষয়ের ফলে সীসা-২০৫-এ রূপান্তরিত হয়েছে; প্যালাডিয়াম-১০৭—যেটা অনুরূপভাবে রৌপ্য-১০৭-এ পরিণত হয়েছে; আয়োডিন-১২৯—যেটা পরিণত হয়েছে জেনন-১২৯-এ। প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারী পদার্থের গঠন আর গ্রহাণুপুঞ্জে বস্তুর কঠিন রূপ প্রাপ্তি—এই দুইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো ২০ থেকে ৩০ কোটি বছর। আমাদের সৌরমণ্ডলের বয়সের তুলনায় এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার—সমগ্রভাবে আমাদের ছায়াপথের বয়সের তুলনায় তো বটেই!

ক্ষণজীবী আইসোটোপগুলির প্রত্যেকটির অনুশীলন থেকে এই যে মিল দেখা গেল, সেটাকে আকস্মিক মিল বলে মনে করা যায় না।

অতি-তারকার বিস্ফোরণের ফলে যে অভিঘাত তরঙ্গের (ইমপ্যাক্ট ওয়েভ) সৃষ্টি হয়, তা মহাশূন্য দেশের অন্তর্বর্তী বস্তুকে গ্যাস ও নীহারিকার ধূলি-কণায় পরিণত করে। এই ধরণের বিস্ফোরণ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালেই ঘটেছে সোয়ান তারামণ্ডলে। সেই বিস্ফোরণের যে সব আলোচিত্র এপর্যন্ত নেওয়া হয়েছে, পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে ধারাবাহিক ভাবে সে সব আলোকচিত্র মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে—নীহারিকার উপাদান-কণাগুলি একটি কেন্দ্র থেকেই ব্যাসার্ধ বরাবর সেকেণ্ডে ১০ থেকে ২০ কিলো-মিটার বেগে ছুটে চলে। ওই কেন্দ্রটি বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গ নিঃসরণের একটি খুব শক্তি-শালী উৎস। তার বাইরে এক ধূলি-মাধ্যমের আবরণ। যে অভিঘাত তরঙ্গের ফলে তাদের সৃষ্টি, সেগুলিই তাদের সংনমিত করেছে এবং ওই বাইরের আবরণ হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে।

সম্প্রতি কাজাকস্তানের বিজ্ঞান পরিষদের জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা ইনষ্টিটিউটের মানমন্দিরের গবেষকেরা ওই ধূলি-মাধ্যমের মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক গঠনোন্মুখ তারকাকেন্দ্র (ফর্মেটিভ ষ্টার সেণ্টার)—যা পরে তারকায় পরিণত হবে—আবিষ্কার করেছেন। এর অর্থ—অতি-তারকার বিস্ফোরণ তার গ্যাস ও ধূলিকণার আবরণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং স্থানীয়ভাবে যে চাপ সৃষ্টি করে, তারই ফলে তারকার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই তারকা ও গ্রহের-উপাদান ভারী মৌলিক পদার্থেরও সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে ওই গঠনোন্মুখ তারকা-কেন্দ্রগুলি থাকে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলিত রূপে (ষ্টার চেন)। তারপর পরিণতির সঙ্গে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনভাবে একই প্রক্রিয়ার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।

এসব তারকার চারদিকে পরিক্রামরত গ্রহগুলিকে অবশ্য তাদের অতি ক্ষীণ ভাস্বরতার দরুণ দেখা যায় না। কিন্তু বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব তথ্য থেকে আমরা এখন মোটামুটি বলতে পারি যে, সৌরমণ্ডলের উদ্ভবকালে প্রাথমিক অবস্থাটা কিরূপ ছিল।

কড্‌লিভার অয়েলের কথা

কড্‌লিভার অয়েলের গুণের কথা কে না জানে। দুর্বল শিশুকে কোন কিছু ওষুধ খাওয়াবার আগে মায়েরা প্রথমেই চিন্তা করে থাকেন কড্‌লিভার অয়েলের কথা।

এখন এই কড্‌লিভার অয়েলকে আরও কতদিকে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা চলছে

হালের অন্তর্গত মারফ্লিট—বৃটেনের পূর্ব উপকূলের একটি প্রধান মৎস্য-শিকারের বন্দর। এখানে বৃটিশ কড্‌লিভার অয়েল কোম্পানী এই তেল উৎপাদনের জন্যে বিশ্বের বৃহত্তম প্রোসেসিং কারখানাটি পরিচালনা করছেন। গত কয় বছরে এই প্রতিষ্ঠানটি একরকমের অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ কড্‌লিভার অয়েল প্রস্তুত করেছেন, যা পুষ্টির দিক দিয়ে অতীব মূল্যবান বলে সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নানা ধরণের অয়েল ইতিমধ্যে দেখা গেছে, যেমন—বেকারি এবং কনফেকশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যে খাদ্যোপযোগী ফ্যাট এবং শ্রমশিল্পে ব্যবহারের জন্যে তৈলজাত পদার্থসমূহ। এগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রও ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে।

রাসায়নিক দিক থেকে কড্‌লিভার অয়েল একরকমের সামুদ্রিক জান্তব তেল। এ হলো বহু রকমের তৈলাক্ত অ্যাসিডসমূহের গ্লিসারাইডগুলির জটিল মিশ্রণ, যার মধ্যে অসম্পৃক্ত তৈলাক্ত অ্যাসিডসমূহ বেশীমাত্রায় বর্তমান। এগুলি পরে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাকালে অক্সিডাইজ করা হয়, যার ফলে তেল টকে যায় এবং স্বাভাবিক ভিটামিন-শক্তি হ্রাস পায়।

অসম্পৃক্ত তৈলাক্ত অ্যাসিড এবং ভিটামিনের শক্তিকে স্থিতিশীল করবার ব্যাপারটা ক্রমশঃ সমস্যার রূপ নেয়, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করেছেন বৃটিশ কড্‌লিভার অয়েল কোম্পানী। এখন এমন তেল তাঁরা বাজারে ছাড়ছেন, যার ভিটামিন-শক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁরা রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁদের নতুন স্বয়ংক্রিয় কারখানাটিতে এখন এই কাজ চলছে।

উনিশ শতকে সাধারণভাবে সকলে কড্‌লিভার অয়েলকে শক্তি-হ্রাসকারী রোগের একমাত্র ওষুধ বলে মনে করতো, কিন্তু এই শতকে তার অন্য রকম মূল্যও স্বীকৃত হয়েছে। এর উপাদানগুলির মধ্যে আছে ভিটামিন এ, ডি এবং ই।

ভিটামিন-এ-র কাজ হলো সাধারণভাবে স্বাস্থ্য, হাড়ের গঠন, চামড়ার স্বাস্থ্য এবং চোখের দীপ্তি নিয়ে।

ভিটামিন-ডি অথবা 'সূর্যালোক' ভিটামিন-এর সম্পর্ক হলো ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের মেটাবোলিজম নিয়ে—হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধির সঙ্গেও সম্পর্কিত।

ভিটামিন-ই-র গুরুত্ব রয়েছে আভ্যন্তরীণ শারীরিক ক্ষরণক্রিয়ার ব্যাপারে এবং সাধারণভাবে পশুর, বিশেষতঃ রেসের ঘোড়ার ক্লান্তি দূর করবার ব্যাপারে।

এই তেলের ভিটামিনের মূল্য বহুকাল ধরে সকলেরই জানা। কিন্তু এর অন্যান্য উপাদানের মূল্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে স্বীকৃত হয়েছে। এই সব উপাদানের মধ্যে আছে অতিমাত্রায় অসম্পৃক্ত তৈলাক্ত অ্যাসিডসমূহ, অন্যান্য এষ্টার (Esters) ও আয়োডিন।

এই পদার্থগুলি অ্যালার্জির উৎস বলে সকলে মনে করেন। কোষের মেটাবলিজম বা বিপাক সম্পর্কেও এগুলির কাজ লক্ষণীয়। রক্তে বাহিত যে পদার্থগুলি মানুষের হৃদ্‌রোগের কারণ হয়, তা দমন করতেও এগুলি সাহায্য করে; আর্থ্রাইটিসের ন্যায় রোগ ও কোন কোন চর্মরোগের উপশম করে।

আরও অনেক চমকপ্রদ উপাদান আছে এর

মধ্যে। কড্‌লিভার অয়েল যক্ষ্মারোগেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং তা রোগের গতি মন্থর করতে সাহায্য করে। রোগ নিরাময়ের উপাদান এর মধ্যে যথেষ্ট। ক্রত পূর্ণতা সম্পাদনও এর একটা বড় গুণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। পুষ্টির অভাব আফ্রিকা, ভারত এবং এশিয়ার একটি বড় অংশে এবং এমন কি, ইউরোপের দরিদ্রতর অংশগুলিতেও রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত খাদ্য হিসাবে কড্‌লিভারের মূল্য অপরিসীম।

কড্‌লিভার অয়েলের চাহিদা বিশ্বব্যাপী হয়েছে। মারক্লিটের শোধনাগার থেকে কড্‌লিভার অয়েল বাক্সবন্দী হয়ে প্রতিদিন যাচ্ছে হংকং ও আবিদাজাম, সিঙ্গাপুর ও বেইরুট, নাইরবি ও কেপ-টাউন, এডেন ও মোম্বাসা, কুয়াইট ও বোম্বাই।

এই মহামূল্যবান তেলের উৎস হলো কড্‌ মাছ। এই কড্‌ মাছ পাওয়া যায় একমাত্র উত্তর আটলান্টিক এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে।

এদের ডিম ছাড়বার সময় হলো জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। অসংখ্য ছোট ছোট ডিম একটি স্ত্রী-কড্‌ একসঙ্গে ছাড়তে পারে এবং একবারে একটি কড মাছের ডিমের সংখ্যা হতে পারে ১০,০০০,০০০। এই ডিমগুলি জলের উপর ভেসে বেড়ায়। বহু রকমের শত্রুর আক্রমণ হয় এগুলির উপর। একটি মাছ ছয় ফুট পর্যন্ত বড় হতে চার বছরের মত সময় নিয়ে থাকে এবং এর ওজন হতে পারে ১০০ পাউণ্ড (৪৫ কিলোগ্র্যাম) পর্যন্ত।

কডের তেল এবং তার উপাদানগুলির ব্যাপকতর ব্যবহার সম্পর্কে এখনও নানা রকম গবেষণা চলছে।

চন্দ্রলোকে গমনের প্রস্তুতি

সোভিয়েট রাশিয়া সাত বছর আগে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিল। মানুষের গ্রহান্তরযাত্রার এই হলো প্রথম উদ্যোগ।

রাশিয়ার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের চার মাস পরে প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। সেদিন জুপিটার-সি নামে রকেটের সাহায্যেই সেই উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। রকেটটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ ফুট এবং উপগ্রহসহ রকেটের মোট ওজন ছিল ৬৮ হাজার পাউণ্ড আর ঐ রকেটের শেষ পর্যায়সহ কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ছিল ৩০·৮ পাউণ্ড। এটি ছিল নানা যন্ত্রপাতিতে ভর্তি একটি সিলিণ্ডারের মত।

রকেট-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকা পিছিয়ে আছে, এরকম ধারণা তখন অনেকেই পোষণ করতেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুকাল ধরে বিভিন্ন গ্রহ অভিমুখে কয়েকটি তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করায় এই ধারণা অনেকখানি বদলে গেছে। সম্প্রতি অষ্টম রেঞ্জার নামে মার্কিন উপগ্রহটির চাঁদে অবতরণ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উপগ্রহের যন্ত্রপাতি চাঁদের খুব কাছে থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সপ্তম রেঞ্জার নামে এই ধরণের আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহও গত গ্রীষ্মকালে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি গ্রহণ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিল। মানুষের গ্রহান্তর যাত্রা আর কল্পনা মাত্র নয়। কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ মানুষের গ্রহলোক গমনের কল্পনাকে আজ বাস্তবে পরিণত করতে চলেছে। মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে আর একটি মার্কিন উপগ্রহ ধাবমান। আমেরিকায় রকেট-বিজ্ঞানের উন্নতিই তা সম্ভব করে তুলেছে।

অষ্টম রেঞ্জার নামে মার্কিন উপগ্রহটি যে

স্যাটার্ণ রকেটের সাহায্যে সম্প্রতি চাঁদে প্রেরিত হয়েছে, তার দৈর্ঘ্য ১৮৮ ফুট এবং কৃত্রিম উপগ্রহসহ সম্পূর্ণ রকেটটির ওজন ১১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড। আর স্যাটার্ণ রকেটের শেষ পর্যায়সহ কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ২৩ হাজার ২ শত পাউণ্ড।

বর্তমানে স্যাটার্ণ রকেটের চেয়েও শক্তিশালী রকেট নির্মাণের তোড়জোড় আমেরিকায় চলছে। এই সকল রকেটের সাহায্যেই ১৯৭০ সাল নাগাদ মনুষ্যবাহী মহাকাশযান চাঁদে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রলোক যাত্রা সংক্রান্ত কাজকর্মের অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও সপ্তম ও অষ্টম রেঞ্জারের চাঁদে অবতরণ ও পৃথিবীতে চন্দ্রপৃষ্ঠ সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ বিশেষ আশার সঞ্চার করেছে।

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী অষ্টম রেঞ্জার চাঁদের উপরিভাগ সম্পর্কে সাত হাজার আলোকচিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। চন্দ্রপৃষ্ঠ সমতল, না বন্ধুর এবং তা কতখানি ভর নিতে সক্ষম ইত্যাদি তথ্য ঐ সকল কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এই সকল এবং এর আগে সপ্তম রেঞ্জারের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র থেকে মনে হয়, চাঁদের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত সমতল। অনেকে বলেছেন, এর উপরিভাগ পার্বত্য ও বন্ধুর হওয়া সম্ভব। এই সকল আলোকচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও তথ্য সন্ধানের উপরেই নবম রেঞ্জার প্রেরণের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির হবে। অতি শীঘ্রই ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে রেঞ্জার পর্যায়ের শেষ উপগ্রহটি প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে তা নির্ভর করছে, আবহাওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর।

চাঁদের উপরিভাগের গঠন সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা নিরসনের জন্যে রেঞ্জার পর্যায়ের পর সার্ভেয়ার নামে এর চেয়েও উন্নত ধরণের এবং বৃহত্তর মহাকাশযান চাঁদে প্রেরিত হবে। প্রথম সার্ভেয়ার জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ এই বছরের শেষ দিকেই প্রেরিত হবে। এটি আপন কক্ষপথে চাঁদ পরিক্রমাকালে চাঁদের আলোকচিত্র গ্রহণ করবে। এর পর যে সকল সার্ভেয়ার উপগ্রহ প্রেরিত হবে, সেই সকল উপগ্রহ থেকে যন্ত্রপাতি সমন্বিত আধার চাঁদের উপর ধীরে ধীরে নামানো হবে। এই সকল আধারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাঁদের উপরিভাগের গঠন ও ভর সইবার ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্যাদি এবং আলোকচিত্রসমূহ পৃথিবীতে প্রেরিত হবে।

১৯৫৭ সালে মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পর আমেরিকার এই পথে এগিয়ে যাবার জন্যে আত্মসমীক্ষায় ব্রতী হতে হয়েছে। তার সাধারণ শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা মহাকাশ-যুগের উপযোগী কি না এবং শিল্প সংস্থা ও গবেষণাগারসমূহ এই ধরণের কাজে প্রবৃত্ত হবে কি না ও মহাকাশসংক্রান্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হবে কি না—সে বিষয়ে গভীরভাবে পর্যা-লোচনা করতে হয়েছে।

এজন্যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং হাজার হাজার বিদ্যালয়ে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকেই অঙ্কশাস্ত্র অনুশীলনের নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে নতুন নতুন কম্পিউটার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের জগতে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংক্রান্ত শিল্পে আজ ৩০০০০ নরনারী নিযুক্ত রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে বিশ লাখেরও বেশী। বহু নতুন নতুন বস্তুগুলি এর ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে।

এক কথায়, মহাকাশ যুগ এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন। স্যাটার্ণ রকেটের আলোকচ্ছটা মহাকাশযাত্রার অগ্রগতির পথই মাত্র আলোকিত করে নি, মানুষ এই পথেই এই সীমায় ঘেরা পৃথিবীতে যে নতুন আর এক জগতের তোরণদ্বারে এসে পৌঁচেছে, তাও উদ্ঘাটিত করেছে।

রেডার

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়

রেডার এখন জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশেষ পরিচিত নাম। বিশেষ করে চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে ভারতের সীমান্ত বরাবর রেডার স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর থেকে রেডার নামটি অপরিচিত থাকবার কথা নয়। কিন্তু রেডার কি, এর কাজ কি এবং কিভাবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা খুব অল্প লোকেরই থাকা সম্ভব। কেন না, রেডারের প্রচার খুব ব্যাপক নয়, তাছাড়া এর ব্যবহার কেবল আবহাওয়া বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিমান চলাচল, নিয়ন্ত্রণ ও বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার ব্যাপারে রেডারের ব্যবহার সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দমদম বিমান বন্দরেই দ্বিতীয় রেডার স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

যন্ত্রটির নামকরণ প্রথমে করেছিলেন বৃটিশ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন রেডিও লোকেশন অ্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডস; কিন্তু এই নাম অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। তাই মার্কিন বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন রেডার। এটা সংক্ষিপ্ত নাম। পুরা নাম হলো—Radio Direction and Range.

রেডার হলো এমন একটি বেতার যন্ত্র, যার সাহায্য নিয়ে আকাশে কোন বিশেষ বস্তুর অবস্থিতি ও গতি ইত্যাদি জানা যায়। রেডার যন্ত্রের সাহায্যে বিমানকে যে লক্ষ্য করা হচ্ছে বা তার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে—এই কথাটা বিমানচালকও জানতে পারেন না, যদি তিনি আগে থেকে জানতে না পারেন যে, তিনি কোন রেডার যন্ত্রের এলাকার মধ্যে এসে পড়েছেন।

রেডারকে প্রধানতঃ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—(১) প্রাইমারী। (২) সেকেণ্ডারী। সেকেণ্ডারী রেডারে কিন্তু এক সঙ্গে প্রক্ষেপণ ও গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর (বিমান) সহযোগিতা দরকার হয়; অর্থাৎ রেডার ষ্টেশন থেকে যা প্রক্ষেপণ করা হবে, বিমান থেকে তা গৃহীত হবে এবং বিমান থেকে তার অবস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রক্ষেপ করলে ভিন্ন যন্ত্রে তা রেডার ষ্টেশন গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রাইমারী রেডার যন্ত্রে দুটা কাজই এক সঙ্গে হয়ে থাকে। তাই প্রাইমারী সেটগুলিকে ট্র্যান্সরিসিভিং সেট বলা হয়। এই প্রাইমারী সেট আবার দু-রকমের আছে; যথা—(ক) সারভিলেন্স (Surveillance) ও (খ) প্রিসিশন অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল রেডার (Precision Approach Control Radar)।

সারভিলেন্স রেডারের কাজ প্রধানতঃ তার সীমানার মধ্যে কোন বিমান এসে পড়লে তার অবস্থান লক্ষ্য করা, তার গতিবেগ এবং গতিবিধি নিরূপণ করা। স্বভাবতঃই এই জাতীয় রেডারের এলাকা খুব বেশী বড় হয়ে থাকে। ক্ষেত্র-বিশেষে মূল কেন্দ্রের চতুর্দিকে ১০০ থেকে ১২০ মাইল পর্যন্ত আকাশে কোন বিমান এলেই এই যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। তবে এই যন্ত্রে ঠিক কোন্ জায়গার উপরে বিমানটি রয়েছে, তা বুঝতে পারা গেলেও সঠিক কত ফুট উঁচু দিয়ে বিমানটি উড়ে যাচ্ছে, তা নিরূপণ করা যায় না। সীমান্ত অতিক্রম করে কোন শত্রুপক্ষীয় বিমান দেশের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছে কি না, তা এই ধরণের রেডারে সহজে ধরা যায় এবং এর এলাকা ব্যাপক হওয়ায় এই কাজে সুবিধাও হয়। তাই সামরিক বিভাগে,

বিশেষ করে বিমান বন্দরের কাজে এই জাতীয় রেডারের ব্যবহার ব্যাপক। ভারতে সম্প্রতি যে রেডার যন্ত্রাদি আমেরিকা থেকে এসেছে, তা এই সারভিলেন্স রেডার।

প্রিসিশন অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল রেডার সাধারণতঃ অসামরিক বিমান পরিবহন বিভাগে ব্যবহৃত হয়। কেন না, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যেখানে বিমান কোন ক্রমেই রানওয়ে দেখতে পায় না, সেখানে এই রেডার তাকে নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। কিভাবে রেডারের কাজ হয়ে থাকে, সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই কিছুটা প্রাথমিক ধারণা পাবার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। প্রক্ষেপণ ও গ্রহণের ব্যাপারে যে সেটটি ব্যবহৃত হয়, সেটা ট্র্যান্স-রিসিভিং সেট। একবার বার্তা প্রক্ষেপণের পর তাকে বিমানে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবার জন্যে অবশ্যই সময় দিতে হবে এবং সেই সঙ্কেত-তরঙ্গ ফিরে এলেই তবে পরের প্রক্ষেপণটি করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা কতকটা নাড়ীর গতির মতই চলে। যদি প্রক্ষিপ্ত সঙ্কেত-তরঙ্গ ফিরে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে ঐ এলাকার মধ্যে কোন বিমান নেই; কারণ প্রেরিত তরঙ্গ প্রতিহত হবার মত কোন কিছু খুঁজে না পেয়ে কেবল এগিয়ে গিয়ে এলাকার বাইরে চলে গেছে।

রেডারের কর্মপদ্ধতির মধ্যে জটিলতা আছে। কেন না রেডারের কাজে প্রতিটি স্তরে রয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। রেডার যন্ত্রের প্রাণ হলো ঐ ট্র্যান্স-রিসিভিং সেট। এই যন্ত্র থেকে বার্তা প্রক্ষিপ্ত হলে তা একটি অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যায় এরিয়েলে। এরিয়েল থেকে আলোক-তরঙ্গের মত ঐ বার্তা ছুটে চলে বিমানটির দিকে। বিমানে প্রতিহত হয়ে সেই তরঙ্গ ফিরে আসে আবার ঐ এরিয়েলে। অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্য দিয়ে তা আবার ট্র্যান্স-রিসিভিং সেটে পৌঁছে চলে যায় আর একটি অ্যামপ্লিফায়ারে। এখানে তরঙ্গের ছবিটি ফুটে ওঠে একটি ক্যাথোড রশ্মির টিউবে আঁকা মানচিত্রের উপর। এই মানচিত্রের ছবি দেখে বিমানের অবস্থান, গতিবেগ আর উচ্চতা প্রভৃতি হিসাব করে বের করে নিতে অসুবিধা হয় না।

ভারতে রেডারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অনেক দিন থেকেই অনুভূত হচ্ছে। অবশ্য যে সব আবহাওয়ার ক্ষেত্রে রেডার অপরিহার্য, সে ধরনের আবহাওয়া ভারতে খুব বেশী দিন থাকে না। কিন্তু তবুও ভারতে রেডার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিমানবহর তো অনেক দিন আগেই রেডারের ব্যবহার আরম্ভ করেছে, কিন্তু অসামরিক বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে রেডারের ব্যবহার ভারতে খুবই কম। প্রথম রেডার সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ভারত সরকার বিমান পরিবহন দপ্তরের যে দু-জন কৃতী অফিসারকে সর্বপ্রথম মনোনীত করেন, তাঁরা হলেন স্বর্গতঃ এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও সত্য ভট্টাচার্য। আমেরিকা থেকে তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা শেষ করে ফিরে এসে ভারতে বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে রেডারের ব্যবহার ত্বরান্বিত করেছেন।

রেডার আজ আমাদের দেশে মোটামুটি ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সে সব যন্ত্র আমাদের প্রধানতঃ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। আজ আমাদের দেশে বিমান পরিবহন অথবা শত্রু বিমান পর্য-বেক্ষণের জন্যেই কেবল রেডারের প্রয়োজন নয়— বিমান, জাহাজ প্রভৃতি চলাচলের কাজে রেডারের ব্যবস্থা ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আব-হাওয়া বিভাগের প্রয়োজন তো আছেই, তাছাড়া আজকাল জাহাজের ক্ষেত্রে ডপ্‌লার নেভিগেটর পরিচালিত হচ্ছে রেডারের সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে রেডার নির্মাণের প্রয়োজনীয়-তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেন না,

রেডারের ব্যবস্থা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার মত ভারতেও একদিন রেডারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠতে মোটেই দেরী হবে না। বিশেষ করে আসামের অনিশ্চিত আবহাওয়ায় রেডার অনেক বিপদকে এড়াতে সাহায্য করবে।

এই রেডার স্থাপনের দ্বারা সীমান্তরক্ষীদের একটি কাজ সহজ হয়ে যাবে। তুষারপাত, গাঢ় মেঘের সুযোগ নিয়ে অতি আধুনিক জঙ্গী জেট বিমান মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভারতের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে পারে, কিন্তু রেডারের শ্যেনদৃষ্টিকে তারা কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই রেডার নিঃসন্দেহে আমাদের অনেকখানি নিশ্চয়তা এনে দিতে পেরেছে বলা যায়।

বিংশ শতাব্দীর বহু বিস্ময়ের মধ্যে রেডার যন্ত্র এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন বিংশ শতাব্দীর যাদুদণ্ড। রেডারের কার্যকারিতা দেখলে স্বভাবতঃই মনে হবে, রেডার যাদুদণ্ডই বটে।
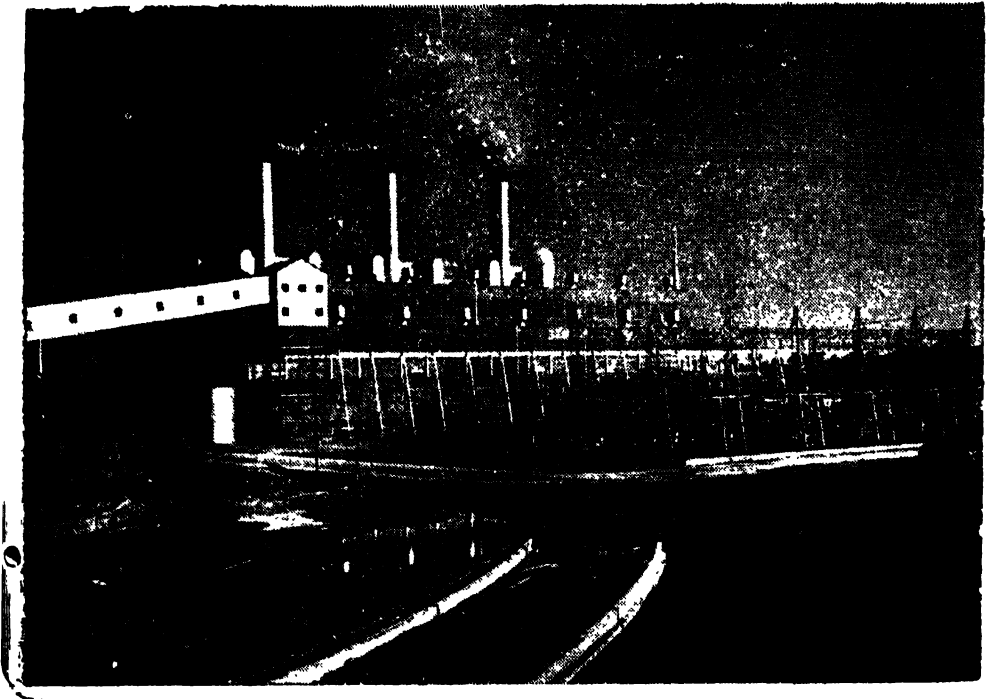
বোকারো থার্ম্যাল স্টেসনের সাধারণ দৃশ্য।

ডাইনোসোর

রমেন দেবনাথ

রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে নানা রকম দৈত্য-দানবের গল্প পাওয়া যায়। বকাসুর, হিড়িম্বা রাক্ষসী, ব্রহ্মদৈত্য, ময়দানব ইত্যাদির গল্প অল্পবিস্তর সকলেই জানে; তবে পুরাণের দৈত্য-দানব পুরাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে—বাস্তব জগতে ইহাদের অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণী-জগতে দানব সদৃশ কতকগুলি সরীসৃপ প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের পুরাণে কথিত দৈত্য-দানবের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগকেই ডাইনোসোর বলা হয়। ইউরোপীয় প্রত্ন-জীববিজ্ঞানী সার রিচার্ড আইওয়েন কর্তৃক ইহাদের ডাইনোসোর নামটি প্রদত্ত হয়। দুইটি গ্রীক শব্দ থেকে ডাইনোসোর (Dinos = terrible, sauros = lizard) নামের উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে ভয়ঙ্কর সরীসৃপ।

প্রাণী-জগতে ডাইনোসোরের স্থান—ডাইনোসোর সরীসৃপ (Reptilia) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আঁশযুক্ত চামড়া এবং ডিম হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত একটি ডাইনোসোরের কঙ্কালের জীবাশ্মের (Fossil skeleton) সঙ্গে কিছু আঁশযুক্ত চামড়া পাওয়া গিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে—সাপ, গিরগিটি, গোসাপ ইত্যাদি সরীসৃপ প্রাণীর আঁশযুক্ত চামড়ার সঙ্গে ঐ চামড়ার মিল আছে। ডাইনোসোর যে স্তন্যপায়ী বা বিহঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নয়, তা সহজেই প্রমাণিত হয়—কারণ, উহাদের শরীরে লোম অথবা পালকের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই!

অতীত যুগ—ডাইনোসোর সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে মানুষের জন্মের কোটি কোটি বৎসর আগে। প্রায় ১৯ কোটি বৎসর আগে ডাইনোসোরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। একটি ডাইনোসোরও এখন বাঁচিয়া নাই—উহাদের মরদেহ জীবাশ্মে (Fossil) রূপান্তরিত হইয়া ভূগর্ভের শিলাস্তরে চাপা পড়িয়া আছে। ঐ শিলাস্তরে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরণের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সকল শিলাস্তর এবং জীবাশ্মের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্ন-জীববিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অতীত জীবনের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করিয়াছেন; যথা—

(১) পুরাজীবীয় যুগ (Palaeozoic Age)—ইহা আদিম প্রাণীদের যুগ। এই যুগ অতীতের ৫০ কোটি থেকে উপরের দিকে ২২ কোটি বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছয়টি উপযুগ লইয়া এই যুগটি গঠিত।

(২) মধ্যজীবীয় যুগ (Mesozoic Age)—ইহা সরীসৃপ প্রাণীদের যুগ এবং ১৯ কোটি হইতে ১১ কোটি বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনটি উপযুগ লইয়া এই যুগটি গঠিত।

(৩) নবজীবীয় যুগ (Cenozoic Age)—ইহা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যুগ এবং ৭ কোটি হইতে ৫০ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এই যুগের ৫টি উপযুগ আছে।

মধ্যজীবীয় যুগে সরীসৃপ প্রাণীরা উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল এবং ঐ যুগেই ভয়ঙ্কর সরীসৃপ বা ডাইনোসোরের উত্থান এবং পতন ঘটে। সমস্ত প্রাণী-জগতের উহারাই ছিল একচ্ছত্র অধিপতি। সেই জন্য এই যুগকে সরীসৃপের স্বর্ণযুগ বা ডাইনোসোরের যুগ বলা হয়। ঐ যুগের তিনটি

উপযুগে বিভিন্ন রকমের ডাইনোসোরের উদ্ভব হইয়াছিল। ঐ তিনটি উপযুগ হইল—

(১) ট্রায়াসিক (Triassic Age; Tri – three)—এই উপযুগের শিলাস্তর ত্রিধা বিভক্ত। ইহার বয়স ১৯ কোটি বৎসর।

(২) জুরাসিক (Jurassic Age; Jura – mountain) সুইজারল্যাণ্ডের জুরা পর্বতে প্রথম আবিষ্কৃত। ইহার বয়স ৩৪ কোটি বৎসর।

(৩) ক্রিটেশাস (Cretacious Age – Creta – chalk)—এই উপযুগের শিলাস্তরে খড়িমাটির প্রাধান্য বেশী। ইহার বয়স ১১ কোটি বৎসর।

যেহেতু মধ্যজীবীয় যুগেই ডাইনোসোর পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহাদের কোন বংশধর জীবিত নাই—সেহেতু বহুদিন পর্যন্ত ডাইনোসোর সম্পর্কে কেহ কিছু জানিতই না। মাত্র ১০০ বৎসর পূর্বে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম হইতে প্রত্ন-জীববিজ্ঞানীরা ডাইনোসোরের অস্তিত্বের বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

৭।৮ কোটি বৎসর যাবৎ মধ্যজীবীয় যুগে ডাইনোসোরেরা পৃথিবীতে একচেটিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। অন্যান্য প্রাণীরা উহাদের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত এবং এখানে-ওখানে আত্মগোপন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিত। এই দীর্ঘকাল রাজত্বের সময় নানারকম ডাইনোসোরের জন্ম হইয়াছিল। কতকগুলির চামড়া আঁশযুক্ত, কতকগুলির শরীর শক্ত প্লেটের মত পদার্থের দ্বারা আবৃত, কতকগুলির চামড়া আবার মসৃণ। এছাড়া দ্বিপদী, চতুষ্পদী, স্থলচর, জলচর, উভচর, মাংসাশী, তৃণভোজী প্রভৃতি হরেক রকম ডাইনোসোরের উদ্ভব হইয়াছিল। আকার ও অয়তনে পার্থক্য থাকিলেও সকল রকম ডাইনোসোরেরই একটি মিল ছিল—তাহা হইল তাহাদের ক্ষুদ্রাকৃতির মস্তিস্ক।

ডাইনোসোরের শ্রেণীবিভাগ—জঙ্ঘাস্থির (Hip bone) আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া ডাইনোসোরকে দুইটি পর্বে (Order) ভাগ করা হইয়াছে; যথা—

(১) সরীসৃপ সদৃশ ডাইনোসোরা বা সোরিস্কিয়া (Saurischia — Saur – Lizard, ischia = hip-bone)—এই পর্যন্ত ডাইনোসোরের জঙ্ঘাস্থি সরীসৃপদের জঙ্ঘাস্থির ন্যায়।

(২) বিহঙ্গ সদৃশ ডাইনোসোর বা অর্নিথিস্কিয়া (Ornithischia; — Ornithos – Bird)—এই পর্বের ডাইনোসোরের জঙ্ঘাস্থি পাখীর জঙ্ঘাস্থির ন্যায়।

উপরিউক্ত দুইটি পর্বকে কয়েকটি উপপর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে ডাইনোসোরের শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল:—

পর্ব—সোরিস্কিয়া
উপপর্ব—থেরোপডা (Theropoda)
উপপর্ব—সোরোপডা (Sauropoda)

পর্ব—অর্নিথিস্কিয়া
উপপর্ব—অর্নিথোপডা (Ornithopoda)
উপপর্ব—ষ্টেগোসোরিয়া (Stagosuria)
উপপর্ব—অ্যাঙ্কাইলোসোরিয়া (Ankylosauria)
উপপর্ব—সিরেটোপসিয়া (Ceretopsia)

এখন এক একটি পর্ব এবং উপপর্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে।

উপপর্ব থেরোপডা—এই উপপর্ব হইতেই ডাইনোসোরের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। আদি ডাইনোসোরের নাম হইল সিলোফাইসিস। আমেরিকার মেক্সিকোর ট্রায়াসিক শিলাস্তর হইতে সম্প্রতি উহার সম্পূর্ণ জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কঙ্কালটি আট ফুট লম্বা, হাড়গুলি খুবই হাল্কা এবং ফাঁপা। কাজেই উক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে (Coelo – hollow, physis

—bone)। ইহাদের লেজ এবং ঘাড় খুব লম্বা। সিলোফাইসিস দ্বিপদী এবং মাংসাশী প্রাণী। ইহাদের চোয়ালে শক্ত ধারালো দাঁত আছে। এই আদি ডাইনোসোর হইতেই জুরাসিক এবং ক্রিটেসাস উপযুগে বড় বড় মাংসাশী ডাইনোসোরের (টাইরেনোসোরাস, অ্যালোসোরাস ইত্যাদি) উৎপত্তি হইয়াছিল। টাইরেনোসোরাসই (Tyranosaurus) ডাইনোসোরাসের মধ্যে ভয়ঙ্কর ছিল। বলিতে গেলে উহারাই ছিল মধ্য যুগের অধিপতি। এই অত্যাচারী, মাংসভুক, অতিকায় দানবের সম্পূর্ণ কঙ্কালের জীবাশ্ম ইউরোপ এবং আমেরিকার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। উহা লম্বায় ৪০ ফুট, উচ্চতায় ২০ ফুট এবং চোয়ালে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা ড্যাগারের মত তীক্ষ্ণ দাঁত আছে। পা দুইটি থামের মত মোটা। উহারা অন্যান্য ডাইনোসোরদের হত্যা করিয়া উদরপূরণ করিত।

উপপর্ব মরোপডা—এই উপপর্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির ডাইনোসোরের (ব্রন্টোসোরাস, ডিপ্লোডোকাস ইত্যাদি) জন্ম হইয়াছিল। যেহেতু উহারা অতিকায় জন্তু, সেহেতু শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য চারিটি থামের মত পায়ের উদ্ভব হইয়াছিল; একই প্রয়োজনে উহারা বেশীর ভাগ সময় জলে থাকিত। উহাদের লেজ এবং ঘাড় খুবই সরু, কিন্তু শরীরের মাঝখানটা আবার বেজায় মোটা। প্রশস্ত দেহ এবং থামের মত পায়ের জন্য উহাদিগকে হাতীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাদের মাথা খুবই ছোট। আমেরিকার যাদুঘরে রক্ষিত ব্রন্টোসোরাসের কঙ্কালটি ৬৭ ফুট লম্বা, ওজন ৩৮ টন। পিটস্‌বার্গের যাদুঘরে রক্ষিত ডিপ্লোডোকাস (Diplodocus) লম্বায় ৮৭ ফুট, কিন্তু তাহা হইলেও সরু ঘাড় এবং লম্বা লেজ অনেকটা জায়গা দখল করিয়া থাকিবার ফলে উহার ওজন ব্রন্টোসোরাসের ওজন অপেক্ষা কম। ব্রন্টোসোরাস, ডিপ্লোডোকাস (১ম ও ২য় চিত্র) অতিকায় জন্তু হইলেও ভয়ঙ্কর ছিল না। কারণ উহারা তৃণভোজী প্রাণী (চ্যাপ্টা দাঁত হইতে উহা প্রমাণিত হয়)।

ব্রন্টোসোরাস

উপপর্ব অনিথোপোডা—বিহঙ্গ সদৃশ ডাইনোসোরদের মধ্যে এই বিভাগের ডাইনোসোরই প্রাচীন। জুরাসিক এবং ক্রিটেসাস উপযুগে উহারা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিত। কম্প্‌টোসোরাসের কঙ্কালটি ১০ ফুট লম্বা। ইগুয়াডনের (Iguadon) কঙ্কালটি ৩৪ ফুট লম্বা। ডাইনোসোরাসের মধ্যে ইগুয়াডনের কঙ্কালটিই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় বেলজিয়ামে।

উপপর্ব ষ্টেগোসোরিয়া—এই বিভাগের ডাইনোসোরের নাম ষ্টেগোসোরাস (Stegosaurus)। উহার উত্থান এবং পতন জুরাসিক উপযুগে ঘটিয়াছিল। এই ডাইনোসোর ছিল চতুষ্পদী এবং তৃণভোজী। উহার পিঠের উপর শক্ত বর্মের মত দুই সারি প্লেট ছিল (৩য় চিত্র)। ঐ প্লেটগুলি ভাঁজ করিয়া পিঠের উপর রাখিলে বর্মের ন্যায় শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিত। লেজের কাছে ঐ প্লেটগুলির পরিবর্তে সূক্ষ্মাগ্র স্পাইন আছে। উহার মাথাটি শরীরের তুলনায় খুবই ছোট, কাজেই মস্তিষ্কও

ছোট। জঙ্ঘাস্থির কাছে (যেখান হইতে লেজ আরম্ভ হইয়াছে) সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal eord) অনেকটা স্ফীত হইয়া দ্বিতীয় মস্তিষ্কের (?) সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকের মতে, শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে উহারা মাথার দিক গুটাইয়া লেজের দিক দিয়া আক্রমণ করিত, অর্থাৎ তখন পিছনের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক কাজে লাগাইত। লণ্ডনের ইয়েল এবং আমেরিকার ওয়াশিংটনের যাদুঘরে ষ্টেগোসোরা-সের কঙ্কাল রক্ষিত আছে।

উপপর্ব অ্যাঙ্কাইলোসোরিয়া—এই বিভাগের ডাইনোসোরের শরীরও বর্মাবৃত। কচ্ছপের ন্যায় উহাদের সমস্ত শরীর একটি আবরণীর মধ্যে থাকে। জুরাসিক উপযুগে উহাদের উৎপত্তি এবং ক্রিটেসাস উপযুগে পতন ঘটে। উদাহরণ—অ্যাঙ্কাইলোসো-রাস। উপপর্ব সিরেটোপসিয়া—এই বিভাগের ডাইনোসোর হইল মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ধাপের প্রাণী; অর্থাৎ ক্রিটেসাস উপযুগে উহাদের উৎপত্তি এবং পতন। উহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গণ্ডারের মত মাথার শিং এবং মাথা হইতে কাঁধ পর্যন্ত একটি শক্ত আবরণী। উদাহরণ—ট্রাইসিরে-টোপ (Triceretop)।

ডাইনোসোরের বিলুপ্তি—পৃথিবীর বুক হইতে ডাইনোসোর সবংশেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৮ কোটি বৎসর ধরিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রাণী-জগতে রাজত্ব করিয়া হঠাৎ উহারা পৃথিবীর বুক হইতে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। প্রবল প্রতাপ-শালী ডাইনোসোরদের বংশ-বিলুপ্তি কেমন করিয়া ঘটিল? জীব-বিজ্ঞানীদের কাছে ইহা একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য রহিয়া গিয়াছে। এই রহস্যের সমাধানকল্পে বিজ্ঞানীরা তিনটি মতবাদ খাড়া করিয়াছেন, কিন্তু কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। মতবাদগুলি হইতেছে—

(১) কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, আগ্নেয়গিরি হইতে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমস্ত ডাইনোসোর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (২) কাহারও কাহারও মতে, স্তন্যপায়ী প্রাণী কর্তৃক তাহাদের ডিম নিঃশেষিত হইবার ফলেই ডাইনোসোর-দের বংশ নির্মূল হইয়া গিয়াছে। মধ্যজীবীয় যুগকে ডাইনোসোরের যুগ বলিলেও ঐ সময় পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী ইত্যাদির আবির্ভাব হইয়াছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা আত্মগোপন করিয়া ডাইনো-সোরদের ডিম খাইয়া শেষ করিত। ডিম পাড়িবার পর ডিম্বজ প্রাণী মরিয়া গেলেও যদি তাহাদের ডিম নষ্ট না হয়, তাহা হইলে ঐ ডিম হইতে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্ম হয়। কিন্তু ডাইনোসোরের ডিম ধ্বংস হইয়া যাইবার ফলে উহাদের ভবিষ্যৎ বংশধর আর জন্মাইতে পারে নাই। এই ভাবে আস্তে আস্তে ডাইনোসোরের বিলুপ্তি সাধিত হয়।

ডিপ্লোডোকাস।

(৩) তৃতীয় মতবাদ হইল এই যে, মধ্যজীবীয় যুগের শেষে এবং নবজীবীয় যুগের প্রারম্ভে ভূগর্ভ এবং ভূস্তর এক বিরাট উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়, যার ফলে সমুদ্রগর্ভ হইতে পর্বতের জন্ম হয় এবং নদী শুষ্ক হইয়া স্থলভূমির সৃষ্টি করে। পৃথিবীর এই উত্থান-পতনকে ল্যারামাইড রিভোলিউসন

(Lara mide Revolution) বলা হয়। ইহার ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানারকম পরিবর্তন ঘটে এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে যে সমস্ত উদ্ভিদাদি উদরসাৎ করিয়া তৃণভোজী ডাইনোসোর জীবনধারণ করিত তাহার অভাব ঘটে এবং তৃণভোজী ডাইনোসোর ক্রমশঃ ধ্বংস হইতে থাকে। ইহা ছাড়া পরিবর্তিত আবহমণ্ডল, তাপমাত্রা এবং নূতন পরিবেশের সঙ্গে স্থূলমস্তিষ্কের ডাইনোসোরেরা খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে নাই। তৃণভোজী ডাইনোসোরদের বিলুপ্তির ফলে মাংসাশী ডাইনোসোরের খাদ্যের অভাব ঘটে এবং উহাদেরও মৃত্যু বরণ করিতে হয়। খাদ্যের ব্যাপারে সমস্ত ডাইনোসোরদেরই খুব সীমাবদ্ধতা ছিল, কাজেই তাহাদের নির্দিষ্ট ধরণের খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটিবার ফলে অন্যান্য প্রাণীদের মত উহারা উহাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিতে পারে নাই।
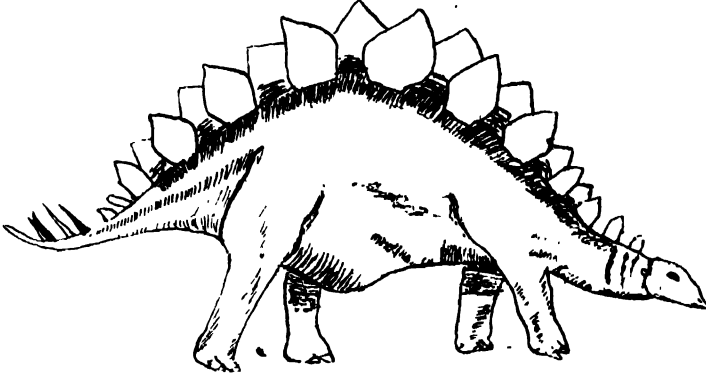
ষ্টেগোসোরাস।

ডাইনোসোরের বিলুপ্তির কারণ সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ থাকিলেও ইহার প্রাথমিক কারণ হইল, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার অক্ষমতা।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ভারতে মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণা

সূর্য ও ছায়াপথের মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার জন্যে চব্বিশ জনেরও বেশী মার্কিন বিজ্ঞানী ভারতে আসছেন। তাঁরা অন্যান্য কয়েকটি দেশের বিজ্ঞান ও গবেষক দলের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন।

সূর্য ও মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বাইরের বায়ু-মণ্ডলে আগত উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক কণিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিজ্ঞানীরা ঊর্ধ্বাকাশে ২৮ মাইল পর্যন্ত বেলুনযোগে যন্ত্রপাতি প্রেরণ করবেন। এই বেলুনগুলি মানুষের দ্বারা পরিচালিত হবে না।

নিরক্ষরেখায় বেলুন উৎক্ষেপণ অভিযান পরিকল্পনা অনুসারে ১৬টি বেলুন হায়দরাবাদে উৎক্ষেপণ করা হবে। 'আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বৎসর' পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই এই পরীক্ষা চালানো হবে।

এই অভিযানে ৩ লক্ষ ডলার ব্যয় হবে। যুক্ত-রাষ্ট্রের জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এবং অন্যান্য আরও কতকগুলি সংস্থার সমর্থনক্রমে আমেরিকা এই অভিযানে যোগদান করেছে।

গ্রেট বৃটেন, আয়ারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সিংহল ও টাসমানিয়া থেকে গবেষকেরা এই পরিকল্পনায় কাজ করবার জন্যে যোগদান করছেন।

নিরক্ষরেখা থেকে দূরে ঊর্ধ্বাকাশে এর আগে যে সব গবেষণা করা হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছিল যে, এই বিকিরণ প্রধানতঃ প্রোটন ও হিলিয়াম কণাসমূহ এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত অধিকতর ভারী কণার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। সম্প্রতি যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে মহাজাগতিক বিকিরণে ইলেকট্রন ও গামা রশ্মির অস্তিত্বের কথাও জানা গেছে।

এই অভিযানে বৈজ্ঞানিক সংযোগ রক্ষাকারী ডারটাম স্টিলার বলেছেন, সূর্যে বিস্ফোরণাদির ব্যাপার যখন সবচেয়ে কম ঘটে, তখন নিরক্ষ-রেখায় বেলুন উৎক্ষেপণ অভিযান অনুসারে গবেষণা চালাবার অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য আছে। সূর্য যখন সক্রিয় থাকে, তখন সূর্যপৃষ্ঠ থেকে মুক্ত আহিত কণা মেঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র, ছায়াপথ থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মির অনেকগুলিকে সৌরজগতের পরিমণ্ডলের বাইরে বিতাড়িত করে নিয়ে যায়। ফলে ছায়াপথের খুবই অল্পসংখ্যক মহাজাগতিক কণিকা পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৌঁছুতে পারে।

সৌরবিস্ফোরণ যখন সবচেয়ে কম থাকে, তখন গবেষণা চালিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে সৌরবিস্ফোরণ সবচেয়ে বেশী থাকবার সময় গবেষণালব্ধ তথ্যাদির তুলনা করেও দেখা হবে।

অভিযানকালে যে বেলুনগুলি শূন্যে প্রেরিত হবে, সেগুলিতে থাকবে, গামা রশ্মি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার যন্ত্র, নিউট্রন গণনার যন্ত্র, পার-মাণবিক গবেষণার সহায়ক তরল পদার্থপূর্ণ পাত্র, ক্যামেরা এবং রেকর্ডিং ও দূরত্বপরিমাপক যন্ত্র। আহিত কণিকা নির্ধারক নবতম যন্ত্র এই সর্বপ্রথম এত ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হবে।

যে বেলুনগুলি এই গবেষণার জন্যে ব্যবহার করা হবে, সেগুলি নতুন ধরণের পলিথিনের তৈরি। এগুলি এমনভাবে তৈরি যে, হিমাঙ্কের নীচে ৯০ ডিগ্রী শৈত্য সহ্য করতে পারে। অবতরণকালে বেলুনগুলিকে এই তাপমাত্রার মধ্যে দিয়ে আসতে

হতে পারে। দুই রকমের বেলুন এই গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। অধিকাংশ বেলুনই ৩৫০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি নিয়ে উর্ধ্বাকাশে যাত্রা করবে, তবে ৫০ লক্ষ ঘনফুটের একটি বেলুন ২ হাজার পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি বহন করবে।

এছাড়া আবহ-বিজ্ঞানের দিক থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ফুট উর্ধ্বে বাতাস ও উত্তাপ নিয়মিত পরিমাপ করবার উদ্দেশ্যে আরও প্রায় ৮০টি বেলুন উৎক্ষেপণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

সৃষ্টির আদিতে কোন্ মহাশক্তি এই পৃথিবী ও তার মহাদেশ, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি ও ধাতব সম্পদ সৃষ্টি করেছিল এবং কেন ভূমিকম্প হয়ে থাকে—ইত্যাদি বিষয়ের কারণ ও তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা কিছুকাল থেকে করলেও উর্ধ্বলোকের তুলনায় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস তেমন হয় নি। পৃথিবীর উর্ধ্বলোকের রহস্যের সন্ধান মানুষ আজ অনেকখানি পেয়েছে—মানুষের আজ চন্দ্র, মঙ্গল বা শুক্রলোকে যাত্রার প্রস্তুতি চলছে।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর উপরের স্তর থেকে ম্যান্টেল এলাকা পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ভূপৃষ্ঠের দশ থেকে পনেরো মাইল নীচে রয়েছে এই ম্যান্টেল এলাকা। এই এলাকা দু-হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবীর স্থলভাগে নির্দিষ্ট স্থানে দুই থেকে পাঁচ মাইল পর্যন্ত খনন করা হবে, আর সমুদ্রের তলদেশে ম্যান্টেল এলাকা পর্যন্ত খনন করে তথ্যসংগ্রহের যে চেষ্টা চলছে, তার কাজকর্ম আরও প্রসারিত করা হবে। এর ফলে গবেষণার জন্যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বহু উপকরণ এবং তাপমাত্রা, চৌম্বক শক্তি ও অন্যান্য নানা বিষয়ে নানারকম তথ্য সংগৃহীত হবে।

অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্ট ফ্রেডারিক সিজ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, পৃথিবীর উপরের স্তর থেকে কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত সব কিছু জানবার উপরই মানুষের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। এই পরিকল্পনায় পৃথিবীর ৬০টি রাষ্ট্র সহযোগিতা করছেন।

মঙ্গলগ্রহে কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে?

একটি যন্ত্রচালিত ও নানাবিধ যন্ত্রপাতিসমন্বিত বৃহত্তম মহাকাশযানের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি তথ্যানুসন্ধানী পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা প্রেসিডেন্ট জনসন উল্লেখ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে মেরিনার যানের তুলনায় দশ থেকে পনেরো গুণ বৃহত্তর একটি মহাকাশযানের সাহায্যে যন্ত্রপাতিসমন্বিত একটি ক্যাপসুল মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে। এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐ সব যন্ত্রপাতি সঠিক তথ্য সরবরাহ করবে। এই মহাকাশযানটির নামকরণ করা হবে ভয়েজার।

নতুন আর্থিক বছরে আমেরিকার জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার এটিই হবে নতুন পরিকল্পনা। সংস্থার কর্মীরা বলেছেন—এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে এক-শ' কোটি ডলারেরও অধিক অর্থব্যয় হতে পারে।

তাঁরা এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহ তথ্য সংগ্রহের অনুকূল অবস্থায় আসবে। এই সময়ের মধ্যে ঐ গ্রহে যাওয়ার উপযোগী সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই কাজে নামতে হবে। এই বছরে সংস্থা ভয়েজারের নক্সাটি সম্পূর্ণ

করবার দিকে দৃষ্টি দিবেন। এই মহাকাশযানের প্রধান অংশে থাকবে টেলিভিশন ক্যামেরা সহ প্রায় ছু-শ' পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি। এই ক্যামেরা মঙ্গলগ্রহের কক্ষ পরিক্রমাকালে ছয় মাস পর্যন্ত চিত্র-গ্রহণে সক্ষম হবে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, পথ নির্দেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি-সমন্বিত অংশটির ওজন হবে এক টনের মত। মঙ্গলগ্রহের উপরে যে ক্যাপসুলটি ফেলা হবে, তাথেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহও এই অংশটিই রিলে করে পৃথিবীতে পাঠাবে। যন্ত্রপাতি-সমন্বিত ঐ ক্যাপসুলটির ওজন হবে তিন টন। আর যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্যাপসুলটি মঙ্গলগ্রহে নামানো হবে, তার ওজন হবে প্রায় দেড় টন।

মেরিনার নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে ধাবমান, তার ওজন ৫৭৫ পাউণ্ড। এতে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা রয়েছে। আগামী জুলাই মাসে মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে এই ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র পৃথিবীতে প্রেরিত হবার ব্যবস্থা আছে।

পৃথিবী থেকে গৃহীত মঙ্গলগ্রহের আলোক-চিত্রের তুলনায় মেরিনার উপগ্রহ থেকে গৃহীত চিত্র এক-শ' গুণ স্পষ্টতর হবে। তবে ঐ সকল চিত্র থেকে প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

চাঁদে অবতরণের উদ্যোগ

পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব আড়াই লক্ষ মাইল। বর্তমানে যে সকল রকেট ও মহাকাশযান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের সাহায্যে মানুষের চন্দ্র-লোক পাড়ি দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বিশিষ্ট মার্কিন মানচিত্রকর মিঃ আলবার্ট এল. নাউইকি সম্প্রতি চাঁদের মানচিত্র রচনা সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা চন্দ্রলোকে মানুষ পাঠাতে পারে।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, চাঁদে মানুষের অবতরণের পূর্বে, কি কি উপকরণে চাঁদ গঠিত, সেখানে কঠিন জমি আছে কিনা, কোন প্রাণী আছে কিনা, তার আবহাওয়া প্রাণধারণের অনুকূল কিনা—ইত্যাদি বিষয় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভাল করে জেনে নেবার পরেই সেখানে যাত্রীবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সম্ভব হবে।

তবে চাঁদের জমি যে শক্ত এবং তা মানুষ ও মহাকাশযানের অবতরণের উপযোগী—তা সপ্তম রেঞ্জার নামে মার্কিন উপগ্রহের সাহায্যে জানা গেছে। আরও জানা গেছে যে, চাঁদে পৃথিবীর মত কোন আবহাওয়া নেই। দিনের তাপমাত্রা ২২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে এবং রাত্রিতে ২৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায়। মানুষের যে সকল উষ্ণ ও শীতলতম স্থানের কথা জানা আছে, তাদের মধ্যে চাঁদ অন্যতম।

সুতরাং চন্দ্রলোকযাত্রীর চাঁদে অবতরণের জন্যে প্রয়োজন হবে খুব মোটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ উপযোগী পোষাক। ঐ পোষাকের জন্যে তাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম করা সম্ভব হবে না। সুতরাং চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এমন ভাবেই তৈরি করতে হবে, যাতে ঐ ধরণের পোষাক পরিধান করেও ঐ সকল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম করা যায়।

গত বছর জুলাই মাসে সপ্তম রেঞ্জার নামে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে বহু আলোকচিত্রই গৃহীত হয়েছে। পৃথিবী থেকে অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্রের তুলনায় ঐ সকল চিত্র দু-হাজার গুণেরও বেশী সুস্পষ্ট। সপ্তম রেঞ্জার চাঁদের পৃষ্ঠে

পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। চাঁদ সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বুধবার অষ্টম রেঞ্জার নামে আর একটি ৮০৮ পাউণ্ড ওজনের মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছে।

পৃথিবী থেকে চাঁদের যে ভাগ চোখে পড়ে, তার পূর্ব দিকের মধ্যস্থলের সমতল ক্ষেত্রে এটিকে নামাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ক্ষেত্রটির নাম 'সী অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি'।

অষ্টম রেঞ্জারের যন্ত্রপাতিসমূহ ঠিকমত চালু থাকলে চাঁদ থেকে উপগ্রহটি যখন ১১০০ মাইল দূরে থাকবে, তখন থেকে ঐ উপগ্রহের আটটি ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ সুরু হবে এবং চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে দেড় মাইল দূরে থাকবার সময় চিত্র গ্রহণ শেষ হবে। ঐ সময়ে প্রায় চার হাজার আলোকচিত্র গৃহীত হবে।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মাংস সুস্বাদু

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর প্রান্তের তৈমুর উপদ্বীপের নরিল্‌স্ক্‌ শহরের প্রাণী-বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিও মিচুরিন একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় ম্যামথের মাংস রেঁধে খেয়েছেন এবং সেই মাংস খেতে বেশ সুস্বাদু বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই ম্যামথটি সাইবেরিয়ার একটি চিরতুষারাচ্ছন্ন জায়গায় কয়েক হাজার বছর ধরে বরফের গভীরে অতিনিম্ন তাপাঙ্কে হিমায়িত অবস্থায় ছিল এবং সেই জন্যেই তার মাংসে কোন রকম পচনক্রিয়া দেখা দেয় নি।

অধ্যাপক মিচুরিন বলেন, এই মাংস খেতে অনেকটা গোমাংসের মত—কিন্তু তার চেয়ে একটু বেশী আঁশযুক্ত।

সাইবেরিয়ার যে অংশ উত্তর মেরুবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, সেখানকার পিয়াসিনা নদীর উত্তর তীরে একদল জেলে এই ম্যামথটিকে আবিষ্কার করে এবং তার দেহের একাংশ তুষারস্তূপ খুঁড়ে উদ্ধার করে। নরিল্‌স্ক্‌ শহরের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠাতে এবং সেখান থেকে অধ্যাপক লিও মিচুরিনের এখানে আসতে দিন কয়েক কেটে যায়। সেই সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের বিখ্যাত রূপালী লোমের শেয়ালের (সিল্‌ভার ফার ফক্স) দল ম্যামথটির দেহের একাংশ খেয়ে ফেলে। এথেকেই অধ্যাপক মিচুরিনের মনে হয় যে, ম্যামথটির মাংসে পচনক্রিয়া ঘটে নি। এই ধরণের অক্ষতদেহ ম্যামথ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায় নি বলেই অধ্যাপক লিও মিচুরিন বিশ্বের প্রথম প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মাংস-ভোজী হবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন।

ম্যামথটির বাকী অংশ লেনিনগ্রাডের প্রাণীবিদ্যা মিউজিয়ামে এনে রাখা হয়েছে।

পুশ-বাটন্‌ রেডার ব্যবস্থার সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দান

একটি পুশ-বাটন্‌ রেডার ব্যবস্থা (নাম রেইন-বো) তার এরিয়েলের ২০০ মাইলের মধ্যে ঝড়ের সম্ভবনা দেখা দিলে বা বৃষ্টি উৎপাদনকারী মেঘের সঞ্চার হলে যথাসময়ে তা বলে দিতে পারবে। এই সর্বাধুনিক সুলভ উপকরণটি এখন আবহবিদ্যা-বিদ্‌দের ব্যবহারে এসেছে।

আবহ-উপকরণ হিসাবে রেডারের এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন এটি

ব্যবহৃত হতো, তখন বৃষ্টির প্রতিধ্বনি বিমান আগমনের সমস্ত সংকেত ডুবিয়ে দিত। অথচ এই প্রতিধ্বনি আবহবিদ্যাবিদ্‌দের কাছে এক মহামূল্যবান জিনিষ। সেই জন্মে একদিকে সামরিক রেডার ব্যবস্থার সাহায্যে বৃষ্টির এই শব্দ মুছে ফেলবার জন্মে যেমন চেষ্টা করা হয়, অন্য দিকে তেমনই আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে রেডার ব্যবহারের উন্নতি বিধানেও যত্ন লওয়া হয়।

আবহবিদ্যাবিদ্‌রা প্রধানতঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রধান ভারের (Main mass) প্রক্রিয়া সম্পর্কেই আগ্রহী; উর্ধ্বাকাশে উড্ডয়ন ও কৃত্রিম উপগ্রহের যুগে একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের মোট ভরের প্রায় পাঁচ-ষষ্ঠাংশ এবং তার আর্দ্রতার সর্বাধিক অংশ এমন এক স্তরের মধ্যে রয়েছে, যে স্তর পৃথিবীর সমতলের খুব কাছে এবং যা সাত বা আট মাইল পর্যন্ত গভীর। এই স্তরেই আবদ্ধ আছে সেই আবহাওয়া, যা আমাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আবহবিদ্যাবিদ্‌গণ এখন এই স্তরের পরীক্ষায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছেন।
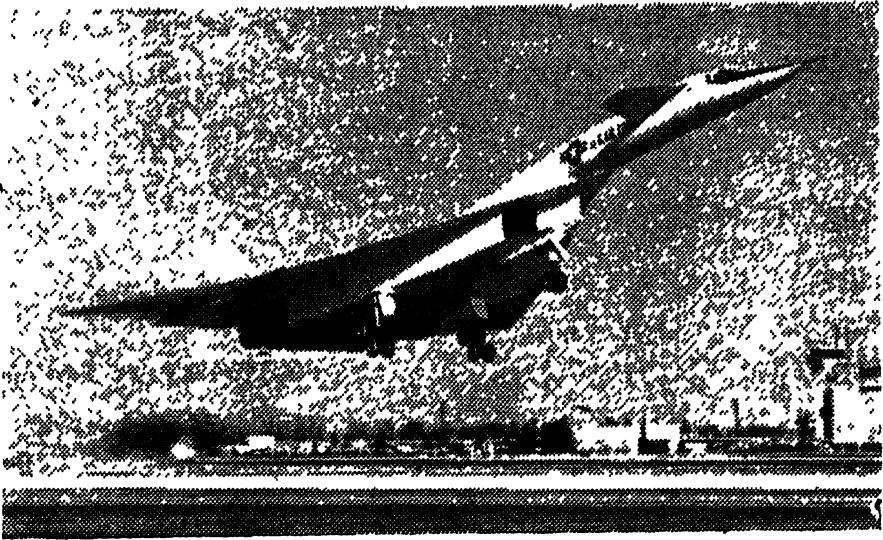
যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ফোর্সের পরীক্ষামূলক বি-৭০ সুপারসনিক বোমারু। এর ওজন ২৭৫ টন—বোধ হয় এ-পর্যন্ত এত ভারী বিমান আর তৈরি হয় নি। ডানায় স্থাপিত ছয়টি ছোট ইঞ্জিনের দ্বারা এটি চালিত হয়। এর গতিবেগ ঘন্টায় ২,০০০ মাইলেরও বেশী।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তদশ-বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন

আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, সেই সুযোগের জন্যে দেশের কাছে তাদের ঋণ জমা হয়ে আছে। সেই ঋণ কি তারা শোধ করবে না? যে স্তূপীকৃত অন্ধকারের বোঝায় দেশ আজ জীবন্মৃত, সেই অন্ধকার থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে উন্মুক্ত আলোয় নিয়ে আসতে কি তারা সাহায্য করবে না?

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাতে ভাষণ দেবার সময় দেশের শিক্ষিত সমাজকে তাদের এই ঋণশোধের দায়িত্বের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

১৯৪৮ সনে বিজ্ঞান পরিষদের জন্ম। বাংলা দেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেষ্টা চালিত হয়। পরিষদের মুখপত্র মাসিক পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ভারত বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে যে দ্বৈমাসিক পত্রিকা বিজ্ঞান পরিচয় প্রকাশিত হতো, জ্ঞান ও বিজ্ঞান তারই আদর্শের উত্তরাধিকারী।

গত সতেরো বছর যাবৎ পরিষদ পত্রিকাটির মাধ্যমে বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি পরিবেশন করেছে। এছাড়াও পরিষদ বেশ কয়েকটি পুস্তকের প্রকাশনা করেছে, আয়োজন করেছে বহু জনপ্রিয় বক্তৃতার, বিজ্ঞান-প্রদর্শনীরও পরিচালনা করেছে। পরিষদের উদ্যোগে একটি অবৈতনিক পাঠাগারও চালিত হচ্ছে। পরিষদের কার্যাবলী যাতে আরো ব্যাপক ও আরো সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থনের জন্যে প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আবেদন জানান পরিষদের কর্মসচিব শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বর্তমান যুগে বিজ্ঞান-চর্চাকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেন এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টাকে ভূয়সী প্রশংসা জানান। বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি অনুবাদের গুরুত্ব আলোচনা করে তিনি বলেন যে, অনুবাদ যাতে যথাযথ ও মার্জিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহের আতিশয্যে তাঁদের অনুবাদ অনেক সময় কি ভাবে দুর্বোধ্য ও বিকৃত হয়ে ওঠে, দৃষ্টান্ত সহকারে তিনি আর উল্লেখ করেন।

এমন অনেক নৈরাশ্যবাদী আছেন, যাঁরা মনে করেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত চিরকালই পাশ্চাত্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ থাকবে। প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ স্থাপত্য বিদ্যায় অন্যান্য দেশের তুলনায় কত উন্নত ছিল, অনুষ্ঠানের প্রধান

অতিথি স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা করেন। কালের আবর্তনে জগৎ-সভায় ভারত আজ হতগৌরব। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আশা প্রকাশ করেন, আমরা নিশ্চয় ভারতের সেই লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবো।

প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাহায্যের জন্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

সাহা ইন্‌স্টিটিউট, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা— সভাস্থল হিসাবে তাঁদের বক্তৃতা-কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দেন এবং মাইক্রোফোন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিজ্ঞান বিষয়ক যে চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়, সেগুলি ব্রিটিশ ইন্‌ফর্মেশন সার্ভিস ও আকাশবাণীর (কলিকাতা) সৌজন্যে সংগৃহীত।

জয়ন্ত বসু
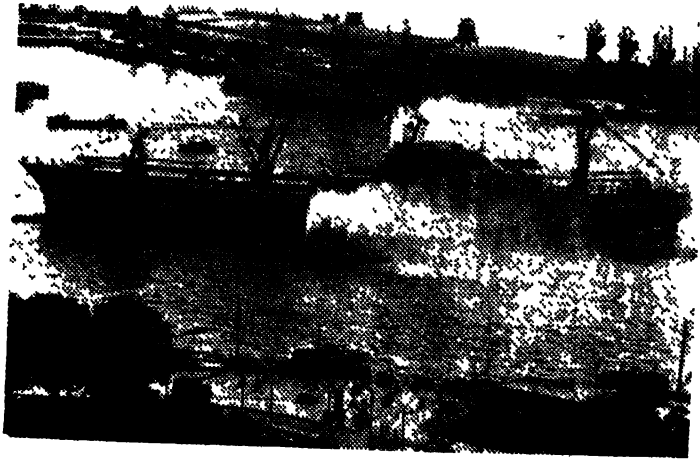
পরমাণু শক্তি চালিত পৃথিবীর একমাত্র পণ্যবাহী এন. এস. স্যাভানা নামক যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নোটারডাম বন্দরে উপস্থিত হলে জল স্প্রে করে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষণ প্রদান করছেন; তাঁর দক্ষিণে প্রধান অতিথি শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বামে পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

করে দেখ

অঙ্কের খেলা

এবার তোমাদের জন্যে একটা অঙ্কের খেলার কথা বলছি। এই খেলাটা দেখিয়ে সবাইকে বেশ অবাক করে দিতে পার।

একটা কাগজে ১২৩৪৫৬৭৯ এই সংখ্যাটা লেখ। সংখ্যাটা মনে রাখা খুবই সহজ, কারণ এতে কেবল ৮ সংখ্যাটি ছাড়া ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পর পর বসানো আছে।

এখন তোমার কোন বন্ধুকে কাগজে লিখিত সংখ্যাগুলির মধ্য থেকে যে কোন একটি সংখ্যার নাম করতে বল। তার খুসীমত যে কোন একটি সংখ্যার নাম করবার পর মনে মনে তুমি সেই সংখ্যাটিকে ৯ দিয়ে গুণ কর। গুণফল যা হবে, সেটা কাগজে লেখা

সংখ্যাটির নীচে লিখে তোমার বন্ধুকে গুণ করতে বল। গুণফল দেখে তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। কারণ সে যে সংখ্যাটির কথা বলেছিল, গুণফলের মধ্যে কেবল সেই সংখ্যাটিরই পৌণঃপুনিক সমাবেশ ছাড়া অন্য কোন সংখ্যাই নেই। যেমন ধর, তোমার বন্ধু ৪ সংখ্যাটিকে ধরেছে। এই ৪ সংখ্যাটিকে তুমি মনে মনে ৯ দিয়ে গুণ করলে পাবে ৩৬। এবার কাগজে লেখা ১২৩৪৫৬৭৯ সংখ্যার নীচে ৩৬ বসিয়ে বন্ধুকে গুণ করতে বল। দেখবে, এর গুণফল হবে—৪৪৪৪৪৪৪৪৪; অর্থাৎ গুণফলের সবগুলি সংখ্যাই ৪। এভাবে যে কোন সংখ্যা নিয়েই দেখবে, তাকে মনে মনে ৯ দিয়ে গুণ করে যত হবে, সেই সংখ্যা দিয়ে ১২৩৪৫৬৭৯-কে গুণ করলে গুণফলের মধ্যে সেই নির্ধারিত সংখ্যাটিরই বার বার আবির্ভাব ঘটবে—তাতে অন্য কোন সংখ্যা আসবে না।

প্লিমসোল রেখা

তোমরা অনেকেই ছোট বড় নানারকমের জাহাজ দেখেছ নিশ্চয় এবং হয়তো, প্রত্যেক জাহাজের খোলের গায়ে নীচের ছবির মত চিত্রটি লক্ষ্য করেছ। চিত্রের বিভিন্ন রেখা ও বৃত্তটি প্লিমসোল রেখা (Plimsoll Mark) নামে পৃথিবীর সব দেশেই পরিচিত।

এই চিত্রটির বিভিন্ন রেখা ও বৃত্তটির ব্যাখ্যা দেবার পূর্বে প্লিমসোল রেখা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

আজ থেকে প্রায় এক-শ' বছর পূর্বের কথা। তখন মালবোঝাই সমুদ্রগামী
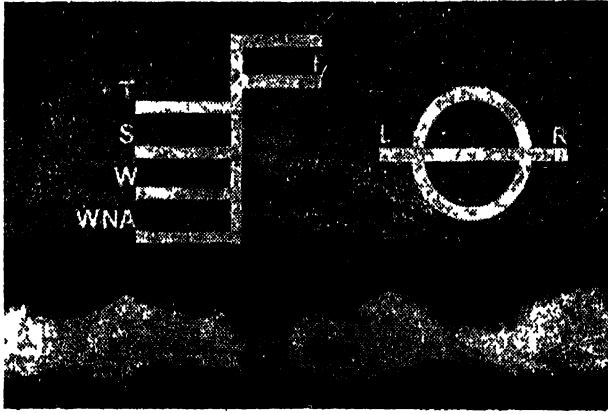
প্লিমসোল রেখা।

জাহাজের নাবিকেরা প্রায়ই সমুদ্রে ডুবে যেতেন। কারণ, জাহাজের মালিকেরা জাহাজে এত বেশী পরিমাণে মাল বোঝাই করতো যে, জাহাজ মাঝ দরিয়ায় যাবার পথেই অনেক সময় সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই সমুদ্রে ডুবে যেত। এতে জাহাজের মালিকদের কোন ক্ষতি হতো না, কারণ জাহাজের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী বীমা করা থাকতো বলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তারা প্রচুর অর্থ পেতো। কিন্তু এমন অতিরিক্ত মালবোঝাই জাহাজে নাবিকদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। মালবাহী জাহাজে সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ করবার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্য, স্যামুয়েল প্লিমসোল নামক এক ব্যক্তি উঠে-পড়ে লাগলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—প্রত্যেক জাহাজ তার আকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী একটি নির্ধারিত ওজনের বেশী মাল বোঝাই করতে পারবে না; অর্থাৎ প্রত্যেক জাহাজের একটি ওজন রেখা (Load Line) থাকবে, যার অতিরিক্ত মাল বোঝাই করা সমুদ্রে

জাহাজ চলাচলের পক্ষে নিরাপদ নয়। বস্তুতঃ এই যুক্তি স্বীকার করলেও এর পেছনে কোন আইনের জোর না থাকায় জাহাজের মালিকেরা তাদের খুসীমত মাল বোঝাই করতো অধিক মাশুল পাবার লোভে। তাই প্লিমসোল পার্লামেণ্টের মাধ্যমে এই সম্বন্ধে আইন পাশ করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর বহুদিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে অবশেষে আইন পাশ হলো। আজ পৃথিবীর সব দেশই প্লিমসোল রেখা মেনে নিয়েছে।

প্রতিটি জাহাজের প্লিমসোল রেখা (বা ওজন রেখা) নির্ধারিত হয়ে থাকে তার আয়তন, ওজন ও অন্যান্য নানারকম বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভিত্তিতে। প্রতিটি জাহাজে বর্তমানকালে যাত্রার পূর্বে প্লিমসোল লাইন অনুযায়ী মাল বোঝাই হয়েছে কিনা, তা বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে দেখেন।

এবার আমরা চিত্রের চিহ্নগুলির দ্বারা কি বোঝায়, তা জানতে পারি। চিত্রের ১২" মাপের একটি গোলাকার চাক্তির স্থায় বৃত্তের মাঝামাঝি ১৮" লম্বা রেখা দেখা যাচ্ছে এবং ঠিক এর উপরে আর একটি ১২" মাপের রেখা আছে। এই চিহ্নটির দ্বারা ডেক লাইন বা জাহাজের উপরে উন্মুক্ত স্থানটি অর্থাৎ ডেক বোঝায়। চিত্রে এই বৃত্তটির ঠিক ২১" দূরে সম্মুখে উপর থেকে একটি নিম্নমুখী সরল লাইনের (Vertical Line) ডান ও বাঁ-পাশে কতকগুলি ৯" লম্বা রেখা সমান্তরালভাবে দেখা যাচ্ছে। এই রেখাগুলি বিভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়া অনুযায়ী মালবোঝাই করবার নির্দেশক। চিহ্নগুলির অর্থ এইরূপ :—

FW—পরিষ্কার জল

I — গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগর

S— গ্রীষ্মকাল

W— শীতকাল

এবং WNA— আটলাণ্টিক শীতকাল

শ্রীদিগেন্দ্রকুমার চৌধুরী

মহাকর্ষ

বৈজ্ঞানিক হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রহস্য-সন্ধানী। কোন রহস্যের জট ছাড়াতে গিয়ে তাঁরা সব সময়েই দেখেন, আরও গভীরতর সমস্যারই সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে অনেক সময় তাঁদের প্রচলিত বহু ধারণাকে বাদ দিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। এরূপ একটি সমস্যা হলো মহাকর্ষ নিয়ে। খৃষ্টের জন্মের চার-শ' বছর আগে অ্যারিষ্টটল থেকে সুরু করে কয়েক মাস আগে হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কত যে গবেষণা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবু এখনও বলা যায় না—এতদিনে আমরা একটি সম্পূর্ণ তত্ত্বের সন্ধান পেলাম।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, অ্যারিষ্টটলের মতবাদই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত ছিল—প্রায় দু-হাজার বছর হবে। কিন্তু তাঁর মতবাদ আজ আমাদের কাছে নেহাৎ হাস্যকর বলেই মনে হয়। অ্যারিষ্টটল মনে করতেন, বস্তুর ভার জিনিষটা তার উপর ভগবৎ-দত্ত অধিকার। একটা ভারী জিনিষ একটা হাল্কা জিনিষের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়ে—কেন না, ভারী জিনিষটা নীচের দিকে চলবার অধিকার লাভ করেছে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে। বস্তু সম্পর্কে এই ধারণার বশবর্তী হয়েই অ্যারিষ্টটল বলেছেন—

$$\text{বেগ} \propto \frac{\text{ভার (বা ওজন)}}{\text{মাধ্যমজনিত অবরোধ}}$$

কোন জিনিষ ছুঁড়ে দিলে কিছুটা উপরে ওঠে, কারণ ছোঁড়বার সঙ্গে তাকে উপরের দিকে ওঠবার চলৎ-শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। সেই চলৎ-শক্তি ফুরিয়ে গেলেই তার উপর ভার কাজ করবে—বস্তুটি নীচে নেবে আসবে। এখানে একটি লক্ষ্য করবার ব্যাপার এই যে, গ্রীক দার্শনিকেরা মনে করতেন—উপরে ওঠবার চলৎ-শক্তি আর ভার কোন বস্তুর উপর একই সঙ্গে কাজ করতে পারে না। চলৎ-শক্তিকে ভারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় এবং সেটা ফুরিয়ে গেলেই ভারের কাজ আরম্ভ হয়।

এই মতবাদের কিছু কিছু সমালোচনা সুরু করলেন মধ্যযুগের রেনেসাঁসের বৈজ্ঞানিকেরা। কিন্তু প্রকৃত আঘাত এলো গ্যালিলিওর কাছ থেকে। তিনি বললেন, 'ভারী' আর 'হাল্কা'—এগুলি হচ্ছে আপেক্ষিক শব্দ। কোন জিনিষের পড়বার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না; অতএব এদের দূরে সরিয়ে চিন্তা করা যাক। তিনি বললেন—দুটা পৃথক ওজনের জিনিষকে একই সঙ্গে উপর থেকে ফেলে দিলে তারা একই সঙ্গে মাটিতে এসে পড়বে। তিনি পতনশীল বস্তুর গতি এবং পথ পরিভ্রমণ সম্বন্ধে খুব সুন্দর দুটি নিয়মের কথা বললেন—(১) ধরা যাক, কোন বস্তু যদি t সেকেণ্ড ধরে

উপর থেকে পড়তে থাকে, তাহলে তার গতি হবে প্রতি সেকেণ্ডে $t \times$৩২ ফুট এবং সেটা পথ অতিক্রম করবে ১৬$\times t^2$ ফুট। ধরা যাক, একটা কোন বল উপর থেকে ফেলে দেওয়া হলো। তাহলে ৩ সেকেণ্ড পরে সেটার গতি হবে (গ্যালিলিওর নিয়ম অনুসারে) ৩×৩২=৯৬ ফুট / সেঃ এবং সেটা পথ অতিক্রম করবে ৩²×১৬=১৪৪ ফুট। এরকম ভাবে যে কোন সময় পরেই বলটার গতি ও পথ অতিক্রমের হিসাব বের করা যায়।

গ্যালিলিও পড়ন্ত বস্তু নিয়ে প্রচুর গবেষণা করলেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা কোথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন নি। গ্যালিলিওর সমসাময়িক আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রহগুলির কক্ষপথ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে কয়েকটি সূত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হলেন কেপলার। কিন্তু কেপলারও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা চিন্তা করেন নি। অত বড় জ্যোতির্বিদ্ হয়েও কেপলার বিশ্বাস করতেন, গ্রহগুলি কোন ঐশ্বরিক শক্তির বলেই কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। গ্যালিলিওর বলবিদ্যা আর কেপলারের জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হলেন।

একই উচ্চতা থেকে একটা বল নীচের দিকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ও সমান্তরালভাবে একটা গুলি ও ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে। এরা একই সঙ্গে মাটিতে এসে পড়বে।

নিউটনের গবেষণাতেই প্রমাণিত হলো, গ্রহগুলি একে অন্যের পাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয় একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে। নিউটনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি রকম ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তার একটা সূত্র নির্দেশ করা। মহাকর্ষের রহস্য সমাধানে এটাই প্রথম সিঁড়ি। এই নিয়ম অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই একে অন্যকে আকর্ষণ করছে। দুটি বস্তুর ভর যদি m_1 ও m_2 হয় এবং তাদের দূরত্ব যদি d হয়, তবে তাদের মধ্যেকার আকর্ষণ শক্তি (F) হবে, $F = G.\frac{m_1 \times m_2}{d^2}$, G= মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। এই সূত্র অনুসারে দুটি বস্তুর (m_1 ও m_2) মধ্যে একটির ভর যদি দ্বিগুণ করে দেওয়া যায়, তাহলে তাদের

মধ্যেকার আকর্ষণ (F) দ্বিগুণ হয়ে যাবে, কিন্তু দূরত্ব (d)-কে যদি দ্বিগুণ বাড়ানো যায়, তাহলে তাদের আকর্ষণ (F) চারগুণ কমে যাবে। সে জন্তে আমাদের পৃথিবীতে যে জিনিষের ওজন ১মণ, সূর্যে তার ওজন হবে ২৮ মণ। কারণ সূর্যের ভর পৃথিবীর চেয়ে ৩২৯৪০০ গুণ বেশী। ঠিক এরকম ভাবে দেখা যাবে, ঐ এক মণ জিনিষটার ওজন চাঁদে গিয়ে অনেকখানি কমে যাবে, কারণ চাঁদের ভর পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম।

মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁর তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই আবিষ্কৃত হয়েছিল নেপচুন আর প্লুটো গ্রহ! বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হার্শেল লক্ষ্য করেছিলেন, ইউরেনাস গ্রহটি ঠিক নিউটন নির্দেশিত পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে না। তিনি এর দুটি কারণ দিলেন। ইউরেনাস গ্রহের পরেও কোন গ্রহ থাকতে পারে, যা তাকে আকর্ষণ করছে অথবা নিউটনের
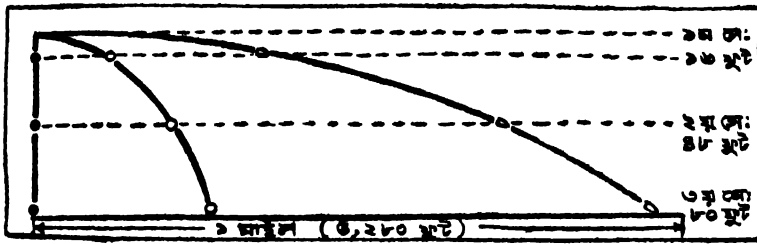
ঢিল ও গুলির পথ পরিভ্রমণ। তাদের যদি ১৪৪ ফুট উচ্চতা থেকে ফেলা হতো।

তত্ত্বে কোথাও ভুল রয়েছে। এই নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে মতবিরোধ দেখা দিল। ঠিক সেই সময় ফরাসী গণিতজ্ঞ লেভেরিয়ের ও ইংরেজ জ্যোতির্বিদ অ্যাডাম্‌স্ আলাদা আলাদা-ভাবে গবেষণা করে বললেন যে, ইউরেনাসের পরে একটি গ্রহ রয়েছে। তাঁরা এই অজানা গ্রহটির কক্ষপথ নির্দেশ করলেন এবং আকাশের কোন্ জায়গায় তার সন্ধান মিলবে, তাও পর্যন্ত নির্দেশ করে দিলেন। তারপর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সত্যই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়লো সেই অজানা গ্রহটি—প্রমাণিত হলো নিউটনের তত্ত্বের সত্যতা। এটাই হলো নেপচুন গ্রহ। ১৯৩০ সালে ঠিক একই ভাবে আবিষ্কৃত হলো প্লুটো।

মহাকর্ষের চাবিকাঠি সেই প্রথম সূত্রটি নিউটন গাণিতিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করেন নি। ওটা তিনি ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলাফলের উপর নির্ভর করে উদ্ভাবন করেছিলেন। নিউটনের তত্ত্ব দুটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ মাধ্যম ও সময়ের বালাই না রেখে কোন বস্তুর আকর্ষণ শক্তি বিশ্বের যে কোন স্থানে অন্য একটি বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিজ্ঞানীরা একে বলেছেন—

Action at a distance। দ্বিতীয়তঃ মহাকর্ষ নির্ভর করবে বস্তুর ভর বা জাড্যের (Inertia) উপর। ভর বেশী হলে জাড্য বেশী হবে, অতএব মহাকর্ষ তার উপর আরোপিত হবে বেশী। কিন্তু জাড্যের সঙ্গে মহাকর্ষের সম্পর্কের কারণটা কি? নিউটনের মতে এটা নেহাৎই প্রকৃতির একটা সাধারণ ধর্ম।

দু-শ' বছর ধরে এই ধারণাই চলে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ ধরা পড়লো, বুধ গ্রহের কক্ষপথ প্রতি এক-শ' বছরে ৪৩ সেকেণ্ড করে ঘুরে যায়। এটা কিন্তু কিছুতেই নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল না। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিউটনীয় ধারণার সমালোচনা সুরু করলেন। তিনি দেখালেন, দুটি গ্রহের আপেক্ষিক গতি খুব বেশী হলে এবং তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানও বেশী হলে, তাদের কক্ষপথ নিউটনীয় সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না—যার জন্যে বুধগ্রহ ঠিক ঠিক নিউটনের নির্দেশিত পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যে বুধের কক্ষপথ ব্যাখ্যা করা গেল। তাঁর মতে, মহাকর্ষ আলোর গতিতে পথ অতিক্রম করে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব খুবই জটিল। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে তা আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর তত্ত্ব সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। পদার্থবিদ্‌দের মতে, এই তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ যতখানি বুঝতে পেরেছি, গত আড়াই হাজার বছরে তার অংশ মাত্রও বুঝি নি। তাহলে কয়েক মাস আগে হয়েল-নারলিকার কি বলেছেন? তাঁরা আইনস্টাইনের তত্ত্বের কোন ভুল বের:করেন নি—সেই তত্ত্বকে আবার কিছুটা বাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁদের তত্ত্বের কয়েকটি সিদ্ধান্ত খুবই আশ্চর্যজনক। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেকটা মুছে ফেলা যায়, তবে নাকি সূর্য পৃথিবীকে আরও দ্বিগুণ জোরে আকর্ষণ করবে আর তার ঔজ্জ্বল্যও যাবে বেড়ে—প্রায় ১০০ গুণ। তা কি সত্যই হতে পারে? কেউ তা বলতে পারে না। কারণ এই সিদ্ধান্তের পরীক্ষামূলক প্রমাণ এখনও দেওয়া যায় নি। হয়তো বা ভবিষ্যতে অন্য কোন বিজ্ঞানী এসে মহাকর্ষ সম্বন্ধে দেবেন আরও আশ্চর্যজনক তত্ত্ব—যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আরও তলিয়ে দেখতে সহায়তা করবে।

শ্রীঅমিতাভ পাইন

মানুষ-খেকো মাছ

সমুদ্রে যে সব ভয়ঙ্কর জীবের অস্তিত্ব আছে, তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে পিরান্‌হা বা মানুষ-খেকো মাছ। বিজ্ঞানের ভাষায় এই মৎস্য পরিবারের নাম Characidae। Characid নামটিই অবশ্য বর্তমানে বেশী প্রচলিত।

সাধারণতঃ এই মাছগুলি দেখা যায় মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার সমুদ্রের স্থানবিশেষে। পিরান্‌হা নানা আকারের হয়ে থাকে। সবচেয়ে ছোট মাছের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি, আর বড় জাতের মাছ পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এরা ভয়ঙ্কর রকম মাংসাশী হয়ে থাকে। অবশ্য অনেক জাতের Characid মাছ আছে, যারা এক রকম নিরামিষভোজী। চার-পাঁচ জাতের Characid মাছই মাংসাশী হয়ে থাকে। এরা বেশীর ভাগই দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে বিচরণ করে। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ মেয়ার Aquarium Journal নামক একটি মাসিক পত্রিকায় এই পিরান্‌হা মাছের সম্বন্ধে এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিখেছিলেন ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায়। তিনি লিখেছিলেন—'মাত্র এক ফুট লম্বা এই মাছগুলির দাঁত অতি সাংঘাতিক ধারালো করাতের মত। এর সাহায্যে এরা মানুষ—এমন কি, কুমীরের গা থেকেও অতি সহজেই খণ্ড খণ্ড মাংস কেটে নিতে পারে। এমন নিপুণভাবে কাটে, যেন কোন ধারালো ক্ষুরের সাহায্যে কেটে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। পিরান্‌হা মাছ কাউকেই ভয় পায় না। তড়িৎগতিতে এরা আক্রমণ করে। এরা কখনও একাকী থাকে না, সব সময়েই হাজার হাজার মাছ দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়। কোন রকম উত্তেজনার কারণ ঘটলেই এরা সেখানে উপস্থিত হয়। রক্তের গন্ধ পেলেই এরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকায় এদের নাম শুনলে সবাই আতঙ্কিত হয়। অ্যামাজন নদীতেও এরা সর্বাধিক ভয়ঙ্কর জীব, সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যেও।

চার জাতের সাংঘাতিক পিরান্‌হার মধ্যে Serrasalmus natterei জাতের মাছ সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। সবচেয়ে বড় জাতের পিরান্‌হার নাম Serrasalmus piraya। দৈর্ঘ্যে এরা ২ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের বেশীর ভাগ দেখা যায় ব্রেজিলের সানফ্রান্সিস্‌কো নদীতে। অন্যান্য জাতের পিরান্‌হা অনেক ছোট আকারের হয়ে থাকে। অবশ্য আকৃতির পার্থক্যের জন্যে এদের হিংস্রতার কোন তারতম্য হয় না। কারণ এরা আক্রমণ করে দলবদ্ধভাবে আর নিমেষের মধ্যেই আক্রান্ত প্রাণীকে নিঃশেষ করে ফেলে। দু-জাতের পিরান্‌হার নাম Black piranhas বা কালো

পিরান্‌হা। কারণ এদের রং কালো। এসব মাছ সাধারণ মৎস্যাগারেও পালন করা হয়, অবশ্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আইনের সাহায্যে এই মাছ আমদানী ও বিক্রয় করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য বন্দী অবস্থায় তাদের ডিম পাড়বার কথা খুব কমই শোনা গেছে। একমাত্র ১৯৬০ সালে শিকাগোর জন. জি. শেড মৎস্যাগারের উইলিয়াম ব্রেকার জানান যে, সেখানে একটি পিরান্‌হা ডিম পেড়েছে। তিন বছর মৎস্যাগারে পালন করবার পর ঐ মাছটি ডিম পাড়ে। এর পরে পুরুষ পিরান্‌হা ঐ ডিম পাহারা দিতে থাকে। পাঁচ দিনের মধ্যেই ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।

পিরান্‌হারা সাধারণতঃ ছোট ছোট মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। মাঝে মাঝে নিজেদের জাতের অন্যান্য মাছও ওরা খেয়ে ফেলে। কদাচিৎ ওরা কোন বড় জাতের মাছ শিকারের সুবিধা পায়। কারণ পিরান্‌হা অধ্যুষিত অঞ্চলে সাধারণতঃ কোন প্রাণীই যায় না। এদের হাত থেকে তিমি বা হাঙর কোন প্রাণীরই নিস্তার নেই। এই মাছগুলি যে কত সাংঘাতিক, তা প্রমাণিত হয় এই থেকে যে, একটি এ-কশ' পাউণ্ড ওজনের মাছকে ওরা এক মিনিটেরও কম সময়ে খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। এরা সামান্য গোলাকৃতির হয়ে থাকে। সাধারণ মাছের মতই এদের পাখ্‌না আছে দেহের দু-পাশে। মুখের দু-পাশে আছে সারি সারি করাতের দাঁতের মত তীক্ষ্ণ দাঁত।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা পিরান্‌হা ধরে খেয়েও থাকে। ওদের মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু। তারের জালের সাহায্যে পিরান্‌হা ধরা হয়। তবুও অনেক সময় ঐ জাল কেটে ওরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মৃতপ্রায় পিরান্‌হাও কম সাংঘাতিক নয়! দেখা গেছে, এই অবস্থায়ও ওরা মানুষের আঙুল বা দেহের কোন অংশ কামড়ে ছিঁড়ে নিতে পারে।

এরূপ সাংঘাতিক হওয়া সত্ত্বেও মৎস্যাধারে এই মাছগুলি নিরীহের মতই বাস করতে পারে। সম্ভবতঃ দলছাড়া হওয়ায় এরা অতটা ভয়ঙ্কর হয় না। তবুও মৎস্যাধারে এই মাছও অনেক সময় মানুষের আঙুল কেটে নিয়েছে বলে শোনা গেছে। আবার অন্যান্য মাছ এদের সঙ্গে রাখলে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের খেয়ে শেষ করে ফেলে। সাধারণতঃ মৎস্যাধারে পিরান্‌হার সঙ্গে অন্য জাতের মাছ ওদের খাদ্য হিসাবে রাখা হয়,

যাতে ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে। কারণ, সামনে অন্য জাতের মাছ দেখলে ওরা তাকেই আক্রমণ করে থাকে।

এক জাতের পিরান্‌হা সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ খেয়েই জীবনধারণ করে। সহজে এদের চিনে আলাদা করা কঠিন। কেবল মাত্র এদের দাঁত অত তীক্ষ্ণ নয় এবং এদের আকৃতিও ছোট। এদের অনেক সময় Silver Dollar'ও বলা হয়। Boulengerella lucius নামেও আর এক ধরণের পিরান্‌হাও অতি সাংঘাতিক। এরা অন্যান্য মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের শিকার-কৌশল বেশ মজার। জলের উপরের দিকের উদ্ভিদের মধ্যে এরা আত্মগোপন করে থাকে। সে সময় কোন মাছ কাছাকাছি আসা মাত্র তাকে আক্রমণ করে' গিলে ফেলে। পিরান্‌হা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে পারে, যার ফলে প্রায় চোখের নিমেষে এরা আক্রমণ করতে পারে।

আফ্রিকায় প্রাপ্ত Characid জাতের মাছ কিছুটা অন্য ধরণের। এদের দেহ সামান্য ভারী হয়ে থাকে। আফ্রিকায় আর এক জাতের মাছ আছে, যার নাম Phago। এদের মাথা চ্যাপ্টা। এরাও সাংঘাতিক রকমের মাংসাশী। যে কোন বড় প্রাণীকে এরা বিনা দ্বিধায় আক্রমণ করে থাকে। পিরান্‌হা সাধারণ মাছের মতই ডিম পাড়ে। এরা অনেক সময় নিজেরাই ডিমগুলিকে ছড়িয়ে ফেলে। এই পিরান্‌হা মাছ কখনও এক জায়গায় থাকে না—অনবরত আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং সামনে অন্য কোন প্রাণী দেখলেই প্রবল বেগে আক্রমণ করে। মানুষের সৌভাগ্য এই যে, পিরান্‌হা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় না। তাহলে ব্যাপারটা যে অতি সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতো, তাতে সন্দেহ নেই।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ

কলকাতায় ডাঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার

নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রবক্তা তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার তিন দিনের জন্যে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় এসে-ছিলেন। এই সময় তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স, সাহা ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বোস ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি গবেষণা-গারগুলি পরিদর্শন করেন এবং জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহাকর্ষ সম্পর্কে তাঁদের (অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল সহ) নতুন তত্ত্বের বিষয়ে তিনি যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সাহা ইনষ্টিটিউটে দুটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শেষোক্ত সভায় অধ্যাপক সত্যেন বসু সভাপতিত্ব করেন। এখানে ডাঃ নারলিকার মাক-এর তত্ত্ব ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ডাঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারকে অভিনন্দিত করছেন অধ্যাপক সত্যেন বসু

ফটো—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-এর সৌজন্যে

ডাঃ নারলিকারের বক্তৃতার শেষে তাঁকে

অভিনন্দিত করে অধ্যাপক বসু বলেন, হয়েল-নারলিকারের নতুন তত্ত্ব আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অনুধাবন করছি। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ নারলিকার যে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমি বিশেষ আনন্দিত। তাঁদের নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বিজ্ঞান-জগতে এক যুগান্তর ঘটবে।

গুড় শোধন

গুড় শোধনের জন্যে বাজারে নানারকমের যে সব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলি ব্যবহার না করাই ভাল। এর ফলে গুড়ের স্বাদ, গন্ধ ও গুণের হানি ঘটে এবং বাজারে ঐ গুড়ের দামও কমে যায়।

অনেক সময় শুধু রং বা গাঢ় করবার জন্যেও এসব কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে ফল খুব ভাল হয় না, কারণ এসব রং ও গন্ধ বেশী দিনের জন্যে স্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরেই এই গুড়ের রং ও গন্ধ চলে যায়, তখন অশোধিত গুড়ের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তবে গুড়ের স্বাদ বৃদ্ধি বা গাঢ়ত্বের জন্যে চুনের জল বা সোডার ব্যবহার চলতে পারে।

ভাল গুড় তৈরির জন্যে দেশী পদ্ধতিই ভাল। কোনও কোনও গাছপালা বা তার বীজ এদিক দিয়ে বেশ কার্যকরী। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল দেওলী, চিনাবাদাম ঢ্যাড়স, শিমুল, ফলসা এবং রেড়ী প্রভৃতি।

কুসুম ফুলের শত্রু 'মরিচা' রোগ

মরিচা রোগ কুসুম ফুলের ফলনে খুব ক্ষতি করে। এই রোগ দূর করবার উপায় কিন্তু বেশ সহজ। রোগের লক্ষণ হচ্ছে, গাছের পাতার নীচে প্রথমে বাদামী রঙের ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। এগুলি ছোট ছোট বীজাণুতে ভর্তি। ছয়-সাত দিনের মধ্যে এই রোগ কচি পাতা ও সবুজ ডালে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে গাছ নষ্ট হয় আর ফলন কমে যায়। এই রোগ খুব দ্রুত বাড়ে এবং একটা ফসল থেকে আর একটা ফসলে ছড়িয়ে পড়ে।

এই রোগ দমন করতে হলে গাছের শুক্‌নো ডালপালা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আর সব সময়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। এগ্রোসান জি-এন দিয়ে শোধন করলে বীজ জীবাণুমুক্ত হবে। ৩ তোলা এগ্রোসান জি-এন ১২ পাঃ কুসুম বীজের সঙ্গে মেশাতে হবে।

কুসুম ক্ষেতের আশেপাশে যেন শিয়ালকাঁটা না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ এই রোগের বীজাণু শিয়ালকাঁটার গাছে বাড়তে পারে।

নারিকেলের চাষে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্র সার

কেন্দ্রীয় নারিকেল সমিতি প্রায় সাত বছর ধরে কেরলে, দোআঁশ ও লাল মাটিতে গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নারিকেলের চাষে মিশ্র সার দিলে ফলন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়। কারণ নারিকেল গাছের পক্ষে পটাস, নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরিক অ্যাসিড—এই তিনটি উপাদানই বিশেষ দরকারী।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে নারিকেল ক্ষেতের বিশেষ কোনও পরিচর্যা করা হয় না, অথচ বারো মাসই আমরা কিছু না কিছু ফল পেয়ে থাকি। জমির উপাদানে যে ঘাট্‌তি পড়ে, তা পূরণ করতে পারলে ফলন বেশী হওয়া স্বাভাবিক।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একর প্রতি ½ মণ নাইট্রোজেন, ½ মণ ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও ১ মণ পটাস মিশিয়ে প্রয়োগ করলে শতকরা ৩৫ ভাগ নারিকেলের ফলন ও শতকরা ৪৪% শাঁস বেশী পাওয়া যায়।

ভ্রম সংশোধন—গত মার্চ সংখ্যায় "পৃথিবীর জনসংখ্যা" শীর্ষক বিবিধ সংবাদে শেষের দিকে "১০ কোটির" স্থলে ১ কোটি হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি ও উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের এই অনুষ্ঠানে আজ পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা এই শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আমরা আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৮ সালে এই পরিষদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের এই সাংস্কৃতিক কর্ম-প্রচেষ্টার সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে এখন অষ্টাদশ বর্ষ চলছে। আজ এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমরা বাংলার বরেণ্য সন্তান সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে বিশেষ গৌরব বোধ করছি এবং আশা করছি, পরিষদের কাজে আমরা তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করে এর অধিকতর কর্মপ্রসার ও সাফল্যের পথ খুঁজে পাবো। এই সম্মেলনে আমাদের প্রধান অতিথি হিসাব প্রখ্যাত স্থপতিবিদ্ শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য-বিশারদ মহাশয় যোগদান করে আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেও পেয়েছি। আমরা পরিষদের প্রতি তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা আজ আর নূতন করে বলবার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। দীর্ঘ সতেরো বছর যাবৎ পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্যাদি ও ভাবধারা দেশের জনগণের মধ্যে পরিবেশন করে আসছে। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও বিজ্ঞান-চেতনার উন্মেষ সাধন করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজেদের মাতৃভাষায় সহজ কথায় বিজ্ঞানের তথ্যাদি ও দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-সংবাদ দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে পরিষদ এই আদর্শ গ্রহণ করেছে।

একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত অনুশীলন ও তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে না পারলে কোন দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে না। কেবলমাত্র শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারের গণ্ডীতে বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ রাখলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারা তাই দেশের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই প্রচেষ্টাকেই বলে বিজ্ঞান-জনপ্রিয়করণ। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এই প্রচেষ্টা বহুদিন আগে থেকেই চলছে।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের অজস্র অবদান আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছি, দৈনন্দিন জীবনে

বিজ্ঞানের দান হিসেবে নানা সুখ-সুবিধা আমরা ভোগ করছি, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা শুনছি; কিন্তু কোন্ জিনিষটা কি, কি করে কি হলো, তার মূল কথাটা পর্যন্ত জানবার বা বোঝবার আগ্রহ বা উৎসাহ আমাদের দেশের লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। জন-মানস থেকে এই বিজ্ঞান-বিমুখতা ও ঔদাসীন্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণাগারের উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানই কেবল বিজ্ঞান নয়; মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য তথ্য ছড়িয়ে আছে। সে সব জানলে ও বুঝলে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও চিন্তাশীলতা গড়ে ওঠে। বিজ্ঞান-প্রগতির ইতিহাসে এরূপ অনেক দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেক সময় একটা সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা লুকানো থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে ও অনুকূল আবহাওয়ায় সেই প্রতিভা বিকশিত হয় এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে দেশ ও জাতি উন্নত হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই পরিবেশ গঠনের জন্যেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ একান্ত প্রয়োজন। আর সেই আদর্শ সামনে রেখে আমাদের এই বিজ্ঞান পরিষদ যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে।

এই বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে এই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতি বছর আমাদের বলতে হচ্ছে। বারংবার পুনরুক্তি হলেও এই উপলক্ষ্যে এসব কথা দেশবাসীর নিকট আমাদের নতুন করে তুলে ধরতে হয়; কারণ, বিজ্ঞানকে জন-প্রিয়করণের ক্ষেত্রে এই পরিষদ বাংলার জনগণের একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বলে আমরা মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মত অনগ্রসর দেশে মাতৃভাষায় যথাসম্ভব সহজ ও সরল কথায় জনসাধারণকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি জাতীয় কর্তব্য। আর বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে পরিষদের কর্ম-প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যাপকতার উপরে দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে বলেও আমরা মনে করি।

যাহোক, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এই আদর্শ সামনে রেখে পরিষদ গত সতেরো বছর যাবৎ বিভিন্ন পরিকল্পনায় যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। একথা সহজেই অনুমেয় যে, সারা দেশে পরিষদের আদর্শের প্রসার সাধন ও সমগ্র দেশবাসীকে বিজ্ঞান-সচেতন স্তরে তুলতে হলে যে ব্যাপক আয়োজন ও বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, আমরা তা করতে পারি নি। তার জন্যে যেরূপ বিপুল অর্থব্যয় ও দেশব্যাপী সংগঠনের প্রয়োজন, পরিষদের মত একটি ক্ষুদ্র জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। তথাপি পরিষদ তার সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে আদর্শের পথে কিছুটা যে অগ্রসর হয়েছে, দেশের জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি যে কিছুটা আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছে, সে কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে গত বছর এই প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় সরকারী তরফ থেকে পরিষদকে যে শুভেচ্ছা-পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার কিয়দংশ এখানে আমরা প্রকাশ করছি:

"...বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে যে প্রয়াস করে আসছেন, দেশের জনসমাজের কাছে সে কথা অপরিজ্ঞাত নয়। এই পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ মুখপত্র। দেশ ও জাতিকে বড় করে তুলতে হলে জনমানসে বিজ্ঞান-চেতনার সৃষ্টি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন—একথা বলবার অপেক্ষা

রাখে না। যুদ্ধ এবং শান্তি—উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আধুনিক মানুষের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যত বাড়ে, মানুষের মনে তত শুভ বুদ্ধির আলোকপাত হয় এবং মানুষের কর্মনৈপুণ্যও এই ভাবে বৃদ্ধি পায়।

জাতির জীবনে এই বিজ্ঞান-বুদ্ধি জাগ্রত করবার কাজে নিযুক্ত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাই সকলেরই সমর্থন ও সহায়তা লাভের যোগ্য। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে আমি এর কর্মকর্তা ও সদস্যগণকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জা াই এবং পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিষদের এক জন আজীবন সদস্য।

যাহোক, কর্মসচিব হিসাবে পরিষদের এই বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে বিগত বছরের একটি বিবরণী আমাকে দিতে হয়; তাই পরিষদ তার সীমাবদ্ধ অর্থসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আলোচ্য বছরে যা কিছু করেছে এবং করবার চেষ্টা চলছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের কাছে বিবৃত করছি। পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ কোন নতুন কাজে হস্তক্ষেপ করা এ-বছরে সম্ভব না হলেও প্রারব্ধ কাজগুলি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে আমরা সম্পন্ন করেছি। এর মধ্যে বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তকাবলী ও 'জ্ঞান বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালনা, একটি বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরিষদের প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা গত জানুয়ারী (১৯৬৫) সংখ্যায় অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী থেকে বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক এই একমাত্র মাসিক পত্রিকা প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। আলোচ্য বছরেও এই পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শতাধিক প্রবন্ধ, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-সংবাদ ও আলোচনাদি এবং এর 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' অংশে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সহজ বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি এবং জনসাধারণের মধ্যে এই বিজ্ঞান-পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা অনেকটা বেড়েছে। বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে—এমন কি, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা যাচ্ছে। যাহোক, এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার এই জনপ্রিয়তায় আমরা উৎসাহ বোধ করছি। প্রতি মাসের ৭ তারিখে নিয়মিতভাবে আমরা পত্রিকাটি প্রকাশ করে যাচ্ছি; একটি সাময়িক পত্রিকার পক্ষে এরূপ নিয়মিত প্রকাশনা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনায়ও পরিষদ সাধ্যানুসারে কাজ করে যাচ্ছে। গত বছর অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয়ের লিখিত 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী' নামক পুস্তকখানা প্রকাশিত হয়েছে এবং তৎপূর্বে 'সৌরপদার্থবিদ্যা' নামক একখানা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিয়ে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান-পুস্তকের সংখ্যা মোট ২৪ খানা হয়েছে। অবশ্য এর কতকগুলি বই নিঃশেষিত হওয়ার পরে নানা কারণে আর পুনঃ-প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে ডক্টর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত 'কয়লা' এবং ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের 'খাদ্য ও পুষ্টি' শীর্ষক দু'খানা পুস্তক প্রকাশের কাজ চলছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থখানাও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এ কথা বলা প্রয়োজন যে, পরিষদের পুস্তক প্রকাশের কাজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না; বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অতি স্বল্পমূল্যে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পুস্তক প্রকাশ

যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য কাজ! বিজ্ঞানানুরাগী বদান্য ব্যক্তিদের দানের উপরেই আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়। সম্প্রতি শোভাবাজারের শ্রীজগন্নাথ রায় মহাশয়ের নিকট থেকে আমরা এই জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশের সাহায্যার্থে এককালীন ২৫০০৲ টাকা দানস্বরূপ পেয়েছি। পরিষদের এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় এই দানের জন্যে আমরা শ্রীরায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের জন্যে জনসাধারণ, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজকে গল্প-উপন্যাসের পরিবর্তে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে উৎসাহিত করবার জন্যে পরিসদ কর্তৃক একটি অবৈতনিক বিজ্ঞান-পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও বিধি-ব্যবস্থা সহ পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার স্থাপন করা এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, স্থানাভাবই তার প্রধান কারণ। পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্রিকাদির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করবার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞান বিষয়ক সব রকম পাঠ্যপুস্তকও এই পাঠাগারে রাখা হবে।

প্রধানতঃ স্থানাভাবের জন্যেই পরিষদের প্রারব্ধ কাজকর্মের প্রসার সাধন বা কোন নতুন পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে এযাবৎ সম্ভব হয় নি। পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা বহুদিন ধরেই চলছে; এখন অদূর ভবিষ্যতেই আমরা গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ করতে পারবো বলে আশা করছি। মধ্য কলিকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নিকট থেকে ক্রীত জমিতেই পরিষদের বাড়ী তৈরির আয়োজন চলছে। পরিষদের এই গৃহনির্মাণের সাহায্যার্থে সরকারের এককালীন আর্থিক সাহায্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং জনসাধারণের দান হিসাবে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ইতিপূর্বেই সংগৃহীত হয়েছিল। আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, 'কুমার প্রমথনাথ রায় চেরিটেবেল ট্রাস্ট'-এর ট্রাস্টিবর্গ পরিষদের গৃহনির্মাণ ও আদর্শানুযায়ী কাজকর্মের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পরিষদকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন। এখন এই লক্ষাধিক টাকায় গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ করবার জন্যে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্যোগ-আয়োজন করছেন এবং শীঘ্রই এই কাজ আরম্ভ হবে। গত বছর জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পরিষদের প্রস্তাবিত গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছেন।

পরিষদের এই গৃহ-নির্মিত হলে অধিকতর ব্যাপকভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করা যাবে। পরিকল্পনানুযায়ী এই গৃহে পরিষদের নিজস্ব বক্তৃতাকক্ষ, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, বিজ্ঞান-সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন করে জনশিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজে আমরা অগ্রসর হতে পারবো। এই প্রসঙ্গে আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, পরিষদের গৃহ নির্মিত হলে উপযুক্ত পাঠাগার ও বিজ্ঞান-সংগ্রহশালা স্থাপনের কাজের সাহায্য হিসাবে দক্ষিণ কলিকাতার গ্রোভ লেন নিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদকে সম্প্রতি এগারো হাজার টাকা দান করেছেন। তাঁহার এই স্বতঃপ্রণোদিত ব্যক্তিগত দানের জন্যে আমরা এই বিজ্ঞানানুরাগী বদান্য ব্যক্তিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের অন্যতম উপায় হিসেবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষাদিসহ সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করাও আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্যে নিয়মিতভাবে এরূপ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয় নি, মাঝে মাঝে এরূপ বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে মাত্র। আমরা আশা করছি, পরিষদের নিজস্ব বক্তৃতা-গৃহ তৈরি হলে নিয়মিত ভাবে এরূপ বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা হবে। এখন আমরা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আহ্বান পেলে

পরিষদের পক্ষ থেকে এরূপ জনপ্রিয় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করতে পারি। যাহোক, পরিষদের বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রতি বছর নিয়মিত প্রদত্ত হয়ে আসছে। পরলোকগত বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক রাজশেখর বসু মহাশয়ের দানের অর্থে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বছরে বাঙালীর 'খাদ্য ও পুষ্টি' সম্বন্ধে এই স্মৃতি-বক্তৃতা দিয়েছেন ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। পরিষদের নিয়মানুসারে এই বক্তৃতাটি এখন পুস্তকাকারে প্রকাশের কাজ চলছে। তৎপূর্ব বছর অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী' শীর্ষক রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, সেটি ইতিপূর্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

যাহোক, আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আপনাদের নিকট সংক্ষেপে আমার সামান্য বক্তব্য পেশ করলাম। এখন আমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার কথা কিছু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

পরিষদের আর্থিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, পরিষদ এই বছরে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে সাবালকত্ব লাভক্রম করলেও প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারে নি। অবশ্য একথা সত্য যে, এই শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পর-নির্ভরতার উপরেই পরিচালিত হয়ে থাকে। জনসাধারণ ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এরূপ প্রতিষ্ঠান চলে। পরিষদের সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রদত্ত চাঁদার আয় এখনও প্রয়োজনানুরূপ নয়—তা-ও আবার সব বছরে সমান থাকে না। আলোচ্য বছরে পরিষদের মোটামুটি পাঁচ হাজার টাকার ঘাটতি বহন করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আমরা বহু বছর যাবৎ নির্দিষ্ট মাত্র ৩,৬০০৲ টাকা বার্ষিক অর্থ-সাহায্য পেয়ে আসছি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সব দিকে ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ রাজ্য সরকারের এই অনুদান ইদানীং একান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। তবে আশার কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুপারিশ ও প্রচেষ্টায় এই বছর কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-দপ্তর থেকে রাজ্য সরকারের অনুরূপ ৩,৬০০৲ টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় অনুদান পেলে পরিষদের গত বছরের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করছি।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পরিষদের কাজকর্ম ব্যবসায়িক লাভালাভের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না; কাজেই সঙ্গতভাবেই এর আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে পরিষদের এই জনশিক্ষামূলক কর্ম-প্রচেষ্টাকে অধিকতর ব্যাপক ও কল্যাণকর করে তুলতে হলে আপনাদের সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করি, পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সফল করে তোলবার জন্যে আমরা দেশের সুধীবৃন্দ ও জনসাধারণের সহযোগিতা ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাবো এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

পরিষদের এই বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে এই বছর আমরা জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে পেয়ে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ বোধ করছি। বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সুধীদ্বয়ের অবদানের কথা সুবিদিত। আমরা আশা করছি, এঁদের সুচিন্তিত অভিভাষণে পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা যথোচিত উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা লাভ করবো। পরিশেষে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে পরিষদের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইতি—

নিঃ—শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ মে, ১৯৬৫ পঞ্চম সংখ্যা

বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি

সন্দীপকুমার বসু

জীবতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণে জীবের প্রধান ধর্ম হলো বংশবৃদ্ধি। প্রত্যেক জীবেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা তার বংশপরম্পরায় ব্যাপ্ত হয় এবং অন্য ধরণের জীবের সঙ্গে তার পার্থক্য সূচিত করে। যে ভাবে কোন জীবের আপন বৈশিষ্ট্য-গুলি সন্তানপরম্পরায় প্রেরিত হয়, তাকে বলে বংশগতি; অর্থাৎ যে কারণে এক জাতি বা বংশের জীব কেবল সেই জাতি বা বংশের জীবেরই জন্ম ঘটায়, তাকে বংশগতি বলা যায়। সুতরাং বংশ-গতির রহস্য ভেদ করতে হলে প্রজনন সম্পর্কিত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির বিষয় সম্যকরূপে জানা দরকার। সাম্প্রতিক কালে এই জ্ঞানের বিশেষ প্রসার লাভের ফলে জীববিজ্ঞানের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান নিকটতর হয়েছে। বর্তমানে তাই জীববিজ্ঞানীগণ বংশগতির আণবিক বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বংশগতির ক্ষুদ্রতম এককগুলিকে তাঁরা জানতে চান—জানতে চান তাদের সজ্জা, তাদের স্থাপনা এবং তাদের কর্মতৎপরতা। তাঁরা বুঝতে চান সেই সব রাসায়নিক পরিবর্তন এবং ভৌত শক্তিসমূহের রহস্য, যার ফলে জীবনধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলেছে।

জীবতন্ত্র অত্যন্ত জটিল। একটি জীবকোষকে শুধু বাঁচবার জন্যেই অসংখ্য জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়। অথচ প্রত্যেক জীবকে কেবল বাঁচলেই চলে না, সন্তান উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানও তার মধ্যে থাকা দরকার। জৈবরসায়নের চর্চার ফলে জানা গেছে যে,

নিজ ধরণের জীব প্রজননের জন্যে দরকারী সংবাদ জীবকোষের এক বিশেষ ধরণের পদার্থের মধ্যে নিহিত থাকে। এই পদার্থগুলি এক জনি থেকে পরবর্তী জনিতে চালিত হয়ে সেই জনিভুক্ত ব্যক্তির স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদার্থগুলিকে বংশগতির বস্তুগত ভিত্তি বলা যেতে পারে।

যাবতীয় জীবদেহই কোষের দ্বারা গঠিত। জীব এককোষী বা বহুকোষী যা-ই হোক না কেন, তার প্রজনন হয় কোস-বিভাজনের দ্বারা। ব্যাক্টিরিয়া এককোষী জীব। আকারে দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত এর বৃদ্ধি ঘটে, তারপর দুই ভাগে বিভাজিত হয়। এই বিভাজনের ফলে একটি কোষ থেকে একই রকমের দুটি কোষের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ উন্নততর উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রেও যে কোন দুটি জনির মধ্যবর্তী একমাত্র শারীরিক সেতু রচনা করে জননকোষগুলি। একটি পুং-জনন-কোষ ও একটি স্ত্রী-জননকোষ গর্ভাধানকালে মিলিত হয়ে একটি নিষিক্ত ডিম্ব (Fertilized egg) গঠন করে। এই নিষিক্ত ডিম্বটিই হলো নতুন ব্যক্তি। এই নতুন ব্যক্তির বৃদ্ধি ঘটে খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রোটিন এবং প্রোটোপ্লাজমের মধ্যস্থিত অন্যান্য পদার্থ তৈরি করে এবং পুনঃ পুনঃ কোষ-বিভাজনের ফলে। বৃদ্ধিকালের বিভিন্ন সময়ে একদল কোষ বিভেদিত (Differentiated) হয়ে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কলা (যেমন —উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূল, কাণ্ড ও পত্র এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ, গঠন করে। সুতরাং কোন জটিল বহুকোষী জীবের জননের জন্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ এই একটি মাত্র কোষের মাধ্যমে প্রেরিত হয় এবং প্রত্যেক বিভাজিত কোষের মধ্যেও নিজের জননের জন্যে দরকারী সংবাদ থাকে। এই সংবাদকে প্রজনন-সঙ্কেত বলা যায়। অতএব মূলতঃ বংশগতির উপাদানগুলি কোষের বৈশিষ্ট্য, ;বর. নয়। তাই বংশগতির বস্তুগত ভিত্তির আলোচনা একক কোষসমূহের জননসংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলিতেই কেন্দ্রীভূত করা যায়।

কোষের কোন্ উপাদানগুলিতে বংশগত সংবাদ নিহিত থাকে, তা জানতে হলে কোষের গঠন বিবেচনা করা দরকার। প্রায় সব রকম কোষেরই মূল গঠনে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কোষ সাধারণতঃ কোষ-ঝিল্লীর (কখনও কখনও বহিরঙ্গ কোষ-প্রাচীরের) দ্বারা আবৃত থাকে। ঝিল্লীর অভ্যন্তরে থাকে কেন্দ্রীন (Nucleus) এবং সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। অধিকাংশ কোষের কেন্দ্রীনে থাকে ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত সুত্রাকৃতির বস্তু। কেন্দ্রীনস্থ এই সুত্রাকৃতি বস্তুগুলিকে বলে ক্রোমোসোম। সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন ধর্মের কণা, যথা—মাইটোকণ্ড্রিয়া, মাইক্রোসোম প্রভৃতি বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রতিটি কোষে একটি মাত্র কেন্দ্রীন থাকে। দেখা গেছে যে, কেন্দ্রীন সমন্বিত কোষগুলিই কেবল জননক্ষম। অবশ্য ব্যাক্টিরিয়াতে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীন না থাকলেও কেন্দ্রীনের তুল্য কণা পাওয়া যায়। কোষ-বিভাজনের সময় কেন্দ্রীন এক বিশেষ প্রণালীতে বিভাজিত হয়ে প্রত্যেক ক্রোমোসোমের যথাযথ প্রতিলিপি গঠন করে। কেন্দ্রীনের মধ্যস্থিত ক্রোমোসোমই বংশগতির বস্তুগত ভিত্তি। একই জাতীয় জীবের দেহকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রতিটি কেন্দ্রীনের ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও তার আভ্যন্তরীণ গঠনই জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতি নির্ণয় করে। বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন।

প্রধানতঃ টমাস হান্ট মর্গ্যান ও তাঁর সহ-কর্মীদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্রোমোসোমগুলি বংশগতির একক। সুতরাং ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন জানতে পারলে বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তির রহস্য অবগত হওয়া সম্ভব। সাম্প্রতিককালে কোষের অন্যান্য উপাদান

থেকে ক্রোমোসোম পৃথক করে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। ক্রোমোসোমের মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ আছে—প্রোটিন, ডি. এন এ (DNA) ও আর এন এ (RNA)।

প্রোটিন, ডি এন এ এবং আর. এন. এ হলো প্রাকৃতিক পলিমার। কয়েকটি সরল অণুর বারংবার রাসায়নিক সংযোজনের ফলে উৎপন্ন বৃহৎ অণুটিকে পলিমার বলা হয়। কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্ন প্রকার সমবায়ে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি হয় এবং বিভিন্ন প্রোটিনে ১০০ থেকে ১০,০০০ অ্যামিনো অ্যাসিড একক থাকতে পারে। ডি. এন এ এবং আর এন এ চারটি সরল এককের পৌনঃপুনিক যোজনায় গঠিত হয়। এই এককগুলিকে বলে নিউক্লিয়োটাইড। ডি. এন. এ-র নিউক্লিয়োটাইডগুলি গঠিত হয় তিনটি উপাদানে—ডিঅক্সিরাইবোজ, ফস্‌ফরিক অ্যাসিড এবং চারটি বিভিন্ন জৈব ক্ষারক (অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন)। প্রত্যেকটি জৈব ক্ষারক, ডিঅক্সিরাইবোজ ও ফস্‌ফরিক অ্যাসিড রাসায়নিকভাবে একত্রিত হয়ে মোট চারটি নিউক্লিয়োটাইড গঠন করে। একটি ডি. এন. এ. অণুতে এমন ৩০,০০০ নিউক্লিয়োটাইড থাকতে পারে। আর এন এ-র নিউক্লিয়োটাইডগুলিতে ডিঅক্সিরাইবোজের বদলে রাইবোজ এবং থাইমিনের বদলে ইউরাসিল থাকে। ক্রোমোসোমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এই তিন রকমের পদার্থের কোনটিতে বা কোন বিশেষ সমবায়টিতে প্রজনন সঙ্কেত আছে। কেবল জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষা থেকেই এই সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

জীবকোষের কোন্ বিশেষ উপাদানে প্রজনন সঙ্কেত নিহিত আছে, তা প্রমাণ করতে হলে সেই উপাদানটিকে কোন একটি জীব থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করে দেখানো দরকার যে, অপর কোন জীবে সেটি প্রবিষ্ট করিয়ে দিলে দ্বিতীয় জীবে প্রথম জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয় এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বিতীয় জীবের সন্তানপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। আজ পর্যন্ত উচ্চতর প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্রোমোসোম থেকে প্রস্তুত পদার্থ নিয়ে এরূপ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক এই রকমের পরীক্ষা বিশেষভাবে সফল হয়েছে।

১৯২৮ সালে গ্রিফিথ দুই রকমের নিউমোনিয়া জীবাণুর সন্ধান পান। এক রকমের জীবাণু জীবদেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে প্রাণীটি নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়, অপর রকমের জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে না। প্রথম রকমের নিউমোনিয়া জীবাণুকে বিদ্বেষী (Virulent) এবং অপরটিকে অবিদ্বেষী (Avirulent) বলা যায়। ইঁদুরের দেহে তাপনিহত বিদ্বেষী ধরণের জীবাণু প্রবেশ করালেও কোন রোগলক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু গ্রিফিথ দেখলেন জীবন্ত অবিদ্বেষী জীবাণু ও তাপনিহত বিদ্বেষী জীবাণুর মিশ্রণ ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে ইঁদুরটি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং তার রক্তে জীবন্ত বিদ্বেষী জীবাণু দেখা যায়। অসংখ্য কোষ-বিভাজনের পরেও এই বিদ্বেষী ভাব বর্তমান থাকে। সুতরাং তাপনিহত বিদ্বেষী জীবাণুর সংস্পর্শে থাকায় অবিদ্বেষী জীবাণুগুলি বিদ্বেষী জীবাণুতে পরিণত হয় এবং এই পরিবর্তন বংশগতভাবে সন্তান-সন্ততিতে ব্যাপ্ত হয়। এই ঘটনাকে ব্যাক্টিরীয় রূপান্তর (Bacterial transformation) বলে। পরবর্তীকালে ব্যাক্টিরিয়ার অন্যান্য বংশগত লক্ষণও ইঁদুর ছাড়া পরীক্ষা নলের মধ্যে এই ভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করে দেখানো গেছে যে, বিশুদ্ধ ডি এন এ. অনুরূপ বংশগত রূপান্তর সাধন করতে পারে। প্রোটিন বা আর এন. এ ব্যাক্টিরীয়

রূপান্তর ঘটায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ডি. এন. এ-ই বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি।

ব্যাক্টিরীয় ভাইরাস সম্বন্ধে গবেষণার ফল থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, ডি. এন. এ-ই বংশগতির মূল উপাদান। ব্যাক্টিরীয় ভাইরাসগুলি প্রোটিন আচ্ছাদিত ডি. এন. এ. কণা। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এগুলিকে দেখা যায়। এই জাতীয় ভাইরাস কেবল জীবন্ত নির্দিষ্ট ব্যাক্টিরীয় কোষের মধ্যেই জননক্ষম, অন্যথা নয়। ব্যাক্টিরীয় ভাইরাসের জনন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে, এগুলি নির্দিষ্ট ব্যাক্টিরীয় কোষের সঙ্গে আটকে থেকে কোষ-প্রাচীরে একটি ছিদ্র করে আপন ডি. এন. এ ব্যাক্টিরীয় কোষে সঞ্চারিত করে। প্রোটিন আচ্ছাদনটি কোষের বাইরেই থাকে। ভাইরাস-ডি. এন. এ সংক্রমণের ফলে আক্রান্ত কোষটি কেবল ভাইরাস-ডি এন. এ. ও প্রোটিন সংশ্লেষণ করতে থাকে। ক্রমে এগুলি একত্রিত হয়ে নতুন সম্পূর্ণ ভাইরাসকণা গঠিত হয় এবং কোষ-প্রাচীর ছিন্ন করে ভাইরাসগুলি বেরিয়ে আসে। এথেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্যাক্টিরীয় ভাইরাসের প্রজনন-উপাদান হলো ডি. এন এ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ ভাইরাস (যেমন—পোলিও ভাইরাস এবং টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাস) কেবল মাত্র প্রোটিন ও আর. এন. এ-র দ্বারা গঠিত। ব্যাক্টিরীয় ভাইরাসের ডি. এন. এ-র মত এই সব প্রাণী ও উদ্ভিদ ভাইরাসের আর. এন এ অংশটিতেই নতুন সম্পূর্ণ ভাইরাস সৃষ্টির জন্যে দরকারী সমস্ত সংবাদ থাকে। প্রাণী ও উদ্ভিদ ভাইরাসের জননক্ষম আর. এন. এ-র অনুকৃতি (Replication) সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা নেই। সাম্প্রতিক কয়েকটি পরীক্ষা থেকে মনে হয়, এই ধরণের আর. এন. এ-র অনুকৃতি আমন্ত্রক কোষের (Host-Cell) ডি. এন. এ-র সঙ্গে বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। মনে হয়, ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ-র রাসায়নিক গঠনের অত্যন্ত নৈকট্যের জন্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে আর এন. এ-ও মূল প্রজনন-উপাদান রূপে কর্মক্ষম। প্রজনন-বিদ্যার বর্তমান প্রগতির ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, উচ্চতর জীবদেহেও প্রজনন-সঙ্কেত ক্রোমোসোমের ডি. এন. এ-র মধ্যে সঙ্কেতাবদ্ধ এবং আর. এন. এ. এই সঙ্কেতের অনুকথনে নিয়োজিত।

ডি. এন. এ. অণুতে কিভাবে প্রজনন-সঙ্কেত নিহিত থাকে, তা বুঝতে হলে এর আণবিক গঠন সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকা দরকার। ডি. এন. এ. অণুকে বহুসংখ্যক ডিঅক্সিরাইবোজফস্‌ফেটের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলরূপে কল্পনা করা যেতে পারে, যার প্রতিটি ডিঅক্সিরাইবোজের সঙ্গে একটি করে জৈব ক্ষারক যুক্ত থাকে। ডি এন এ-তে সাধারণতঃ চারটি জৈব ক্ষারক দেখা যায়—দুটি পিউরিন (অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন) এবং দুটি পিরিমিডিন (সাইটোসিন ও থাইমিন)। সমস্ত ডি. এন এ-তেই মোট অ্যাডেনিনের পরিমাণ মোট থাইমিনের সমান এবং মোট গুয়ানিনের পরিমাণ মোট সাইটোসিনের সমান হয়। জেম্‌স্‌ ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রীক এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে ডি. এন. এ-র আণবিক গঠন সম্বন্ধে একটি যুগান্তকারী ধারণার প্রস্তাবনা করেছেন। তাঁদের মতে—ডি. এন. এ. অণু দুটি পরস্পর বেষ্টনকারী পলিনিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খলের দ্বারা গঠিত এবং শৃঙ্খল দুটির পিউরিন ও পিরিমিডিন ক্ষারকগুলি হাইড্রোজেন বণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট ক্ষারক-যুগল গঠন করে। এইভাবে একটি শৃঙ্খলের অ্যাডেনিন অপর শৃঙ্খলের থাইমিনের সঙ্গে এবং অনুরূপভাবে গুয়ানিন সাইটোসিনের সঙ্গে হাইড্রোজেন বণ্ডের দ্বারা গ্রথিত থাকে। এই নির্দিষ্ট ক্ষারক-যুগলায়নের (Base Pairing) ফলে একটি শৃঙ্খলের ক্ষারক সজ্জাক্রম অপর শৃঙ্খলটির ক্ষারক সজ্জাক্রম নির্ধারণ করে। ওয়াটসন-ক্রীক

প্রস্তাবিত ডি. এন. এ-র আণবিক গঠনের বিশেষত্ব এই যে, এটি দ্বিশৃঙ্খল সমন্বিত এবং শৃঙ্খল দুটি পরস্পরের পূরক। এই ধারণার সমর্থনে অনেক ভৌত এবং রাসায়নিক প্রমাণ আছে।

আমরা জানি যে, বংশগতি অব্যাহত রাখবার জন্যে কোষ-বিভাজনের সময় তার প্রজনন-উপাদান অবিকলভাবে অনুকৃত হওয়া দরকার, যাতে বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষ দুটিতে পূর্বোক্ত কোষের অনুরূপ প্রজনন-উপাদান থাকে। দ্বিশৃঙ্খল সমন্বিত ডি এন. এ. অণুর ধারণা থেকে প্রজনন-উপাদানের অনুকৃতি সম্বন্ধে আকর্ষণীয় মতের উদ্ভব হয়েছে। এই মতানুসারে অনুকৃতির সময়ে একটি ডি. এন. এ অণুর শৃঙ্খল দুটি পৃথক হয় এবং প্রত্যেক শৃঙ্খলের গঠন ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে। আমরা জানি যে, অ্যাডেনিন ও থাইমিন এবং গুয়ানিন ও সাইটোসিন যুগল রূপে অবস্থান করে। ক্ষারক যুগলায়নের এই নির্দিষ্টতার জন্যে পৃথকীভূত প্রত্যেক ডি. এন. এ শৃঙ্খল তার পূরক শৃঙ্খলটির সংশ্লেষণ পরিচালনা করতে পারে। ফলে, একটি ডি এন. এ অণু থেকে অনুরূপ দুটি ডি. এন. এ. অণুর সৃষ্টি হয়। ডি. এন. এ-র অনুকৃতির উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে অর্ধসংরক্ষণশীল অনুকৃতি (Semiconservative Replication) বলে। মেসেলসন ও স্টালের এক যুগান্তকারী পরীক্ষায় ব্যাক্টিরীয়ার ক্ষেত্রে ডি. এন. এ. অণুর অর্ধসংরক্ষণশীল অনুকৃতি সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জে. হারবার্ট টেলরের উচ্চতর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা থেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আর্থার কর্নবার্গকৃত ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ সম্বন্ধীয় গবেষণাও এই মতের সমর্থক। ইনি দেখেছেন যে, জৈবরাসায়নিক উপায়ে ডি. এন. এ-র সমস্ত ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমন্বিত একটি যৌগ গঠন করা সম্ভব। এই সংশ্লেষণের জন্যে দরকার যথেষ্ট পরিমাণ নিউক্লিয়োটাইড চতুষ্টয়, একটি শক্তি-উৎস, অল্প পরিমাণ এক শৃঙ্খলবিশিষ্ট ডি. এন. এ. এবং ডি. এন. এ. পলিমারেজ নামক একটি বিশেষ এনজাইম (জৈব অনুঘটক)। দ্বিশৃঙ্খলবিশিষ্ট ডি এন. এ.ও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু একশৃঙ্খল সমন্বিত ডি. এন. এ-র মত ফলপ্রদ হয় না। উল্লিখিত বিক্রিয়ায় সৃষ্ট ডি. এন. এ-র ক্ষারক-সংযুতি ও অন্যান্য ভৌতরাসায়নিক ধর্ম বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত ডি. এন. এ-র অনুরূপ হয়। অবশ্য এই উপায়ে এখনও জৈবরাসায়নিক সক্রিয়তাসম্পন্ন ডি. এন. এ. প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি। তবে এই ধারায় সক্রিয় গবেষণা চলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পরীক্ষা-নলে জৈবরাসায়নিক ভাবে ক্রিয়াশীল ডি. এন. এ. সংশ্লেষণও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ক্রোমোসোমের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে যে, অতি ক্ষুদ্র দানার মত বহুসংখ্যক কণিকা সূত্রাকারে গ্রথিত হয়ে এক একটি ক্রোমোসোম গঠন করে। এই কণিকাগুলিকে বলে জিন। জিনগুলি সকল প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ধারণ করে। জীবদেহের সমস্ত বিক্রিয়াই কোন না কোন এনজাইমের প্রভাবে সংঘটিত হয়। এবং সমস্ত এনজাইমই প্রোটিন। সুতরাং জিনের মধ্যে যে বংশগত সংবাদ নিহিত থাকে, তা বিভিন্ন এনজাইমের মাধ্যমে বংশগত লক্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ জিনের সবটুকুই ডি এন. এ.; সুতরাং ডি. এন. এ. এনজাইমসমূহের সংগঠক অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ডি. এন. এ. যদি বংশগত সংবাদের ধারক হয়, তবে নিশ্চয়ই ডি. এন. এ-র ক্ষারক চতুষ্টয়ের সজ্জাক্রমই প্রজনন-সঙ্কেত রূপে ব্যবহৃত হয়। এই সিদ্ধান্ত থেকে স্বভাবতঃই যে সমস্যার উদ্ভব হয়, সেটি হলো—কি ভাবে মাত্র চারটি ক্ষারকের সজ্জাক্রম কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম নির্ধারিত করে নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণ করে? ক্রীক প্রস্তাবিত তথাকথিত "কমাবিহীন সঙ্কেত" এই সমস্যার অনেক যুক্তিসঙ্গত সমাধানের মধ্যে অন্যতম।

আলোচনার সুবিধার জন্যে নিউক্লিয়োটাইড-

গুলিকে A, B, C, D রূপে চিহ্নিত করা যাক। যেহেতু চারটি মাত্র ক্ষারক আছে, সেহেতু একটি ক্ষারক-যুগল একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত হতে পারে না—কেন না, এভাবে মাত্র ৪ × ৪ = ১৬টি অ্যামিনো অ্যাসিড নির্ধারিত হতে পারে। একটি ক্ষারক-ত্রয়ী যদি একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত হয়, তবে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪টি সঙ্কেত শব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, এই ৬৪টি সজ্জার কিছু কিছু অর্থহীন; অর্থাৎ কিছু ক্ষারক-ত্রয়ী কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত নয়। আর একটি অনুমানও মেনে নিতে হবে যে, যে কোন একটি ক্রমে, যথা—ABCDCA যদি ABC এবং DCA অর্থবহ হয়, তবে BCD এবং CDC অর্থহীন হবে। এই অনুমান দুটির ভিত্তিতে সহজেই প্রমাণ করা যায়—এভাবে সর্বাধিক ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড সঙ্কেতাবদ্ধ হতে পারে। AAA, BBB ইত্যাদি ত্রয়ীগুলি অর্থহীন হবে—কেন না, AAA ত্রয়ীটি যদি একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত হয়, তবে কোন ডি. এন. এ. অণুতে···AAAAAA···এই ক্রমটির ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব। কারণ এক্ষেত্রে ১, ২ ও ৩নং ২, ৩, ও ৪নং···ইত্যাদি ক্ষারকের দ্বারা গঠিত ক্রমগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক অনুমান হলো এই যে, দুটি অর্থবহ পরস্পরসংলগ্ন ক্ষারকত্রয়ীর অন্তর্বর্তী ক্ষারক ত্রয়ীগুলি অর্থহীন হবে। সুতরাং AAA, BBB, ···ইত্যাদি চারটি অর্থহীন ক্ষারকত্রয়ী বাদ গেল এবং বাকী রইলো ৬০টি সমবায়। যে কোন ত্রয়ীর বৃত্তীয় বিন্যাসগুলি ব্যবহৃত হতে পারে না; অর্থাৎ ABC ত্রয়ীটি যদি একটি অর্থবহ সঙ্কেত হয়, তবে BCA এবং CAB অর্থহীন বলে বাদ দিতে হবে। সুতরাং ৬০টি সম্ভাব্য সমবায়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ২০টি মাত্র অর্থবহ ত্রয়ী হতে পারে, বাকীগুলি অর্থহীন। , সুতরাং ডি. এন. এ-র চারটি ক্ষারক ত্রয়ীরূপে সজ্জিত হযে কোন প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ধারণ করতে পারে।

ডি এন. এ বংশগতির মূলাধার এই সত্যের প্রতিষ্ঠা জীবন-রহস্যের আণবিক ব্যাখ্যার পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চিন্তার উন্মেষের ক্ষণটি থেকে মানুষের আকুল জিজ্ঞাসা—জীবন কি? এই অদম্য অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞানী মনকে জীবনের ক্ষুদ্রতম মৌলিক এককের সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন জীবন-রহস্যের অন্ধকার নতুন জানার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে নতুন প্রাণের সংশ্লেষণও হয়তো সম্ভব হবে। ডি. এন. এ-র রহস্যভেদ অনাগত সেই গৌরবময় সম্ভাবনার অগ্রদূত।

বায়ুর চাপ আবিষ্কারের কাহিনী

যুগলকান্তি রায়

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬৪৩ সালে ফ্লোরেন্সে। মানুষের জ্ঞানসাধনার পথ তখনো নিষ্কণ্টক হয় নি, জ্ঞানভিক্ষু মানুষের কাছে আর্যবাক্য ও ধর্মযাজকদের কড়া অনুশাসনের প্রচণ্ড বিভীষিকা। মাত্র এক বছর আগে সত্যসন্ধানী গ্যালিলিও সত্য প্রচারের অপরাধে ধর্মীয় কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে বন্দী অবস্থায় প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ—কোপারনিকাসের বিশ্বরূপ প্রচার। তাঁর সেই আত্মাহুতির যন্ত্রণায় পৃথিবী তখনো কাতর। কিন্তু এভাবে কি মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণাকে চেপে রাখা যায়? গুরুর শেষ বিদায়ের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে এগিয়ে এলেন টরিসেলি। প্রকৃতির আর এক রহস্যের চাবিকাঠি মানুষের হাতে তুলে দেবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। প্রায় এক মিটার লম্বা একমুখ খোলা একটি কাচের নল পারদে ভর্তি করলেন। নলটির ব্যাস সর্বত্র সমান। নলটির খোলামুখ আঙুল দিয়ে বন্ধ করলেন। একটি পারদপূর্ণ খোলা মুখটি উল্টে পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে সাবধানে আঙুল সরিয়ে নিলেন। নলটি খাড়া করে রাখতেই দেখা গেল—নলের ভিতরকার পারদ কিছুটা নেমে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নলের মধ্যে পারদস্তম্ভ যেন আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা কিভাবে সম্ভব? তাহলে উপরের অংশটিতে কি কিছুই নেই? টরিসেলির উত্তর হলো—না, কিছুই নেই, ঐ অংশটি শূন্য। টরিসেলির এই কথায় সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নানা লোক নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। তাহলে এতদিনের বিশ্বাস কি মিথ্যা? 'প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না' (Nature abhors vacuum)—অ্যারিস্টটলের এই উক্তি কি ভুল? ঐ অংশে যদি কিছু না-ই থাকে, তাহলে নলের ভিতরের পারদস্তম্ভটি দাঁড়িয়ে রয়েছে কিভাবে? দেড় হাজার বছরের বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হতে পারে না! অ্যারিস্টটলের কথা ভুল হওয়া অসম্ভব। টরিসেলির পরীক্ষাতেই নিশ্চয় কোনও গলদ আছে। এই ধরণের নানা কথা টরিসেলিকে লক্ষ্য করে সকলে বলতে লাগলেন। টরিসেলি ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, বায়ুর ওজনের ফলেই নলের ভিতরের পারদস্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি লিখলেন, আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে রয়েছি। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, বিভিন্ন দিনে নলের ভিতরের পারদস্তম্ভের উচ্চতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এটি লক্ষ্য করবার পর তিনি সমালোচকদের উপহাস করে বললেন—প্রেমাভিনেত্রী তরুণীর ন্যায় প্রকৃতির বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বায়ুশূন্যতার বিভীষিকা থাকতে পারে না। বিভিন্ন দিনে বায়ুর চাপের পরিবর্তনের জন্যেই যে পারদস্তম্ভের উচ্চতার পরিবর্তন হচ্ছে, একথাও তিনি জানিয়ে দিলেন। তাঁর ঐ যন্ত্রই পৃথিবীর প্রথম ব্যারোমিটার। ঐ পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৬০৮-৪৭)।

টরিসেলির এই পরীক্ষার বহু পূর্বেই বায়ুর চাপের কয়েকটি ঘটনা লোকে জানতো। যেমন—দুটি সমতল মসৃণ জিনিষকে চেপে দিলে পৃথক করা খুবই কষ্টকর। পিচকারীর হাতল বাইরে টেনে নিলে পিচকারী জলে ভর্তি হয়। কিন্তু এগুলি যে বায়ুচাপের জন্য হয়ে থাকে, একথা তখন কেউ জানতো না। ব্যাখ্যাস্বরূপ তাঁরা অ্যারিস্টটলের উক্তিকে খাড়া করতো—'প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ

করে না'; অর্থাৎ পিচকারীর হাতল টেনে নিলে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি তা পছন্দ করে না বলে জল পিচকারীতে ওঠে। অ্যারিষ্টটল তাঁদের কাছে অভ্রান্ত। অ্যারিষ্টটলের ধারণা অনুযায়ী তাঁরা ভাবতেন—প্রকৃতিতে শূন্যস্থান সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানেই শূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে, প্রকৃতি সেখানে বাধা দিয়ে তা পূরণ করবেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কূপ ও খনির কাজের জন্যে উত্তোলক পাম্পের বেশ প্রচলন হয়েছিল। ১৬৪২ সালে ইটালীর অন্তর্গত টুস্কানীর ডিউক তাঁর বাগানে জল দেবার জন্যে কতকগুলি কূপ খনন করান। কূপগুলির গভীরতা প্রায় ৪০ ফুটের বেশী ছিল। কূপ থেকে জল তুলতে গিয়ে দেখা গেল, উত্তোলক পাম্প ৩৪ ফুটের বেশী গভীরতা থেকে জল তুলতে পারছে না। এতে সকলের কৌতূহল বাড়লো। তাহলে কি এই নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত প্রকৃতির শূন্যস্থান বিভীষিকা? সারা দেশ জুড়ে তখন গ্যালিলিওর নাম। এর ব্যাখ্যার জন্যে গ্যালিলিওকে ডাকা হলো। গ্যালিলিও তখন অদ্ভুত ধরণের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, ৩৪ ফুটের বেশী উচ্চতার জলস্তম্ভ নিজের ওজনে হয়তো ভেঙে পড়ে বলেই এরকম হয়। বিজ্ঞানের কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, গ্যালিলিওর মনে নাকি বায়ুচাপের একটা ধারণা ছিল। পাম্পে যে কোনও গণ্ডগোল নেই, সে কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন—এমন কি, অ্যারিষ্টটলের কথাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি নাকি তাঁর প্রিয় শিষ্য টরেসেলিকে তাঁর ধারণার কথা বলে যান। অবশ্য ঐতিহাসিকদের এই মতের অনুকূলে এখনও সে রকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

তবে টুস্কানীর ডিউকের বাগানে পাম্প দিয়ে ৩৪ ফুটের বেশী গভীরতা থেকে জল তোলা যাচ্ছে না, একথা টরিসেলি শুনেছিলেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বায়ুর ঊর্ধ্বচাপের অনুমান করেছিলেন। তিনি ভাবলেন পারদ যখন জলের চেয়ে প্রায় সাড়ে তেরো গুণ ভারী তখন বায়ুর যে ঊর্ধ্বচাপ চৌত্রিশ ফুট জলস্তম্ভকে ধরে রাখে, তা ত্রিশ ইঞ্চি পারদস্তম্ভকে ধরে রাখবে। জল নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাত লম্বা কাচের নল দরকার, কাজেই এতে পরীক্ষা করা অসুবিধাজনক। তাই তাঁর অনুমান সত্য কিনা দেখবার জন্যে তিনি পারদ নিয়েই পরীক্ষা করলেন। নলের উপরিভাগের যে অংশটিতে কিছুই নেই বলে টরিসেলি বললেন, তা পদার্থবিদ্যায় 'টরিসেলির শূন্যস্থান' নামে পরিচিত। অবশ্য ঐ স্থানে কিছুটা পারদ বাষ্পের অস্তিত্ব মেলে। টরিসেলির এই পরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃতির আর এক রহস্য—বায়ুমণ্ডলের চাপের অস্তিত্বের বিষয়ে মানুষ জানতে পারলো। শুধু তাই নয়, অ্যারিষ্টটলের যে কথার উপর মানুষ দেড় হাজার বছরেরও বেশী বিশ্বাস রেখে আসছিল, তারও ভিত্তি নড়ে উঠলো। প্রকৃতিতে শূন্যতাও সৃষ্টি করা যায়—টরিসেলির পরীক্ষার এটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

শিষ্যের এই পরীক্ষায় গুরুর আর এক সিদ্ধান্তও প্রমাণিত হলো। বস্তুর পতন সম্পর্কে গ্যালিলিওর একটি সিদ্ধান্ত হলো যে, বিভিন্ন বস্তুর পতনকালের মধ্যে যে সামান্য তারতম্য হয়, তার জন্যে পতন-মাধ্যমই দায়ী। তিনি বললেন, বস্তুর পতনে বাধা দেবে না এমন কোনও মাধ্যমে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে পাখীর পালক ও সীসকখণ্ড একই সঙ্গে ফেলে দিলে একই সময়ে ভূমি স্পর্শ করবে। গ্যালিলিওর এই কাল্পনিক মাধ্যম হলো—বায়ুশূন্য মাধ্যম। কিন্তু বায়ুশূন্যতার বিভীষিকার (Horror vacui) মতবাদ সকলের মনকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই কুসংস্কার ও আর্যবাক্যের প্রতিকূলে সে সময়ে গ্যালিলিওর সিদ্ধান্তের কোন পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তাঁরই প্রিয় শিষ্য টরিসেলি যখন শূন্যতা সৃষ্টি করলেন, তখন গ্যালিলিওর সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হলো।

ফ্রান্সে এখনকার Académie des Sciences-এর মত তখন প্যারিসে Académie Libre নামে জ্ঞানী-গুণীদের এক সংস্থা ছিল। তাঁরা প্রতি বৃহস্পতিবার বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করতেন। অন্ধ কুসংস্কার, আর্ষবাক্যের বিরোধী নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। টরিসেলির এই পরীক্ষার সংবাদ ঐ সংস্থার সম্পাদক ফাদার মার্সের (Mersenne) কাছে পৌঁছালো। ব্লেজে প্যাস্কালের (১৬২৩-৬২) পিতা এতিনে প্যাস্কাল ছিলেন ঐ সংস্থার সদস্য। তাঁরা তখন রুয়েঁতে আছেন। ১৬৪৬ সালের অক্টোবরে ব্লেজে প্যাস্কাল টরিসেলির পরীক্ষার কথা প্রথম শুনলেন। ফ্রান্সের এক উচ্চ-পদস্থ অফিসার পেটিট সে সময় এক কাজে Dieppe-এ যাবার পথে রুঁয়েতে তাঁর বন্ধু প্যাস্কালের সঙ্গে দেখা করেন। কাচের নল ভাল না হওয়ার জন্যে তিনি ও ফাদার মার্সে টরিসেলির পরীক্ষা পুনরায় করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পেটিটের কাছে টরিসেলির পরীক্ষার কথা ও তাঁদের ব্যর্থতার কথা প্যাস্কালরা শুনলেন। সে সময়ে রুঁয়েতে ভাল কাচ-শিল্প গড়ে উঠেছে। সেখান থেকে চার ফুট কাচের নল নেওয়া হলো ও একটি ফার্মেসী থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পারদ নিয়ে আবার পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল পারদস্তম্ভ নলের মধ্যে ত্রিশ ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছে এবং পারদস্তম্ভের শীর্ষ ও নলের উপরিভাগের মধ্যে জায়গাটুকু ফাঁকা। ঐ শূন্যস্থান সম্পর্কে টরিসেলির ব্যাখ্যা পেটিটের জানা ছিল না, তিনি ভাবলেন প্রকৃতির 'শূন্যস্থান বিভীষিকা' সত্ত্বেও কি এভাবে শূন্যস্থান থাকা সম্ভব? ব্লেজে প্যাস্কালের কৌতূহলী মন যেন এতে চিন্তার খোরাক পেয়ে গেল। তিনি মাসের পর মাস নানা রকম পরীক্ষার মাধ্যমে এর উত্তর খুঁজে বেড়ালেন। শূন্যতা সৃষ্টি সম্ভব কিনা, কি সেই শক্তি, যা দিয়ে এই সৃষ্টি সম্ভব—এই সব নানা চিন্তায় দিন-রাত ডুবে রইলেন—এমন কি, বেশীর ভাগ সময় রুয়েঁর কাচের কারখানায় যন্ত্রপাতি নির্মাণ দেখে বেড়াতেন।

তিনি অদ্ভুতভাবে একটি পরীক্ষা করলেন। একটি চল্লিশ ফুট লম্বা কাচের নলের এক মুখ বন্ধ করে নলটি জলে পূর্ণ করলেন। খোলা মুখটি একটি ষ্টপার দিয়ে এঁটে একটি জাহাজের খাড়া মাস্তুলের সঙ্গে খোলা মুখটি নীচের দিকে রেখে বেঁধে দিলেন। তারপর খোলা মুখটি (ষ্টপার দিয়ে আঁটা) একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। ষ্টপারটি খুলে দিতেই দেখা গেল, নলের ভিতরকার জলস্তম্ভের উচ্চতা চৌত্রিশ ফুট, উপরের বাকী ছয় ফুট ফাঁকা। তারপর প্যাস্কাল পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করে হিসেব করে দেখলেন যে, জলের পরিবর্তে পারদ নিয়ে পরীক্ষা করলে নলের ভিতরকার পারদস্তম্ভের উচ্চতা ত্রিশ ইঞ্চি হবে। এমন কি, লাল মদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে হিসেব করে দেখলেন যে, লাল মদের ক্ষেত্রে এর উচ্চতা হবে ৩৪.৬ ফুট। করে এর সত্যতাও প্রমাণ করলেন। এই সব পরীক্ষা থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা গেল, যে শক্তি ৩৪ ফুট জলস্তম্ভকে ধরে থাকে, তা ৩০ ইঞ্চি পারদস্তম্ভ বা ৩৪.৬ ফুট লাল মদের স্তম্ভকে ধরে রাখবে।

১৬৪৭ সালের গ্রীষ্মে প্যাস্কাল প্যারিসে গিয়ে রইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর ঐ সব পরীক্ষার কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর বাড়ীতে নানা জ্ঞানী-গুণীর সমাগম হতে লাগলো। এলেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ডেকার্তে। অবশ্য এর আগেও ডেকার্তে প্যাস্কালের পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ডেকার্তে সে সময় প্যাস্কালের প্রতিভার স্বীকৃতি দেন নি। প্যাস্কাল মাত্র ষোল বছর বয়সে 'কণিক' সম্পর্কে যে বই লেখেন, ডেকার্তে সেটা প্যাস্কালের লেখা বলে স্বীকার করেন নি। এই কারণে

ডেকার্তে ও প্যাস্কালের এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ছিল। এক্ষেত্রেও ডেকার্তের মনোভাবের পরিবর্তন হলো না। শূন্যস্থান সম্পর্কে প্যাস্কাল ডেকার্তের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বললেন - কেন, কিছু সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। ডেকার্তে এইভাবে শূন্যস্থানের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় তাঁর সঙ্গে প্যাস্কালের বন্ধু ম্ রোবার্ভালের তিক্ত বাদানুবাদ হয়। ডেকার্তে শুধু শূন্যতা সৃষ্টির কথাই অস্বীকার করেন নি, বিদ্রূপ করে একটি চিঠিতেও লিখে জানালেন যে, তাঁর তরুণ বন্ধুর (প্যাস্কাল) মাথাতেই কিছু নেই, মনে হলো।

এই সময় ওয়ারশ'তে ফাদার ভ্যালেরিয়ান ম্যাগ্‌নি শূন্যস্থান সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। প্যাস্কালের কাছে এই সংবাদ আসামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর সমস্ত পরীক্ষা ও তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 'Expériences Nouvelles Touchant le vide' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশ করে দিলেন। লেখার ভঙ্গী খুবই সরল ও সহজ। লেখার শেষে এই সিদ্ধান্ত করলেন—প্রকৃতিতে শূন্যস্থান অসম্ভব নয়, মানুষ যতটা ভাবে শূন্যতার প্রতি প্রকৃতিদেবীর ততটা আতঙ্ক নেই।

কিন্তু প্যাস্কালের এই লেখার প্রতিবাদ করলেন ডেকার্তের প্রাক্তন শিক্ষক ফাদার নোয়েল। তিনি বললেন, 'টরিসেলির শূন্যস্থান' প্রকৃত শূন্যস্থান নয়; বিশুদ্ধ বাতাস নলের দেয়ালের নানা ছিদ্র দিয়ে নলের মধ্যে প্রবেশ করে ঐ স্থান পূর্ণ করে রেখেছে। তিনি বললেন, নলটি উল্টে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যখন পারদস্তম্ভ নেমে যায় না, অর্থাৎ তার নামতে যখন সময় লাগে এবং ঐ স্থানের মধ্য দিয়ে যেহেতু আলো যায়, সেহেতু ঐ স্থানটি শূন্যস্থান হতেই পারে না। অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে তিনি শূন্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে বহু দার্শনিক ও আধিবিদ্যক যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন।

প্যাস্কালও থামলেন না! ধর্মীয় কুসংস্কার ও আর্ষবাক্যের বিরুদ্ধে জেহাদ জানিয়ে এগিয়ে এলেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অধিবিদ্যার যুক্তি অর্থহীন। শুধু অ্যারিষ্টটলের নাম না আওড়ে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রমাণ করা উচিত। প্রকৃতির রহস্য সন্ধানের পথে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয় সম্ভব নয়। এই সব নানা যুক্তি দিয়ে তিনি নোয়েলের লেখার তীব্র অথচ সংযত প্রতিবাদ জানালেন।

বায়ুর চাপ সম্পর্কে প্যাস্কালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, তরল পদার্থের চাপের সঙ্গে বায়ুর চাপের সামঞ্জস্য দেখানো। তরল পদার্থের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপেরও যে বৃদ্ধি হয়, তা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি একটি থলি পারদে ভর্তি করে একটি দু-মুখ খোলা কাচের নলের এক প্রান্তে এঁটে দিলেন। তারপর ঐ নলটি একটি জলপূর্ণ পাত্রে ধরে নলটিকে ক্রমশঃ নামাতে লাগলেন। দেখা গেল, থলির মধ্য থেকে পারদ ক্রমশঃ নলের মধ্যে উঠছে। অনুরূপ পরীক্ষা তিনি বায়ুর ক্ষেত্রেও করেছিলেন। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে পারদস্তম্ভের উচ্চতা হ্রাস পায় কিনা, দেখবার জন্যে তিনি তাঁর শ্যালক Perrier-কে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের Puy-de-Dome পর্বতের শীর্ষে টরিসেলির যন্ত্র নিয়ে যেতে লিখলেন। পর্বতটির উচ্চতা প্রায় এক হাজার মিটার। দেখা গেল, পারদস্তম্ভ প্রায় আট সেন্টিমিটার নেমে এসেছে। পরের দিন একটি নল নিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে Notre Dame-এর সর্বোচ্চ টাওয়ারের চূড়ায় যাওয়া হলো। সে ক্ষেত্রেও ঐ একই ফল পাওয়া গেল। এই নলকে যে বায়ুর চাপ নির্ধারণের জন্যে ব্যারোমিটার রূপে ব্যবহার করা যায়, এই সম্পর্কে কারও আর সন্দেহ রইলো না। এমন কি, এই নলের সাহায্যে পর্বতের উচ্চতাও যে বের করা সম্ভব, একথাও প্যাস্কাল জানিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর এই সব পরীক্ষার ফলকে বায়ুর চাপ ও ওজনের কারণস্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর

নিজের কথায়, "এই সব পরীক্ষার ফল বায়ুর চাপ ও ওজনের জন্যেই সম্ভব হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। কেন না, ফ্লুইড (Fluid)-এর সাম্য অবস্থা সম্পর্কে যে সাধারণ সূত্র আছে, এগুলি তারই একটি বিশেষ রূপ।"

এদিকে টরিসেলিরও আগে জার্মেনীতে অটো ভন্ গেরিক (১৬০২-৮৬) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে 'শূন্য-স্থান' সৃষ্টি করবার জন্যে নানা রকম পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্যাস্কালের আগেই ১৬৩৫ থেকে ১৬৪৫ সালের মধ্যে তিনি এই কাজে সফল হন। একটি কাঠের পাত্র জলপূর্ণ করে বন্ধ করবার পর দুজন শক্তিশালী মানুষকে পাম্প করে জল বের করতে বললেন। তিনি ভাবলেন, পাত্রটি থেকে জল বের করে নিলে পাত্রটিতে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা না হয়ে পাত্রটি ভেঙ্গে গেল। আর একটি মজবুত পাত্র নিয়ে অনুরূপভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে পাত্রটির মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলেন। বাতাস জোর করে পাত্রটিতে প্রবেশ করবার জন্যেই এই শব্দ হচ্ছিল। তৃতীয় পাত্রের ক্ষেত্রেও তিনি ওর মধ্যে পাখীর কলরবের মত শব্দ পেলেন। কাঠের পাত্রটির নানা ছিদ্র দিয়ে বাতাসের আনাগোনার জন্যেই এই শব্দ হচ্ছিল। এই শব্দ তিন দিন ধরে শোনা গিয়েছিলো। তখন কাঠের পাত্রের পরিবর্তে তামার গোলক নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন এবং তাঁর সেই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিতও হলো।

তিনি সে সময় ম্যাগ্‌ডেবার্গে থাকতেন। তাঁর বায়ু-পাম্প আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ১৬৫১ সালে সম্রাট তৃতীয় ফার্ডিনাণ্ডের কাছে বিখ্যাত 'ম্যাগ্‌ডেবার্গের অর্ধ-গোলকের পরীক্ষা' দেখিয়ে বায়ুচাপের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করলেন। দুটি ফাঁপা ব্রোঞ্জের অর্ধ-গোলককে মুখে মুখে এঁটে দেবার পর দুদিক থেকে টেনে অতি সহজেই গোলক দুটিকে খুলে নিলেন। এর পর আবার সেই দুটিকে ভালভাবে বন্ধ করে বায়ু-পাম্পের সাহায্যে ভিতরটা বায়ুশূন্য করলেন। গোলক দুটিকে তখন আর সহজে টেনে পৃথক করা সম্ভব হলো না; দুদিকে আটটি করে ষোলটি ঘোড়া টানাটানি করেও পৃথক করতে পারলো না। তিনি বললেন, গোলক দুটির ভিতর বায়ুশূন্য হওয়ায় বাইরের বায়ুর প্রবল চাপের ফলেই গোলক দুটিকে পৃথক করা গেল না। এর পর গেরিক তাঁর বাড়ীর পাশে জল-ব্যারোমিটার স্থাপন করে দৈনন্দিন বায়ুচাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। আবহাওয়ার সঙ্গে ঐ ব্যারোমিটারের জল-স্তম্ভের উচ্চতার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখে তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

পরে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি বায়ুচাপের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছিলেন। রয়াল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট বয়েল (১৬২৭-৯১) নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, নির্দিষ্ট ভরের বায়ুর আয়তন ও চাপের এক সূত্র আবিষ্কার করেন, যা বয়েল সূত্র নামে সুবিদিত। এই বয়েল সূত্রকে বিভিন্ন গ্যাসের নানা আধুনিক মতবাদের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না।

আলোক বর্তিকা

শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু

তড়িৎ-প্রবাহ পরিবাহীকে উত্তপ্ত করে। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জুল প্রথমে তড়িৎ-প্রবাহের সহিত উৎপন্ন তাপের সম্পর্কের বিষয় আবিষ্কার করেন বলিয়া এই প্রকার তাপনকে 'জুলীয় তাপন' বলা হয়।

তড়িৎ-প্রবাহ বস্তুতঃ পরিবাহীর ভিতর দিয়া ইলেকট্রনের চলাচল মাত্র। কোনও পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব-বৈষম্য সৃষ্টি হইলেও ইলেকট্রন ঐ পরিবাহীর নিম্নবিভব বিন্দু হইতে উচ্চবিভব বিন্দুতে যায়। বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে চলিবার সময় ইলেকট্রনে ত্বরণের সৃষ্টি হয়। ফলে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। পরিবাহীর অণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রনের এই বর্ধিত গতিশক্তি অণুতে সঞ্চালিত হয়। পরিবাহীর অণুর শক্তি বৃদ্ধি পায়। অণুর শক্তিবৃদ্ধি উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে পরিবাহীরও উষ্ণতা বাড়ে এবং তাপের উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন পরিবাহীর দুই প্রান্তে একই বিভব-বৈষম্য প্রযুক্ত হইলেও তড়িৎ-প্রবাহের তারতম্য ঘটে। কারণ পরিবাহীভেদে বিভব-বৈষম্য প্রয়োগে ইলেকট্রনের চলাচল ভিন্ন হয়। যে ধর্মের জন্য পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রন চলাচলের তারতম্য ঘটে, তাহাকে পরিবাহীর প্রতিরোধ বলা হয়। পরিবাহীর প্রতিরোধ বেশী হইলে তড়ি-প্রবাহে পরিবাহীর তাপশক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাপশক্তি বৃদ্ধির ফলে কোন কোনও পরিবাহী এত উত্তপ্ত হয় যে, উহা ভাস্বর (Incandescent) হইয়া উঠে এবং আলো বিকিরণ করে। পরিবাহীর এই বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্ন বৈদ্যুতিক বাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক বাতি (Electric Glow Lamp)

তড়িৎ-প্রবাহের তাপন-ক্রিয়া বৈদ্যুতিক বাতিতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। যদিও হেনরিচ্ জিওবেল নামক হ্যানোভারের একজন শিক্ষকই সর্বপ্রথম কার্বন ফিলামেন্টের বাতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারোপযোগী বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক এডিসন। বৈদ্যুতিক বাতির প্রাথমিক যুগে কাচের বাল্বের ভিতর কার্বন ফিলামেন্ট বা সরু তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালান হইত। কিন্তু ইহার ব্যবহারে বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, কার্বন উচ্চতর উষ্ণতায় বায়ুর অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়। ফলে বাল্বটি বায়ুশূন্য করিবার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কার্বনের গলনাঙ্ক ৪২০০° সেন্টিগ্রেড—তথাপিও ইহা ১৮৬৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাতিকে ক্রমশঃ কালো করিয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্বনের প্রতিরোধ কমিয়া যায়—ফলে উৎপন্ন তাপ-শক্তিও হ্রাস পায়। উপরিউক্ত কারণে বর্তমানে কার্বনের পরিবর্তে ধাতব ফিলামেন্ট (সরু তার) ব্যবহার করা হয়। আধুনিক কাচের বাতি বায়ুশূন্য বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসপূর্ণ একটি বাল্ব্। ইহার ভিতর দুইটি মোটা পরিবাহী তামার তারের প্রান্তে একটি সরু তার বা ফিলামেন্ট সংযুক্ত করা থাকে। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক ৩৩৯০° সেন্টিগ্রেড বলিয়া ইহার ফিলামেন্ট ব্যবহার সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রমাণিত হইয়াছে। ফিলামেন্টের প্রতিরোধ শক্তি খুব বেশী বলিয়া তামার তারের প্রান্তে বিভব-বৈষম্য প্রয়োগ করিলে টাংস্টেনের তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয় এবং

ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করে। ফলে ফিলামেন্টটি ভাস্বর হইয়া আলো বিকিরণ করে।

বাল্‌ব্‌ বায়ুশূন্য হইলে ফিলামেন্টের তাপ বায়ুর দ্বারা পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না। সেই জন্য ফিলামেন্টটি বেশী উত্তপ্ত হইয়া বেশী আলো প্রদান করে। কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফিলামেন্ট হইতে ধাতুকণা নির্গত হইয়া বাল্‌বের গায়ে জমিয়া উহাকে কালো করিয়া দেয়। বাল্‌বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকিলে ধাতুকণা নির্গমন বহুলাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু ইহাতে তাপ পরিচলন ও পরিবহন-প্রক্রিয়া কিছুটা ব্যাহত হইয়া উষ্ণতার হ্রাস ঘটায় এবং আলোও কম হয়। বর্তমান বৈদ্যুতিক বাতিতে ফিলামেন্টকে কুণ্ডলীর আকারে জড়াইয়া উপরিউক্ত দোষগুলি মুক্ত করা হয়।

বৈদ্যুতিক আর্ক্‌ বাতি (Electric Arc Lamp)

কোনও তড়িৎ-বর্তনীর পজিটিভ এবং নিগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে দুইটি পরিবাহী দণ্ড জুড়িয়া উহাদের ক্ষণকাল স্পর্শ ঘটাইয়া $\frac{1}{8}$ ইঞ্চির মত দূরত্বে বিচ্ছিন্ন করিলে উভয়ের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আর্ক্‌ গঠিত হয় এবং ঐ আর্ক্‌ হইতে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। ইহাকেই আর্ক্‌ বাতি বলা হয়। কার্বন-দণ্ডই সাধারণতঃ আর্ক্‌ বাতিতে ব্যবহৃত হয়। বর্তনীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতের দ্বারা দণ্ড দুইটির প্রান্তে উপযুক্ত বিভব-বৈষম্য প্রয়োগ করিয়া উহাদের স্পর্শ ঘটাইলে দণ্ড দুইটির যে স্থানে সংস্পর্শ ঘটে, সেই স্থান খুব উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং তখন নিগেটিভ দণ্ড হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেও তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয় না। কারণ নিগেটিভ হইতে নির্গত ইলেকট্রন দণ্ড দুইটির মধ্যবর্তী বায়ুকণাকে আয়নে পরিণত করে। দণ্ড দুইটি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া সাদা হয় এবং আলো বিকিরণ করিতে থাকে। পজিটিভ দণ্ডটি বেশী উত্তপ্ত হয়। পজিটিভ আয়ন নির্গত হইয়া পজিটিভ কার্বন দণ্ডে একটি গর্তের সৃষ্টি করে। পজিটিভ দণ্ডের গর্তের নিকটবর্তী স্থানের উষ্ণতা প্রায় ৪০০০° সেন্টিগ্রেড। দণ্ড দুইটির প্রান্ত হইতেই আলোর বিকিরণ বেশী হয়। সমগ্র আলোর শতকরা ৮৫ ভাগ পজিটিভ দণ্ডের প্রান্ত হইতে, শতকরা ১০ ভাগ নিগেটিভ দণ্ড হইতে এবং আর্ক্‌ হইতে শতকরা ৫ ভাগ নিঃসৃত হয়। নিগেটিভ দণ্ডটি ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইতে থাকে এবং উষ্ণতা হয় প্রায় ২৫০০° সেন্টিগ্রেড। প্রবাহ চলিতে থাকিলে দণ্ড দুইটি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দেখা যায়, পজিটিভ দণ্ডটি নিগেটিভের দ্বিগুণ ক্ষয়িত হয়। সেই জন্য পজিটিভ দণ্ডটির প্রস্থচ্ছেদ নিগেটিভ দণ্ডের দ্বিগুণ রাখা হয়। তড়িৎ-প্রবাহ পরিবর্তী হইলে উভয় দণ্ডই সমান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ফলে উভয় দণ্ডই সমান প্রস্থচ্ছেদযুক্ত থাকে। কার্বন দণ্ড দুইটির মধ্যে যে বিভব-বৈষম্য প্রয়োগ করিলে আর্ক্‌ গঠিত হয় এবং সেই আর্ক্‌ হইতে আলো পাওয়া সম্ভব, তাহা নিম্নের সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়—

$$\text{বিভব বৈষম্য} = \left\{ \text{ক} + \text{খ} \times \text{আর্কের দৈর্ঘ্য} + \frac{\text{গ} + \text{ঘ} \times \text{আর্কের দৈর্ঘ্য}}{\text{তড়িৎ-প্রবাহ}} \right\} \text{ ভোল্ট}$$

[ভোল্ট—বিভব-বৈষম্যের একক]

যেখানে ক, খ, গ এবং ঘ ধ্রুবক এবং আর্কের দৈর্ঘ্য মিলিমিটারে দণ্ড দুইটির প্রান্তের দূরত্ব। পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায়, কার্বন-দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে ৪৪ ভোল্টের মত বিভব-বৈষম্য প্রয়োগ করিলেই আর্ক্‌ গঠিত হয়।

কার্বন দণ্ড (পজিটিভ ও নিগেটিভ) বহুক্ষণ ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাদের সরাইয়া আনিয়া নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখিতে হয়। বর্তমান যুগে আর্ক্‌ বাতির ব্যবহার একেবারেই সীমিত। শিখা আর্ক্‌ বাতি (Flame Arc Lamp) নামে এক

প্রকার বাতির ব্যবহার তবুও কিছুটা প্রচলিত আছে। ইহা অবশ্য আর্ক্ বাতিরই পরিবর্তিত রূপ। শিখা আর্ক্ বাতিতে কার্বন দণ্ডের প্রান্তে গর্ত করিয়া উহাকে ধাতুঘটিত লবণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়। আর্ক্ ঐ লবণকে আঘাত করে এবং লবণও ক্রমশঃ বাষ্পে পরিণত হয় এবং অতি উজ্জ্বল শিখার সৃষ্টি করে। ঐ শিখা হইতে তখন আলো পাওয়া যায়।

ক্ষরণ বাতি (Discharge Lamp)

গ্যাসের আয়নীভবন ধর্ম উজ্জ্বল প্রভার সৃষ্টি করিতে বর্তমান কালে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। নিম্ন বা অল্প চাপে কোনও গ্যাসের মধ্য দিয়া তড়িৎ-ক্ষরণ প্রবাহিত হইলে ঐ গ্যাস আয়নিত হয় এবং উহার আলোক ধর্ম প্রকাশ পায়। উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পারদ-বাষ্প বাতির মধ্যে সামান্য পরিমাণে পারদ থাকে। তড়িৎ-ক্ষরণ ঐ পারদের মধ্যে প্রবাহিত হইলে পারদ বাষ্পীভূত হয় এবং বাষ্প হইতে ক্রমশঃ উজ্জ্বল আলো নির্গত হইতে থাকে। অবশ্য এই আলোর মধ্যে অদৃশ্য অতিবেগুনী রশ্মি বেশী থাকে। পরিচিত নিয়ন-সাইন (Neon Signs) একটি লম্বা নল মাত্র। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ নিয়ন গ্যাস কয়েক মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপে রক্ষিত থাকে। তড়িৎ-ক্ষরণ প্রবাহিত হইলে নিয়ন-সাইন লাল আলো দেয়। সেইরূপ সোডিয়াম বাষ্প ভর্তি নলে তড়িৎ-ক্ষরণ চমৎকার হরিদ্রাভ আলো দেয়।

প্রতিপ্রভ বাতি (Fluorescent Lamp)

পারদ-বাষ্প বাতি হইতে তড়িৎ-ক্ষরণের প্রবাহে যে অতিবেগুনী রশ্মি নির্গত হয়, সেই রশ্মিকে বিশেষ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে পদার্থগুলি অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মিকে শোষণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের দৃশ্য আলো প্রদান করে। রাসায়নিক পদার্থগুলির এই বিশেষ ধর্ম অবলম্বন করিয়া প্রতিপ্রভ বাতি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিপ্রভ বাতির নলগুলি প্রায় ১½ ইঞ্চি মোটা এবং ২ ফুট হইতে চার ফুট পর্যন্ত লম্বা। নলের দুই প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র ভাস্বর ফিলামেন্টের তড়িৎদ্বারে বিভব-বৈষম্য প্রয়োগ করা হয়। ফিলামেন্টগুলি আলোর উৎসের পরিবর্তে ইলেকট্রনের উৎস হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। নলের ভিতর অল্প চাপে নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাস থাকে। সামান্য পরিমাণ পারদও রাখা হয়। ফিলামেন্টের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকিলে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং পারদও ক্রমশঃ বাষ্পে পরিণত হয়। ফলে ঐ বাষ্প আয়নিত হয় এবং উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে। নলের ভিতর প্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে। নির্গত আলোর অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি ঐ পদার্থের দ্বারা শোষিত হয় এবং উহা বিশেষ রঙের আলো নিঃসরণ করে। আজকাল বাসগৃহ এবং রাস্তাঘাটের আলোতে প্রতিপ্রভ বাতির ব্যবহার সন্তোষজনক।

দ্বিধর্মী আলোক-তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ

শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস

প্রাক নিউটনিয়ান যুগ থেকে আলোক-তত্ত্বকে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা তরঙ্গ মতবাদ (Wave theory) দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন মতবাদে (Classical theory) তাই আলোর তরঙ্গবাদের পূর্ণ প্রভাব আমরা আজও দেখতে পাই। তখন তাঁদের ধারণা ছিল যে, কোন উৎস থেকে যখন আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসে, তখন তা তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় বা পুকুরের মধ্যস্থলে যদি একটা ঢিল ছোঁড়া যায়, তাহলে যেমন চতুর্দিকে তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, কোন আলোক রশ্মিও ঠিক সেইভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, উপরিপতন (Interference), ডিফ্র্যাকশন, পোলারিজেশন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আলোর তরঙ্গ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই মাইকেলসন এবং আরও অনেকে আলোর গতিবেগ নির্ণয় করেছেন। নিউটন কিন্তু আলোর এই প্রাচীন মতবাদের উপর একটু নতুনত্ব সৃষ্টি করেন। নিউটনের মতানুযায়ী—কোন উৎস থেকে যখন আলো বেরোয়, তা তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার আকারে বেরিয়ে আসে এবং ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার নাম দেওয়া হলো করপাসলস্ (Corpuscles)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নতুন মতবাদ তখনকার দিনের অনেক বিজ্ঞানীই স্বীকার করেন নি। আলোর বস্তুকণাতত্ত্ব (Corpuscular theory) তখনকার দিনে স্বীকৃতি না পেলেও পদার্থবিদ্যায় নতুন আলোকপাত করলো মাত্র

আজ কিন্তু সেই করপাস্কুলার থিওরী কোন পদার্থ-বিজ্ঞানীর অজানা নেই—অবশ্য নাম হয়েছে নতুন। এই নতুন নাম দিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়ান্টাম মতবাদে (Quantum theory) এবং তিনি আলো-কে খুব ক্ষুদ্র বস্তুকণা হিসাবে স্বীকার করেছেন এবং নাম দিয়েছেন ফটোন।

তিনি দেখিয়েছেন যে, ঐ সব ফটোনের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকণা (Bundle of energy or Packet of energy) নিহিত রয়েছে। ঐ শক্তির পরিমাণকে তিনি গাণিতিক সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, ফটোনের ভিতর যে শক্তি নিহিত রয়েছে, তার পরিমাণ $E=h\nu$। এখানে মনে রাখা দরকার যে, E হচ্ছে ফটোনে নিহিত মোট শক্তির পরিমাণ, h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং ν আলোক বিকিরণের পর্যায় সংখ্যা (Frequency of Radiation)।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর নতুন তত্ত্ব প্রচার করলেন। নতুন তত্ত্বানুযায়ী আলো কে ফটোনের বর্ষণ হিসাবে (Shower of Photon) ধরে নেওয়া হলো এবং বলা হলো যে, যখন কোন উৎস থেকে আলো বেরিয়ে আসে, তখন অসংখ্য ফটোন আলোর গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আলোর এই নবআবিষ্কৃত তত্ত্ব নতুনভাবে বরং প্রত্যক্ষ পরীক্ষামূলকভাবে রূপ পেল বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ফটোইলেকট্রিক সমীকরণে। প্রাচীন আলোক-তত্ত্ব (Classical Theory of Light) ফটোইলেকট্রিক সমীকরণে প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, ফটোইলেকট্রিক সমীকরণকে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না, আইনষ্টাইন তাই প্রয়োগ করলেন নবআবিষ্কৃত আলোর কোয়ান্টাম মতবাদ (Quantum theory)।

প্রসঙ্গক্রমে ফটোইলেকট্রিক সমীকরণ কি, তা একটু জানা দরকার।

আগেই বলেছি, আলো-কে ধরা হয়েছে ছোট ছোট শক্তি কণা হিসাবে—যার নাম দেওয়া হয়েছে ফটোন। এই আলোক শক্তিকণা বা ফটোন (কোন অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি অথবা সাধারণ রশ্মি থেকে আগত) যখন কোন ক্ষার জাতীয় ধাতব পাতের (Alkali metal plate) উপর পতিত হয়, তখন ঐ ধাতুর উপরিভাগ থেকে বেরিয়ে আসে অসংখ্য ইলেকট্রন।

অবশ্য ইলেকট্রনগুলি একটা নির্দিষ্ট সর্তে বেরিয়ে আসে। যখন ধাতুর আভ্যন্তরীণ বন্ধন শক্তি (Internal Binding energy) তার উপর আপতিত ফটোনের শক্তি অপেক্ষা কম হয়, তখন ঐ ধাতুর পাত থেকে ইলেকট্রনগুলি বেরিয়ে আসে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে। আর যদি আভ্যন্তরীণ বন্ধন শক্তি (Internal Binding energy) আপতিত ফটোনের শক্তি অপেক্ষা বেশী হয়, তবে কোন মতেই ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসে না এবং আপতিত ফটোনের যে ন্যূনতম (minimum) মানে ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসে, ফটোনের সেই ন্যূনতম মানকে বলা হয় ঐ ধাতব পদার্থের ওয়ার্ক ফাংসান (Work-function)। আপতিত ফটোনের শক্তি যখন ধাতব পদার্থের Work-function অপেক্ষা বেশী হয়, তখন ঐ পদার্থের ইলেকট্রনগুলি একটা নির্দিষ্ট বেগে বেরিয়ে আসে। আইনষ্টাইন এই যুক্তি দিয়ে তাঁর বিখ্যাত ফটোইলেকট্রিক সমীকরণ খাড়া করেন এবং গণিতের সূত্রে প্রকাশ করেন $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W_0$—এখানে m হচ্ছে স্থানচ্যুত ইলেকট্রনের ভর, v-ইলেকট্রনের বেগ এবং Wo ধাতব পদার্থের Work-function, h এবং ν-কে পূর্বে ব্যাখ্যা হয়েছে।

আলোর এই নতুন মতবাদ দিয়ে ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণের প্রত্যেকটি সর্ত ব্যাখ্যা করা গেল। আলোর তরঙ্গবাদ দিয়ে যেমন ইনটারফিয়া-রেন্স, ডিফ্র্যাকশন, পোলারিজেশন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যায় এবং সেখানে যেমন ফটোন-তত্ত্ব অচল, ঠিক তেমনি ফটোন-তত্ত্ব বা কোয়ানটাম-তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় আইনষ্টাইনের ফটোইলেকট্রিক সমীকরণ এবং তরঙ্গবাদ এখানে অচল। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হই যে, আলো দ্বিধর্মী—তরঙ্গধর্মী ও কোয়ানটামধর্মী এবং আলোক সংক্রান্ত সব ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে আলোর দ্বি-তত্ত্বের অপরিহার্য।

ধূমকেতু-রহস্য

শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

নভোমণ্ডলে সঞ্চরমান বস্তুপুঞ্জের মধ্যে উল্কা আমাদের কাছে একটি অতি পরিচিত নভশ্চর। এই উল্কার কথায় সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—এরা কি এবং কোথা থেকে আসে? এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উল্কার উৎপত্তিস্থল হিসেবে যে ভ্রাম্যমান বস্তুর সন্ধান পেলেন, তাই হলো ধূমকেতু। বিরাট পুচ্ছ সম্প্রসারিত করে যে উজ্জল নভশ্চারী সুদীর্ঘ কাল অন্তর অন্তর একবার করে আকাশে দেখা দেয়, কিছুদিন আগেও তার সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন ধারণাই ছিল না। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সমবেত অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা জানতে পেরেছি তার রহস্য, তার ইতিহাস।

কোন বাঁধাধরা নিয়মে ধূমকেতু ধরা পড়ে না। বহির্বিশ্বের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি তোলবার সময়েই ধূমকেতুগুলি ধরা পড়ে। নক্ষত্রপুঞ্জের সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা এবং একটি টেলিস্কোপ থাকলে ধূমকেতুকে সহজেই খুঁজে বের করা যায়। অনেক সময় নক্ষত্রপুঞ্জকে ধূমকেতু বলে ভ্রম হয়। কিন্তু ধূমকেতুর চলমান অবস্থা থেকেই একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করতে পারা যায়। সাধারণতঃ রাত্রি হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তে এবং রাত্রি অবসানের আগে পূর্ব দিগন্তেই ধূমকেতুর সন্ধান পাওয়া যায়। কয়েক দিন পর্যবেক্ষণের ফলে ধূমকেতুর তিন-চারটি অবস্থান জানতে পারলেই মোটামুটি তার সঞ্চরণ-পথটি বুঝতে পারা যায় এবং তাথেকেই ধরা যায়, সেটি একেবারে নতুন অথবা প্রত্যাবর্তনকারী পুরনো ধূমকেতু মাত্র।

বছরে গড়ে প্রায় ছয় থেকে আটটি ধূমকেতু আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশই পুনরাগত পুরনো ধূমকেতু এবং অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ নতুন। বছরে গড়ে একটারও কম ধূমকেতু খালিচোখে ধরা পড়ে। সন (যে সনে আবিষ্কার হয়, সব সময় তা নাও হতে পারে) এবং তার সঙ্গে একটি রোমান সংখ্যার দ্বারা ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়ে থাকে; যেমন :—1956 11। অনেক সময় অনেক ধূমকেতুরই তার আবিষ্কারকের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়ে থাকে।

কোন ধূমকেতুরই নিজস্ব স্থায়ী কোন বিশেষত্ব নেই, যার সাহায্যে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে বুঝতে পারা যায়। সূর্যের চারদিকে আবর্তনের পথ থেকেই প্রত্যেকটিকে আলাদা করে চিনতে পারা যায়। অদ্যাবধি পরিবর্তনশীল গতিপথের প্রায় ৫০০ ধূমকেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়েছে। তাদের দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে— ১। অধিবৃত্তাকার পথে সঞ্চরমান ধূমকেতু এবং ২। উপবৃত্তাকার পথে সঞ্চরমান ধূমকেতু। প্রথমোক্ত ধূমকেতুর পরিক্রমণ পথ এত দীর্ঘ যে, এই জাতীয় প্রত্যেকটি ধূমকেতুর একবার আবির্ভাবই মাত্র দেখা গেছে। এদের অনিয়মিত ধূমকেতু বলা হয় এবং এদের অর্ধেক পূব থেকে পশ্চিমে এবং অর্ধেক পশ্চিম থেকে পূবে পরিক্রমণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের ধূমকেতুগুলিকে নিয়মিত ধূমকেতু বলা হয়। এদের পুনরাগমনের সময় কয়েক শত বছরের বেশী নয় এবং এরা পশ্চিম থেকে পূবেই ঘুরে বেড়ায়। এই উভয় প্রকারের ধূমকেতুরই একটা তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

অনিয়মিত ধূমকেতু

	নাম	বছর	সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার তারিখ	সূর্য থেকে নিকটতম দূরত্ব (জ্যোতির্বিজ্ঞান এককে)	আবর্তন পথের অবনতি (ডিগ্রী)
১।	রিভ্‌স্	১৯৩১ সি	অগাষ্ট, ১৯৩১	০'১৮	৮৫
২।	পেল্টিয়ার	১৯৩৬ এ	জুলাই, ১৯৩৬	১ ১০	১৬৭
৩।	ফিন্স্‌লার	১৯৩৭ এফ্	অগাষ্ট, ১৯৩৭	০ ৮৬	১৪৬
৪।	কানিংহাম	১৯৪০ ডি	জানুয়ারী, ১৯৪১	০'৩৭	৫২
৫।	হুইপেল	১৯৪২ এফ	ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩	১'৩৬	২০
৬।	বেষ্টার	১৯৪৭ কে	ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮	০'৭৫	১৪০
		১৯৪৭ এন্	ডিসেম্বর, ১৯৪৭	০'১১	১৩৮
৭।	হাণ্ডা-বারনোস্কনি	১৯৪৮ জি	মে, ১৯৪৮	০'২১	২৩
		১৯৪৮ এল	অক্টোবর, ১৯৪৮	০'১৪	২৩
৮।	উইলসন-হ্যারিংটন	১৯৫১ আই	জানুয়ারী, ১৯৫২	০'৭৯	১৫৩

নিয়মিত ধূমকেতু

	নাম	প্রথম দেখা যায়	শেষ দেখা যায়	কালচক্রের বিস্তার (বছর)	সূর্য থেকে নিকটতম দূরত্ব (জ্যোতির্বিজ্ঞান এককে)
১।	পন্স্-ব্রুক্স্	১৮১২	১৯৫৩	৭০'৮৮	০ ৭৭
২।	ক্রোমেলিন	১৮১৮	১৯৫৬	২৭'৮৭	০'৭৪
৩।	পন্স্-উইনেক	১৮১৯	১৯৫১	৬'২৬	১'২৩
৪।	ফেয়ে	১৮৪৩	১৯৫৪	৭ ৪১	১'৬৫
৫।	দ্য এরেষ্ট	১৮৫১	১৯৫০	৬'৬৯	১ ৩৮
৬।	টেম্পল ২	১৮৭৩	১৯৫৬	৫'৩১	১ ১৪
৭।	জিয়াকোবিনি-জিনার	১৯০০	১৯৫৩	৬ ৫৯	১'০০
৮।	ড্যানিয়েল	১৯০৯	১৯৫০	৬'৬৬	১'৪৬
৯।	অটার্মা	১৯৪৩	—	৭'৯৫	৩'৪১
১০।	সোয়াস্মান-ওয়াকমান	১৯২৭	—	১৬'১৫	৫'৫২

অনেক সময় তিন-চারটা ধূমকেতু একসঙ্গে মিলে একটা পরিবার গঠন করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বৃহস্পতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পথে সঞ্চরমান এমন তিনটি ধূমকেতুর একটি পরিবার আছে। সাধারণতঃ কোন গ্রহের পাশ দিয়ে ধূমকেতু যাওয়ার সময়ই এরূপ পরিবার গঠিত হয়। সূর্য থেকে ন্যূনতম দূরত্বের মাত্রাধিক্য এবং কক্ষপথের স্বল্প অবনতিই এরূপ পরিবার গঠনের কারণ। ধূমকেতুকে সৌরজগতের বাইরে থেকে আগন্তুক বলে ধরা হয় এবং যেগুলি দল গঠন করে, তারা শুধু তাদের অবস্থান বিলম্বিত করে মাত্র।

(Aphelion) অবস্থানে দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৮৬ সালে একে অনুসূর (Perihelion) অবস্থানে দেখা যাবে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। নীচে ধূমকেতুটির সঞ্চরণপথের একটা চিত্র দেওয়া হলো।

১৬৬৮, ১৮৪৩, ১৮৮০, ১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সালে দৃষ্ট ধূমকেতুগুলি একটা দল গঠন করে সূর্যের অস্বাভাবিক রকম কাছ দিয়ে চলে গেছে এবং তাদের কক্ষপথ প্রায় একই রকমের। তাদের একই ধূমকেতুর বিভিন্ন অংশ বলে ধরা হয়েছে। সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যাবার সময় আদি ধূমকেতুটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কক্ষপথে ছড়িয়ে
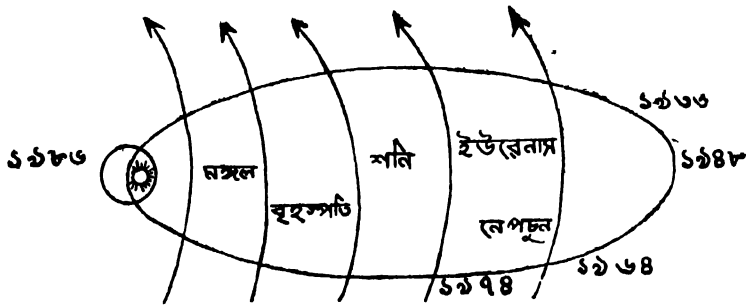
ধূমকেতুর গতিপথ

প্রথম পরিচিত বিখ্যাত নিয়মিত ধূমকেতুটিকে তার আবিষ্কারকের নামানুসারে হেলির ধূমকেতু বলা হয়। হেলিই প্রথম আবিষ্কার করেন—১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালের ধূমকেতুগুলি একই ধূমকেতুর বিভিন্ন রূপ মাত্র এবং ধূমকেতুটি একটি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর ধারণা হলো—এই ধূমকেতুটি আবার ১৭৫৮ সালে দেখা দেবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধূমকেতুটিকে সেই সনেই আবার দেখা গিয়েছিল এবং তার পরেও ১৮৩৫ এবং ১৯১০ সালে দেখা গিয়েছিল। হেলির ধূমকেতুই একমাত্র ধূমকেতু, যার কালচক্র একশত বছরের কম। অদ্যাবধি ২৮ বার এই ধূমকেতুর পুনরাগমন হয়েছে। ১৯৪৮ সালে একে অপসূর

পড়েছে। ১৮৮২ সালে দৃষ্ট ধূমকেতুটিই আধুনিক কালের সর্বাধিক উজ্জ্বল ধূমকেতু বলে ধরা হয় এবং এটাকে দিনের আলোতেও দেখা যায়। এটা ঘণ্টায় দশ লক্ষ মাইলেরও অধিক গতিবেগে সূর্য থেকে ৩০০০০০ মাইল দূর দিয়ে চলে গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, এই ধূমকেতুর কেন্দ্রটি নাকি চার খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং ঐ অংশগুলি পঞ্চবিংশ থেকে অষ্টবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ফিরে আসবে।

যার সাহায্যে ধূমকেতুর পুচ্ছ তৈরি হয় তার তিনটি স্পষ্ট গতিবেগ আছে; যথা—(১) এটা কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়, (২) কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সূর্যালোক এবং সূর্য থেকে কণিকা-

বিকিরণের চাপে সূর্যের দিক থেকে দূরে সরে যায়; ফলে পুচ্ছের আকারে দেখা যায়। সূর্য থেকে যত দূরে সরে যায়, ততই এই পুচ্ছ মোটা হতে থাকে এবং একটা ফাঁপা শিঙের মত আকৃতি ধারণ করে। (৩) ইতিমধ্যে এটা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। অনেক সময় ধূমকেতুর মধ্যস্থিত চূর্ণবিচূর্ণ পদার্থ ধূমকেতুর পশ্চাৎ দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। মোটের উপর এই সব কিছু মিলিয়েই ধূমকেতুর আকৃতি গঠিত হয়ে থাকে।

ধূমকেতুর কেন্দ্রটি উল্কা-গঠনোপযোগী পদার্থ সংমিশ্রিত অত্যন্ত সচ্ছিদ্র তুষার দ্বারা গঠিত বলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। হুইপেলের মতে, এই তুষারের মধ্যে প্রধানতঃ জল, মিথেন এবং অ্যামোনিয়াই আছে। উল্কা-গঠনোপযোগী পদার্থগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশরূপেই থাকে এবং সেগুলি প্রধানতঃ লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সিলিকন, সোডিয়াম এবং অন্যান্য ধাতুরই সংমিশ্রণ। একটা ধূমকেতুর কেন্দ্র এক মাইলের মত ব্যাসসমন্বিত হয়। সূর্যের নিকটবর্তী হবার সময় কেন্দ্রস্থিত তুষারকণাগুলির কিছু অংশ গলে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এরূপ বাষ্পীভূত হবার সময় গ্যাসীয় পদার্থগুলি তীব্রবেগে উল্কা-গঠনোপযোগী পদার্থসহ পুচ্ছমাধ্যমে বেরিয়ে এসে কক্ষপথে ছড়িয়ে যায়। হুইপেলের মতে, প্রতি অনুসূর অবস্থানে একটা ধূমকেতুর প্রায় ১/২০০ ওজন বাষ্পায়িত হয়ে যায়। আর বেশী বাষ্পীভূত না হবার কারণ, শেষভাগে কেন্দ্রটি আরও বেশী সহনশীল হয়ে পড়ে এবং উল্কা-গঠনোপযোগী পদার্থগুলিই তুষারকণাগুলিকে রক্ষা করে। অনেকবার আসা-যাওয়ার পর ধূমকেতুটি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং উল্কা-গঠনোপযোগী পদার্থগুলি উল্কাস্রোত হিসেবে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এই ধূমকেতু এবং উল্কা দুই-ই আজ এক আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁরা এ নিয়ে অক্লান্তভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা এদের সম্বন্ধে আরও তথ্য জানতে পারবো।

মানব বংশধারা-তত্ত্ব ও প্রোফেসার হলডেন

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির আকৃতি-প্রকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও মাঝে মাঝে বিসদৃশ সন্তান-সন্ততি দেখা যায় কেন? সহোদর ভাইবোনের মধ্যে কারুর চোখের মণির রং কটা, কারুর কালো হয় কেন? কারুর চুল কোঁকড়ানো, কারুর সোজা হয় কেন? কারুর বুদ্ধি বেশী, কারুর কম দেখা যায় কেন? কেউ ভাল গান গাইতে পারে, আবার কারও একেবারে সুরজ্ঞান থাকে না কেন? সুস্থ ও নীরোগ বংশে হঠাৎ Albino কিম্বা গন্নাকাটা (Hare lip) সন্তানের আবির্ভাব হয় কেন? এক এক পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে মারা যায় কেন? মৃগী, ডায়েবেটিস ও হাঁপানী রোগের প্রাদুর্ভাব কোন বংশে বেশী, আবার কোন বংশে কম দেখা যায় কেন? মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগ কি বংশগত? কোন কিছু বৈশিষ্ট্য গঠনে বংশানুক্রমের প্রভাব বড়, না পরিবেশের প্রভাব বড়? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই মানবের বংশধারা-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে। মেণ্ডেলের বংশধারা-তত্ত্বের সূত্র পুনরাবিষ্কৃত হবার পর থেকেই বিজ্ঞানের এই শাখার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। একই বা ভিন্ন পরিবারের সন্তান-সন্ততির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ নির্ণয় করাই এই বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য নয়। প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অনিষ্টকর বৈশিষ্ট্যের প্রতিকার বা প্রতিবিধানের পন্থা বের করা এবং সুস্থ ও সুখী মানব-সমাজ গঠন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

মানুষের কোন বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক ধারা নির্ণয় করতে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। গাছপালা বা পশুপক্ষীর যৌন-মিলন নিয়ন্ত্রিত করে কোন কিছু বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম সম্বন্ধে যেমন গবেষণা করা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে তেমন করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনকাল দীর্ঘ হবার ফলে কোন গবেষণাকারীর পক্ষে কোন বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক ধারা পর পর তিন বংশের বেশী লক্ষ্য করা প্রায় অসম্ভব। গাছপালা, পশুপক্ষীর তুলনায় মানুষের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও কম। এক একবার গর্ভধারণে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ একটি সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে এবং গর্ভধারণের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ও বেশী। ফলে উপযুক্ত সংখ্যক সন্তান-সন্ততির অভাবে কোন বংশগত বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পায় না। আবার যদি কোন বংশগত বৈশিষ্ট্য বেশী বয়সে আত্মপ্রকাশ করে এবং সন্তান-সন্ততি সেই বয়স পর্যন্ত বেঁচে না থাকে, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ ধরা পড়বার সম্ভাবনাও থাকে না।

মানুষের কোন বৈশিষ্ট্যের বংশধারা জানতে হলে কুলপঞ্জী বা বংশলতিকার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কোন ব্যক্তির বংশগত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ দেখলে তাঁকে বা তাঁর আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের তথ্য জেনে নেওয়া হয় এবং এইরূপ অনেক পরিবারের তথ্য একত্রিত করে মানব-বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সূত্র বের করা হয়। কুলপঞ্জীর দ্বারা মানব-বৈশিষ্ট্যের ধারা পর্যালোচনায় অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে মৃতব্যক্তির কোন বংশগত বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব হয় না। আবার অনেক পরিবারে দত্তক বা অবৈধ সন্তান থাকবার ফলে কোন বৈশিষ্ট্যের বংশধারা সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকে। সমাজে মান-মর্যাদা

হানির ভয়ে এবং পুত্র-কন্যাদের বিবাহে জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে—এই ভেবে মানুষ তাঁর নিজের বা পরিবারের অন্য ব্যক্তির বংশগত রোগের কথা স্বভাবতঃই গোপন রাখে। আজকাল অনেক দেশে হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা প্রভৃতি থেকে বংশগত বৈশিষ্ট্য ও রোগের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

গ্যালটন, পিয়ারসন, ফিসার, ডালবার্গ, হগ্‌বেন, ভাইনার, বার্ণষ্টাইন, নিউম্যান ও পেনরোজ প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে মানুষের বংশধারা-তত্ত্বের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই বিজ্ঞানে প্রোফেসার জে. বি. এস. হলডেনের অবদানও কম উল্লেখযোগ্য নয়। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে যে একজোড়া লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম (XY) আছে, তিনি সেই জোড়ায় কয়েকটি জিনের অবস্থান নির্ণয় করে তাদের বংশধারার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রথমে হিমোফিলিয়া ও বর্ণান্ধতা রোগের বংশধারার কারণ অনুসন্ধান করেন। এই দুটি রোগের লক্ষণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী দেখা যায়। যদি কোন স্ত্রীলোকের দুটি X ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি X ক্রোমোসোমে দুটি রোগের জিন যুক্তভাবে থাকে, তাহলে তাঁর অর্ধেক পুত্র-সন্তানের মধ্যে দুটি রোগের লক্ষণ একই সঙ্গে প্রকাশ পাবে। আবার যদি তাঁর দুটি X ক্রোমোসোমের প্রত্যেকটিতে একটি করে রোগের জিন নিহিত থাকে, তাহলে তার সবগুলি পুত্র-সন্তানের মধ্যে যে কোন একটি রোগের লক্ষণ দেখা যাবে। কিন্তু জনন-কোষ প্রস্তুতির সময় স্ত্রীলোকের দুটি X ক্রোমোসোমের অংশ পরিবর্তনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে দেখা যায়, অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে কয়েকটি পুত্রের মধ্যে যে কোন একটি রোগের লক্ষণ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি পুত্রের মধ্যে একই সঙ্গে দুটি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে অথবা দুটি রোগই অপ্রকাশিত থাকবে। নিজের সংগৃহীত ছয়টি কুলপঞ্জী ও অন্যান্য গবেষণাকারীদের সংগৃহীত এগারোটি কুলপঞ্জীর সাহায্যে প্রোফেসর হলডেন প্রমাণ করেন যে, শতকরা দশটি ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ধরণের বিচ্যুতি দেখা যেতে পারে। একই ক্রোমোসোমে অবস্থিত দুটি জিনের বিযুক্তি হওয়ায় শতকরা হারই দুটি জিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়। X ক্রোমোসোমের অসমসংস্থ অংশে (Non homologous) অবস্থিত হিমোফিলিয়া ও বর্ণান্ধতা রোগের জিন দুটির ব্যবধান প্রোফেসার হলডেন প্রথম নির্ধারণ করেন।

X ও Y ক্রোমোসোমের সমসংস্থ অংশে অবস্থিত জিনগুলিকে যে আংশিকভাবে লিঙ্গ অনুগামী হতে দেখা যায়, তা প্রোফেসার হলডেনই প্রথম আবিষ্কার করেন। যদি কোন প্রকট (Dominant) জিন Y ক্রোমোসোমের সমসংস্থ অংশে অবস্থান করে, সেই জিনের লক্ষণ সাধারণতঃ পুত্র সন্তানের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু জনন-কোষ প্রস্তুতির সময় মাঝে মাঝে X ও Y ক্রোমোসোমের অংশ পরিবর্তনে প্রকট জিনটি X ক্রোমোসোমে স্থানান্তরিত হয় এবং সেই X ক্রোমোসোমটি যদি কোন কন্যা-সন্তান লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে ওই জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে জিনটিকে আংশিক লিঙ্গ অনুগামী বলা হয়। প্রোফেসার হলডেন সমসংস্থ অংশে অবস্থিত পাঁচটি প্রচ্ছন্ন (Recessive) ও একটি প্রকট জিনের পারস্পরিক দূরত্বের পরিমাণ নির্ণয় করেন এবং ক্রোমোসোমের সমসংস্থ অংশের মানচিত্রও প্রস্তুত করেন। মানুষের ক্রোমোসোমের মানচিত্র জানা থাকলে সন্তান-সন্ততির অন্তঃপ্রকৃতি (Genotype) সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

প্রোফেসার হলডেনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো, মানুষের জিন পরিব্যক্তির

(Mutation) হার নির্ণয় করা। জিন-পরিব্যক্তির হার থেকে মানুষের বিবর্তনের ধারা ভবিষ্যতে কোন্ পথে প্রবাহিত হবে, তার আভাস পাওয়া যায়। হিমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত পুরুষেরা কোন সন্তান উৎপাদন করবার আগেই সাধারণতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্যে তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিমোফিলিয়া জিনেরও বিলুপ্তি ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে এই জিনের অস্তিত্ব নির্মূল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় না। কারণ জিনের গঠন-প্রক্রিয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে হিমোফিলিয়া রোগের ধর্মবিশিষ্ট নতুন জিনের উদ্ভব হয়। এই নতুন জিনের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে পরিব্যক্তি (Mutation) বলে। প্রোফেসার হলডেন তাঁর সংগৃহীত ছয়টি কুলপঞ্জীর মধ্যে তিনটিতে হিমো-ফিলিয়া রোগের উৎপত্তি যে জিন পরিব্যক্তির দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রমাণ পান। তিনি হিসাব করে দেখেন যে, X ক্রোমোসোমে অবস্থিত একটি সুস্থ জিন হিমোফিলিয়া জিনে পরিব্যক্ত হতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পর্যায়ের (Generation) প্রয়োজন; অর্থাৎ প্রতি পঞ্চাশ হাজার X ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি X ক্রোমোসোমে নতুন হিমোফিলিয়া জিনের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা থাকে। বিলুপ্তি ও পরিব্যক্তির মধ্যে এক ভারসাম্য বজায় থাকবার ফলে মানব জাতিতে হিমোফিলিয়া রোগের লোপের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বংশধারা-তত্ত্বের সাহায্যে মানুষের বংশগত রোগ কতদূর নির্মূল করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে প্রোফেসার হলডেন অনেক জায়গায় মত প্রকাশ করেছেন। বংশগত রোগ নির্মূলের উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রকট জিনের উপর নির্ভরশীল কোন বংশগত রোগ যদি অল্প বয়সে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে সমস্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করলে এক পর্যায়ের মধ্যেই ঐ রোগের মূল উৎপাটন করা সম্ভব হতে পারে। তবে জিনের পরিব্যক্তির ফলে মানব জাতিতে রোগগ্রস্ত জিনের নতুন করে উদ্ভব হয়। বন্ধ্যাকরণের বিকল্প হিসাবে বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিবাহে নিবৃত্তি, বিবাহিত জীবনে সংযম পালন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের পন্থা অবলম্বন করবার উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ বংশগত রোগ প্রচ্ছন্ন জিনের উপর নির্ভরশীল। অন্তর্বিবাহের (Inbreeding) ফলে প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য হঠাৎ সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই সব রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করলে ত্রিশ বা চল্লিশ পর্যায়ের আগে প্রচ্ছন্ন জিনের অস্তিত্ব নির্মূল করা যায় না। ঐ পন্থা গ্রহণ না করেও বংশগত রোগের আবির্ভাব বহুলাংশ কমানো যেতে পারে। জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, মাসতুতো ও পিসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে বংশধারাগত কতকগুলি ব্যাধি, যথা—Juvenile amaurotic idiocy-র হার শতকরা ১৫ ভাগ, Congenital deaf mutism-এর হার শতকরা ২৫ ভাগ ও Xeroderma pigmentosum-এর (এক প্রকার চর্মরোগ) হার শতকরা ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব হতে পারে। প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগ কোন সন্তানের মধ্যে দেখা গেলে বাধ্যতামূলক ভাবে বা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে স্বামী-স্ত্রীর যে কোন একজনের প্রজনন শক্তি নষ্ট করে দিলে প্রচ্ছন্ন জিনের প্রসার বন্ধ করা যেতে পারে। এই সব বংশগত রোগ রোধ করবার উদ্দেশ্যে প্রোফেসার হলডেন বহির্বিবাহের (Outbreeding) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

প্রোফেসার হলডেন প্রজনন-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে উন্নত মানব সমাজ গঠনের কথা চিন্তা করতেন। সমাজে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয়-

তাকে তিনি স্বীকার করতেন। ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রজনন-শক্তি লোপ করবার বিরুদ্ধে তিনি বলতেন—যে লোক শূয়োর চরায় ও যে লোক একঘেয়েমী কাজ ধৈর্যসহকারে করতে পারে, সমাজে তাদেরও মূল্য আছে—তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদনে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাঁর মতে—সমাজ এক জাতের মানুষ নিয়ে টিঁকে থাকতে পারে না। সুস্থ সমাজ গঠনে সাধু, ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, শিল্পী ও শ্রমিক প্রভৃতি সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন আছে। যে সমাজে যত বেশী স্বাধীনতা আছে, যত বেশী কাজের বিভিন্নতা আছে, যেখানে প্রতিটি স্ত্রী ও পুরুষের পছন্দমত বৃত্তি গ্রহণের অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে, সেই সমাজই হবে আদর্শ সমাজ।

সঞ্চয়ন

পরমাণুর সংযোজন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন

পরমাণুর সংযোজনের ফলে যে শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাবার চেষ্টা বারো বছরেরও বেশী হলো আমেরিকায় হচ্ছে। সূর্য ও তারকাসমূহে নিয়তই যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেই শক্তির মূলে আছে ঐ পারমাণবিক সংযোজন বা তাপ-বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া—থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন।

ঐ প্রচণ্ড শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাবার বিষয়টি খুবই কঠিন। তাহলেও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিপুল। বিজ্ঞানীরা এজন্যেই পরমাণুর সংযোজনের দ্বারা শক্তি সৃষ্টি করে তাকে কাজে লাগাবার জন্যে গবেষণা করে যাচ্ছেন।

পরমাণুর বিভাজনের ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে ভেষজ, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ঐ প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রে মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণে হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ খুবই কাছাকাছি এসে পড়ে। ফলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রিত বা সংযোজিত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হয়।

কিন্তু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন, একটি হিলিয়াম পরমাণুর ওজনের সমান নয়। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অ্যাটমিক ওয়েট বা পারমাণবিক ওজন ৪.০৩৩ ইউনিট, সেই স্থলে একটি হিলিয়াম পরমাণুর অ্যাটমিক ওয়েট হচ্ছে ৪.০০৩ ইউনিট। .০৩০ ইউনিট আলো ও তাপ শক্তিতে পরিণত হয়। ঐ তাপ ও আলোর জন্যেই গ্রহসমূহে জীবন সম্ভব হয়েছে।

সূর্যে যে ভাবে পরমাণুর সংযোজন হয়ে থাকে, সেই ভাবে গবেষণাগারে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন ঘটিয়ে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যুতান্বিত করে 'লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী তাপের মধ্যে রাখলে ঐগুলির পরমাণুর মধ্যে প্রচণ্ড গতির সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে, ফলে কিছু সংখ্যক পরমাণু একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করবে হিলিয়াম।

কিন্তু ঐ পরিমাণ তাপে যে আধারে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে রাখা হবে, সেই আধার যে কোন উপাদানেই নির্মিত হোক না কেন তা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। কাজেই বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে ধরে রাখার জন্যে এক প্রকার অদৃশ্য

নব আধারের পরিকল্পনা করেছেন। একে বলা হয় ম্যাগ্‌নেটিক বট্‌ল্‌। এতে ব্যবহৃত হয় চৌম্বক দণ্ড। ঐ সকল দণ্ড অতি শক্তিশালী। বিদ্যুতান্বিত হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে ঐ দণ্ডের চৌম্বক শক্তি শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে, পরমাণুগুলি পাত্রের গায়ের সংস্পর্শে আসতে পারে না। এই সব বিদ্যুতান্বিত পরমাণুকে বলা হয় প্লাজ্‌মা।

কিন্তু ঐ বিদ্যুতান্বিত অতি উত্তপ্ত অস্থির হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সেই চৌম্বক আধার বা ম্যাগ্‌নেটিক বট্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে আসে। মনে হয় ঐ পাত্রটির গায়ে যেন ছিদ্র হয়ে গেছে। এর যে কি কারণ—তা এখনও বিশদভাবে জানা যায় নি।

তবে মার্কিন বিজ্ঞানীরা ঐ সব উত্তপ্ত পরমাণুকে ধরে রাখবার জন্যে নতুন ধরণের আধার তৈরি করেছেন। এগুলি দেখতে যেমন অদ্ভুত, নামও তেমনি অদ্ভুত; যেমন—অ্যাসট্রন, শিলা, ফারোস, ডিসিয়েক্স, পায়রোট্রন, ষ্টেলারেটার, লিভিট্রন। নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লাজ্‌মা ফিজিক্স লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা সি-ষ্টেলারেটার নামে একটি নতুন ধরণের আধারে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে এক সেকেণ্ডের ৩ হাজার ভাগের এক ভাগ সময় রেখেছিলেন। পুরনো এ ও বি ধরণের ষ্টেলারেটারে তাঁরা ঐ পরিমাণ তাপে ঐ সময়ের জন্যে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে রাখতে পারেন নি। ডি সি এক্স ২ নামে আধার নিয়ে টেনেসীর ওকরিজের ন্যাশন্যাল লেবরেটরীতেও গবেষণা হচ্ছে। পূর্বে যে সকল মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, সেগুলির তুলনায় এই সব নতুন মডেলের আধার দশ হাজার গুণ উৎকৃষ্টতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। উচ্চতর তাপে অধিকতর সময়ের জন্যে ঐ আধারে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে রাখা যায়। ফলে দেখা গেছে, ঐ প্রক্রিয়ায় এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগেরও কম সময়ে ঐ সব পরমাণুর মধ্যে সংযোজন ঘটে এবং প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থায় ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতে হলে ঐ সংযোজন নিয়মিত হারে হতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, এই বিষয়ে বহু তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন। সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন যেদিন সম্ভব হবে, সেদিন থেকে তত্ত্বগতভাবে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ-শক্তির অভাব কোন দিনই হবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার অক্ষয় বলে ঐ বিদ্যুৎ-শক্তির ভাণ্ডার হবে অফুরন্ত।

সমুদ্রের জলে ডয়টেরিয়াম নামে এক ধরণের হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ডয়টেরিয়ামের সংযোজনের দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হবে, তা সমপরিমাণ কয়লা থেকে প্রাপ্ত শক্তির দশ কোটি গুণ বেশী হবে। পরমাণুর বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের তুলনায় সংযোজন প্রক্রিয়ার সুবিধা অনেক বেশী। বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে অতি মূল্যবান ইন্ধন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের খরচ অনেক বেশী পড়ে যায়। তারপর ঐ ইন্ধনের অপচয় হিসাবে পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় ভস্ম। ঐ ভস্ম-সমস্যা সংযোজন প্রক্রিয়ায় থাকবে না এবং বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণও হবে অনেক বেশী।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এবং সংযোজন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রদূত ডাঃ আমাসা এস বিশপ আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স টু ডে-তে লিখেছেন:—"সংযোজন সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে এবং এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, এই রকম একটা আবহাওয়ারও সৃষ্টি হয়েছে।"

বসন্তরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এই সম্পর্কে ডাঃ এফ. পি. পোভারেনিখ ও ডাঃ শ্রীমতী এল. এস. পোভারেনিখ লিখেছেন—প্রধানতঃ তিনটি কারণে বসন্তরোগ এত আতঙ্কজনক। রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং এই রোগের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও ঔষধপত্র না থাকায় অধিকাংশ রোগীই মারা পড়ে। যারা সেরে ওঠে, তাদের দেহসৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিশক্তি অথবা অন্য কোন দৈহিক ক্ষমতা লোপ পায়। সরকারী হিসেব মত, ১৯৬৩ সালে ভারতে এই রোগে ২৫ হাজার লোক মারা গেছে।

এই রোগের ইতিহাস অনুসরণে দেখা গেছে—মধ্যযুগে আরব দেশের মহাপ্রতিভাবান চিকিৎসক আবুবকর অল রাজী রিয়াজেস (খৃঃ ৮৬৫-৯২৫) সর্বপ্রথম এই রোগের লক্ষণ, রোগের বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কেও গভীরভাবে অনুশীলন করেন এবং জীবাণুর দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয় বলে মত প্রকাশ করেন।

এতদিনে প্রমাণিত হয়েছে যে, বসন্তরোগের মূল হলো এক ধরণের ভাইরাস—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্মলপক্স ভাইরাস'। এই ভাইরাস বাতাসে ভাসমান ধুলিকণার সঙ্গে সুস্থ মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য ভাবেও সংক্রামিত হয়ে তাকে রোগাক্রান্ত করে। রোগীর বিছানা, জামাকাপড়, মলমূত্র ও ঘর ভয়ঙ্কর সংক্রামক হয়ে দাঁড়ায়। বিমান, জাহাজ বা ট্রেনে যারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করে, তাদের পোষাক ও জিনিষপত্রের সঙ্গে এই ভাইরাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫৮ সালে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা বসন্তরোগের বিলোপ ঘটাবার জন্যে এক আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা রচনা করেন। কারণ, বসন্তরোগ এতই ভয়াবহ রকমের সংক্রামক যে, এক দেশে মহামারী আকারে দেখা দিলে তা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে—বিশেষতঃ প্রতিবেশী দেশগুলির পক্ষে গুরুতর ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। যে কোন একটি দেশে যতক্ষণ বসন্তরোগের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের পক্ষেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকা'র।

বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশে এবং অন্যান্য দেশেও বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার শাখা-প্রশাখা রয়েছে। কোথাও বসন্তরোগের প্রকোপ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ওই সব স্থানীয় শাখা-দপ্তরগুলি জেনেভায় বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার আন্তর্জাতিক কোয়ার‍্যান্টাইন সার্ভিস-এর কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরগুলি জেনেভায় বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার আন্তর্জাতিক কোয়ার‍্যান্টাইন সার্ভিস-এর কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে তারবার্তায় বা বেতারে তা জানিয়ে দেয় এবং অবিলম্বে তাঁরা রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সেই সঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার আন্তর্জাতিক কোয়ার‍্যান্টাইন সার্ভিসের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'উইক্লি এপিডেমিওলজিক্যাল রেকর্ড-এ প্রকাশ করা হয় এবং সর্বত্র বিমান-ডাকে পাঠানো হয় (পত্রিকাটি অনেকগুলি ভাষায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়)।

জেনেভার এই সক্রামক রোগ সংক্রান্ত তথ্য-কেন্দ্রে বসন্তরোগ সম্পর্কে প্রতি বছরে যে সব তারবার্তা ও বেতার-বার্তা আসে, তার সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩ হাজার। এথেকে বসন্তরোগের বিশ্বব্যাপী প্রকোপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

১৯৬৩ সালে এখানে ১ লক্ষেরও বেশী বসন্ত-রোগীর বিবরণ এসেছিল। এর মধ্যে ভারতের রোগীর সংখ্যাই সর্বাধিক—প্রায় ৬০ হাজার। ইন্দোনেশিয়ার স্থান তার পরে—বছরে প্রায় ৮

হাজার। পাকিস্তান, কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল) ও ব্রেজিল প্রভৃতি প্রত্যেকের কিঞ্চিদধিক ৫ হাজার করে। ১ থেকে ২ হাজারের মধ্যে কেস-এর রিপোর্ট এসেছিল গ্যাম্বিয়া, নাইজিরিয়া, কঙ্গো (ব্রাজাভিল) মালি, টাঙ্গানাইকা, নেপাল, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে। এগুলি ছাড়া আরও ৪০টি দেশে ওই বছরে বসন্তরোগ দেখা দিয়েছিল। সুইডেন, পোল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মেনী, হাঙ্গেরী ও সুইজার-ল্যাণ্ডও বাদ যায় নি।

মানুষের ইতিহাসের প্রায় আদি যুগ থেকেই বসন্তরোগের অস্তিত্ব আছে বলা যেতে পারে। মিশরের ফ্যারাও পঞ্চম রামেসিস-এর যে মামি' বা সংরক্ষিত মৃতদেহে পাওয়া গেছে, তা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এই রোগের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক ও আয়ুর্বেদ রচয়িতা সুশ্রুত এই রোগকে 'মসূরক' বলে উল্লেখ করে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ভয়ঙ্কর মহামারীর আকারে বসন্তরোগ দেখা দেয় এবং মোট ৬০ লক্ষ লোক মারা পড়ে বলে জানা যায়। ১৮৭৩-৭৪ সালে ভারতে ৫ লক্ষ লোক এই রোগে মারা যায় এবং প্রায় ওই সময়েই গ্রেট বৃটেনে বসন্ত-মহামারীতে ৪৪ হাজারেরও বেশী লোকের মৃত্যু হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে এই রোগ ভয়ঙ্কর রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৮৯০-৯১ সালে রাশিয়ায় বসন্ত মহামারীতে ২ লক্ষ ১৫ হাজারেরও বেশী লোক মারা যায়।

চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের অনেকের মতে, বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা দেবার ব্যবস্থাটিও প্রায় এই রোগের মতই প্রাচীন। অতি প্রাচীন কালে লোকে লক্ষ্য করেছিল যে, একবার যে লোক এই রোগে ভুগেছে, সে আর সাধারণ নিয়মে নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হয় না। এথেকেই এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সুস্থ লোকের দেহে সামান্য পরিমাণে রোগ-সংক্রমণ ঘটিয়ে তাকে দু-চার দিনের জন্যে যৎসামান্য অসুস্থ করে রেখে গুরুতর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করা হয়তো সম্ভব। টিকা দেবার ব্যবস্থা যে সঠিক লক্ষ্যেই একটি পদক্ষেপ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুদীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা, বহু ব্যর্থতা ও আংশিক সাফল্যলাভের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এডোয়ার্ড জেনারের হাতে এই প্রতিষেধক-পদ্ধতি প্রথম পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে।

তরুণ এডোয়ার্ড জেনার যখন ব্রিস্টলের কাছে একটি ওষুধের দোকানে শিক্ষানবিশী করতেন, তখন তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে—যার পানবসন্ত (কাউ পক্স বা চিকেন পক্স) হয়, সাধারণতঃ সে আর মহাবসন্তে (স্মল পক্স) আক্রান্ত হয় না—এই প্রচলিত বিশ্বাসটি সত্য কি না, তা হাতেনাতে প্রমাণ করতে হবে।

১৭৯৬ সালের মে মাসে জেনারের সেই বিখ্যাত পরীক্ষার কথা সকলেই জানেন—জলবসন্তে আক্রান্ত একটি মেয়ের দেহ থেকে গুটির রস নিয়ে তিনি অতি সামান্য পরিমাণে একটি ছেলের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেন। ছেলেটি সপ্তাহখানেক সামান্য অসুস্থ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। তারপর জেনার সেই সুস্থ ছেলেটির দেহে মহাবসন্তের গুটির রস ঢুকিয়ে দেন। দিনের পর দিন অনবরত পর্যবেক্ষণে রেখে জেনার লক্ষ্য করেন যে, ছেলেটির কিছুই হলো না। জেম্‌স্ ফিপ্‌স্ নামে সেই কিশোরটি চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সে স্বেচ্ছায় নিজের দেহের উপর এই পরীক্ষা চালাতে দিতে রাজী হয়েছিল। জেনার এই ছেলেটিকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে তুলেছিলেন।

জেনারকে অবশ্য ব্যাপকভাবে টিকা দানের ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে বহু বাধা-বিপত্তি ও

কুসংস্কারের মুখোমুখী হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই জয়ী হয়। উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকেই ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণকে টিকা দেবার ব্যবস্থা ইউরোপের প্রায় সব দেশে—এমন কি, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মত অনগ্রসর দেশেও চালু হয়। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্দারের আমলে প্রথম যে রুশ শিশুকে বসন্ত-টিকা বা ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়, তার নাম আন্তন পেত্রফ। জার নতুন নামকরণ করেন আন্তন ভ্যাক্সিনফ।

কিন্তু তখন মুশকিল দেখা দিয়েছিল এত বেশী পরিমাণে টিকা তৈরির জন্যে মানুষের দেহ থেকে বসন্ত-বীজাণু সংগ্রহ করা নিয়ে। আরও বড় সমস্যা ছিল টিকার বীজ দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা। প্রথমটির সমাধান করেন জেনার নিজেই। তিনি কৃত্রিম উপায়ে পর পর তিনটি গরুর দেহে রোগ সংক্রামিত করেন। দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান করেন জীবাণুবিদ জীন ডি কারো। তিনিই প্রথম 'শুষ্ক টিকা' বা 'ড্রাই ভ্যাক্সিন' তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপের বাইরে প্রথম বসন্ত-টিকা মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হয় এবং রোগ উৎপাদন করা হয় বসরা ও বোম্বাই শহর দুটিতে।

বসন্তরোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হলো সর্বাত্মকভাবে টিকাদানের অভিযান চালানো—গোটা দেশের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেককে টিকা দেওয়া।

বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার কর্মীদের অভিজ্ঞতায়, দেশের শতকরা ৮০ জনকে টিকা দেওয়াটাও যথেষ্ট নয়, কারণ বাকী ওই শতকরা ২০ জন লোকই ভয়ঙ্কর মহামারী ঘটাতে পারে। তাই একেবারে আক্ষরিক অর্থে, শতকরা ১০০ জনকেই টিকা নিতে হবে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশগুলিতে বসন্ত-রোগের এত বেশী প্রাদুর্ভাবের কারণ হলো জনগণের দারিদ্র্যজনিত জীবনযাত্রার নিম্নমান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের থাকতে বাধ্য হওয়া, অশিক্ষা-জনিত কুসংস্কারের বশে টিকা নিতে অনিচ্ছা ইত্যাদি। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং জনশিক্ষা বিস্তারের ফলে আজ বহু অনগ্রসর দেশ দ্রুতহারে বসন্তরোগের প্রকোপ কমিয়ে আনছে। যেমন—১৯৬৩ সালে এশিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলিতে ৭৫ হাজার লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৪ সালে ওই সব দেশে বসন্তরোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,৮৯৬।

উন্নতিশীল দেশগুলি আজ সকলেই বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার সহযোগিতায় বসন্ত-উচ্ছেদ অভিযানের আন্তর্জাতিক কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। শুধু ভারতেই আগে বসন্ত-রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা প্রতি বছরে দাঁড়াতো মোট বিশ্ব-সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। ১৯৬২ সালে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার সেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রকমে কমে গেছে। গত বছরে মে মাসের মধ্যে ভারতের ৪৫ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৫৩ জনকেই টিকা দেওয়া হয়। সর্বাত্মক টিকাদানের মধ্যে দিয়ে বসন্তরোগের বিরুদ্ধে অভিযানে এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে।

মানুষ ও পশু পাখীর ভাষা

শব্দকে কি করে ছবিতে পরিণত করা যায়—এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন। টেলিফোন আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেলের মূক-বধিরদের প্রতি ছিল বিশেষ দরদ। তিনি বিশেষ করে তাদেরই জন্যে এই বিষয়টিকে কার্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে খুবই চেষ্টা করে গেছেন।

এই তথ্যটি কার্যে রূপান্তরিত না হলেও বেল

টেলিফোন লেবরেটরীতে "ভয়েস প্রিন্ট" নামে একটি অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির গলার স্বরকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে পরিণত করা হয়। তারপর এক ধরণের টেলিভিশন পর্দার উপরে ঐ সঙ্কেতটি প্রতিফলিত করা হয়। বেল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীদের মতে, এতে যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে, একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই; অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বরই ভিন্ন ধরণের। যাদের গলার আওয়াজ এমনি শুনলে একই রকম মনে হয়, তাদের "ভয়েস প্রিন্ট" নিয়ে দেখা গেছে যে, এদের স্বরের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে

লরেন্স কাষ্টা এই 'ভয়েস প্রিন্ট' প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা। এই প্রক্রিয়ার শুধু বিজ্ঞানের দিক থেকেই নয়, ব্যবহারিক জগতের দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের এক সভায় মিঃ কাষ্টা এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সকল ব্যক্তি আত্মপরিচয় গোপন রেখে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন বা গালিগালাজ করে থাকে, এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাদের সনাক্ত করা সম্ভব। কারণ গলার স্বর যত বিকৃতই করুক না কেন, প্রত্যেক স্বরের যে বৈশিষ্ট্য, যে প্যাটার্ন রয়েছে, তা কোন ভাবেই লুকানো সম্ভব নয়—'ভয়েস প্রিন্টে' তা ধরা পড়ে। কিন্তু বাক্যের শব্দসমূহ যে কিভাবে সৃষ্ট হয় অর্থাৎ কথা যে কি ভাবে বলতে হয়, সে প্রশ্নের উত্তর 'ভয়েস প্রিন্ট' দিতে পারে নি

তবে ক্যালিফোর্ণিয়ার লরেন্স রেডিয়েশন লেবরেটরীর জর্জ বার্টন যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। বার্টন একটি টেলিভিশন টিউবে (বা একটি অসিলস্কোপের মধ্যে) শব্দকে কোন প্যাটার্নে রূপান্বিত করা যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখছেন। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সামান্য শব্দ করলে চক্রাকার প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ তিনি অনেকটা ঐ ধরণের প্যাটার্ন নিয়েই শব্দকে ছবিতে পরিণত করবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন।

একদিন তিনি তাঁর রেডিওর সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি জুড়ে দিলেন। গান থেমে গেল এবং বেতার-কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান-সূচী ঘোষণা করা হলো। ঘোষণাটি কয়েকবার করা হলো। বার্টন লক্ষ্য করলেন যে, ঘোষকের প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দে ঐ যন্ত্রে যে ছাপ বা প্যাটার্নের সৃষ্টি হচ্ছে, তা সুনির্দিষ্ট এবং প্রত্যেকটি শব্দের প্যাটার্ন বিভিন্ন—একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই।

কার্টার উদ্ভাবিত 'ভয়েস প্রিন্টে' বিভিন্ন গলার আওয়াজের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা ধরা পড়ে। বার্টনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্বরের মধ্যে যে মিল রয়েছে, তা নিরূপণ করবার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়। ঐ প্রক্রিয়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন লোক একই শব্দ উচ্চারণ করে, তখন প্রায় একই প্রকার প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়। বার্টনের প্রক্রিয়ায় গলার স্বরের যে প্যাটার্ন বা ছাপ সৃষ্টি হয়, তাতে সেই স্বর উঁচু বা নীচু পর্দায় থাকলেও কিছুই আসে যায় না। পর্দা যে প্রকারেরই হোক না কেন, প্যাটার্ন একই প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমতঃ তিনি তার পরিবারের লোকজনের গলার আওয়াজ নিয়েই পরীক্ষা করেন। তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন রকমের গলার আওয়াজের তুলনামূলক আলোচনার জন্যে তাঁর যন্ত্রের পর্দায় যে বিভিন্ন রকমের প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। তাতে দেখা গেছে যে, প্রত্যেকটি শব্দের বিভিন্ন অক্ষরগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটির সঙ্গে আর একটি সংযুক্তি অর্থাৎ শব্দাংশগুলি বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শব্দের চিত্ররূপ গৃহীত হয় বলে বার্টন এই নতুন

প্রক্রিয়াটিকে ক্যালিগ্র্যাফোন নামকরণ করবেন বলে স্থির করেছেন।

জর্জ বার্টন নিজে একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী। তিনি এই নতুন বিষয়ে এই আশায় গবেষণা করে যাচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে এমন কেউ হয়তো আসবেন, যাঁর চেষ্টায় এক্ষেত্রে সমূহ উন্নতি সাধিত হবে। তিনি মাত্র সূত্রের সন্ধান দিয়ে গেলেন। বিশেষ করে যে সকল বধির মানুষের কথা শুনতে না পাওয়ায় অনুকরণ করতে পারে না, মিঃ বার্টনের ধারণা, সেই সকল বধিরদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে ক্যালিগ্র্যাফোন খুবই কাজে লাগতে পারে। কারণ কোন কথা বললে ক্যালিগ্র্যাফোন যন্ত্রে তার ছাপ উঠে যায়। বধির ঐ ছাপ দেখে দেখে ঐ শব্দের অনুকরণ করে কথা বলতে ও উচ্চারণ শিখতে পারবে। সে মাইক্রোফোনে কথা বলবার চেষ্টা করবে, প্রতিবারের চেষ্টার ফলই সে দেখতে পারবে। কারণ প্রতিবারই তার আওয়াজের ছাপ তৈরি হবে এবং তার সামনে থাকবে স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের কথার ছাপ। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে দেখেই সে এগিয়ে যাবে।

বার্টন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির দাম সামান্য। ৬০ ডলার মূল্যেই এসব যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বুদ্ধিমান তরুণেরা নিজেরাই তা তৈরি করে নিতে পারে।

বিজ্ঞানীরা কেবল মানুষের গলার স্বর নিয়েই নয়, পশু-পাখীর গলার স্বর নিয়েও গবেষণা করছেন। অধিকাংশ পশু-পাখী আওয়াজ করে' মনের ভাব প্রকাশ ও বিনিময় করে থাকে। বিজ্ঞানীরা পাখীর ডাকেরও রেকর্ড করেছেন। ভীত সন্ত্রস্ত পাখীদের ডাকের রেকর্ড করা হয়েছে। এই সকল রেকর্ড বাজিয়ে পাখী তাড়ানো যায়, এজন্যে তাঁরা তা ব্যবহারও করে থাকেন। ডলফিন বা শুশুকের ভাষা বোঝবার চেষ্টাও তাঁরা করছেন। এ-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শুশুকেরা যে বিজ্ঞানীদের কথার অনুকরণ করে, তা তাঁরা দেখেছেন। স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে শুশুক খুবই বুদ্ধিমান। বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক অন্যান্য ছোটখাটো প্রাণীর শব্দ নিয়েও গবেষণা করছেন।

রোড আয়ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যালয় বা ওশ্যানোগ্র্যাফী স্কুলের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মাছেরা যে কেবল নানারকম শব্দই করতে পারে তা নয়, রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই শব্দের মাত্রাও বাড়তে থাকে। ক্রোকার জাতীয় মাছ খুব বেশী শব্দ করে, জলের নীচে ২৫ ফুট দূর থেকে এদের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। জেলেরা এই আওয়াজ অনুসরণ করে মাছ ধরতে পারে।

পশু-পাখীর ভাষা নিয়ে জাপানে বেশ ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয়েছে। কিয়োটো ইউনিভারসিটির অধ্যাপক দেশাজাবাবো মিয়াদী—বানরের ভাষা নিয়ে তাঁরা যে অনুশীলন করেছেন, সে বিষয়ে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের সাম্প্রতিক অধিবেশনে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ডাঃ মিয়াদী বলেছেন যে, কোন বিপদের আশঙ্কা দেখলেই কোন বানর দলের নেতা একটা বিশেষ আওয়াজ করে বিশেষ ভাষায় দলের সবাইকে সতর্ক করে দেয়। আবার আক্রমণ করতে হলে সে অন্য রকম আওয়াজ করে দলের সবাইকে নির্দেশ দিয়ে থাকে।

তাঁর মতে, বড় বড় দলের বানরদের ভাষার পুঁজি ছোটখাটো দলের বানরদের তুলনায় অনেক বেশী। বানরেরা দলের প্রত্যেকটিকেই চেনে এবং অন্যান্য বানরেরা নেতাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিশেষ সম্মান করে থাকে।

রিফ্র্যাকটরিস

শ্রীকিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

রিফ্র্যাকটরিস শ্রেণীর পদার্থগুলি আধুনিক বিজ্ঞান-সভ্যতার একটি অবদান; কিন্তু বহু পুরাতন কাল থেকেই এই জিনিষের প্রচলন ছিল। রিফ্র্যাক-টরিস-এর অভিধানগত অর্থ হলো—যাকে গলানো কঠিন, আর সাধারণভাবে ব্যবহৃত অর্থ হলো—(১) যে সকল বস্তুর ৯০০° সে. তাপমাত্রার আগে কোন প্রকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না এবং ১২০০° সে. পর্যন্ত সেটি নরম হয় না বা গলে যায় না; (২) উচ্চ তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা ছাড়াও যে সব বস্তু কঠিন আবহাওয়া বা প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে পারে; যেমন—যেখানে অম্ল জাতীয় বা ক্ষার জাতীয় অবস্থা বর্তমান, সেখানেও সে অক্ষত বা অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন এবং দেওয়া যায় না। বর্তমান কালে রিফ্র্যাকটরিস ১২০০° সে বা ১৪০০° সে. তাপ সহ্য করতে পারে বলা ঠিক নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটির আসল অবস্থা বর্ণনা না করা হচ্ছে; যেমন—বিশেষ করে কত চাপে বস্তুটিতে তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথবা বস্তুটি চুল্লীতে কত চাপ বহন করছে।

অনেক আগে টেরাকোটা নামে এক রকম জিনিষের প্রচলন ছিল, যার নিদর্শন পুরাতন সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায়। মাটিতে (অবশ্য বিশেষ ধরণের মাটি) উচ্চ তাপ প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকা নির্মিত বস্তুগুলির আকৃতিগত অবস্থার কোন পরিবর্তন না করে—আংশিক গলনে (যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Incepient fusion) কঠিন পদার্থে পরিণত করা হতো। টালী তৈরি অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই রিফ্র্যাকটরিস পণ্যের উৎপাদন শিল্প নিজ বৈশিষ্ট্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রিফ্র্যাকটরিসের অভাবে ধাতুশিল্প অচল। এর অভাবে কোন ধাতু তৈরি সম্ভব নয়। লোহা, তামা—এই দুটি ধাতুই প্রস্তুত করবার সময় অনেক তাপের প্রয়োজন এবং সেই তাপ সহ্য করে এমন জিনিষ পাওয়া যেত না যদি রিফ্রাকটরিসের প্রবর্তন না হতো।

সাধারণতঃ রিফ্র্যাকটরিসকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) প্রাকৃতিক এবং (২) অপ্রাকৃতিক (Synthetic)। রিফ্র্যাকটরিসকে বর্তমান কালে গঠন অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) অম্ল জাতীয় (Acidic)

(২) ক্ষার জাতীয় (Basic)

(৩) নির্দলীয় (Neutral)

(১) অম্ল জাতীয় বা Acidic Refractories—এই বস্তুগুলি উচ্চ তাপ তো সহ্য করেই, তাছাড়া অম্ল জাতীয় অবস্থায় বস্তুটির কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। অম্ল জাতীয় ধাতুমলের দ্বারা এই বস্তুগুলি আক্রান্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ—ফায়ার ব্রিক্‌স্ (Fire bricks), সিলিকা ব্রিক্‌স্ (Silica bricks), সিলিমেনাইট ইত্যাদির কথা বলা যায়। এগুলি সাধারণতঃ ১১৫০° সে.—১৯০০° সে. পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে। এই জাতীয় বস্তুগুলির মধ্যে ফায়ার ব্রিক্‌স্‌ই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই বস্তুগুলি সবই বিভিন্ন আকারের ইট তৈরি করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ইটগুলি এক ধরণের বিশেষ সিমেন্টের সাহায্যে (যাকে বলা হয় রিফ্র্যাকটরিস মর্টার) চুল্লীতে

স্থাপন করা হয়। তার ফলে বাইরের লোহার খোলটি উচ্চ তাপের প্রভাবে আসতে পারে না এবং চুল্লীতে লোহার গলনাঙ্ক ১৫১০° সে অপেক্ষা আরও বেশী উচ্চ তাপের প্রভাবে আনতে পারা যায়। অনেক সময় বাইরে কোন ধাতুর খোল ব্যবহার না করলেও চলে, শুধু মাত্র ভাল করে রিফ্র্যাক্টরিস দিয়ে চুল্লী তৈরি করা হয়। লৌহশিল্প যত প্রসারিত হবে এগুলির চাহিদা ততই বেড়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ষ্টীল তৈরি হয় ১২৫ কোটি টন, রাশিয়াতে ৫৫ কোটি টন, আর ভারতে তৃতীয় পরিকল্পনার পর হবে ১৫ কোটি টন। অন্য দেশে প্রতি টন ষ্টীল তৈরি করতে হলে ১২০ পাঃ রিফ্র্যাক্টরিস লাগে, আর ভারতের লাগে ২১০ পাঃ থেকে ১৮০ পাঃ রিফ্র্যাক্টরিস।

প্রথম পরিকল্পনার আগে ভারতে ২০০০০০ টন রিফ্র্যাক্টরিস তৈরি হতো, যার বেশীর ভাগই হতো ফায়ার ব্রিক্স্। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দাঁড়ায় ৩৫০,০০০ টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দাঁড়ায় ৬০০,০০০ টন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী দাঁড়ায় ৮০৫, ০০ টন এবং এই রিফ্র্যাক্টরিসগুলিতে নিম্নলিখিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ তৈরি হয়:—

ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাক্টরিস	—	৫২০,০০০ টন
সিলিকা ”	—	৭৫,০০০ ”
বেসিক বা ক্ষারজাতীয় ”	—	৪৮,০০০ ”
অ্যালুমিনা ”	=	১০,০০০ ”
ম্যাগ্নেসাইট ”	=	৬৪,০০০ ”
রিফ্র্যাক্টরিস মর্টার ”	—	৮৫,০০০ ”
বিবিধ ”	=	৬৪০০ ”
		৮০৫,০০০ টন

এখন পর্যন্ত ভারতে মোটামুটিভাবে ৪৪টি রিফ্র্যাক্টরিস-এর কারখানা আছে এবং সেগুলি প্রদেশ অনুসারে সাজালে—

বিহার—	১১
বাংলা—	৬
বোম্বাই—	৬
মাদ্রাজ—	৪
মহীশূর—	৪
কেরল—	১
উড়িষ্যা—	৩
মধ্যপ্রদেশ—	৬
রাজস্থান—	১
পাঞ্জাব—	১
উত্তর প্রদেশ—	১

আমাদের দেশে এখন যে সমস্ত রিফ্র্যাক্টরিস তৈরি হয়, তার অধিকাংশই ফায়ার ব্রিক্স্-এর অন্তর্ভুক্ত এবং যা তৈরি হয়, তাতে আমাদের কুলায় না, বাইরে থেকে আনতে হয় এবং তাতে আমাদের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে যায়।

(২) ক্ষার জাতীয় বা Basic Refractories—এই বস্তুগুলি ক্ষারীয় ধাতুমলের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না এবং এই অবস্থায় উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে; যেমন—ম্যাগ্নেসাইট, ক্রোম ম্যাগ্নেসাইট, ফস্টেরাইট, ডলোমাইট ইত্যাদি। এগুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বেসিক ওপেন হার্থ প্রক্রিয়ায় (Basic Open Hearth Process) ও ননফেরাস অর্থাৎ লোহাবিহীন ধাতুর প্রস্তুতিকরণে।

(৩) নির্দলীয় বা Neutral—এগুলি অম্ল বা ক্ষার জাতীয় কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না এবং সাধারণতঃ এগুলির ব্যবহার হয় দুটি অম্ল ও ক্ষার জাতীয় রিফ্র্যাক্টরিস-এর মাঝখানে। উদাহরণ-স্বরূপ গ্র্যাফাইট, জিরকোনিয়াম, ক্রোমাইট ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

এখন একটি সাধারণ পদ্ধতি—যার দ্বারা ইটগুলি তৈরি করা হয়—তার সম্বন্ধে কিছু বলছি। প্রথমে কাঁচা মালটি নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী গুঁড়া করা হয় বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে; যেমন—Jaw-Crsuher, Hammer Mill, Edge Runner, Ball Mill

ইত্যাদি। পরে বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন কাঁচামাল (অনুপাত গবেষণাগারে স্থির করা হয়) মেশানো হয় এবং অল্প জল মেশানো হয় অথবা বেশী জল মিশিয়ে আরও গুঁড়া করা হয় এবং পরে সেই জল পরিস্রাবণের দ্বারা সরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই কাদার মত মাটিকে হাতে করে বা যন্ত্রের সাহায্যে ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। এর পর এগুলিকে বাতাসে শুকিয়ে নেবার পর একটি ঘরে রাখা হয়। এই ঘরটির নিম্নদেশ দিয়ে চিম্‌নির গ্যাস পাঠানো হয়। ফলে ঘরটি বেশ গরম থাকে এবং বস্তুগুলি বেশ শুকিয়ে যায়। তখন এগুলিকে চুল্লীতে সাজিয়ে উচ্চ তাপে পোড়ানো হয়। এই তাপমাত্রা অবশ্যই বিভিন্ন জিনিষের জন্যে বিভিন্ন হয়ে থাকে। পোড়াতে ৫০-৬০ ঘণ্টা সময় লাগে এবং ঠাণ্ডা হতে ২-৩ দিন লাগে। ইউরোপ, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ইটগুলির পরিমাপ ৯×৪½×২½" ইঞ্চি হয়ে থাকে, কিন্তু জার্মেনীর ইটের পরিমাপ হচ্ছে—২৫০×১২৩×৬৫ সেন্টিমিটার। অবশ্য বিভিন্ন ধরণের মাপ হতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের ইট তৈরি করা হয়।

এই ইটগুলির একটি বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Spalling—যার অর্থ হলো কিছুদিন ব্যবহার করলে দেখা যায় যে, বস্তুগুলি ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ভেঙে যাচ্ছে। অসমানভাবে উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা করবার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। এই যে তিন প্রকার ইট বা রিফ্র্যাকটরিস-এর কথা বলা হলো, এদের রাসায়নিক সংযুক্তি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, Al_2O_3, SiO_2—এই দুটি হচ্ছে খুবই সাধারণ ও প্রধান অঙ্গ। নিম্নে বিভিন্ন রিফ্র্যাকটরিস-এর ভাগগুলি দেওয়া হলো—

	ফায়ার ব্রিক্‌স্ (Fire Bricks)	সিলিকা ব্রিক্‌স্ (Silica Bricks)	সিলিমিনাইট (Sillimenite)	ম্যাগ্‌নেসাইট (Magnesite)	ডলোমাইট (Dolomite)
Silica (SiO_2)	৫৫-৭০	৯৪-৯৬	২৫-৩৫	২-৫	১২-১৫
Alumina (Al_2O_3)	২৫-৩৮	০.৫-১.৫	৫৫-৬৫	১-৫	২-৩
Titania (TiO_2)	১-১.৫	০.২-০.৩	০.৫-১	×	×
Iron Oxide (Fe_2O_3)	২-৫	০.৫-১.৫	০.২-০.৮	২-৮	২-৪
Magnesia (MgO)	০.২-০.৫	০.১-০.৫	০.৫-০.৮	৮৪-৯২	৩৪-৪২
Lime (CaO)	০.৫-১.০	২-২.৫	০.৫-১.০	২-৪	৩৮-৪২

এই বস্তুগুলির উচ্চতাপ সহনশীলতা নির্ভর করছে তার রাসায়নিক ধর্মের উপর। এতে কোন্ জিনিষ আছে এবং কি পরিমাণে আছে, তারই উপর নির্ভর করছে বস্তুটির গলনাঙ্ক। সব জিনিষই বিশুদ্ধ অবস্থায় সবচেয়ে বেশী তাপ সহ্য করতে পারে এবং কোন জিনিষের গলনাঙ্ক নির্ণয় করে তার বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যেতে পারে। আর একটি জিনিষ দেখা গেছে যে, কোন জিনিষে যদি আর একটি বা একাধিক বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, তবে কোন কোন সময় গলনাঙ্ক বেশ কমে যায়, যার ফলে ঐ পদার্থটির তাপ-সহনশীলতা কমে যায়—যাকে বলা হয় ইউটেকটিক (Eutectic)। যেমন সিলিকার গলনাঙ্ক হচ্ছে ১৭২৮° সে. এবং অ্যালুমিনার গলণাঙ্ক হচ্ছে ২০৫০° সে.; কিন্তু এই দুইটির মিশ্রণে এমন একটি ইউটেকটিক তৈরি হয়, যার গলনাঙ্ক হচ্ছে ১৫৪৫° সে.। এই ছবিটির একটি বিশেষ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র আছে, আর বিবরণ দিতে গেলে একটা বড় প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়। সে জন্যে কেবল মাত্র সামান্য দু-একটি কথা মাত্র বলা হবে এখানে। শতকরা ৯৪.৫ ভাগ

সিলিকা এবং শতকরা ৫'৫ ভাগ অ্যালুমিনার সাহায্যে যে মিশ্রণটি তৈরি হয়, তার গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম। এই জিনিষটিকে বলা হয় ইউটেকটিক। সুতরাং রিফ্র্যাকটরিস তৈরি করবার সময় এই জিনিষটির উপর নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, তা না হলে রিফ্র্যাকটরিস-এর গুণ বহুল পরিমাণে কমে যাবার সম্ভাবনা আছে। এখানে আর একটি বিশেষ জিনিষের উপর নজর দেওয়া হয়—সেটা হচ্ছে, তাকার এবং বড় আয়তনে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই সিলিকার তিনটি রূপ আছে; যথা—(ক) Quartz (α, β), (খ) Cristobalite (α, β), (গ) Tridymite (α, β)। এই তিন প্রকারের এবং মূলতঃ ছয় প্রকারের (α, β ধরে) আয়তন সমান নয় এবং তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে একটি আর একটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ফলে বস্তুটির আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। সেই
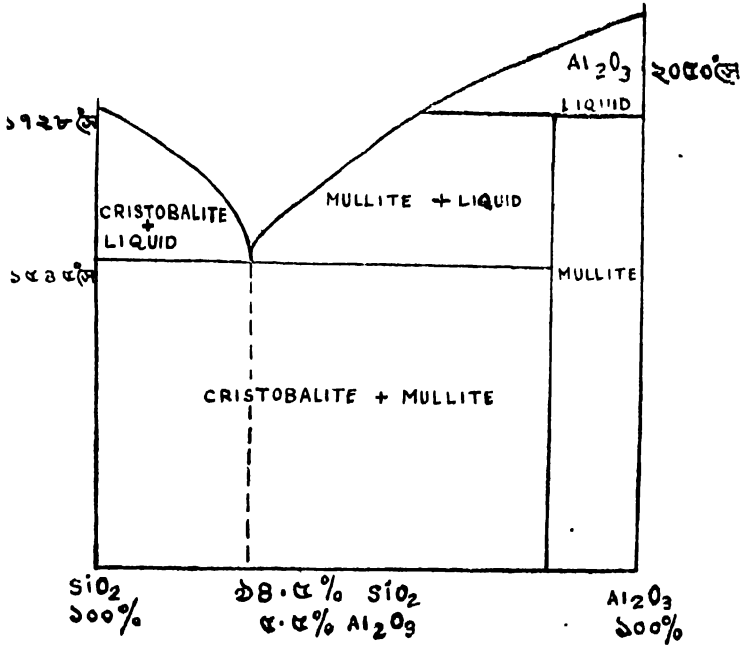
কতটা মিউলাইট (Mullite—$3Al_2O_3.2SiO_2$) হলো তার পরিমাপ করা। কারণ এর একটি বিশেষ মূল্য আছে রিফ্র্যাক্টরিসের উপর।

সিলিকা রিফ্র্যাক্টরিস সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। পৃথিবীতে SiO_2 বা সিলিকা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী উপাদান। এই সিলিকার অনেক রকম রূপান্তর থাকতে পারে—বালি, কোয়ার্ট্‌জ্‌ (Quartz) ইত্যাদি। রিফ্র্যাক্টরিস তৈরি করবার জন্যে এই Quartz-এরই বেশী ব্যবহার হয়। এটি নিয়-জন্যে সিলিকা ব্রিক্‌স্‌-এর তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তন বৃদ্ধি পায়। সিলিকা ব্রিক্‌স্‌ তৈরি করা সহজ ও দামে কম, যার জন্যে বেশী দামী ও আরও ভাল ক্রোম-ম্যাগ্‌নেসাইট (Chrome-Magnesite) ব্রিক্‌স্‌ বা ইটগুলি সব সময় ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ইটগুলির তাপ-পরিবাহিতা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। ইটগুলি চুল্লীতে স্থাপন করা হয়, ফলে বেশী তাপে কাজ করা সম্ভব হয়। কিন্তু

যদি ইটের তাপ-পরিবাহিতা ধাতুর ন্যায় হয়, তবে বহুল পরিমাণে তাপ নষ্ট হবে (Radiation loss)। তাই এই বিষয়টির জন্যে দুই প্রকারের ইট তৈরি করা হয়—এক প্রকার হচ্ছে, যেগুলি চুল্লীর মধ্যে থাকবে, তার পরিবাহিতা বেশী এবং আরেক প্রকারের হচ্ছে, যেগুলি চুল্লীর বাইরের দিকে থাকবে। প্রথমটি বেশী তাপ সহ্য করবে, আর দ্বিতীয়টি তাপ-পরিবহনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করবে। দ্বিতীয় প্রকারের ইটকে বলা হয় "অন্তরিত ইট" বা Insulated Bricks। প্রথমত: ইটগুলি ফাঁকা হয়, ফলে এর ক্ষমতা অনেক কমে যায় এবং ফাঁপা হবার ফলে হাল্‌কা হয়। যেহেতু ফাঁপা, সেহেতু তাপ সেই অন্তরীণ বায়ুর ভিতর প্রবেশে বা চলাচলে বাধা পায়। কারণ বায়ু কুপরিবাহী তাই সেগুলি হয় অন্তরিত ইট। যথেষ্ট ফাঁক থাকবার ফলে এগুলিকে যদি চুল্লীতে প্রথমে স্থাপন করা হয়, তবে অনেক জিনিষ ঐ ফাঁকে প্রবেশ করবে এবং নানা প্রকারের অসুবিধা ঘটাবে, যেমন—ধাতুমল ক্রিয়া (Slug action)। তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহিতার সামান্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে। নিম্নে দুই প্রকারের বিভিন্ন অন্তরিত ইট (ক) ও (খ) চিহ্নিত এবং ফায়ার ব্রিক্‌স্-এর পরিবাহিতা বিভিন্ন উত্তাপে দেওয়া হলো—

তাপ	অন্তরিত ইট (ক)	অন্তরিত ইট (খ)	ফায়ার ব্রিক্‌স্
৫০০° ফা:	১'০২	১'৬৪	৬ ৬৯
৬-০	১'০৪৫	১'৭৫	৬'৯২
৭০০	১ ১৪	১ ৮৬	৭ ১৫
৮০০	১'১৮	১'৯৪	৭'৩৮
৯০০	১'২০	২'০৩	৭'৬১
১০০০	১'২২	২'১১	৭'৮৪
১১০০	১ ২৩	২'১৮	৮'০৭

এখন রিফ্র্যাক্টরিস্-এর ঘনত্ব, গলনাঙ্ক, চাপের প্রভাবে গলনাঙ্কের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলা হবে। পূর্বে গলনাঙ্ক ও চাপের উপর গলনাঙ্ক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দুটি শব্দ এক নয় এবং প্রথমটির মান পূর্বের চেয়ে বেশী। এখন প্রথমটির মান যাই হোক না কেন, যদি চাপ বৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয়টির মান দ্রুত হ্রাস পায়, তবে জিনিষটি অকেজো হয়ে পড়ে। নিম্নে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হলো, যাতে সব রিফ্র্যাক্টরিস-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। তার পূর্বে কি ভাবে পোড়ানো হয় এবং কি দিয়ে তাপ দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমে ইটগুলিকে চুল্লীতে এভাবে সাজাতে হবে, যাতে সব জিনিষগুলি সমানভাবে উত্তপ্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত: সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে বেশী তাপ নষ্ট না হয়, তার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্তরিত ইট দেওয়া। চার রকমে পোড়ানো যেতে পারে—(১) কয়লার দ্বারা, (২) তেলের দ্বারা, (৩) গ্যাসের দ্বারা এবং (৪) বৈদ্যুৎশক্তির দ্বারা। যে তেল সাধারণত: ব্যবহার করা হয়, তার নাম ফারনেস তেল (Furnace Oil) এবং গ্যাস হচ্ছে প্রডিউসার গ্যাস (Producer Gas)।

	ঘনত্ব	রিফ্র্যাক্টরিনেস (Refractoriness,	রিফ্র্যাক্টরিনেস আণ্ডার লোড (Refractoriness under load 28lb/□"
(১) সিলিকা ব্রিক্‌স্	২'৩-২'৪	১৭১০-১৭১০° সে:	১৬৫০-১৬৮০° সে.
(২) সিলিসিয়াস	২'৪	১৬৫০-১৬৯০	১৫০০-১৬১০
(৩) ফায়ার ব্রিক্‌স্			

	ঘনত্ব	রিফ্র্যাকটরিনেস (Refractoriess,	রিফ্র্যাকটরিনেস আণ্ডার লোড Refractoriness under load 28lb□"
(ক) ২৫-৩০% Al_2O_3	২'৬-২'৭	১৬১০-১৬৫০	১৩৮০-১৪৬০
(খ) ৩০-৩৫% "	২'৭	১৫৩০-১৬৯০	১৪৬০-১৫২০
(গ) ৩৫-৩৮% "	২'৮	১৬৫০-১৭৩০	১৫২০-১৫৮০
(৪) সিলিমিনাইট	২'৯	১৭৭০	>১৬৫০
(৫) ম্যাগ্‌নেসাইট	৩'৪-৩'৬	১৮৫০	১৫০০-১৬৭০
(৬) ক্রোমাইট	৩'৮-৪'১	১৮৫০	১৩৩০-১৪৬০
(৭) জিরকোনিয়া	৪'৬	১৮৫০	১৫৮০-১৬৩০
(৭) কারবোরানডাম	৩'১-৩'২	১৮৫০	>১৭৫০

ভারতে লৌহ খনিজ পদার্থ আছে প্রচুর এবং কালক্রমে আমাদের দেশেও স্টীল তৈরি বহুলাংশে বেড়ে যাবে। যতই লৌহশিল্পের প্রসারতা বেড়ে যাবে, ততই রিফ্র্যাকটরিস-এর চাহিদা বাড়বে। বর্তমানে যে চাহিদা আছে, তাও আমাদের দেশে মেটানো সম্ভব নয়। যার ফলে বিদেশ থেকে রিফ্র্যাকটরিস আমদানী করতে হয় এবং ৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের প্রতি বছর নষ্ট হয়ে যায়। ধাতুর কতকগুলি নিজস্ব গুণ আছে যা রিফ্র্যাকটরিসের নেই, রিফ্র্যাকটরিসের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যা ধাতুর নেই। সেই জন্যে এমন একটি জিনিষ তৈরি করবার প্রয়োজন ছিল, যাতে দুয়েরই গুণ বর্তমান থাকবে। সেই অত্যাধুনিক জিনিষটির নাম সারমেট (Cermet)। সারমেট না হলে পারমাণবিক চুল্লী ও রকেট ইত্যাদি তৈরি করতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হতো। এখানে সারমেট সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়, শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এটি হচ্ছে বিজ্ঞান জগতের আর একটি বিস্ময়কর অবদান।

ভারত মহাসাগর

পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-সপ্তমাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে ভারত মহাসাগর। এর আয়তন ২ কোটি ৮০ লক্ষ বর্গমাইল। এই মহাসাগরের তীরে পৃথিবীর মোট অধিবাসীর এক-চতুর্থাংশের বাস। এই মহাসাগরের তলায় যে তেল প্রভৃতি প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ লুকানো রয়েছে এবং এই সমুদ্র থেকে আমাদের খাদ্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ যে সংগ্রহ করা যেতে পারে, মাত্র কয়েক বছর আগেও তা জানা ছিল না। ১৯৬১ সাল থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের ফলেই একথা জানা সম্ভব হয়েছে। ভারত সহ পৃথিবীর মোট ৩২টি রাষ্ট্র ভারত মহাসাগর সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধান অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা এবং বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংঘসমূহের আন্তর্জাতিক পরিষদের বিশেষ সমিতি এই তথ্যানুসন্ধান অভিযানের উদ্যোক্তা। ১৯৬১ সাল থেকে এই অভিযান সুরু হয়েছে এবং এই বছরের শেষে তা সমাপ্ত হবে। তবে সামুদ্রিক গাছগাছড়া এবং সামুদ্রিক গুল্ম কেল্‌প্‌কে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না, সে বিষয়ে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে, বিশেষ করে জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কেল্‌প্‌-এর ভস্ম থেকে আয়োডিন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কেল্‌প্‌ শুকিয়ে তাথেকে খাদ্যাদি প্রস্তুত করা যায় এবং সে খাদ্য যে মানুষের দেহের উপযোগী, তাও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। ভারত মহাসাগরে খাদ্যানুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, সামুদ্রিক গাছগাছড়া থেকে প্রোটিন বের করে নিয়ে তাতে এনজাইম মিশিয়ে সেই জিনিষকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে।

এনজাইম হচ্ছে বিভিন্ন জীবের দেহকোষ থেকে নিঃসৃত একপ্রকার জৈব পদার্থ। বিভিন্ন রকম এনজাইমের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষমতা আছে। এরা বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এক এক রকম এনজাইমের এক এক রকম নির্দিষ্ট রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। মুখের লালাতে টায়ালিন নামক একপ্রকার এনজাইম আছে, যার প্রভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়।

এ-পর্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়েছে যে, মহাসাগরে মানুষের অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার রয়েছে। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম প্রধান মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারিস স্টুয়ার্টের অভিমত এই যে, এই এলাকায় নিয়মিতভাবে মাছের চাষ হতে পারে এবং পৃথিবীর মৎস্যভাণ্ডার আদৌ হ্রাস না করে বর্তমানে যা রয়েছে, তার পাঁচগুণ বাড়ানো যেতে পারে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, মাছ ধরবার পদ্ধতিরও ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি হবে। তখন বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার রং ও শব্দের সাহায্যে মানুষ মাছের ঝাঁককে জালে এনে ফেলবে।

এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে। এতে ভারতীয় চাষীরা ভবিষ্যৎ বৃষ্টিপাত সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানতে পেরে সেভাবে চাষবাসের ব্যবস্থা করে অধিকতর ফসল ফলাতে পারবে। তাছাড়া এর ফলে সমুদ্র পথের যাতায়াত হবে আরও নিরাপদ, দ্রুত ও লাভজনক। সামুদ্রিক ঝড়ের আগমন-বার্তা আগে থেকেই বিজ্ঞাপিত হবার ফলে প্রাণহানির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

এই অভিযানের ফলে বিশেষ করে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সোজা পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারত মহাসাগরের এই তথ্যানুসন্ধানী অভিযানে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের মিলিত উদ্যোগের ফলে ভারত মহাসাগরেও যে নতুন সমুদ্রপথের সন্ধান মিলেছে, তাতেও শীঘ্রই যাত্রা সুরু হবে। এর ফলে যাতায়াতের খরচ অনেক বেঁচে যাবে।

বিজ্ঞানীরা কেবল আবহাওয়া, খাদ্য, জলপথ সম্পর্কেই নয়, ভারত মহাসাগরের তলায় প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, প্রচুর পরিমাণ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সকল প্রকার ধাতব সম্পদও ভারত মহাসাগরের নীচে সঞ্চিত রয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সমুদ্র থেকে অল্প খরচে সংগ্রহের চেষ্টায় অনেকটা সাফল্যও লাভ করেছেন।

ভারত ও মার্কিন যুক্ত উদ্যোগে ভারত মহাসাগর সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬৩ সালের মে মাসে মার্কিন গবেষণা-মূলক জাহাজ অ্যানটন ব্রনের সাহায্যে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলের সন্নিকটে তিনটি গভীর খাদ বা ক্যানিয়ন আবিষ্কারে সক্ষম হন। এই খাদের একটি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরলোকগত ডাঃ ভি. এস. কৃষ্ণানের নামে, দ্বিতীয়টি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহাদেবনের নামে এবং তৃতীয়টির অন্ধ্র ক্যানিয়ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যানুসন্ধানের কাজ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে বলে তৃতীয়টির নাম অন্ধ্র ক্যানিয়ন রাখা হয়েছে।

বিশ্বের ৩২টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে ভারত নানাভাবেই উপকৃত হয়েছে। এর ফলে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতেও সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় স্থির হয়েছে। এখানে ভূতাত্ত্বিক, ভৌত, রাসায়নিক ও প্রাণিবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা হবে।

তবে ভারত মহাসাগর সম্পর্কে এই আন্তর্জাতিক তথ্যসন্ধানী পরিকল্পনা কার্যকরী করবার সময়ে বোম্বাইয়ে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া কেন্দ্র এবং কোচিনে একটি সামুদ্রিক প্রাণিবিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। পরে এই ধরণের আরও কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এই তথ্যসন্ধানী পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞানীরা যে সব বিষয় পর্যালোচনা ও অনুশীলন করেছেন, তার মধ্যে আছে সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান, সমুদ্রের জলের উপরিভাগের তাপের আবহমণ্ডলে সঞ্চরণ এবং শব্দের গতিবেগ। এছাড়া তাদের উদ্যোগে মেঘলোকের আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে এবং সমুদ্রের তলায় যে উপত্যকা রয়েছে, তাদেরও মানচিত্র তৈরি হয়েছে।

এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে আরও জানা গেছে যে, এই মহাসাগরেরই অন্তর্গত আরব সাগরের জলে ফস্‌ফরাসঘটিত পদার্থের পরিমাণ অন্যান্য সাগরের তুলনায় পাঁচগুণ বেশী।

লোহিত সাগরের ২০০০ মিটার গভীরে উষ্ণ জলের সন্ধানলাভ এই অভিযানের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। এখানে লৌহখনিও থাকতে পারে বলে কোন কোন বিজ্ঞানী জানিয়েছেন। দ্বিতীয় আটলান্টিস নামে মার্কিন জাহাজের সাহায্যেই এই তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে।

ঐ জাহাজের অন্যতম বিজ্ঞানী মিঃ মিলার এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এভারেস্ট শৃঙ্গে এক হাল্কা গরম হাওয়ার সন্ধান পেলে যেমন হয়, সমুদ্রের গভীরে এই গরম জলের সন্ধান লাভও ঠিক সেই রকম।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ক্যান্সারের চিকিৎসার নতুন উপকরণ

পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ব্রিষ্টল হাসপাতালে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীগণ ক্যান্সারের চিকিৎসা আরও কি ভাবে ফলপ্রদ করা সম্ভব হতে পারে, তার উপায় সন্ধান করছেন।

চিকিৎসকগণ ব্যগ্র হয়েছেন ক্যান্সারদুষ্ট কোষগুলিকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্যে। এই কোষগুলি স্বাভাবিক পথে বৃদ্ধি না পেয়ে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

কোষ হলো জীবদেহের একেবারে প্রাথমিক পদার্থ। এই কোষ নিয়েই গঠিত হয়েছে প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহতন্ত্র। এগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাসায়নিক কারখানা বিশেষ, যার মধ্যে জীবনের প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়। সাধারণ কারখানার মতই এখানে দিবারাত্র কাজ চলে এবং কখনও কখনও এই কাজ চলে সাধারণ কারখানার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে।

চিকিৎসকদের কাছে কাজের এই নিয়মিত আবর্ত সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, কোষের মধ্যে কাজ যখন খুব বেশী পরিমাণে চলে, তখনই বিকিরণের সাহায্যে চিকিৎসা সম্ভব। এই কারণে চিকিৎসকগণ ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষগুলিকে ধ্বংস করবার জন্যে রোগীর শরীরে এই কোষগুলি কখন খুব বেশী মাত্রায়, সক্রিয় হয়, তা জানতে চান।

ব্রিষ্টলে চিকিৎসকদের যে দলটি এই দিকে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত আছেন, সেই দলটিকে পরিচালনা করছেন ডাঃ আর, সি, টাডওয়ে।

প্রথমে শল্যচিকিৎসকগণ একটি দু-ইঞ্চি লম্বা গাইগার কাউন্টার (এর দ্বারা তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরিমাপ করা হয়) ক্যান্সার-দুষ্ট কোষগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তারপর রোগীকে দেওয়া হয় এক ডোজ তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস্।

এই ফস্‌ফরাস তার স্বভাব অনুযায়ী শরীরের সুস্থ কোষগুলির চেয়ে ক্যান্সার-দুষ্ট কোষগুলিতে গিয়ে বেশী মাত্রায় জমা হয়, যার ফলে ক্ষুদ্র গাইগার কাউন্টারটি কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস এই কোষগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা পরিমাপ করে, আর পরিমাপ করতে পারে কোষগুলির সক্রিয়তা।

গাইগার কাউন্টার যখন এই তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ পরিমাণের রেকর্ড পায়, তখনই বোঝা যায় যে, ক্যান্সার-দুষ্ট কোষগুলি সর্বাধিক কর্মব্যস্ত।

এইভাবে রোগীর কোষের সক্রিয়তায় আবর্ত বুঝে নেওয়া যেতে পারে এবং তার ফলে চিকিৎসকগণও ক্যান্সার-দুষ্ট কোষগুলিকে ধ্বংস করবার জন্যে যথাসময়ে রেডিওথেরাপি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।

গড়পড়তা এই সক্রিয়তা সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে পৌছায় ১৩ ঘণ্টা অন্তর, কিন্তু রোগীরা এই ব্যাপারে সবাই সমান নয়। তাছাড়া এখনও অনেক পরীক্ষা বাকী রয়েছে।

[এই ক্ষুদ্র গাইগার কাউন্টারগুলি এখন নির্মাণ করছেন টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (কিং হেনরিজড্রাইভ, নিউ এডিংটন, ক্রয়ডন, সারে, ইংল্যাণ্ড) এবং মুলার্ড লিমিটেড (মুলার্ড হাউস, টরিংটন প্লেস, লণ্ডন, ডবলিউ সি-১)। এগুলি যথেষ্ট ক্ষুদ্র হওয়ায় মস্তিষ্কের টিউমার এবং উদরের মধ্যে সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব।]

অতি উচ্চ চাপ প্রয়োগে পদার্থের রূপান্তর

অতি উচ্চ চাপের মধ্যে পদার্থের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে খুব বিচিত্র উপায়ে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫ লক্ষ পাউণ্ডের চাপে সাধারণ তরল পদার্থ কঠিন হয়ে যায় এবং গ্যাস হয়ে যায় তরল পদার্থ। কোন কোন পাথর রবারের মত প্রসারিত হয়। এরূপ চাপের ফলে অপরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়েও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর ঘরের উত্তাপে জল সীসার মত ভারী ঘনকে পরিণত হয়, আবার চাপমুক্ত হওয়া মাত্রই সহসা এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে।

উচ্চ চাপ সংক্রান্ত গবেষণা থেকে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, তা হলো কৃত্রিম উপায়ে গ্র্যাফাইটের হীরকে রূপান্তরণ। ১৯৫৫ সালে নিউইয়র্কের সেনেকটাডির জেনারেল ইলেকট্রিক কর্পোরেশন লেবরেটরীতে বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই অসাধ্য সাধন করলে এই বিস্ময়কর ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক জগতে এক আলোড়ন দেখা দেয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগটাই একটা উচ্চতাপের বীক্ষণাগার। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের অনেক নীচে প্রচণ্ড তাপ ও চাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপ ও চাপে ভূগর্ভে যে গ্র্যাফাইট জমা থাকে, তা হীরকে রূপান্তরিত হয়। তবে একদিনে তা হয় না। এজন্যে সময় লাগে হাজার হাজার বছর, কখনও বা লক্ষ লক্ষ বছর।

বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে বছরে মোট কয়েক টন কৃত্রিম হীরক উৎপন্ন হয়। কতকগুলি দিক থেকে এই কৃত্রিম হীরক প্রাকৃতিক হীরকের চেয়েও বেশী মূল্যবান। কৃত্রিম হীরক শ্রমশিল্পে একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। কাটা, ঘষা ও পালিশ করবার কাজে প্রাকৃতিক হীরকের চেয়ে কৃত্রিম হীরকের কার্যকারিতা অনেক বেশী বলে লক্ষ্য করা গেছে। কারণ কৃত্রিম হীরকের আকৃতি ও পৃষ্ঠদেশ ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

জেনারেল ইলেকট্রিক লেবরেটরীর একজন বিজ্ঞানী বোরন ও নাইট্রোজেনের একটি যৌগিক মিশ্রণকে অতি উচ্চ চাপ ও উত্তাপের মধ্যে রেখে বোরাজন নামক একটি পদার্থের সৃষ্টি করেছেন। শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে ঘষা ও পালিশ করবার কাজে বোরাজন হীরককে হটিয়ে দিতে পারে। কারণ যে উত্তাপে হীরক গলে যায়, বোরাজন তা সহ্য করতে পারে। কাজেই শিল্পে বোরাজনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চাপের মাত্রা যতই বেশী হতে থাকবে, ধাতুর বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ততই বেড়ে যাবে। এ-থেকেই কোন কোন বিজ্ঞানী অনুমান করেছেন যে, বীক্ষণাগারে উৎপাদন করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, এমন উচ্চ মাত্রার চাপ যদি সম্ভব করে তোলা যায়, তাহলে কোন কোন ধাতুকে ঘরের উত্তাপের মধ্যেই অতিমাত্রায় পরিবাহী করে তুলতে পারা যায়।

চাপের পরিমাপ করা হয় কিলোবারের সাহায্যে। প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৪,৫০০ পাউণ্ডের চাপকে এক কিলোবার চাপ বলা হয়। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ চাপ যন্ত্রের সাহায্যেও ৫০০ কিলো-বারের বেশী চাপ সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে চাপের পরিমাণ আনু-মানিক ৩ হাজার কিলোবার। অবশ্য বিস্ফোরকের সাহায্যে মানুষ ক্ষণকালের জন্যে ৫ হাজার কিলোবারেরও বেশী চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে ভূগর্ভে ২৫০ মাইলের মধ্যে যে চাপ বর্তমান রয়েছে, আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তার অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। ভূগর্ভে এই অঞ্চলটিতেই অধিকাংশ ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, পাথর ও ধাতু নিয়ে বীক্ষণাগারে পরীক্ষার ফলে ভূমিকম্পের কারণ আরও ভালভাবে জানা যাবে এবং ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

চাঁদের কেন্দ্রস্থলে যে চাপ আছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তার অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করবার জন্য ক্যালিফোর্ণিয়ার বেভারলি হিলসের নরথ্রপ কর্পোরেশনে একটি হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহার করা হয়। এই প্রেসটি ৮৫ কিলোবার চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যাবে।

উচ্চ চাপ সম্পর্কে এই ধরণের গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে সৌর-মণ্ডলের উদ্ভব এবং কেমন করে এতে জীবনের সূত্রপাত হলো—বিজ্ঞানের এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

রক্ত থেকে ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোষ পৃথক করবার অভিনব পদ্ধতি

রক্তে ক্যান্সার-দুষ্ট কোষসমূহ পৃথক করবার একটি উপায় সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্লাষ্টিক-নির্মিত ফিল্টারে রক্তকে পরিষ্কার করা হয়। ক্যান্সার-দুষ্ট কোষসমূহ স্বাভাবিক কোষের তুলনায় আকারে বড় হয় এবং সেগুলি রক্তে ভেসে থাকে। ঐ ফিল্টারে ছেঁকে নিলে রোগদুষ্ট কোষসমূহ রক্ত থেকে পৃথক হয়ে যায়। কোন কোন ক্যান্সার রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে প্রথমাবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করে রোগ ধরা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

মানুষের একটি চুলের অগ্রভাগ যতটুকু স্থান নেয়, ঐ ফিল্টারে ততটুকু স্থানে এক হাজার ছিদ্র থাকে। পার-মাণবিক ড্রিলের সাহায্যে প্লাষ্টিক ফিল্মের এই সকল ছিদ্র করা হয়ে থাকে। এই ফিল্টার তৈরির প্রথম পর্যায়ে একটি পাত্‌লা প্লাষ্টিক ফিল্ম পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে রাখা হয়। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুসমূহের স্বাভাবিক বিভাজনের ফলেই তেজস্ক্রিয়া ঘটে। ঘনবস্তুর উপর এই সকল বিভাজনের ক্রিয়া হয় ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঐ পাত্‌লা পর্দার ভিতর দিয়ে যাওয়ার ফলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ ফিল্ম এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম পাত্‌লা হয়ে থাকে। তেজ-স্ক্রিয়ার প্রভাবে রাখবার পর এটিকে এমন একটি দ্রবণীয় পদার্থের মধ্যে রাখা হয়, যার সংস্পর্শে আসবার ফলে তেজস্ক্রিয় রশ্মির জন্যে ঐ পর্দার যে সকল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সে সকল স্থান ক্ষয় হয়ে ছিদ্র হয়ে যায়। ঐ দ্রবণীয় পদার্থে যত বেশী সময় রাখা যায়, ছিদ্রসমূহও তত বড় হয়ে থাকে। ঐ ফিল্মটিকে তেজস্ক্রিয় প্রভাবে যত বেশী রাখা যাবে, ছিদ্রের সংখ্যাও তত বেড়ে যাবে। এই সকল ছিদ্র নলের মত এবং প্রত্যেকটির ব্যাস একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং কোষসমূহ জমাট বাঁধে না বা কোষের কোন রকম ক্ষতিও হয় না, রক্ত সহজেই পরিস্রুত হয়ে থাকে এবং তার জন্যে কোন চাপের প্রয়োজন হয় না।

আর কোষসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই ফিল্টারের উপরেই হতে পারে।

নিউ ইয়র্কের স্কেনেকটাডীং মেমোরিয়েল ক্যান্সার সেণ্টারে ডাঃ শ্যাম এইচ. সীল এই নিয়ে গবেষণা করছেন। এপর্যন্ত এক-শ'টি ক্যান্সাররোগীর রক্ত নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

নিউ ইয়র্কের স্কেনেকটাডিং-এর জেনারেল ইলেক-ট্রিক কর্পোরেশনের বিজ্ঞানীরা এই প্লাস্টিক ফিল্টার তৈরি করেছেন। ডাঃ রবার্ট এম. ওয়াকার, ডাঃ বি. বুফোর্ড প্রাইস এবং ডাঃ রবার্ট এল. ফ্লেইশার এই গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটি এজন্যে তাঁদের বিশেষ পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

মহাকাশযাত্রীর সহায়ক উপকরণ মাইক্রোফিল্ম

আমেরিকার প্রথম যে মহাকাশযাত্রী চাঁদে অবতরণ করবেন, তাঁর মহাকাশযানটি চালু রাখা, মহাকাশযানে যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটলে তার মেরামত করা ও মহাকাশের পথ নিরূপণ ও নির্দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় বহু তথ্য এবং গ্রহতারকার বহু মানচিত্র ও চার্ট সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। চাঁদে অবতরণের বিভিন্ন পরিবেশে যাত্রীর বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সে সম্পর্কেও নানা তথ্য তাঁর সঙ্গে নিতে হবে। এসব মানচিত্র, চার্ট ও তথ্য একত্র করলে বারো-শ' পাতার একটি মোটা বইতে এসে দাঁড়াবে। অতি পাত্‌লা কাগজে ছাপলেও তার ওজন হবে ১৯ পাউণ্ডের বেশী।

এসব তথ্য মানচিত্র ও চার্টের অতি ক্ষুদ্রাকার আলোকচিত্র গ্রহণ করে মহাকাশযাত্রী সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তখন প্রতিলিপিগ্রাহী যন্ত্রসহ ঐ সব ক্ষুদ্র আলোকচিত্রের ওজন হবে মাত্র তিন পাউণ্ড এবং আয়তনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নোট বুকের চেয়ে সামান্য বড় হবে।

আলোকচিত্রসমূহ এমনভাবে রাখা হবে যে, কোন বিষয় জানতে চাইলে প্রতিলিপিগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে তা জানবার জন্যে পনেরো সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগবে না।

মহাকাশযাত্রী এপোলো শ্রেণীর মহাকাশযানে চাঁদে অবতরণ করবেন। তিনি ঐ মহাকাশযানের যে ভাগে থাকবেন, সেই ভাগেই মহাকাশযাত্রীর কোলের উপর ঐ মাইক্রোফিল্ম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ দুটি ছোট বাক্স থাকবে। ঐ বাক্সের ঢাক্‌না পর্দার কাজ করবে। বাক্সের আয়তন হবে লম্বায় ১১'৭৫ ইঞ্চি, প্রস্থে ৯'৫ ইঞ্চি এবং খাড়াই-এ ২'৫ ইঞ্চি।

অন্ধদের পথচলার অভিনব টর্চ

আমেরিকার অন্ধদের জন্যে সম্প্রতি একপ্রকার অভিনব টর্চ-লাইট উদ্ভাবিত হয়েছে। এই টর্চ-লাইটটি হাতে থাকলে তারা আগে থেকেই তাদের সামনের রাস্তা উঁচু নীচু কিনা, তাতে কোন সিঁড়ি বা সামনেই কোন খানা-ডোবা আছে কিনা—ইত্যাদি বিষয় জানতে পারবে। দুই ব্যাটারীর টর্চ-লাইটের মত এই যন্ত্রটি তাদের হাতে ধরা থাকে। অন্ধকারে পথচলার সময়ে টর্চ-লাইট জ্বেলে যেমন আমরা চলি, তারাও ঐ যন্ত্র হাতে করে তেমনি চলবে। রাস্তায় কোন প্রতিবন্ধক থাকলে তাতে ঐ যন্ত্র প্রতিফলিত আলোর মাত্রার তারতম্য ঘটে ও কম্পন সৃষ্ট হয়। ঐ কম্পন তারা করতলে অনুভব করে সতর্ক হতে পারবে। আলোর মাত্রা অনুযায়ী তাতে সেকেণ্ডে চার থেকে চার-শ' বার পর্যন্ত কম্পন সৃষ্ট হয়ে থাকে।

আলোর মাত্রার পরিবর্তন এসে পড়ে ফটো রেজিস্টারের উপর। তা প্রভাবিত করে অসিলেটরকে। আলোর তারতম্য অনুসারে অসিলেটরের কম্পনের মাত্রা কম-বেশী হয়।

ক্যালিফোর্ণিয়ার মেনলো পার্কের সান্টারিটা টেক্‌নোলজী নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্রটি তৈরি করেছেন এবং এর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে গবেষণা হয়েছে মার্কিন বিমান বাহিনীর কেম্ব্রিজের গবেষণাগারে। শব্দের অর্থ কতকগুলি সাঙ্কেতিক স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করানো যায় কিনা অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় ছাড়া দেহত্বকের স্পর্শানুভূতির সাহায্যে কোন কথা বোঝানো যায় কিনা, তা নিয়ে ঐ গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। ঐ পরীক্ষার ফলেই এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

মহাকাশে ভ্রমণকালে মহাকাশযাত্রীদের চোখ ও কান নানা গুরুতর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে। মহাকাশযাত্রীদের এবং বিশেষ করে যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কোন বিষয়ে

সতর্ক করে দিতে হলে এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগতে পারে।

"ট্যাক্‌টাইল ট্র্যান্সডিউসার" নামে এই যন্ত্রটি হাতে ধরা থাকলে এতে যে কম্পন সৃষ্ট হয়, তাতে শ্রবণের অনুভূতি জন্মে। অভ্যাস করলে কোন্ সঙ্কেতে স্বরবর্ণ এবং কোন্‌টিতে ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝায়, তা পরিষ্কার বোধগম্য হয়। এই প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে তিলাপিয়া মাছের উপযোগিতা

লেনিনগ্রাডের মৎস্য-বিজ্ঞানীরা ভিয়েৎনাম থেকে কিছু তিলাপিয়া মাছ (কলিকাতার বাজারে যাকে চলতি ভাষায় "আমেরিকান কই মাছ" বলা হয়) আনিয়েছিলেন এবং কিছু মাছ ঘটনা-চক্রে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জলাধারে ছাড়া পায়। কিছুদিনের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারেরা লক্ষ্য করেন যে, তাঁদের বিদ্যুৎ ষ্টেশনের জলাশয়ে পাম্পিং ষ্টেশনের ফিল্টারগুলিকে আর আগেকার মত ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হয় না এবং ছাঁকনিগুলির মুখে ছত্রাক ও শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদও জমে না। এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার পর জানা যায় যে, ওই তিলাপিয়া মাছ দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে জলাধারের যাবতীয় আগাছা, পোকামাকড় ও শ্যাওলা নিঃশেষে খেয়ে ফেলে জলাশয়কে খুব পরিষ্কার অবস্থায় রাখছে। তিলাপিয়া মাছের আরেকটি খুব বড় গুণ হলো স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে তারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

এর পর পরীক্ষামূলক ভাবেই উক্রাইনের দুটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারে তাদের ছাড়া হয় এবং সেখানকার অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা জলেও তারা বেশ নিজেদের মানিয়ে নেয়। এই জলাধার দুটিকে পরিষ্কার রাখবার কাজে তিলাপিয়া মাছ বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

সেই সঙ্গে দ্রুত বংশবৃদ্ধির ফলে এদের সংখ্যাও এত বেড়ে গেছে যে, এই থার্ম্যাল পাওয়ার ষ্টেশনের জলাধার দুটি স্থানীয় মৎস-শিকারীদের কাছে এক বিরাট আকর্ষণের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে একবার ছিপ ফেলে বসবার পর সকলেই অল্পক্ষণের মধ্যে থলে ভর্তি মাছ নিয়ে বাড়ী ফেরে।

মাছের চাষ

চতুর্থ পরিকল্পনায় ভারতে মাছের চাষের উন্নতির জন্য ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে রাজী হইয়াছেন। অবশ্য এই টাকাটার বেশীর ভাগই মৎস্য-বন্দর উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য দেওয়া হইবে।

বর্তমানে বৎসরে ১৪ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে আরও ৫ লক্ষ টন বেশী মাছ ধরা হইতে পারে।

মাছের জন্য বর্তমানে তিন হাজারটি যান্ত্রিক নৌকা আছে। এই সংখ্যা আট হাজার পর্যন্ত বাড়ান যাইতে পারে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার ব্যাপারে বড় যান্ত্রিক নৌকার সাহায্য লওয়া হইবে। বীরবল, ম্যাঙ্গালোর, কোচিন, বোম্বাই, বিশাখাপত্তনম, তুতিকোরিন ও সুন্দরবন—এই সাতটি কেন্দ্র হইতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার চেষ্টা করা হইবে।

কৃষি-বিজ্ঞান

ইউরিয়ার ব্যবহার

মধ্যপ্রদেশের কৃষকেরা শস্যের চাষে খুব ইউরিয়া সার ব্যবহার করছেন। তাঁদের মতে, ইউরিয়া যে কেবল সস্তা তাই নয়, ফলনের পক্ষে অ্যামো-নিয়াম সালফেটের চেয়ে ভাল।

ঐ রাজ্য সরকার ইদানীং রাজ্যের প্রধান

বাজরার চাষে নাইট্রোজেনঘটিত সার

বাজরার চাষের পক্ষে নাইট্রোজেনঘটিত সারই উপযুক্ত আর এই সার ফসলে দু-দফায় দিলে সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রথম দফায় বোনবার সময়, আর দ্বিতীয় দফায় যখন সবেমাত্র শীষ বেরুতে সুরু করে।

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের কানপুরে যে গবেষণা করা হয়, তাতে এই ফল পাওয়া গেছে। ঐ পরীক্ষায় দু-দফায় বিভিন্ন মাত্রায় এই সার দেওয়া হয়েছিল।

যে মাত্রাতেই নাইট্রোজেন দেওয়া হোক্ না কেন, দেখা যায় যে, দু-দফায় দিলেই ফলন বেশী হয়।

রশুন বোনবার সবচেয়ে ভাল উপায়

লাঙলের পিছনে খাতের নালীর মধ্যে রশুনের কোয়া ফেলে যাওয়াই রশুন বোনবার সবচেয়ে ভাল উপায়। কেরা পদ্ধতি নামে পরিচিত এই প্রথায় চাষ করে রশুন-চাষীরা বেশী লাভ করতে পাবেন।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কৃষি-কলেজে তিনটি পদ্ধতিতে রশুন বোনা হয়েছিল, যথা—ছিটিয়ে বোনা (Broadcasting), গর্তে বোনা (Dibbling) ও কেরা পদ্ধতি। কেরা পদ্ধতিতে যে রশুন বোনা হয়েছিল, তাতে ফলন বেশী হয় ও ছিটিয়ে বোনা এবং গর্তে বোনার চেয়ে হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ২১৫৲ এবং ১৫০৲ বেশী আয় হয়।

নতুন জাতের বাজরা

অনেক চাষীই বাজরার চাষ করেন। পাখীর উৎপাতে ক্ষেতে বাজরার ফলনের খুব ক্ষতি হয়। কিন্তু এস-৫৩০ নামে নতুন জাতের বাজরা উদ্ভাবিত হওয়ায় চাষীরা এই লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই বাজরার শীষে সরু সরু কাঁটা থাকায় পাখীরা খেতে পারে না। এই বাজরা খেতেও ভাল ফলেও বেশী এবং উন্নত

প্রধান ফসলের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেটের মধ্যে কোন্‌টি ভাল। দেখা গেছে যে, ধান আর গমের জন্যে ইউরিয়া আর অ্যামোনিয়াম সালফেট দুই-ই সমান কার্যকরী। জোয়ার ও কার্পাসের চাষে ইউরিয়া বেশী ভাল।

ইউরিয়া সার ব্যবহারের আর একটি সুবিধা এই যে, জমিতে না দিয়ে এই সার জলে গুলে ফসলের পাতায় ছিটিয়ে দেওয়া চলে।

আখের ক্ষেতে বাড়্‌তি লাভ

আখ-চাষীরা সামান্য একটু চেষ্টা করলেই আখের ক্ষেত থেকে অনেক বেশী আয় করতে পারেন। সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যের হর্টিকাল্‌চার্যাল ডিপার্টমেন্টে এক পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, আখের মুড়ি বসাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আখের সারির মধ্যে কোনও জল্‌দি জাতের সব্জীর চাষ করা যায়, তাহলে কেবল যে একটা বাড়্‌তি আয় হয় তাই নয়, আখের ফলনও বাড়ে। এতে আখ-চাষীর চাষ ও সারের জন্যে কোনও অতিরিক্ত খরচ তো নেই-ই বরং ঐ শস্যের ফসল তুলে নেবার পরে জমিতে মাড়িয়ে দিলে আখের ফসলে সারের কাজ দেয়। আখের সারির মধ্যে চাষ করবার জন্যে বীন্ বা মটরই সবচেয়ে ভাল বলে দেখা গেছে, তবে যে কোনও জল্‌দি জাতের সব্জীরই চাষ করা চলতে পারে।

মহীশূরের হর্টিকাল্‌চার্যাল ডিপার্টমেন্টে যে পরীক্ষা চালানো হয়, তাতে অবশ্য 'ফরাসী বীনের' চাষ করা হয়েছিল। নয় ইঞ্চি ব্যবধানে ফরাসী বীনের বীজ বোনা হয়। 'ফরাসী বীন' তুলে নেবার পর ঐ শস্য আখের ক্ষেতে সবুজ সার হিসাবে মাড়িয়ে দেওয়া হয়। কেবল ফরাসী বীন থেকেই একর প্রতি ৩০০ টাকা লাভ হয়।

প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ মণ ফলন হতে পারে।

জুলাই-এর মাঝামাঝি এই জাতের বীজ ক্ষেতে বোনবার উপযুক্ত সময়। ফসল পাকতে সময় লাগে ৯০ দিন মাত্র। যে সব অঞ্চলে ২৫ থেকে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় বা যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে, এই বাজরা সেই সকল অঞ্চলের বিশেষ উপযোগী।

তামাকের চাষে রাসায়নিক সার

তামাক-চাষীরা ক্ষেতে রাসায়নিক সার একদফায় পুরামাত্রায় দিলে ভাল ফল পাবেন। গাছ লাগাবার আগে ক্ষেতের নালীগুলির মধ্যে এই সার দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে কেবল যে বেশী তামাকপাতা পাওয়া যাবে তা নয়, পাতার উৎকর্ষও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

বিহারের পুসায় অবস্থিত "হুকা অ্যাণ্ড চিউইং টোব্যাকো রিসার্চ স্টেশনে" পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই তথ্য জানা গেছে।

তামাক-চাষীদের চলতি প্রথা হলো, নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক গাছ লাগাবার আগে ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া, আর বাকী অর্ধেক এক মাস পরে দেওয়া। কিন্তু তার বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার সবটা একবারে দিলে শতকরা ১০ ভাগ বেশী পাতা আর শতকরা ৩০ ভাগ উৎকৃষ্ট তামাক পাতা পাওয়া যাবে।

গমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গন্ধকের ভূমিকা

রবার, বারুদ, দেশলাইয়ের কাঠি, বাজি এবং সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরীতে সালফার বা গন্ধক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রবারকে কঠিন, কোমল অথবা স্থিতিস্থাপক করবার উদ্দেশ্যে গলিত গন্ধকের সঙ্গে রবার মেশানো হয়। ওষুধ তৈরিতেও গন্ধকের প্রয়োজন হয়। কীট-পতঙ্গ বিনাশ ও ছত্রাক নষ্ট করবার জন্যে কলিচুনের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।

গন্ধকের নানা রকম ব্যবহারই মানুষের বহুকাল থেকে জানা আছে। কিন্তু গমের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও যে গন্ধক বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে, এই বিষয়টি সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলেই জানা গেছে।

আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ওয়াশিংটন রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলের শতকরা ৭৫ জন কৃষক কৃষিসারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। তাতে তাঁরা খুবই ফল পেয়েছেন এবং তাঁদের গমের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকেরাও এ-বিষয়ে তৎপর হয়েছেন।

ওয়াশিংটনের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ভূমি-বিজ্ঞানী ডাঃ কোয়েলার 'গেন্স' নামে এক প্রকার গমের উৎপাদন গন্ধক মিশ্রিত সার প্রয়োগ করে কি ভাবে ও কি পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ গত বছর মিজুরীর ক্যানসাস সহরে আমেরিকান সোসাইটি অব এগ্রোনোমী বা মার্কিন কৃষি অর্থনীতি বিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপিত করেছিলেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, নাইট্রোজেন-যুক্ত কৃষিসারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে উৎপাদন যে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে, তা বিজ্ঞানীরা দশ বছর আগেই

বলেছিলেন। ওয়াশিংটন রাজ্যের প্যালাউজ উপত্যকার উত্তর দিকের ঢালু জমির উর্বরতা অবক্ষয়ের দরুণ অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে টিপিসমূহেও কর্দমাক্ত স্থানে গন্ধকযুক্ত সার অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে আশাতীত ফল পাওয়া গেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—যে সকল স্থানে আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত বেশী, সেখানেই গন্ধকযুক্ত সার অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে।

ওয়াশিংটন রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানের তুলনায় বারিপাত অধিক হয়ে থাকে এবং ঐ অঞ্চলেই গম উৎপাদনে বর্তমানে অধিকতর পরিমাণে গন্ধকযুক্ত সার প্রয়োগ করা হয়। গন্ধকযুক্ত সার প্রয়োগের কার্যকারিতা লক্ষ্য করে কৃষকেরা প্রথমতঃ কি ধরণের গন্ধকের এবিষয়ে উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশী, তা জানবার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয় এবং বিজ্ঞানীরাও এবিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন।

ডাঃ কোয়েলার সালফার ডাইঅক্সাইড নামে একটি গ্যাস, জিপ্‌সাম নামে শুষ্ক দানাদার পদার্থ এবং অ্যামোনিয়াম থিয়োসালফেট ও অ্যামোনিয়াম পোলিসালফাইড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই সকল কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি দেখলেন, এদের কার্যকারিতা প্রায় প্রত্যেকেরই সমান। প্রতি একর জমিতে এই সকল পদার্থ ১৬ পাউণ্ড হারে প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এই চার প্রকার গন্ধকের মধ্যে প্রত্যেকটির দ্বারাই গমের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জিপ্‌সাম জমির উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়। অ্যামোনিয়াম থিয়োসালফেট ও অ্যামোনিয়াম পোলিসালফাইড মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। আর সালফার ডাইঅক্সাইড মাটিতে যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হয়।

শুকনো জমিতে গন্ধকযুক্ত সার প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীদের পর্যালোচনার ফলে জানা গেছে, যে সকল শুকনো জমিতে গম জন্মে, সেখানে একবার গন্ধকযুক্ত সার প্রয়োগ করে পরবর্তী কয়েক বছরই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মার্কিন কৃষি দপ্তরের বিবরণীতে প্রকাশ—১৯৫১ সালে কোন কোন জমিতে একর পিছু পনেরো পাউণ্ড বা তার বেশী গন্ধক প্রয়োগ করা হয়। ১৯৬৩ সালে দেখা যায়, যে সকল জমিতে গন্ধকযুক্ত সার প্রয়োগ করা হয় নি, তাদের তুলনায় এই সকল জমিতে ১৩ বুশেল অধিক ফসল উৎপন্ন হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

জালে একটা বড মাছি ধরা পড়বার পব মাবডসা তার শরীবেব পশ্চাদ্ভাগ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি সুতা বের করে শিকাবটাকে 'মামি'ব মত কবে জড়িয়ে ফেলছে।

করে দেখ

চিনির দানায় অগ্নি-প্রজ্বলন

কোন কোন পদার্থের উপস্থিতিতে কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত বা সহজে নিষ্পন্ন হয়, অথচ বিক্রিয়ার ফলে সেই পদার্থটির কোনই পরিবর্তন ঘটে না, রসায়ন শাস্ত্রে এরূপ পদার্থকে ক্যাটালিস্ট (Catalyst) বা অনুঘটক বলা হয়ে থাকে। ক্যাটালিস্টের এই অদ্ভুত কার্যকারিতার বিষয় খুব সহজ একটি পরীক্ষা করে দেখতে পার। এই পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে—দেশলাই, সামান্য কিছু সিগার বা সিগারেটের ছাই এবং বড় রকমের একটি চিনির দানা। আজকাল সচরাচর আমরা সরু এবং মোটা দানার চিনি ব্যবহার করে থাকি ; কিন্তু সেগুলি ছাড়াও চিনির বেশ বড় বড় চৌকা দানা পাওয়া যায়।
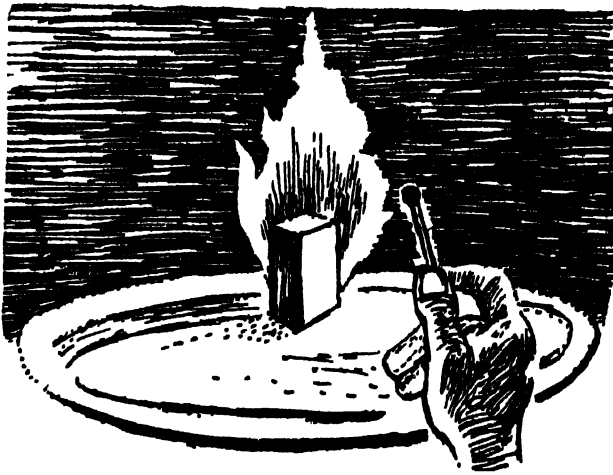
এই রকমের বড় চিনির দানা সংগ্রহ করে একটা দানা একখানা প্লেটের উপর রেখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তাতে আগুন ধরাতে পার কি না—চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই সেটাকে জ্বালাতে পারবে না।

এবার চিনির দানাটার একদিকে একটু সিগারেটের ছাই ঘষে দাও। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে এবার ছাই-ঘষা দিকটাতে লাগালেই দেখবে, দানাটাতে আগুন ধরে গেছে এবং সেটা বেশ সহজভাবেই জ্বলতে সুরু করেছে।

এথেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়—ছাইটা এখানে ক্যাটালিষ্ট বা অনুঘটকের কাজ করছে। ছাইটা-ই চিনির দানার প্রজ্বলনে সহায়তা করেছে। ছাই কিন্তু নিজে প্রজ্বলনক্ষম নয় এবং দহনকালেও সেটা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয় কথাটার সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা পড়েছিল, সে কথাটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই বিস্ফোরণের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয়েছিল এই বোমা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তার ফলে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমাদের এই পৃথিবীর উপরে একাধিক তেজস্ক্রিয় বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশের পথে মহাকাশ-চারীদের এর সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই তাঁরা বিশেষ ধরণের পোষাক পরে মহাকাশের পথে পাড়ি জমান।

এবার তেজস্ক্রিয়তা কি ভাবে আবিষ্কৃত হলো, সে কথায় আসা যাক। ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিক হেনরী বেকেরেল রঞ্জেনরশ্মি নিয়ে গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর গবেষণাগারের ড্রয়ারে কয়েকটা ছবির প্লেটের উপর কিছু ইউরেনিয়ামের লবণ ছিল। ছবির প্লেটগুলি ঠিক আছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তিনি একটি প্লেট 'ডেভেলপ' করেন। এবার তাঁর অবাক হবার পালা। বেকেরেল দেখলেন—ডেভেলপ করবার পর প্লেটে ইউরেনিয়াম লবণের ছাপ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। অন্ধকার ড্রয়ারে ছবির প্লেটগুলি থাকা সত্ত্বেও কি করে প্লেটে ছবির ছাপ ফুটে উঠলো—এই বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে করতেই ইউ-রেনিয়াম লবণ থেকে নির্গত একটা নতুন রশ্মির অস্তিত্ব ধরা পড়লো। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই নতুন রশ্মির নামকরণ করা হলো বেকেরেল রশ্মি।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, সে সময়ে কেবলমাত্র ইউরেনিয়াম থেকেই বেকেরেল রশ্মি নির্গত হবার কথা জানা ছিল। এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বেকেরেল রশ্মির উৎপত্তিস্থল কি শুধুই ইউরেনিয়াম? মাদাম মেরী কুরীর নাম তোমরা সবাই শুনেছ। তিনিই সর্বপ্রথম এই বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। সাধারণ অবস্থায় বাতাস বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। কিন্তু বেকেরেল রশ্মির একটি গুণ এই যে, এই রশ্মিযুক্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়ে থাকে। রশ্মির এই বিশেষ গুণটিকে কাজে লাগিয়ে মাদাম কুরী বিভিন্ন রকমের পদার্থ পরীক্ষা করেন। দীর্ঘ দু-বছর পরীক্ষার পর থোরিয়াম লবণের মধ্যে তিনি বেকেরেল রশ্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আরও দেখা যায় যে, লবণে যদি থোরিয়ামের ভাগ বেশী থাকে, তবে বিচ্ছুরিত রশ্মির পরিমাণও বেশী হয়। পিচব্লেণ্ড নামে এক রকম আকরিক ধাতব প্রস্তর আছে,

তাথেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই পিচ্ব্লেণ্ড ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে বেকেরেল রশ্মি বিকিরণ করে। সুতরাং এটা ধারণা করা স্বাভাবিক যে পিচ্ব্লেণ্ডে এমন নতুন কিছু পদার্থ আছে, যার বেকেরেল রশ্মি বিচ্ছুরিত করবার ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেকাংশে বেশী। এই ধারণাটা যে সত্য, সেটা প্রমাণ করেন মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী। পিচ্ব্লেণ্ড থেকে দুটি মৌলিক পদার্থ পৃথক করতে তাঁরা সক্ষম হন। মাদাম কুরী তাঁর জন্মভূমি পোলাণ্ডের সম্মানার্থে প্রথমটিকে পোলোনিয়াম নামে অভিহিত করেন। দ্বিতীয়টির সঙ্গে বেরিয়ামের অনেকাংশে মিল থাকায় এর নামকরণ করা হয় রেডিয়াম। রেডিয়ামের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তেজস্ক্রিয় বা Radioactive কথাটা উদ্ভূত হয়েছে "Radiare" নামে ল্যাটিন শব্দ থেকে। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, যা রশ্মি বিকিরণ করে। তাই যে সব পদার্থ থেকে বেকেরেল রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, তাদের আমরা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে থাকি। মাদাম কুরী প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়—এই নামানুসারে বেকেরেল রশ্মি বর্তমানে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নামে পরিচিত।

এবারে তেজস্ক্রিয় রশ্মির গুণের কথা বলছি। তেজস্ক্রিয় রশ্মি একটা মিশ্র রশ্মি, যা তিন রকমের বিভিন্ন রশ্মির সমষ্টি। বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আরনেষ্ট রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম এই তিন রকম পৃথক রশ্মির অবস্থিতির বিষয় টের পান। সেটা ছিল ১৮৮৯ সাল।

একটি সরু তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম অংশের গতিপথ সামান্য বাঁ-দিকে পরিবর্তিত হয়। রাদারফোর্ড এই অংশের নামকরণ করেন আলফা রশ্মি (α)। দ্বিতীয় অংশের গতিপথ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে ডানদিকে বেঁকে যায়—এর নাম বিটা রশ্মি (β)। তৃতীয় বা শেষ অংশের গতিপথ অপরিবর্তিত থাকে। এই অংশ গামা রশ্মি (γ) নামে পরিচিত। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, আলফা আর বিটা রশ্মিকে—রশ্মি বললেও এরা আসলে পদার্থের কণিকার প্রবাহ। আলফা রশ্মি হলো হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনের প্রবাহ এবং বিটা রশ্মি ইলেকট্রনের প্রবাহ। গামা রশ্মি হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিকিরণ।

বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় কণায় প্রভূত পরিমাণ শক্তি থাকে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোন একটি পদার্থকে অপর একটি পৃথক পদার্থে পরিবর্তিত করা যায়। ভর বেশীর জন্যে আলফা কণারই পরিবর্তন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। রাদারফোর্ড

১৯১৯ সালে নাইট্রোজেন গ্যাসকে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করেন। এই আঘাতের ফলে নাইট্রোজেনের একটা অংশ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিরও আমাদের মত পরিবার আছে। আমরা জানি যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির (α) একটি নির্দিষ্ট ভর আছে। তাই এই রশ্মি বিকিরণের ফলে বিশেষ একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভর পরিবর্তিত হয়ে অন্য একটি পদার্থে পরিণত হয়। এই নতুন পদার্থকে বিজ্ঞানীরা বলেন Daughter Element।

এই Daughter Elementটি আবার নতুন একটি Daughter Element-এর জন্ম দেয়। এই ভাবে পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত একটা স্থায়ী পদার্থ সৃষ্টি হলে এই পরিবারের সমাপ্তি ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে ইউরেনিয়াম সীসাতে রূপান্তরিত হয়। পৃথিবীতে চারটি প্রধান তেজস্ক্রিয় পরিবারের দেখা মেলে। সেগুলি হলো—(১) ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম পরিবার, (২) অ্যাকটিনিয়াম পরিবার, (৩) থোরিয়াম পরিবার, (৪) নেপচুনিয়াম পরিবার। নীচে ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম পরিবারের তালিকা দেওয়া হলো। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে, কি করে ইউরেনিয়াম সীসাতে রূপান্তরিত হয়।

	ইউরেনিয়াম ২৩৮ ৪·৫ লক্ষ কোটি বছর	α কণা →	থোরিয়াম ২৩৪ ২৪·১ দিন	β কণা →	
	প্রটাকটিনিয়াম ২৩৪ ১·১৪ মিনিট	β কণা →	ইউরেনিয়াম ২৩৪ ২৫০,০০০ বছর	α কণা →	থোরিয়াম ২৩০ ৮০,০০০ বছর
α কণা →	রেডিয়াম ২২৬ ১৬২০ বছর	α কণা →	ইমানেশন ২২২ ৩·৮২ দিন	α কণা →	পোলোনিয়াম ২১৮ ৩·০৫ মিনিট
α কণা →	সীসা ২১৪ ২৬·৮ মিনিট	β কণা →	বিস্‌মাথ ২১৪ ১৯·৭ মিনিট	β কণা →	পোলোনিয়াম ২১৪ ·০০০১৫০ সেকেণ্ড
α কণা →	সীসা ২১০ ২২ বছর	β কণা →	বিস্‌মাথ ২১০ ৫ দিন	β কণা →	পোলোনিয়াম ২১০ ১৩৮ দিন
α কণা →	সীসা ২০৬ স্থায়ী				

তেজস্ক্রিয়তা তত্ত্বকে পৃথিবীর বয়স পরিমাপের কাজে লাগানো যেতে পারে। এই বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন লর্ড রাদারফোর্ড। অধ্যক্ষ বল্ড্‌উইন পরে এই পদ্ধতির প্রচুর উন্নতি সাধন করেন। উপরের তালিকায় আমরা দেখি যে, ইউরেনিয়াম (২৩৮) সীসায় পরিবর্তিত হয় (পারমাণবিক ভর ২০৬)। এই সীসার একটা আইসোটোপ আছে, যার

পারমাণবিক ভর হলো ২০৭। সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীতে এই সীসার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর্থার হোম্‌স্‌-এর মতে, ইউরেনিয়াম পরিবর্তিত হয়ে এই সীসাতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে যে পরিমাণ এই সীসা (২০৭) পৃথিবীতে আছে, ইউরেনিয়াম থেকে তাতে রূপান্তরিত হতে যে সময় লাগবে, তা পৃথিবীর বয়সের সমান। এই হিসেব মত পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৪'৫—৪'৬ লক্ষ কোটি বছর।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাতাসকে আয়নিত করে। এই গুণটিকে কাজে লাগিয়ে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের যন্ত্র তৈরি করা হয়। এই সব যন্ত্রের মধ্যে গাইগার কাউণ্টার ও ক্লাউড চেম্বার উল্লেখযোগ্য। তেজস্ক্রিয়ার একক হলো, যা প্রতি সেকেণ্ডে ৩৭ লক্ষ কোটি (৩.৭×১০^{১০}) রশ্মি বিচ্ছুরিত করে। এই এককের নাম কুরি।

ছাত্রদের কাছে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ধর্ম দেখাবার জন্যে বেকেরেল একবার পিয়ের কুরীর কাছ থেকে কিছু রেডিয়াম এনেছিলেন। কাচের আধারে রক্ষিত এই রেডিয়াম কয়েক ঘণ্টার জন্যে তাঁর কোটের পকেটে ছিল। কিছুদিন পরে তিনি দেখতে পেলেন যে, কোটের বিপরীত দিকে তাঁর শরীরে একটা লাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষতের আয়তন ছিল রেডিয়ামের আয়তনের সমান। এরপর পিয়ের কুরী নিজের শরীরের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব পরীক্ষা করে অনুরূপ ফল পান। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রাণীর দেহকোষ ও লাল রক্তকণিকাকে নষ্ট করে ফেলে। পরীক্ষার ফলে আরও দেখা গেছে যে, ব্যাধিযুক্ত দেহকোষ এই রশ্মির প্রভাবে অনেক তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়। এই গুণের জন্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই রশ্মির মূল্য অপরিসীম। এই রশ্মির সাহায্যে রোগাক্রান্ত দেহকোষকে বিনষ্ট করে রোগের উপশম করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় এই রশ্মি অপরিহার্য।

এই পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তোমরা ভাবছ—গবেষকেরা বেঁচে আছেন কি ভাবে? তাঁদের জন্যে ভাবনার কিছু নেই। তেজস্ক্রিয় রশ্মি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সীসার পুরু দেয়াল ভেদ করতে পারে না। তাই গবেষকেরা সীসার দেয়ালের বাইরে বসে সুস্থ সবল দেহে তাঁদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

নতুন উপকথা

ঠাকুরমার পুরাতন উপকথায় তোমরা শুনেছ—রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সদাগরপুত্র চার বন্ধু ঠিক করলো—রাজ্যপ্রাচীরের গণ্ডী ছেড়ে তারা বেরিয়ে পড়বে দেশ-দেশান্তরে। তারা খুঁজে বেড়াবে, কোথায় কোন্ আশ্চর্য জিনিষ লুকিয়ে আছে। খোঁজবার পথে তাদের কত বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সব পার হয়ে তারা ফিরে এল সেই সব আশ্চর্য জিনিষের সন্ধান নিয়ে। আর নিয়ে এল রাক্ষসের পুরী থেকে সমুদ্রের ওপারের রাজকন্যাকে উদ্ধার করে।

এমনি অল্প কয়েকজন একদিন বেরিয়েছিল পুরোহিতদের তোলা প্রাচীরের গণ্ডী পার হয়ে বিশ্বের আশ্চর্য জিনিষের সন্ধানে। পুরোহিতেরা চারদিক থেকে আমাদের চলা, বলা ও ভাবনায় গণ্ডী বেঁধে দিল। উহুঁ—এ করতে পারবে না। না না এমন কথা বলা চলবে না—ভাবাও না। ভগবানের কোপে পড়বে। ভগবানের কোপে পড়ুক আর নাই পড়ুক ধর্মযাজকদের কোপে পড়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তারাই হয়ে দাঁড়ালেন ভগবান। ভগবানের রাজ্যে সত্য ও প্রেম যে সবার উপরে, পুরোহিতেরা নিজেদের মদমত্ততায় তা ভুলে গেলেন।

সকল দেশে সকল কালের উপকথার রাজপুত্রদের মত এক দল লোক জন্মে, যারা "তাসের দেশ"-এর নিয়মের প্রাচীর ভেঙ্গে সত্যের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে—শাসন গ্রাহ্য করে না। ষোড়শ শতাব্দীতে এমনি এক দল লোক জন্মেছিলেন ইউরোপে। ধর্মযাজকদের শাসন অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়ছিলেন তাঁরা সত্যের সন্ধানে। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ইটালির গ্যালিলিও।

গ্যালিলিও বললেন—সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। ধর্মযাজকেরা হেঁকে ওঠলেন—না, ওকথা বলা চলবে না। ভগবানের প্রধান সৃষ্টি মানুষের বাসস্থান যে পৃথিবী, তাকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের সৃষ্টি। গ্যালিলিও মানলেন না। তাঁকে আটক রাখা হলো সারা জীবন। বন্দী জীবনেও তিনি সত্যের সন্ধানই করে গেলেন। তাঁর আবিষ্কৃত সত্যই বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করলো। কেবল গ্যালিলিও নন, সে যুগে আরও অনেক সত্য-সন্ধানী ধর্মযাজকদের হাতে নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু সত্য-সন্ধান এগিয়েই চলেছে। আজ ধর্মযাজকদের হাত পঙ্গু। তাঁদের শাসন থেকে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান অধিক স্বীকৃতি পাচ্ছে।

এই আধুনিক রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর সদাগরপুত্রের দল এগিয়ে চলেছেন। চলবার পথে তাঁরা বহু রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছালেন। এখন যাবেন কোন্

পথে? তাঁরা ঠিক করলেন, এক এক জন এক এক পথ ধরে চলবেন। দেখবেন—কোন্ পথে কোন্ আশ্চর্য বস্তু লুকিয়ে আছে। এক রাস্তায় রাজপুত্রেরা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন গ্যালিভারের ভ্রমণ কাহিনীর মত ক্রমেই ছোট থেকে বড়তে পৌঁচাচ্ছেন—পৃথিবী, সৌরজগৎ, নীহারিকা, নীহারিকামণ্ডল (Clusters of Nebulae)—এমনি বহু জিনিষের সম্মুখীন হতে লাগলেন। যেন এই প্রসারের শেষ নেই। আর এক পথে মন্ত্রিপুত্রেরা চলতে চলতে ক্রমে ক্ষুদ্রের সন্ধান পাচ্ছেন। তাঁরা ক্রমে অণু, পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদির মত কল্পনাতীত পদার্থের সন্ধান পাচ্ছেন। কোটাল পুত্র অন্য পথে আবিষ্কার করছেন—আমাদের চারদিকে যা দেখি, তাদের মধ্যে সকলেই সাধারণভাবে শৃঙ্খলা মেনে চলে। দেখছেন—পদার্থ ও শক্তির খেলার নিয়মে সারা বিশ্বের গতি। আর সদাগর পুত্রেরা বিশ্ব-নিয়ম অবলম্বনে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে লাগাবার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন।

এগুলি সবই রাজপথ নয়—বহু রাস্তা এক রাজপথকে অন্য রাস্তার সঙ্গে করেছে। আবার বহু রাস্তার গলিপথও দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে আমরা শুনবো—এই নবীন রাজপুত্রের দল কোন্ পথে কি সব আশ্চর্য বস্তুর সন্ধান এনেছেন। প্রথমে রাজপুত্রদের সন্ধানের কথা শোনা যাক।

প্রথমে দেখা গেল, এই অগণিত তারকাখচিত আকাশে সূর্যও এক তারকা। সূর্য একা নয়—তার সঙ্গে কতকগুলি সন্তান-সন্ততি আছে। তারা হলো গ্রহ-উপগ্রহ। এই সব মিলে সৌরজগৎ। সূর্য কেন্দ্রে অবস্থিত—আর এই সব গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের নয়টি গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই সব গ্রহের প্রদক্ষিণ-পথ মোটামুটি নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট প্রদক্ষিণ-পথে এরা নিজ নিজ অক্ষের (Axis) চারদিকেও আবর্তিত হয়। আর এক কথা, কেবল গ্রহ-উপগ্রহই নয়, আকাশে অবস্থিত সকল জ্যোতিষ্কই মোটামুটি গোলকাকৃতির। সূর্য থেকে গ্রহগুলির দূরত্ব, তাদের গোলকের ব্যাসের পরিমাণ, প্রদক্ষিণকাল, অক্ষ গতিতে আবর্তনকাল প্রভৃতির এক তালিকা দেওয়া গেল। সূর্যও আপন অক্ষ গতিতে আবর্তন করে। উক্ত নয়টি গ্রহ ব্যতীত সূর্যের চারদিকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গ্রহ পরস্পরের কাছাকাছি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এগুলিকে গ্রহাণু বা অ্যাষ্টারয়েড বলা হয়। এই অ্যাষ্টোরয়েড্গুলির মধ্যে বৃহত্তমটির নাম এবং ব্যাসও এই তালিকায় দেওয়া আছে। ক্ষুদ্রতম যে কত ক্ষুদ্র, তা কেউ জানে না। গ্রহের গতি এবং দূরত্ব সব সময় সমান নয়—পরিবর্তিত হয়। তালিকায় গড় পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।

সূর্য ও গ্রহ	ব্যাস (KM)	দূরত্ব (লক্ষ KM)	অক্ষ অবলম্বনে আবর্তন কাল (দিন-ঘন্টা মিঃ সেঃ)	সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ কাল (দিন)	পৃথিবীর তুলনায় আয়তন	পৃথিবীর তুলনায় গুরুত্ব
সূর্য	১৩৯০০০০	—	২৪৬৫ — — —	—	৩৩১৯৫০	১৩০০০০০
বুধ	৫০০০	৫৭৮'৫	৮৮'০ — — —	৮৮'০	০'০৪	০'০৬
শুক্র	১২৪০০	১০৮১'০	—	২২৪'৫	০'৯২	০'৮১
পৃথিবী	১২৭৪২	১৪৯৪'৫	—২৩-৫৬-৪	৩৬৫'২৫	১'০	১'০
মঙ্গল	৬৭৭০	২২৭৭ ২	—২৪-৩৭-২২'৫৮	৬৮৬ ৯৮	০'১৫	০ ১০৮
(অ্যাষ্টারয়েড বা গ্রহাণু) সিরেস	৭৭০	৪১৩৫'৮	—	১৬৮১'৪৪	৮০০০ (?)	০'০০০২
বৃহস্পতি	১৩৯৫৬০	০৭৭৬'০	—৯ - ৫৩ —	৪৩৩২'৫৯	১৩১২	৩১৬'৯
শনি	১১৫১০০	১৪২৫৬'০	—১০-২৬ —	১০০৫৯'২	৭৩৪'০	৯৪'৯
ইউরেনাস	৫১০০০	২৮৬৮১'০	—১০'৭ — —	৩০৬৮৫ ৯	৬৪	৩৪'৬৬
নেপচুন	৫০০০০	৪৪৯৪১'০	— ১৫ — —	৬০১৮৭'৬৪	৬০	১৭'১৬
প্লুটো	১২৭০০ (এর কাছাকাছি)	৫৯০৬২'৬	?	৯০৫৫৭৮	১'০	১'০ (কাছাকাছি)

এই সকল গ্রহ নিয়েই সূর্যের জগৎ নয়! অনেক গ্রহের আবার উপগ্রহও আছে। তাদের সংখ্যা এবং নাম জেনে রাখা ভাল।

গ্রহ	তার উপগ্রহের সংখ্যা ও নাম	ব্যাস (KM)	মূল গ্রহ থেকে গড় দূরত্ব (KM)	প্রদক্ষিণ কাল দিন. ঘন্টা. মিঃ. সেঃ	গুরুত্ব (চন্দ্রের তুলনায়)
বুধ	০ (কোন উপগ্রহ নেই)				
শুক্র	০ (কোন উপগ্রহ নেই)				
পৃথিবী	(১) চন্দ্র	৩ ৪৭৬	৩৮৪৪০৩	২৭-৭-৪৩-১১'৫	১ ০
মঙ্গল	(১) ফোবাস	১৫ (?)	৯৩৮০	০ ৭-৩০-১৩ ৫৮	—
	(২) ডিমোস	৮ (?)	২৩৪৬০	১-৬-১৭-৫৪'৯	—
বৃহস্পতি	(১) নামহীন	১০০ (?)	১৮১২০০	০-১১-৫৭-২২'৭	—
	(২) আয়ো	৩৭৩০	৪২১৩০০	১-১৮-২৭-৩৩'৫১	১ ০
	(৩) যুরোপা	৩১৫০	৬৭০৫০০	৩-১৩-১৩-৪২'০৫	০ ৬৫
	(৪) জানিথিও	৫১৫০	১০৬৯৩০০	৭-৩-৪২-৩৩ ৩৫	২'১০
	(৫) ক্যালিসটো	৫১৮০	১৮৮১০০০	১৬-১৬-৩২-১১'২১	০ ৫৮
	(৬) নামহীন	১৩০ (?)	১১৪৫০০০০	—২০৫ ৬৮— —	—
	(৭) নামহীন	৪০ (?)	১১৭৩০০০০	—২০৬'০৬— —	—
	(৮) নামহীন	২৫ (?)	২৩৫০০০০০	—৭৩৮'৯ — —	—
	(৯) নামহীন	২৫ (?)	২৪১০০০০০	—৭৪৪'০ — —	—

গ্রহ	তার উপগ্রহের সংখ্যা ও নাম	ব্যাস (KM)	মূল গ্রহ থেকে গড় দূরত্ব (KM)	প্রদক্ষিণ কাল দিন. ঘণ্টা. মিঃ. সেঃ	গুরুত্ব (চন্দ্রের তুলনায়)
শনি	(১) মিমাস	৬৫০ (?)	১৮৫৭০০	—২২-৩৭-২'২৫	১/২১২০
	(২) এন্‌সিলেডাস	৮০০ (?)	২৩৭৯০০	১-৮-৫৩-৬'৮২	১/৫২০ (?)
	(৩) টেথিস	১৩০০ (?)	২৯৪৫০০	১-২১-১৮-২৬'১৪	১/১১৯
	(৪) ডায়োনে	১২০০ (?)	৩৭৭২০০	২-১৭-৪১-৯'৫৩	১/৬৯
	(৫) রি	১৭৫০ (?)	৫২৬৭০০	৪-১২-২৫-১২'২৩	১/৩০
	(৬) টিটান	৪২০০	১২৩০০০০	১৫-২২-৪১-২৬'৮২	১'৮৬
	(৭ হাইপেরিয়ন	৫০০ (?)	১৪৮০০০০	২১-৬-৩৮-২৪'০০	<[illegible]
	(৮) ইয়াপেটাস	১৮০০ (?)	৩৫৫৮০০০০	৭৯-৭-৫৬-২৪'৪	<১
	(৯) ফোবে	২৫০ (?)	১২৯৩০০০০	—৫৫০'৪৪	<[illegible]
ইউরেনাস	(১) এরিয়েল	৯০০ (?)	১০১৭০০	২-১২-২০-২০'৮	—
	(২) আমব্রিয়েল	৭০০ (?)	২৬৭০০০	৪-৩-২৭-৩৬'৭	—
	(৩) টিটেনিয়া	১৭০০ (?)	৪৩৮০০০	৮-১৬-৫৬-২৬'৭	—
	(৪) ওবেরন	১৫০০ (?)	৫৬৮০০০	১৩-১১-৭-৩'৫	—
নেপচুন	(১) নামহীন	৫০০০ (?)	১৫৩৭০০	৫-২১-২-৩৮'১	—
প্লুটো	কোন উপগ্রহের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি।				

এই সব নিয়ে সৌরজগৎ। অসংখ্য গ্রহাণু এরই অন্তর্গত। এই গ্রহাণু কোন গ্রহের সঙ্গে যুক্ত নয়। সৌরজগতে সম্মিলিতভাবে অন্যান্য গ্রহের মতই এর স্থান। পরে এই কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। উপগ্রহসমূহ তাদের অক্ষের (Axis) চারদিকে আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। উপগ্রহদের সঙ্গে নিয়ে গ্রহগুলি সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত। এগুলি ছাড়াও সৌরজগতের আরও কিছু কিছু সভ্য আছে—যেমন কতকগুলি ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জ।

ধূমকেতু—মাঝে মাঝে রাত্রির আকাশে (বিশেষ করে সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশে) বিশাল পুচ্ছসহ এক প্রকার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়। তারাই ধূমকেতু। সূর্যের কাছে আসবার কালেই এর পুচ্ছ হয়। সূর্যের যত নিকটে আসে, পুচ্ছও তত বড় হতে থাকে। সূর্য থেকে যখন অনেক দূরে, তখন এর চেহারা পুচ্ছবিহীন গোলকাকার। এদের মধ্যে কতকগুলি সৌরজগতের সীমার বাইরে যায় না।

উল্কাপুঞ্জ—মাঝে মাঝে রাত্রির আকাশে আলোকপিণ্ড অতি দ্রুত একদিক থেকে অপর দিকে যেতে দেখা যায়। পূর্বেও এদের অবস্থান জানা যায় না এবং পরেও না। এরা উল্কা। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি—'তারা খসে পড়া'। আসলে এরা আকাশে ভ্রাম্যমান শীতল প্রস্তরপিণ্ড। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে আলোকিত হয়।

কতকগুলি উল্কা-প্রস্তর মাছের ঝাঁকের মত আকাশে একই সঙ্গে বিচরণ করে। যুক্তভাবে গ্রহাদির মত এদের নির্দিষ্ট কক্ষ আছে। এরা যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ে, তবে একসঙ্গে বহু উল্কাপিণ্ড আলোকিত হয়ে অতি সুন্দর এক দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এরাও সৌর-জগতের সভ্য। সৌরজগতের এই সব সভ্যদের সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পরে দেওয়া হবে।

সৌরজগতের সভ্যেরা সাধারণভাবে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। এদের কেপ্‌লারস্‌ ল (Kepler's Law) বা কেপলারের নিয়ম বলা চলে। (১) সব গ্রহ সূর্যকে এক ফোকাসে রেখে প্রতিবৃত্তের (Ellipse) আকারের কক্ষে প্রদক্ষিণ করে। আশা করি প্রতিবৃত্ত বা Ellipse-এর সংজ্ঞা এবং রূপ তোমাদের জানা আছে। তবুও ছবিতে দেখানো হচ্ছে (চিত্র-১)। $ক_১$ ও $ক_২$ দুইটি ফোকাস্‌।
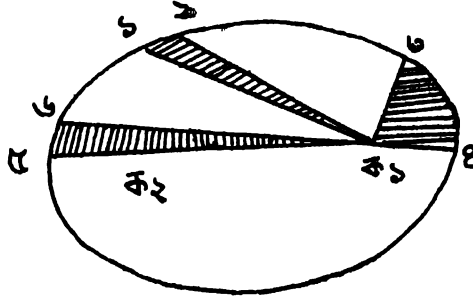
১ন° চিত্র

সূর্য এক ফোকাসে অবস্থিত। ১,২,৩,৪,৫,৬ গ্রহের কক্ষ। দেখা যায় যে, সৌরজগতের সকল গ্রহ একই দিকে গতিশীল হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, এই গতির দিক হলো তার উল্টা। আরও দেখা যায় যে, সকল গ্রহই সূর্যের বিষুব ক্ষেত্রের অর্থাৎ বিষুব বৃত্তকে আকাশে প্রসারিত করলে যে সমতল ক্ষেত্র হয়, তারই কাছাকাছি অবস্থিত।

(২) গ্রহের গতিবেগ (Velocity) সর্বদা সমান হয় না। সূর্যের যত কাছে আসে, এদের গতিবেগ তত বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিরও একটা নিয়ম আছে। একই সময়ে গ্রহ কক্ষপথে যতটা অতিক্রম করে, তার দুই প্রান্ত ফোকাস-এর সঙ্গে রেখার দ্বারা যুক্ত করলে যে ক্ষেত্রফল হয়, তারা সব সমান। গ্রহ সমান সময়ে (চিত্র-১) যদি ১-২, ৩-৪ এবং ৫-৬ পথ অতিক্রম করে থাকে, তাহলে ১ক-২, ৩ক-৪, এবং ৫ক-৬-এর অন্তর্গত ক্ষেত্রফল সমান হবে।

(৩) তৃতীয় নিয়ম—গ্রহের গড় দূরত্বের সঙ্গে তার প্রদক্ষিণ কালের সম্বন্ধ। প্রদক্ষিণ কালের বর্গফল সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্বের ঘন ফলের অনুপাতে হয়ে থাকে। দুই গ্রহের প্রদক্ষিণ কাল যদি $প_১$ ও $প_২$ এবং তাদের দূরত্ব যথাক্রমে $দ_১$ এবং $দ_২$ হয়, তবে

$$\frac{প_১^২}{প_২^২} = \frac{দ_১^৩}{দ_২^৩}$$

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কাল এবং দূরত্ব উভয়কেই ১ ধরা গেল। এখন অন্য এক গ্রহের প্রদক্ষিণ-কাল যদি পৃথিবী থেকে ১০০গুণ হয়, তবে এই গ্রহের দূরত্ব কত হবে ?

$$\frac{১^২}{১^৩} = \frac{১০০^৩}{দ}$$ অর্থাৎ $দ=(১০০^৩) \times \frac{১}{১} = ১০০০০০০$ গুণ হবে।

অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যত, এই গ্রহের দূরত্ব তার ১০০০০০০ গুণ হবে।

সূর্যের সঙ্গে গ্রহের যে সম্বন্ধ, গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহদেরও সেই সম্বন্ধ। একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রথমে এই সব নিয়ম কেপ্‌লারের দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়। পরে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র আবিষ্কার করলে এই সব নিয়মের অর্থ পাওয়া যায়। নিউটন প্রমাণ করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই গ্রহ-উপগ্রহ এই সব নিয়মাধীন। কেবল সূর্যের সঙ্গে গ্রহের এবং গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহেরই নয়, সমস্ত জ্যোতিষ্কের পরস্পর সম্বন্ধ এই সব নিয়ম মেনে চলে।

কেপ্‌লারের নিয়মগুলি ব্যতিরেকে বোডে (Bode) আর একটি নিয়ম আবিষ্কার করেন। একই লাইনে ৯টি ৪ লেখা গেল।

৪　৪　৪　৪　৪　৪　৪　৪　৪

তার পরে প্রথমটিকে ছেড়ে দিয়ে পর পর

৩　৬　১২　২৪　৪৮　৯৬　১৯২　৩৮৪

যোগ করলে নিম্নলিখিত সংখ্যা পাওয়া যায় (এদের প্রত্যেকটি ৩ এর পর থেকে পূর্বটির দ্বিগুণিত সংখ্যা)।

৪　৭　১০　১৬　২৮　৫২　১০০　১৯৬　৩৮৮

এই সব সংখ্যা সূর্য থেকে মোটামুটি ভাবে গ্রহসমূহের দূরত্বের অনুপাতে অবস্থিত ; যথা—

৩.৯　৭.২　১০　১৫.২　২৬.৫　৫২.০　৯৫.৪　১৯১.৯　৩০০.৭

এই নিয়মের কোন কারণ পাওয়া যায় না। হয়তো এই নিয়ম আকস্মিক—হঠাৎ ঘটে গেছে। প্লুটোর বেলায় এই নিয়ম খাটে নি। এই নিয়ম অনুসারে প্লুটোর দূরত্ব হওয়া উচিত ছিল ১১৫৩৩৬.৮ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু আমরা পূর্বের তালিকায় দেখেছি, এর দূরত্ব ৫৯০৬২ কিলোমিটারে। তাহলে কি হয়, প্রথম দিকে গ্রহের সন্ধানে বোডেস্ ল (Bode's Law) অনেক কাজে লেগেছে।

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

ডিম-চোর

পশু-পাখীদের ভিতরে খাবারদাবারের প্রায়ই একটা নিয়ম দেখা যায়—কেউ হয়তো তৃণভোজী, কেউ মাছ, কেউ মাংস, কেউ শস্য, কেউ বা ফল খেয়ে থাকে। কিন্তু একটা বিষয়ে তাদের বেশ মিল দেখা যায়। তারা প্রায় সবাই অল্প-বিস্তর ডিম খেতে ভালবাসে।

মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে বেচাকেনা নেই। ও কাজটা তারা কিনে চালাতে পারে না, ওটা তাদের চুরি করেই করতে হয়। ডিম হয় দুইটি মাত্র জীবের—এক পাখী, আর এক সরীসৃপ। তাই এই দুয়ের বাসার কাছে এই ডিম-চোরেরা ঘোরাঘুরি করে এবং সুবিধা পেলেই ডিম নিয়ে যায় বা খেয়ে পালায়।

কেউ কেউ ডিমটি যেখানে পায় সেখানেই খেয়ে ফেলে। কেউ সেটা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে সুবিধামত জায়গায় বসে খায়, কেউ বা মজুত করেও রেখে দেয়, পরে খাবার জন্যে। এরা প্রায়ই ডিমচুরির মৎলবে মনুষ্য-বসতির কাছাকাছিও ঘুরে বেড়ায়, কারণ তারা জানে, সেখানে হাঁস বা মুরগী থাকবেই এবং অনেক হাঁস বা মুরগীর অভ্যাস আছে—ঝোপের ধারে বা পুকুরের পাড়ে ডিম পাড়বার।

কাক, হাঁড়িচাঁচা প্রভৃতি পাখীরা নামকরা ডিম-চোর। যদিও ওরা প্রায়ই ডিমটি যেখানে পায়, সেখানেই ভোজন সমাধা করে, তবু প্রয়োজনমত ঠোঁটে করে ডিমটি নিয়েও পালায়। তারপর তার সুবিধামত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করে। এরা ছোট ছোট ডিম ঠোঁটে করে নিয়ে পালায় এবং একবারেই সম্পূর্ণটা গিলে খায়।

গাল, অ্যালবাট্রস প্রভৃতি সামুদ্রিক পাখীরা ডিম চুরিতে ওস্তাদ। এরা অনেক সময় নিজেদের জাতভাইয়ের ডিমও চুরি করে। সমুদ্রের মধ্যে এমন অনেক দ্বীপ আছে, যেখানে মানুষের বসতি নেই। সেখানে আছে বহু পাখীর বাস এবং প্রায়ই এক এক দ্বীপে বাস করে এক এক জাতের পাখী। যখন এদের ডিম পাড়বার ঋতু আসে, তখন হাজারে হাজারে, লাখে লাখে তারা মাটির উপর খড়-কুটা বিছিয়ে বাসা বাঁধে, আর সেখানে এই সব সামুদ্রিক পাখীদের ভীড় জমে যায় ডিম খাবার জন্যে।

দক্ষিণ-মেরুর কাছাকাছি স্কুয়া নামে এক রকম সামুদ্রিক পাখী আছে, যারা বিস্তর পেঙ্গুইনেব ডিম খেয়ে ফেলে। পেঙ্গুইন একবারে একটি মাত্র ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম চুরি করে কোন স্কুয়া আকাশে উঠে পড়লে মা-পেঙ্গুইন তার পিছন পিছন ছুটতে থাকে আর তার ছোট ডানা ঝাপ্‌টায়। পেঙ্গুইন উড়ন-ক্ষমতাহীন।

এই ডানা ঝাপ্‌টানোতে তার অন্তর্নিহিত ওড়বার চেষ্টাই প্রকাশ পায়। সে দৃশ্য অতি করুণ।

পশুদের মধ্যে নামকরা ডিম-চোর হচ্ছে শেয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজী, বানর, ইঁদুর, স্টোট, মারটেন (দক্ষিণ-আমেরিকার বেজীর মত জন্তু) ও সজারু। স্টোটদের ভিতরে ডিম নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার মতিগতি দেখা গেছে। একবার এক প্রাণী-বিজ্ঞানী একটি স্টোটের গর্তে এক ডজন মুরগীর ডিম দেখেছিলেন, আর একটি স্টোটের গর্তে দেখেছিলেন আধ ডজন অন্য পাখীর ডিম। স্টোট থুত্‌নি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ডিম নিয়ে যায় তার গর্তে। আর সামনের দুই পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে পথের নিশানা ঠিক রাখে। মার্টেনদের ডিম চুরির কায়দাটাও ঐ একই রকম। তবে তাদের গর্তে জমানো ডিম এখনও দেখা যায় নি।

ইঁদুরও ঠিক স্টোটের মতই ডিম চুরি করে অর্থাৎ ডিমটি চুরি করে থুত্‌নি দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে পালায়। ইঁদুরের দেহের অনুপাতে একটি হাঁস বা মুরগীর ডিম অনেক বড়। তবু ইঁদুরও তা নিয়ে পালায়। সে জন্যে এরকম কথা প্রচলিত আছে যে, দুটি বা তাতোধিক ইঁদুর একত্রে দল বেঁধেও কাজ করে। এই কথার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নেই, অর্থাৎ কোন বিজ্ঞানী আপন চোখে দেখে তা সমর্থন করেন নি এখনও।

সজারু ঠিক ডিম চুরির মৎলবেই ঘুরে বেড়ায়, এমন কথা এখনও খুব ভাল করে' প্রমাণিত হয় নি। তবে হঠাৎ যদি সে এমন কোথাও এসে পড়ে যেখানে কোন বাসায় পাখীর ডিম সঞ্চিত রয়েছে, তাহলে সে সেখানেই একটা একটা করে সব ডিম শেষ করে সরে পড়ে। তার গায়ের ঐ কাঁটার আবরণের জন্যে পাখীরা তাদের কিছু করতে পারে না।

শেয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজী প্রভৃতিও পাকা ডিম-চোর। গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর ডিম এরা বিস্তর চুরি করে খায়। পাখীর ডিমও এরা সুবিধামত পেলে খায়। তবে যাদের ডিম এরা সবচেয়ে বেশী খায়, তারা হচ্ছে কুমীর এবং কচ্ছপ। কুমীর বা কচ্ছপ ডিম পাড়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে। তারপর তারা আবার মাটি দিয়ে সেই ডিম ঢেকে দেয়। এরা ডিমে তা' দেয় না, ডিম একটা বিশেষ সময়ের পর আপনিই ফোটে এবং বাচ্চারা উপরের ঝুরঝুরে মাটি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। ডিম না ফোটা পর্যন্ত কুমীর বা কচ্ছপ খাবার খোঁজবার সময় ছাড়া এই ডিমের গর্তের কাছাকাছিই থাকে। শেয়াল বা বেজী তাদের ভাব দেখেই টের পায়, কাছাকাছি ডিম আছে। তখন তারা সেখানে ঘুরঘুর করতে থাকে এবং সুবিধা পেলেই সব ডিম লোপাট করে দিয়ে পালায়।

ভারতবর্ষের বানর ফলমূল, কচি পাতা প্রভৃতি খেয়ে জীবনধারণ করে; অর্থাৎ তারা নিরামিষভোজী। কিন্তু ডিম খেতে তারা ওস্তাদ। গাছে গাছে তারা পাখীর বাসা খুঁজে বেড়ায় এবং বাসা পেলে দুটি বানর এক জোট হয়ে চুরির কাজটি সমাধা করে। একটি বানর বাসার কাছাকাছি গিয়ে বাসায় বসা পাখীকে জ্বালাতন করতে থাকে আর একটি বানর থাকে উল্টো দিকে লুকিয়ে। পাখী যখন বাসা ছেড়ে এই শত্রুকে আক্রমণ করতে উঠে আসে, তখন অন্য বানরটি ডিম নিয়ে পালায়। বানরই হচ্ছে একমাত্র জীব, যারা জোটবদ্ধ হয়ে এই কাজ করে।

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

বিবিধ

ভারতের আধুনিকতম আলোকস্তম্ভ

গুজরাট থেকে প্রচারিত পি-টি. আই-এর এক খবরে জানা যায়—কচ্ছ উপসাগরবর্তী জাখাউ বন্দরের কাছে এগারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি ও সজ্জিত দেড়-শ' ফুট উঁচু একটি আলোকস্তম্ভ ১১ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে আলোকিত হয়। এটি ভারতের আধুনিকতম ও বৃহত্তম অলোকস্তম্ভ। নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সমন্বিত এই স্তম্ভের আলো পঁচিশ মাইল দূর থেকে দেখা যাবে।

বঙ্গোপসাগর তৈলসমৃদ্ধ

রাঁচী থেকে প্রচারিত পি. টি. আই-এর এক খবরে প্রকাশ—জলের নীচে তেল সম্পর্কিত সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ এ. এ. জ্যাবারোভিচ সম্প্রতি রাঁচীতে বলেন যে, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস বঙ্গোপসাগরের নীচে এত তেল আছে যে, তাহা আবিষ্কৃত হইলে ভারত পৃথিবীর অন্যতম প্রধান তৈল-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হইবে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় ভারতে শীঘ্রই অনেক বড় তৈলখনি আবিষ্কৃত হইবে।

ভারতের চুল বিদেশে রপ্তানী

ইউ. এন. আই. কর্তৃক মাদ্রাজ থেকে প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের তালিকায় আর একটি নতুন পণ্যের যোগ হয়েছে—মানুষের চুল। এই চুল রপ্তানী করে ভারত এখন বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে।

গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে ভারত ১৯১৯৬৬৮ টাকা মূল্যে ২৫৬০২ কিলো মানুষের চুল পশ্চিমী দেশগুলিতে রপ্তানী করেছে।

সবচেয়ে বড় খরিদ্দার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৭৭১২ কিলো। এর দাম ৭৯৬৮৩৮ টাকা। তার পরে পশ্চিম জার্মেনী ও ফ্রান্স।

বাকী যে ১৩টি দেশ ভারত থেকে মানুষের চুল ক্রয় করে, তাদের মধ্যে বৃটেন, ক্যানাডা, পূর্ব-জার্মেনী, অস্ট্রেলিয়া, ইটালী ও যুগাশ্লোভাকিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত

নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত ইউ. এন, আই-এর এক খবরে প্রকাশ—'ইস্রায়েল সংবাদের'

সর্বশেষ সংখ্যায় জানা যায় যে, ইস্রায়েলী চিকিৎসকগণ সন্ধান পেয়েছেন যে, দক্ষিণ নেগেভ মরুভূমির বাসিন্দা ১৮০০০ অর্ধযাযাবরের বস্তুতঃ কোন হৃদ্‌রোগ নেই। মরুভূমির এই অধিবাসীরা তরকারি, ফল বা ডিম খায় না। তাদের সেই বালির আবাসে মাছ পাওয়াই যায় না। মাংস তারা কেবল মাসে একবার খেয়ে থাকে।

শক্ত ধরণের খাদ্যের মধ্যে তারা গম বা বার্লির রুটি খায়। কিন্তু তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ খায়। ভেড়া, ছাগল, উট অথবা গাধার মধ্যে যে কোন প্রাণীর দুধ তারা খেতে পারে। বিশেষ করে উটের দুধ তারা পুষ্টিকর বলে মনে করে।

মঙ্গলগ্রহেও মানুষ আছে

নয়াদিল্লী থেকে প্রাপ্ত ইউ. এন. আই-এর সংবাদে জানা যায়—একজন সোভিয়েট বিজ্ঞানীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, মঙ্গলগ্রহে জীবজন্তু আছে। সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী মনে করেন যে, মঙ্গলগ্রহে উন্নত ধরণের সভ্যতাও থাকতে পারে।

বিজ্ঞানীর নাম ফেলিক্স জিগেল। তিনি বলেন যে, মঙ্গলগ্রহের তথাকথিত সমুদ্র, মরুস্থান এবং খালগুলি প্রচুর শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ।

তিনি বলেন যে, মঙ্গলগ্রহের আকৃতিতে যে সব সাময়িক পরিবর্তন দেখা যায়, তা বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি। উপরে বৃহৎ জলাধার ও মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন বিভিন্ন প্রকারের জলাশয় থেকে শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অবশ্য অন্য কোন সোভিয়েট বিজ্ঞানী এপর্যন্ত জিগেলকে সমর্থন করেন নি।

তিন প্রকার প্রাগৈতিহাসিক মানুষ

শিকাগো থেকে প্রচারিত এ. পি-এর এক খবরে প্রকাশ—বিশ্বের প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অন্যতম ডাঃ লুই এস. বি. লিকে আবিষ্কার করেছেন যে, ১০ লক্ষ বছর পূর্বে তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ একই সময়ে ও একই স্থানে বাস করতো।

ডাঃ লিকে নাইরোবির বারিনডেন মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। তিনি তাঁর সহকর্মী বৈজ্ঞানিকগণকে বলেন যে, তাঁরা যেন থিয়োরীগুলিকে তথ্য হিসাবে গ্রহণ না করেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মানুষের উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বক্তৃতামালায় ডাঃ লিকে তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত মত প্রকাশ করেন।

মহাকাশে পারমাণবিক চুল্লী

ভ্যাণ্ডেনবুর্গ বিমানঘাঁটি, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রচারিত রয়টারের এক খবরে জানা গেছে—এই সর্বপ্রথম একটি পারমাণবিক চুল্লী পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথ পরিক্রমা করছে।

ভবিষ্যতে গ্রহান্তর পরিক্রমায় পারমাণবিক চুল্লী প্রযোজনীয় শক্তি জোগাতে পারবে কি না, তারই পরীক্ষা হচ্ছে।

একটি কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তরে একটি পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন করে সেটাকে মহাকাশে তুলে দেওয়া হলো। এই ধরণের কোন চেষ্টা ইতিপূর্বে আর করা হয় নি।

একটি অ্যাটলাস-আগেনা রকেট ক্ষুদ্রাকৃতির চুল্লী-বোঝাই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষে স্থাপন করলো। পৃথিবীর ৭০৫ থেকে ৭১৫ মাইল দূরত্বে থেকে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করলো।

চার ঘণ্টা পর বিজ্ঞানীরা চুল্লীটিকে কাজ আরম্ভ করবার নির্দেশ দিলেন।

এর আগে তাঁরা অবশ্য এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, উক্ত দূরত্বে চুল্লীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলেও বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হবে না।

বিমানবাহিনী ও পারমাণবিক শক্তি কমিশন

২৫০ পাউণ্ড ওজনের এই তাপ-চুল্লীটি তৈরি করেছেন এবং নাম দিয়েছেন 'স্ন্যাপ-১০-এ'।

চুল্লীটি বারো মাস চালু থাকবে এবং সর্বোচ্চ ৫ শত ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করবে—যা পাঁচটি ঘরের আলো জ্বালাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তামার রং সংরক্ষণের চেষ্টা

তামা বা তামামিশ্রিত জিনিষপত্রের জন্যে এক ধরণের নতুন স্বচ্ছ ল্যাকার সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে, তাথেকে সম্প্রতি জানা গেছে যে, এই ল্যাকার ব্যবহারের ফলে তামার যে কোন জিনিষ গৃহের বাইরেও সহজে ব্যবহার করা যাবে।

এই ল্যাকারটি হলো "ইনক্রাল্যাক" (Incralac) নামে এক রকমের সংরক্ষণাত্মক পদার্থ। ইণ্টার-ন্যাশন্যাল কপার রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ নন-ফেরাস মেটাল্‌স্‌ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন এই পদার্থটি উদ্ভাবন করেছেন।

তামা এবং সঙ্কর তামার জন্যে কি ধরণের ল্যাকার ব্যবহার সম্ভব হতে পারে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান বহুকাল ধরেই চলে আসেছে। স্থপতিদের কাছে ব্রোঞ্জের ধরণের তামার রং বিশেষ প্রিয়, কিন্তু এই রংটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো এযাবৎ সম্ভব হয়েছে গৃহের মধ্যে, গৃহের বাইরে নয়।

ইনক্রাল্যাক হয়তো এইবার গৃহের বাইরেও তামার ব্যবহার সম্ভব করবে। কিন্তু কতদিন তামা তার আসল রং রক্ষা করতে পারবে, তা এখনও জানা যায় নি। অবশ্য রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন বলেন—তাঁরা ইতিমধ্যে প্রমাণ পেয়েছেন যে, দু'বছরেও বাইরের একটি তামার প্যানেলের রঙের কোন বিকৃতি ঘটে নি।

কাচতন্তু দিয়ে তৈরি ফ্যান

বৃটেনের একটি ফার্ম মোটর গাড়ী, লরি অথবা ট্র্যাক্টরে ব্যবহারের জন্যে একটি কুলিং ফ্যান উদ্ভাবন করেছেন, যার ওজন প্রচলিত ফ্যানের ওজনের বিশ ভাগের একভাগ মাত্র।

এই ফ্যানটি কাচতন্তুর তৈরি। ফ্যানটির ছয়টি নমনীয় ব্লেড আছে। ব্লেডগুলি এমনভাবে সংস্থাপিত—এরোপ্লেনের প্রপেলারের সঙ্গে যা তুলনীয়—যার ফলে ইঞ্জিনের উপর চাপ অনেক কম পড়ে।

নির্মাতাদের মতে, নতুন ফ্যানে শক্তির অপব্যয় রোধ করা যাবে। প্রচলিত ধাতব ফ্যানে এই অপব্যয় একটু বেশী রকমেরই হয়ে থাকে।

মহাকাশযান ভস্কড-২-এর নির্বিঘ্নে অবতরণ

সোভিয়েট মহাকাশযান ভস্কড-২-এর মহাকাশ পরিক্রমার কথা উল্লেখ করিয়া জড্রেল ব্যাঙ্ক অবজারভেটরীর ডিরেক্টর স্যার বার্ণার্ড লোভেল (১৮ই মার্চ) বলেন—সোভিয়েট রাশিয়া নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী মহাকাশ অভিযান চালাইয়া যাইতেছেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৯ অথবা ১৯৭০ সালে তাঁহারা চাঁদে অবতরণ করিতে পারেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার অবজারভেটরী হইতে মহাকাশযানের সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়াছিলেন। সঙ্কেতধ্বনি অনেকটা পায়রার শব্দের মত। তাঁহারা মানুষের গলার স্বর শুনিতে পান নাই।

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট মহাকাশচারীর মহাকাশে পদচারণার সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বিভাগের অফিসারেরা অতিমাত্রায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশ অভিযান একটি বিরাট কীর্তি। এই ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনেকখানি পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত এক প্রকার পোষাকে সজ্জিত লিওনেভ কুড়ি মিনিটের জন্য মহাকাশযানের বাহিরে আসিয়া মহাকাশের অবস্থা দেখিবার জন্য হাঁটিয়া, ডিগবাজি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভস্কডের সঙ্গে সংযুক্ত বন্ধন-রজ্জুটি কোনক্রমে ছিন্ন হইয়া গেলে

তাঁহাকে 'মানুষ-উপগ্রহ'রূপে অন্ততঃ সপ্তাহ দুই পর্যন্ত সেই কক্ষপথে পাক খাইতে হইত। ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই লিওনেভ হাউইয়ের মত জ্বলিয়া-পুড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইতেন। টেলিভিসনে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই মনে হইয়াছিল, ভস্কড হইতে বাহির হইয়া লিওনেভ যেন কাচে-ঘেরা একটা সখের জলাধারের মধ্যে অদ্ভুত রকমের একটা মাছের মত সাঁতার কাটিয়া একবার কয়েক ফুট দূরে চলিয়া যান আবার ওলট-পালট খাইয়া ফিরিয়া আসেন। হাতে সিনেমার ক্যামেরা—পৃথিবীর দিকে এদিক-সেদিক তাকাইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লইবার পর খুট খুট করিয়া ছবি তুলিয়া লন। ১৯৬২ সালের মহাকাশচারী পপোভিচ বলিয়াছেন—লিওনেভের এই অদ্ভুত কার্যের ফলে অন্য গ্রহে যাইবার পথ বোধ হয় খুলিয়া গেল।

মহাকাশে পায়চারির পর রাশিয়ার মাটিতে অবতরণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়স্ক লিওনেভ বলিয়াছিলেন—আমি চাঁদে পাড়ি দিবার আশা রাখি।

বেলিয়েভ ভস্কড-২ চালাইয়া ১৯শে মার্চ বেলা ১২টা ২ মিনিটের সময় (ভারতীয় সময় দুপুর ২-৩২ মিঃ) নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসেন। মহাশূন্যের প্রথম পদচারী লিওনেভকে লইয়া তিনি যখন উরালের পশ্চিমে পার্সে সহরে অবতরণ করিলেন, তখন দুই জনেই পুরাপুরি সুস্থ, দুই জনের মুখেই মৃত্যুকে উপেক্ষার হাসি দেখা গিয়াছিল।

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় শুধু মাত্র বোতাম টিপিয়া নয়, রীতিমত হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া বেলিয়েভ ভস্কড-২ যানটিকে চালাইয়া পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করেন। এই প্রথম মানুষ নিরালম্ব অবস্থায় কোন রকম ওজন বোধ ব্যতিরেকে মহাকাশে পদচারণা করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই অভিযান হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি মহাশূন্যযাত্রায় স্পেস-ষ্টেসন স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন এবং মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইবে।

রাশিয়ার খবরে জানা যায়—পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিবার সময় ভস্কড-২ অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্বেই অবশ্য পশ্চিমীমহলে জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়াছিল যে, মহাকাশযানটি অবতরণ করিবার সময় পথে বোধ হয় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই ইহার অবতরণের সংবাদ পাঁচ ঘন্টা পরে পাওয়া যায়।

টাসের সংবাদে জানা গিয়াছিল যে, মহাকাশযানের বাহিরের বেতারের তারটি পুড়িয়া যাইবার ফলে বেতার যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই তাহা ঠিক হইয়া যায়।

দীর্ঘায়ুর রহস্য

করাচী থেকে প্রচারিত রয়টারের এক খবরে জানা যায়—সিংকিয়াং সীমানায় পাকিস্তানের শেষ ঘাঁটি হুঞ্জা। স্থানটি পশ্চিম হিমালয়ে। এখানকার অধিবাসীদের গড় আয়ু অস্বাভাবিক দীর্ঘ, অনেকেরই বয়স ১০০-১২০। এরা সরল, কষ্টসহিষ্ণু, শিরায় আর্যরক্ত, চামড়া পাতলা—প্রায় কৃচ্ছ্র জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। বৃদ্ধ বয়সেও তারা সুস্থ কর্মক্ষম ও সতেজ। আলেকজাণ্ডারের গ্রীক যোদ্ধাদের বংশধর বলে তারা দাবী করে।

হুঞ্জার পুরুষ কিন্তু ৯০ বা তারও বেশী বয়স পর্যন্ত সন্তান-উৎপাদনক্ষম থাকে আর নারীরা ষাট বছরের উর্ধ্বেও সন্তান-ধারণে সক্ষম।

এই দীর্ঘজীবন এবং সন্তান-প্রজননে এরূপ অস্বাভাবিকতা কেন—এই রহস্য ভেদের জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ উৎসুক। ১৯৬৩ সালে এক ফরাসী বিশেষজ্ঞ দল হুঞ্জা ঘুরে এসেছেন। তাঁদের ধারণা—খনিজ জল আর পুষ্টিকর খাদ্যই এর কারণ।

একদল মার্কিন চিকিৎসক ও হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞও পরে হুঞ্জায় যান। তাঁদের ধারণা, যথেষ্ট দেহচালনা, আমিষ ও শালি জাতীয় খাদ্যগ্রহণ, সহজ জীবন-যাত্রা, বিশুদ্ধ বায়ু ও খনিজ পানীয় দীর্ঘজীবী হবার কারণ। এবার হুঞ্জায় যাবেন পাকিস্তানের এক বিশেষজ্ঞ দল। তাঁরা মনে করেন, আগের উভয় দলের গবেষণাই অসম্পূর্ণ। কেন না, হাজার হাজার মাইল দূরের বীক্ষণাগারে সংগৃহীত মালমশলা দীর্ঘদিন পরে পরীক্ষা করলে তার বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | জুন, ১৯৬৫ | ষষ্ঠ সংখ্যা

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট

শ্রীকিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জিনিষ মানব সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সিমেণ্ট হচ্ছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম। সাধারণতঃ যে সিমেণ্ট ব্যবহার করা হয়, তার নাম পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট (Portland-Cement)। সিমেণ্টের ব্যবহার পুরাতন মিশরীয় সভ্যতায় পাওয়া যায়। প্রাচীনসভ্যতায় যে সিমেণ্ট ব্যবহার করা হতো, তা হলো অবিশুদ্ধ জিপসাম পোড়ানো বস্তু (Calcined impure Gypsum)। গ্রীক বা রোমক সভ্যতার আগে সিমেণ্টে চুনা পাথর ব্যবহার করা হতো না—তারাই প্রথম চুনা পাথর দেবার ব্যবহার করেছিল। তখন দুটি জিনিষকে জোড়া জন্যে বালি, চুন ও জল দেওয়া হতো। কিছুদিন পর রোমানরা পোজোলানা (Pozzolana) ব্যবহার করতে শিখলো। পোজোলানা আসলে হচ্ছে সুরকী, কিন্তু তখন এই রকম এক প্রকারের মাটি Pozzuoli নামক জায়গা থেকে পাওয়া যেত বলেই ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৭৯৬ সালে জোসেফ পারকার রোমান সিমেণ্ট নাম দিয়ে এক ধরণের সিমেণ্টের প্রচলন করেন। এই জিনিষটি চুনা পাথর ও পোজোলানা থেকে তৈরি হয়েছিল এবং এর রং ছিল আগেকার যুগের রোমানদের সিমেণ্টের মত। ঐ সিমেণ্ট ছিল তখনকার দিনের সবচেয়ে ভাল সিমেণ্ট। পরে ভিসাট নামে একজন বৈজ্ঞানিক সিমেণ্টের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি বলেন যে, যদি বিশেষ ধরণের কাদামাটির সঙ্গে চুনা পাথর মিশিয়ে পোড়ানো হয় তবে খুব ভাল সিমেণ্ট পাওয়া

যায়। ১৮২৪ সালে জোসেফ অ্যাপস্ডিন প্রথম সিমেন্ট তৈরি করে পেটেন্ট নেন পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট নাম দিয়ে। অবশ্য এই নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে যোসেফ নতুন কিছু তৈরি করেন নি। একমাত্র বলা যেতে পারে যে, তিনি সিমেন্টের একটি বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন, যার অর্থ হলো—সিমেন্টটি পোর্টল্যাণ্ড পাথরের ন্যায় শক্ত ও স্থায়ী। পোর্টল্যাণ্ড পাথর হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের নিকট পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপের বিখ্যাত পাথরের তৈরি একটি নিদর্শন।

ভারতবর্ষে সিমেন্ট তৈরির কাজ কিছুটা এগিয়ে আছে বলতে পারা যায়, যদিও আমাদের দেশে সিমেন্ট পাওয়া সাধারণের পক্ষে খুবই দুষ্কর। কিন্তু একথা বলা হলো, কারণ ১৯৫২ সালে পৃথিবীর কোন্ দেশে কত সিমেন্ট তৈরি হয় তাথেকে মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, ভারত সেখানে খুব বেশী পিছিয়ে নেই। সেই হিসাবটি এখানে দেওয়া হলো। হিসাবটি হাজার মেট্রিক টনের—

ক্যানাডা	—	২৯৪০
মেক্সিকো	—	১৬৪০
আমেরিকা	—	৪৯,০৯১
অষ্ট্রেলিয়া	—	১৪০২
ফ্রান্স	—	৮৬৫৬
পশ্চিম জার্মেনী	—	১২,৮৮৬
রাশিয়া	—	১১,৩১৪
চীন	—	২০০০
ভারত	—	৩৬২০
ইরান	—	৬৫
পাকিস্তান	—	৫৪৪
জাপান	—	৭১১৭
মিশর	—	৯০৭
অষ্ট্রীয়া	—	১৩৫৭
ইন্দোনেশিয়া	—	১৩৭
সুইডেন	—	২০৫৪

ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সিমেন্টের উৎপাদন দাঁড়াবে ১·৫ কোটি টন। এই পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কার চেয়ে দ্বিগুণ। সিমেন্ট কথাটি এসেছে Cementing অর্থাৎ কোন দুটি জিনিষকে জোড়া দেওয়া থেকে—যে পদার্থের দ্বারা কোন জিনিষকে জোড়া দেওয়া যায়, তাকে সিমেন্ট বলা হয়।

আমেরিকায় সিমেন্টকে সাধারণতঃ চার প্রকারের ভাগ করে (A. S. T. M বা American Society for Testing Materials অনুসারে)।

(১) পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট—ছোট করে বলতে হলে চুন ও কাদামাটি একত্রে পুড়িয়ে পরে গুঁড়া করে যে জিনিষটি পাওয়া যায়। এই পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট আবার পাঁচ প্রকারের—

(a) সাধারণ কাজের জন্যে—এই সিমেন্ট সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং বাকী চার রকমের সিমেন্টে যে বিশেষ গুণ বর্তমান থাকে, এতে সেগুলি থাকে না।

(b) Moderate Heat of Hardening Cement—এই সিমেন্টে খুব বেশী Heat of hydration অর্থাৎ জল দিলে খুব বেশী তাপ উদ্ভূত হয় না এবং এটা সালফেটের অবস্থান কিছুটা সহ্য করতে পারে।

(c) High Early Strength—যখন খুব তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে শক্ত হবার প্রয়োজন, তখনই এই সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

(d) Low-Heat Cement—যখন Heat of hydration বা জল দিলে খুব কম তাপ উদ্ভূত হয়।

(e) সালফেট সহনশীল—এই সিমেন্ট সালফেট সহনশীল অর্থাৎ সালফেটের ক্রিয়াতে এই সিমেন্ট নষ্ট হয় না।

(২) পোজোলানা সিমেন্ট—কোন জিনিষ জোড়া দিতে হলে চার ভাগ পোজোলানা ও এক ভাগ চুন মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। পোজোলানা নিজে কিন্তু কোন জিনিষকে জোড়া দিতে

পারে না, যদি চুন মিশানো না হয়। প্রাকৃতিক পোজোলানা আগ্নেয়গিরির লাভাতে থাকে, আর সিন্‌থেটিক পোজোলানা হলো ইটের গুঁড়া অর্থাৎ সুরকী।

(৩) ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট বা অত্যধিক অ্যালুমিনা সিমেণ্ট—এই সিমেণ্ট খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয় এবং সালফেটের ক্রিয়ায় অত্যন্ত সহনশীল। এই সিমেণ্ট চুন ও Baunite-কে একসঙ্গে পুড়িয়ে তৈরি করা হয়।

(৪) বিশেষ সিমেণ্ট—এই সিমেণ্ট কোন রাসায়নিক কারখানায় ব্যবহৃত চুল্লীর গায়ে লাগানো থাকে, যার ফলে সহজে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া না হয়। এর ধর্ম হচ্ছে এই যে, সহজে এর গায়ে কোন রকম ক্রিয়া হয় না—যাকে বলা যেতে পারে Corrosion resistant। আবার মর্টার বা রিফ্র্যাক্টরিস্‌-এ ব্যবহৃত বা রিফ্র্যাকটরিস্‌ জোড়া দেবার কাজে ব্যবহৃত সিমেণ্টও এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর একটি সিমেণ্ট বাজারে দেখতে পাওয়া যায়, সেটি হলো সাদা সিমেণ্ট। এই সিমেণ্টে লোহের পরিমাণ থাকে খুবই কম এবং যেটুকু থাকে, সেটা ফেরাস্ অবস্থায় থাকে। এই সিমেণ্ট তৈরি করবার জন্যে বিশুদ্ধ চুন ও কাদামাটি, যাতে লোহার পরিমাণ খুব কম থাকে—এই সব জিনিষ ব্যবহার করতে হয়।

পণ্য উৎপাদনের কাঁচা মাল—(ক) চুনা পাথর বা চক্ বা Alkali waste, (খ) মাটি বা মারুত চুল্লীর ধাতুমল—কাঁচা মালকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। পরে সিমেণ্ট তৈরি করবার সময় যে জিনিষটির ঘাট্‌তি থাকে, তখন সেটা দেওয়া হয়; যেমন—মাটিতে লোহার পরিমাণ কম থাকলে (যতটা দরকার ততটা থাকে না) তখন বাইরে থেকে উপযুক্ত পরিমাণ লোহার আকরিক দেওয়া হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাটি ও চুন দিয়েই সর্বত্র সিমেণ্ট তৈরি হতো। কিন্তু বর্তমান কালে মারুত চুল্লীর ধাতুমলকে মাটির স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে। এই ধাতুমলকে আগে ফেলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না, এখন সেটাই হচ্ছে সিমেণ্ট তৈরি করবার বিশেষ উপযোগী। ফলে যেখানে লৌহ-শিল্প আছে, সেখানে একটি করে সিমেণ্টের কারখানা গড়ে উঠতে পারে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ২.৫ কোটি টন ধাতুমল উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ এখন এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী হয়েছে। সিমেণ্টে মোটামুটিভাবে এই থাকা দরকার—CaO, SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3। মাটিতে থাকে SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3 এবং চুন থেকে আসে CaO। মারুত চুল্লীর ধাতুমল ব্যবহার করা হয়, কারণ মোটামুটি ধাতুমলে থাকে—

CaO—৪৫%, SiO_2—৪০%, Al_2O_3—১৫%। অনেকে CaO-এর উপাদান হিসাবে $CaSO_4$ অর্থাৎ জিপসাম ব্যবহারের কথা চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু মাটির সঙ্গে চুনের বিক্রিয়ার তুলনায় মাটির সঙ্গে $CaSO_4$-এর বিক্রিয়া অত্যন্ত আস্তে হয়। সুতরাং ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব না হবার কারণ, ভারতে জিপ্‌সাম বেশী পাওয়া যায় না।

$$CaSO_4 + SiO_2 \rightarrow [CaO.\ SO_3]$$
$$SiO_2 \rightarrow Ca\ SiO_3 + SO_3 \uparrow$$
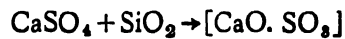
মাটি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে—এই মাটি হচ্ছে অ্যালুমিনো সিলিকেট। সাদা সিমেণ্টের কথায় বলা হয়েছে যে, অতি বিশুদ্ধ মাটি দরকার—এটা হলো ভাল 'চায়না ক্লে'—$Al_2O_3.\ 2SiO_2.\ 2H_2O$—এতে অবিশুদ্ধ পদার্থ হিসাবে অন্য কিছু অল্প পরিমাণে এসে যেতে পারে, তবুও মোটামুটি ভাবে SiO_2 = ৪৬-৪৮%; Al_2O_3 = ৩৭-৩৮%; H_2O ১৩% থাকে। মাটি ও চুনা পাথরের বিক্রিয়ার ফলে সিমেণ্ট নামে যে জিনিষটি তৈরি হয়, সেখানে SiO_2, Al_2O_3 ও CaO রাসায়নিক গঠনে নিম্নলিখিতভাবে থাকে—

১। C_2S

২। C_3S

৩। C_3A

৪। C_4AF

৫। MgO

৬। CaO

৭। Sulphate

আসলে কিন্তু উল্লিখিত সবগুলির মধ্যে C_2S ও C_3S হচ্ছে সিমেণ্টের মূল বস্তু—এই দুটি বস্তুর জন্যেই সিমেণ্টের যত গুণ। সুতরাং সর্বদাই চেষ্টা করা হয়, যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বেশী পরিমাণ C_2S ও C_3S [C_2S = Dicalcium silicate ও C_3S = Tricalcium silicate] তৈরি হতে পারে। সিমেণ্টের প্রাথমিক অবস্থায় শক্তি জোগায় C_3S এবং পরবর্তী কালে শক্তি জোগায় C_2S। এই দুটিরই Heat of hydration কম—যদি এই তাপ বেশী হয়, তখন সিমেণ্ট ফেটে যেতে পারে। বাকীগুলির কোনটিরই প্রয়োজন নেই—কিন্তু সিমেণ্ট তৈরি করবার সময় অবশ্যম্ভাবীভাবে তৈরি হবে। C_3A (Tricalcium aluminate) সিমেণ্টকে তাড়াতাড়ি জমতে সাহায্য করে। যদি C_3A বেশী পরিমাণে থাকে, তবে সিমেণ্ট জমাবার কাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং C_3A শক্তি সঞ্চয়ের পথে সামান্য পরিমাণে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং বেশী থাকবার অর্থ হলো, সিমেণ্টের শক্তি হ্রাস পাবে। আবার C_3A সমুদ্রের জলের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং Heat of hydration হচ্ছে বেশী। C_4AF, C_3A-এর চেয়ে তাড়াতাড়ি জমে। কিন্তু এর শক্তি জোগাবার পথে পাথেয়ও খুব কম, তবে সামুদ্রিক জলের প্রভাবে C_3A-এর মত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় না। বেশী পরিমাণে CaO এবং MgO না থাকা ভাল, কারণ এদের বৃদ্ধিতে Heat of hydration বেড়ে যাবে ; ফলে ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফর্মুলা, রাসায়নিক সংযুক্তি ও নামগুলি দেওয়া হলো।

Formula	Name	Abbreviation
2 CaO, SiO_2	Dicalcium Silicate	C_2S
3 CaO, SiO_2	Tricalcium Silicate	C_3S
3 CaO, Al_2O_3	Tricalcium aluminate	C_3A
4 CaO, Al_2O_3, Fe_2O_3	Tetracalcium Alumino ferrite	C_4AF.

সিমেণ্ট তৈরি করবার সময় ১৪৫০-১৬০০° সে. উত্তপ্ত করা হয়। যদি ভাল ভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, ধীরে ধীরে কি ভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তাহলে সিমেণ্ট সম্বন্ধে অনেক কিছু তখনই জানা যায়। লী ও ডেস্-এর মতানুসারে নিম্নলিখিত ভাবে বিক্রিয়া ঘটছে। বিভিন্ন তাপে এবং বিক্রিয়ায় তাপ উদ্ভূত হচ্ছে, না গৃহীত হচ্ছে—তা জানা যাবে—

তাপাঙ্ক	বিক্রিয়া	তাপ পরিবর্তন
১০০° সেঃ	জলের বাষ্পীভবন	তাপ গৃহীত হচ্ছে (Endothermic)
৫০০° সেঃ	রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত জল মাটি থেকে বের হচ্ছে।	”
৯০০° সেঃ	কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবির্ভাব চুনা পাথর থেকে।	”
৯০০–১২০০° সেঃ	চুন ও মাটির সঙ্গে আসল বিক্রিয়া।	তাপ উদ্ভূত হচ্ছে (Exothermic)
১২৫০–১২৮০° সেঃ	গলনের সূত্রপাত।	তাপ গৃহীত হচ্ছে।
১২৮০–১৫০০° সেঃ	আরও তরলের আবির্ভাব ও আরও রাসায়নিক সংযোগ।	হয়তো বা তাপ গৃহীত হচ্ছে (Probably endothermic)

এবার কিভাবে সিমেণ্ট তৈরি করা হয়, তার কথায় আসা যাক। ছুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়—শুক্নো (Dry) ও ভিজা (Wet)। ছুটি পদ্ধতিতেই কাঁচা মাল ও তৈরী মালকে বদ্ধ জায়গায় গুঁড়ানো হয়—যাকে বলা হয় Closed Circuit Grinding। এই পদ্ধতিকে অনুকরণ করা হয় খোলা জায়গায় গুঁড়াবার (Open Circuit Grinding) থেকে। ভিজা পদ্ধতি (Wet process) হচ্ছে পুরাতন এবং বর্তমানে শুষ্ক পদ্ধতি এসে এর স্থান দখল করে বসেছে। ভিজা পদ্ধতিতে অবশ্য কাঁচা মালগুলিকে চুল্লীতে পাঠাবার আগে খুব ভাল ভাবে মেশানো সম্ভব। প্রথমে কাঁচা মালকে গুঁড়া করা হয়—বল মিল বা Edge Runner যন্ত্রের দ্বারা। ভিজা পদ্ধতিতে কাঁচামালকে উপযুক্ত পরিমাণে বল মিলে নিয়ে তারপর ঘুরানো হয়, ফলে জিনিষগুলি ভালভাবে গুঁড়া হয় এবং সেগুলি ভালভাবে মিশেও যায়। পরে যে জিনিষটি তৈরি হয়, তাকে বলা হয় Slurry এবং Slurry থেকে পরিস্রাবণের দ্বারা জল তাড়ানো হয়। আর শুষ্ক উপায়ে কাঁচামালকে গুঁড়া করে মিশিয়ে সোজা একেবারে চুল্লীতে পাঠানো হয়।

সিমেণ্ট তৈরি করবার জন্যে চুল্লীর একটি বিশেষ ধরণ আছে এবং এর নাম Rotary Kiln বা ঘূর্ণয়মান চুল্লী। নাম থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, চুল্লীতে পোড়াবার সময় সেটি ঘোরে—খুব আস্তে, ২-৩ r.p.m. অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ২।৩ বার ঘোরে। চুল্লীগুলি বেশ লম্বা ও গোলাকার।

আধুনিক কালে চুল্লীগুলিকে বেশী বড় (লম্বা) করবার দিকে ঝোঁক, কারণ বেশী তাপ কাজে লাগানো যেতে পারে—যাকে বলা হয় Thermal economy। শুষ্ক পদ্ধতির চুল্লী লম্বায় ১৫০—২৫০ ফুট এবং ভিজা পদ্ধতির চুল্লী ৩০০—৫০০ ফুট লম্বা এবং প্রস্থ ৮—১৫ ফুট। চুল্লীগুলি একটু হেলানো অবস্থায় স্থাপন করা হয়, তাহলে কাঁচা মাল ঢোকাবার পর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে এবং এমন ভাবে ঠিক করা থাকে যে, যখন বেরিয়ে যাবে, তখন পোড়ানোও শেষ হয়ে যাবে। সাধারণতঃ পোড়াতে ২—৩ ঘণ্টা সময় লাগে। চুল্লীর নির্গমন নল থেকে নির্গত বস্তুর একটি বিশেষ নাম আছে, যাকে বলা হয় ক্লিংকার (Clinker)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সিমেণ্ট তৈরি করবার সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হলো ১৫০০° সে.। এই উচ্চ তাপ সহ্য করা খুবই কঠিন, সে জন্যে চুল্লীর আস্তরণে (Lining) সমস্যা দেখা দেয়। High Alumina এবং High Magnesia ইটের দ্বারা কার্য সামাধা করা যেতে পারে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্র সিমেণ্ট ক্লিংকার ব্যবহার করে সুবিধা পাওয়া গেছে।

যে ক্লিংকার পাওয়া গেল, সেগুলি দানা বাঁধা অবস্থায় থাকে এবং তার মাপ হলো ⅛ থেকে ¼ ইঞ্চি। ক্লিংকারকে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে অথবা ঠাণ্ডা বাতাস চালনা করে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে এবং এই তাপকে এক বা একাধিক বয়লার চালাবার কাজে লাগাতে পারা যায়। শেষে ক্লিংকারকে গুঁড়া করা হয়। জল দিয়ে ঠাণ্ডা করলে ক্লিংকার ভঙ্গুর হয়ে যায়। ক্লিংকার গুঁড়া করলে সিমেণ্টে পরিণত হয়—এতে জিপ্‌সাম দেওয়া হয় সময়মত জমানোকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে। সিমেণ্টকে যত বেশী গুঁড়া করা যাবে, তত বেশী ভাল সিমেণ্ট হবে এবং তাড়াতাড়ি জমবে এবং বেশী শক্ত হবে। সিমেণ্ট তৈরি করবার সময় জ্বালানী হিসেবে তেল, গ্যাস বা গুঁড়া কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে। গুঁড়া কয়লার ব্যবহার খুব ব্যাপক হয়েছে অনেক কারণে। প্রথমতঃ অনেক খারাপ কয়লা, যাতে Clinkering trouble বেশী দেখা যায়, সেই সব কয়লাকে খুব সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কয়লা পোড়াবার পর যে ছাই হয়, সেগুলি অনায়াসে সিমেণ্টের সঙ্গে মিশে যায় এবং তাতে সিমেণ্টের কোন ক্ষতি হয় না।

এবার আলোচনায় আসা যাক, কেন সিমেণ্ট জলের সংস্পর্শে এসে জমে যায়। সিমেণ্ট কেন জমে যায়, তার সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখানে পুরনো মতবাদ থেকে আধুনিক মতবাদ সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করা হবে। আর্মষ্ট্রং বলেছিলেন যে, সিমেণ্ট জমে যেমন প্লাস্টার অব প্যারিস জমে—সেখানে কেলাসের মধ্যে বন্ধনের সৃষ্টি (Formation of interlocking crystals) হয়। দ্বিতীয় মতবাদ পোষণ করেন মাইকেল। তিনি বললেন—সিমেণ্ট হলো অনিয়তাকার বা Amorphorous জাতীয় এবং সিমেণ্ট জমে যেমন করে সিলিকা জেল জমে। সেখানে সমস্ত জিনিষটি শুকনো হয়ে পড়ে Internal suction-এর জন্যে।

আধুনিক মতবাদে বলা হয় যে, X-ray-এর দ্বারা জানা গেছে, সিমেণ্ট হলো অনিয়তাকার এবং এর আয়তন খুবই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসগুলি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে বাঁধনের সৃষ্টি করে। রাসায়নিক ভাবে দেখাতে গেলে—

$$C_3S + H_2O \xrightarrow{\text{quick}} C_2S\,(aq) + Ca\,(OH)_2$$

$$C_2S + H_2O \xrightarrow{\text{slow}} C_2S\,(aq)$$

$$C_2S\,(aq) \longrightarrow C_3\,S_2\,(aq) + Ca\,(OH)_2$$
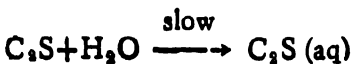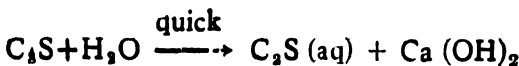
[এগুলি সবই থক্‌থকে বা gelatinous]

$$C_3A + H_2O \xrightarrow{\text{quick}} C_3A\ (aq)$$

$$C_3AF + H_2O \xrightarrow{\text{slow}} C_3A\ (aq) + CF\ (aq)$$

$$C_3A + CaSO_4 + H_2O \longrightarrow \underset{\text{Ettringite}}{C_3A.\ 3\ CaSO_4\ (aq)}$$

$$C_4AF + CaSO_4 + Ca\ (OH)_2 \longrightarrow C_3A.\ 3\ CaSO_4 (aq) + C_3F.\ 3CaSO_4\ (aq)$$

$$C_3A + CaSO_4 + Ca\ (OH)_2 + C_3A.\ 3\ Ca\ SO_4 \longrightarrow C_3A.\ Ca\ [SO_4.\ (OH)_2]\ (aq)$$
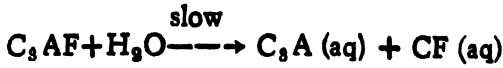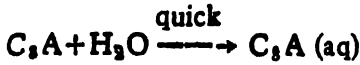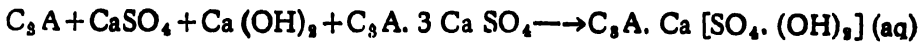
শেষটি থেকে বোঝা যায়, যে এটি হলো একটি Solid solution বা শক্তের মধ্যে মিশ্রণ। সিমেন্টে Ettringite তৈরি হওয়া খুবই খারাপ। কারণ যদি একবার তৈরি হয়, তখন ফেটে যাবার সম্ভবনা। কেন না Ettringite খুব প্রসারিত হয়, ফলে ফেটে যায়।

সিমেন্ট পরীক্ষা করবার অনেকগুলি উপায় আছে। প্রথমতঃ তার জমবার সময় (Setting characteristic) দেখা হয় এবং তাথেকে মোটামুটিভাবে বোঝা যায়, সিমেন্টের ব্যবহারে কোন অসুবিধা দেখা দিতে পারে কিনা। আর একটি হলো এর শক্তি পরীক্ষা করা—একটি ব্লক তৈরি করে উপর থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং লক্ষ্য করা হয়, কোন্ চাপে ব্লকটি ফেটে যাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন জিনিষের শক্তির অনুপাত দেওয়া হলো।

রোমান সিমেন্ট — ১০০ পাঃ
পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট— ৪০০ পাঃ
উচ্চ অ্যালুমিনা
বিশিষ্ট সিমেন্ট — ৪০০ পাঃ

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা হয়, সেটা হলো তার Porosity অর্থাৎ তার ছিদ্রতা। সমস্ত দেশে সিমেন্ট সম্বন্ধে কিছু বিধিনিষেধ থাকে, যেমন—ভারতবর্ষে দেওয়া আছে—অম্লে অদ্রব-নীয়ের ভাগ ১.৫% এর বেশী হবে না। MgO শতকরা ৫ ভাগের বেশী হতে পারবে না। সালফেটের পরিমাণ শতকরা ২.৫ ভাগের বেশী হবে না। এবং—

$$\frac{CaO}{2{\cdot}8\ Si\ O_2 + 1{\cdot}2\ Al_2\ O_3 + O{\cdot}65\ Fe_2\ O_3} = 1{\cdot}02 \text{ to } 0{\cdot}66 \text{ হবে।}$$

উপরে পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট ও High Alumina সিমেন্টের শক্তি এক বলা হয়েছে। কিন্তু High Alumina Cement-এর সুবিধা হলো এই যে, যখন তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্টের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় (৯০০° সে.) তখন আবার রাসায়নিক সংযোগের সৃষ্টি হয় (Formation of ceramic bond)। কিন্তু পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের ক্ষমতা নষ্ট হয় ৫০০° সে-এ, তখন কিন্তু রাসায়নিক সংযোগের (Formation of ceramic bond) সৃষ্টি হয় না। এই হলো পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের অসুবিধা।

১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে, ভারতবর্ষে মোট ৩২টি কারখানা আছে এবং এই ৩২টি কারখানায় বছরে ৭৬,৮৫,৯০৫ টন সিমেন্ট তৈরি হয়। ১৯৬৪ সালের হিসাব অনুযায়ী এখন ৪০টি কারখানা ভারতবর্ষে আছে। ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষে মোট ৮৬,০০,০০০ টন সিমেন্ট তৈরি হয়েছে এবং প্ল্যানিং কমিশনের হিসাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতবর্ষে সিমেন্টের চাহিদা দাঁড়াবে ১,৫৫,০০,০০০ টন।

অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের বংশধারা

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, অসংখ্য লাল রঙের গোল চাকতি ঈষৎ হলদে রঙের তরল পদার্থে ভেসে আছে। এই চাকতিগুলিকে লোহিত কণিকা আর তরল পদার্থকে রক্তরস বা প্লাজ্মা বলা হয়। প্রতি লোহিত কণিকার ব্যাস আট মাইক্রন অর্থাৎ এক মিলিমিটারের ১২৫ ভাগের এক ভাগ এবং পুরু দুই মাইক্রন, অর্থাৎ এক মিলিমিটারের ৫০০ ভাগের একভাগ। লোহিত কণিকাগুলি প্রধানতঃ অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ ১২০ দিন কর্মক্ষম থাকে। সুস্থ মানুষের প্রতি ঘন-মিলিমিটার রক্তে ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে এবং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের রক্তে এদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়

লোহিত কণিকাগুলি মুখ্যতঃ হিমোগ্লোবিনের দ্বারা গঠিত। প্রতিটি লোহিত কণিকায় প্রায় ২৮ কোটি হিমাগ্লোবিনের অণু থাকে। আবার প্রতিটি হিমোগ্লোবিন-অণুর মধ্যে থাকে ৫৭৪টি অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বিত বর্ণহীন প্রোটিন আর লৌহ। লৌহজাত পদার্থ থাকবার ফলে হিমোগ্লোবিনের বর্ণ হয় লাল। হিমোগ্লোবিনের কাজ হলো ফুস্ফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে ধমনী দিয়ে শরীরের বিভিন্ন কলাতন্তুর মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, আর সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে শিরা দিয়ে ফুস্ফুসে নিয়ে আসা। যে সব হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন থাকে, তাদের রং লাল টক্‌টকে হয়, কিন্তু অক্সিজেন নিঃশেষিত হিমোগ্লোবিনের রং সাধারণতঃ কাল্‌চে-লাল হয়ে থাকে।

প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম হলে বা লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকলে বা তার উপাদানে কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটলে মানুষের শরীরে রক্তশূন্যতার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লোহিত কণিকার ক্ষরণ ও পূরণের ভারসাম্যের অভাবে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পূরণের চেয়ে যদি ক্ষরণ বেশী হয়, তাহলে রোগীকে ফ্যাকাশে বা রক্তশূন্য দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা রোগীকে লিভার, ডিমের কুসুম ও যে সব তরীতরকারীতে লোহার ভাগ বেশী, সেই সব খাদ্য গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিছুদিন ধরে এই ধরণের খাদ্য গ্রহণে রোগীর রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তার রক্তশূন্যতার ভাবও চলে যায় কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক গোলযোগে রক্তশূন্যতা দেখা যায়, সে সব ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উপায়ে রোগ নিরাময় করা যায় না। রক্তশূন্যতা ব্যাধি সে ক্ষেত্রে বংশগতভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বংশগত রক্তশূন্যতার কথা অলোচনা করা হয়েছে।

লোহিত কণিকায় A, C, D, E, F প্রভৃতি পঁচিশ রকম হিমোগ্লোবিনের পরিচয় আজ পর্যন্ত জানা গেছে। হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশগুলি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তারা মেণ্ডেলের উত্তরাধিকার সূত্র অনুযায়ী বংশ-পরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবাহিত হয়। সুস্থ মানুষের রক্তে A-হিমোগ্লোবিন থাকে। A-হিমোগ্লোবিন ছাড়া অন্যান্য হিমোগ্লোবিনগুলিকে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন হিসাবে গণ্য করা হয়।

অনেকের ধারণা, অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলে একটা বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিব্যক্তিতে (Mutation) বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি ঘটে। লোহিত কণিকাগুলিতে যদি অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকে, তাহলে কোন কোন্ ক্ষেত্রে তাদের ছোট, বড়, লম্বাটে বা কাস্তের আকৃতিবিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এদের অক্সিজেন ধারণ করবার ক্ষমতা লোপ পায় এবং আয়ুষ্কালও কম হতে দেখা যায়। যে সব মানুষের রক্তে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকে, তাদের মধ্যে রক্তশূন্যতার লক্ষণ কম বা বেশী মাত্রায় প্রকাশ পায়। মানুষের রক্তে সাধারণতঃ এক প্রকার কিংবা দুই প্রকার হিমাগ্লোবিন থাকে। ফিল্টার কাগজে দু-এক ফোঁটা রক্ত ফেলে তাতে তড়িৎ-প্রবাহ চালিত করলে বিভিন্ন হিমোগ্লোবিনের গতিশীলতা বিভিন্ন রকম হতে দেখা যায়, ফলে তাদের পৃথক করা সম্ভব হয়। পৃথকীকরণের এই পদ্ধতিকে ইলেকট্রোফোরেসিস (Electrophoresis) বলে।

যে সব মানুষের রক্তে গোলাকৃতির লোহিত কণিকার পরিবর্তে কাস্তের আকৃতির লোহিত কণিকা থাকে, তাদের মারাত্মক রক্তশূন্যতা রোগ দেখা যায় এবং তারা সাধারণতঃ অল্পবয়সে বা সন্তান উৎপাদন করবার আগেই মারা যায়। এই রোগকে সিক্‌ল্-সেল অ্যানিমিয়া (Sickle-cell anemia) বলে। সিক্‌ল্-সেল অ্যানিমিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের লোহিত কণিকাগুলি অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের দ্বারা গঠিত। যাদের লোহিত কণিকায় A ও S হিমোগ্লোবিন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাদের S-হিমোগ্লোবিনের বাহক বলে গণ্য করা যেতে পারে। তাদের রক্তে অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের মধ্যে রক্তশূন্যতার লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। পিতামাতা উভয়েই যদি অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের বাহক হয়, তাহলে তাদের এক-চতুর্থাংশ সন্তান-সন্ততি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে, অর্ধাংশ পিতামাতার মত মিশ্রিত হিমোগ্লোবিনের উত্তরাধিকারী হয় এবং বাকী এক-চতুর্থাংশের মধ্যে মারাত্মক রক্তশূন্যতার রোগ প্রকাশ পায়। সিক্‌ল্-সেল জনিত রক্তশূন্যতার লক্ষণ যদি কোন সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার পিতামাতা উভয়ের রক্তে অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব নিহিত আছে। পিতা-মাতার মধ্যে যদি একজন S-হিমোগ্লোবিনের বাহক ও অপরজন A-হিমোগ্লোবিনের উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে তাদের অর্ধেক সন্তান-সন্ততি বাহক ও অর্ধেক সুস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি কোন রক্তশূন্যতা রোগগ্রস্তের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির বিবাহ ঘটে, তাহলে তাদের সব সন্তান-সন্ততির রক্তে অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব দেখা যায়। A-হিমোগ্লোবিনের বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমিক সজ্জায় একস্থানের গ্লুটামিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ভ্যালিন অ্যাসিড সৃষ্টি হওয়ায় অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তির কারণ হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলে এই সামান্য পরিবর্তনে দুটি হিমোগ্লোবিনের বৈশিষ্ট্যে বিরাট প্রভেদ বহিঃপ্রকৃতিতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পূর্ব আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার দ্বীপের অধিবাসীদের রক্তের মধ্যে অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। এছাড়া মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের রক্তে এবং দক্ষিণ আরব ও দক্ষিণ ভারতের কিছু উপজাতির রক্তে অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

A-হিমোগ্লোবিনের অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলে যে স্থানের একটি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তনে S-হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি হয়, সেই স্থানে অন্য নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডের (লাইসিন অ্যাসিড) আবির্ভাব ঘটলে অস্বাভাবিক C-হিমোগ্লোবিনের

সৃষ্টি হয়। পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকে C-হিমোগ্লোবিনের জিন গ্রহণ করলে সন্তানের মধ্যে রক্তশূন্যতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার কোন সন্তান, পিতামাতার একজনের নিকট থেকে যদি S-হিমোগ্লোবিনের জিন ও অপরের নিকট থেকে C-হিমোগ্লোবিনের জিন গ্রহণ করে, তাহলে তার মধ্যে রক্তশূন্যতার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু C-হিমোগ্লোবিনজনিত রক্তশূন্যতা সিকল-সেল অ্যানিমিয়ার মত অত মারাত্মক আকার ধারণ করে না। অনেকে অনুমান করেন যে, A, S ও C হিমোগ্লোবিনের জিন একই ক্রোমোসোমের এক নির্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান করে এবং যে কোন দুটি জিনের সমবায়ে ছয় প্রকার অন্তঃপ্রকৃতিসম্পন্ন (Genotypes) হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হতে পারে, যথা—AA, SS, CC, AS, AC ও SC। ইলেকট্রোফোরেসিসের সাহায্যে এদের সনাক্তকরণে বিশেষ অসুবিধা হয় না। পশ্চিম আফ্রিকায়, বিশেষতঃ ঘানা প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কুড়ি জনের রক্তে অস্বাভাবিক C-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব দেখা যায়।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের এক প্রকার মারাত্মক রক্তশূন্যতা দেখা যায়—একে ভূমধ্যসাগরীয় রক্তশূন্যতা বা থ্যালাসেমিয়া বলে। লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকবার ফলে এই রোগ উৎপত্তির কারণ ঘটে। কি ভাবে যে এই রোগের উৎপত্তি হয়, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই। অনেকে মনে করেন যে, থ্যালাসেমিয়া রোগের মূলে আছে এক প্রকার জিন। এর প্রভাবে সুস্থ হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তিতে বাধা সৃষ্টি হয় এবং অন্য অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি ঘটে। যারা দুটি থ্যালাসেমিয়াজনিত জিন অথবা একটি থ্যালাসেমিয়া ও একটি S-হিমোগ্লোবিনের জিনের উত্তরাধিকারী হয়, তারা মারাত্মক রক্তশূন্যতা রোগে ভুগে থাকে। কিন্তু যারা একটি থ্যালাসেমিয়াজনিত জিন ও একটি A-হিমোগ্লোবিনের জিন বহন করে, তাদের মধ্যে সামান্য রক্তশূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, বিশেষতঃ ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে থ্যালাসেমিয়া জিনের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়।

অন্যান্য অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের মধ্যে D ও E-হিমোগ্লোবিনের বৈশিষ্ট্যের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, অস্বাভাবিক S ও C-হিমোগ্লোবিনের জিন ক্রোমোসোমের যে কক্ষে অবস্থান করে, D ও E-হিমোগ্লোবিনের জিনও সেই কক্ষে থাকে। পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকে অস্বাভাবিক D অথবা E হিমোগ্লোবিনের জিন গ্রহণ করলে সন্তানের মধ্যে রক্তশূন্যতার লক্ষণ দেখা যায়, তবে S-হিমোগ্লোবিনজনিত রক্তশূন্যতার মত অত মারাত্মক হয় না। ভারতবর্ষে গুজরাটি ও শিখদের রক্তে D-হিমোগ্লোবিনের আধিক্য দেখা যায়। রক্তে অস্বাভাবিক E-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও মালয়ে শতকরা দশজনের মধ্যে দেখা যায়। কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডক্টর জে. বি. চ্যাটার্জির এক বক্তৃতায় জানা যায় যে, বাংলা দেশে শতকরা চার জনের রক্তে E-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব আছে।

আফ্রিকার ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সব নিগ্রোদের লোহিত কণিকায় স্বাভাবিক A-হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে S-হিমোগ্লোবিন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাদের ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। এই সঙ্কর জাতীয় লোকেরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে বেশী দিন বেঁচে থাকে। কিন্তু যাদের লোহিত কণিকায় শুধু A-হিমোগ্লোবিন থাকে, তারা ম্যালেরিয়া রোগে সহজে আক্রান্ত হয় এবং যাদের লোহিত কণিকায় শুধু S-

হিমোগ্লোবিন থাকে, তারা রক্তশূন্যতা রোগে মারা যায়।

যে সব স্ত্রী-পুরুষ কোন বংশগত রোগের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে, তারা যদি জনসাধারণের মধ্যে মিশে থাকে, তবে তাদের অন্তঃপ্রকৃতি (Genotype) সহজে জানা যায় না। কিন্তু ইলেকট্রোফোরেসিসের সাহায্যে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের বাহককে সহজে সনাক্ত করা যেতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের রক্ত পরীক্ষা করে বিবাহের ব্যবস্থা করলে রক্তশূন্যতা বংশগত রোগ হিসাবে কোন সন্তান-সন্ততির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবার সম্ভাবনা থাকে না। স্বামী বা স্ত্রী, যে কোন একজনের লোহিত কণিকায় সুস্থ ও স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকলে ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশগত রক্তশূন্যতার লক্ষণ ফুটে ওঠে না।

লোহিত কণিকায় কোন অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন মানব জাতির রক্তে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের অনুপাত থেকে মানব জাতির সংমিশ্রণ ও গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য জানা সম্ভব হয়। কোন মানব গোষ্ঠীর রক্তে S ও C-হিমোগ্লোবিনের প্রাচুর্য দেখলে সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের কোনকালে যোগসূত্র ছিল বলে মোটামুটিভাবে ধারণা করা যেতে পারে। আবার কোন গোষ্ঠীর রক্তে যদি থ্যালাসেমিয়া ও E-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব থাকে, তবে সেই গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অনুমান করা যেতে পারে।

বিশ্রাম

জয়া রায়

শরীর সুস্থ রাখতে হলে বাতাস, জল ও খাদ্যের মত বিশ্রামও যে আবশ্যক, তা সকলেই স্বীকার করেন। তবে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব বেশী হয় নি। রোগের চিকিৎসায় নানারকম ওষুধের আবিষ্কার ও ব্যবহার বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। একই রোগের জন্যে বিভিন্ন ওষুধের প্রয়োগও বিরল নয়; কিন্তু বিশ্রামের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়, এমন কিছু এপর্যন্ত জানা যায় নি।

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে প্রত্যেক প্রাণীর যে পরিমাণ অঙ্গসঞ্চালন অপরিহার্য, তা বজায় রাখতে যে শক্তির আবশ্যক, তা খাদ্যের বিভিন্ন জটিল উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করেই পাওয়া যায়। এই ব্যয়িত শক্তিকে ফিরে পাবার জন্যে আবার কতকগুলি সংশ্লেষণমূলক কার্যও সঙ্গে সঙ্গে চলা দরকার। শ্রমের সময় যেমন প্রথম প্রক্রিয়া (বিশ্লেষণ) চলে, বিশ্রামের সময়ও তেমনি দ্বিতীয়টি (সংশ্লেষণ) চলে। বিশেষতঃ রোগের সময় শরীরের ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয় বলে উপযুক্ত বিশ্রামের আবশ্যকতা আরও বেশী হয়।

বিশ্রামের মাত্রা বা পরিমাপ নির্ধারণ করা সহজ নয়। কোন রোগী বিছানায় শুয়ে থাকলেও তার শরীরের অংশবিশেষে বা সর্বাংশেই কিছু কিছু নড়াচড়া চলতে পারে। ডাক্তার বা নার্স হয়তো দেখেন যে, রোগী বার বার পাশ ফিরছে, হাত-পায়ের কোন অংশ বারবার নড়ছে অথবা তার শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত বা নিয়মিতভাবে চলছে না কিংবা তার মুখের ভঙ্গী ক্রমাগত বদল

হচ্ছে বা চোখের পাতার গতি নিয়মিত মৃদুতালে ঘটছে না। এই সব দেখে বোঝা যায় যে, রোগীর উপযুক্তভাবে বিশ্রাম হচ্ছে না। অন্য ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য থাকলে চোখে দেখা না গেলেও উপযুক্ত যন্ত্রে তা ধরা কঠিন নয়।

মাংসপেশীর সঙ্কোচনের সময় তাদের দৈর্ঘ্য কমে ও প্রসারণের সময় তা বৃদ্ধি পায়। এই সংস্কোচন-প্রসারণের উপরেই শরীরের যাবতীয় নড়াচড়া নির্ভর করে। এই ঘটনা প্রকাশ্যভাবেই দেখা যায়। আবার কোন কোনটি গোপনে বা চোখের আড়ালে ঘটে; যেমন—হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী ও মূত্রাশয়ের স্বাস্থ্যে নিয়মিত এবং রোগে অনিয়মিত গতি। আবার মনের ভাবের তারতম্যের সময় মুখ ও হাত-পায়ের ভঙ্গী পরিবর্তন অনেক সময় এমন সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, ভাল করে লক্ষ্য না করলে তা বোঝা যায় না। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম সঙ্কোচন-প্রসারণ লক্ষ্য করা ও মাপা যায়। সঙ্কোচন মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী হলে তাকে স্থায়ী সঙ্কোচন বা Hypertonia বলে।

কোন কোন রোগে এই স্থায়ী সঙ্কোচনের অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে। আবার কোন কোন রোগে মাঝে মাঝে আসতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধি (Essential hypertension) রোগে অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহে এই রকম বিকার দেখা যায়। কোন কোন অজীর্ণ রোগে এবং স্নায়ুতন্ত্রের অস্থিরতা রোগে (Nervousness) এই সব লক্ষণ দেখা যায়।

বৃহদন্ত্রে আক্ষেপপ্রবণতা, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোন কোন উদরাময়ে এই অতি সঙ্কোচন অন্ননালীর পেশীতন্ত্রে সারা দিনই থাকে। আবার খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং বৃহদন্ত্রের অবসাদেও এই রকম দেখা যায়।

রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে ধমনীর ক্ষুদ্র শাখাগুলির পেশীস্তরে এই অতি সঙ্কোচন ধীরে ধীরে হয় ও বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রথম অবস্থায় মাংসপেশীর সঙ্কোচনের ফলেই অস্থায়ী চাপবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। মানসিক শান্তির সময় রোগীর রক্তচাপ স্বাভাবিকই থাকে।

মাংসপেশীর পূর্ণ প্রসারণ বা বিশ্রাম তখনই হয়, যখন পেশীর কোন সঙ্কোচনই থাকে না। এই অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্রামকালে স্বাভাবিকভাবেই আসে। কারুর আবার অভ্যাস বা চেষ্টার দ্বারা এই অবস্থা আনতে হয়। আবার শরীরের বিশ্রামকে মনের বিশ্রাম থেকে তফাৎ করা যায় না। কারণ সজ্ঞান অবস্থায় সকল কাজই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জ্ঞাতসারে ঘটে থাকে ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যাকে আমরা মানসিক শ্রম বলি, তাতেও শরীরের কাজ একেবারে বন্ধ হয় না। বাইরে দৃশ্যমান প্রত্যেক আচরণের সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ও বহুসংখ্যক মাংসপেশীর কাজ পরস্পর-সাপেক্ষভাবে ও সহযোগে ঘটে। সুতরাং মাংসপেশীর পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হলে মস্তিষ্কের বা মনের বিশ্রামও আবশ্যক। কল্পনা, গভীর চিন্তা, আবেগ বা অন্য সকল মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সূক্ষ্ম শারীরিক ক্রিয়া সর্বদাই জড়িত থাকে। শরীরের কোন অংশে মাংসপেশার সম্পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশের নিয়ামক মস্তিষ্কের অংশগুলিও বিশ্রাম পায়, অর্থাৎ পেশীর বিশ্রামে মনেরও বিশ্রাম ঘটে। শারীরিক ও মানসিক উভয় জাতীয় রোগের চিকিৎসায় এই পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়টি কাজে লাগালে অনেক সুফল পাওয়া যায়। বিশ্রাম চিকিৎসা (Rest cure) নাম দিয়ে উইয়ার মিচেল (Weir Mitchell) যে ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন, তাতে খাদ্যের উপরে বেশী ঝোঁক দেওয়া হতো। রোগীকে মাংস, ডিম ইত্যাদি বেশী পরিমাণে খেতে দিয়ে তাকে অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকতে বলা হতো। যাদের কোন কারণে

শরীরের ওজন কম, এই ব্যবস্থায় তাদের ওজন সহজেই বেড়ে যেত; কোন কোন ক্ষেত্রে আরামবোধও কিছু বাড়তো। মিচেল কিন্তু ঠিক উপলব্ধি করেন নি যে, রোগীর মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতাই মাংসপেশীর হাইপারটোনিয়া এবং পেশীতন্ত্রের শীর্ণতার কারণ। কিছু দিন এই চিকিৎসার পরে ওজন কিছু বাড়লেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি ওজন কমে যেত। অপর পক্ষে, এইসব রোগীকে বিশ্রামের প্রকৃত কৌশল শিখিয়ে দিলে শুধু মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যই বাড়ে না, খাদ্যের পরিমাণ না বাড়ালেও শরীরের ওজন বেড়ে যায়। তার জন্যে সারাদিন শুয়ে থাকবারও দরকার হয় না, রোগী সাধারণভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে।

রোগীর শরীরের ওজন বাড়াতে হলে তার শয়ন বা নিদ্রার সময় মাংসপেশী ও মনের পূর্ণ বিশ্রামের দিকে নজর দেওয়া দরকার। এই অবস্থা তখনই সম্যকভাবে ঘটে, যখন (১) খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার (Metabolic rate) কম থাকে, (২) Knee-jerk বা অন্য Reflex-গুলির তীব্রতা কমে যায়, (৩) রোগী বিভিন্ন অঙ্গের দিক থেকে এবং সর্বাঙ্গের দিক থেকে শান্ততর অবস্থায় থাকে, (৪) মনের বিভিন্ন কাজগুলির (চিন্তা, কল্পনা, বিচার ইত্যাদির) তীব্রতা বা উগ্রতা অনেকটা কমে যায়।

সর্বশরীরের এই পূর্ণ বিশ্রামের সময় খাদ্যের চাহিদা কিছু কম পড়ে। কিন্তু শুধু এই জন্যেই যে উপকার বা লাভ হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, বিছানায় শুয়ে থাকলেও যদি অনিদ্রায় রাত কাটে, তাহলে সকালে স্বাভাবিক ঘুমের পরে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও কাজে উৎসাহ বোধ হওয়া উচিত, তা মোটেই হয় না, বরং নিজেকে ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করে। অপর পক্ষে, এক ঘণ্টাকাল মাংসপেশীগুলিকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে পারলে রোগীর মনে হয় যে, তার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, যদিও সে একটুকুও ঘুমায় নি। সুতরাং ঘুমের যে নিজস্ব কোন অদ্ভুত গুণ আছে তা মনে হয় না। মনের অশান্তি এবং অস্থিরতা রোগী যে পরিমাণে চিকিৎসক বা ঘরের লোকের সহযোগিতায় সংযত করতে পারে, তার শরীরের ও মনের বিশ্রাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য সেই পরিমাণে বাড়ে। কিছুকালের জন্যেও সম্পূর্ণভাবে এই অস্থিরতা দমন করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সিষ্টোল ও ডায়াষ্টোলের রক্তচাপ কমে যায় এবং পাকস্থলী, অন্ত্রনালী ও অন্য আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির নড়াচড়া ততই স্বাভাবিক তালে চলতে থাকে। চোখ ও স্বরযন্ত্রের পেশীগুলির গতি মনের বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা (যেমন—চিন্তা, আবেগ, উদ্বেগ ইত্যাদি) বিশেষভবে প্রভাবিত হয়। মনের পূর্ণ বিশ্রামে এদের বিশ্রামও পূর্ণমাত্রায় ঘটে এবং এই কারণেই এই বিশ্রামের উপকারিতা বেশী।

মাংসপেশীর উপযুক্ত বিশ্রামের জন্যে নানা কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। আবার উপযুক্ত পথ্য, শান্তিপ্রদ ভেষজ এবং মালিস বা চিকিৎসার দ্বারাও মনকে শান্ত করা কঠিন নয়। তবে ওষুধের উপর নির্ভর না করে রোগী যদি নিজেই শরীর ও মনকে সংযত করবার কৌশলগুলি শিখে নেন, তবেই ফল সবচেয়ে ভাল হয়।

শরীরের কোন অংশে আঘাত লাগলে সেই অংশকে বিশ্রাম দেবার দরকার বেশী হয়। শিশু-পক্ষাঘাত এবং কোন কোন বাত রোগে বিশ্রামের দরকার সবচেয়ে বেশী, আবার পড়ে গিয়ে হাতের কব্জির উপরের অংশ ভেঙে গেলে Collie's fracture নামক যে অবস্থা প্রায়ই ঘটে, তাতে কাঠের 'বাড়' বা প্লাষ্টার দিয়ে অংশটির নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করাই চিকিৎসার গোড়ার কথা। যক্ষ্মারোগে ফুসফুসে ছিদ্র হয়ে

গেলেও বুকে প্লাষ্টার করা বা A. P. প্রক্রিয়ায় ফুস্‌ফুসের বাইরে কৃত্রিমভাবে হাওয়া ঢুকিয়ে আক্রান্ত অংশটিকে নিশ্চল করবার রীতিও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। চোখের কোন কোন রোগে আক্রান্ত ইন্দ্রিয়টিকে ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে অচল করা দরকার হয় অথবা কোকেন প্রয়োগ করেও চোখটিকে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব। কাঠের নানারকম বাড় বা ফ্রেম, বিশেষ ধরণের স্ক্রু, পেরেক ও কপিকলে ঝোলানো ভারের সাহায্যেও আহত অঙ্গকে অচল করে রাখা যায়।

এই ভাবে স্থানীয় বিশ্রামের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদনা হ্রাস করা। পশু-পক্ষীরাও কোন ভাবে জখম হলে বিশ্রামের দ্বারাই শরীরকে সুস্থ করে তোলে। পাখীর ডানায় চোট লাগলে ঠোঁটের সাহায্যে পালকগুলি সমেত ডানাটিকে মেলে দিয়ে জলের কাছে গিয়ে বিশ্রাম নেয় এবং পিপাসা দূর করবার জন্যে গলা বাড়িয়ে জল খাওয়া ছাড়া অন্য সব নড়াচড়া বন্ধ রাখে।

সাধারণ ব্যবস্থায় আহত স্থানের নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করা যায় না। অন্য অঙ্গের নড়াচড়ার সময় আহত অঙ্গের পেশীগুলিরও সঙ্কোচন চলতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধই সেই কাজ থেকে বিরত হতে বাধ্য করে। পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হলে আহত অঙ্গের প্রভাবক স্নায়ুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা দরকার। এই কাজ উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বা অবসাদক ওষুধের সাহায্যে করা যায়।

শরীরের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গের নড়াচড়া দুই দল বিপরীত-ধর্মী মাংসপেশীর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ একদলের (Flexor) ক্রিয়া কিছু বেশী জোরালো হয়। আঘাতের পরে এই জোরালো পেশীদলের স্থায়ী সঙ্কোচনে অঙ্গটি একদিকে বেঁকে অচল হয়ে পড়ে। তাতে বেদনাবোধ কম হয়। তবে এই রকম স্থায়ী সঙ্কোচন অস্বাভাবিক; সুতরাং 'বাড়' বা প্লাষ্টারের সাহায্য নেওয়া খুবই দরকার। এই ব্যবস্থায় কাজটি এমন সুচারুভাবে হওয়া চাই যে, আহত অঙ্গের পেশীগুলিকে কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে না হয়। তুলা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করেই অনেক ছোটখাট আঘাতে আহত অঙ্গের বিশ্রাম দেওয়া যায়। এতে যথেষ্ট না হলে মোটা কাপড় বারবার জড়িয়ে দেবার পর শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। গ্রন্থির আঘাতে এই উপায়েই কাজ হয়। হাড় ভেঙে গেলে অথবা বাত রোগে বালিশের মত নরম পুরু জিনিষের উপর অঙ্গটি রাখলে আরাম হতে পারে। পাত্‌লাভাবে প্লাষ্টার করেও এই কাজ করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার স্নায়ুগুচ্ছকে ওষুধের সাহায্যে অবশ করলে ফল বেশী পাওয়া যায়। হাড় ভেঙে গেলে ভাঙ্গার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত জুড়ে প্লাষ্টার করা দরকার। হাঁটু ভাঙলে প্রায় সমস্ত পায়ে এই রকম করতে হয়। প্লাষ্টারের আগে ভাঙ্গা হাড়ের দুই অংশ যাতে ঠিকভাবে এক লাইনে বসে, তা লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। তাহলে একটি অংশ আর একটির উপর বা পাশে পড়ে না এবং দুই অংশ সহজে জোড়া লাগে।

আরথ্রাইটিসের তরুণ অবস্থায় বেদনাযুক্ত স্ফীত অংশকে বিশ্রাম দেওয়া খুবই দরকার। না হলে অনেক সময় পেশীগুলির অনিয়মিত স্থায়ী সঙ্কোচনে অঙ্গটি বেঁকে যায় ও কিছু দিন ধরে এই বাঁকাভাব সংযোজন তন্তুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে স্থায়ী হয়ে উঠে এবং পরে আর সংশোধন করা যায় না।

এজন্যে প্লাষ্টারের সাহায্যে অঙ্গের নড়াচড়া কিছুদিনের জন্যে একেবারে বন্ধ করতে হয়। হাঁটুর রোগে এই সাবধানতার আবশ্যক সবচেয়ে বেশী হয় এবং পায়ের গুল্‌ফ থেকে কুঁচকির কাছ পর্যন্ত অংশের নড়াচড়া বন্ধ করতে হতে পারে। এই ব্যবস্থায় স্থায়ী ক্ষতি দেখা যায় না। তবে দুই দিন পরে প্লাষ্টার খুলে অঙ্গটিকে

কিছু নড়াচড়া করতে দেওয়া হয়। হাতের আঙ্গুলের হাতের জন্যে উপযুক্ত প্লাষ্টারের সাহায্যে দীর্ঘকাল বিশ্রাম দেওয়া দরকার হয়।

এই ভাবে উপযুক্ত বিশ্রাম পেলে মাংসপেশী, অস্থি বা গ্রন্থির তন্তুগুলি আপনাআপনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে এই সব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিশ্রামের আবশ্যকতাও কম নয়। ক্রোধ, উত্তেজনা, বিরক্তি ইত্যাদি থাকলে এই সব ব্যবস্থায়ও পূর্ণ বিশ্রাম ঘটে না এবং রোগ নিরাময়ে বিলম্ব ঘটে। চিকিৎসক, নার্স বা বাড়ীর লোকের সহযোগিতায় এই সব অনিষ্টকর কারণগুলি দূর হতে পারে।

ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও জীবন

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষের দেহের প্রতিটি অংশেই বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের উপস্থিতি দেহ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। বেশীর ভাগ রাসায়নিক পদার্থই সাধারণতঃ জৈব, অর্থাৎ এদের মূল উপাদান কার্বন বা অঙ্গার। যদি কোন জীবিত বস্তুকে পোড়ানো হয়, তাহলে দেহের বেশীর ভাগ অংশই বাতাসে মিলিয়ে যায়। জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হয়, আর কার্বনের অংশ কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। মানুষের দেহ পোড়ালে শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে সামান্য ছাই। দেহের ওজনের তুলনায় সে ছাই অতি সামান্য। ঐ ছাই পাওয়া যায় দেহের কঠিন অংশ অর্থাৎ হাড় ও দাঁত থেকে। এই ছাইয়ের ওজন জীবিত দেহের ওজনের এক-শ' ভাগের একভাগের কাছাকাছি মাত্র। অথচ এই ছাইয়ের মধ্যে আছে নানা ধরণের লবণ (Salt), প্রোটোপ্লাজম বা জীব-কোষের প্রাণের মূল উপাদান। এই লবণ ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব বজায় থাকা অসম্ভব।

জীবনের চেয়ে নিশ্চয়ই দামী কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই, অথচ সেই জীবনের মূল উপাদান অতি সস্তা মূল্যের কয়েকটি জিনিসের সমষ্টি মাত্র। দেহের অতি সাধারণ উপাদানের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ, পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম আর ক্যালসিয়ামের নানা লবণ (Salt)। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব কার্যকারিতা আছে। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে ক্যালসিয়াম, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্যালসিয়াম না থাকলে বড় বড় প্রাণীর কোন হাড় বা দাঁত থাকতো না। দেহের এই সব শক্ত অংশের গঠন নির্ভর করে ক্যালসিয়ামের উপরেই। হাড় ও দাঁত গঠন ছাড়াও ক্যালসিয়ামের অন্য কার্যকারিতা আছে। হাড়, দাঁত ও দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কোষের মধ্যে ক্যালসিয়ামের অস্তিত্ব বর্তমান। ক্যালসিয়াম দেহের অভ্যন্তরে সিমেন্টের কাজ করে। কোষগুলির পরস্পরের গায়ে লেগে থাকবার কাজ ক্যালসিয়ামই করে। পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করতে ক্যালসিয়ামের জুড়ি নেই, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম নানা ভাবেই দেহ গঠনের কাজ করে থাকে।

দেহ গঠনে ক্যালসিয়ামের উপযোগিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা একটি চমৎকার পরীক্ষা করে দেখেছেন। পরীক্ষাটি করা হয়েছিল অ্যামিবার উপর। অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। চলবার সময় অ্যামিবার দেহ থেকে নানা দিকে আঙুলের মত

অংশ বের হয়ে থাকে। এর সাহায্যেই অ্যামিবা চলাফেরা করতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—ক্যালসিয়াম নষ্ট করে দেয়, এই ধরণের রাসায়নিক কোন দ্রব্য অ্যামিবার গায় ছড়িয়ে দিলে অ্যামিবার দেহাকৃতি কুঁচকে ছোট হয়ে যায় আর সে চলতে পারে না। এর ফলে অ্যামিবার দেহের প্রোটোপ্লাজম আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয় যে, জীবদেহে ক্যালসিয়ামের উপযোগিতা অপরিসীম। এই অতি প্রয়োজনীয় লবণ ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব নয়।

নানা ধরণের খাদ্যের মধ্য দিয়েই প্রাণীরা ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে। নানা রকমের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ক্যালসিয়ামের উপযোগিতা কম নয়। ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয় অংশ কোন কারণে কম হলে প্রাণীর দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে ও নানা রকম রোগের সৃষ্টি হতে পারে। তখন অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে এর ঘাট্‌তি পুরণ করা দরকার হয়ে পড়ে। সুতরাং দেহের হাড় বা অন্য কোন কঠিন অংশ গঠন করাই ক্যালসিয়ামের একমাত্র কাজ নয়, জীবন-ক্রিয়ার জন্যেও এর উপযোগিতা অপরিসীম।

ঠিক ক্যালসিয়ামের মতই আর একটি বস্তু দেহ গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়—সেটি হচ্ছে প্রোটিন। ১৮৩৮ সালে বিখ্যাত ডাচ্‌ কৃষিবিদ গেরার্ড মুল্ডার (Gerard Mulder) বলেন—প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে এক ধরণের বস্তু আছে, যার অভাবে আমাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব। তিনিই এই বস্তুটির নামকরণ করেন প্রোটিন। কথাটি নেওয়া হয়েছে গ্রীক Proteios শব্দ থেকে, যার মানে—কোন কিছু শ্রেষ্ঠ। মুল্ডার ও বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক গুস্টাস ভন লিবিগ (Gustus Von Leibig) মনে করতেন যে, প্রোটিন একটি মাত্র পদার্থ। তাঁদের ধারণা শীঘ্রই ভুল বলে প্রমাণিত হলো। প্রোটিনও দেহের অন্যান্য পদার্থ, যেমন—চর্বি আর কার্বো-হাইড্রেট-এর সঙ্গে গঠিত। দেহের শুষ্ক পদার্থের মোট ওজনের দেড়গুণ হচ্ছে প্রোটিন (দেহের প্রায় সত্তর ভাগ জলীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত)। আবার দেহের মোট প্রোটিনের একের তিন ভাগ পাওয়া যায় পেশীর মধ্যে। পেশীর কাজে প্রোটিনের একান্ত প্রয়োজন। দেহচর্মে দেহের মোট প্রোটিনের শতকরা দশ ভাগের অস্তিত্ব আছে। বাইরের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করাই প্রোটিনের কাজ।

প্রোটিনের নানা শ্রেণী বিভাগ আছে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে এন্‌জাইম (Enzyme), যদিও অন্যান্য ধরণের প্রোটিনের তুলনায় এদের অংশ কম। দেহের নানারকম রসের মধ্যেও প্রোটিনের অস্তিত্ব আছে। নানা রকমের জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সর্বদাই এবং প্রোটিন এদের হাতে থেকে দেহকে রক্ষা করতে সর্বদাই সাহায্য করে।

আজ পর্যন্ত নানা ধরণের প্রোটিনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। জীবনধারণের ক্ষেত্রে কোন্‌ ধরণের প্রোটিনের কি উপযোগিতা ও তাদের গঠন কি ধরণের—এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন রকমের গবেষণা করে চলেছেন। বিষয়টি এত জটিল যে, এই বিষয়ে সঠিক কোন ধারণা করা এখনও সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই জীবনধারণ সম্বন্ধে এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে যাবে।

সমস্ত প্রোটিনের উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এছাড়া অন্যান্য বস্তুরও সামান্য পরিমাণ উপস্থিতি দেখা যায়। সাধারণতঃ শতকরা বারো থেকে উনিশ ভাগ থাকে নাইট্রোজেন। বহু প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া যায় গন্ধক আর কোন কোনটিতে পাওয়া যায় ফস্‌ফরাস।

প্রোটিনের অণু ভেঙে বিশ্লেষণ করা অতি কঠিন কাজ। যদিও বৈজ্ঞানিকেরা সে অসম্ভবকেও

সম্ভব করছেন। এই পরীক্ষার ফলে আজ জানা গেছে যে, একটি প্রোটিনের অণু হাইড্রোজেন অণুর চেয়ে ১৩০০০ হাজার গুণ বেশী ভারী; অর্থাৎ এর আণবিক ওজন ১৩০০০। সবচেয়ে বড় আকৃতির প্রোটিন অণুর ওজন প্রায় ১০০ লক্ষ অর্থাৎ এক কোটি। এই প্রোটিন অণুর গঠন অত্যন্ত জটিল। ব্যাপারটি সহজেই বোঝা যাবে পেনিসিলিনের একটি অণুর সঙ্গে এর তুলনা করলে। পেনিসিলিন অণুর ওজন ৩৩৪ আর ফরমুলা হলো C_{16} H_{18} O_4 N_2S; দুধের প্রোটিনের (Lactoglobulin) সঙ্গে যদি এর তুলনা করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এই প্রোটিনের আণবিক ওজন ৪২০০০ আর ফরমুলা হচ্ছে C_{1864} H_{3012} O_{576} N_{468} S_{21}। সুতরাং এথেকেই বোঝা যায় যে, এর গঠন কতখানি জটিল।

বর্তমানে প্রোটিন অণু সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় রাসায়নিকেরা প্রথমে প্রোটিন অণুকে বিশেষ উপায়ে আরও ছোট অণুতে ভেঙে ফেলেন। ঐ অণু হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডে (Amino acid) গঠিত। প্রোটিনকে প্রথমে অ্যাসিড বা ক্ষার-এর সাহায্যে বিভক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হাইড্রোলিসিস (Hydrolysis)। প্রোটিন যখন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়, তখন বৈজ্ঞানিকেরা ঐ অ্যাসিডের গঠন পরীক্ষা করেন। কারণ জৈব রসায়নের আবির্ভাবে একাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে, আর সব রকম অ্যামিনো অ্যাসিডেরই গঠন জানা সম্ভব হয়েছে।

সবচেয়ে সরল অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লাইসিনের (Glycine) আবিষ্কার হয় ১৮২০ সালে। একাজ সম্ভব করেন ফরাসী রসায়নবিদ হেনরী ব্র্যাকোনট (Henry Braconnt)। জিলাটিনের উপর অ্যাসিডের বিক্রিয়ার সাহায্যে তিনি এই কাজ সম্ভব করেন। আজ পর্যন্ত প্রোটিনের মধ্য থেকে প্রায় ২২ রকম অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কার করা হয়েছে। অ্যামিনো অ্যাসিড সম্বন্ধে গবেষণার ফলে বর্তমানে প্রোটিন সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ জানা সহজতর হয়েছে—একথা নিশ্চয়ই বলা চলতে পারে। কারণ প্রত্যেক অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠনেই কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে; যেমন—এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে COOH, অর্থাৎ কারবক্সিল (Carboxyl) আর আছে NH_2 বা NH। এর নাম অ্যামিনো গ্রুপ। এরা প্রত্যেকই কার্বন-অণুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। একে বলা হয় আল্‌ফা-কার্বন। আল্‌ফা-কার্বনের সঙ্গে থাকে হাইড্রোজেন অণু। ঐ বিভিন্ন অণুর বিচ্ছিন্ন অবস্থান দেখেই বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের তফাৎ বোঝা সম্ভব হয়। যে কোন প্রোটিনকে হাইড্রোলিসিসের সাহায্যে অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে ফেললেই ঐ প্রোটিনের বিভিন্নতা বোঝা অবশ্যই সম্ভব। এই উপায়েই আজ প্রোটিন বিশ্লেষণ করে তার গঠন জানা সম্ভব হয়েছে।

দেহ গঠনের পক্ষে আজ ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবতে পারেন, প্রকৃতি কি অদ্ভুতভাবেই জীবজগতে তার আশ্চর্য কুশলতার নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছে। যদিও মানুষ চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যমে দেহ সম্বন্ধে আর অজ্ঞ নেই, তবুও একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, এখনও বহু খুঁটিনাটি বিষয় আছে, যার সম্বন্ধে আলোকপাত করা এখনও সম্ভব হয় নি।

নলকূপ ও তাহার জল

শ্রীকরুণানিধান চট্টোপাধ্যায়

যখনই আপনি আপনার বাড়ীতে নলকূপ বসাইবার কথা স্থির করিলেন, তখনই আপনার মনে হইবে যে, নলকূপের জল কি রকম হইবে অর্থাৎ সুস্বাদু হইবে কিনা অথবা জলে দ্রবীভূত লৌহ কি পরিমাণ থাকিবে, দ্রবীভূত লবণের পরিমাণই বা কতখানি হইবে ইত্যাদি। যদি আপনার প্রতিবেশী পূর্বেই কোন নলকূপ বসাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি জলের গুণ বিচার করিতে পারিবেন নচেৎ আপনাকে নলকূপের ঠিকাদারের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অথবা আপনি যদি স্থানীয় জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কার্যালয়ে খোঁজ নেন, তবে উক্ত স্থানের নলকূপের জল সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাইতে পারেন।

জলের গুণ কতকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে; যথা—(১) জলের তাপ, (২) ইহার রসায়ন (Chemistry) ও (৩) ইহার জীবায়ন (Biology)। জলের গুণের উপর তাহার স্বাদ নির্ভর করে। জল অত্যধিক কষা (Hard) হইলে কাপড় ধৌত করিতে অত্যধিক সাবান লাগিবে আবার জলে অত্যধিক দ্রবীভূত লৌহ থাকিলে জলের রং লাল হইয়া যাইবে এবং এই জলে কাপড় ধৌত করিলে কাপড়ের রং লাল হইয়া যাইবে। জলে দুর্গন্ধ হইতে পারে বা জল খাইলে দাঁতের রং লাল হইবে ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমেরিকার জনস্বাস্থ্য বিভাগ জলের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে এখনও জলের কোনরূপ মান নির্দিষ্ট না থাকায় আমরা আমেরিকাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। জলের মান কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নিম্নে আংশিকভাবে দেওয়া হইল—

(১)	ঘোলা (Turbidity)	=১০	ভাগ	প্রতি ১০ লক্ষ ভাগ পর্যন্ত জলে ব্যবহার যোগ্য।
(২)	লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ	=০'৩	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৩)	কষা (Hardness)	=১০০'০	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৪)	ম্যাগ্‌নেশিয়াম	=১২৫'০	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৫)	সীসা	=০'১	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৬)	আর্সেনিক	=০'০৫	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৭)	তাম্র	=৩'০	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৮)	দস্তা	=১৫'০	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(৯)	লবণ	=২৫০'০	ভাগ	,, ,, ,, ,, ,,
(১০)	কঠিন পদার্থ (Total solids)	=৫০০'০ হইতে ১০০০	ভাগ	,, ,, ,, ,,
(১১)	নিরপেক্ষতা (ph value)	=৭'০ হইলে ভাল হয়।		

নলকূপের জল সাধারণতঃ ঘোলা হয় না—তবে বিশেষভাবে লৌহ, কষা, লবণ, কঠিন পদার্থ ও নিরপেক্ষতার জন্ম পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অবশ্য আপনি কি জন্ম জল ব্যবহার করিবেন, তাহার উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। যেমন—আপনার যদি ধোতাগার (Laundry) বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার জন্ম জলের প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্যই জল পরীক্ষা করিয়া উপরিউক্ত বিষয় দেখা দরকার।

জলের গুণ যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার মধ্যে জলের তাপের মান গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা সহজ। অনেকে হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, শীতকালে নলকূপের জল গরম বোধ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ভূমি হইতে ৩০ ফুট ও ৯০ ফুটের মধ্যে জলের তাপ বাহিরের স্থানীয় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, নলকূপের জলের তাপ জানিবার কি প্রয়োজন আছে? যদি নলকূপের জল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার জন্ম ব্যবহার করিবেন বলিয়া স্থির করা হয়, তবে অবশ্যই নলকূপের জলের তাপ জানিবার প্রয়োজন আছে। যদি আপনার বাড়ীতে গরম জলের ব্যবস্থা রাখেন, তাহা হইলেও জলের তাপ জানিবার প্রয়োজন আছে। জলের তাপের উপর আপনার কি পরিমাণ খরচ হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে।

আপনার নিকট তাপমানযন্ত্র থাকিলে খুব শীঘ্র জলের তাপ জানিতে পারিবেন। যদি না থাকে তাহা হইলে অনুমান করিয়া লইতে পারেন, যদি নিম্নলিখিত নিয়মটি স্মরণ রাখেন। আপনার নলকূপ ভূমি হইতে ১০০ ফুট গভীর হইলে তাপ স্থানীয় বায়ুর বার্ষিক গড় তাপমাত্রা অপেক্ষা ১ হইতে ৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশী হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম যাহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। ভূমি হইতে ১০০ ফুটেরও বেশী গভীরতার জন্ম প্রতি ১০০ ফুটে জলের তাপ সাধারণতঃ ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশী হইবে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

ধরুন আপনার এলাকায় বায়ুর গড় তাপমাত্রা ৮৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং আপনি ভূমি হইতে ৩০০ ফুট গভীর একটি নলকূপ বসাইয়াছেন। তাহা হইলে আপনার নলকূপের জলের তাপমাত্রা (৮৭+১+২)=৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে (৮৭+৪+২)=৯৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইবে। এই নিয়মটি স্মরণ রাখিলে তাপমানযন্ত্র না থাকিলেও আপনি জলের তাপমাত্রা সম্বন্ধে একটি ধারণা করিতে পারিবেন।

তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতে পারে উষ্ণ প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরি বা পাহাড়ী এলাকায়। সেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, কারণ সেখানের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা সমতলভূমি অপেক্ষা ভিন্নরূপ। সেই সকল ক্ষেত্রে তাপমানযন্ত্রের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

হাইড্রোজেন ২ ভাগ ও ১ ভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণে জল প্রস্তুত হয়। নলকূপের জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে আরও বিভিন্ন রকমের দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থ রহিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বৃষ্টির জল মাটির নীচে পৌঁছিবার পূর্বে বিভিন্ন ভূস্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া সেই সকল রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া লয়।

বাংলা দেশের নলকূপের জল বেশীর ভাগ কষা হইয়া থাকে। আমেরিকার জনস্বাস্থ্য বিভাগ জলের যে ন্যূনতম মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা—১০০ ভাগ প্রতি ১০ লক্ষ ভাগে—তাহা অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ নলকূপকেই বাতিল করিতে হইবে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার দরুণ উক্ত মান অনুসরণ করা সম্ভব নহে। কষা জলকে নরম (Soft) জলে পরিণত করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে। তবে যদি আপনি ধৌতাগার করেন, সেখানে আপনাকে কষা জলকে নরম জলে পরিণত করিতেই হইবে, যাহাতে আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি না হয়। ইহা ছাড়া কষা জল ব্যবহার করিলে নলে রাসায়নিক স্তর (Chemical deposit) পড়িয়া নলের আয়ত ক্ষেত্র কমাইয়া দিবে ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে নলটি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আবার অত্যধিক নরম জল ব্যবহার করিলে নল অতি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে পুনরায় নূতন নল লাগাইতে হইবে।

বাংলা দেশের অধিকাংশ নলকূপের জলে দ্রবীভূত লৌহের পরিমাণ অধিক হইবার দরুণ নলকূপের চাতাল (Platform) লাল হইয়া যায়। কাপড় কাচিলেও তাহা লাল্‌চে রঙের হইয়া যায় ও হাত ধুইবার বেসিনেও (Washing Basin) লাল রঙের দাগ লাগিয়া যায়। জলে অত্যধিক দ্রবীভূত লৌহ থাকিলে জল কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোলাটে হইয়া যাইবে এবং জল দুর্গন্ধযুক্ত ও বিস্বাদ বোধ হইতে পারে। এই সকল কারণ চিন্তা করিয়াই আমেরিকার জনস্বাস্থ্য বিভাগ জলের ন্যূনতম মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইবে যে, জলে যদি দ্রবীভূত লৌহের পরিমাণ (ম্যাঙ্গানিজ সহ) ০.৩ ভাগের কম প্রতি ১০ লক্ষ ভাগে থাকে, তবে সে জল বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত বা লাল্‌চে হইবে না। দ্রবীভূত লৌহ মুক্ত করিবার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। তাহার মধ্যে বায়ুর সাহায্যে মুক্ত করিবার উপায়ই হইতেছে সর্বাপেক্ষা সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য।

আমাদের দেশের অধিকাংশ নলকূপের জল কষা হইয়া থাকে ও তাহাতে দ্রবীভূত লৌহের পরিমাণ বেশী থাকে বলিয়া শুধু মাত্র কষায় ও দ্রবীভূত লৌহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। কিছু কিছু এলাকায় অবশ্য নলকূপের জলে লবণ ও কঠিন পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে পুনরায় ভিন্ন স্তরে নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই।

জলে যে জীবাণু থাকে, সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মানুষের ক্ষতিকারক জীবাণু, যথা—টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষা ইত্যাদি ও দ্বিতীয়তঃ মানুষের ক্ষতিকারক নয় এমন জীবাণু, যথা—ক্রিনোথ্রিক্স ইত্যাদি। ভাল জল বলিতে আমরা বুঝি—যে জলে মানুষের ক্ষতিকারক কোন জীবাণু থাকে না। যদিও নলকূপের জলে সাধারণতঃ ক্ষতিকারক জীবাণুর সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়, তবুও আপনার সন্দেহ হইতে পারে যে, এই জল পান করিলে কোন অসুখ করিবে কিনা। সেই জন্য প্রত্যেক নলকূপের জল পরীক্ষাগারে যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা উচিত। জল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় দেখা হয় যে, জলে 'বি-কোলাই' (B. Coli) জাতীয় ক্ষতিকারক জীবাণু আছে কি না। এই জীবাণু মানুষ ও জীবজন্তুর পেটের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়। সেই জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, যদি জলে এই জীবাণু থাকে তবে টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি ক্ষতিকারক জীবাণু থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তখন সেই নলকূপের জল একেবারেই পান করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লোরিনের দ্বারা নলকূপটি ধৌত করা না হয়।

রূপান্তরিত শিলা ও রূপান্তরের সাক্ষ্য

শ্রীকমলকুমার নন্দী

জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন তরল অবস্থায় পৌঁছালো, সেই ক্রমিক অবস্থান্তরের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাসের সাক্ষ্য মেলে নি। তারপর তরল থেকে কঠিনে উত্তরণের সময়। সর্বপ্রথম তরলের উপরের স্তর বিকিরণের ফলে তাপ হারিয়ে কঠিন হলো। এই কঠিন স্তরের নীচে তরল অবস্থায় পৃথিবী তখনও টলমল করছে। মাঝে মাঝে সেই কঠিন স্তরে দেখা দিয়েছে ফাটল; উচ্চ চাপ ও তাপে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ উপরে এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে সেই উত্তপ্ত তরল পদার্থও তার সঞ্চিত তাপ হারিয়ে শিলীভূত হলো। এই ভাবে শিলাস্তরের জন্ম হলো প্রথম।

তরল অবস্থা থেকে শিলীভবনের ক্রমিক ও সময়ানুপাতিক কোনও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া তাপ ও চাপের পরিবর্তনের সাক্ষীস্বরূপ এমন কোনও নজীর মেলে না, যা থেকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তরল থেকে কঠিনে রূপান্তরণের সর্বপ্রকার ভৌত ও রাসায়নিক কারণগুলি উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতে পারে। তরল ও কঠিন পদার্থের অবস্থান্তর সম্বন্ধীয় ভৌত ও রাসায়নিক নিয়মগুলি সম্পর্কে গবেষণাগারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে যা জানা গেছে—সেই জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীর গঠনের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অস্পষ্ট ধারণা করা চলে, কিন্তু গঠন-তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। তার মূল কারণ বলে যেটা মনে হয়, তা হলো এই যে, গবেষণাগারের ক্ষুদ্র পরিবেশে পৃথিবীর মত বৃহৎ উপাদান—অর্থাৎ পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার দিক থেকে পৃথিবীর সমকক্ষ হতে পারে, এমন কোনও পরীক্ষণীয় সামগ্রী পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এক্স্ট্রাপোলেশন (Extrapolation) পদ্ধতির সাহায্যে, যেমন—পরীক্ষাগারে যে অবস্থা সৃষ্টি সম্ভব নয়, সেইরূপ অবস্থায় পদার্থের কোনও ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মের মানের পরিবর্তন কি ভাবে হয়, তা নিরূপণ করা যায়—ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবীর আদিকালের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে সেই অবস্থাতে গবেষণাগারের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল এক্স্ট্রাপোলেট করে মোটামুটি তখনকার তরল থেকে কঠিনে অবস্থান্তরের বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা সম্ভব। পরীক্ষামূলকভাবে তত্ত্বের আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করা এখনও সম্ভব হয় নি। তবে মনে হয় এক্স্ট্রাপোলেশন পদ্ধতি ভবিষ্যতেও অপরিহার্য।

পৃথিবীর কঠিন শিলাস্তর কিন্তু এখনও সাম্য অবস্থায় পৌঁছায় নি। প্রধানতঃ তিনটি প্রাকৃতিক কারণে শিলাস্তরে আজও ভাঙ্গন ধরছে।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে ভার ও আভ্যন্তরীণ চাপের অসাম্যের ফলে শিলাস্তরে চ্যুতির (Fault) সৃষ্টি হতে পারে, দ্বিতীয়তঃ অনুভূমিক বা তির্যক পার্শ্বচাপের জন্যে শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে। এই ভাঁজের ফলে বহু ক্ষেত্রেই শিলাস্তরগুলি নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়, অর্থাৎ কোন কোনও ক্ষেত্রে প্রাচীন স্তরের নীচে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নবীন শিলাস্তর—যা সাধারণতঃ হয় না। তৃতীয়তঃ অগ্ন্যুৎপাতের জন্যে লক্ষণীয় স্থানীয় পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে আশেপাশে শিলার রূপ ও প্রকৃতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত তিনটি কারণে স্বভাবতঃই স্থানীয় চাপ ও তাপীয় স্থানাঙ্ক পরিবর্তিত হয় এবং সেই

সীমাবদ্ধ স্থানটিতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এই বৈষম্যের ফলে যে স্থানীয় চাপ ও তাপের উদ্ভব হয়, তাতে যে খনিজগুলির সমন্বয়ে শিলাটি গঠিত, সেই খনিজগুলির উপাদানগত পরিবর্তন হয়। শুধু উপাদানগতই নয়, এই পরিবর্তনের ফলে শিলাতে খনিজের অবস্থানগত বিন্যাস ও আকৃতিগত পরিবর্তনও সাধিত হয়। ফলস্বরূপ যে নতুন শিলাটি গঠিত হয়, তাকেই রূপান্তরিত শিলা বলে। এই রূপান্তরের প্রতিটি ক্রমিক প্রক্রিয়ার স্বাক্ষর কিন্তু শিলার অন্তরে লুকিয়ে থাকে। সেই গোপন খবর উদ্ঘাটনের বিভিন্ন উপায় আছে।

প্রথমতঃ জানা দরকার, চাপ ও তাপের পরিবর্তনের ফলে শিলা ও শিলামধ্যস্থ খনিজের আকৃতি, বিন্যাস ও উপাদানগত কি কি পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্যে উদ্ভূত তাপের ফলে তাপমাত্রা যদি শিলাটির গলনাঙ্কের ঊর্ধ্বে হয়, তাহলে গলিত শিলা পরিবর্তিত অবস্থায় ধীরে ধীরে তাপ হারাবার ফলে নতুন খনিজের উদ্ভব হয়। রূপান্তরের পূর্বে শিলাতে বর্তমান খনিজ থেকে নতুন খনিজটি তার উপাদান সংগ্রহ করে। মৌলিক উপাদানগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন খনিজ সৃষ্টি হয়। এই সব নবসৃষ্ট খনিজের সমন্বয়েই রূপান্তরিত শিলাটি গঠিত।

বিভিন্ন শিলাস্তরে আপেক্ষিক সরণের ফলে উদ্ভূত চাপ ও তাপের স্থানগত পরিবর্তন দেখা যায়, যার ফলে স্থানীয় মানচিত্রে একটি চাপীয় ও আরেকটি তাপীয় অনুক্রমের লেখ অঙ্কন সম্ভব হয়। এই অনুক্রমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানাঙ্কে বিভিন্ন খনিজ গঠিত হবার উপযোগী পরিবেশ তৈরি হবার দরুণ এক একটি বিশেষ বিশেষ খনিজ গঠিত হয়। সেই খনিজগুলির নাম হলো—**Metamorphic grade index mineral,** অর্থাৎ খনিজটির উপস্থিতিই নির্দিষ্ট চাপ ও তাপের পরিমাপক। বিভিন্ন চাপ ও তাপে খনিজের প্রকৃতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে এই রূপান্তরের একটি স্তর বিন্যাস করা হয়েছে। যেমন ক্লোরাইট ($H_4Mg_3Si_2O_9$) গ্রেড—যে গ্রেডে ক্লোরাইট নামক খনিজ গঠনের উপযোগী চাপ ও তাপের উদ্ভব হয়েছিল। এই গ্রেডের চাপ ও তাপ কম। দ্বিতীয় উচ্চতর গ্রেডে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশী চাপ ও তাপে বায়োটাইট [$H_2K(Mg, Fe)_3Al(SiO_4)_3$—কালো অভ্র] দেখা যায়। এই গ্রেডের নাম বায়োটাইট গ্রেড। এরপর আসে গারনেট [$(Ca, Mg, Fe, Mn)_3(Al, Fe, Cr, Ti)_2(SiO_4)_3$] ও ক্যায়ানাইট [$Al_2SiO_5$] এবং তারপর সিলিমেনাইট [$Al_2SiO_5$] গ্রেড। কিন্তু এই সমস্ত খনিজগুলির উপাদানের অভাব থাকলে এই উপায়ে গ্রেড নির্ধারণ সম্ভব নয়। উচ্চতর গ্রেডে সাধারণতঃ নিম্নতর গ্রেড নির্দেশক খনিজগুলি বর্তমান থাকে; তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগতে পারে, তা হলো এই যে, উচ্চ চাপ ও তাপ ধীরে ধীরে কমে গিয়ে যখন সাধারণ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন উচ্চচাপ ও তাপ নির্দেশক খনিজগুলি নিম্নচাপ ও তাপ নির্দেশক খনিজে পরিবর্তিত হয় কি? কোন কোন ক্ষেত্রে তাও দেখা যায় এবং তাকে বলা হয় অনুবর্তী রূপান্তর (Retrograde metamorphism)। তবে ভূতাত্ত্বিকেরা এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এখনও করতে পারেন নি। এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে, নিকট ভবিষ্যতে একটা সদুত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে শিলাচ্ছেদে (Thin section যেটা মাত্র ০.০৩ মি. মি. পুরু) যদি গারনেট, ক্লোরাইট ও বায়োটাইট পাওয়া যায়, তাহলে স্পষ্টতঃই বোঝা যাবে যে, শিলাটি গারনেট গ্রেড থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যে স্থান থেকে ঐ

শিলাটি সংগৃহীত, সে স্থানটি নিশ্চয়ই গারনেট গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত।

গারনেট গ্রেডের পরবর্তী সমস্ত উচ্চতর গ্রেডেই গারনেট বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে। কিন্তু গ্রেড পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গারনেটের উপাদানগত পরিবর্তনও লক্ষণীয়।

ক্ষুদ্রতর আয়নিক ব্যাসার্ধসম্পন্ন আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

Ca^{++}—এর আয়নিক ব্যাসার্ধ—1·06Å
Mn^{++}— „ „ „ —0·91Å
Fe^{++}— „ „ „ —0·83Å
Mg^{++}— „ „ „ —0·76Å
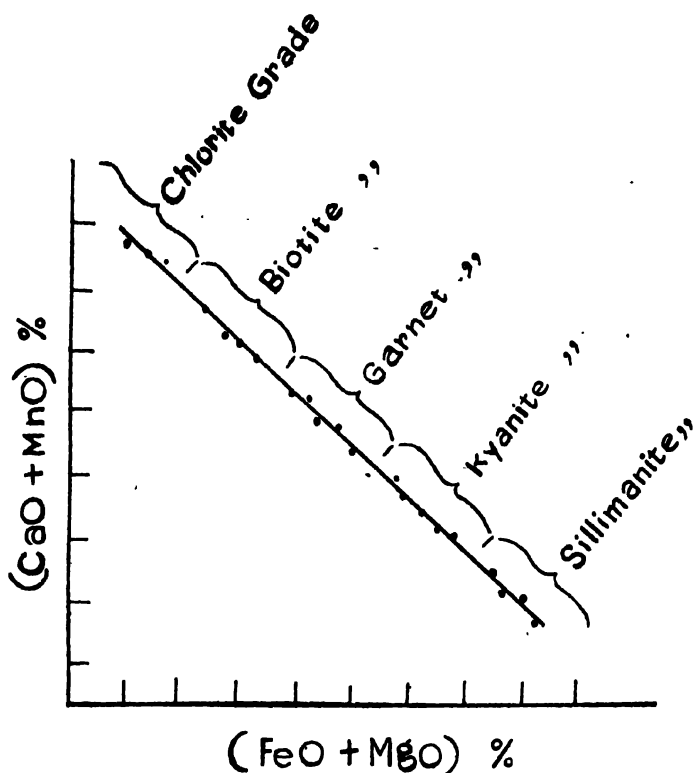
১নং চিত্র

চাপ ও তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, গারনেটে Ca^{++} ও Mn^{++} আয়নের পরিমাণ কমে আসে, Fe^{++} ও Mg^{++} তাদের স্থান পূরণ করে। লা স্যাটেলিয়ারের (La Chatelier's) রাসায়নিক সাম্য-সূত্র (Principle of chemical equilibrium) অনুযায়ী অধিক চাপে গারনেটের আণবিক আয়তন হ্রাস পায়। তার পরে যে আয়নের ব্যাসার্ধ বেশী, তারা ধীরে ধীরে

যেখানে $1Å = 10^{-8}$Cm.

ফলতঃ যতই উচ্চতর গ্রেডে যাওয়া যায়, ততই CaO ও MnO-এর মোট পরিমাণ কমে ও তার পরিবর্তে FeO ও MgO-এর মোট পরিমাণ বাড়ে। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং গারনেটের রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর মোট FeO ও MgO এবং CaO ও MnO-

এর পরিমাণ দেখেই ১নং লেখচিত্রের সাহায্যে গ্রেড নিরূপণ সহজেই সম্ভব।

প্রথম লেখচিত্র থেকেই বোঝা যায় যে, CaO+MnO ও FeO+MgO-এর অনুপাতকে গ্রেড নির্দেশক একটি সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে (CaO+MnO)/(FeO+MgO)—এই অনুপাতের সঙ্গে গারনেটের আণবিক আয়তনের লেখ অঙ্কন করা হয়েছে। এই লেখচিত্রেও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, যতই রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে আণবিক আয়তন নিরূপণ করে গ্রেড নির্ণয় করা যেতে পারে বা শিলাচ্ছেদে (Thin section of rock) উল্লিখিত খনিজগুলির উপস্থিতি থেকেও গ্রেড নির্ণয় করা চলে।

চাপ ও তাপের ক্রমিক পরিবর্তন অনুযায়ী নিম্নতম গ্রেড হলো—ক্লোরাইট গ্রেড, তারপর বায়োটাইট গ্রেড, তারপর যথাক্রমে গারনেট, ক্যায়ানাইট ও সর্বোচ্চ গ্রেড হলো সিলিমেনাইট
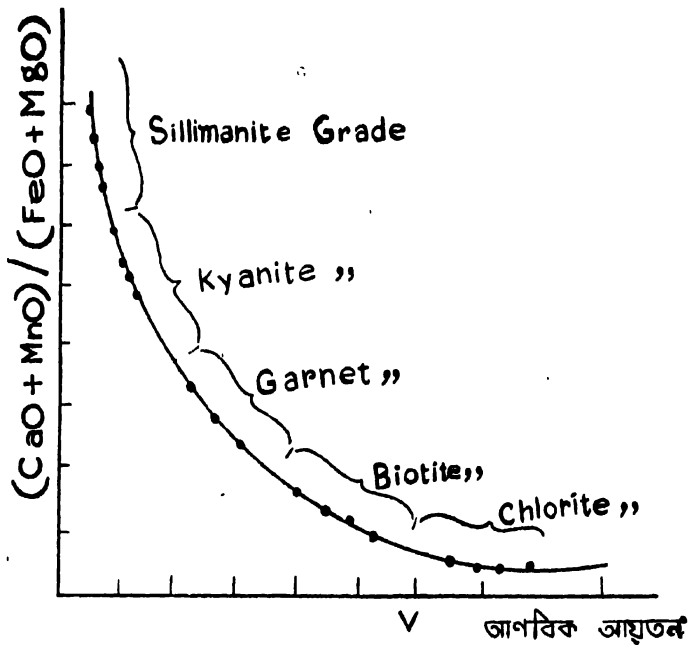
২নং চিত্র

উচ্চতর গ্রেডে যাওয়া যায়, ততই আণবিক আয়তন কমে। সুতরাং এখানে কেবলমাত্র গারনেটের আণবিক আয়তন থেকেই রূপান্তরের গ্রেড নিরূপণ সম্ভব।

সিলিমেনাইট ও ক্যায়ানাইট গ্রেডের জন্ম আরও উচ্চ চাপ ও তাপে। সেখানেও গারনেটের গ্রেড।

এইভাবে ভূত্বকে চাপ ও তাপের স্থানীয় পরিবর্তনের নজীর হিসাবে গ্রেড নির্দেশক খনিজগুলিকে বা গারনেটের রাসায়নিক উপাদানকে ব্যবহার করে মোটামুটিভাবে সুদূর অতীতে কোথায় কেমন চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বলা যায়।

সঞ্চয়ন

মানুষের মহাকাশ-যাত্রার ইতিকথা

মানুষ এমন এক গতিশীল সভ্যতার যুগে বাস করছে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিজ্ঞান পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জীবনযাত্রার মান, জাতির প্রতিরক্ষা এবং মর্যাদার দিক থেকেও এর মূল্য অনস্বীকার্য।

১৯৫৭ সালে রাশিয়া প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করলো। তখন এক বছর পরে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সৃষ্টি করলো।

সে সময়ে রুশ রকেটগুলি অনেক উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল। এই রকেটগুলি যত বেশী ওজনের ধাক্কা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, মার্কিন রকেটগুলি ততটা পারে নি। রাশিয়া তখন একটি কুকুরকে কক্ষপথে প্রেরণ করেছিল। এথেকে বোঝা গেল, স্পুটনিক উৎক্ষেপণের বহু আগে থেকেই রাশিয়া মহাকাশে মানুষ প্রেরণের ব্যাপারে আগ্রহশীল। রাশিয়া কুকুরটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় এটুকু বোঝা গেল যে, তাদের রকেটের শক্তি বেশী হলেও কারিগরি দিক থেকে কতকগুলি সমস্যার মীমাংসা তখনও তারা করতে পারে নি।

আজ রকেটের উন্নতির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দান খুবই উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্যাটার্ন রকেট পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী কৃত্রিম উপগ্রহকে আজ অনেক দূরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। 'প্রোজেক্ট মার্কারী' খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। যে ৬ জন মহাকাশচারীকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের সকলকেই নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

১৯৬১ সালের মে মাসে অ্যালান শেপার্ডের মহাকাশ পরিক্রমার পর যুক্তরাষ্ট্র চন্দ্রাভিযান জাতীয় লক্ষ্য বলে স্থির করলেন। চন্দ্রলোকে যাত্রা করতে হলে যে গতিবেগ প্রয়োজন হয়—যতখানি সময় মহাকাশে থাকতে হয়, তখনও পর্যন্ত তা চিন্তার অতীত ছিল। আবহমণ্ডলের সাহায্য ছাড়াই রকেটের সাহায্যে মহাকাশযানকে চাঁদে নামিয়ে দেবার কৌশলও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মহাকাশ-যাত্রার স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পরিণতি চন্দ্রাবতরণ।

মহাকাশে মানুষ প্রেরণের পরিকল্পনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে চূড়ান্ত 'প্রোজেক্ট মার্কারী' কর্মসূচী, অর্থাৎ গর্ডন কুপারের মহাকাশ ভ্রমণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে জেমিনি পরিকল্পনা, অর্থাৎ দু'জন মহাকাশচারীকে মহাকাশে প্রেরণ এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রোজেক্ট অ্যাপোলো, অর্থাৎ তিনজন মহাকাশচারীকে প্রেরণ।

কুপারের মহাকাশ-যাত্রার কক্ষপথ আশানুরূপ নিখুঁত ছিল। কুপার এমন সঠিক সময়ে রকেটে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন যে, তাঁর মহাকাশযানটি প্রশান্ত মহাসাগরে উদ্ধারকারী জাহাজের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবতরণ করেছিল।

দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ পরিক্রমায় মানুষ যে সক্ষম, ২২ বার কক্ষ পরিক্রমায় কুপার তার প্রমাণ দিলেন। কুপার ও তাঁর পূর্ববর্তী মহাকাশচারীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল যে, আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে মহাকাশচারী ১০০ মাইল উঁচু থেকেও ট্রেণ, ঘরবাড়ী, জাহাজের মাস্তুল ও অন্যান্য বস্তু চিনতে পারে।

জেমিনি মহাকাশযানযোগে পরিক্রমা মার্কিন মহাকাশ-সন্ধান পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়। এই

পরিকল্পনার দুটি প্রাথমিক লক্ষ্য হলো মহাকাশচারীরা যাতে অন্ততঃ দু' সপ্তাহ মহাকাশে কক্ষ পরিক্রমা করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা এবং মহাকাশে মিলনের কৌশল আবিষ্কার করা।

দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার পর, ঘুম ভেঙে উঠলে অবস্থা যেমন হয়, দেড় দিন কক্ষ পরিক্রমার পর প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে কুপার যখন উদ্ধারকারী জাহাজের ডেকের উপর উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর অবস্থাও প্রায় সেরূপ হয়েছিল—তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। দীর্ঘতর সময় কক্ষপথে থাকবার পর জেমিনির মহাকাশচারীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখা একটা উদ্দেশ্য ছিল।

মহাকাশে মিলন প্রসঙ্গে বলা যায়, নিজেদের মহাকাশযানযোগে ইতিপূর্বে কক্ষপথে প্রেরিত এজিনা রকেটের সঙ্গে মিলিত হবার কৌশল মহাকাশচারীরা অভ্যাস করবেন। আমেরিকার কর্মসূচীর তৃতীয় পর্যায়ে অ্যাপোলোযোগে চাঁদে অবতরণের প্রস্তুতি হবে এর মধ্য দিয়ে।

উন্নততর স্যাটার্ণ রকেটের প্রয়োজন হবে চাঁদে অবতরণের জন্যে। বর্তমানে যে স্যাটার্ণ রকেট ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের মত ধাক্কা সৃষ্টি করে। উন্নততর স্যাটার্ণ এর পাঁচ গুণ বেশী ধাক্কা সৃষ্টি করবে।

চন্দ্রাভিযানে কিভাবে অ্যাপোলোযান কাজ করবে, তার একটা মোটামুটি আভাস এখানে দেওয়া গেল।

অ্যাপোলো মহাকাশযানটি উন্নত স্যাটার্ণের মাথায় লাগানো আছে। অ্যাপোলোতে থাকবেন তিনজন মহাকাশচারী। অ্যাপোলো ও স্যাটার্ণের সম্মিলিত উচ্চতা ৩৬০ ফুট এবং ওজন ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর কক্ষের অর্ধপথে এসে প্রথম পর্যায়ের রকেটটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ১০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের মত ধাক্কা দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটি মহাকাশযানটিকে পৃথিবীর কক্ষের আরও কাছে নিয়ে গিয়ে পড়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি ২ লক্ষ পাউণ্ডের ধাক্কা দিয়ে অ্যাপোলোকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে। তারপর রকেটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়।

এই তথাকথিত "পার্কিং কক্ষপথে" এসে মহাকাশযানটি লক্ষ্যস্থল অভিমুখী হয় এবং উপযুক্ত মুহূর্তে তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি আবার চালু হয়। এইবার অ্যাপোলোর চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা সুরু হয়। এইখানে তৃতীয় রকেটটি বিচ্ছিন্ন হয়।

অ্যাপোলো তিনটি বিভাগে বিভক্ত:—মেরামতি বিভাগ, নির্দেশদানের বিভাগ এবং অবতরণ বিভাগ। অ্যাপোলো যখন চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, মেরামতি বিভাগের রকেটটিতে তখন অগ্নিসংযোগ করে দিক সংক্রান্ত ছোটখাটো সংশোধন করা হয়। রকেটটির গতি তখন কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে এটি চাঁদের কক্ষপথে স্থাপিত হতে পারে।

মহাকাশচারীদের মধ্যে দু'জন নির্দেশ দান বিভাগ ত্যাগ করে একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অবতরণ বিভাগে আসে। অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট যানটি তখন অ্যাপোলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ক্রমে নামতে থাকে। চাঁদের বায়ুশূন্য পৃষ্ঠদেশের যত কাছে আসতে থাকে, ততই এর গতি হ্রাস করবার জন্যে ক্রমাগত রকেটে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। তারপর খুব ধীর গতিতে চাঁদে নামে। মহাকাশচারীরা তখন মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আসে।

কাজ শেষ হলে মহাকাশচারীদ্বয় ফিরে এসে অবতরণ বিভাগটিকে চালু করে। তাঁদের তখন লক্ষ্য অ্যাপোলোর অন্য বিভাগগুলির কাছে যাওয়া। এগুলি তখনও তৃতীয় মহাকাশচারীকে নিয়ে কক্ষপথে রয়েছে। ইতিপূর্বে জেমিনির ভ্রমণকালে উদ্ভাবিত কৌশলের সাহায্যে তাঁরা নির্দেশদানের

বিভাগে মিলিত হয় এবং সুড়ঙ্গ-পথে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়।

অবতরণ বিভাগটি অতঃপর পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয় এবং খালি অবস্থায় তা কক্ষপথে থেকে যায়। মেরামতি বিভাগটিকে তখন চালু করা হয় এবং তা পৃথিবীমুখী হয়। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশের অল্পক্ষণ পূর্বে মেরামতি বিভাগটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ঘণ্টাকৃতির নির্দেশ দানের বিভাগটি ধীরে ধীরে আবহমণ্ডলে প্রবেশ করতে থাকে। শেষ পর্যায়ে তিনটি প্যারাস্যুটের সাহায্যে সে পৃথিবীপৃষ্ঠ স্পর্শ করে।

মানুষের মহাকাশ-বিচরণ মূলতঃ আবিষ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শুধু মহাকাশ-সন্ধান বা চন্দ্রাবিষ্কার নয়—এর ফলে রকেটের শক্তি, ইলেকট্রনিক্স, পদার্থ-বিজ্ঞান ও বিমান চলাচল সম্পর্কিত অজস্র অজ্ঞাত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের অবদান

সকলের কাছে পুসা ইনষ্টিটিউট নামে যার পরিচয়, তার বর্তমান নাম ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার। এদেশে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই গবেষণাগারের সফল প্রয়াসের ষাট বছর পূর্ণ হওয়ায় গত মার্চ মাসে তার হীরক জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। ১৯০৫ সালে উত্তর বিহারের পুসা গ্রামে মাত্র কয়েকজন গবেষণা-কর্মী নিয়ে সামান্যভাবে এই গবেষণাগারের কাজ সুরু হয়। আজ এটি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন গবেষণাগার। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। এই প্রতিষ্ঠানই ভারতে কৃষি গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। অতীতে কৃষির উন্নয়নে তার অপরিমিত অবদানের জন্যে সে যথার্থই গর্ব বোধ করতে পারে। তার এই সার্থক প্রয়াসের সাহসের উপর ভর করেই সে ভবিষ্যতের সুবর্ণ যুগের দিকে অগ্রসর হবে।

এদেশে কৃষি-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি বিভাগ স্থাপনের সুপারিশ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই সুপারিশ রূপায়ণের চেষ্টায় একটি রাজকীয় কৃষি বিভাগ খোলা হয়। এই চেষ্টার মধ্যেই ছিল ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার গঠনের সূচনা। শিকাগো সহরের মিঃ হেনরী ফিপ্স নামক জনৈক মার্কিন মানব-প্রেমিকের বদান্যতার ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এটিই ভারতের প্রথম কৃষি গবেষণা সংস্থা।

স্বাধীনতা লাভের পর এই গবেষণাগারের গবেষণার কাজকর্ম ও বৈজ্ঞানিক কর্মীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। প্রথমে এই গবেষণাগারের পাঁচটি বিভাগ ছিল, এখন আছে তেরোটি। এই তেরোটি বিভাগে প্রায় ১০০ জন বিজ্ঞানী কৃষি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা ও আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণার জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি উপকেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে।

সর্বাধুনিক সরঞ্জাম ও সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কর্মী সমন্বিত এই গবেষণাগারে গবেষণার যেমন সুবিধা আছে, তেমন সুবিধা এদেশের অন্য কোথাও নেই। এর গ্রন্থাগার ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষি গ্রন্থাগার। এখানে প্রায় দুই লক্ষ গ্রন্থ আছে। প্রতি বছর যে সব সাময়িক পত্র পাওয়া যায়, সেগুলির সংখ্যা প্রায় এক হাজার। শস্য ফলনের গাছগুলিতে বংশানুক্রমিক ধারার পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে যেমন এখানে গামা গার্ডেন রয়েছে, তেমনি রেডিও-আইসোটোপের সাহায্যে উদ্ভিদের পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণার আধুনিক ব্যবস্থাও আছে।

এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ২২ হাজারের বেশী নমুনা কীট আছে। আর আছে ৫ হাজার জাতের ২১ হাজার নমুনার ছত্রাক। এইগুলি নিয়ে উদ্ভিদের রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের গবেষণা চলে। কীট ও ছত্রাকের এত বেশী নমুনার সংগ্রহ বিশ্বের খুব কম জায়গাতেই আছে।

এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গবেষণা-সূচী ছাড়াও বিভিন্ন কৃষি প্রতিষ্ঠান, কৃষি শিক্ষালয়, রাজ্য কৃষি বিভাগ এবং রকফেলার ফাউণ্ডেশন, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, ভারত-মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা মিশন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় নানা রকমের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব কারণে ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

প্রথম যুগে কয়েক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এখানে অগ্রণী হিসাবে কৃষি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। এখানে অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড ও তাঁর পত্নী গ্যাব্রিয়েল কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গম এদেশে ও বিদেশে 'পুসা গম' নামে খ্যাত। ছত্রাক ও তজ্জনিত রোগের ক্ষেত্রে ই. জে. বাটলার এবং পোকামাকড়ের শ্রেণীবিভাগ ও সেগুলি বিনাশের ক্ষেত্রে ই. ম্যাক্সওয়েল লেফ্রয় ও টি. বি. ফ্ল্যাচারের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষি-রসায়নের ক্ষেত্রে জে. ডব্লিউ. লেদারের খ্যাতিও কম নয়। যে কোয়েম্বাটুর জাতের আখ ভারতের চিনি-শিল্পে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তা টি. এস. ভেঙ্কটরমন উদ্ভাবন করেন। ভার্জিনিয়া তামাক চাষের গবেষণার ফলে বর্তমান যুগের তামাক-শিল্পের উন্নয়নের পথ সহজ হয়। এদেশে বর্তমানে সাহিয়াল জাতের গাভী সবচেয়ে বেশী দুধ দেয়। এই জাতের গাভীর প্রজনন কৃষি গবেষণাগারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের গবেষণার ঐতিহ্য উজ্জ্বল। ১৯৩৪ সালে বিহারের মারাত্মক ভূমিকম্পের পর ১৯৩৬ সালে গবেষণাগারটি নয়া-দিল্লীতে সরিয়ে আনা হয়। সেই সময় থেকে এখানে অনেক নতুন নতুন বিস্ময়কর গবেষণার কাজ চলেছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন এন. পি. গম। এন. পি. ১০০ ও এন. পি. ৮০০—এই জাতীয় গম প্রতি একর জমিতে ৪০ মণ করে উৎপন্ন হয় এবং এগুলি শস্য রোগ-প্রতিরোধক। তারপর মেক্সিকোর গম থেকে আর এক রকমের গম উদ্ভাবন করা হয়েছে।

যোয়ার, বাজরা ও রেড়ীর ক্ষেত্রে গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। বসন্ত কাল থেকে গ্রীষ্ম কালের মধ্যে এবং বর্ষাকালে উৎপাদনের জন্যে এক ধরণের রেড়ী উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

সঙ্কর শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে এই গবেষণাগার অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। গবেষকেরা আট রকম সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদন করেছেন। যেখানে স্থানীয় জাতের ভুট্টা প্রতি একর জমিতে ১২ থেকে ১৪ মণ উৎপন্ন হয়, সেখানে সঙ্কর ভুট্টা উৎপন্ন হয় ১৫ থেকে ৯৫ মণ।

বর্তমান বছরের প্রথম ভাগে প্রথম সঙ্কর বাজরা উদ্ভাবন করা হয়। এই সঙ্কর বাজরায় এদেশের শ্রেষ্ঠ বাজরার তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বেশী ফসল ও শতকরা ৩০ ভাগ বেশী গবাদির খাদ্য পাওয়া যায়। এইরূপ বাজরা রোগ-প্রতিরোধক এবং বিভিন্ন রকম জলবায়ুতে উৎপাদন করা চলে। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুর পর্যন্ত সকল স্থানে এই বাজরার চাষ হয়।

মানুষের ব্যবহার্য খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে দুই রকম পশুখাদ্যও উৎপাদন করা হয়েছে। একটি হলো নেপিয়ার ঘাস—এই ঘাস এত বেশী জন্মে যে, সেরূপ আর অন্য কোন দেশে জন্মে না। এই ঘাস থেকে প্রতি বছর দুই লক্ষ

পাউণ্ড সবুজ পশু-খাদ্য পাওয়া যায়। এই ঘাসে প্রোটিন ও চিনির ভাগ বেশী। এই ঘাস গবাদি পশুর প্রিয়। আর এক রকম পশু-খাদ্য হলো বেরসীম। বর্তমানে যে ধরণের বেরসীমের আবাদ হয়, তার তুলনায় শতকরা ২০-৩০ ভাগ বেশী পশু-খাদ্য নতুন জাতের বেরসীম থেকে পাওয়া যায়।

কৃষি গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকগণ নিখুঁত চারা পাবার জন্যে বিশ্বের সকল স্থানের শস্য ব্যবহার করেন। কেনিয়া ও মেক্সিকোর গম, অষ্ট্রেলিয়ার তিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ফিলিপাইনের সব্জি ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে অষ্ট্রেলিয়ার রিডলে জাতের গম হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে খুব বেশী উৎপাদিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার কেন্ট জাতের ওট প্রাতঃকালীন খাদ্য হিসাবে সমাদৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিওক্স জাতের টমেটো, আর্লিব্যাজার জাতের মটরশুঁটি, ফিলিপাইনের পুষাবর্ষাতি জাতের মটরশুঁটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার মিগেট জাতের এবং জাপানের আসাহি ইয়ামাতো জাতের তরমুজের চাষ এদেশে আরম্ভ করা হয়েছে।

কৃষি গবেষণায় পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের জন্যে ১৯৫৫ সালে রেডিও ট্রেসার গবেষণাগার ও ১৯৬৩ সালে গামা গার্ডেন স্থাপন কৃষি গবেষণাগারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক নতুন ধরণের (এন. পি. ৮৩৬) গম উদ্ভাবন করা গেছে। এর শীষে খুব বেশী শোঁয়া থাকে বলে পাখীরা নষ্ট করতে পারে না এবং সেই কারণে উৎপাদন শতকরা দশভাগ বেশী হয়। এক প্রকার কার্পাস উৎপাদন করা হয়েছে, যার পাতায় খুব শোঁয়া থাকায় জসিদ পোকা আক্রমণ করতে পারে না। এক ধরণের টমেটো উৎপন্ন করা গেছে, যার উপরিভাগের সবটা এক রকমের লাল। এসবই রেডিয়েশন ব্যবহারের ফল। রেডিও-আইসোটোপ ট্রেসার ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সার প্রয়োগও সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার ফলে উন্নত জাতের টমেটো, বেগুন, গোলআলু, লাউ, মটরশুঁটি, মিষ্টি আলু ও ভেণ্ডি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতার দিক দিয়েও যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত বীজহীন আঙুরের চাষ দিল্লীতে ও দিল্লীর চারদিকে সুরু হয়েছে। এইভাবে ৬৫টি জাতের ২১ রকমের সব্জি কৃষকদিগকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এই গবেষণাগার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও ফলের মড়ক ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের নানা ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। খাদ্য ও ফল সংরক্ষণের সহজ ও ফলদায়ক পন্থা উদ্ভাবন এই গবেষণাগারের অন্যতম বিশিষ্ট কৃতিত্ব। নিমবীজ-ভিজানো জল ছিটিয়ে পঙ্গপালের আক্রমণ নিবারণ করবার উপায়ও এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবন করেছেন।

ভারতে বিশ কোটি মেট্রিক টনের বেশী গোময় জ্বালানী হিসাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়—ফলে বহু পরিমাণ সার নষ্ট হয়। কৃষি গবেষণাগার যে গ্যাস যন্ত্র নির্মাণ করেছেন, তার সাহায্যে গোময়কে জ্বালানী ও উৎকৃষ্ট সার—উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা সম্ভব।

সুশিক্ষিত. কারিগরি কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে ১৯৫৮ সালে গবেষণাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। সেখানে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। এপর্যন্ত পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এখান থেকে এম. এস-সি বা পি-এইচ ডি. উপাধি লাভ করেছেন। এখানে এখন চার শতাধিক ছাত্র শিক্ষারত আছেন। শুধু উন্নতিশীল দেশ নয়, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকেও ছাত্রগণ

এখানে কৃষি শিক্ষার জন্যে আসেন। এটি এখানকার শিক্ষার উন্নত মানের অন্যতম প্রমাণ।

এই গবেষণাগার ১৯৪৯ সাল থেকে দিল্লীর চারদিকের কয়েকটি গ্রামে ব্যাপক আবাদ পরিকল্পনা রূপায়িত করছেন। গবেষণাগারে সার্থক প্রচেষ্টার ফল যাতে কৃষকেরা লাভ করেন, সে জন্যে পল্লী অঞ্চলে উন্নত চাষ-আবাদ পদ্ধতি গাছ-পালা সংরক্ষণের উপায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র একটা গ্রামকে "বীজ গ্রাম" হিসাবে গঠন করা হচ্ছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন করা যেতে পারে। কারণ উৎকৃষ্ট চাষ-আবাদের প্রধান অসুবিধা হলো উত্তম বীজের অভাব।

ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মিটান কঠিন সমস্যা। সেই কারণে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যে ভারতে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সুরু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। গত ষাট বছরে গবেষণাগারের কর্মীরা কৃষি-বিজ্ঞানে যে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, ভবিষ্যতেও তাঁরা তেমনি ভারতের কৃষকদের পথ প্রদর্শন করবেন বলে আশা করা যায়।

সমুদ্র-পথে গ্যাস

জন ওয়ালপোল এই সম্বন্ধে লিখেছেন—আজকাল অনেক দেশেই প্রাকৃতিক গ্যাসের (মিথেন) সন্ধান করা হচ্ছে। মাটি বা সমুদ্রের নীচে বিপুল পরিমাণ গ্যাসের সন্ধান যদি একবার পাওয়া যায়, তাহলে যে দেশে এই গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, কেবল সেই দেশ নয়, হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য সব দেশও লাভবান হতে পারে। অবশ্য এই গ্যাস ধরবার জন্যে এবং তা সমুদ্র পার করে বিদেশে চালান দেবার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর কারিগরি-দক্ষতা।

সাহারা অঞ্চলের হাসি এর আর'মেল-এর (Hassi E R'Mel) গ্যাস ক্ষেত্রটি, যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হিসাবে গণ্য, উত্তর অফ্রিকার উপকূল থেকে প্রায় ২৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মাটির নীচ থেকে উপরে গ্যাস তুলে আনবার জন্যে ৭,০০০ ফুট পর্যন্ত গভীরে কূপ খনন করা হয়েছে। তারপর গ্যাসের দীর্ঘ যাত্রা সুরু হয়েছে। প্রথমেই পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে তা পাম্প করে পাঠানো হয়েছে আলজেরিয়ার সমুদ্র উপকূল—পোর্ট আরজুতে।

এইখানে প্রাকৃতিক গ্যাসকে রূপান্তরিত করা হয় তরল পদার্থে। একটি জমাটকরণ যন্ত্র এই গ্যাসকে মাইনাস ২৫৮° ফারেনহাইট তাপে (মাইনাস ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) নামিয়ে আনে। গ্যাসকে এই রকম নিম্ন তাপেই রাখতে হয়, জাহাজে করে বাইরে পাঠাবার জন্যে।

দু'টি বিশেষ ধরণের ট্যাঙ্কারে—'মিথেন প্রিন্সেস ও মিথেন প্রোগ্রেস গ্যাস এরপর বৃটেনে বাহিত হয়। প্রতি তৈলবাহী জাহাজে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় পাত্রে বাহিত হয় ১২,০ টন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস। পাত্রগুলি এক হিসাবে অতিকায় বায়ুশূন্য ফ্লাস্কের কাজ করে। শাট্‌ল্ ককের মত এগুলি যাতায়াত করে—সাড়ে পাঁচ দিনে একটি করে।

তরল ঠাণ্ডা গ্যাস, মূল গ্যাসের জন্যে যে জায়গার প্রয়োজন হয়, তার ৬০০ ভাগের এক ভাগ জায়গা নিয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি ট্যাঙ্কার বহন করতে পারে—৬০০ ট্যাঙ্কারে যে পরিমাণ মাটি থেকে সদ্য সংগৃহীত গ্যাস বাহিত হতে পারে—তার সমপরিমাণ গ্যাস।

ট্যাঙ্কারগুলি সমুদ্র পার হয়ে এই গ্যাস ডেলিভারি দেয় টেম্‌স্ নদীর মোহনায় ক্যানভে দ্বীপে অবস্থিত বৃটিশ গ্যাস কাউন্সিলের জেটিতে।

এখানে তরল গ্যাস পাম্প করে তীরে তোলা হয়, তারপর ইভাপরেটরের সাহায্য নিয়ে বাড়ি এবং শ্রমশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী সাধারণ গ্যাসে পরিণত করা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা কমার্শিয়াল গ্যাসের চেয়ে অনেক গুণ বেশী হওয়ায় সাধারণ গ্যাসের সঙ্গে মেশাবার আগে প্রাকৃতিক গ্যাসকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে বিভিন্ন গ্যাস বোর্ডকে সরবরাহ করা হয়।

গ্যাস পরিবহণের জন্যে ধাতব পাত্র ছাড়াও মিথেন জাহাজ দুটিতে আছে গ্যাস বয়েল অফ্ (Boil off) করবার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

যে গ্যাস এই ভাবে বয়েল অফ্ করা হয়, তা হলো অ্যালুমিনিয়াম পাত্র থেকে বেরিয়ে-আসা গ্যাস। এর পরিমাণ খুবই সামান্য, মোট বাহিত তরল গ্যাসের এক শতাংশেরও অনেক কম। এই বয়েল অফ্-এর দরুণ লাভ হয় জাহাজের জন্যে অতিরিক্ত শক্তির মূল্যবান উৎস।

স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবার জন্যে এখন কোন রকম বিপদ ছাড়াই সম্ভব হচ্ছে গ্যাসকে বিশেষ বার্ণারে স্থানান্তরিত করা। এই বার্ণার-গুলিকে যুগপৎ মূল ইন্ধন তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মিত করা হয়েছে।

যদি কোন কারণে অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করা হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত গ্যাস বাতাসে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় গ্যাসের প্রবাহ বাধামুক্ত থাকতে পারে এবং বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনাও দূর হয়।

এই দ্বৈত ইন্ধন ব্যবস্থাটির ডিজাইনকারক হলেন লণ্ডনের একটি ফার্ম। এই ব্যবস্থার ফলে বার্ণার ব্যবহার করতে পারে প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক ৭৪০ পাউণ্ড গ্যাস।

বিস্মৃত নীরব অতীত

শিবদাস ঘোষ

আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্পরীতি ইত্যাদির ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনেকেরই কিছু না কিছু ধারণা আছে। কিন্তু আজ থেকে বহুদিন আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ধাতুবিদ্যা, খনিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী ছিলেন, একথা হয়তো অনেকেরই তত ভাল করে জানা নেই।

আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায়, যেমন—বিহারের সিংভূমে, অন্ধ্রের অগ্নিগুণ্ডলাতে, রাজস্থানের ক্ষেত্রীতে এবং জাওয়ারে এখনও বহু পুরনো খনির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বহু জায়গাতে এই রকম পুরনো খনি আছে এবং এরকম কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে ঐ পুরনো কাজের খেই ধরে আজও কাজ চলছে, যেমন—স্পেনের রাইয়োটিন্টো খনি। ভারতবর্ষেও এমনি খনি আছে, যেমন—কোলার, ক্ষেত্রী, জাওয়ার। কোলারে পাওয়া যায় সোনা ক্ষেত্রীতে তামা এবং জাওয়ারে সীসা, দস্তা আর রূপা।

এই জাওয়ার খনি হলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উদয়পুরের মাইল পঁচিশ দূরে। প্রায় পঁচিশ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে একটা বিশেষ ধরণের পাথর যাকে ভূবিদ্‌রা বলে থাকেন ডলোমাইট। সেট ছড়ানো রয়েছে আর তার মধ্যেই রয়েছে এই মূল্যবান অতি প্রয়োজনীয় ধাতুগুলি। প্রসঙ্গতঃ

একথা বলা যেতে পারে যে, জাওয়ারই ভারতের একমাত্র সীসা ও দস্তার খনি।

এবারে আমাদের সেই পুরনো খনির কথায় ফিরে আসা যাক। গোটা এলাকাটা জুড়ে অনেক লম্বা আর উঁচু কতকগুলি পাহাড় রয়েছে। ওদেশের লোকেরা একে বলে মগ্‌রা, যেমন—মোচিয়া মগ্‌রা, বারোই মগ্‌রা ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনও কোনও পাহাড় ৫৫০ ফুট উঁচু। এখন যেখানে খনির কাজ চলছে, তার নাম মোচিয়া মগ্‌রা প্রায় —২½ মাইল লম্বা আর ৫৫০ ফুট উঁচু। গোটা পাহাড়টাই পুরনো খাদে ভর্তি, সবচেয়ে বড়টা প্রায় হাজার ফুটের বেশী লম্বা আর ৮০ থেকে ১০০ ফুট চওড়া। প্রাচীন খনিকারেরা প্রায় সব জায়গাতেই পাহাড়ের চূড়া থেকে কাজ স্থুরু করতো। তারপর যতদূর পর্যন্ত নীচে নামা যায়, ততদূরে কাজ করতো। খনি যতই গভীর হয় ততই নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন —জলের সমস্যা, হাওয়ার অসুবিধা আর সবচেয়ে বড় কথা—মানুষ আর মালের ওঠা-নামার বিপদ। এসব পাহাড়ের যে সব পুরনো খাদ রয়েছে, তাদের অনেকগুলিতেই এমন সব ব্যবস্থা আছে, যা দেখে আজকের আধুনিক ইঞ্জিনীয়ার-দেরও প্রশংসা না করে উপায় নেই। তখনকার দিনে স্যাফ্‌ট্ অর্থাৎ মাটির নীচে ওঠা-নামার জন্যে খাঁচা ছিল না—সে জন্যে তারা পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মত করে নিত, যাতে অনায়াসেই নীচে নামা যায়।

তখনকার দিনের লোকেরা যে বিভিন্ন পাথরের তফাৎ জানতো আর আকরগুলিকেও চিনতো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। যে ধাতুগুলির জন্যে জাওয়ার প্রসিদ্ধ—পাহাড়ের উপর পাথরের গায়ে তার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। হয়তো সামান্য কোনও চিহ্ন দেখে মাটির নীচে এই সব ধাতুর অস্তিত্বের বিষয় তারা অনুমান করেছিল। তখনকার দিনে যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই যে কি করে তারা মাটির নীচে ৩০০-৩৫০ ফুট—এমন কি, কোন কোনও জায়গায় ৫০০ ফুট পর্যন্ত কাজ করেছিল—এটা ভাবলে তাদের খনি-বিদ্যায় কতটা দখল ছিল, সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাওয়ারে যে পাথরের ভিতর ধাতু পাওয়া যায়, সেটা বেজায় শক্ত—আধুনিক কালের নানারকম বিস্ফোরক দ্রব্য তখনকার দিনে না পাওয়া সত্ত্বেও তারা ৫৫০ ফুট পর্যন্ত মাটির নীচে কিভাবে কাজ করেছিল—এই সমস্যার আজও সমাধান হয় নি। অনেকে অনুমান করেন যে, তখন ক্রীতদাসদের এই সব পরিশ্রমের কাজে লাগানো হতো। অবশ্য ক্রীতদাসপ্রথা তখনকার দিনে প্রচলিত থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এখন যেখানে জাওয়ার খনির কাজ হচ্ছে, সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে হচ্ছে প্রাচীন জাওয়ার। জায়গাটায় রয়েছে বিখ্যাত পাহাড় জাওয়ার মালা আর বারোই মগ্‌রা। এই শেষের পাহাড়ের একটা পুরনো খাদে মহারাণা প্রতাপ সিংহ মোগল সেনার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ বিরাট খাদটার মধ্যে ছোটখাটো দরবার বসাবার মত চত্বর পর্যন্ত আছে। জাওয়ার মালা পাহাড়ে অজস্র পুরনো খাদ রয়েছে। এছাড়াও তারা যে আকরকে গলিয়ে ধাতুটাকে বের করে শুধু সেটাকেই নীচে পাঠাতো—তারও যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

আকর থেকে ধাতু বের করে নেবার পর যা পড়ে থাকে, তাকে ইংরেজীতে বলে স্ল্যাগ। জাওয়ারের চার পাশে এই স্ল্যাগের অজস্র ঢিপি রয়েছে। এটা যে এককালে একটা বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী জায়গা ছিল, সেটা এখানকার অগুণ্‌তি মন্দির, ঘরবাড়ী, ঘন্টাঘর প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখলে অনুমান করা যায়। মন্দিরগুলিতে বুদ্ধদেব, পার্শ্বনাথ এবং শিব প্রভৃতি সবারই মূর্তি

আছে। এসবের কারুকার্যের সূক্ষ্মতা আর সৌখিনতা ভারতের যে কোন বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের সর্বপ্রথম দস্তা গলাবার কারখানা তৈরি হচ্ছে উদয়পুর থেকে কয়েক মাইল দূরে দেবারি বলে একটা জায়গায়। পরিকল্পনা অনুসারে জাওয়ার খনির পুরা দস্তাই ঐখানে গলানো হবে—যা এতদিন জাপানে পাঠানো হতো। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে যে ধাতু গলাবার কৌশল আমাদের পূর্বপুরুষদের জানা ছিল—আজ সেটাই জানবার জন্যে আমরা বিদেশ থেকে লোক আর যন্ত্রপাতি আমদানী করছি।

এই সমৃদ্ধ লোকালয়টি হঠাৎ কি করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো—সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা এখনও একমত হন নি। এটা কত প্রাচীন, সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। অনেক পণ্ডিতের মতে—যেহেতু কিছু পৌরাণিক গ্রন্থে সীসা ও দস্তার উল্লেখ আছে এবং জাওয়ার বলতে গেলে ভারতে একমাত্র ঐ ধাতুর বিরাট খনি—সেহেতু অনায়াসেই একে পৌরাণিক যুগের আওতায় ফেলা যায়। পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক, সেই বিষয়ে তর্কের সুযোগ থাকতে পারে—কিন্তু তখনকার খনিকারদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ঐ খাদগুলি আর বিরাট ধাতুনিষ্কাশনের কারখানার নিদর্শনই যথেষ্ট।

এই মৌন অতীতকে আমরা ভুলতে পারি কি ?

নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মিসেস ডরোথি ক্রফুট হজ্‌কিন

প্রোফেসর ডরোথি ক্রফুট হজ্‌কিনের নাম আজ সবাই জেনেছেন, কারণ তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। কিন্তু অল্প লোকেই তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত। কাজেই এস্থলে তাঁর জীবন ও কাজকর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রোফেসর ডরোথি ক্রফুট হজ্‌কিন তখন আক্রায়, যখন তাঁর কাছে রসায়ন শাস্ত্রে ১৯৬৪ সালের নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদটি এসে পৌঁছলো। সেখানে তাঁর স্বামী ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজের ডিরেক্টর। নোবেল পুরস্কার সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সম্মান। ডক্টর হজ্‌কিন হলেন তৃতীয় নারী—যিনি এই দুর্লভ সম্মান লাভ করলেন। অন্য দু'জন হলেন মেরি কুরি (১৯১১ সালে) এবং তাঁর কন্যা আইরিন জোলিও-কুরি (১৯৩৫ সালে, অপরের অঙ্গে ভাগ করে)। তাঁর পরিবারেও এটি দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার। তাঁর স্বামী হলেন প্রোফেসর এ. এল. হজ্‌কিনের সম্পর্কিত ভাই। প্রোফেসর এ. এল. হজ্‌কিন ১৯৬৩ সালে মেডিসিনে এই পুরস্কার অন্য আর এক জনের সঙ্গে লাভ করেছিলেন। পুরস্কারের পরিমাণ ১৮,৭৫০ পাউণ্ডের (কর-মুক্ত) কিছু বেশী।

রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর ভাষায় ডাঃ ক্রফুট হজ্‌কিনকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে—এক্স-রে পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থসমূহের গঠন-প্রকৃতি নির্ধারণে তাঁর কৃতিত্বের জন্যে। ডাঃ হজ্‌কিন অভূতপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তাঁর রাসায়নিক জ্ঞান, অনুমান শক্তি, সব বিচারশক্তি ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ডরোথি ক্রফুট ১৯১০ সালে কায়রোয় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাঃ জে. ডাবলিউ. ক্রফুট ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। এক

সময় তিনি সুদানে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হয়েছিলেন এবং পরে তিনি জেরুজালেমের ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট অব আর্কিওলজির ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই ভাবে ডরোথি ক্রফুটের বাল্য-জীবনের অনেকটা সময় তাঁর পিতার সঙ্গে কাটে সুদান ও প্যালেস্টাইনে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্মের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় এই ভাবে ঘটে। সে জন্যে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক হয়েই জীবন সুরু করতেন, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকতো না।

তিনি সাফোকের অন্তর্গত বেকল্‌স্-এর সার জন লেম্যান স্কুলে শিক্ষারম্ভ করেন এবং পরে অক্সফোর্ডে রাসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে ডরোথি হজ্‌কিন কেম্ব্রিজের নতুন ক্রিস্ট্যালোগ্রাফিক লেবরেটরিতে গিয়ে জে. ডি. বার্ণালের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেন। এই খানেই ১৯৩৩ সালে তিনি প্রথম প্রোটিনের এক্স-রে চিত্র গ্রহণ করেন। এর ক্রিস্ট্যালগুলি আনা হয়েছিল সুইডেন থেকে। এথেকেই আবিষ্কৃত হলো যে, প্রোটিনের অণুগুলি অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং এগুলির মধ্যে হাজার হাজার পরমাণুর প্রত্যেকটির যথাযোগ্য স্থান রয়েছে। ১৯৩৫ সালে তিনি অক্সফোর্ডে ফিরে এসে ছাত্রদের মধ্যে নতুন করে এক্স-রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। এই সব ছাত্রের মধ্যে অনেকেই পরে তাঁর অধীনে গবেষণা ও তাঁর কাজকর্মে সহায়তা করেন।

বর্তমানে মিসেস ডরোথি ক্রফুট হজ্‌কিন সামারভিল কলেজের একজন ফেলো এবং ১৯৬০ সাল থেকে রয়েল সোসাইটির উল্‌ফ্‌সন রিসার্চ প্রোফেসর। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কেমি-ক্যাল ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি লেবরেটরিতে ১৪ জন গবেষকের দ্বারা গঠিত একটি রিসার্চ টিমের তিনি প্রধান। তিনি বৃটেনের সেরা সেরা ক্রিস্ট্যালোগ্রা-ফারদের একজন। এই সব ক্রিস্ট্যালোগ্রাফার যৌগিক পদার্থের ক্রিস্ট্যালের এক্স-রে চিত্র পরীক্ষা করে অণু-পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে থাকেন। অক্সফোর্ডের সেই সব বৈজ্ঞানিকদেরও তিনি একজন—যাঁদের প্রচেষ্টায় আশ্চর্যজনক নতুন বৃটিশ ভেষজ কেপোরিন তৈরি হতে পেরেছে।

কি ভাবে একটি পদার্থ গঠিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট করাই ডক্টর হজ্‌কিনের কাজ এবং এই ধরণের কাজের উপরেই বৈজ্ঞানিকদের পরম নির্ভর। এই কাজ সম্ভব হলেই কৃত্রিম উপায়ে যে কোন পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয় এবং তাতে অর্থ বাঁচে। প্রাকৃতিক উপায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দানা বেঁধে কবে পদার্থটি নিজ আকৃতি গ্রহণ করবে, তার জন্যে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকতে হয় না।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পেনিসিলিনের বিশ্লেষণমূলক তাঁর কাজের জন্যে ডক্টর হজ্‌কিন ১৯৪৭ সালে বৃটেনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং আট বছরব্যাপী ভিটামিন-বি-১২ নিয়ে কাজ করেন। অনিষ্টকারী রক্তাল্প-তাকে বশে আনবার জন্যে যকৃতের নির্যাস থেকে এই ভিটামিন ১৯৪৮ সালে প্রথম পৃথক করা সম্ভব হয়। কিন্তু সার আলেকজাণ্ডার টডের নেতৃত্বে কেম্ব্রিজের গবেষকদের নিয়ে প্রোফেসর হজ্‌কিনের কাজ করবার আগে এবং বৃটেন ও আমেরিকার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগ আরম্ভ হবার আগে এই অতি জটিল অণু সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। তার পরেই রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষণের পথ প্রশস্ত হয়।

এক্স-রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ-কারীকে অণুর তিন প্রান্তের গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করতে হবে। এক্স-রে-কে এই তিন দিক থেকে ইলেকট্রনগুলি কিভাবে ছড়িয়ে দেয় তা লক্ষ্য করতে হবে। সংগৃহীত তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। হাজার হাজার এক্স-রে ছবি পরীক্ষা করে দেখতে হয়, ইলেক-

ট্রনগুলির ঘনত্ব কি ভাবে ছড়ানো আছে, তা এতে ধরা থাকে এবং অণুদেহের সীমারেখার মানচিত্রই যেন আঁকা থাকে এতে।

প্রোফেসর হজ্‌কিনের প্রতিভা হচ্ছে সেই বিশেষ শক্তি, যার দ্বারা তিনি দুই প্রান্তের অণুদেহ দেখে তার তৃতীয় প্রান্তটির সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে পারেন। এর ফলে তিনি প্রাথমিকভাবে একটি নির্ভুল সিদ্ধান্তেই পৌঁছান। অনেক সময় তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাসায়নিকদের পূর্ব ধারণার একেবারে বিপরীত হয়, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে বিস্তৃত ও শ্রমসাধ্য পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে অবশেষে একটা নির্ভুল নিখুঁত চিত্রে উপস্থিত হন। এই পদ্ধতিটা কাজে লাগানো খুবই কঠিন এবং জটিল কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষাকারীর উপর ভীষণ চাপ পড়ে।

এক সময়ে তাঁর এই অনুমান শক্তির সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয়—পুরুষদের চেয়ে নারীরাই ত্রিমাত্রা সম্বন্ধে বেশী কল্পনা করে নিতে পারে কি না। একথা স্বীকার করে নিতে পারেন নি প্রোফেসর হজ্‌কিন। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে তার পর বলেন, নারীরা সম্ভবতঃ এক সঙ্গে দুটা বিষয়ে বেশী চিন্তা করতে পারে—কেন না, জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তাদের এই ভাবে চিন্তা করে কাটাতে হয়।

তাঁর নিজের জীবনেই, ৫৪ বছর বয়সে, তিনি নারীর এই বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩১ সালে তিনি ঐতিহাসিক টমাস হজ্‌কিনকে বিবাহ করেন। তাঁদের তিনটি সন্তান আছে, আর আছে তিনটি নাতিনাত্‌নি। তিনি সংসার ও গবেষণার দায়িত্ব যুগপৎ পালন করে চলছেন, কোনটির দিকেই তাঁর মনোযোগ কম নয়। তাঁর নিয়মানুবর্তী মন একটু গোলমাল ও হট্টগোলের মধ্যেই যেন বেশী প্রখর হয়ে ওঠে। যেখানে সেখানে বসে তিনি কাজ করতে পারেন। অক্সফোর্ডে তাঁর গৃহে বন্ধুবান্ধবেরা গেলে তাঁরা দেখবেন—তিনি হৈ-হট্টগোলের মধ্যেই কাজ করছেন—গিটার বাজাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেরা তাঁর চার দিকে ঘিরে এবং দশ-বারো জন অতিথি বা বন্ধু এক সঙ্গে গল্প করে চলেছে। তাঁর এই অক্সফোর্ডের গৃহে তাঁর সঙ্গেই বাস করেন তাঁর বোন ও সেই বোনের পাঁচটি ছেলেমেয়ে।

ডক্টর হর্জ্‌কিনের নিজের ছেলেরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আছে। তাঁর বড় ছেলে লিউক বিয়ে করে তিনটি ছেলেপুলে নিয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছে অ্যালজিয়ার্স বিশ্বত্যালয়ে; অক্সফোর্ড ও ব্রিস্টলে গণিত সম্বন্ধে গবেষণা করে সে দক্ষতা দেখিয়েছে। তাঁর কন্যা এলিজাবেথের বয়স ২৩ বছর, সে এখন জাম্বিয়াতে শিক্ষকতা করছে, ১৮ বছর বয়স্ক ছেলে টডি ভলাণ্টারি সার্ভিস ওভারসীজের সদস্য হয়ে এক বছর হলো ভারতবর্ষে আছে।

তাঁর পুরস্কারের এই অর্থ দিয়ে কয়েকটি ভাল কাজ করবার ইচ্ছা। এই পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি অক্সফোর্ডে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করতে চাই এবং আমার ইচ্ছা, দুর্ভিক্ষ প্রশমন ও শান্তির জন্যে অর্থ দান করি।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অভিনব শুক্‌নো খাদ্য

ফলমূল, শাকসজী প্রভৃতির জলীয় অংশ শুকিয়ে ফেলে সেগুলিকে অবিকৃত অবস্থায় বহুদিন রাখা যায়। এই সব শুক্‌নো শাকসজী রান্নাবান্নার দিক থেকে গৃহিণীদের পক্ষে কিছুটা সুবিধাজনকও হয়ে থাকে। এই সকল তরকারী কাটাকুটির বালাই থাকে না, সোজা উনুনে চড়িয়ে দিলেই হয়। শুক্‌নো ফলমূলও দূর পথে পাঠাবার সুবিধা অনেক—তাতে পচে গিয়ে নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। তাছাড়া ওজনে কম হয়, আয়তনে জায়গা নেয় কম। কিন্তু টাট্‌কা সজী রান্না করলে তরকারীর যে স্বাদ ও গন্ধ পাওরা যায়, তা এসব সজীতে পাওয়া যায় না। ফলমূল শুকিয়ে রাখবার এই পদ্ধতি বহুকাল থেকেই নানা দেশে প্রচলিত রয়েছে।

আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ার উইণ্ড-মোরের কৃষি গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এই ভাবে ফলমূল ও শাকসজী সংরক্ষণের অসুবিধা দূর করে সুবিধাটুকু রেখে কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্যে অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করছিলেন। কিছুদিন হয় এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং তাঁদের উদ্যোগে ‘এক্সপ্লোশন পাফিং’ নামে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে ঘূর্ণায়মান একটি কৌটার মধ্যে শুক্‌নো শাকসজী অথবা ফল রাখা হয়, তবে এই সব সজী বা ফল একেবারে শুক্‌নো থাকে না। কৌটার মুখটি থাকে সম্পূর্ণ আঁটা। তারপর এটিকে গরম করা হয়। কৌটার ভিতরে যেটুকু উত্তাপ ও চাপের প্রয়োজন, তা সঞ্চিত হবার পর কৌটার ঢাকনাটি হঠাৎ খুলে ফেলা হয়। ঢাক্‌না খোলা মাত্রই ঐ সব্‌জী বা ফলে সামান্য যেটুকু জলীয় অংশ থাকে, তা বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায় এবং সজী বা ফলের প্রত্যেকটি টুক্‌রা ফুট্‌তে থাকে।

এই প্রক্রিয়ার ঐ সকল সজী বা ফল সচ্ছিদ্র হয়ে পড়ে। আগে যেখানে ঐ সব সবজী রান্না করতে লাগতো ২০ মিনিট, সেখান ঐ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সজী রান্না করতে লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট। সচ্ছিদ্র হবার ফলে জলে ফেলামাত্র এদের মধ্যে জল ঢুকে যায়। রান্নার সুবিধা ছাড়াও টাট্‌কা সজীর রান্নার যে স্বাদ, সেই স্বাদও এই সকল সজীতে পাওয়া যায়।

আপেল, জাম, গাঁজর, আলু, বীট, শালগম প্রভৃতি নিয়ে এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। প্রেসার কুকার অবিষ্কারের পর খাদ্য প্রস্তুতির ব্যাপারে এটি হচ্ছে অন্যতম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য আবিষ্কার। ইউরোপের কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখছেন এবং জাপানে এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুতির একটি কারখানাও নির্মিত হচ্ছে।

মার্কিন কৃষিদপ্তর এই পদ্ধতিটি অন্যান্য দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও অন্যান্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের পরিকল্পনা করেছেন।

বেলুনের সাহায্যে বিমান দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষার পন্থা

কঠিন জমিতে বিমান অবতরণজনিত দুর্ঘটনা ও ধ্বংস থেকে যাত্রীদের রক্ষা করবার একটি অভিনব উপায় সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। যাত্রীরা যাতে আসন সংলগ্ন হয়ে বসে থাকতে পারেন এবং ধাক্কার ফলে পিঠে কোন চোট না পান, তার ব্যবস্থা প্লাস্টিক নির্মিত এক প্রকার

বেলুনের সাহায্যে হয়েছে। এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'এয়ার স্টপ'। আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা কর্তৃক এই জিনিষটি উদ্ভাবিত হয়েছে। বিমান মহড়ায় কৃত্রিম উপায়ে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে।

এই সকল বেলুন রবার ও স্বচ্ছ প্লাস্টিকে তৈরি। এগুলিকে না ফুলিয়ে পাট করে প্রত্যেক বিমানযাত্রীর আসনের পিছন দিকে রাখা হয়। বিমান-চালক কোন রকম দুর্ঘটনার আশঙ্কা করলেই তার ঘরে যে বোতামটি রয়েছে তা টিপে দেওয়া মাত্র ঐ সকল বেলুন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। প্রথম ভাগ যাত্রীর পা ও হাঁটু রক্ষা করে। আর এর বৃহত্তর অংশ থাকে যাত্রীর পা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে। বিমানে ধাক্কা লাগলে যাত্রীর দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বেলুনটিও উপরের দিকে ছিট্‌কে পড়ে, মাথাটি ঠেকে ঐ বেলুনেই। ফলে যাত্রী মাথায়ও আঘাত পায় না। বেলুনটি যাত্রীকে সামনের দিকেও ঝুঁকে পড়তে দেয় না। প্রচণ্ড গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে যে প্রচণ্ড ধাক্কার সৃষ্টি হয়, তার প্রতিক্রিয়া থেকে যাত্রীকে এইভাবেই রক্ষা করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

আমেরিকার ফেডারেল এভিয়েশন এজেন্সীর পদস্থ কর্মচারীগণ এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন। মহাকাশ যাত্রীদের মহাকাশ যাত্রার সময়ে অবতরণকালে আত্মরক্ষার জন্যে এই ব্যবস্থা বিশেষ কাজে লাগতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

মহাকর্ষশক্তি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্তমানে মহাকাশ-যাত্রীদের তাঁদের আসনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। মহাকর্ষশক্তির চাপ থেকে মহাকাশ-যাত্রীকে রক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে এই 'এয়ার স্টপ' প্রক্রিয়া এর তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী হবে, শতকরা ৮৫ ভাগ চাপ এই প্রক্রিয়ায় হ্রাস করা যাবে।

মাত্র দশ মিনিট, একবার ওঠবার সময় আর একবার নামবার সময় এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে। বাকী সময় বেলুনের বাতাস বের করে নিয়ে পাট করে আসনের পিছনে রেখে দিলেই হবে।

মেরীল্যাণ্ডের বাল্‌টিমোরস্থিত মার্টিন কোম্পানী কর্তৃক এই জিনিষটি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বর্তমানে এ নিয়ে আরও গবেষণা চলছে।

মুদ্রণের কাজে হোভারক্র্যাফট পদ্ধতি ব্যবহারের সম্ভাবনা

লণ্ডনের কাছে একটি গবেষণাগারের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হলে হোভারক্র্যাফট পদ্ধতিকে হয়তো মুদ্রণের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। লেদারহেডের প্রিন্টিং প্যাকেজিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ট্রেড্‌স্ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে যে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে, তার লক্ষ্যই হলো বাতাসকে মুদ্রণের কাজে সাহায্যের জন্যে নিয়োগ করা।

সাধারণতঃ মুদ্রণের জন্যে যে চাপের প্রয়োজন হয়—যে চাপ কাগজকে কালি-মাখানো সিলিণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত করে—সেই চাপ আসে স্প্রিং লোডেড রোলারের কাছ থেকে। কাগজটি আটকে থাকে রোলার ও প্রিন্টিং সিলিণ্ডারের মাঝখানে ছাপ গ্রহণের জন্যে। লেদারহেডের যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করছেন—রোলার ব্যবহার না করে 'এয়ার কুশন' ব্যবহার কি পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে, তা বিচার করে দেখতে। কাগজটি যখন সিলিণ্ডারের উপর দিয়ে যাবে, তখন একটি পাইপ লাইন মারফত এই কাগজ বরাবর বাতাস সরবরাহ করা হবে। বায়ুর চাপ—যাকে 'এয়ার কুশন' বলা হয়ে থাকে—কাগজটিকে ঘূর্ণায়মান সিলিণ্ডারের উপর চেপে ধরে রাখবে।

এই ব্যবস্থার একটা বড় রকমের সুবিধা হলো এই যে, পেপার ফ্রিকশন বা কাগজের ঘর্ষণ এর ফলে একেবারে দূর হবে। 'ব্ল্যাংকেট' রোলারগুলির প্রয়োজন না থাকায় যন্ত্রপাতিও খুব সরল হতে পারবে।

এই সম্পর্কে গবেষণা সুরু হয়েছে, এখনও কিছু বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে। অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা মনে করেন গ্র্যাভ্যুর প্রিন্টিং-এর ব্যাপারে এর সাফল্য প্রথম লক্ষণীয় হবে। বায়ুর চাপ ঘূর্ণায়মান সিলিণ্ডারের উপর কাগজকে সমান ভাবে চেপে ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারবে। এই পদ্ধতি একবার কার্যকরী হলে বিজ্ঞানীরা লিথো এবং লেটার প্রেসপ্রিন্টিং-এর ব্যাপারেও তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।

পুরাতন চোখের বদলে নতুন চোখ

বৃটেনে যে নতুন ডীপ-ফ্রীজ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তাথেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্ধ ব্যক্তিরা কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন। এই পদ্ধতিতে দান হিসাবে প্রাপ্ত চোখগুলি এক বছর বা তারও বেশী সময় ধরে সংরক্ষণ করা যাবে এবং সময় ও সুযোগ বুঝে তা রোগীর দেহে পুনঃস্থাপন করা যাবে।

লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনষ্টার হাসপাতালের গবেষণা বিশেষজ্ঞগণ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীগণ এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। হাসপাতালের জনৈক মুখপত্র বলেন যে, এই অপারেশনের ফলে রোগীদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষভাবে শিশুরা কর্ণিয়ার ক্ষতের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত চোখ বদল করে নিতে পারবে।

বৃটেনে শতকরা মাত্র প্রায় এক জন এই ভাবে উপকৃত হতে পারবে, কিন্তু এই নতুন পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষভাবে উপকারে আসবে। এই সব দেশে কর্ণিয়ার ক্ষতজনিত রোগে বহু লোকই ভুগে থাকে।

পূর্বে কর্ণিয়া—চোখের সম্মুখভাগের স্বচ্ছাবরণ—তাজা রাখা সম্ভব হতো মাত্র একমাস পর্যন্ত। দান হিসাবে প্রাপ্ত চোখগুলি পাওয়ার ৩৬ ঘন্টার মধ্যে তা গ্র্যাফ্‌ট্ করবার প্রয়োজন হতো। সেই জন্যে এই ভাবে প্রাপ্ত বহু চোখই অযথা নষ্ট হয়ে যেত।

এখন এই চোখ -১৭৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জমাট করে রাখা সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে, অতি-মাত্রায় কোমল কর্ণিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

ডীপ-ফ্রীজে রাখবার পূর্বে দান হিসাবে প্রাপ্ত চোখগুলিতে একটি রাসায়নিক পদার্থ 'ডাইমেথিল সালফোক্সাইড' ইন্‌জেক্ট করে দেওয়া হয়। এতে টিস্যু রক্ষা করে কর্ণিয়ার স্বচ্ছতা রক্ষা করা হয়।

বৃটেনে সাতটি রোগীর উপর সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অপারেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই নতুন পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা এক বছর ধরে চলবে। কয়েক মাসের মধ্যে গঠিত হবে বিশ্বের প্রথম চোখের ব্যাঙ্ক, যেখানে দান হিসাবে প্রাপ্ত চোখগুলিকে মজুত রাখা হবে এবং পরে যে কোন সময়ে—এমন কি, কয়েক বছর পরেও তা ব্যবহার করা যাবে। চোখের এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবে লণ্ডনের মুরফিল্ডস্ আই হস্‌পিটালে।

কস্‌মিক রশ্মির দাঁড়িপাল্লায় বাড়ী ওজন

পৃথিবীর যে কোন বস্তুর ওজন মাপা যায় মহাশূন্যদেশ থেকে ছুটে আসা রহস্যময় মহাজাগতিক 'মিউ-মেসন' কণার সাহায্যে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৯৬৫) আলমা আতায় সোভিয়েট মহাশূন্য দেশীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের যে সম্মেলন শেষ হয়, সেই সম্মেলনে একথা ঘোষণা করেন মস্কোর

অধ্যাপক গ্যর্গি জ্দানফ। তিনি জানান—এই পদ্ধতিতে সোভিয়েট রাজধানীর 'হোটেল মস্কোভাকে' ওজন করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, এর ওজন ৪৫০০০ টন। কস্‌মিক রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে এক বিশেষ যন্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে এই ওজন করা হয়েছে। এই ধরণের ইমারত বা কোন বিপুলকায় বস্তুর ওজন মাপবার জন্যে ইতিপূর্বে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো, সেই পুরাতন পদ্ধতিতে পাওয়া ওজন থেকে এই নতুন পদ্ধতিতে পাওয়া ওজনের অঙ্কে যৎসামান্য তফাৎ রয়েছে।

অধ্যাপক জ্দানফ জানান—ভূগর্ভের কয়েক কিলোমিটার গভীরের বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরের ভর নির্ধারণ করবার কাজে মহাজাগতিক রশ্মির মিউ-মেসন কণাকে ব্যবহার করবার একটি পদ্ধতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিউ-মেসন কণা 'শোষণ' করে—এই তথ্যটির ভিত্তিতেই এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে। ওদেসার চুনা-পাথর তরাই অঞ্চলে এখন এই পদ্ধতিটিকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মানসিক কারণে মেদবাহুল্য

আহার নিয়ন্ত্রণ এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে ওজন হ্রাস হতে পারে। শরীর যতটুকু খাদ্য 'উত্তাপে' পরিণত করতে পারে, যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী খান, তিনি তাঁর শরীরকে মেদবহুল করবার পথে এগিয়ে দেন। শরীরের অভ্যন্তর' ভাগ সম্পর্কে পশ্চিম জার্মেনীর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ এন. জলনার বিশ্বাস করেন যে, ইন্দ্রিয়গত কোন রোগ বা আহার লালসা, মেদবাহুল্য ঘটাবার প্রধান কারণ নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন জটিল পরিস্থিতি থেকে নিজের মনকে বিক্ষিপ্ত রাখবার উদ্দেশ্যে অত্যধিক আহারের ফলেই মেদবাহুল্য ঘটে। কাজেই শরীরের স্থূলত্ব হ্রাস করবার জন্যে আহার নিয়ন্ত্রণ সুরু করবার পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি সব সময়েই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

বহু লোক এখনও স্বেচ্ছাকৃত ক্ষুধা রোগে ভোগেন। মহাযুদ্ধের পর যে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়, তখন মেদবাহুল্য রোগ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এরপর যখন আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয়, খাদ্য এবং পানীয়ের জন্যে যে যত বেশী ব্যয় করতে পারতো, তখন তার সামাজিক মর্যাদা তত বেশী বাড়তো। তাছাড়া স্ত্রীরা প্রায়ই স্বামীদের বেশী বেশী খাইয়ে তাঁদের ভালবাসা ও যত্নের প্রমাণ দিতে ব্যস্ত হন। মা, বাবা, সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্যে প্রায়ই তাদের বেশী খাওয়ান।

ওজন বৃদ্ধির ফলে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি খুব বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে। মিউনিকের বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক জলনার তাঁর বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে উপযুক্তভাবে ওজন হ্রাস সম্পর্কে এখন ব্যবহারিক পরামর্শ দিতে পারেন।

শরীর যতটুকু খাদ্য উত্তাপে পরিণত করতে পারে, কেউ যদি তার চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে একমাত্র সেই রকম রোগীর ক্ষেত্রেই শুধু আহার নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হতে পারে।

কাজেই এই রকম ক্ষেত্রে খাদ্য এমনভাবে সীমায়িত করতে হবে, যাতে রোগী উপবাসী না থাকে। তার দৈনিক খাদ্য তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন থাকা প্রয়োজন, যেমন—মাংসের জুস, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী। চিনি, মিষ্টি ইত্যাদির মত কার্বোহাইড্রেট খাদ্য বেশী থাকা উচিত নয়।

আহার নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করবার প্রথম সপ্তাহেই যদি ভাল ফল না পাওয়া যায়, তাহলে অনেক রোগীই হতাশ হয়ে পড়ে। প্রথম সপ্তাহে ফল না পাওয়া গেলে হতাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ শরীরে সব সময়েই কিছু জল সঞ্চিত থাকে, যার ফলে ওজন হ্রাস বোঝা যায় না। দুই পাউণ্ড মেদ তন্তুতে ৬০০০ ক্যালরি থাকে। আহার নিয়ন্ত্রণ করলে ১০০ গ্র্যাম মেদ থেকে ১০৫ গ্র্যাম হারে জল হতে থাকে। ফলে ওজন হ্রাস বোঝা যায় না।

বিশেষ আহার নিয়ন্ত্রণের দিনগুলিতে অর্থাৎ যে দিন শুধু ফল আহার্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সেই দিনগুলিকে প্রকৃতপক্ষে অপুষ্টির দিন বলা যায়। এই রকম আহার্য মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে। যে সব বড়ি ক্ষুধা হ্রাস করে, অধ্যাপক জলনার সেগুলি সম্পর্কে বিশেষ সমালোচনা করেন। কারণ এই রকম চিকিৎসায় রোগী তার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর না করে বড়ির উপরেই বেশী নির্ভর করেন বলে এগুলি থেকে সীমাবদ্ধ ফল পাওয়া যায়। ফলে রোগী সহজেই তার পূর্ব অভ্যাসে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ হন। কোন ব্যক্তির আহার নিয়ন্ত্রণ করলে যদি প্রথম দিকেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে একমাত্র সেই রকম ক্ষেত্রেই মিউনিকের এই অধ্যাপক ক্ষুধানাশক বড়ি দেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

হাইলা ভাবসিকালার জাতীয় গেছো ব্যাং একটা উড়ন্ত প্রজাপতি ধরবার জন্য লাফ দিয়েছে ।

করে দেখ

গ্লাসের জলে আঙ্গুল ডোবালে তার কি ওজন বাড়বে ?

জল সমেত একটা গ্লাস ওজন করে নেবার পর তাতে ছোট্ট একটা মাছ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওজন করলে কি দেখা যাবে? তার ওজন বাড়বে, না সমানই থাকবে? এই প্রশ্নটা নিয়ে অনেক সময়ই বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হলো— মাছটার ওজন যতটা, গ্লাসের জলের ওজন ঠিক ততটাই বেড়ে যাবে।

ধর, একগ্লাস জলে তুমি একটা আঙ্গুল খানিকটা ডুবিয়ে দিলে—অনেকেই বলবে, এতে ওজন কিছুই বাড়বে না। প্রকৃতপক্ষে ওজন কিন্তু কিছুটা বেড়েই যাবে। আঙ্গুল ডুবিয়ে দেবার ফলে যতটা জল স্থানচ্যুত হবে, তার ওজন যতটা—গ্লাসের জলের ওজন ঠিক ততটাই বেড়ে যাবে। ব্যাপারটা খুব সহজেই তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।
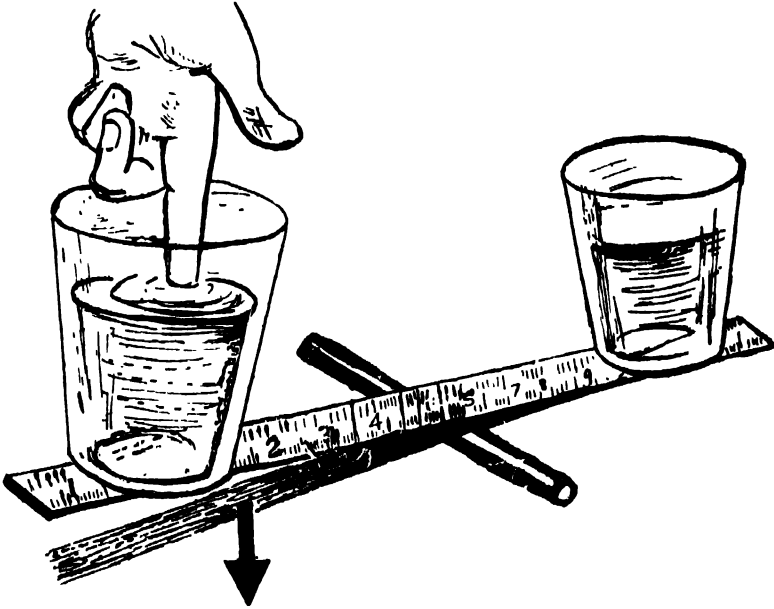
টেবিলের উপর একটা পেন্সিল রাখ। পেন্সিলটার উপর আড়াআড়িভাবে একখানা চ্যাপ্টা স্কেল বা রুলার রেখে তার দুই প্রান্তে একই রকমের দুটি জলভর্তি গ্লাস ব্যালান্স করে বসিয়ে দাও। গ্লাস বসানো স্কেলখানাকে পেন্সিলের উপর এমনভাবে ব্যালান্স করে বসাবে, তার একটা প্রান্ত যেন সামান্য একটু নীচের দিকে হেলানো থাকে। যে গ্লাসটা

একটু উঁচুতে আছে, এবার তার মধ্যে খুব সাবধানে আঙুলের ডগাটা খানিকটা ডুবিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে—জল ছাড়া অন্য কোথাও যেন আঙুল স্পর্শ না করে। দেখবে আঙুলটা ডুবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্কেলের অপর দিকের গ্লাসটা একটু উপরে উঠে গিয়ে দুদিকই প্রায় সমানভাবে ব্যালান্স হয়েছে। আঙুল ডুবিয়ে দেবার ফলে গ্লাসের জলের ওজন যে বেড়ে গেছে, এই পরীক্ষাতে সে কথাই প্রমাণিত হয়। কিভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে, ছবিটা দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে।

—গ—

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

নিউইয়র্ক সহরের রিভারসাইড গীর্জার শ্বেত মর্মরের নির্মিত প্রাচীরে পৃথিবীর ছয় শত মহাপুরুষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি জায়গায় আছে চৌদ্দ জন বিজ্ঞানীর প্রতিকৃতি। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের প্রতিকৃতির নীচে লেখা আছে—আইনষ্টাইন যে সময়ে জীবিত ছিলেন, সে সময়ের তিনি মাত্র শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও। একাধারে এই পরম প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানীর যে মিলন, তার একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থ-বিজ্ঞানের এই যাদুকর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের এতকালের ধারণা বদ্‌লে দিয়ে গেলেন, আর উদ্বোধন করে গেলেন নতুন পরমাণু যুগের। মানবেতিহাসে যাঁরা অমর আসন অধিকার করে রয়েছেন, সেই সকল মনীষীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

বহু লোকেই বিনা দ্বিধা ও প্রশ্নে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যাঁদের আছে, তাঁদের মধ্যেও খুব কম লোকই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যে কতখানি, তা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বিজ্ঞানী হিসাবে পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, কোপারনিকাস এবং নিউটন—এই কয়টি মুষ্টিমেয় মহা-বিজ্ঞানীর মতই তিনিও নির্ভীকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সেই জয়যাত্রার পথেই এগিয়ে গেছেন। আইনষ্টাইনের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি যে রকম বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন—জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন, তাঁর আগে এরকম আর কেউ করেন নি। তাঁর ত্রিশ পাতার এই আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়ে থাকে—"এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব"। কিন্তু বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় এগিয়ে যাবার সহায়ক উপকরণের মধ্যে ছিল মাত্র একটি পেন্সিল আর

ছোট্ট একটি খাতা। মস্তিষ্ক ও মেধাই ছিল তাঁর গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারের সাহায্যে দূরবীক্ষণে যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, তার চেয়েও অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাছের জিনিষকে স্পষ্টতর করে তোলে। তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি যে কোন জিনিষ দেখতে পেতেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য যেখানে গিয়ে মিলেছে, তিনি একাকী আপন মহিমায় সেখানে সেই মোহনায় গিয়ে পৌঁচেছিলেন। তিনি এক জগৎ থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে অন্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে গেছেন।

তবে এই যুগে রেডিও-টেলিস্কোপের মত বহু বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার উদ্ভাবিত হবার ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নতুন নতুন বহু আবিষ্কার হয়েছে। মহাকর্ষ সম্পর্কে অধ্যাপক হয়েল ও ডাঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের নতুন মতবাদ এক্ষেত্রের সাম্প্রতিক একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় হয়েল ও নারলিকারের নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—"মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটন ও আইনষ্টাইনের মতবাদকে হয়েল-নারলিকারের আবিষ্কার অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং এক নতুন পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে।"

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ জার্মেনীর উলম সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি কবিতা রচনা করতেন। স্কুলের ছাত্র হিসাবে ছিলেন লাজুক। পড়াশুনায়ও ভাল ছিলেন না। কিন্তু প্রশ্নবাণে মাষ্টার মশাইদের উত্যক্ত করে তোলতেন। আইনষ্টাইনের অধিকাংশ প্রশ্নেরই তাঁরা উত্তর দিতে পারতেন না। বারো বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং পরের বছর দার্শনিক ক্যাণ্টের 'ক্রিটিক অব পিউর রিজন' নামক পুস্তকটি পড়েন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আইনষ্টাইন 'ইন্টিগ্র্যাল অ্যাণ্ড ডিফারেনশিয়েল ক্যালকুলাস' ও 'অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি' অনুশীলন করেন। কিন্তু এত অল্প বয়সে আশ্চর্য মেধার পরিচয় দিলেও জুরিখ পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউট থেকে এনট্র্যান্স পাশের জন্যে তাঁর দু-বার চেষ্টা করতে হয়েছিল।

স্নাতক হবার পর ১৯০১ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং ঐ সময় থেকে সুইজারল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তখন আইনষ্টাইন ছিলেন সরকারী পেটেণ্ট অফিসে একজন অখ্যাত করণিক। এর চার বছর পরে তাঁর বয়স যখন মাত্র ২৬ বছর, তখন পাঁচটি প্রবন্ধে আইনষ্টাইনের বিশ্ববিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। পঞ্চমটি ছিল ক্ষুদ্রতম। কোন বস্তু বাধা না পেলে সহজাত গুণের জন্যে একমুখে চলতে থাকে। ঐ চলবার গুণ বা ইনারশিয়া, ঐ বস্তুতে যে শক্তি বা এনার্জি রয়েছে—তার উপর নির্ভরশীল কি না, তা ঐ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বিরাট সাড়া পড়ে যায়—ব্রহ্মাণ্ড, স্থান, কাল ও মহাকর্ষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানীদের 'গতি' সম্পর্কে কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্ভর করতে হতো প্রায় দু-শ' বছর আগের সার আইজাক নিউটনের 'লজ অব মোশন্‌স্' বা গতিবেগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর উপর। নিউটন আপেক্ষিক গতি বা রিলেটিভ মোশন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ গতি বা অ্যাবসোলিউট মোশন-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলেন। তিনি তা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডে দূরে, বহু দূরে অবস্থিত স্থির নক্ষত্রাঞ্চলে, হয়তো বা তাও ছাড়িয়ে দূরতম প্রান্তে রয়েছে কোন কিছু শান্ত স্থির। এই কথা তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি। তবে পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা এই সম্বন্ধে অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, মহাশূন্যে 'ইথার' নামে যে অদৃশ্য বস্তুটি রয়েছে—নিউটন যে স্থির বস্তুটির কল্পনা করেছিলেন, এ হচ্ছে তাই। আইনষ্টাইন নিউটনের এই ধারণা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর যুক্তি এই যে, ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থির নেই, সব কিছুই চলছে, সবই গতিশীল। গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের বর্ণনা কেবলমাত্র একটির সঙ্গে আর একটির তুলনা করেই করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে সব কিছুই অস্থির বলে একেবারে সঠিক তুলনাও সম্ভব নয়।

আইনষ্টাইন প্রমাণ করে দেখালেন যে, সময়ও আপেক্ষিক। কোন স্থির নির্দিষ্ট কাল নেই, যেখান থেকে অতীত সুরু হয়ে বর্তমানে এসেছে এবং তা চলেছে ভবিষ্যতের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—কোন বিষয়ের কথা আমরা যখন বলি, তখন কোন্ সময়ের বিষয়ের কথা বলছি, সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের উল্লেখ না করলে ঐ বিষয়ের বর্ণনা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। স্থানও তেমনই আপেক্ষিক সত্য। মহাকাশে কোন দুটি গ্রহের মধ্যে দূরত্ব তাদের গতির মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য, গতিকে বাদ দিয়ে দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়।

ভর সম্পর্কে ধারণাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কোন চলমান বস্তুর সকল গুণাগুণের মত এর ভর বা মাসের মাত্রার পরিবর্তন গতির মাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেহেতু গতি হচ্ছে এক ধরণের শক্তি, সেহেতু কোন চলমান বস্তুর গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ভরের পরিমাণও বেড়ে যায়। সংক্ষেপে শক্তিরও ভর আছে। এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আইনষ্টাইনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সূত্রই বর্তমান পারমাণবিক বিজ্ঞানের ভিত্তি।

এই তত্ত্ব প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আইনষ্টাইন একদা ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের পেটেণ্ট অফিসের করণিক, তাঁর খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো, তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁকে অধ্যাপক হিসাবে পেতে চাইলো। ১৯১২ সালে আইনষ্টাইন বার্লিনের বিখ্যাত কাইজার উইলহেলম ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯১৫ সালে আইনষ্টাইন

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সংক্রান্ত জেনারেল থিয়োরী বা সাধারণ মতবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

যে রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি গ্রহ-তারকা ও ছায়াপথে অবস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আইনষ্টাইন-নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিউটন সেই অদৃশ্য শক্তিকে ইউনিভার্সাল গ্রেভিটেশন বা সর্বব্যাপী মহাকর্ষ শক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন। আইনষ্টাইন নিউটনের এই মত সমর্থন করেন নি। তিনি দেখালেন—একটি চুম্বক যেমন নিজের চার পাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে থাকে, চলন্ত গ্রহ-তারকাসমূহও তেমনই নিজ নিজ এলাকা তৈরি করে থাকে এবং এই এলাকা অন্যান্য গ্রহ-তারকার গতিবিধিকে প্রভাবিত করে।

মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনষ্টাইনের এই নতুন মতবাদ ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ বদ্‌লে দেয়। স্থান-কালের প্রবাহে সকলই ভেসে চলেছে। মহাকাশে বস্তু কোথায়ও পুঞ্জীভূত হলে সেই প্রবাহের পথে বিঘ্ন ঘটায়। সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণীজল যেমন বেঁকে যায়, তেমনই অবস্থা হয় সেই প্রবাহের।

এইভাবে মহাকাশে পুঞ্জীভূত বস্তুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রবাহের গতিতে যে বিকৃতি ঘটে, তার সম্মিলিত ফল—তার পরিণতি হলো বিরাট একটি বৃত্তাকার আনমিত রেখা। এই মহাজাগতিক বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয় এই ব্রহ্মাণ্ড। আইনষ্টাইনের ব্রহ্মাণ্ড সসীম। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৩৫০০ কোটি আলোক-বর্ষ। এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত, এতে কোটি কোটি ছায়াপথের স্থান হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মেনীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসনাধীনে আইনষ্টাইন সুখে-স্বচ্ছন্দেই বসবাস করছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বার্লিনে প্রায় একুশটি পরিবারের ভরণপোষণে সাহায্য করতেন; অবসর সময়ে পাল তোলা নৌকায় বিহার করতেন, আর বেহালা বাজাতেন। জার্মেনীর শাসন কর্তৃত্ব হিটলারের হাতে আসবার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৩ সালে আইনষ্টাইন হিটলারের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রথমে পালিয়ে এলেন ফ্রান্সে, ফ্রান্স থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে এলেন বেলজিয়ামে, তারপর ইংল্যাণ্ডে। এই সময়ে নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট ফর এডভানস্‌ড্ ষ্টাডিজ-এ অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন। ১৯৫৫ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই শান্ত সহরটিতে কাটিয়ে গেছেন। ১৯৪০ সালে আইনস্টাইন আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করেন।

এই শান্তিকামী মানুষটি, যিনি নাৎসীদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে এসেছিলেন—তিনি ছিলেন স্বাধীনতার প্রবল অনুরাগী, সমস্ত শোষণের প্রচণ্ড বিরোধী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন কিছু বেছে

নেবার স্বাধীনতা থাকবে, ততক্ষণ আমি সেই দেশটি বসবাসের জন্যে বেছে নেব, যে দেশে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, আর আছে পরমত সহিষ্ণুতা।

১৯৫২ সালে ইজরায়েলের প্রথম প্রেসিডেন্ট চেইম ওয়াইজম্যানের পরলোক গমনের পর শ্রেষ্ঠ ইহুদী হিসাবে আইনস্টাইনকেই ঐ পদটি গ্রহণের জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল। এই আমন্ত্রণ গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেছিলেন যে, এই ভৌত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতেই তিনি ভালবাসেন। মানুষ নিয়ে কাজকারবারের অভিজ্ঞতা অথবা এই বিষয়ে স্বাভাবিক কর্মদক্ষতাও তাঁর নেই।

আইনষ্টাইন ছিলেন একান্তভাবে মানবদরদী, মানবকল্যাণকামী। আর অর্থ ও বিভবের প্রতি তাঁর আদৌ কোন আকর্ষণ ছিল না। একথা আক্ষরিকভাবে সত্য। বিত্ত লাভের, ধনী হবার প্রভূত সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, সে সবই অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নোবেল পুরস্কারের পুরা অর্থই (প্রায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০ টাকা) তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে—রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে তিনি একবার ৭ হাজার ২০০ টাকার একটি চেক পান। চেকটিকে বেশ কিছুদিন বুকমার্ক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তারপর ঐ চেক সমেত ঐ বইটি হারিয়ে যায়।

৭৬ বছরে আইনষ্টাইনের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর মত দান আর কারো নেই।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছিলেন—তিনি ছিলেন প্রকৃতই সত্যকামী। অসত্য ও অন্যায়ের সঙ্গে রফা তাঁর জীবনে স্থান পায় নি। যে পৃথিবীতে ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, সেই অন্ধকারে তিনি ছিলেন আলোয় দিশারী। আর যাঁরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন শক্তির উৎস।

গতিবেগের কথা

যদি বলা হয়, তোমরা যে গতিতে স্কুলে যাচ্ছ সে গতি একটু কমিয়ে ফেল—তাহলে কি করবে? তোমরা বলবে—আস্তে যাব। আস্তে যাওয়া কথাটার অর্থ কি একবার ভেবে দেখেছ? ধর, স্কুলে যেতে তোমার সময় লাগে ১০ মিনিট; আস্তে চললে লাগবে ২০ মিনিট। অর্থাৎ তোমার পদক্ষেপ যে গতিতে চলছিল সেই গতি সঙ্কুচিত হলো। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, গতি কম হলে সময় বেশী লাগবে আর গতি বেশী হলে সময় কম লাগবে, গতির সঙ্গে সময়ের কি রকম সম্পর্ক রয়েছে বুঝলে তো!

তোমরা ভাবছ, কথার ছলে অঙ্ক শেখাচ্ছি। কিন্তু দেখো, যত বড় হবে তত বুঝবে যে, সব কিছু বস্তু একটি নির্দিষ্ট হিসাবের ঝুলিতে ঠাসা রয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, সূর্য নির্দিষ্ট সময়ে উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে। বছরের পর বছর একই হারে ঋতুর পরিবর্তন হয়ে আসছে। সব শামুক তাদের মন্থর গতিতে জীবনের শেষের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সুপারসনিক বিমান শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে উড়ে যাবে। সবই দেখ, গতি হিসাবের রেখায় বাঁধা।

সুতরাং সেই গতির কথায় আবার ঘুরে আসতে হলো। তোমাদের গতি তোমরা ইচ্ছামত বাড়াতে কিংবা কমাতে পার। কিন্তু জড়ের বেলায় কি হবে? তারা অচল। তোমাদের মত প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে তারা আসে নি।

ধর, সাইকেলের চাকার কথা। লক্ষ্য করে দেখবে—প্যাডল যার সঙ্গে লাগানো রয়েছে, সেটা বেশ বড় ও তার দাঁতের সংখ্যাও বেশী। পিছনের যে ছোট্ট চাকাটি রয়েছে, তার বৃত্তের পরিধি ও দাঁতের সংখ্যা কম। (১নং চিত্র দেখ)।
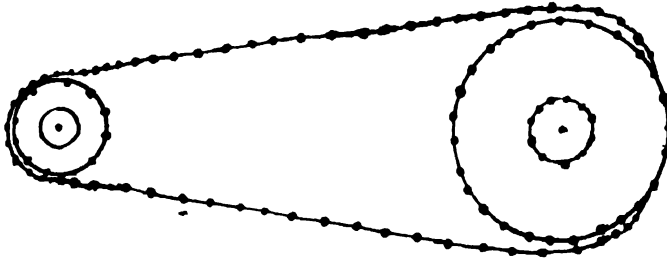
১নং চিত্র।

এখন সাইকেলের প্যাডল ঘুরিয়ে দাও। লক্ষ্য কর, বড় চাকাটি যদি একবার ঘুরে আসে, তার অনুপাতে ছোট্ট চাকাটি কয়েক বার ঘুরে আসবে। এতে গতি বৃদ্ধি হবে।

আবার গতি কমাতে হলে প্যাডল করতে হবে ধীরে ধীরে। কারণ একটা দাঁত থেকে আর একটা দাঁতে যেতে সময় বেশী লাগাতে হবে। আগেই বলেছি, সময় পিছিয়ে গেলে অর্থাৎ বাড়লে গতিবেগ কমবে, আবার সময় কম লাগলে গতিবেগ বাড়বে।

এই তো গেল স্থূল গতিবেগের কথা। কিন্তু এমন যন্ত্র আছে, যার গতি খুবই কম। যেমন—রেকর্ডিং ড্রাম (Racording drum)। যখন তোমরা শারীরবিদ্যা অনুশীলন করবে, তখন হামেশাই এসব যন্ত্রে কাজ করতে হবে। এদের গতিবেগ অত্যন্ত কম

সেকেণ্ডে ০·১২ মিলিমিটার। এখন তোমাদের নিশ্চয়ই জানবার কৌতূহল হচ্ছে, কেমন করে এসব যন্ত্রের গতিবেগ কমানো হয়েছে।
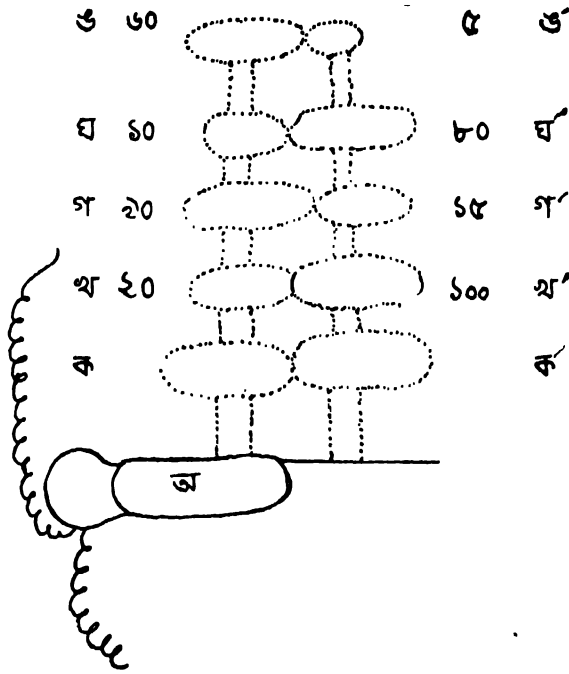
২নং চিত্র। চাকার দাঁত ও পরিধির সাহায্যে গতিবেগ কমানো হচ্ছে।

২নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট একটি বৈদ্যুতিক মোটরের (অ) সাহায্যে ক চাকাটি (বেশ বড় পরিধি ও দাঁতের সংখ্যা বেশী) জোরে ঘুরছে ও তার সঙ্গে যুক্ত একই পরিধি ও দাঁতবিশিষ্ট ক´ চাকাটিও সমান বেগে ঘুরছে। এখন একটি সহজ হিসাব দিচ্ছি—যাতে তোমরা বুঝতে পারবে, চাকার গতি কেমন ভাবে কমে যাচ্ছে।

ধর — খ চাকাটির দাঁতের সংখ্যা ২০
এবং — খ " " " ১০০

এখন ধরা যাক, খ চাকাটির ২০টি দাঁত, খ´ চাকাটির ২০টি দাঁতকে ঘোরাতে ১ সেকেণ্ড সময় লাগে, তাহলে খ´ চাকাটির ১টি দাঁতকে ঘোরাতে $\frac{১}{২০}$ সেঃ সময় লাগবে।

খ ,, ১০০ ,, ,, $\frac{১}{\cancel{২০}} \times \cancel{১০০}^{৫}$

৫ সেকেণ্ড সময় লাগবে।

এই ভাবে গ গ´ চাকাটি ঘুরতে সময় লাগবে ৬ সেকেণ্ড
ঘ ঘ´ " " " " ৮ সেকেণ্ড
ঙ ঙ´ " " " " ১২ সেকেণ্ড

এবার তোমরা বুঝতে পারলে কেমন করে সময় পিছিয়ে দিয়ে যন্ত্রের গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হলো।

শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য

লিউয়েনহোয়েকের অদৃশ্য জগৎ

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষের কৌতূহল শুধু দুটা চোখের দৃষ্টিতে যা দেখা যায়, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাকে ঘিরে যে অদৃশ্য জগৎ রয়েছে এবং সেখানেও যে বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে, সে খবর তখনও সে পায় নি। সেই অদৃশ্য জগতের সন্ধান দিলেন, আজ থেকে প্রায় ২৯৪ বছর আগে হল্যাণ্ডের অ্যান্টনী ভন লিউয়েনহোয়েক অথবা লিউয়েন হো। অজানা দেশের আবিষ্কর্তা হিসাবে কলাম্বাস, ভাস্কো ডিগামার নাম ইতিহাস আর ভূগোলের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। সেই দেশ আগন্তুক মানুষের কাছে নতুন হলেও সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে অতি পরিচিত—আর লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কৃত দেশ, সেই সময়ে কোন মানুষ কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি।

প্রকৃতির বহু রহস্যের কোন কিনারা করতে না পেরে মানুষ নিজেকে তখন কুসংস্কারের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছে। শুধু অপার কৌতূহল আর অপরিমেয় অধ্যবসায়টুকু সম্বল করে সেদিন যাঁরা উপহাস আর নিন্দার মাঝে কাজ করে আজকের মানুষের সামনে নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছেন—তাঁরা নিঃসন্দেহে নমস্য। লিউয়েনহোয়েকের দীর্ঘ একানব্বই বছরের জীবন ঠিক এই রকম এক মহান কর্মময় জীবনের ইতিহাস।

১৬৩২ সালে হল্যাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ট শহরে এক মদ্য ব্যবসায়ীর ঘরে লিউয়েনহোয়েকের জন্ম হয়। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় মা স্কুলে পাঠালেন ছেলেকে এই আশায় যে, বড় হয়ে সে যাতে রাজকর্মচারী হয়। ছেলে কিন্তু ষোল বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে আমষ্টারডামের এক দোকানে শিক্ষানবীশের কাজ নিল এবং একুশ বছর বয়সে নিজের দেশ ডেল্‌ফ্‌টে এসে নিজেই একটা দোকান খুললো। তাঁর পরবর্তী কুড়ি বছরে দুটি বিবাহ আর বেশ কয়েকটি সন্তানের জনক হলো। তার পর কাচ ঘষে লেন্স বানাবার নেশায় মাতলো। প্রতিবেশীরা বললো পাগল, কিন্তু তবু পাগল তার পাগলামী ছাড়লো না। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে তামা এবং সোনার পাত মুড়ে ছোট নলের মত করে তার দু-প্রান্তে নিজের হাতে ঘষা লেন্স বসালেন। এই হলো পৃথিবীর এক আদিম অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এখানে বলে রাখা ভাল যে, লিউয়েনহোয়েক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক নন। তাঁর জন্মের অনেক আগেই জ্যানসেন (১৫৯০ সাল) এবং শিনার (১৬২৮ সাল) অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তার পরে রয়েল সোসাইটির সদস্যেরা স্বীকার করেন যে, সেই সময়ে যে সব অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাওয়া যেত, তাদের

মধ্যে নিঃসন্দেহে লিউয়েনহোয়েকের হাতে-গড়া জিনিষগুলিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ পৃথিবীর প্রতিটি কোণে যখন বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা বিনা আয়াসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অদৃশ্য জগতের বাসিন্দাদের চালচলন দেখে, তখন কি কারুর মনে পড়ে যে, একদিন এই যন্ত্র গড়বার সময়ে লিউয়েনহোয়েক গরম তামায় হাত পুড়িয়েছিলেন!

খেলনা গড়বার পর লিউয়েনহোয়েকের কাজ হলো ঐ হাতে-গড়া খেলনা দিয়ে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দেখা। এই ভাবে তিমির পেশী, গায়ের চামড়া, বিভিন্ন প্রাণীর দেহের লোম, মাছির ঘিলু, মৌমাছির হুল—সব কিছু দেখতে লাগলেন। যা দেখেন তাই লিখে রাখেন, কোনদিন যে এসব জানিয়ে বড় হব, এরকম কোন আশা তাঁর ছিল না। তবে এইটুকু তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর হাতে-গড়া যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সব কিছুর অনেক খুঁটিনাটি ধরা পড়ে, প্রতিবেশীরা যখন লিউয়েনহোয়েককে বাতিল করে দিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে ডেল্‌ফ্‌ট সহরের নামকরা বৈজ্ঞানিক গ্রাফ এলেন লিউয়েন-হোয়েকের ঘরে। নিতান্ত কৌতূহলী হয়েই বোধ হয় লিউয়েনহোয়েকের হাতে-গড়া যন্ত্রে চোখ লাগালেন। লিউয়েনহোয়েক লক্ষ্য করলেন যে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার পর বৈজ্ঞানিক গ্রাফ বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—লিউয়েনহোয়েকের নিখুঁত কাজের কাছে তাঁর নিজের কাজ কত অকিঞ্চিৎকর! আজ থেকে প্রায় তিন-শ' বছর আগে ডেল্‌ফ্‌ট শহরের বৈজ্ঞানিক গ্রাফ-এর কাছ থেকেই লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে চিঠি গেল—'Get Antony Leeuwenhoek to write you telling of his discoveries'.

বৈজ্ঞানিক জগতে লিউয়েনহোয়েকের সেই হলো প্রথম প্রতিষ্ঠা, যদিও অদৃশ্য জগতের খবর তখন তাঁর কাছে অজ্ঞাত।

রয়েল সোসাইটির সদস্যেরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন লিউয়েনহোয়েকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে এবং তাঁকে গবেষণা-পত্র পাঠাতে অনুরোধ জানালেন।

একদিন তাঁর খেয়াল হলো, বাগানের টবে যে বৃষ্টির জল জমে আছে তারই এক ফোঁটা দেখবার। যথারীতি এক ফোঁটা জল নিয়ে তা লেন্সের নীচে দেখে লিউয়েনহোয়েক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। খালি চোখে দেখা যায় না, এই রকম বহু বিচিত্র জীব ঐ একফোঁটা জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বিশ্বাস না হওয়াতে আবার এক ফোঁটা জল নিলেন। কিন্তু এবারেও একই দৃশ্য দেখলেন। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, শুধু এই একফোঁটা জলের মধ্যে অসংখ্য জীবদের দিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকেন। মানুষের ইতিহাসে এই দেখাটুকু নিশ্চয়ই এক অতি শুভক্ষণে হয়েছিল। এমন প্রাণীদের তিনি দেখলেন, যাদের চেহারা তার আগে কোন মানুষ কোন দিন দেখে নি। শুধু দেখেই লিউয়েনহোয়েক ক্ষান্ত নন, ওদের পরিচয় আরো নিবিড় করে জানতে হবে—এই হলো তাঁর প্রতিজ্ঞা। বিশেষ যত্নের সঙ্গে

পরীক্ষা করে লিউয়েনহোয়েক প্রমাণ করলেন যে, ঐ অদৃশ্যলোকবিহারীরা বৃষ্টির জলের সঙ্গে আকাশ থেকে নামে না, টবে জমা বৃষ্টির জলেই উৎপন্ন হয়। লঙ্কা-ভিজানো জল পরীক্ষা করে দেখলেন, সেখানেও অদৃশ্য জগতের বাসিন্দাদের ভিড়।

অনেক পরীক্ষার পর লিউয়েনহোয়েক রয়েল সোসাইটিতে অদৃশ্যলোকের বাসিন্দাদের খবর পাঠালেন। সেখানকার বিজ্ঞ সদস্যেরা তাঁর আবিষ্কারকে অবিশ্বাস করলেন, কারণ তাঁদের দৃঢ় ধারণা, ভগবানের রাজত্বে পনীরের পোকার থেকে ছোট প্রাণী আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু লিউয়েনহোয়েকের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এমনই নিখুঁত যে, তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই লিউয়েনহোয়েকের কাছে চিঠি গেল, রয়েল সোসাইটি থেকে তাঁর হাতে-গড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাঠিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র লিউয়েনহোয়েকের প্রাণ; কিছুতেই তিনি তা হাতছাড়া করবেন না। তাই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বদলে তিনি তাঁর গবেষণার কাগজপত্র এবং যাঁরা ঐ অদৃশ্য জগতের বাসিন্দাদের দেখেছেন—এমন দশজন লোকের চিঠি পাঠিয়ে দিলেন।

রয়েল সোসাইটির সদস্যেরা তখন নিরুপায় হয়ে রবার্ট হুক আর গ্রু-র উপর ভার দিলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং লঙ্কা-ভিজানো জল নিয়ে আসবার জন্যে। ১৬৭৭ সালের পনেরই নভেম্বর হুক এবং গ্রু অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর লঙ্কা-ভিজানো জল নিয়ে এলেন। অবিশ্বাসী সদস্যেরা একের পর এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখলেন যে, লিউয়েনহোয়েকের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একফোঁটা জলে যত প্রাণী রয়েছে, তারা সংখ্যায় লণ্ডন শহরের লোকসংখ্যাকেও বুঝি ছাড়িয়ে যায়! বিচিত্র তাদের গঠন, বিচিত্র তাদের চলবার কায়দা আর বিচিত্র তাদের খাবার ভঙ্গী। অভিনন্দন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে লিউয়েনহোয়েক রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন।

লিউয়েনহোয়েক অদৃশ্য প্রাণীদের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, মানুষের দাঁতে, ব্যাঙের খাদ্যনালীর মধ্যে—সব জায়গাতেই ওরা রয়েছে। তাছাড়া তিনি প্রমাণ করলেন যে, অতিরিক্ত গরমে ঐ সব অদৃশ্য জগতের জীবগুলি মারা যায়। এই পরীক্ষা করবার জন্যে লিউয়েনহোয়েক দিনের পর দিন গরম কফি খেয়ে মুখ পুড়িয়েছেন। অদৃশ্য জগতের জীব আবিষ্কার ছাড়া তিনি মাছের লেজে কৈশিক নালীর মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালন, লোহিত কণিকার আকৃতি, ঈষ্ট নামক এক প্রকার ছত্রাকের দেহের গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ প্রথম আবিষ্কার করেন। সারা জীবনে তিনি প্রায় ২৩৯টি অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং ১৭৮টি লেন্স তৈরি করেছিলেন।

একদিন যাঁরা তাঁকে পাগল বলে উপহাস করেছিল, পরে তাঁরাই তাঁকে উচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

বিবিধ

এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম ভারতীয় দল

নয়া দিল্লী থেকে প্রাপ্ত পি. টি. আই-এর খবরে প্রকাশ—ভারতীয় অভিযাত্রীদল ২০শে মে সকাল সাড়ে নয়টার সময় এভারেস্ট শৃঙ্গে (২৯,০২৮ফুট) আরোহণ করেছেন। ভারতীয় দলের কাছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের এই প্রথম নতি স্বীকার করতে হলো।

২০শে মে ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের দুইজন সদস্য এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তাঁদের নাম হলো ক্যাপ্টেন এ. এস. চিমা ও শ্রীনওয়াং গোম্বু। ২০শে মে সকাল ৫টার সময় শেষ শিবির থেকে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের জন্যে যাত্রার আগে অভিযাত্রীদলের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। অভিযাত্রীদলের শেষ শিবিরটি স্থাপিত হয় ২৭,৯৩০ ফুট উর্ধ্বে। এর আগে কোন অভিযাত্রীদলই এত উপরে শেষ শিবির স্থাপন করেন নি। এই অভিযাত্রীদলের নেতা হচ্ছেন লেঃ কঃ এম. এস. কোহলি।

পরবর্তী এক সংবাদে জানা যায়—ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সোনাম গিয়াৎসো এবং সোনাম ওয়াংগিয়াল ২২শে মে বেলা সাড়ে বারোটায় দ্বিতীয়বার এভারেষ্ট শৃঙ্গে পৌঁছেন এবং ৫০ মিনিট সেখানে অবস্থান করেন।

২৩শে মে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে ভারতীয় অভিযাত্রী দলের সি. পি. বোহ্‌রা এবং আং কামি তৃতীয়বারে এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

নূতন তারকা আবিষ্কার

লণ্ডন থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—এডিনবরা অবজারভেটরির জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবী থেকে একশত আলোকবর্ষ দূরের একটি নতুন তারকার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই সংবাদ ঘোষণা করেছেন ১৩ই মে অবজারভেটরির ডিরেক্টর এইচ. এ. বাক্‌।

রাজস্থানে আর্য সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার

জয়পুর থেকে প্রাপ্ত ইউ. এন. আই-এর এক খবরে জানা যায়—রাজস্থানের ভরতপুর থেকে চার মাইল দূরে নোহ্‌ নামক জায়গায় খননকার্য চালাবার ফলে যে সব পুরাবস্তু পাওয়া গেছে, তাথেকে পুরাতত্ত্ববিদেরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, প্রাচীন যুগে ঐ জায়গায় যে সব লোক বাস করতো, তারা প্রাক্‌-হরপ্পা সভ্যতার যুগের ও হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী যুগের লোক ছিল না, তারা ছিল আর্য। উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকার আর্যেরা ৩,২০০ বছর আগে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করতো এবং তাদের দেবতাদের পূজা করতো।

নোহ্‌তে লৌহনির্মিত যে সব সামগ্রী ও পাত্রের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে সেগুলি নিঃসন্দেহে আর্য-সভ্যতার নিদর্শন।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা নবাবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলির কার্বন পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, এই সব পুরাবস্তুর মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেগুলি খৃঃ পূঃ ১,২০০ অব্দের।

পোড়ামাটির কতকগুলি মাতৃকা মূর্তি (বসুন্ধরা) পাওয়া গেছে। উপবিষ্ট অবস্থায় এই মাতৃকামূর্তির পদযুগলের উপর ধনসম্পদপূর্ণ একটি পাত্র রক্ষিত এবং তার উপর তাঁর দুখানি হাত মনোরম ভঙ্গীতে ন্যস্ত। এই মূর্তির গায়ে যে সাদা রঙের প্রলেপ লাগানো ছিল, তার চিহ্নও বর্তমান। মূর্তিগুলি সুঙ্গ-কুষাণ যুগের বলে প্রকাশ।

একটি অপূর্ব পানপাত্র পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মী-লিপিতে এই পাত্রের ভিতরের দিকে চারটি লাইন এবং বাইরের দিকে একটি লাইন খোদাই করা আছে। তাছাড়া চিত্রিত ও চিত্রিত নয়—এমন বহু পানপাত্র ও ভোজনপাত্র পাওয়া গেছে। এই সব পাত্রের রং কালো, লাল ও ছাইয়ের মত ধূসর।

লুনা-৫-এর চন্দ্রে অবতরণ

মস্কো থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস জানাচ্ছেন যে, রাশিয়ার নতুন উপগ্রহ লুনা-৫ ১২ই মে রাত্রে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। তবে ধীরে ধীরে অবতরণ করবে বলে আগে যে আশা করা হয়েছিল, ঠিক তদনুযায়ী সে চাঁদে নামতে পারে নি।

ইতিপূর্বে যে সকল কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এবং ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—ঝাঁপ দেবার আগেই সেগুলিকে যা কিছু কাজ শেষ করতে হয়েছে।

চাঁদে কোনদিন মানুষের অবতরণ সম্ভব হবে কি না, তাও এই পরীক্ষায় জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে যে ধরণের মহাকাশ-যান রয়েছে, সেগুলি মানুষকে চন্দ্রে নিয়ে যাবার উপযোগী কি না, সঙ্গে সঙ্গে সে পরীক্ষাও হয়ে যাবে।

মার্কিন মহাকাশ-বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, সোভিয়েটের এই চেষ্টা যদি সফল হয় তবে ধরে নিতে হবে যে, চন্দ্রলোকে অবতরণের সম্ভাবনা পরীক্ষার কাজে তাঁরা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন। কেন না, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীর আগে এই ধরণের কোন পরীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র হাত দিতে পারছে না।

লুনা-৫ পর্যবেক্ষকরূপে চন্দ্রে যাচ্ছে। সেখানে যা কিছু সে দেখবে, তাই জানিয়ে দেবে।

১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে লুনিক-৪-কে পাঠানো হয়েছিল, সে চন্দ্রের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসবার পথে সূর্যের গ্রহ হয়ে আজও মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু, লুনা-৫ নিজ দেহটি অক্ষত রেখে চন্দ্র-পৃষ্ঠে গিয়ে অবতরণ করবে, টেলিভিশনে চোখ দিয়ে চন্দ্রের মরু-প্রান্তর দেখে নেবে এবং সেখান থেকে পৃথিবীকে তা জানিয়েও দেবে।

চাঁদে যাওয়া কঠিন

ওয়াশিংটন থেকে প্রচারিত এ. পি-র এক খবরে জানা যায়—মহাকাশ-যান তো দূরের কথা, চন্দ্রপৃষ্ঠ একজন মানুষের ভারও সইতে পারবে কিনা—সে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

[illegible]র রেঞ্জার্স রকেটের সহায়তায় যে সকল ছবি তোলা হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, 'এপোলো' মহাকাশ-যান আরোহী সমেত রন্ধ্রবহুল চন্দ্রদেহ বিদীর্ণ করে সেখানকার পাতাল-পুরীতে ঢুকে পড়বে।

সামান্য একটু বেশী ওজন পড়লে চন্দ্র ভেঙে-চুরে খান খান হয়েও যেতে পারে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ টমাস গোল্ড বলেছেন, চন্দ্রের দূরবিস্তৃত ধূলিপ্রান্তরের নীচে একটি তুষার-প্রান্তর লুকিয়ে আছে।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্ত পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্তে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্তে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্তে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | জুলাই, ১৯৬৫ | সপ্তম সংখ্যা

সূর্যের করোনা

অশেষকুমার দাস

করোনাকে বলা যায় সূর্যের একটি গ্যাসের টোপর। সূর্যের চেহারার সঙ্গে একটু পরিচিত হলেই নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে। কালো কাচের মধ্য দিয়ে তাকালে তাকে একটি জলন্ত থালার মত মনে হয়। এই অংশের নাম ফটোস্ফিয়ার। ঠিক ফটোস্ফিয়ারের উপরেই রয়েছে লাল্‌চে রঙের ক্রোমোস্ফিয়ার—হাইড্রোজেন দহনে যার সৃষ্টি। ক্রোমোস্ফিয়ারের পরে কয়েক লক্ষ মাইল জুড়ে সাদা রঙের হাল্‌কা গ্যাসের ব্যাপ্তির নাম করোনা। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ যখন সূর্যকে ঢেকে ফেলে, তখন করোনাকে দেখতে পাওয়া যায় একটি উজ্জ্বল সাদা জ্যোতিঃপ্রভার মত।

বহুকাল ধরেই করোনা পর্যবেক্ষণের সময় ছিল কেবল পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়টুকু। ফলে জ্যোতির্বিদেরা পেয়েছেন বছরে গড়ে ২.৯ মিনিটের মত সময়—ওইটুকুর মধ্যে সারতে হয়েছে যত কিছু তথ্য সংগ্রহ। করোনা পর্যবেক্ষণের এই অসুবিধা দূর করতে এগিয়ে এসেছিলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী লায়ো (B. Lyot—১৯৩০)। লায়ো দেখলেন—প্রথমতঃ, বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণায় আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে সূর্যের চারধারে করোনার চেয়ে কয়েক শত গুণ বেশী উজ্জ্বল এক জ্যোতিঃপ্রভার সৃষ্টি করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যামেরা বা টেলিস্কোপের লেন্সেরই খুঁৎ থাকবার দরুণ করোনার চেয়ে উজ্জ্বল আর একটি জ্যোতিঃপ্রভার সৃষ্টি হয়। লায়ো এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে একটি যন্ত্র তৈরি

করেন, যা করোনাগ্রাফ নামে পরিচিত (চিত্র-১)। আসলে করোনাগ্রাফ একটি কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। এখানে কেবল চাঁদের জায়গা নিয়েছে একটি ছোট্ট চাকতি। অবশ্য আজও পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় করোনা পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব একটুও কমে নি। কারণ এই সময় করোনা নিখুঁত-ভাবে দৃষ্ট হয়, বিশেষ করে করোনার বহির্ভাগ, যা করোনাগ্রাফে ধরা পড়ে না।

r, সূর্যের কেন্দ্র থেকে সৌরব্যাস এককে দূরত্ব জ্ঞাপন করে। সৌরপৃষ্ঠে $r=1$ এবং প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ইলেকট্রনের ঘনত্ব $N_0 = 4.6 \times 10^8$। এক বর্গ সেঃ মিঃ ক্ষেত্রবিশিষ্ট করোনার সমান দীর্ঘ একটি স্তম্ভে ইলেকট্রনের সংখ্যা দাঁড়ায়—$N = 4 \times 10^{18}$। পরবর্তীকালে ভ্যান ডি হালস্ট (১৯৫০) করোনা থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর জন্যে ধূলিকণাও কিছুটা দায়ী ধরে
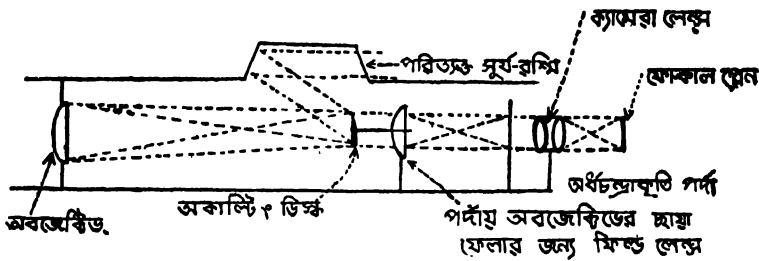
১নং চিত্র।

লায়ো-করোনাগ্রাফ।

করোনাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অন্তর্বর্তী বা K-করোনা এবং বহির্বর্তী বা F-করোনা। এই দুই ভাগের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত না হলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণালীর মধ্যে পার্থক্য আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় K. Schwarzschild K-করোনা এবং সূর্যের মধ্যভাগের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জানিয়েছিলেন—করোনার সাদা আলোর কারণ বিক্ষেপণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো—বিক্ষেপণের ফলে করোনার আলো সাদা না হয়ে নীল হওয়া উচিত, যে জন্যে পৃথিবীর আকাশ নীল দেখায়। অতএব ধরে নেওয়া হলো, করোনার আলো বিক্ষেপণের জন্যে দায়ী ইলেকট্রন। Baumbach (১৯৩০) করোনায় ইলেকট্রনের ঘনত্বের পরিমাপ হিসেবে এই ইণ্টারপোলেশন সূত্রটি দিয়েছেন—

$$N(r) = 10^8 (0.036r^{-1.5} + 1.55r^{-6} + 2.99r^{-16})$$

নিয়ে আরও নির্ভরযোগ্য সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন।

করোনার সাদা আলোর ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে বসলো আর একটি সমস্যা। সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণে আমরা বহু শোষণ-রেখার সন্ধান পাই, যা ফ্রনহফার-রেখা নামে পরিচিত, অথচ অন্তর্বর্তী করোনার বর্ণালীতে সেগুলি অদৃশ্য। এর উত্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানালেন যে, অন্তর্বর্তী করোনায় শোষণ-রেখা দৃশ্য হতো, যদি সেখানকার ইলেকট্রনগুলি স্থির থাকতো। কিন্তু সেগুলি প্রত্যেকে প্রবল বেগে ছুটাছুটি করছে, ফলে ডপ্‌লার এফেক্টের দরুণ শোষণ-রেখাগুলি এতটা ভোঁতা এবং চওড়া হয়ে যায় যে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীর পটভূমিকায় সেগুলিকে সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের দপ্তরে হাজির হলো আর এক বিস্ময়। করোনায়

শোষণ-রেখা অদৃশ্য রাখবার জন্যে ইলেকট্রনগুলির যে গতি দরকার, সেটা অন্ততঃ ১০০০,০০০$^{\circ}$k না হলে হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ করোনার তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রি, যেখানে সূর্যের পিঠের উপরের তাপমাত্রা মাত্র ছয় হাজার ডিগ্রি! এই তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এখনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

করোনার এই প্রচণ্ড তাপমাত্রার ব্যাখ্যা করবার জন্যে বহু তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারোও মতে, হয়তো বা পরমাণুর কেন্দ্রীনের বিভাজনের ফলেই করোনা উত্তপ্ত হয়ে থাকে। অথচ এই প্রক্রিয়া ঘটাবার জন্যে যে পরিমাণ সক্রিয় পরমাণু থাকা দরকার, তা করোনায় অনুপস্থিত। কেউ কেউ বিশ্বতত্ত্ববিদ্ বণ্ডি, হয়েল এবং লিটলটনের মতে, মহাশূন্যে পরিভ্রমণ কালে সূর্য আন্তর্জাগতিক ধূলিকণা আত্মসাৎ করে নেবার ফলে করোনার তাপমাত্রা বজায় থাকে। কিন্তু সূর্য বহির্ভূত কোন কারণের চেয়ে আভ্যন্তরীণ কোন কারণের সম্ভাব্যতা স্বাভাবিক। দেখা যায়, সৌর-কলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে করোনার আকৃতির বেশ একটা সম্পর্ক আছে (চিত্র-২,৩)। অধ্যাপক আলফ্‌ভেনের মতে, সৌরকলঙ্কের আবর্তের ফলে উদ্ভূত বিদ্যুৎ করোনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। করোনার তাপমাত্রার রহস্যের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাকার
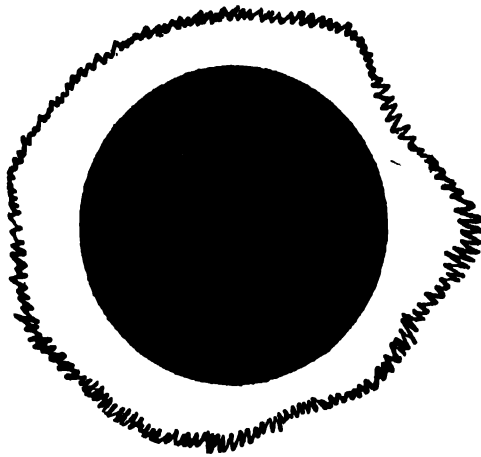
২নং চিত্র।
সূর্যের পিঠে সর্বাধিক সৌরকলঙ্ক অবস্থানের সময় করোনার আকৃতি অনেকটা ডালিয়ার মত (জুন ২৯, ১৯২১)।

বলেছেন, সূর্য থেকে গ্যাস নির্গত হয়ে করোনাকে উত্তপ্ত করে তোলে। কিন্তু দশ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে নির্গত গ্যাসের যে গতিবেগ হওয়া প্রয়োজন, তা কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়া ছয় হাজার ডিগ্রিতে অবস্থিত এক স্থান থেকে দশ লক্ষ ডিগ্রিতে অবস্থিত আর এক স্থানে তাপ সঞ্চারিত হতে পারে না। কারণ এটা সরাসরি তাপীয় গতি-বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী। বিখ্যাত হলেন Houtgast, Biermann এবং Martin Schwarzschild। তাঁরা বলেন—ফটোস্ফিয়ারে অনবরত আলোড়নের ফলে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। এই শব্দ ফটোস্ফিয়ার থেকে করোনার দিকে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম ঘন মাধ্যমের মধ্যে প্রবাহিত হবার সময় "শক ওয়েভের" সৃষ্টি হয়, যার ফলে করোনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

যে সব ঘটনা করোনার তাপমাত্রার সত্যতাকে

সমর্থন করে, তার কয়েকটি হলো—(১) নিম্ন তাপমাত্রার বর্ণালী রেখা করোনায় দেখা যায় না; (২) অন্তর্বর্তী করোনায় ফ্রনহফার-রেখা অদৃশ্য থাকে; (৩) বহির্বর্তী করোনায় ফ্রনহফার-রেখার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা সাধারণ শোষণ-রেখার চেয়ে যথেষ্ট চওড়া; (৪) করোনার বিশাল ব্যাপ্তি বুঝিয়ে দেয় যে, সূর্যের আকর্ষণ সত্ত্বেও গ্যাসের পরমাণুগুলি প্রচণ্ড উত্তাপে প্রবলবেগে ছুটাছুটি করতে করতে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ে;

অতএব ধরে নেওয়া হলো একটি নতুন ধাতুই হচ্ছে বিকিরণ-রেখার কারণ। নামকরণ হলো এই ধাতুটির—করোনিয়াম। কি যেন অশুভক্ষণে এই নামকরণ হয়েছিল! একে একে মেণ্ডেলিফের পর্যায়সারণীর সব কটা ঘর ভর্তি হয়ে গেল—করোনিয়ামের আর জায়গা হলো না। বাধ্য হয়েই তখন এই সিদ্ধান্তে আসতে হলো যে, করোনিয়াম নামে কোন নতুন পদার্থ নয়—পর্যায়সারণীর কোন পরিচিত ধাতুই করোনার
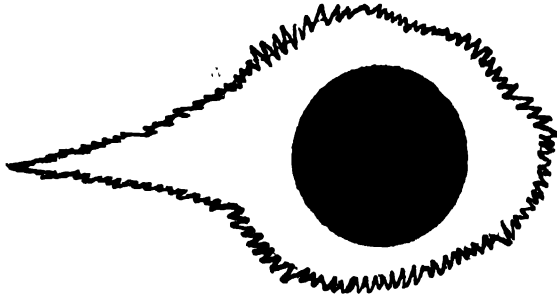
৩নং চিত্র।

সূর্যের পিঠে ন্যূনতম পরিমাণ সৌরকলঙ্কের অবস্থিতির সময় করোনা। বিষুব অঞ্চলে এই সময় করোনা-রশ্মির সর্বাধিক ব্যাপ্তি দেখা যায়। (অগাষ্ট ৩১, ১৯৩২)।

(৫) করোনার বিকিরণ-রেখা (Emission lines) দশ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রার সাক্ষী; (৬) করোনার মধ্যে বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি তার প্রচণ্ড তাপমাত্রার দরুণই ঘটে থাকে।

একটু আগেই আমরা করোনার বর্ণালীতে শোষণ-রেখার অদৃশ্য থাকবার কারণ জেনেছি। কিন্তু করোনার নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীর মধ্যে বেশ কয়েকটা বিকিরণ-রেখার সন্ধান পাওয়া গেল। নতুন আবিষ্কারের এই আনন্দ পরে বিরাট সমস্যা হয়ে চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের পাকে পাকে জড়িয়েছে। প্রথমে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, এই বিকিরণ-রেখার অনুরূপ রেখা পার্থিব কোন ধাতুর বর্ণালী বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন ধাতুর বর্ণালীর সঙ্গেই তা মিললো না।

বিকিরণ-রেখার জন্যে দায়ী। তবে করোনায় তাদের স্বাভাবিক অবস্থার এমন কোন পরিবর্তন ঘটেছে যে, তাদের বর্ণালীতে পাওয়া যাচ্ছে ইতিপূর্বে অজানা রেখার উপস্থিতি। গ্রট্রিয়ান (১৯৩৯) একবার দেখেছিলেন—আয়নিত লোহার বর্ণালীর সঙ্গে কখনো কখনো নোভার বর্ণালীর এবং করোনার কয়েকটি রেখার মিল পাওয়া যায়। গ্রট্রিয়ানের এই ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে সুইডেনের এড্‌লেন (১৯৪১) কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ার এক অনন্য সংমিশ্রণ করে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিলেন, করোনার বিকিরণ-রেখার জন্যে দায়ী আমাদের অতি পরিচিত লোহা, নিকেল এবং ক্যালসিয়াম; তবে তারা বেশ কয়েকটা ইলেকট্রন

হারিয়ে অত্যধিক আয়নিত হয়ে রয়েছে। ইলেকট্রন হারাবার কারণ হিসেবে বলা হলো—করোনার পরমাণুগুলি এমন ছুটাছুটি করে থাকে যে, তাদের একের সঙ্গে অন্যের অনবরত দারুণ সংঘর্ষ ঘটে চলেছে, যার ফলে স্ব স্ব কক্ষ থেকে ইলেকট্রনগুলি বিমুক্ত হয়ে যায়।

নীচে আমরা করোনার বর্ণালী বিশ্লেষণে পাওয়া কয়েকটি ধাতুর বিকিরণ-রেখার সঙ্গে পরিচিত হবো। ষষ্ঠ সারিতে যে আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল দেওয়া হয়েছে, তা নির্দেশ করে সংঘর্ষিত পরমাণুগুলির যথাযথ ইলেকট্রন বিমুক্ত করতে কতখানি শক্তি থাকা দরকার। পঞ্চম সারি নির্দেশ করছে, কয়টা ইলেক্ট্রন একটি পরমাণু থেকে বেরিয়ে এসেছে। Fe XIII বা Fe XI-এর অর্থ লোহার পরমাণু থেকে বারোটি বা দশটি ইলেকট্রন হারিয়ে গেছে।

[তীব্রতার পরিমাপ উজ্জ্বলতম সবুজ রেখার (5303Å) শতকরা ভিত্তিতে]

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য	তীব্রতা গ্রট্রিয়ান 1929	লায়ো 1934-36	রিঘিনি 1936	পরিচিতি	আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল (ev)	দর্শক
3328.1	1.0	—	—	Ca XII	589	ল্যুইস (1908)
3388.10	16.4	—	17.5	Fe XIII	325	নীগ্যামওয়ালা (1898)
3453.13	2.3	—	12.9	—	—	ঐ (ঐ)
3533.42	—	—	1.8	—	—	ল্যুইস (1908)
3600.97	2.1	—	1.0	Ni XVI	455	ঐ (ঐ)
3642.87	—	—	0.9	Ni XIII	350	ডাইসন (1900)
3800.77	—	—	1.1	—	—	ফাউলার ও লক্‌ইয়ার (1898)
3986.88	0.7	—	2.8	Fe XI	261	ফাউলার (1893)
3997	—	—	—	—	—	লায়ো ও ডল্‌ফাস (1952)
4086.29	1.0	—	—	Ca XIII	655	ফাউলার (1893)
4231.4	2.6	—	6.0	Ni XII	318	ঐ (ঐ)
4311.5	—	—	—	—	—	ডাইসন (1900)
4351	—	—	—	—	—	লায়ো ও ডলফাস (1952)
4359	—	—	—	—	—	হিলস্ ও নিউয়াল (1896)
4412	—	—	—	—	—	ডানহাম (1937)
4567	1.1	—	—	—	—	হিলস্ ও নিউয়াল (1896)
4586	—	—	—	—	—	ফাউলার ও লকইয়ার (1898)
5116.03	4.3	2.1	4.8	Ni XII	350	ডাইসন (1905)
5302.86	100	100	100	Fe XIV	355	হার্কনেস (1869)
5445.2	—	—	—	—	—	হ্বাল্ডমিয়ের (1950)
5536	—	—	—	—	—	ডাইসন (1905)

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য	তীব্রতা গ্রট্রিয়ান 1929	লায়ো 1934-36	রিঘিনি 1936	পরিচিতি	আয়োনাই-জেশন পোটেন-শিয়াল (ev)	দর্শক
5694.42	—	1.3	—	—	—	ল'য়ো (1935)
6374.51	8.7	2.3	4.7	Fe X	233	কারাসকে (1914)
6701.83	5.4	2.7	—	Ni XV	422	গ্রট্রিয়ান (1929)
7059.62	—	3.3	—	—	—	লায়ো (1936)
7891.94	—	2 4	—	Fe XI	261	ঐ (1935)
8024.21	—	1.1	—	Ni XV	422	ঐ (1936)
10746.80	—	200	—	Fe XIII	325	ঐ (ঐ)
10797.05	—	125	—	Fe XIII	325	ঐ (ঐ)

করোনার বিকিরণ-রেখাগুলি আমাদের আর একটি খবর দেয়—সেটি হলো এই যে, সেখানকার ঘনত্ব খুব কম। কারণ বিকিরণ-রেখাগুলির মধ্যে তথাকথিত নিষিদ্ধ রেখারও (Forbidden lines) সন্ধান পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ রেখার সৃষ্টি করতে হলে পরমাণুগুলির সুস্থিত অবস্থায় (Metastable state) থাকতে হয়। এটি পরমাণুগুলির এক অত্যধিক উত্তেজিত অবস্থা। গ্যাসের ঘনত্ব বেশী হলে অন্যান্য পরমাণুগুলি অনবরত উত্তেজিত পরমাণুটির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়। ফলে তার শক্তি কমে গিয়ে সুস্থিত থেকে সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। তখন আর তার পক্ষে নিষিদ্ধ রেখা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

করোনা সম্পর্কে আজ আমরা নেহাৎ অজ্ঞ নই। তবু কয়েকটা প্রশ্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিব্রত করে এখনো; যেমন—করোনার ঐ প্রচণ্ড তাপমাত্রার কারণ কি? করোনা কি সূর্যবহির্ভূত কোন কারণে উত্তপ্ত? করোনার বিস্তৃতি কতদূর? সৌরকলঙ্কের সঙ্গে করোনার বিশেষ আকারের সম্পর্ক কি? এসব প্রশ্ন থাকলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে ক্রোমোস্ফিয়ারের চেয়ে করোনা সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে বেশী।

ফারমেট ও তাঁর শেষ উপপাদ্য

যুগলকান্তি রায়

১৯৬৫ সালের ১২ই জানুয়ারীতে বিশ্ববিশ্রুত গাণিতিক ফারমেটের ত্রিশততম মৃত্যুবার্ষিকী পূর্ণ হলো। তিন-শ' বছর আগে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বই, কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটি বইয়ের পাতার মার্জিনের উপর সকলের চোখ পড়লো। গণিতের একটি সমস্যা প্রসঙ্গে সেই মার্জিনের এক অংশে তিনি লিখেছেন যে, তিনি ঐ সমস্যাটির প্রমাণ বের করেছেন, কিন্তু মার্জিনে জায়গা না থাকায় প্রমাণটি লিখতে পারেন নি। প্রমাণটি অন্য কোথাও লিখে রেখে গেছেন কিনা দেখবার জন্যে তাঁর সমস্ত বই, কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও তা পাওয়া গেল না। এই খবর যখন বিশ্বের পণ্ডিতমহলে গিয়ে পৌঁছালো, তাঁরা তখন সমস্যাটি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ তিন-শ' বছর হয়ে গেল কেউই তা প্রমাণ করতে পারেন নি। শেষে একজন জার্মান অধ্যাপক এটি প্রমাণের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কারো ভাগ্যে সে পুরস্কার মেলে নি। ঐ সমস্যাটিই গণিতশাস্ত্রে 'ফারমেটের শেষ উপপাদ্য' (Fermat's Last Theorem) নামে সুবিদিত। গণিত, তথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর কোনও বিষয় এত দীর্ঘকাল ধরে পণ্ডিতমহলে এভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বলে জানা নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর ফারমেট বিংশ শতাব্দীর গণিতের রাজ্যে এক রহস্যময় প্রতিভা হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর পুরা নাম পিয়ের ফারমেট। ১৬০১ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে ফ্রান্সের Beaumont-de-Lomagne-এ তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই গণিতে তাঁর খুব ঝোঁক থাকলেও ত্রিশ বছর বয়সের আগে গণিতে গভীরভাবে মন দেবার অবসর পান নি। ছেলেবেলার শিক্ষা বাড়ীতেই হয়, পরে অন্যত্র আইনশাস্ত্র পড়েন। ত্রিশ বছর বয়সে সরকারের এক কমিশনার পদে নিযুক্ত হন। সতেরো বছর এই পদে থাকবার পর তাঁর পদোন্নতি হয়। ১৬৪৮ সালে Toulouse-এর স্থানীয় পার্লামেন্টে রাজার কাউন্সিলার হন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে যোগ্যতা ও মর্যাদার সঙ্গে এই কাজ করেন।

চাকরীই যেন তাঁর জীবনে আশীর্বাদ রূপে এলো। কাজের ফাঁকে ও অবসর সময়ে গণিত নিয়েই কাটাতেন। গণিতের চর্চাই তাঁর জীবনের একমাত্র সখ ছিল। অবসর সময়ে অঙ্ক কষে আনন্দে এতই বিভোর থাকতেন যে, সে সময় গণিতের যে সব নতুন নতুন চিন্তা ও তত্ত্বের উদ্ভাবন করতেন, তার হিসেবনিকেশ করবার কথাও ভাবতেন না। নাম-যশের প্রতি তাঁর বরাবরের বিতৃষ্ণা, গণিতের কোনও মৌলিক তত্ত্ব প্রকাশ করা তো দূরের কথা, সুসংবদ্ধভাবে কিছু লিখেও যান নি। টুকরা ছেঁড়া কাগজ, চিঠিপত্র, বইয়ের মার্জিনেই তাঁর অবসর সময়ের সমস্ত কাজ ছড়িয়ে রয়েছে। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, গাণিতিক সমস্যার সমাধান তিনি করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, এমন বহু জিনিষের প্রমাণ-পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায় নি। বহু গাণিতিককে প্রমাণের জন্যে বছরের পর বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আবার এমনও হয়েছে যে, অনেক সমস্যার সমাধান করেও জীবিতকালে কাউকে জানান নি, মৃত্যুর বহু বছর পরে হয়তো কোনও টুক্‌রা কাগজ থেকে বা বইয়ের মার্জিন থেকে সমাধানের

সন্ধান পাওয়া গেছে। গণিতে যে সব মৌলিক দান রেখে গেছেন, তা সংগ্রহ করে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পেতে গণিতজ্ঞদের বহু বছর লেগেছে। স্বভাবতঃই তাঁর এই অসামান্য জীবন ও কর্মের কথা মানুষ জেনেছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি আমরা দেখছি, তা সম্ভব হয়েছে গণিতের বিকাশে। সপ্তদশ শতাব্দীর দুই ফরাসী গণিতজ্ঞ দেকার্তে ও ফারমেটের প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করেই নিউটন, গস্, রীমান, লোবাচেভস্কি প্রমুখ গণিতজ্ঞেরা আধুনিক গণিতকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন। দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) ফারমেটের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) হলেন একচল্লিশ বছরের ছোট। এই দুই প্রতিভাধর গণিতজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সঙ্গে ফারমেটের নাম গণিতের ইতিহাসে জড়িয়ে আছে। দেকার্তের অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি (Analytical Geometry) ও নিউটনের অন্তরকলন (Differential Calculus) গণিতে যে নতুন অধ্যায় যোগ করেছিল, তাতে ফারমেটের অবদান কম নয়। ফারমেট ও দেকার্তে উভয়েই গ্রাফ কাগজে বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করে জ্যামিতি ও বীজগণিতের সেতু রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই বিষয়ে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে, বরং ফারমেট আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। দেকার্তের চিন্তা দ্বি-মাত্রিক সমস্যার সমাধানের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ফারমেট এটিকে প্রথম ত্রি-মাত্রিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সফল হন। এভাবে দেকার্তে ও ফারমেটের প্রচেষ্টায় বিন্দুর সঙ্গে সংখ্যার যোগ স্থাপিত হওয়ায় গণিতের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে গেল। অন্তরকলনের আবিষ্কর্তা রূপে নিউটন ও লাইবনিজের (১৬৪৬-১৭১৬) নাম প্রচারিত হলেও ফারমেটই ছিলেন গণিতে এই পদ্ধতি প্রণয়নের পথিকৃৎ। অন্তরকলনের আবিষ্কর্তা কে—নিউটন, না লাইবনিজ? এই নিয়ে ঐ দুই গণিতজ্ঞ ও তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু কেউই জানতেন না যে, তাঁদের বহু আগেই ফারমেট এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন—এমন কি, নিউটনের জন্মের তেরো বছর আগে ও লাইবনিজের জন্মের সতেরো বছর আগেই ফারমেট অন্তরকলনের কয়েকটি মূল ধারণার প্রয়োগও করেছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের আগে একথা কেউই জানতেন না। ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক মুর তাঁর লিখিত নিউটনের জীবনী গ্রন্থে নিউটনের একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। সেই চিঠিতে নিউটন গণিতে অন্তরকলন প্রবর্তনের জন্যে ফারমেটের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন।

সম্ভাবনাবাদের তত্ত্ব (Theory of Probability) হলো ফারমেটের আর এক মহামূল্য অবদান। তাঁরই স্বদেশবাসী প্যাস্কালের সঙ্গে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। পরিসংখ্যানবিদ্যা এই তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জ্যামিতি, অন্তরকলন ও সম্ভাবনাবাদে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর থাকলেও সংখ্যাতত্ত্বেই তাঁর অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গণিতের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। গণিতের বিকাশে পদার্থবিদ্যার বিকাশ সম্ভব। তাই ফারমেটের বহু গাণিতিক অবদান পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিকে সহজতর করেছে। এছাড়া তাঁর বিখ্যাত সূত্র 'প্রিন্সিপল অফ লিষ্ট টাইম' (Principle of least time)-এর সাহায্যে তিনি আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মাবলী প্রমাণ করেন। আলোকবিদ্যায় তাঁর একটি গাণিতিক সূত্রের প্রয়োগের মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum theory) গাণিতিক রূপ তরঙ্গ-বলবিদ্যার (Wave mechanics) আভাসও পাওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে ফারমেট যা কিছু রেখে গেছেন, সবই তাঁর অবসর সময়ে খেয়ালী মনের সৃষ্টি। তাই

প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বেল সৌখীন গণিতজ্ঞদের 'যুবরাজ' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তাঁর যে শেষ উপপাদ্যটির কথা সুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হলো তাঁর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আধুনিক গণিতের সমস্ত ছলাকলা এর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এটি এতই সহজ ও সরল যে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়—কি রহস্য এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে, যার জন্যে এই উপপাদ্যটি তিন শতাব্দী ধরে গণিতের শ্রেষ্ঠ দিকপালদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে?

আলোকজাণ্ড্রিয়ার গাণিতিক ডায়োফ্যান্টাসের 'এরিথ্মেটিকা' (Arithmetica) থেকে এই উপপাদ্যটি গড়ে তোলবার প্রেরণা পান। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ডায়োফ্যান্টাস মিশর ও মেসোপটেমিয়ার গাণিতিকদের বীজগণিতে গবেষণালব্ধ ফলকে সম্প্রসারিত করেন ও তিনি নিজেও এই সম্পর্কে বহু গবেষণা করেছেন। এই বিষয়গুলিকে তিনি এরিথ্মেটিকায় লিপিবদ্ধ করে যান। এই বইয়ের একটি ফরাসী অনুবাদ ফারমেটের হাতে পড়ে। কোনও কিছু পড়তে পড়তে কোনও নতুন প্রশ্ন বা চিন্তা মনে এলে সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বইয়ের পাতার মার্জিনেই লিখে রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। এরিথ্মেটিকা থেকে সাধারণ-সংখ্যার নানা ধর্ম আমরা জানতে পেরেছি। বীজগণিতের নানা ধরণের সমীকরণের সামাধানের পদ্ধতিও এই বইয়ে পাওয়া যায়। পিরামিড ও যজ্ঞবেদী নির্মাণের অভিজ্ঞতায় মিশরীয় ও ভারতীয়গণ জেনেছিলেন—৩, ৪ ও ৫ দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট বাহুত্রয় সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে। তাঁরা এও অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন যে, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অপর দুটি বাহুর বর্গের সমষ্টি। পীথাগোরাস এর জ্যামিতিক প্রমাণ দিলেন। আর ডায়োফ্যান্টাস এমনই এক পদ্ধতি বের করলেন, যার সাহায্যে এমন পূর্ণসংখ্যা পাওয়া যাবে, যাদের দুটির বর্গের সমষ্টি অপরটির বর্গের সমান; অর্থাৎ গণিতের ভাষায় তাঁর ঐ পদ্ধতির সাহায্যে এমনই তিনটি পূর্ণসংখ্যা পাওয়া সম্ভব, যা $x^2+y^2=z^2$ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে, যেমন—৫, ১২ ও ১৩, ৬, ৮ ও ১০ ইত্যাদি। সৌখীন গণিতজ্ঞ ফারমেট ভাবলেন, তাহলে কি x, y ও z-এর উচ্চতর ঘাতেও এরকম সম্পর্ক থাকা সম্ভব? x, y, z-এর মান পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ যাই হোক না কেন, তা দিয়ে কি $x^3+y^3=z^3$, $x^4+y^4=z^4\cdots$ ইত্যাদি সমীকরণগুলি সিদ্ধ হওয়া সম্ভব? সার্বিক ভাবে তাঁর চিন্তাটি হলো, n-এর যে কোনও মানে এমন তিনটি সংখ্যা x, y, z পাওয়া সম্ভব কিনা, যা $x^n+y^n=z^n$ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করবে। ফারমেটের উত্তর হলো—না। n-এর মান ২-এর বেশী পূর্ণসংখ্যা হলে এরকম সম্পর্ক-যুক্ত তিনটি সংখ্যা (পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ) পাওয়া সম্ভব নয়। এটিই হলো তাঁর বিখ্যাত 'শেষ উপপাদ্য' যা 'ফারমেটের শেষ উপপাদ্য' নামে সুবিদিত। এই উপপাদ্যটির প্রমাণ সম্পর্কে ফারমেট ঐ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম সমস্যাটির পাশে লিখে রেখেছেন—"কিন্তু একটি সংখ্যার ঘনফলকে দুটি সংখ্যার ঘনফলের যোগফলে অথবা সাধারণভাবে তিন-এর বেশী কোনও ঘাতকে দুটি চতুর্থ ঘাতের যোগফলে পৃথক করা। আমি এর সুন্দর প্রমাণ বের করেছি, কিন্তু তা লেখবার পক্ষে পাতার মার্জিন খুব কম।" বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গণিতজ্ঞগণ এই উপপাদ্যটি প্রমাণ করতে গিয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যে গণিতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন বটে, তবুও এটি প্রমাণ করতে পারেন নি। কুমার ও ডেডিকেণ্ড এটি প্রমাণ করতে গিয়ে আদর্শ সংখ্যা (Ideal number) সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে অয়লার (Euler) ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডিরিখ্লেট ও লিজেণ্ডার ৪র্থ ও ৫ম

ঘাতের ক্ষেত্রে উপপাদ্যটির সত্যতা প্রমাণ করেন। বহু গাণিতিকের চেষ্টায় n-এর বহু মান পর্যন্ত ঐ সমীকরণটির অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি, এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৪,০০০-এর কম কোনও মৌলিক সংখ্যা n-এর দ্বারা যদি x, y, z বিভাজ্য না হয়, তাহলে n-এর সেই মানে এমন কোনও তিনটি পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে না, যা ঐ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে। কিন্তু সার্বিকভাবে অর্থাৎ n-এর যে কোনও মানেও যে এই উপপাদ্যটি সত্য, তা আজও প্রমাণিত হয় নি। ফলে এ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। কেউ কেউ দুঃখ করে বলেন, পাতার মার্জিনটি কেন বড় হলো না! কেউ বা আবার সন্দেহ করেন, ফারমেট কি সত্যিই এর প্রমাণ বের করেছিলেন? সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ গসের মত মানুষও বলে ফেললেন যে, ফারমেট এটি প্রমাণ না করেই ঐসব কথা লিখেছেন। ফারমেটের মত সৎ প্রকৃতির মানুষ সম্পর্কে গসের এই উক্তিতে বহু গণিতজ্ঞ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, এমনও হতে পারে তাঁর প্রমাণে হয়তো ভুল ছিল, তিনি ধরতে পারেন নি। সংখ্যাতত্ত্বে অসীম প্রতিভার অধিকারী ফারমেট সম্পর্কে এরকম চিন্তা করতেও অনেক গণিতজ্ঞ রাজী হন নি। তাঁর প্রমাণে ভুল থাকুক বা না থাকুক, এই উপপাদ্যটি যে গণিতজ্ঞদের কাছে একটা বস্তু বড় চ্যালেঞ্জ, তা কেউ অস্বীকার করেন না। এখন গণিতজ্ঞদের কাছে পথ দুটি। হয় এটিকে প্রমাণ করা, নয়তো দুই-এর বেশী কোনও ঘাতে এমন তিনটি সংখ্যা বের করা, যা দিয়ে ঐ সমীকরণটি সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। প্রথমটি হলে ফারমেটের উপপাদ্যটির সত্যতা প্রমাণিত হয়, শেষেরটি হলে তার উপপাদ্যটি যে ভুল, তা প্রমাণিত হয়।

উপপাদ্যটির নাম নিয়েও গণিতজ্ঞদের কৌতূহলের শেষ নেই। কেন এটিকে 'শেষ উপপাদ্য' বলা হলো? তাহলে কি এর পরে তিনি আর কোনও তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি? কিন্তু ১৬৫৪ সালে তাঁর সঙ্গে প্যাস্কালের যে পত্র বিনিময় হয়, তা থেকেই সম্ভাবনাবাদের তত্ত্ব গড়ে ওঠে। অথচ এই উপপাদ্যটির প্রকাশ কাল ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। তাহলে এই উপপাদ্যটির এরূপ নাম করা হলো কেন? অনেকে বলেন, তিনি যা কিছু প্রমাণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, তার কতকগুলির প্রমাণের সন্ধান তাঁর কাগজপত্রে পাওয়া গেছে, যেগুলির পাওয়া যায় নি, অন্যান্য গণিতজ্ঞেরা সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র গাণিতিক সিদ্ধান্তেরই কোনও প্রমাণ তাঁর কাগজপত্রেও পাওয়া যায় নি, আর কেউ তা প্রমাণও করতে পারেন নি। এসব কারণেই নাকি এর নাম 'শেষ উপপাদ্য'।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু গণিতজ্ঞ, বহু গবেষক এর প্রমাণ দিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রাশি রাশি কাগজ পাঠালেও শেষ পর্যন্ত বিচারে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে আবার প্রমাণ পাঠিয়ে কিছুদিন পরেই তাঁদের প্রমাণে ভুলের কথা জানিয়ে দেন। গাণিতিকদের এই সব ব্যর্থতা দেখে ১৯০৮ সালে জার্মান অধ্যাপক পল ভুলফ্‌সেল্‌ (Paul Wolfskehl) এর জন্যে এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা করেন। বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কের মূল্য কমলেও উপপাদ্যটির মূল্য কমে নি। এখনও পর্যন্ত পুরস্কারটি অজেয় হয়ে আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফারমেট বিংশ শতাব্দীর গণিতজ্ঞদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। যে গভীর রহস্য এই উপপাদ্যটিকে ঘিরে রয়েছে, তা যিনি ভেদ করতে সক্ষম হবেন, গণিতের রাজ্যে তাঁর আসন দেকার্তে, নিউটন, লাইবনিজ, গস্‌, রীম্যান, লোবাচেভস্কি প্রমুখ দিকপাল গণিতজ্ঞদের পাশেই থাকবে।

আলোক-রসায়নের কয়েকটি কথা

শ্রীমহিমারঞ্জন প্রামাণিক

রসায়নশাস্ত্রে অধিকাংশ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় আলোর অবদান এবং উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ও একান্ত প্রয়োজনীয়। দেখা গেছে, আলোর উপস্থিতিতে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার গতি অন্ধকার অপেক্ষা অনেক বেশী এবং কার্যকরী। এমন কি, কোন কোন প্রতিক্রিয়ার সুরুতেই আলো পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

আলোক-রসায়ন হচ্ছে রসায়নশাস্ত্রের এমন একটি অচ্ছেদ্য অংশ, যাতে আলোর দ্বারা সংঘটিত একাধিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

আমাদের কাছে আলোক-রসায়ন কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা আরও সহজ হয়ে যাবে, যদি আমরা আলোর দ্বারা প্রভাবিত একাধিক প্রতিক্রিয়ার ধারাগুলি লক্ষ্য করি; যেমন—

দৃশ্য আলোক বা অতিবেগুনী রশ্মির সান্নিধ্যে

১। হাইড্রোজেন + ক্লোরিন ————————→ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।
$(H_2) + (Cl_2)$ $(2HCl)$

সূর্য রশ্মির প্রভাবে

২। ব্রোমিন + অ্যাসেটিক অ্যাসিড ————→ ব্রোমো-অ্যাসেটিক অ্যাসিড + হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড।
(Br_2) $(CH_3\ COOH)$ $(CH_2\ Br\ COOH) + (HBr)$

৩। হাইড্রোকার্বনের প্রতিক্রিয়া—

ডোডেকেন + সালফার ডাইঅক্সাইড + ক্লোরিন ————→ ডোডেকেন সালফনক্লোরাইড + হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
$(C_{12}H_{26}) + (SO_2) + (Cl_2)$ (কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দৃশ্য আলোর প্রভাবে) $(C_{12}\ H_{25}\ SO_2\ Cl) + (HCl)$

৪। প্রোপিলিন + হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড
$CH_3CH{=}CH_2 + HBr$

অন্ধকারে —→ $CH_3\ CH\ Br\ CH_3$ (আইসোপ্রোপাইল ব্রোমাইড)

আলোর প্রভাবে —→ $CH_3\ CH_2\ CH_2\ Br$ (২-ব্রোমো প্রোপেন)
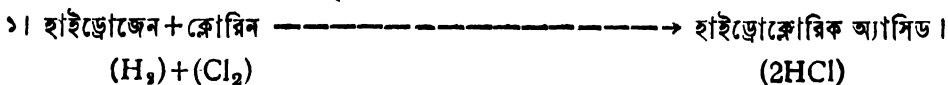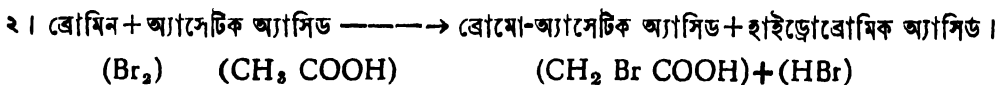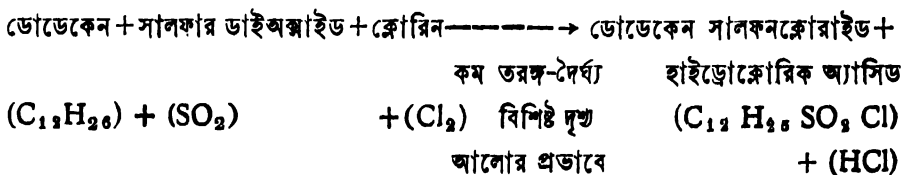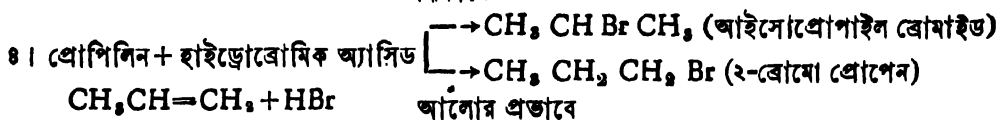
৩নং প্রতিক্রিয়াটি সচরাচর অন্ধকারে ঘটে না, কিন্তু আলোর সান্নিধ্যে সহজেই ঘটে থাকে।

৪নং প্রতিক্রিয়াটি সাধারণ জৈব প্রতিক্রিয়া, ডবল বন্ধনীতে হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড সংযোগে আলোর সংস্পর্শে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে ঘটে থাকে।

এক্ষেত্রে মার্কোনিকফের নিয়ম (Markownikoff's Rule) কার্যকরী। এই বিজ্ঞান

আলোচনার পূর্বেই আলো জিনিষটা কি, আমাদের তা ভাল করে জেনে নিতে হবে।

আলোর বৈশিষ্ট্য—ম্যাক্সওয়েলের সূত্রানুযায়ী আলো-কে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য তরঙ্গগুলির মত আলোরও নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্তমান। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য তাদের রং বা বর্ণালীর স্থানের উপর নির্ভরশীল। তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য ন্যূনতম ও বৃহত্তর হয়ে থাকে। জোড়ালো রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, মাত্র ১ অ্যাংষ্ট্রম (Å = Angstrom) এবং বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য শত শত মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণ দৃশ্য আলোক রশ্মি ঐ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক মিনিট ভগ্নাংশ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। এই আলোক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিস্তার মোটামুটিভাবে ৪০০০ Å থেকে (আসমানী) ৮০০০Å (লোহিত) পর্যন্ত। নিকটতম সীমানায় প্রায় ২০০০ Å-এর নীচে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে (আলট্রাভায়োলেট) অতি-বেগুনী রশ্মি এবং ১০,০০০ Å বা তারও দূরের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে (ইনফ্রারেড রে) নিম্ন লোহিত রশ্মি বলে। আলোক রসায়নের জন্যে আলো বহু ছোট ছোট শক্তির প্যাকেট বলে ধরা হয়েছে, যাদের নাম ফটোন বা কোয়ান্টা। এই প্রতিটি ফটোনের শক্তি কতটা তাও জানা যেতে পারে, যদি প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সঙ্গে আলোর কম্পন-সংখ্যা গুণ করা যায়।

একটি ফটোনের শক্তি, যার কম্পন-সংখ্যা ν (নিউ) $= h\nu$, h হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক। তা-হলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে, যখন কোন আলো কোন বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন বস্তুটির একটি অণু বা পরমাণু কেবলমাত্র একটি সম্পূর্ণ ফটোনকে শোষণ করতে পারে। সেই সময় ফটোনের শক্তির পরিমাণ হচ্ছে $h\nu$।

যেহেতু লাল আলোর কম্পন-সংখ্যা সবুজ আলোর কম্পন-সংখ্যা অপেক্ষা ভিন্ন, সেহেতু এই লাল আলোর কোয়ান্টাম শক্তি সবুজ আলোর কোয়ান্টাম শক্তি অপেক্ষা ভিন্ন।

আবার যতই লাল থেকে সুরু করে বেগুনীর দিকে যাওয়া যায়—আলোর কম্পন-সংখ্যা ততই বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অণুতে শক্তির পরিমাণও বেড়ে চলবে, যতই বেগুনী আলোর দিকে বা বেগুনী আলোর সীমারেখা অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়া যাবে।

একমাত্র এই কারণের জন্যে অতিবেগুনী রশ্মির আলোক-রাসায়নিক ক্ষমতা সাধারণতঃ দৃশ্য আলোক অপেক্ষা বেশী এবং আসমানী আলোক অপেক্ষা বেশী ক্রিয়াশীল। সূর্যের আলো বা অন্য যে কোন আলোর আলোক-রাসায়নিক ক্ষমতাসম্পন্ন অংশকে 'সক্রিয় রশ্মি' বলা হয়।

বস্তুর দ্বারা আলোক শোষণ—এই রসায়নের সর্বপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্নই হচ্ছে—যখন বস্তুর অণু বা পরমাণু ১ কোয়ান্টাম পরিমাণ আলোক শোষণ করে, তখন বস্তুকণাটির ভৌতিক বা রাসায়নিক অবস্থার কি পরিবর্তন হতে পারে? সাধারণতঃ প্রথমেই অণুটির শক্তি বৃদ্ধি পায় $h\nu$ পরিমাণ এবং অণুটির ভিতরে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত হয়। এই তড়িৎ-শক্তি কম্পনশীল বা ঘূর্ণনশীল শক্তি বলেও অভিহিত হয়।

বর্ণালী-বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের পরিভাষায় সাধারণ অণুগুলিকে অচল ও শান্ত এবং আলোকিত বস্তুগুলিকে সক্রিয় ও উত্তেজিত বলে ধরা হয়েছে। এই আণবিক উত্তেজনার কম-বেশীর কারণ একমাত্র শক্তিসম্পন্ন প্যাকেটগুলির উপর নির্ভর করে, যেগুলি থেকে $h\nu$ পরিমাণ শক্তি অণুগুলিতে প্রেরিত হয়। সাধারণ আলো বস্তুর একটি অণুকে ইলেকট্রনের সাহায্যে উত্তেজিত করে এবং শক্তির তলকে উন্নীত করে। যদি সেই শক্তির মাত্রা বেশী হয়, তাহলে কম্পনশীলতার মাত্রা অণুটিকে বিশ্লেষিত করবার পক্ষে

যথেষ্ট হয়ে থাকে, যেমন—ব্রোমিনের বাষ্পকে আসমানী, বেগুনী বা অতিবেগুনী আলোর দ্বারা আলোকিত করলে ব্রোমিনের পরমাণুতে পরিণত হয়। অ্যাসিটোনের বাষ্পকে অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা আলোকিত করলে C—C বন্ধনীটি ছিন্ন হয়ে যায় এবং দুটি স্বাধীন যৌগে পরিণত হয়। এই বিশ্লেষিত পরমাণু এবং যৌগগুলিই পরে প্রতিক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

ব্রোমিনের অণু + ফটোনের শক্তি → ব্রোমিনের পরমাণু

$$(Br_2)+(h\nu) \rightarrow Br+Br.$$
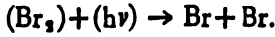
অ্যাসিটোন + ফটোনের শক্তি → মিথাইল যৌগ + মিথাইল কার্বোনাইলের যৌগ

$$CH_3COCH_3+h\nu \rightarrow CH_3+CH_3CO.$$
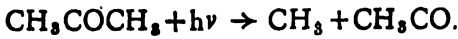
আলোর দ্বারা ঘটিত অনেক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ধারা খুবই জটিল এবং এই সকল প্রতিক্রিয়ার সঠিক বিবরণ এখনও অজ্ঞাত। আলোক-রসায়নশাস্ত্রে দুটি সূত্র খুবই প্রয়োজনীয় এবং খুব ভালভাবেই এই বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন মেনে চলে।

১। আলোক-রসায়নের প্রথম সূত্র—আলোর যে অংশটুকু বস্তুর দ্বারা শোষিত হয়, তাকে আলোক-রসায়নে সক্রিয় আলো বলে। এই সূত্রকে গ্রোথাস ড্র্যাপারের (Grothus Draper) আলোক-রাসায়নিক সূত্রও বলে। সূত্রটিতে বলা হয়েছে, বস্তুগুলির নিজেদের শোষক বাহু থাকে, যাদের সাহায্যে তারা নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গকে শোষণ করে নিতে পারে। তখন ঐ অলোই আলোক-রাসায়নিক রূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কারণ যখন আলোক শোষিত হয় না, তখন অণুগুলিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না; সেখানে আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়াও সাধিত হবে না।

২। আইনষ্টাইনের আলোক - রাসায়নিক সমতুল্যতার সূত্র—এই সূত্রে বলা হয়েছে, বস্তুর একটি অণু বা পরমাণু এক কোয়ান্টাম পরিমাণ আলোক শোষণ করতে পারে। প্রতি কোয়ান্টাম আলোতে $h\nu$ পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে। প্রতি কোয়ান্টাম আলোর শক্তি $=h\nu$ অর্থাৎ নির্ভরশীল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলই হচ্ছে উত্তেজিত অণু বা পরমাণুগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন অণুগুলির স্বাধীন প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে। আমরা জানি, কেবলমাত্র বস্তুর সক্রিয় অণুর দ্বারাই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সাধিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া সকল অণুর আলোক শোষণের দ্বারাই সুরু হয়। কারণ অণুগুলিকে সক্রিয় করবার শক্তি আলোর মধ্যে অপর্যাপ্ত থাকে। একাধিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ধারা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আলোক শোষণের দ্বারা অণুতে শক্তির মাত্রা, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াতে নিয়োজিত শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। অধিকাংশ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াতে প্রতিক্রিয়ার শক্তির সীমানা হচ্ছে ১০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ক্যালোরী পর্যন্ত, কিন্তু সমগ্র বস্তুপিণ্ডে আলোর কোয়ান্টাম শক্তি $Nh\nu$ (N হচ্ছে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা) সাধারণতঃ অনেক বেশী। এই পরিমাণ শক্তিকে ১ আইন-ষ্টাইন বিকিরণের সংখ্যাও বলে।

কোয়ান্টাম শক্তির পরেই আসছে তার ক্ষমতার কথা। কোয়ান্টাম আলোর ক্ষমতা কতটা, তাও আমরা জানতে পারি, যদি আমরা কোন বস্তুতে কত সংখ্যক কোয়ান্টাম আলো শোষিত হলো আর কত সংখ্যক অণু বিভাজিত হলো, তা জেনে থাকি। কারণ কোয়ান্টামের ক্ষমতা হচ্ছে এই দুই সংখ্যার অনুপাত।

$$\text{কোয়ান্টামের ক্ষমতা} = \frac{\text{শোষিত কোয়ান্টামের সংখ্যা}}{\text{বিভাজিত অণুর সংখ্যা}}$$

আইনষ্টাইনের আলোক-রাসায়নিক সমতুল্য-

তার সূত্র অনুযায়ী ১ কোয়ান্টাম আলো ১টি অণুকেই সক্রিয় করে তোলে। যদি প্রতিক্রিয়াগুলি কেবলমাত্র সক্রিয় অণুগুলির বিভাজনের ফলেই ঘটে থাকে, তাহলে আমরা প্রতিটি আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়াতেই সমতা দেখতে পাই, যদিও নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াগুলির কোয়ান্টাম ক্ষমতা কমই সেই সমতা রক্ষা করে। কারণ এগুলির মান ক্রমশঃই কম থেকে বেশীতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

নিম্নমানের কোয়ান্টাম ক্ষমতা সাধারণতঃ উত্তেজিত অণুগুলির প্রতিক্রিয়ায় ব্যবহৃত না হবার জন্যেই হয়ে থাকে এবং বেশী মানের কোয়ান্টাম ক্ষমতা ধারাবাহিকভাবে একাধিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে।

এবার আলোক-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। এই প্রতিক্রিয়াগুলি বিচিত্র ধরণের হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথম ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আলোর সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে অণু বা পরমাণুগুলির বিচ্ছিন্নকরণ। যেমন, হ্যালোজেনের (ক্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদি) যৌগিক উৎপাদন, আলোর সাহায্যে আণবিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

আর এক ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, অণুগুলি আলোক শোষণের পর উত্তেজিত ও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং নিকটতম অন্যান্য অণুগুলির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল অণুগুলি বিশ্লেষিত হয় না। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দুটি অণুর সংযুক্তিকরণ এবং একাধিক জারণ ও লঘুকরণ প্রক্রিয়ায় সাধিত প্রতিক্রিয়া। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা সহজ করা যাক।

(ক) ক্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদির জৈব যৌগিক উৎপাদন :—

এই প্রতিক্রিয়ার প্রথমেই দৃশ্য আলোক শোষণের পর ক্লোরিন অণুটি ভেঙ্গে যায় এবং পরমাণুতে পরিণত হয়। তারপর পরমাণুগুলি সরাসরিভাবে জৈব বস্তুটির সঙ্গে ক্রিয়া করে বা ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়া করে চলে।

ক্লোরিনের অণু + ফটোনের শক্তি → ক্লোরিনের পরমাণু।

$$(Cl) + h\nu \rightarrow Cl + Cl$$
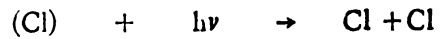
(খ) অ্যানথ্রাসিনের দ্বিআণবিক মৌল :— অ্যানথ্রাসিনের (Anthracene) দ্রবণকে অতি-বেগুনী রশ্মির সান্নিধ্যে রাখলে অ্যানথ্রাসিনের দুটি অণু যুক্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার ধারা দেওয়া যেতে পারে, যেমন—

অ্যানথ্রাসিনের অণু + ফটোনের শক্তি ⟶ শক্তি প্রভাবিত অ্যানথ্রাসিনের অণু

$$A + h\nu \longrightarrow A^*$$
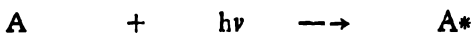
শক্তি প্রভাবিত অ্যানথ্রাসিনের অণু + অ্যানথ্রাসিনের অণু ⟶ দ্বিআণবিক অ্যানথ্রাসিন

$$A^* + A \longrightarrow A_2$$

(গ) আলোক সংযোজন (Photosynthesis) :—এই আলোক-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এর সাহায্যে প্রকৃতি বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল এবং সূর্যের আলোর সংস্পর্শে শ্বেতসার (Starch) জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ক্লোরোফিল (সবুজ কণিকা) প্রভাবকের অংশ গ্রহণ করে থাকে। প্রতি-ক্রিয়াটির রাসায়নিক সমীকরণও দেওয়া যেতে পারে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড + জল + ফটোনের শক্তি ⟶ শ্বেতসার + অক্সিজেন

$$CO_2 + H_2O + h\nu \longrightarrow (C_6H_{10}O_5)n + O_2$$

বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রতিক্রিয়াটির সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও দিতে সক্ষম হন নি। তবে কয়েকটি খুব উপযোগী তথ্যের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন।

আলোক সংযোজনের সময় অক্সিজেনের সৃষ্টি জল থেকে হয়ে থাকে, কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে নয় এবং সেই কারণেই আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়, হাইড্রোজেন জল থেকে বিশ্লেষিত হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু জল বা কার্বন ডাইঅক্সাইড—এই দুটির মধ্যে কোনটিই আলোক শোষণকারী নয়। পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ায় ক্লোরোফিলই আলোক সক্রিয়তায় অংশ গ্রহণ করে। এই ক্লোরোফিলের লোহিত এবং সবুজ আলোক-তরঙ্গ শোষণ করে নেবার ক্ষমতা আছে। এই দুই ধরণের আলোর মধ্যেও আলোক-রাসায়নিক সক্রিয়তা বর্তমান। সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬ কোয়ান্টাম আলো কার্বন ডাইঅক্সাইডের ১টি অণুকে জলের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। এই পরিমাণ আলোক-শক্তি থেকে তার ক্ষমতা নির্ণয় করে দেখা গেছে, এই ক্ষমতার মান কল্পিত ক্ষমতার মানের প্রায় সমান। তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ($^{14}CO_2$) আলোক সংযোজন করে দেখা গেছে, এথেকে বহুবিধ যৌগিক উৎপাদিত হতে পারে; যেমন—ফরম্যালডিহাইড, গ্লিসারেল্ডিহাইড ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার গতি খুবই দ্রুত হয়ে থাকে।

(ঘ) আলোকচিত্রের প্রতিক্রিয়া—আলোকচিত্রের প্লেটটিতে কলোডিয়ন (Collodion) এবং জিলাটিনের সাহায্যে সিলভার ব্রোমাইডের একটি আস্তরণ দেওয়া থাকে।

এই আস্তরণের উপরেই আলোর দ্বারা প্রচ্ছন্ন প্রতিবিম্বটি প্রকাশিত এবং স্থিরীকৃত হয়। আমরা তখনই আলোকচিত্রটি স্পষ্ট দেখতে পাই। এখানেও আলোক সংযোজন প্রক্রিয়া সাধিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আলোর সঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতির বিক্রিয়া আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এই বিক্রিয়ায় প্রাথমিক অবস্থার কথা জানতে পারা গেছে।

ব্রোমিনের একটি আয়ন ১ কোয়ান্টাম আলোর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ব্রোমিনের একটি পরমাণু এবং একটি ইলেকট্রন সৃষ্টি করে; যেমন—

ব্রোমিনের আয়ন + ফটোন বা কোয়ান্টাম-শক্তি → ব্রোমিনের পরমাণু + ইলেকট্রন

$$Br^- + h\nu \rightarrow Br + \epsilon$$
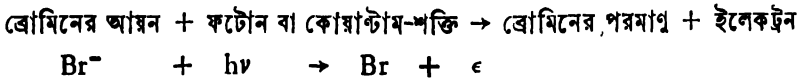
এই ব্রোমিন পরমাণুটি আলোকচিত্রের জিলাটিনের সঙ্গে ক্রিয়া করে এবং ইলেকট্রনটি সিলভার ব্রোমাইডের দানাগুলির মধ্যে কিছু সময় বিচরণ করবার পর সিলভার আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি নিরপেক্ষ সিলভার পরমাণুতে পরিণত করে।

এখানে আলো, সিলভার পরমাণুর অনেকগুলি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে এবং লঘুকরণের জন্যে ব্যবহৃত বস্তুটি আলোকচিত্র প্রকাশ করবার পক্ষে যতটা লঘুকরণ দরকার ততটুকুই করে থাকে, যার ফলে যে স্থানগুলিতে আলোক পৌঁচেছিল, সেই স্থানগুলিতে সিলভারের কলঙ্কের সৃষ্টি হয়। আলোকচিত্রের প্লেটটি হাইপো বা সোডিয়াম থায়োসালফেটের দ্রবণে ধৌত করা হয়। এর ফলে যে পরিমাণ সিলভার ব্রোমাইড অতিরিক্ত থাকে, তা গলে যায়।

এই প্রতিক্রিয়াটি দৃশ্য আলোকের নীল থেকে অতিবেগুনী রশ্মির সীমারেখার মধ্যে সাধিত হয়ে থাকে এবং সেই কারণে এক ধরণের আলোক-সক্রিয় রাসায়নিক বস্তুও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার সাহায্যে সিলভার ব্রোমাইডের দানাগুলিকে সব রকমের দৃশ্য আলোর জন্যে ক্রিয়াশীল রাখা হয়।

উল্কা

বিমলেন্দুনারায়ণ রায়

রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকালে অনেক সময় দেখা যায়, এক খণ্ড আগুন যেন পৃথিবীর দিকে তীব্রবেগে আসতে আসতে হঠাৎ নিবে গেল। অনেকের ধারণা—একটা তারাই বুঝি বা আকাশ থেকে খসে পড়লো! কিন্তু আমাদের প্রশ্ন—এগুলি কি? এদের এখন আমরা উল্কা বলে থাকি—কিছুদিন আগেও কিন্তু এদের সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। বর্তমানে অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা এদের কিছু কিছু পরিচয় পাচ্ছি।

কাল এবং ঋতুভেদে খালি চোখে ঘণ্টায় ২টি থেকে ১০টি উল্কাপাত দেখা যায় বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা। বছরের কোন একটা বিশেষ সময়ে উল্কাপাত ৫০ থেকে ১০০টারও বেশী খালি চোখে ধরা পড়ে। তখন তাকে 'উল্কাবর্ষণ বলা হয়। পুরনো দিনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এরূপ উল্কাপাতের হার ঘণ্টায় কয়েক হাজারও হয়েছে। এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে। এরূপ উল্কাবর্ষণকে উল্কা-ঝড় বলা হয়ে থাকে।

যে সামান্য কয়টি উল্কা আমাদের খালি চোখে ধরা পড়ে, তাথেকে আমরা বিশাল বায়ুমণ্ডলে অবিরত যে বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, তার ধারণা করতে পারি না। প্রথমতঃ, আমরা খালি চোখে আকাশের সামান্য অংশই দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, তারকার ক্ষেত্রে আমরা শুধু উজ্জ্বলতম তারকাগুলিকেই খালি চোখে দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টিশক্তির অতীত (. +১০ আয়তনের) প্রায় ৮০০০ উল্কা প্রতিদিন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। অপর দিকে সেই তুলনায় বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের পতন খুবই কম। বিজ্ঞানীদের মতে, দৈনিক প্রায় ৫০০ কিলোগ্র্যাম ওজনের উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে পড়ছে এবং ১০০০ কিলোগ্র্যামের মত উল্কা পৃথিবীর দিকে আসতে আসতে উচ্চ বায়ুমণ্ডলে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে।

উল্কার বিষয় জানবার কারণ দুটি—প্রথমটি জ্যোতির্বিজ্ঞানঘটিত এবং দ্বিতীয়টি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের ভৌত অবস্থা সম্পর্কিত। অধিকাংশ উল্কাই ৮০ থেকে ১২০ কিলোমিটার উচ্চতায় বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কি জ্যোতির্বিজ্ঞানে, কি পদার্থ-বিজ্ঞানে—উভয় ক্ষেত্রেই এখন শক্তিশালী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—যারা উল্কাপিণ্ডের গভীরের সংবাদ এনে দেবে। আগে ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতেই গবেষণার কাজ চলছিল; কিন্তু এই পদ্ধতি আকাশের অবস্থার উপর নির্ভরশীল বলে আকাশ-বিজ্ঞানীরা আরও উন্নততর ব্যবস্থা অর্থাৎ রেডিও-টেলিস্কোপ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতি পুরাপুরিভাবে আকাশের অবস্থা বা দিনের আলোর উপর নির্ভরশীল নয়। উপরন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র উল্কার আগমনও ধরা যায়।

উল্কাপিণ্ডগুলি সাধারণতঃ ১০ কিঃ মিঃ/সেকেণ্ড থেকে ৭২ কিঃ মিঃ/সেকেণ্ড গতিবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এবং ছুটে আসবার সময় প্রতিটি বায়ু-পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অনেক সময় উচ্চ বায়ুমণ্ডলেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এরূপে বাষ্পীভূত হবার পদ্ধতি আজ বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। তাঁদের ধারণা—

উল্কাপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশ বায়ুর পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষে বিস্ফোরিত হবার সময় একটা বৃহৎ অংশ উল্কাপিণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের গতিশক্তি উত্তাপে পরিবর্তিত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ার সময় উল্কাপিণ্ডটি বাষ্পীভবনের তাপে পৌঁছায় এবং আবদ্ধ অণু-পরমাণুগুলি উত্তাপের গতিবেগে বেরিয়ে আসে। উল্কাপিণ্ডের বন্ধনশক্তি (Binding energy) কয়েক ইলেক্ট্রন-ভোল্ট মাত্র। ফলে আবদ্ধ অণু কর্তৃক প্রদত্ত তাপ বেশ কিছু সংখ্যক পরমাণুকে বাষ্পায়িত করবার পক্ষে যথেষ্ট। বাষ্পায়িত উল্কা পরমাণু উল্কার গতিবেগে চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায় এবং বায়ুর-অণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে স্তিমিত হয়ে আসে। এই বাষ্পায়িত পরমাণুর শক্তি উল্কার গতিবেগ থেকে নির্ধারিত হয় এবং $১০^{২}$ থেকে $১০^{৩}$ ই. ভি.-তে পরিবর্তিত হয়।

উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড গতিবেগে পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসে। পৃথিবী যদি তার আবর্তনের সময় কোন উল্কার সঙ্গে ধাক্কা খায়, তাহলে গাণিতিক নিয়মে সেই উল্কাটি পৃথিবীর গতিবেগেই (৬৭০০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায়) বায়ুমণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধরা হবে। কিন্তু উল্কাগুলি নিজেরাই সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তাদের পৃথিবীতে প্রবেশ করবার গতিবেগ তাদের নিজেদের গতিবেগ এবং পৃথিবীর গতিবেগের সমষ্টির সমান। সূর্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ সঞ্চরমান উল্কাগুলির আসল গতিবেগকে হেলিওসেণ্ট্রিক গতিবেগ এবং তাদের পর্যবেক্ষিত গতিবেগকে জিওসেণ্ট্রিক গতিবেগ বলা হয়।

কখনও কখনও আকাশ থেকে উল্কাবৃষ্টি হতেও দেখা যায়। এই সময় উল্কাপাতের হার ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উল্কাবর্ষণের সময় সমস্ত উল্কাই সমান্তরাল পথে এবং সমান গতিবেগে ধাবিত হয়। বছরের কোন কোন সময়ে উল্কা-বর্ষণ দেখা যায় এবং তাদের গতি-প্রকৃতি কিরূপ, তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যায়।

উল্কাবর্ষণের নাম	সর্বাধিক হবার তারিখ	রাইট এসেনশন (ডিগ্রীতে)	ডিক্লিনেশন (ডিগ্রীতে)	প্রতি ঘণ্টায় পতনের হার (সংখ্যায়)	পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গতিবেগ (কিঃ মিঃ/সেকেণ্ড)
১। কোয়াড্রাণ্টিস	জানুয়ারী ৩	২৩০	+৫২	৩৫	৩৯
২। লিরিডস্	এপ্রিল ২১	২৭০	+৩৩	৮	৫১
৩। ইটা-অ্যাকোয়ারিড্স্	মে ৬	৩৩৮	+৩	১২	৬৬
৪। ডেল্টা অ্যাকোয়ারিডস্	জুলাই ২৮	৩৩৯	—১১	১০	৫০
৫। পারসেইডি	অগাষ্ট ১০–১৪	৪৭	+৫৮	৫০	৬১
৬। ওরিয়নিড্স্	অক্টোবর ২০–২৩	৯৬	+১৫	১৫	৬৮
৭। টরিড্স্	নভেম্বর ৩–১০	৫৫	+১৫	১০	২৭
৮। লিওনিডস্	নভেম্বর ১৬–১৭	১৫২	+২২	১২	৭২
৯। জেমিনিড্স্	ডিসেম্বর ১৩–১৪	১১৩	+৩২	৬০	৩৫
১০। উরসিড্স্	ডিসেম্বর ২২	২০৭	+৭৭	১৩	৩৮

উপরিউক্ত তালিকানুযায়ী সব সময় উল্কাবর্ষণ পরিষ্কার দেখা যায় না। এর কারণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অথবা চাঁদের আলো। সাধারণতঃ দিনের বেলায় উল্কা সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বেতার প্রতিধ্বনির আবিষ্কারের ফলে মেঘ অথবা দিনের আলো আজ আর কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। হে, ষ্টুয়ার্ট, প্রেন্টিস বনওয়েল, লোভেল প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দিনের আলোয় উল্কা সম্বন্ধে যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ভস্মাবশেষের স্তূপের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সঞ্চরণ পথ অতিক্রমের সময় উল্কাবর্ষণ সৃষ্টির একটি চিত্র এখানে দেওয়া হলো (১নং চিত্র)।

অনেক উল্কাবর্ষণের ধারা এবং ধূমকেতুর মধ্যে এমন একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে, যা থেকে একটিকে অপরটি বলে ভ্রম হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের চেষ্টায় এই উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। উল্কাবর্ষণ ধূমকেতুর ভস্মাবশেষেরই একটি ফল বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন। যদিও উল্কাবর্ষণের সঙ্গে ধূমকেতুর সংযোগের দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে, তথাপি এমন উল্কাবর্ষণ আছে, যাদের উৎপত্তিস্থল রূপে কোন ধূমকেতু আজ পর্যন্ত স্থির করা যায় নি; যেমন—জেমিনিড্‌স্ এবং দিবাভাগের অ্যারিয়াটিড্‌স্। আবার এমন অনেক ধূমকেতুও আছে, যারা পৃথিবীর খুব কাছে আসা সত্ত্বেও
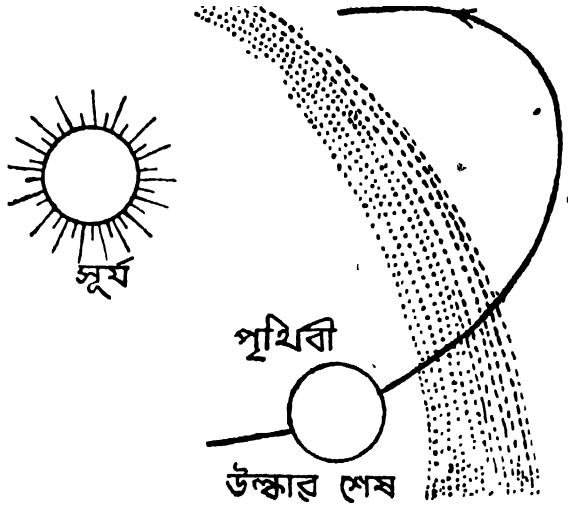
১নং চিত্র।

১৯৪৫ সালের আগে দিনের বেলায় উল্কাবর্ষণের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। ১৯৪৭ সালের ২৮শে জুন তারিখে ক্লেগ, হগো এবং লোভেল সম্মিলিতভাবে দিবালোকে উল্কাবর্ষণের একটা পুরাপুরি প্রামাণ্য তথ্য প্রদান করেন। পরবর্তী কালে ১৯৪৯-৫২ সাল পর্যন্ত আরও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কোন উল্কাবর্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় নি। ধূমকেতু এবং উল্কাবশেষের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভস্মাবশেষ উৎক্ষেপণের প্রকৃতি (অবশ্য যদি তা ধূমকেতু থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়)—এই দুটি আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহলে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশা করতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই দুই সমস্যার সমাধান করে উল্কা এবং ধূমকেতুর সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করে এই দুটি সম্বন্ধে আমাদের আরও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারবেন।

পারমাণবিক তড়িৎ-ব্যাটারী

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

পারমাণবিক শক্তি মানুষের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। মানুষের হাতে এসেছে অমিত শক্তির উৎস। শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারই হচ্ছে বর্তমান যুগের সভ্যতার মাপকাঠি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিপ্রভ পদার্থ (Fluorescent substance) নিয়ে গবেষণা করবার সময় ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেল সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিকিরণের ঘটনা লক্ষ্য করেন। পরে পিয়ারে ও মেরী কুরী, রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় পারমাণবিক বিকিরণের সব রহস্য জানা যায়।

পারমাণবিক বিকিরণজাত রশ্মিকে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের (Magnetic field) দ্বারা প্রভাবিত করলে সেটা তিনটি বিভিন্ন ধর্মের রশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

প্রথম শ্রেণীর রশ্মির চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয় এবং সেটা ধনাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত। এই শ্রেণীর রশ্মির নাম আলফা রশ্মি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবিত হয় এবং সেটা ঋণাত্মক আধানযুক্ত। এই শ্রেণীর রশ্মির নাম বিটা রশ্মি। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, বিটা রশ্মি উচ্চবেগসম্পন্ন ইলেকট্রন প্রবাহ মাত্র।

তৃতীয় শ্রেণীর রশ্মিটি চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ মাত্র। এই শ্রেণীর রশ্মির নাম গামা রশ্মি। জীবদেহের উপর গামা রশ্মির ক্রিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

তারপর বেশ কিছু সময় কেটে গেল। ১৯৩৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী প্রোফে. অটো হান এবং ডাঃ ষ্ট্রাসম্যান ইউরেনিয়ামের ফিসন ঘটিয়ে শৃঙ্খল-বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন। ফলে জন্মলাভ করলো আজকের পারমাণবিক প্রযুক্তি-বিদ্যা বা Nucleonics।

তারপর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেল। মানুষ পরমাণুর ফিসনজাত তাপ-শক্তিকে নানা ব্যাপক ও বিরাট কাজে প্রয়োগ করলো। কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনে পারমাণবিক শক্তির সাহায্য নিতে পারলো না। এর একমাত্র কারণ ভয়ঙ্কর গামা রশ্মির বিকিরণ। সেই কারণেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির (Nuclear Electric Power Plant) স্থান হয়েছে শহর থেকে বহু দূরে মাটির তলায় বায়ুশূন্য স্থান দিয়ে ঘেরা পুরু কংক্রিটের দুর্গে।

পারমাণবিক তড়িৎ-ব্যাটারী পারমাণবিক শক্তিকে সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করবার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ব্যাটারী দিয়ে ইতিমধ্যেই ট্র্যানজিষ্টর-রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

বহু পরীক্ষার পর জানা গেছে যে, কোন কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ স্বতঃবিভাজনের সময় কেবল মাত্র বিটা রশ্মি বা ইলেকট্রন-প্রবাহ বিকিরণ করে। গামা রশ্মি অনুপস্থিত থাকবার দরুণ এইগুলি জীবদেহের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ হচ্ছে এই রকমের একটি আইসো-টোপ। পারমাণবিক রিয়্যাক্টর উপজাত পদার্থরূপে এটি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

পারমাণবিক ব্যাটারীর মূলতত্ত্ব হচ্ছে—

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে বিশেষ ধরণের সেমিকণ্ডাক্টরে পরমাণুর কক্ষের ইলেকট্রনকে মুক্ত করে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করা হয়।

প্রথমতঃ সেমিকণ্ডাকটর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। সেমিকণ্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহীর সঙ্গে ধাতব পরিবাহীর মূল তফাৎ হলো—উভয়ের বিদ্যুৎ পরিবহন করবার ব্যাপারে। সাধারণ অবস্থায় ধাতব পরিবাহীর পরমাণুর কক্ষে মুক্ত ইলেকট্রন বর্তমান থাকে। বিভব-বৈষম্যের (Potential difference) দরুণ ঐ ইলেকট্রনগুলি পরিবাহীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হয়ে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে।

সাধারণ অবস্থায় সেমিকণ্ডাক্টরের পরমাণুতে কোন মুক্ত ইলেকট্রন না থাকবার দরুণ সেটা অপরিবাহী। তবে সেমিকণ্ডাক্টরের উপর যদি তাপ, আলোক বা পারমাণবিক বিকিরণ ইত্যাদি শক্তির প্রয়োগ করা যায়, তবে তাতে মুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়। ফলে সেমিকণ্ডাক্টরটি পরিবাহীর মত ব্যবহার করে।

আবার দেখা গেছে, একাধিক মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত (উদাহরণ—জার্মেনিয়াম ও গ্যালিয়াম এবং জার্মেনিয়াম ও আর্সেনিক) দুটি বিভিন্ন সেমিকণ্ডাক্টর কেলাসের (Crystal) ঠিকভাবে সমন্বয় (Matching) সাধন করতে পারলে সেটা কেবলমাত্র একমুখী তড়িৎ প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। এই সেমিকাণ্ডাক্টরের সমন্বয়ই হলো পারমাণবিক ব্যাটারীর মূল অংশ।

এবার পারমাণবিক ব্যাটারীর গঠনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করা যাক। যদি পূর্বে উল্লিখিত বিশেষ ধরণের সেমিকণ্ডাক্টরের একটি ছোট্ট টুক্‌রার (Wafer) একপ্রান্তে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০-এর একটি পাত্‌লা প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ থেকে বিকিরিত বিটা রশ্মি বা দ্রুতগামী ইলেকট্রনের প্রভাবে সেমিকণ্ডাক্টরটির পরমাণু থেকে বহু ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে সেটাকে পরিবাহীতে পরিণত করবে, আর ইলেকট্রনগুলি সেমিকণ্ডাক্টরটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হবে। এর ফলে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হবে। পূর্বোক্ত সমন্বয়ের দরুণ এই তড়িৎ-প্রবাহ হবে একমুখী, অর্থাৎ ডাইরেক্ট কারেন্ট। এভাবে একটি একক পারমাণবিক তড়িৎ-কোষ পাওয়া গেল। এই কোষের আকার আশ্চর্য রকমের ছোট—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাত্র যথাক্রমে $\frac{1}{10}''$ ও $\frac{1}{8}''$। তবে একটি কোষ থেকে খুব বেশী তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই রকম কয়েক শত কোষকে শ্রেণীবদ্ধভাবে একটি ব্যাটারীতে সাজালে বেশ শক্তিশালী তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে। এই রকম পারমাণবিক তড়িৎ-ব্যাটারী দিয়ে ইতিমধ্যেই রেডিও টেলিভিসন, টেলিফোন ইত্যাদি যন্ত্রকে অত্যন্ত ভালভাবে চালিত করা সম্ভব হয়েছে।

পারমাণবিক ব্যাটারীর কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, ওজন এবং আয়তন, সমান ক্ষমতার শুষ্ক ব্যাটারীর একশত ভাগেরও কম। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাটারীর আয়ুষ্কাল অত্যন্ত বেশী। একটি সাধারণ ব্যাটারী যেখানে মাত্র বারো ঘণ্টা একনাগাড়ে চলতে পারে, সেখানে একটি পারমাণবিক তড়িৎ-ব্যাটারী কয়েক যুগ (১২ বছরে = ১ যুগ) ধরে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করে যেতে পারে। পারমাণবিক তড়িৎ-ব্যাটারী বিজ্ঞানের যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভূমিকর্ষণের গোড়ার কথা

শ্রীঅমিয়কুমার দাশ

শস্য উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী মাটির জৈব-প্রাকৃতিক উপাদানগুলির পরির্বতন করবার নামই কর্ষণ (Tillage)। এযাবৎ ভূমিকর্ষণের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলির অতি অল্পই পরিবর্তন হয়েছে এবং তাদের এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

(ক) কর্ষণ জমিকে বীজ বপনোপযোগী করে তোলে।

(খ) শস্যের শিকড়গুলি যাতে বিস্তৃত স্থান জুড়ে মাটি থেকে খাদ্য আহরণ করতে পারে, কর্ষণ তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(গ) কর্ষণ জমিতে উৎপন্ন আগাছা ধ্বংস করে।

(ঘ) কর্ষণের দ্বারা অতিরিক্ত ঘাস, সবুজসার ইত্যাদি মাটির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশানো যায়, ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) কর্ষণ নীচের মাটিকে উপরে আনে, উল্টে দেয় এবং মৃত্তিকাস্থ ক্ষতিকারক জীবাণুকে উন্মুক্ত রোদের তাপে ফেলে ধ্বংস করে এবং শস্যকে রোগমুক্ত রাখে।

তাছাড়া কর্ষণের দ্বারা আরও চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়—যা শস্য বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত দরকার; যেমন –

(চ) কর্ষণের দ্বারা মাটির মধ্যে উত্তমরূপে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়। মাটিতে বায়ু চলাচলের অসুবিধা ঘটলে অবায়ুজীবী জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্তিকাসংলগ্ন যৌগিক নাইট্রোজেন মুক্ত করে দেয়, ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের অপচয় ঘটে।

(ছ) কর্ষণ জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে। কর্ষণের ফলে মাটি তার রন্ধ্রপথে জল আটকে রাখবার ক্ষমতা পায়, যে জল মাটিতে অবস্থিত রাসায়নিক খাদ্য দ্রবীভূত করে শস্যের শিকড়ের কাছে পৌঁছে দেয়। শিকড় কর্তৃক গৃহীত খাদ্য ও জল শস্যের কোষগুলিকে জীবিত এবং স্ফীত রাখে।

(জ) কর্ষণ মাটির উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। মাটির উষ্ণতা নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়ার জারণ-ক্রিয়ায় সাহায্য করে মাটিতে নাইট্রিফিকেশনের হার বৃদ্ধি করে এবং শস্যের বর্ধিষ্ণু অংশের কোষে সাইটোপ্লাজমের প্রবাহ (Cytoplasmic streaming) ঘটায়। (ঝ) কর্ষণ শস্যের শিকড় মাটিতে প্রবেশ করবার মত সুগম জমি তৈরি করে।

অধুনা কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-যন্ত্রবিদ্যার প্রসার-লাভ হওয়ায় কর্ষণ নীতিগুলির প্রকৃত রূপায়ণের দিকে চেষ্টা চলছে। অতএব এক কথায় বলা যায় কর্ষণের আসল উদ্দেশ্য, জমির উপযুক্ত টিল্‌থ্ (Tilth) আনা। জমির টিল্‌থ্ কিরূপ হবে এবং বিভিন্ন কর্ষণ-যন্ত্রের প্রয়োগ ও তাদের কার্যকারিতা বিচার ঠিক কোন্ সময়ে করা যায়, তা বলা কঠিন। তাই প্রশ্ন আসে—গভীর কর্ষণ শ্রেয়, কি অগভীর কর্ষণ শ্রেয়? জমিতে লাঙল অনেকবার চালানো উচিত, কি অল্প কয়েক বার চালালেই যথেষ্ট? এজন্যে জমির টিল্‌থ্ কেমন হবে, সে বিষয়ে কিছু বলবার আগে জানতে হবে কিরূপ আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে কি কি শস্য কোন্ কোন্ মাটিতে উত্তমরূপে জন্মাতে পারে। তবে টিল্‌থ্ সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে,

জমির এরূপ জৈব-প্রাকৃতিক রূপান্তর সাধন করা, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কর্ষণের গুণাগুণ বিচার অথবা জমির টিল্‌থ্‌ মাপা প্রকৃতপক্ষে না করা গেলেও নিম্নে বর্ণিত উপায়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কর্ষিত মাটির ডেলার আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে। এই প্রথায় কর্ষিত জমির কয়েক জায়গা থেকে নমুনা নিয়ে বিভিন্ন আকারের চালুনি দিয়ে চেলে বিভিন্ন আকারের ডেলা মাটির পরিমাপ নেওয়া হয়। এই শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা কর্ষিত মাটির ডেলা ও কণাগুলির বৃষ্টির আঘাতে বিক্ষিপ্ত এবং বৃষ্টি ও বাতাসের যুগ্ম প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত না হবার মত দৃঢ়তা থাকবে কিনা জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, কর্ষিত মাটির বাল্ক্‌ ডেন্‌সিটি (Bulk Density) দিয়ে মাটির সরন্ধ্রতা মাপা যায় ও কর্ষিত জমির রন্ধ্রপথগুলি ভিতর দিয়ে অধিক জল নিকাশ এবং মাটিতে শস্যের গ্রহণোপযোগী জলধারণ ক্ষমতা থাকবে কিনা জানা যায়। তবে কোন অঞ্চলের মাটির রন্ধ্রপথগুলির বৈশিষ্ট্য, কর্ষণ অপেক্ষা ঐ স্থানের মাটির গ্রন্থন (Texture) কর্তৃক অধিক প্রভাবান্বিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে জমির টিল্‌থ্‌ কিরূপ হবে, তা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়—

(১) জমির উপরিভাগ থেকে অধোভূমি (Sub-soil) পর্যন্ত মাটির কণাগুলি নিরবচ্ছিন্ন রন্ধ্রপথের দ্বারা সংযুক্ত থাকবে, যাতে অধিক বৃষ্টিপাতের জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে।

(২) ঐ রন্ধ্রপথগুলি যেন বেশ কিছুদিন অপরিবর্তনীয় থাকে।

(৩) ঐ রন্ধ্রপথগুলির আবার কৈশিক শক্তির দ্বারা প্রচুর জল ধরে রাখবার ক্ষমতা থাকা চাই, যা শস্যের শিকড় সহজে পেতে পারে, অর্থাৎ মাটির জলধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হওয়া চাই।

(৪) জমির উপকার মাটি এমনভাবে কর্ষিত হওয়া চাই, যেন বৃষ্টির জলের আঘাতে ডেলাগুলি বিক্ষিপ্ত না হবার মত দৃঢ় ও বড় থাকে, অথচ গুঁড়াও যেন এমন হয়, যা বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে অন্তরায় না হয়।

অসীমের অন্বেষণ

তুষার রায়

কবি বলেছেন, 'খোল খোল হে আকাশ—স্তব্ধ তব নীল যবনিকা'। স্মরণাতীত কাল থেকে ক্ষুদ্র এই গ্রহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ সেই সাধনাই করে আসছে। চন্দ্রহীন রাতে নীল আকাশের বুকে তাকিয়ে মানুষ অবাক হয়েছে, কবি কাব্য করেছে, ধর্মপ্রাণ মানুষ পূজা করেছে, দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করেছে, আর সত্যসন্ধ বিজ্ঞান-সাধক চেয়েছে—ঐ অনন্ত রহস্যের যবনিকা ভেদ করতে। মানুষ কতটা সার্থক হয়েছে, সে বিচার করবে মহাকাল।

রাতের আকাশ মানুষের জন্যে বিস্ময়ের ডালি সাজিয়ে যেন অপেক্ষা করছে। অসংখ্য তারকা—কোনটা অনুজ্জ্বল, কোনটা বেশী উজ্জ্বল, আবার কোথাও আকাশের একাংশ আব্‌ছা আলোকিত হয়ে থাকে ছোট ছোট অসংখ্য নক্ষত্রের আলোয়।

তারকাগুলিকে মোট তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) শুভ্র বামন (White Dwarf), (২) প্রধান যোগসূত্রকারী তারকা (Main Sequence Stars), (৩) লাল দৈত্য (Red Giant)। এছাড়াও আকার অনুপাতে তারকাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে; যেমন—প্রথমাকৃতির তারকা (First magnitude stars), দ্বিতীয় আকৃতির (Second magnitude stars) তারকা ইত্যাদি।

তারকাগুলির দূরত্বের কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। সূর্য আমাদের কাছ থেকে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারকা প্রক্সিমা সেণ্টুরি (Proxima Centauri) সূর্যের দূরত্ব অপেক্ষা ২ লক্ষ ৭০ হাজার গুণ বেশী দূরে অবস্থিত। সূর্য একটি তারকা। অতএব আমাদের সবচেয়ে কাছের তারকা হচ্ছে সূর্য।

তারকা বা মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহগুলির দূরত্ব সাধারণতঃ পরিমাপ করা হয় আলোক-বর্ষের হিসাবে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল অতিক্রম করে; এই হিসাবে এক বছরে আলোক যে পথ অতিক্রম করে, তাকে বলা হয় এক আলোক-বর্ষ। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট, অতএব এই হিসাব অনুসারে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে আমাদের যখন প্রাণান্তকর অবস্থা, তখন ভাবতেও আঁৎকে উঠতে হয়—যখন শুনি সূর্য অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তপ্ত তারকা মহাকাশের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের উত্তাপ চার-শত কোটি ডিগ্রী। অথচ এত উত্তপ্ত সূর্যও সিরিয়াস (Sirius) নামক তারকা অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। সিরিয়াস পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সিরিয়াস থেকে আলো আসতে সময় লাগে আট বছর; অর্থাৎ আজ যদি সিরিয়াসে একটি প্রদীপ জ্বেলে আসা যায়, তাহলে আট বছর পরে তা আমাদের পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যাবে। প্রশ্ন জাগতে পারে—যদি সূর্যকে সরিয়ে তার স্থানে সিরিয়াসকে বসানো যেত, তাহলে কি হতো? হতো ভীষণ কাণ্ড, যা ভাবতেও ভয় করে—পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব তো মুছে যেতই, এমন কি নদী, সমুদ্র এবং মেরু অঞ্চলের জমাট বরফ পর্যন্ত বাষ্প হয়ে উবে যেত। আট আলোক বছর দূরের আকাশের উজ্জ্বল আর বড় তারকা হচ্ছে সিরিয়াস। সিরি-

য়াসকে কি করে চিনতে হয়, তা আমরা পরে জানবো। প্রশ্ন হতে পারে, সবচেয়ে অনুজ্জ্বল তারকা কোন্‌টি? সবচেয়ে অনুজ্জ্বল তারকা হচ্ছে 'ভ্যান ম্যানেন-এর তারকা' (Van Mannen's star)—এটি পৃথিবীর প্রায় সমান।

আকাশে সূর্য ও চন্দ্রকে যদিও সমান মনে হয়, আসলে কিন্তু সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা চার-শত গুণ বড় এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বও চন্দ্রের দূরত্বের চার-শত গুণ বেশী। সূর্যের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের চার-শত গুণ বেশী আর পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ বেশী, অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস আট-শত চৌষট্টি হাজার (৮৬৪,০০০) মাইল। সেই হিসাবে তেরো লক্ষ পৃথিবী একত্রিত করলে সূর্যের সমান হয়। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য এত বড় অথচ আকাশের অনেক তারকার তুলনায় সূর্য প্রায় একটা ফুটবলের মত। কালপুরুষ মণ্ডলের বিটলজিয়াস্ক (Betelgeux) এত বড় যে, কয়েক লক্ষ সূর্যকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেও বিট্‌লজিয়াস্কে আরও জায়গা থেকে যায়। আর সূর্যকে সরিয়ে যদি তার জায়গায় বিট্‌লজিয়াস্ককে বসানো যেত, তাহলে পৃথিবীও তার মধ্যে চলে যেত, অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের চেয়েও বিট্‌লজিয়াস্ক-এর ব্যাসার্ধ অনেক বড়। আসলে বিট্‌লজিয়াস্কের ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের ছয় হাজার গুণ বেশী।

খালি চোখের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েও অসংখ্য তারকা অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে আছে। আমাদের খালি চোখের দৃষ্টি কেবলমাত্র সেই সব তারকাগুলিকে দেখতে পায়, যাদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে তিন হাজার আলোক-বর্ষের বেশী নয়। তারপরেই আমাদের দূরবীক্ষণের সাহায্য নিতে হয় এবং দূরবীক্ষণের সীমাও মাত্র চৌদ্দ কোটি আলোক-বর্ষ। মাত্র বলছি এই কারণে যে, ঐ দূরত্বের সীমা ছাড়িয়েও অনেক অনেক তারকা লুকিয়ে আছে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে মহাকাশের সীমা আছে। আজ পর্যন্ত যে মহাকাশের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার পরিধির চারদিকে একবার ঘুরে আসতে আলোর সময় লাগে পাঁচ হাজার কোটি বছর, অর্থাৎ মহাকাশের পরিধি পাঁচ হাজার কোটি আলোক-বর্ষ। আমাদের এই সৌরজগৎ মহাকাশের অতি ক্ষুদ্র এক পরিবার। সৌর-পরিবার নয়টি গ্রহ ও একটি গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) নিয়ে গঠিত। এই সৌরজগৎ আবার ছায়াপথ গোষ্ঠীর (Galactic system) অন্তর্গত অন্যতম পরিবার। ছায়াপথ গোষ্ঠীগুলি আবার তারকানগরীর (Cities) একটি অংশ। নীচের ছকের সাহায্যে ব্যাপারটি স্পষ্ট হতে পারে।
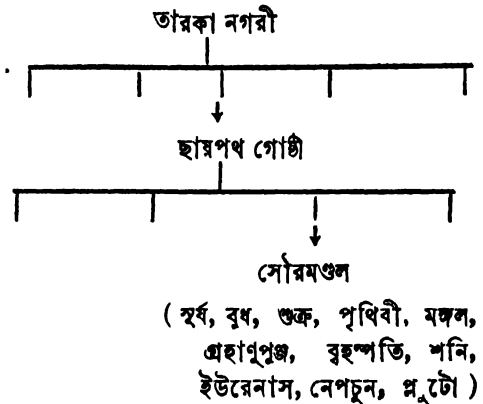
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেধা বৃহত্তর মহাকাশের কল্পনা করে এবং সেই কল্পনা সত্য বলেও বিশ্বাস করে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে একদিন সে বিশ্বাস সত্য বলেই প্রমাণিত হবে।

এখন আকাশের কয়েকটি পরিচিত তারকার অবস্থান আলোচনা করবো। উত্তর আকাশে লক্ষ্য করলে প্রথমেই চোখে পড়ে উজ্জ্বল জিজ্ঞাসা চিহ্নের (?) মত একটি তারকামণ্ডলী (কতকগুলি তারকার একত্র সমাবেশ)। তার নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইংরেজিতে বলে বড় ভল্লুকমণ্ডল (Great Bear)। এখানে সাতটি উজ্জ্বল তারকার সমাবেশ। সপ্তর্ষির নীচে একটু পশ্চিমে আছে লঘুসপ্তর্ষি বা ছোট

ভল্লুক (Little Bear)। এই ছোট ভল্লুকের একেবারে উপরে ভল্লুকের লেজের চুড়ায় যে তারকাটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তার নাম ধ্রুবতারা। আকাশের ঐ অংশে ধ্রুবই সবচেয়ে উজ্জ্বল। প্রায় মাথার উপরে একটু দক্ষিণে কালপুরুষ মণ্ডল। তিনটি উজ্জ্বল তারকা কালপুরুষের কোমরবন্ধনী রচনা করেছে। মনে হয় যেন একটি মানুষ গদা হাতে একটি ষাঁড়ের থেকে আত্মরক্ষা করছে। ঐ মণ্ডলের লালচে উজ্জ্বল তারকাটিই আমাদের বিটলজিয়াস্ক। কালপুরুষের দক্ষিণে বড় কুকুর মণ্ডলীতে (Canis major) আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা সিরিয়াসের অবস্থিতি। ধ্রুবের নীচে একটু পূর্বে হচ্ছে হারকিউলিস মণ্ডল আর হারকিউলিসের একটু উপরে ও একটু পূর্বে রয়েছে বুওতিস (Bootes) মণ্ডল। হারকিউলিস ও বুওতিসের মধ্যস্থলে ইংরেজী ইউ (U) অক্ষরের মত একটি ছোট মণ্ডল আছে। এই ছয় তারকাবিশিষ্ট 'ইউ' আকৃতির মণ্ডলের নাম দেওয়া হয়েছে উত্তরের মুকুট (Northern crown)।

অনন্ত মহাকাশ, অসীম তার বিস্ময়, সীমাহীন তার কথা, ক্ষুদ্র মানুষ তার কতটুকু জানে! তবু জ্ঞানভিক্ষু মানবমন সব সময় তার নতুন নতুন আবিষ্কারের আনন্দে আরও এগিয়ে যাবে জ্ঞান আহরণের জন্যে।

সঞ্চয়ন

মহাকাশে খাদ্য গ্রহণের সমস্যা

মানুষ যে মহাকাশে সার্থকভাবে বেঁচে থাকতে পারে ও কাজ করতে পারে, তা প্রমাণ করাই জেমিনি মহাকাশযানযোগে মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণের অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

মহাকাশ পরিক্রমাকালে মহাকাশচারীদের প্রাথমিক প্রয়োজন হলো জল এবং সুষম খাদ্য। বস্তুতঃ একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ভূপৃষ্ঠের জীবনের চেয়ে মহাকাশের জীবন অনেক বেশী জটিল। এই বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের তথ্যানুসন্ধান করতে হবে—বায়ুশূন্যতা, ভারহীনতা, হ্রাসপ্রাপ্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, সৌর বিস্ফোরণজাত মারাত্মক তেজ বিকিরণ প্রভৃতি সম্পর্কে। এছাড়া অতি সূক্ষ্ম উল্কাকণা সম্পর্কেও তাঁদের গবেষণা করতে হবে। এই উল্কাকণা মহাকাশযানের গাত্র ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে।

মহাকাশে বিচরণকালে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে দুটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমটি হলো কৃত্রিম উপগ্রহে যে খাদ্য প্রেরণ করা হবে, তার ওজন এবং ভারশূন্যতা। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। একটা উপগ্রহকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করতে হলে প্রচুর জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। উপগ্রহের যে সব জিনিষ সরবরাহ করা হবে, তার প্রত্যেকটিরই ওজনে খুব হাল্কা এবং খুব অল্প স্থান অধিকার করা দরকার। প্রতি পাউণ্ড ভারের জন্যে প্রায় এক হাজার পাউণ্ড ওজনের মত ধাক্কার প্রয়োজন হয়।

মহাশূন্যে ভারশূন্যতা মানুষের এক নতুন অভিজ্ঞতা। পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ থাকবার ফলে দ্রব্যাদি নিজ নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হয় না। মহাকাশে কিন্তু অবস্থা বিপরীত। ভারশূন্যতার জন্যে মহাকাশে জলপূর্ণ গ্লাস উবুড় করে দিলেও জল বাইরে গড়িয়ে পড়বে না। তাছাড়া আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, রুটি বা অন্য খাবারের

টুক্‌রা অথবা জলীয় খাদ্যের কৌটা মহাকাশযানের কেবিনের অভ্যন্তরে ভেসে বেড়াতে থাকবে।

মহাকাশ পরিক্রমাকালে মহাকাশযানের কেবিনের মধ্যে ছুরি দিয়ে প্লেটের উপর স্বাভাবিকভাবে মাংস কাটা সম্ভব হবে না। কারণ মাংসের টুক্‌রা পিছলে বেরিয়ে গিয়ে কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে।

১৯৬২ সালে জন গ্লেন যখন মহাকাশ পরিভ্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল টুথপেস্ট জাতীয় টিউবের মধ্যে পেষ্টের আকারে খাদ্যবস্তু। গ্লেন মহাকাশযানের মধ্যে খুব সহজেই টিউব টিপে আহার্য গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্য পাত্রে রাখা জল নলের সাহায্যে পান করেছিলেন।

এই নরম আকারে খাদ্য গ্রহণ করতে মহাকাশচারীরা কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, ভবিষ্যতে যাতে কঠিন খাদ্যবস্তুও মহাকাশ ভ্রমণকালে পাওয়া যায়, যা চিবিয়ে খাওয়া চলে, সেদিক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। স্কট কার্পেণ্টার ১৯৬২ সালে কিছু কঠিন খাদ্যবস্তু তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। এগুলি হলো ঘনকের আকারের বিস্কুট। কিন্তু খাবার সময় অসুবিধা দেখা দিল—বিস্কুটে কামড় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্কুটের টুক্‌রা তাঁর কেবিনের চারদিকে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ফলে বিস্কুটের এই সব টুক্‌রা যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রবেশ করে যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল।

মহাকাশে যে সব খাদ্য প্রেরণ করতে হবে, সেগুলি সম্পর্কে আর এক ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। মানুষ যখন মহাকাশে অবস্থান করবে, তখন সে শারীরিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় থাকবে। তাই তখন অধিক পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ তার পক্ষে অনুচিত হবে। সুতরাং মহাকাশে যে খাদ্যবস্তু প্রেরণ করা হবে, তার মধ্যেও যাতে উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য না থাকে, সেদিকে বিজ্ঞানীদের সতর্ক থাকতে হবে।

মহাকাশের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করা ও তা কোন আধারের মধ্যে রাখবার ব্যাপারে খাদ্য-বিশেষজ্ঞেরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। কতকগুলি শিল্প সংস্থা শুক্‌নো খাদ্যবস্তু উদ্ভাবন করেছে। এসব খাদ্যবস্তুর মধ্যে মাংস, আপেল, পীচ, পীয়ার্স এবং শাকসব্জী ও ফলমূল প্রভৃতিও রয়েছে। যে কোন ফলের রসই শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে আপেল, আঙ্গুর, কমলা-লেবু ও আনারস প্রভৃতির রস শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জলশূন্য খাবার যেমন ওজনে হাল্কা, তেমনি স্থানও দখল করে কম। একজন মহাকাশচারীর পুরা একদিনের টিউব-খাদ্য একটা পাঁউরুটির সমান জায়গা দখল করবে, আর এর ওজন ৩'৬ পাউণ্ড, কিন্তু একদিনের শুক্‌নো খাবারের ওজন হবে মাত্র ১'৩ পাউণ্ড, আর এই টিউব-খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ জায়গা নেবে।

প্লাস্টিক থলির মধ্যে ফলের শুষ্ক রস রেখে তাতে জল মিশিয়ে নিলেই মহাকাশচারীর পক্ষে এক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুত হয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর মহাকাশচারী ইচ্ছা করলে শুক্‌নো খাবারের ট্যাবলেট ব্যাগের মধ্যে রেখে দিতে পারেন—পরে খাবার জন্যে।

কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমাকালে এমন অনেক সময় আসতে পারে, যখন মহাকাশচারী অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবেন, জল মিশিয়ে খাবার প্রস্তুত করে আহার করবার সময় পাবেন না। গর্ডন কুপার মারকিউরী মহাকাশযানযোগে মহাকাশ পরিক্রমায় এই অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন। সে সময় এমন খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন হবে, যার জন্যে কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না—যা সঙ্গে সঙ্গে আহার করা চলবে। ফলে মাংস ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ট্যাবলেটের আকারে এমনভাবে প্রস্তুত করা হবে, যা একেবারে এক কামড়ে আহার করা

যায়। এই রকম ছোট ট্যাবলেটের আকারে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করা হয়েছে। ডিম ফেটিয়ে নিয়ে শুকিয়ে নেবার পর তাকে ট্যাবলেটের আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

অন্যান্য আরও নানা খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে এই পদ্ধতিতে; যেমন—ফলের কেক ট্যাবলেটের আকারে। যে সব মহাকাশচারী মারকিউরী মহাকাশযানে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা চিনি, স্নেহপদার্থ, নারিকেল ও বাদাম সহযোগে প্রস্তুত খাবারের ট্যাবলেট আহার করেছিলেন। কমলালেবু, পাতিলেবু প্রভৃতির সঙ্গে বাদাম প্রভৃতি মিশ্রিত করে এই জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৯৬৩ সালের মে মাসে গর্ডন কুপার মহাকাশে পাঁচ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণকালে আনারস, খোবানি, স্ট্রবেরি প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত ট্যাবলেট আহার করেছিলেন।

১৯৬৫ সালে জেমিনিযানে মহাকাশ পরিক্রমাকালে এক অভিনব পন্থায় খাদ্য সরবরাহ করা হবে মহাকাশচারীদের। মহাকাশযানের মধ্যে যে জ্বালানী কোষ আছে, তাথেকে জল উৎপন্ন হবে। এই জল পান করা চলবে এবং শুষ্ক খাদ্যবস্তুগুলি এই জলে ভিজিয়ে নিলেই সেগুলি খাবার উপযোগী হবে। এই কোষগুলিই আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এবং এই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে মহাকাশযানের কোন কোন যন্ত্র চালিত হবে।

ভবিষ্যতে অ্যাপোলো মহাকাশযানে গরম জল পাবার কোন ব্যবস্থা সম্ভবতঃ থাকবে অথবা শুষ্ক খাদ্যবস্তুর সঙ্গে জল মিশিয়ে তাকে আবার গরম করবার ব্যবস্থাও থাকবে।

তৈরী খাবার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার সমস্যা তো আছেই, এছাড়া খাদ্যবস্তু মজুদ রাখা ও খাবার সময় খাদ্যবস্তু যে পাত্রে থাকবে, তা নাড়াচাড়া করবার সমস্যাও আছে। এমন ধরণের পাত্র দরকার যা হাতে দস্তানা পরে থাকলেও সহজেই নাড়াচাড়া করা যায় এবং এই পাত্র থেকে প্রয়োজনমত খাদ্যবস্তুর পুরা একটি খণ্ড মুখে দেওয়া যায়।

পাত্রটি নির্মাণে যে প্লাষ্টিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এই ফিল্ম ভেঙ্গে গেলে বা এতে ফাটল ধরলে চলবে না। অথচ কোন কোন খাদ্য শুষ্ক করে ট্যাবলেটের আকার দেবার পর সেগুলির ধার এত তীক্ষ্ণ হয় যে, তাতে প্লাষ্টিক ফিল্ম কেটে যায়।

এই ধরণের শুষ্ক খাদ্যবস্তুর উৎপাদন মূলতঃ মহাকাশচারীদের প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হলেও এগুলি পৃথিবীর মানুষদেরও কম কাজে লাগে না। বস্তুতঃ, ভূপর্যটক, শিবির স্থাপনকারী এবং কোন কোন বড় সংস্থার পক্ষে এই ধরণের খাদ্য খুবই প্রয়োজনীয়।

এই সব খাদ্যবস্তু মহাশূন্যে পাঠাবার জন্যে যে ধরণের হাল্কা ও আর্দ্রতা-নিরোধক আধার উদ্ভাবন করা হয়েছে, তা অন্য কাজেও লাগছে। টিউব, প্লাষ্টিক থলি প্রভৃতির মধ্যে খাদ্যবস্তু ভরে তা সাধারণের কাজেও ব্যবহার করা যায়—বিশেষ করে, পঙ্গু ব্যক্তিদের হাসপাতালে এই ধরণের খাদ্য খুবই উপকারে আসবে।

মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণা এভাবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনেরও অনেক সাহায্য করছে। প্রধানতঃ মহাকাশ-সন্ধানের সহায়ক হিসেবে গবেষণা করা হলেও গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের অন্যান্য অনেক কাজে লাগানো সম্ভব।

কোন দিন হয়তো পৃথিবীর উর্ধ্বে কক্ষপরিক্রমারত মহাকাশ গবেষণাগারের অস্তিত্ব সম্ভব হবে। এখানে এই কেন্দ্রটির ঘূর্ণনের জন্যে নিম্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ধরণের কক্ষপরিক্রমারত গবেষণাগারগুলিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হলেও এই গবেষণাগারগুলিতে পুরাপুরি পৃথিবীর পরিবেশ সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে মহাকাশযানের পরিক্রমণের

কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটি ভারশূন্য অবস্থায় এসে যাবে এবং সে অবস্থায় এর মধ্যে খাদ্যবস্তু ও খাদ্যের পাত্রসমূহ মহাকাশযানের মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে।

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা মানুষের হাতে আছে। মহাকাশ-বিজ্ঞানের যুগে টিউব বা খামের মধ্যে ভরে আহার্য গ্রহণের প্রয়োজন হলে তা সম্ভব করা মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। মহাকাশে অবস্থানকালে খাদ্য গ্রহণের সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, মহাকাশ-সন্ধানের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণা

মঙ্গলগ্রহের বৈশিষ্ট্য, তার পরিবেশ ও মানুষের বসবাসের পক্ষে তার উপযোগিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নানা রকম পরীক্ষা করে চলছেন। আমেরিকার চতুর্থ মেরিনার মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ ও তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। এই সব পরীক্ষায় যে তথ্য উদ্ঘাটিত হবে, তার সঙ্গে পৃথিবী ও প্রাণীদের জীবন সম্পর্কে আমাদের যে সব তথ্য জানা আছে, তা একত্রিত করলে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণার একটা সুদৃঢ় ভিত্তি পেতে পারেন।

মঙ্গলগ্রহ ঠাণ্ডা ও শুষ্ক। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে অক্সিজেন থাকে, এখানে তার অভাব রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এসব বিষয়ে প্রায় একমত হয়েছেন বলা যায়। মঙ্গলগ্রহের এই প্রাকৃতিক ও আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য এখানে গবেষণাগারে সৃষ্টি করলে সেই আবহাওয়ায় অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে। জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এই জীবাণুগুলিও বর্ধিত হয় এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গত কয়েক দশক যাবৎ একথা জানা গেছে যে, এমন কতকগুলি জীবাণু আছে, যারা বায়ুশূন্য পরিবেশে জীবিত থাকে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, খাদ্যের বিষক্রিয়ার যে জীবাণু মারাত্মক পরিণতি ঘটায়, সেগুলি খাবারের সীল-করা টিনের মধ্যেই বেঁচে থাকে।

মঙ্গলগ্রহের অনুরূপ আবহাওয়া বীক্ষণাগারে সৃষ্টি করে পরীক্ষায় দেখা গেছে—রাই, যব, মটর প্রভৃতির মত চারাগাছ নাইট্রোজেন ও অল্প পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত, কিন্তু অক্সিজেনশূন্য আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে। কোন কোন গাছপালার দেহের মধ্যে সজীব উপাদানের উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীতে আমরা দেখি গাছপালা অক্সিজেন সৃষ্টি করে, কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন সৃষ্টি করছে।

এমন কি, কোন কোন জটিল গঠনের বৃহৎ প্রাণীর পরীক্ষায় ফলে যে সব তথ্যাদি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব অনুকূল ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ মাইলেরও বেশী উর্ধ্বে যে বায়ুচাপ আছে, তাতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু গবেষণাগারে এরই অনুরূপ অবস্থা তৈরি করে দেখা গেছে, কচ্ছপেরা তাতে প্রায় দু-মাস বেঁচে থাকতে পারে।

একদল মার্কিন বিজ্ঞানী সম্প্রতি মেরিনার উৎক্ষেপণের পূর্বে ম্যাসাচুসেট্‌সের কেম্ব্রিজে মিলিত হয়ে মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশ তিনটি ভাগে বিভক্ত।

এই তিনটি ভাগ চোখে দেখা যায়। প্রথমটি হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। এখানেই প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ করা হয়। দ্বিতীয়টি তুষার-মেরুমুকুট, আর তৃতীয়টি হলো উজ্জ্বল মরুভূমি অঞ্চল। মঙ্গলগ্রহে গ্রীষ্মাগমের সঙ্গে সঙ্গে তুষার-মুকুট গলে যায় এবং অন্ধকার অঞ্চল ক্রমেই সম্প্রসারিত হতে থাকে, অর্থাৎ অন্ধকারের একটা প্রবাহ এগিয়ে আসতে থাকে।

কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন, গলিত তুষার-মুকুট থেকে বাষ্প উত্থিত হয় এবং তা হাল্কা আবহমণ্ডলে ভেসে চলে যায় মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষরেখায়। তাঁরা মনে করেন, জলের পরিমাণ বাড়লে জীবাণুর বৃদ্ধিও সম্ভব। বসন্ত ঋতুর আগমনও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

ঋতুভেদে রং পরিবর্তনের কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও অন্ধকারের প্রবাহ সম্পর্কে কোন সন্দেহের কারণ নেই। এর নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে জীবের অস্তিত্বের ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

প্যারিস মানমন্দিরের ডাঃ অডুইন ডলফাস বলেন, সূর্যকিরণ যখন কোন বস্তুর পৃষ্ঠে প্রতিহত হয়ে আসে, তখন সমবর্তন (Polarization) ঘটে। এই সমবর্তনের পরিমাপ করে ঐ বস্তুর পৃষ্ঠদেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ডাঃ ডল্‌ফাস বলেন, মঙ্গলগ্রহের মরুপৃষ্ঠ লৌহ অক্সাইড দিয়ে তৈরি এবং এর সঙ্গে জল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত রয়েছে। তবে অন্ধকার অঞ্চলে যে সমবর্তন ঘটে, তা পৃথিবী থেকে দেখা না গেলেও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটে। লৌহ অক্সাইড দিয়ে তৈরি পৃষ্ঠদেশে অতি ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব এই পরিবর্তনের কারণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

আরিজোনার অন্তর্গত ফ্ল্যাগষ্টাফের লাওয়েল মানমন্দিরের ডাঃ উইলিয়াম সিন্‌টন মঙ্গলগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত ইনফ্রারেড আলোক বিশ্লেষণ করেছেন। পরীক্ষা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার অঞ্চলগুলি হাইড্রোকার্বন ও অ্যালডিহাইডের দ্বারা পরিপূর্ণ। এই দুটিই প্রাণের সম্পর্কযুক্ত অণু এবং পৃথিবীতে এগুলি খুবই সাধারণভাবে দেখা যায়।

সবগুলি পরীক্ষাতেই মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেলেও খুব কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করে এর সত্যাসত্য প্রমাণ করা কঠিন। সেই জন্যেই যন্ত্রপাতিসমন্বিত চতুর্থ মেরিনার ও অন্যান্য মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে। এগুলির সাফল্যের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ

আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এতে টাইরস ও নিম্বাস জাতীয় মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমন দিন আসবে যখন পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

গত পয়লা জানুয়ারী '৬৫ এই উদ্দেশ্যেই ওয়াশিংটন সহরে 'ওয়ার্লড্ ওয়েদার সেন্টার' নামে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্যে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য প্রস্তুতি ও প্রচারই এই কেন্দ্রের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ এবং রাশিয়ার মস্কোতেও কেন্দ্র খোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই দুটি কেন্দ্র

ইলেকট্রনিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণ, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবদ্ধ করা ও প্রচারের ব্যবস্থা থাকবে।

‘ওয়ার্লড্ মিটিওরোলোজিক্যাল অর্গ্যানিজেশন’, বা বিশ্ব আবহ সংস্থা এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, পৃথিবীর তিনটি অঞ্চলের ঐ তিনটি তথ্য-জ্ঞাপনকারী কেন্দ্র চালু হবার পর ঐ সংস্থার পক্ষে সমগ্র বিশ্বেই প্রতিদিনের আবহাওয়া সম্পর্কে পুরা তথ্য প্রচার করা সম্ভব হবে। তাঁরা অনেকটা সঠিকভাবে বেশ কিছুদিন আগেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন করতে পারবেন।

এতকাল আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা কেবলমাত্র পৃথিবীর মনুষ্যঅধ্যুষিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অনধ্যুষিত অঞ্চলে এই সব ব্যবস্থা না থাকায় সেই সব অঞ্চলে যখন প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং তা মানব অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে পড়ে, তখন তাথেকে রক্ষা পাওয়ার পথ থাকে না। পৃথিবীর তিন ভাগই সমুদ্র। এই বিরাট অঞ্চল এতকাল আবহ-বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল।

এতকাল বেলুনের সাহায্যেই আবহমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হতো। কিন্তু সমুদ্র বা মনুষ্যশূন্য এলাকার উপরে প্রচুর সংখ্যক বেলুন পাঠিয়ে ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কখনই সম্ভব হয় নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ টাইরস ও নিম্বাস। এই সকল উপগ্রহের সাহায্যে এই প্রথম বিশ্বের সব অঞ্চলের আবহমণ্ডল সংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য প্রচার করা সম্ভব হয়েছে! আবহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

১৯৬০ সালে ‘টাইরস প্রথম’ নামে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে প্রেরণের পর থেকে মেঘের গঠন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণযোগ্য তিন লাখেরও বেশী আলোকচিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। ভারতের আবহ-কেন্দ্রসমূহ, যেমন—বোম্বাইয়ের আবহ-দপ্তর, এই অঞ্চলের মেঘের গঠন সম্পর্কে আলোকচিত্রগুলি সরাসরি ঐ উপগ্রহ থেকে পেয়েছে। এই সকল উপগ্রহের টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত চিত্রসমূহ পৃথিবীর সব অঞ্চলের আবহকেন্দ্রগুলিতেই পাঠানো হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের আবহ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই সকল চিত্র পর্যালোচনা করে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আবহাওয়া ও ঝড়ের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়েছে।

তবে টাইরস ও নিম্বাসের সাহায্যে কেবলমাত্র মেঘের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকচিত্রাদি গৃহীত হয়ে থাকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনের জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন —বায়ুর চাপ, বাতাসের গতি ও দিক, তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতির সংবাদ সংগৃহীত হয় না।

এই সকল তথ্য ভূতলস্থিত আবহ-কেন্দ্রের সাহায্যেই সংগ্রহ করতে হয়। ঐ সকল উপগ্রহ আবহমণ্ডলের কোন একটি স্থানের মেঘের আলোকচিত্র গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ মেঘ বারো ঘণ্টা পরে কোথায় থাকবে, তার হদিশ পাওয়ার জন্যে ঐ চিত্র ব্যতীত আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এজন্যে গবেষণা ও তথ্যানুশীলনের প্রয়োজন।

বর্তমান পৃথিবীর আবহ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বৃহত্তম গবেষণাগার রয়েছে আমেরিকার কলোরেডোস্থিত বোলডারে। এই কেন্দ্রটির নাম ‘ন্যশন্যাল সেণ্টার ফর অ্যাটমোস্ফেরিক রিসার্চ’ বা জাতীয় আবহমণ্ডলীয় গবেষণা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহেই ব্যাপৃত নন—তাঁরা আবহমণ্ডলীয় বিষয়সমূহের, তারগতি-প্রকৃতির মূলে কি রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করছেন। মহাকাশে হাজার হাজার মাইল দূরের কোন রাসায়নিক এবং ভৌত ব্যাপারের জন্যে কোন দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে কিনা, তা নিয়ে

তাঁরা পরীক্ষা করছেন। এই কেন্দ্রে এই কাজে আবহ-বিজ্ঞানী ছাড়া, বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী এবং গণিতবিশারদেরাও সাহায্য করছেন। তাঁরা বায়ুপ্রবাহ, মহাসাগর ও পৃথিবীর স্থলভূমির সঙ্গে আবহমণ্ডলের সম্পর্ক এবং পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। জাতীয় আবহমণ্ডলীয় গবেষণা কেন্দ্রের ধারণা, এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হলে আগামী ছয় মাসের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন—এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হবে। তবে কোন কোন বিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, মাত্র আগামী দশ দিনেরই সঠিক পূর্বাভাস জ্ঞাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, এর বেশী নয়। কিন্তু ঐ কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডাঃ ওয়াল্টার রবার্ট্‌স্ এই সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। তিনি বলেছেন, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে তিন বা ছয় মাসের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন বাস্তবে পরিণত হবে এবং তা নির্ভরযোগ্যই হবে।

বর্তমানে আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসই জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। তবে মানুষ এক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তাতে আগামী তিন দিনের বেশী আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আমেরিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কুয়াসা এবং আবহমণ্ডলের নীচের দিকের মেঘপুঞ্জ যে বিশেষ তাপমাত্রায় দূর করা যায়, তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শিলাবৃষ্টি বন্ধ করবার উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে এবং আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে বারিপাতের ব্যবস্থা নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগেই লোকবসতি নেই। সেই সকল স্থান হয়তো অতি উষ্ণ, অতি শীতল অথবা অত্যধিক আর্দ্র বা শুষ্ক—মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এর কিছুটা দূর হলেও মানুষের অশেস কল্যাণ সাধিত হবে।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অতি উর্ধ্বে মহাশূন্যের আবহাওয়া কি রকম? বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ বারট্রাম স্টিলার এর উত্তরে বলেছেন, মহাকাশের অত উঁচুতে কি ধরণের বাতাস বইছে, এটা যদি ভাল করে জানা যায়, তাহলে আবহাওয়ার অবস্থাও জানা যাবে। এতে কৃষিকার্যের সহায়তা হবে। উর্ধ্বলোকের আবহাওয়া, মহাজাগতিক রশ্মি ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে ১৯টি বেলুন ১ লক্ষ ৪০ হাজার ফুট উঁচুতে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনটি বেলুন ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। এতে ছিল নিউট্রন গণনা, গামারশ্মি পরীক্ষা ও দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। প্রতিটি বেলুনের দাম হবে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। গ্রেট বৃটেন, সিংহল এবং ট্যাসম্যানিয়ার বিজ্ঞানীগণও এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা করছেন। ডাঃ রয় ডেনিয়েল এঁদের নেতৃত্ব করছেন এবং বেলিডারস্থিত জাতীয় আবহমণ্ডলীয় গবেষণা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই হায়দরাবাদের বেলুন উৎক্ষেপণ কার্যসূচী পরিচালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক 'শান্ত সূর্য বর্ষ' উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলছে, এই কর্মসূচী তারই অন্তর্গত।

নব-উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক টেলিফোন

গৃহকর্ত্রী কেনাকাটা করতে বাজারে গেছেন। সেখানে গিয়ে মনে পড়লো, উহুনটা ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ফোন নম্বর ও একটি সাঙ্কেতিক সংখ্যায় ডায়াল করলেন। আর রান্নাঘরে তাঁর উহুনটা চালু হয়ে গেল।

অফিসের কর্মী হয়তো একটু আরাম করছেন। কিন্তু তার নিজের ফোন আপনাথেকেই বেজে উঠে তাঁকে প্রস্তুত হবার নিশানা দেবে।

একটি পরিবারের লোকজন পড়শীর বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন। কিন্তু ভাবনার বিষয়—বাইরে গেলে যে সব ফোন আসবে সেগুলি ধরবে কে? তাই যাঁর বাড়ীতে যাওয়া হবে, যাবার আগে তাঁর বাড়ীর ফোন নম্বরেও একটি সঙ্কেত সংখ্যার ডায়াল ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। আর এর পর যত কল আসবে সব ঘুরে যাবে ওই পড়শীর বাড়ীতে। আর নতুন কোন নির্দেশ না জানানো পর্যন্ত এইরূপই চলবে।

এই সব সম্ভব হবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সুইচের রূপান্তর ঘটানোর প্রক্রিয়ায়। চলতি বছরের প্রথমার্ধেই যুক্তরাষ্ট্রে এই যুগান্তকারী ব্যবস্থা চালু হবে।

এই নব-উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক সুইচিং সিষ্টেম নিয়ে ইলিনয়ের মরিসে গত দশ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। হালে নিউ ইয়র্কের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজার্সির সুকাসুনা নামক স্থানে ইলেকট্রনিক সুইচিং সিষ্টেমের প্রথম কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। এটিই হবে বিশ্বে প্রথম স্থায়ী ইলেকট্রনিক সেন্ট্রাল অফিস। ওখানকার আনুমানিক শ' দুই ব্যক্তি—যাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে, তারাই প্রথম এই ব্যবস্থার সুযোগ পাবেন।

আগামী পাঁচ বছরে এই নতুন সরঞ্জামের উৎপাদন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। এর সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর লাখ কুড়ি টেলিফোন নয়া প্রক্রিয়ায় চালু করা যাবে। আর ৩৫ বছরের মধ্যে আমেরিকার টেলিফোন ব্যবহারকারীই হবেন নতুন সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী। এই ব্যবস্থা চালু হলে যে কোন বিক্রেতা নতুন প্রক্রিয়ায় একটি সাঙ্কেতিক সংখ্যা ডায়াল করে তার কারবারের গুদামে রক্ষিত কম্পিউটারের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে পারবেন এবং অন্যের সাহায্য ছাড়াই বলে দিতে পারবেন, প্রার্থিত পণ্যটি গুদামে মজুদ আছে কি না।

গৃহকর্ত্রী সাঙ্কেতিক সংখ্যার তালিকা দেখে তার সুপারমার্কেটের কম্পিউটার যন্ত্রে ডায়াল করে মালমশলার বরাত দিতে পারবেন।

হামেশা যে সব নম্বর ডাকা হয়ে থাকে, প্রত্যেক টেলিফোন ব্যবহারকারীই তার সেই নম্বরগুলি কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সাঙ্কেতিক ভাষায় তালিকাভুক্ত করতে পারেন। তারপর তিনি ফোনে মাত্র তিনটি সংখ্যা (ডিজিট) ঘুরিয়েই ঐ সব নম্বর পাবেন।

নিউ ইয়র্কের বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক। ওখানকার বিজ্ঞানীরা বলেন, যে সব ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের কল্পনাও করা যায় নি, সে সব ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হবে। প্রত্যেক টেলিফোন ব্যবহারকারীই নিজ দরকার মত এই পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারবেন।

নব-আবিষ্কৃত ইলেকট্রনিক টেলিফোন যন্ত্রপাতি এই অবস্থা সম্ভব করে তুলেছে, এটি কম্পিউটারেরই অনুরূপ। এরও আছে ইলেকট্রনিক স্মৃতিশক্তি—যার জন্যে কোন নির্দেশ পালিত হয় এবং ইচ্ছা-মত ওই নির্দেশের রদবদলও করা যায়।

টেলিফোনে সুইচ টেপার বদলে ট্র্যানজিষ্টরই বিজলীবাহী পথের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। এতে অসাধারণ গতিবেগ সঞ্চার হয়, স্থানসাশ্রয় ঘটে ও সহজে যন্ত্রটির রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটানো সম্ভব হলে একটি ইলেকট্রনিক সুইচ বোর্ড পাঁচটি মামুলি সুইচ বোর্ডের কাজ চালাতে পারবে। তাছাড়া এই বোর্ডও হবে মামুলি বোর্ডটির মত খুবই নির্ভরযোগ্য।

ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় সুইচ টেপার ব্যবস্থা চালু করা যেমন হচ্ছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র নানা দেশের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন সংযোগেরও ব্যবস্থা করছে। তদনুযায়ী এক মহাদেশের টেলিফোন ব্যবহারকারীরা অন্য মহাদেশের সঙ্গে অপারেটরের মাধ্যম ছাড়াই যোগাযোগ করতে পারবেন।

ইলেকট্রনের তরঙ্গ মতবাদ

শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস

প্রাচীন কাল থেকেই, এমন কি আধুনিক যুগেও বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা প্রকৃতির একটি ঘটনাকে দ্বিতীয় একটি ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে তার ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। প্রসঙ্গক্রমে আলোক তত্ত্বের কথা বলা যায়। প্রথমে আলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, আলো শুধু তরঙ্গ-ধর্মী, কিন্তু পরবর্তী কালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, আলো শুধু তরঙ্গ-ধর্মী নয়, আলো কোয়ান্টাম (Quantum) ধর্মীও বটে।

প্রাক-নিউটনিয়ান যুগ থেকেই বস্তুর কণিকা-বাদ (Particle nature) স্বীকৃত হয়ে আসছে। আধুনিক যুগে বস্তুর ভিতরে অসংখ্য অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন কল্পনা করেও বস্তুর কণিকাবাদকে উড়িয়ে দেওয়া হয় নি। কিন্তু বস্তুর ভিতরকার অসংখ্য ইলেকট্রন যে শুধু কণিকা-ধর্মীই নয়, তরঙ্গ-ধর্মীও বটে—এটা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডি-ব্রগলি (d'Broglie) বস্তুর তরঙ্গ-মতবাদ প্রচার করবার আগে পর্যন্ত বিশেষ কারও জানা ছিল না। ডি-ব্রগলি আলোক-তত্ত্বের তরঙ্গ-ধর্ম ও কোয়ান্টাম-ধর্ম লক্ষ্য করেন এবং দেখেন যে, কতকগুলি গাণিতিক সূত্র আলোক-তত্ত্ব ও বস্তু-তত্ত্বের উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই গাণিতিক সূত্রগুলির সাদৃশ্য কোথায়, তা একটু সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা দরকার।

বস্তুর গতি (Motion), ভরবেগ (Momentum), ভর (Mass) এবং শক্তি (Energy)—এইগুলির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তিনি দেখতে পেলেন যে, আলোক-তত্ত্ব ও বস্তু-ত মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

এখানে বস্তুর ক্ষেত্রে মপারেশনের সূত্র (Mauperation principle) এবং আলোর ক্ষেত্রে ফারমাটের সূত্রের (Fermat's principle) উল্লেখ করা যেতে পারে। মপারেশনের সূত্রানুযায়ী "চলমান বস্তু (Moving particle) কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোন দ্বিতীয় বিন্দুতে চলবার সময় অসংখ্য পথের মধ্যে যে পথে চলমান বস্তুর কাজ ন্যূনতম (Minimum)—চলমান বস্তু সর্বদা সেই পথেই চলবে।" গণিতের পরিভাষায় এটাকে

$$\delta \int_{P_1}^{P_2} (mu)\, ds = o.$$

এই ভাবে প্রকাশ করা হয়। এখানে জানা দরকার যে, m বস্তুর ভর, u বস্তুর গতিবেগ, ds ক্ষুদ্রতম পথের দৈর্ঘ্য এবং P_1 ও P_2 বস্তুর দুটি বিভিন্ন স্থিতাবস্থা (Rest position)। অনুরূপ

ভাবে ফারমাটের সূত্রানুযায়ী আলোক রশ্মি এক বিন্দু থেকে অন্য এক বিন্দুতে চলবার সময় অসংখ্য পথের মধ্যে যে পথে চলবার সময় ন্যূনতম— আলোক রশ্মি সেই পথেই চলবে। গণিতের সূত্রে এটা দাঁড়ায় $\int_{P_1}^{P_2} \mu\, ds = 0.$ এখানে μ আলোক রশ্মির চলবার মাধ্যমের রিফ্র্যাকটিভ ইণ্ডেক্স বা প্রতিসরাঙ্ক (Refractive Index)।

এই সব সাদৃশ্য দেখে ডি-ব্রগলি বস্তুর তরঙ্গ-মতবাদ প্রচার করলেন এবং আইনষ্টাইন এর আপেক্ষিকতাবাদকে ধরেই এই বস্তু-তরঙ্গের (Matter-wave) এক গাণিতিক সূত্র দেন। গণিতের জটিল হিসাবের মধ্যে না গিয়েই এটাকে সংক্ষেপে $\lambda \; \frac{h}{mv}$ এই ভাবে লেখা যায়। এখানে h প্লাঙ্কের ধ্রুবক ; m বস্তুর মধ্যস্থ ইলেকট্রনের ভর, λ বস্তু-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং v ইলেকট্রনের গতিবেগ।

ডি-ব্রগলির এই নতুন ইলেকট্রন-তরঙ্গ মতবাদ নিউটনের বলবিদ্যার (Newtonian Mechanics) দ্বারা আর ব্যাখ্যা করা গেল না, কিন্তু এর ভবিষ্যৎ গিয়ে পড়লো Schrödinger-এর তরঙ্গ-বলবিদ্যার (Wave-mechanics) উপর। Schrödinger তাঁর তরঙ্গ-মতবাদ দিয়ে বস্তুর ইলেকট্রনের ধর্ম ব্যাখ্যা কিছুই করতে পারলে না ঠিকই, কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বীয় ব্যাখ্যাতে (Statistical interpretation) Schrödinger-এর গাণিতিক সূত্রগুলির মূল অর্থ ধরা পড়লো। কণিকাবাদের সাহায্যে যেমন সম্ভাব্যতার-তরঙ্গ (Waves of Probability) ব্যাখ্যা করা হয়, কোন বিন্দুতে তরঙ্গের তীব্রতা (Intensity) ঐ বিন্দুতে ফোটনের আবির্ভাবের সম্ভাবনার পরিমাণ নির্দেশ করে, ঠিক ঐরূপে ইলেকট্রন-তরঙ্গও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সম্ভাবনার তরঙ্গ বা সম্ভাব্যতা কি, তা একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার। মনে করা যাক, জোয়ারের ঢেউ। জোয়ারের ঢেউ বলতে এই বোঝায় যে, এমন একটা কিছু, যার পথে সবকিছুই জোয়ারের জলে সিক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা হয় উত্তাপের ঢেউ (Heat-Waves), তবে বোঝা যায় যে, এমন একটা কিছু, যা তার পথের সমস্ত বস্তুকেই উত্তপ্ত করে। আর তৃতীয়তঃ, যদি পত্রিকায় দেখি যে, কোনও স্থানে আত্মহত্যার ঢেউ লেগেছে, তখন একথা বোঝাবে না যে, ঐ স্থানের প্রত্যেকটি লোক আত্মহত্যা করবে। তবে এটা বলা যায় যে, আত্মহত্যা করবার সম্ভাবনা (Probability) বেড়েছে। তরঙ্গ-বলবিদ্যায় (Wave-mechanics) ইলেকট্রন-তরঙ্গ বলতে এই ধরণের একটা সম্ভাবনার ঢেউ বোঝায়।

বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ (Heissenberg) ও বোরের (Bohr) মতে, ইলেকট্রন-তরঙ্গ ইলেকট্রনের সম্ভাব্য অবস্থা ও স্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার কতকগুলি বিশেষ প্রতীক (Special Symbol)। তাই যদি ঠিক হয় তবে জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন হবে। ইলেকট্রন-তরঙ্গকে বাস্তব বলা চলে না, দেশ-কালের সীমার মধ্যে এরা ঠিক নির্দিষ্ট নয়। গণিতের সূত্রের (Formula) মানস প্রত্যক্ষ (Visualisation) ছাড়া এদের সম্পর্কে বিশেষ আর কোনও ধারণা আমাদের হতে পারে না।

এখন দেখা যাক, পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে এই ইলেকট্রন তরঙ্গের কতখানি সামঞ্জস্য আছে। ইলেকট্রন-তরঙ্গমতবাদকে প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আমেরিকান বিজ্ঞানীদ্বয় ডেভিসন ও জার্মার (Davisson & Germer)— তাঁদের নিকেল টার্গেট (Nickel Target) থেকে প্রতিফলন পরীক্ষা করে দেখবার সময়। পরীক্ষাটি করা হয়েছিল ১৯২৭ সালে। তাঁরা নিকেল টার্গেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করেছিলেন, ফলে

টার্গেটটি কতকগুলি ক্রিষ্টালে (Crystal) পরিণত হয়েছিল। সেই জন্তে তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফল অপ্রত্যাশিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরীক্ষালব্ধ অপ্রত্যাশতি ফল বিজ্ঞানীদ্বয়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, রঞ্জেন রশ্মির ডিফ্র্যাকশনের (X-ray diffraction) কথা। তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, রঞ্জেন রশ্মির ন্যায় ইলেকট্রনও তরঙ্গাকারে বেরিয়ে আসে। ইলেকট্রনের এই তরঙ্গ-মতবাদ দিয়ে তাঁরা তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফল ব্যাখ্যা করেন এবং বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে ইলেকট্রনের বস্তুতত্ত্ব শুধু আর বস্তুতত্ত্বে সীমাবদ্ধ রইল না, দ্বিধর্মী আলোক-তত্ত্বের ন্যায় দ্বিধর্মী ইলেকট্রন-তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

সময় ও দূরত্বের আপেক্ষিকতা

শ্রীজ্যোতির্ময় ছুই

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of relativity) আবিষ্কারের পূর্বের কথা। পদার্থ-বিদ্ মাইকেল্‌সন এবং মর্লি আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করতে গিয়ে মুস্কিলে পড়েন। তাঁরা অঙ্ক কষে খাতায়-কলমে যে ফল পাচ্ছেন, বাস্তব পরীক্ষাপ্রসূত ফলের সঙ্গে তার ব্যতিক্রম পর আলোকের ফিরে আসবার সময় নিখুঁত ক্রোনোমিটার যন্ত্রের (Precision Chronometer) সাহায্যে গণনা করছেন। ১নং চিত্র থেকে ব্যাপারটি পরিস্কার বোধগম্য হবে। O বিন্দু থেকে আলোক-রশ্মি পাঠানো হচ্ছে। OA ও OB পরস্পর পরস্পারের সঙ্গে লম্ব এবং OA=

১নং চিত্র।
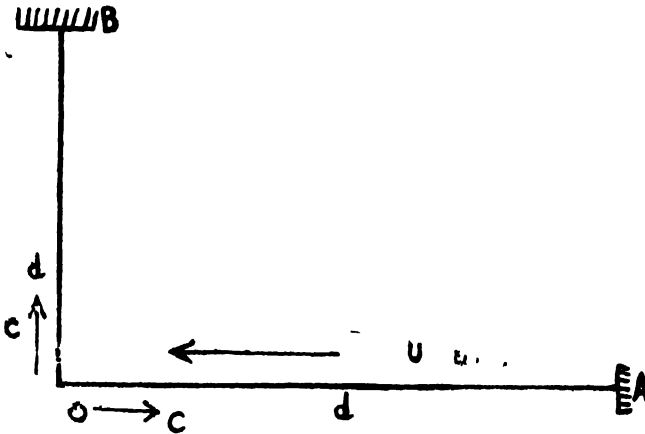
ঘটছে। তাঁরা একটি স্থান থেকে আলোক-রশ্মি (Light Signal) পরস্পর লম্ব দুটি দিকে প্রেরণ করছেন এবং দর্পণ থেকে প্রতিফলনের OB=d, A ও B বিন্দু দুটিতে দুটি সমতল দর্পণ খাড়াভাবে বসানো আছে। তীরের সাহায্যে পৃথিবীর গতিবেগ u নির্দেশ করা হয়েছে।

এখন ধরা যাক, আলোকের গতিবেগ c, স্পষ্টতঃ O থেকে A-তে যাবার সময় আলোক ও পৃথিবীর গতিবেগ (আপেক্ষিক) = C+u [যেহেতু উভয়ের গতিবেগ বিপরীতমুখী] এবং A থেকে O-তে যাবার সময় আলোক ও পৃথিবীর আপেক্ষিক গতিবেগ = C − u [যেহেতু উভয়ের গতিবেগ একই দিকে]। অতএব O থেকে A-তে গিয়ে আবার প্রতিফলনের পর O-তে ফিরে আসতে মোট সময় লাগবে—

$OC^2 = OB^2 + BC^2$ [পীথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে]। এখন $BC = \frac{1}{2}ut_2$, $OB = d$, $OC = \frac{1}{2}ct_2$ বসিয়ে পাওয়া যায় $d^2 + (\frac{1}{2}ut_2)^2 = (\frac{1}{2}ct_2)^2$। স্কুল বীজগণিতের সাহায্যে উক্ত সমীকরণের সরলতা সম্পাদন করলে পাওয়া যাবে $t_2 = \frac{2d}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$

স্পষ্টতঃ $t_1 \neq t_2$; $t_1 = t_2$ হতে হলে হয়
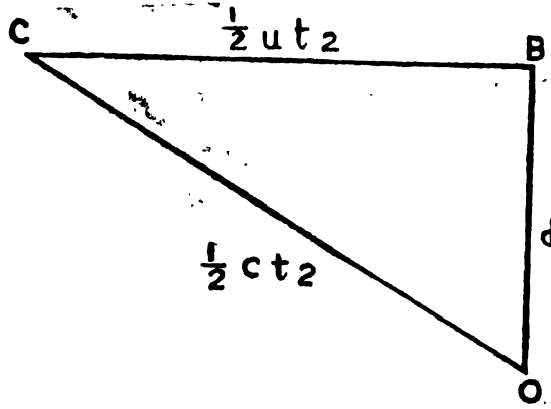
২নং চিত্র।

$t_1 = \frac{d}{c+u} + \frac{d}{c-u}$ [স্কুল পাটীগণিতের নিয়মানুসারে] $t_1 = d\left(\frac{1}{c+u} + \frac{1}{c-u}\right)$ $= d\,\frac{2c}{c^2 - u^2} = \frac{2d}{c} \cdot \frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}$

OB দূরত্বে আলোকের গমন ও প্রত্যাগমনের সময়ে কিন্তু চিত্র বদ্‌লে যাবে। পৃথিবীর গতিবেগের জন্যে B বিন্দু সরে গিয়ে অন্য অবস্থানে যাবে। এক্ষেত্রের মোট সময় যদি t_2 ধরা যায়, তাহলে B বিন্দু $\frac{1}{2}ut_2$ দূরত্বে সরে যাবে, ২নং চিত্রে C বিন্দু, B বিন্দুর পরিবর্তিত অবস্থান নির্দেশ করে।

OBC সমকোণী ত্রিভুজে

পৃথিবীর গতিবেগ $u = o$ হতে হয় [কিন্তু তা অসম্ভব] অথবা c = অনন্ত (infinity) হতে হয় [কিন্তু তা অসম্ভব, কারণ আমরা জানি c = আলোকের গতিবেগ = 186000 মাইল/সেকেণ্ড, বা অন্য লেবরেটরী পদ্ধতিতে নির্ণীত হয়েছে] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাইকেল্‌সন এবং মর্লি বাস্তব পরীক্ষায় দেখলেন, $t_1 = t_2$ হচ্ছে। Classical Physics-এর এটি একটি বেশ বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

পৃথিবীর গতিবেগ এবং আলোকের গতিবেগ সম্পর্কে তৎকালীন ধারণাগুলি প্রায় ভুল প্রমাণিত হতে চললো। কিন্তু পৃথিবীর যে গতিবেগ আছে এবং আলোকের গতিবেগ যে অনন্ত নয়, তা রোমারের পদ্ধতি (Römer's method for

determination of velocity of light by astronomical observations) এবং ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে সুপ্রমাণিত হয়েছে এবং তাঁর থিওরিতে যদি ভুল থাকে তো বৈজ্ঞানিকেরা সমগ্র Classical Physics-এর সততায় সন্দিহান হবেন। মাইকেলসন এবং মর্লি বছরের বিভিন্ন সময়ে নিখুঁত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেও দেখলেন, $t_1 = t_2$ হচ্ছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফিজেরাল্ড (Fitzerald) এবং লোরেঞ্জ (Lorentz) স্বাধীনভাবে গবেষণা করবার পর বললেন, পৃথিবীর গতিবেগের দিকে দূরত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কুচিত হয় এবং পৃথিবীর গতিবেগের লম্বাভিমুখে দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকে। এই মতবাদ মেনে নিয়ে সঙ্কোচন-উৎপাদক K সহজেই নির্ণয় করা যায় যে,

$K = \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$; অর্থাৎ ফিজেরাল্ড এবং লোরেঞ্জের মতে, পৃথিবীর গতির অভিমুখে গমনকারী বস্তুর প্রতিটি একক দৈর্ঘ্য কমে $\sqrt{}$

হবে। কিন্তু এতেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হলো না। এর পর দেখা গেল পৃথিবীর উপর আলোকের গতিবেগ পৃথিবীর গতিবেগের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এটাও সম্ভব হতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হলো 'Concept of local time'—এই ধারণায় (গতিশীল ঘড়ি মন্থরগামী—Moving clock goes slow), প্রত্যেক বাস্তব সেকেণ্ড গতিশীল ঘড়িতে (u গতিবেগে গমনকারী) দাঁড়াবে—

$$\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}} = \sqrt{c^2-u^2} \text{ সেকেণ্ড,}$$

c হলো আলোকের গতিবেগ এবং u হলো গতিশীল ঘড়িটির গতিবেগ। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আইনষ্টাইন সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করেন এবং বহুদিনের সুচিন্তিত গবেষণায় সমস্ত ব্যাপারটি একটি সুসংবদ্ধ সাধারণ সূত্রের (A single general principle) সাহায্যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বললেন—(১) সব গ্যালিলিয়ান পদ্ধতিতে পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী অপরিবর্তিত থাকবে (Physical laws have the same form in all Galilean Systems); (২) উন্মুক্ত মহাশূন্যে (In free space) আলোকের গতিবেগ ধ্রুবক (Constant) থাকবে। প্রথম সূত্রটিকে বলা হয় আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্ব (Special theory of relativity) এবং দ্বিতীয় সূত্রটিকে বলা হয় আলোকের গতি-বেগের নিত্যধ্রুবতার তত্ত্ব (Principle of consistency of the velocity of light)। আইনষ্টাইনের সূত্রদ্বয়ের অর্থ হলো—সময় ও দূরত্ব পরস্পর আপেক্ষিক (Time and distance are relative); তাই সময় ও দূরত্ব অপর দর্শক কর্তৃক পরিমাপিত হলে (Measurement by other observer) আমাদের পরিমাপণের সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের অভিনব ব্যবস্থা

বরফে আচ্ছাদিত দক্ষিণ মেরুর সমুদ্রের তলায় যে সকল প্রাণী থাকে, তাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি অভিনব গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। ইস্পাতে তৈরি এই কক্ষটি উচ্চতায় ৬ ফুট, প্রস্থে চার ফুট এবং ওজনে আড়াই টন। এতে আছে ছয়টি জানালা, প্রত্যেকটি জানালাই দেড় ইঞ্চি পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা। এতে তিন জন লোক ধরে।

সমুদ্রের উপরের বরফ কেটে গর্ত করে তার মধ্য দিয়ে এই অভিনব গবেষণাগারটি নামিয়ে দেওয়া হয়। বরফের নীচেই আছে জল এবং তাতে আছে নানারকমের জীবজন্তু। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত কারখানা থেকেই এই গবেষণাগারে তাপ ও বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। গবেষণাগারের বাইরে চারদিকেই আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, জলে নামিয়ে দেবার পর কক্ষটি যেখানে থাকে, তার চারদিকই আলোকিত হয়ে যায়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এর সহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এক একটি দল প্রায় পনেরো দিন বরফের নীচে জলের মধ্যে থাকেন।

দক্ষিণ মেরুর ম্যাকমার্ডো সাউণ্ড এলাকাতেই এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। সেখানকার জলের গভীরতা হাজার ফুটের উপর। উপরিভাগের পাঁচ ফুট পুরু বরফের স্তর কেটে এটিকে তার মধ্য দিয়ে আরও ছয় ফুট জলের নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা নানারকম মাছ, সিল নামে সন্তরণরত বিশাল সামুদ্রিক প্রাণীদের দেখেছেন, তাদের নানারকম আওয়াজ শুনেছেন।

এই গবেষণাগারটির সঙ্গে একটি দীর্ঘ নল লাগানো থাকে। এটি থাকে উপরের দিকে। এই নল দিয়েই বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাগারে যাতায়াত করেন। ঐ নলের জন্যেই কক্ষটি উল্টে যায় না এবং বরফে এটি ঠিক জায়গায় আট্‌কে থাকে। তবে চারপাশের বরফ গলে গেলে ঐ ভাসমান কক্ষটি যাতে উল্টে যেতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যেই এর সঙ্গে নীচের দিকেও ভারী বস্তু যোগ করে দেওয়া হয়।

সামুদ্রিক জীবজন্তুর আওয়াজ সংগ্রহের জন্যে সমুদ্রের উপরিভাগে, তলায় এবং মাঝখানে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র বা রিসিভার রাখা হয়। তারপর সেই শব্দ রেকর্ড করা হয় এবং বিজ্ঞানীরা হাইড্রোফোনের সাহায্যে তা শোনেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ তাঁরা মাইক্রোফোনের সাহায্যে উপকূলে অবস্থিত বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দেন।

বরফের তলায় নিবিড় অন্ধকারে ঐ সকল প্রাণীর নানারকম শব্দ বিশ্লেষণ করে তাদের জীবনযাত্রার বিষয় জানাই ছিল শব্দ সংগ্রহের প্রধান লক্ষ্য।

ম্যাসাচুসেট্‌স রাজ্যের উড্‌স্‌হোল ওশ্যানো-গ্র্যাফিক ইনস্টিটিউসন এবং নিউ ইয়র্ক জুও-লজিক্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বরফের তলায় অবস্থিত এই সকল প্রাণীর আওয়াজ ঠিক ভূপৃষ্ঠের উপরের প্রাণীদের আওয়াজের মত নয়। নানারকম আওয়াজই এরা করে থাকে। কোন প্রাণী শিস দেয়, কেউ বা করে কিচিরমিচির, আবার জোরে আওয়াজও কোন কোন প্রাণী করে থাকে।

তাঁরা বলেন, ওয়েডিল সীল নামে একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণীই বেশ আওয়াজ করে থাকে।

এদের এক একটি লম্বায় ১১ ফুট এবং ওজনে ১৩০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাঁরা দেখেছেন—এরা খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরছে এবং বরফের মধ্যে যে গর্ত রয়েছে, তাতে নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ পরে পরেই ফিরে আসছে। জলের নীচে থাকবার সময় সীল নাক-মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে; সুতরাং এই অবস্থায় তারা আওয়াজ কি করে করে—সেটা এক রহস্য।

উড্সহোল ইনস্টিটিউসনের ডাঃ উইলিয়াম ই. শেভিল তিমি ও সীল মাছ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনিও এই তথ্যসন্ধানী দলে আছেন। ডাঃ শেভিল বলেন, সীল ও তিমির একটি আওয়াজেরই অনেক রকম অর্থ হতে পারে। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে শীতকালে সূর্যালোকের স্পর্শ এখানকার প্রাণীরা পায় না, তারা থাকে নিবিড় অন্ধকারে। এই অন্ধকারে শব্দের সাহায্যেই একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে, খাদ্যের সন্ধান করে এবং বরফের মধ্যে শ্বাস ফেলবার মত জায়গার সন্ধান করে।

সীলের শব্দ রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ সকল শব্দের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা চলছে। মানুষ সীলের সম্পর্কে যতটুকু দেখেছে, তারই ভিত্তিতে ঐ সব শব্দের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা চলছে।

বিজ্ঞানীরা কুমেরু অঞ্চলে বরফের নীচে সীল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের সময়ে একপ্রকার রঙীন বিরাট জেলী মাছও দেখেছেন।

নিউ ইয়র্ক জুওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানী ডাঃ কার্লটন সূর্যালোক সম্পর্কে বলেছেন, এখানকার নীল আলো বরফের স্তর ভেদ করে জলে এসে পড়ে। কিন্তু সেই ক্ষীণ আলো জলের কয়েক ফুট মাত্র নীচে যায়। এই গবেষণাগার থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ঐ বরফের স্তরের নীচের দিকটা ঢেউখেলানো, অনেকটা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হচ্ছে। দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কার্যসূচী আছে, এই পরিকল্পনা তারই অন্যতম অঙ্গ। পৃথিবীর আরও ১১টি রাষ্ট্র এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সহযোগিতা করছেন।

এই আইস অবজারভেশন চেম্বার বা গবেষণাগারটি নির্মাণ করেছেন নিউজার্সির নরউডের অ্যালপাইন জিওফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েট্স্ কোম্পানী। এই গবেষণাগারটি অন্যান্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানেও ব্যবহৃত হবে।

বাকশক্তিহীন শিশুদের চিকিৎসা

অ্যাপেজিয়া এক রকম মস্তিষ্কের রোগ। এতে আক্রান্ত হলে বাকশক্তি লোপ পেয়ে যায়। রোগী কোন কোন ক্ষেত্রে লেখা পড়তে পারে না এবং কোন কিছু বলতেও পারে না। মস্তিষ্কের রোগ হলেও এতে রোগীর বুদ্ধি নষ্ট হয় না। জন্মের পূর্বে অর্থাৎ গর্ভাশয়ে ভ্রূণ অবস্থায় কোন আঘাত পেলে অথবা রোগগ্রস্ত হলেই ভূমিষ্ঠ হবার পর এই রোগ দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পৃথিবীর হাজার হাজার শিশু এই রোগে ভোগে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার পালো আলটোর স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-কেন্দ্রের ইনস্টিটিউট ফর চাইল্ডহুড এফেজিয়াতে শিশুদের এই রোগ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। এদের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসা হলে এদের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হবার মত কিছু নেই। এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসিত দশটি ছেলে সম্প্রতি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

এদের কিভাবে চিকিৎসা হয়ে থাকে, তারই একটি বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। চার বছরের একটি শিশু জন্মের পর কথা বলতে পারে না, কিছু বললেও বোঝে না। তাদের পরিবারিক চিকিৎসক, এটি বোবা এবং এর কোন কিছু বোঝবার ক্ষমতা নেই বলে অভিমত দেবার পরে ছেলেটির বাপ-মা চিকিৎসার জন্যে একে এই ইনস্টিটিউট ফর চাইল্ডহুড এফেজিয়াতে নিয়ে আসেন। এখানে আসবার পর ছেলেটি সব সময়ই একটি দোলনায় বসে থাকতো আর আপন মনে কি জানি বলতো, কিছু বোঝা যেত না। ছয় মাস ধরে তার চিকিৎসা হয়। এখন আর সে এক জায়গায় বসে থাকে না। বেশ চট্‌পটে হয়েছে, কোন ছবির কথা বললেই তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন—ওর যখন ছয় বছর বয়স হবে, তখন ওকে ফার্স্ট গ্রেডে ভর্তি করা যাবে, তখন সে তারই সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করতে পারবে।

এখানে একে ভর্তি করবার পরেই শিশুরোগের চিকিৎসক, মানসিক রোগের চিকিৎসক এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসকগণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে তার বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং এগিয়ে যাবার পথে কি কি বাধা রয়েছে, সে বিষয়েও পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষকবর্গ তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

অধিকাংশ শিশুকেই ছবির মাধ্যমে অক্ষর শেখানো ও ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হয়—মুখে মুখে শেখানোর দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। প্রচলিত কথ্য ভাষা শেখাবার আগেই কোন কোন শিশুকে পড়াবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

ঐ চার বছরের শিশুটির শিক্ষা সুরু হয়েছিল খেলার মাধ্যমে। প্রথমতঃ তাকে একটা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হতো, এটি কিসের ছবি? অথবা কোন জিনিষ দেখিয়ে এটি কি? মুখে কথা ফোটবার পরই তাকে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি, তা শেখানো হয়। তারপর তার মাতৃভাষা বলতে শেখানো হয়।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের প্রায় এক শত শিশুকে এখানে পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের ইনস্টিটউটে থাকা সম্ভব নয়, তাদের বাপ-মার কাছে রেখে চিকিৎসা করাবার জন্যে সুপারিশ করা হয়।

যাদের অন্য কোন স্থানে চিকিৎসায় কোন ফল হয় নি, সাধারণতঃ এই ইনস্টিটিউটে সেই সব রোগীই আসে।

এই ইনস্টিটিউট থেকে সম্প্রতি ১০টি ছেলেকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এরা এদেরই সমবয়সীদের সঙ্গে সরকারী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

এই ইনস্টিটিউট এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে পরীক্ষা হয়ে থাকে। তাছাড়া এই সকল শিশুকে শিক্ষা দেবার উপযোগী শিক্ষক গড়ে তোলবার কাজও ইনস্টিউটের কর্মীরা করে থাকেন এবং এদের বাপ-মাকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ভাসমান তুষারক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা

জন হোয়ার্ডের লেখা থেকে জানা যায়—জনমানবহীন তুষারক্ষেত্রে বয়ে চলেছে দুরন্ত বাতাস। তারই মধ্যে কয়েকটি মানুষের ছোট ছোট দল বিভিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে তাদের নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক উপকরণ নিয়ে, কুমেরু সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আহরণের জন্যে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক হলেও তারা কেউই পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে না, তার কারণ হলো আন্তর্জাতিক চুক্তিব্যবস্থাধীনে এই ৫,০০০,০০০

বর্ণমাইল আয়তনের সমগ্র অঞ্চলটি শান্তিপূর্ণ গবেষণার জন্যে সংরক্ষিত।

আঞ্চলিক দাবীর প্রশ্ন এখানে নেই এবং গবেষণার ফলে জ্ঞান যা আহরিত হচ্ছে, তাও সবাই ভাগ করে নিচ্ছে।

যাহোক, শান্তিপূর্ণ কথাটা যেন এখানে ঠিক খাটে না। এই অজ্ঞাত, জনহীন, তৃণহীন এলাকায় কঠিন ঠাণ্ডার মধ্যে কাজ করাটা শান্তিপূর্ণ বলে নিশ্চয় মনে হয় না। বিজ্ঞানীরাও বলেন, আর অন্যেরা যাঁরা এখানকার কথা কিছু জানেন তাঁরাও বলবেন যে, তাঁদের প্রত্যেক কাজেই দেখা দেয় বিশেষ রকমের সব সমস্যা—একটা হলো মাথা গোঁজবার স্থানাভাব।

বৃটেনের কুমেরু কেন্দ্রগুলির মধ্যে হ্যালি বে-তে অবস্থিত কেন্দ্রটি সবচেয়ে বড় এবং তা সবকিছু থেকে একেবারে 'বিচ্ছিন্ন। এখানে বরফ যেমন সরে যায়, তেমনই সরে যায় বাড়ীঘর, কখনও বা এই সব বাড়ীঘর তলিয়ে যায় তুষারের নীচে।

এর কারণ হলো বাড়ীর যেটা ভিত্তি, সেটা দাঁড়িয়ে আছে ৮০০ফুট গভীর ভাসমান তুষার-স্তূপের উপর। বরফের এই চাঙের তলদেশ ক্রমশঃ ক্ষয়ে যায় এবং নতুন বরফ এসে বাড়ী-গুলিকে ঘিরে ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

প্রায় চার বছর অন্তর এজন্যে দরকার হয় পুরনো বাড়ীঘরের উপর নতুন বাড়ী তৈরি করবার, পুরনো বাড়ীগুলিকে এরপর ব্যবহার করা হয় গুদাম ঘর হিসাবে, সুড়ঙ্গ তৈরি করে এর মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সব জায়গায় যিনিই কাজ করুন না কেন—গবেষক দলগুলির মধ্যে যেমন আছে ট্র্যাক্টর-চালক, ওয়েল্ডার, রেডার মিকানিক ও ইলেকট্রি-শিয়ান, তেমনই আছে ডাক্তার, প্রাণিবিজ্ঞাবিদ, পদার্থবিজ্ঞাবিদ্, আবহবিজ্ঞাবিদ্ ও অন্যান্য বিজ্ঞানী, তাঁদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় অভাবিত কোন দুর্ঘটনার জন্যে।

হেলি-বে কেন্দ্রের জন্যে গত ডিসেম্বর মাসে '৬৪ 'কিস্টা ড্যান' নামে একটা জাহাজ ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে গেছে একটি ওয়েদার বেলুন শেড। এথেকে একজন বিশেষজ্ঞ কতকগুলি বেলুন ছাড়বেন উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে, যেখান থেকে বেলুনগুলি আবার তাঁর কাছে পাঠাবে রেডিও মেটেরিওলজিক্যাল তথ্যাদি।

আর একটি উপকরণ হলো রেডিও-ইকো সাউ-ণ্ডার। এটি কুমেরু অঞ্চলের রহস্য উদ্ঘাটনে নিশ্চয় বেশী করে সাহায্যে করতে পারবে। এটি উদ্ভাবিত হয় কেম্ব্রিজের (ইংল্যাণ্ড) স্কট পোলার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে। এটি বরফের স্তর ও গ্ল্যাসিয়ারের গভীরতা পরিমাপ করে থাকে।

গ্রীনল্যাণ্ডে এর পরীক্ষা হয়। এখানে অনেক জায়গায় বরফ এক মাইল পর্যন্ত গভীর। যন্ত্রটিকে একটি যানের (Tracked vehicle) সঙ্গে যুক্ত করে তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে নিয়ে গেলে সেটি ক্রমান্বয়ে মেপে চলে নীচের বরফের গভীরতা।

বরফ যখন কঠিন হয়ে ওঠে, তখন এটি সবচেয়ে ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। কুমেরুর বরফ হলো এই রকমের কঠিন এবং কোন কোন জায়গায় তা তিন মাইল পর্যন্ত পুরু।

বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বৃটেন কুমেরুতে সারা বছর গবেষণা চালিয়ে এসেছে। এর ফলাফল আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারবে। খনিজ সম্পদ এখানে একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে। এছাড়া কুমেরুকে নিয়ন্ত্রণ করছে দক্ষিণ গোলার্ধের আবহাওয়া এবং প্রভাবিত করছে সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়া।

অনেক কিছু আবিষ্কার এখনও বাকী আছে। এখনও এমন সব এলাকা পড়ে আছে, যার সম্বন্ধে অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। এসব এলাকার মানচিত্র পর্যন্ত তৈরি হতে পারে নি—এমন কি, এই অঞ্চলের প্রাণীদের সম্পর্কেও এখন পর্যন্ত সবকিছু জানা হয় নি।

বৃটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের ডিরেক্টর সার ভিভিয়ান ফুক্‌স্ বলছেন—আমরা কুমেরুর উপর দিয়ে কেবল আঁচড় কেটে এসেছি, আর কিছু করা হয় নি।

অবশ্য নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপকরণ ব্যবহার করে এবং আরও বেশী শক্তি ও উদ্যম প্রয়োগ করে মানুষ ক্রমশঃ তুলে ধরতে পারবে কুমেরুর গোপন রহস্যের বিরাট যবনিকাটি।

চর্মরোগের চিকিৎসায় সাফল্য

নতুন এক পদ্ধতিতে মানুষের দেহের চর্মের উপর পরীক্ষা সম্ভব হওয়ায় চর্মরোগের চিকিৎসায় স্টেরয়েড অয়েন্টমেন্টসমূহের গুণাগুণ বিচার করবার জন্যে সময় আর সে ভাবে নষ্ট হচ্ছে না।

নতুন পদ্ধতিতে যৌগিক পদার্থগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। আগে এই পরীক্ষায় মাসের পর মাস সময় যেত। লণ্ডনের চর্মরোগের এক হাসপাতালে জনৈক ডাক্তার এই নতুন পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে নতুন যৌগিক পদার্থগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্ল্যাক্সো রিসার্চ বিজ্ঞানীরা ৫০টিরও বেশী নতুন যৌগিকের পরীক্ষা করে দেখেছেন।

যারা এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে, তাদের হাতের উপর অতি সামান্য পরিমাণ স্টেরয়েড প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই সব যৌগিক পদার্থের কার্যকারিতা পরিমাপ করা হচ্ছে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন-এর (Vasoconstriction) ভিত্তির দ্বারা।

একটি যৌগিক পদার্থ, বিটামেথাসোন ১৭-ভ্যালেরেট (Betamethason 17-valerate) সবচেয়ে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণার ফলে আর একটি নতুন পদার্থ পাওয়া গেছে—সেটি হলো বিটনোভেট (Betnovate)।

গ্ল্যাক্সো প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন যে, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় বিটনোভেট আশ্চর্য রকম ফল দেখাতে পেরেছে। এর ক্রিয়ার দ্রুততা লক্ষণীয়, বিশেষ ভাবে সোরিয়াসিস (Psoriasis) বা চর্মের খাপ্য প্রদাহের চিকিৎসায় এই দ্রুততা সবিশেষ লক্ষণীয়।

স্পন্দিত পৃথিবী

পৃথিবীর মহাদেশগুলি অবিরাম স্পন্দিত হচ্ছে এবং সেই জন্যে তাদের আপেক্ষিক দূরত্বেরও পরিবর্তন ঘটছে।

পুলকোভা মানমন্দিরের অধ্যাপক নিকোলাই প্যাভলোভের মতে, গত অগাস্ট ও মার্চ মাসের (১৯৭৪-'৭৫) মধ্যে আমেরিকা ও এশিয়া ছয় মিটার কাছে চলে এসেছে।

এই সোভিয়েট বিজ্ঞানী টাসের সংবাদদাতাকে আরও বলেন যে, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়ে থাকে, কিন্তু অগাস্ট '৭৪ ও মার্চের '৭৫ মধ্যে সে সময়টা এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ বেড়ে গেছে এবং তারই ফলে মহাদেশগুলি একে অন্যের কাছাকাছি চলে এসেছে।

মহাদেশগুলি ঘড়ির দোলকের মত আন্দোলিত হচ্ছে এবং এর গতি দৈনিক তিন মিটার পর্যন্তও উঠতে পারে। মহাদেশগুলি খাড়াভাবেও আন্দোলিত হচ্ছে এবং তার গতি দৈনিক আট মিটার পর্যন্ত।

এই স্পন্দন বা আন্দোলনই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ।

মহাকাশের সঙ্কেত

শ্রীনগর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে গুলমার্গের পারমাণবিক শক্তি যন্ত্রাগারে গত এপ্রিল ও মে মাসে চারশত বার মহাকাশের সঙ্কেত ধরা পড়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এই সব সঙ্কেত আসে মহাকাশ থেকে। ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয় সম্পর্কে তথ্যাদি জানবার অবলম্বন হচ্ছে এই সঙ্কেত।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বিশ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বলয় মানুষের চন্দ্রলোক ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে যাত্রার পথে এক প্রচণ্ড বাধার মত রয়েছে। এই বাধাকে অতিক্রম করেই মানুষকে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে।

গুলমার্গ গবেষণাগারে এই সঙ্কেত ধরে ফেলা এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলেই মনে করা হচ্ছে—'শান্ত সূর্য বছরে' ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার এক বিরাট সাফল্য।

ভারত মহাসাগরের নীচে বিস্তৃত উপত্যকা

ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে নারকোনদাম দ্বীপ এবং সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে একটি উপত্যকা আবিষ্কৃত হয়েছে। দৈর্ঘ্যে ৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ২৫ মাইল এই উপত্যকাটি ভারত মহাসাগরেরই অন্তর্গত আন্দামান সাগরের তিন মাইল নীচে অবস্থিত। সমুদ্রগর্ভের এই বিস্তৃত উপত্যকাটি ঘিরে আছে অত্যুচ্চ পর্বতমালা যার সর্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা ১২০০০ ফুট।

আমেরিকার কোস্ট অ্যাণ্ড জিওডেটিক সার্ভের সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা পায়োনিয়ার নামে একটি জাহাজের সাহায্যে এই আবিষ্কার করেন। ভারত মহাসাগরে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগে যে তথ্যসন্ধানী অভিযান চলছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পায়োনিয়ার নামে জাহাজটি এদেরই অন্যতম। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে ইণ্টার গবর্নমেণ্টাল ওশ্যানোগ্র্যাফিক কমিশন। এই কমিশনের উদ্যোগেই এই তথ্যসন্ধানী অভিযানের ব্যবস্থা হয়। পায়োনিয়ার নামে সমীক্ষা জাহাজের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা এই উপত্যকাটির অবস্থান নির্ণয় করেন এবং এটি যে পূর্বদিকে নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমান্তরালভাবে অবস্থিত, তা স্থির হয়। তাঁদের ধারণা এই উপত্যকা নারকোনদাম দ্বীপ থেকে সুরু হয়ে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর তলদেশ দিয়ে চলে গেছে। এটি কাদায় ভর্তি এবং এই কাদার গভীরতা আধ মাইলেরও বেশী।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের নীচে পর্বতমালার মধ্যে যে ধরণের উপত্যকা রয়েছে, আন্দামান সাগরের তলার উপত্যকাটি গঠন ও প্রকৃতির দিক থেকে প্রায় সেই রকম। আগ্নেয় বিস্ফোরণের ফলে সমুদ্রের নীচে এই পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। তারপর সেই বিস্ফোরণ বন্ধ হয়ে থিতিয়ে যাবার পর দেখা দেয় এই উপত্যকা। পায়োনিয়ার জাহাজের বিজ্ঞানীরা শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রতল সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী গবেষণা চালান। প্রোফাইলার বা স্পার্কার যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত এই সকল তরঙ্গ সমুদ্রের তলানি ভেদ করে শিলীভূত স্তর বা সমুদ্রগর্ভের অন্য কঠিন স্তরে গিয়ে ঠেকে। তারপর ঐ তরঙ্গ সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে এমনিভাবে ফিরে আসে, যা থেকে ঐ কঠিন স্তর পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা এবং ঐ স্তরের গঠন-প্রণালী সঠিকভাবেই জানা যায়। ঐ প্রতিফলিত শব্দকে চিত্রে রূপান্তরিত করা হয়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই উপত্যকাটির প্রস্থে দুই পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে গড়পড়তা ব্যবধান হলো ২০ থেকে ২৫ মাইল। আর তলদেশের

বিস্তৃতি প্রস্থে পাঁচ থেকে দশ মাইল—গভীরতা প্রায় তিন মাইল।

এই উপত্যকার দুই পাশেই সমান্তরালভাবে রয়েছে পর্বতমালা। এদের কোন কোনটির চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরেও উঠেছে। সর্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা ১২ হাজার ফুট। ঐটি রয়েছে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উত্তর দিকের সর্বশেষ দ্বীপটি থেকে ৮০ মাইল দূরে। এর তিন হাজার ফুট রয়েছে সমুদ্রগর্ভে।

পায়োনিয়ার জাহাজটি ১৯৬৪ সালের ২৫শে এপ্রিল এক সপ্তাহের জন্যে কলকাতা বন্দরে এসেছিল। পায়োনিয়ারের বিজ্ঞানীদের এই তথ্য সংগ্রহে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানী ডাঃ এম. সুব্বারাও এবং দেরাদুনের সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার লেঃ কর্ণেল এফ. খোশলাও সাহায্য করেন।

কৃষি-বিজ্ঞান

নতুন জাতের লুসার্ন

বাংলা দেশের মত সমতলে চাষের উপযুক্ত একজাতের লুসার্ন পাঞ্জাবের পশুখাদ্য রিসার্চ কেন্দ্রে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নতুন জাতের নাম লুসার্ন টাইপ-৯। এটি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে আর প্রচুর ফলে, বাঁচেও অনেক দিন। পাঞ্জাবের সির্সার গবেষণা-কেন্দ্রে এক জাতের লুসার্ন দশবছর ধরে সমানে ফসল জোগাচ্ছে।

বছরে ছয়-সাত বার কেটে হেক্টর প্রতি ৬৯১ কুইন্টল, অর্থাৎ একর প্রতি সাড়ে সাত শ' মণ সবুজ পশুখাদ্য (Green fodder) পাওয়া যায়। চাষে একটু যত্ন নিলে একর প্রতি হাজার মণ পাওয়াও অসম্ভব নয় (অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৯২১ কুইন্টাল)।

এই পশুখাদ্যের বেশী ফলন পেতে হলে ক্ষেতের দু'আনি ফসলে ফুল ধরা মাত্রই কাটা সুরু করা উচিত। ৩৫-৪০ দিন পরে পুরো ক্ষেত্রর ফসল কাটা চলবে।

সুপারীর সাদা ও লাল পোকা

মহীশূরের ভিটলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সুপারী গবেষণা-কেন্দ্র সম্প্রতি সাদা ও লাল পোকা (Red and white mite) নির্মূল করবার এক সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন।

সুপারীর শত্রু এই পোকা গাছে দেখলেই গন্ধক মিশ্রণ 'স্প্রে' করা দরকার। ১৬০ লিটার জলে মাত্র ১ কিলো গন্ধকের প্রয়োজন হয়। প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর এই মিশ্রণ 'স্প্রে' করতে হবে। ডিম আর সদ্যোজাত কীড়াগুলিও তুলে নিয়ে দূরে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

এই পোকা গাছের সবুজ অংশেই বেশী আক্রমণ করে, বিশেষতঃ কচি সুপারীকে। পাতার নীচের দিকে এরা আস্তানা বেঁধে থাকে, তাই 'স্প্রে' করবার সময় পাতার নীচের দিকে ভাল করে 'স্প্রে' করা উচিত।

সর্বার্থ-সাধক বীজ-বপন যন্ত্র

মহীশূরের ধারওয়ারে অবস্থিত কৃষি কলেজ সম্প্রতি এক নতুন ধরণের বীজবোনা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্র সব রকম জমিতে এবং একাধিক ফসলের কাজে লাগানো চলে। এই যন্ত্র একসঙ্গে তিন, চার ও পাঁচ সারিতে বীজ বুনতে পারে। দরকারমত সারির মধ্যে ব্যবধান, গর্তের গভীরতা আর বীজের মধ্যে দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী বেশী ও কম বীজ বোনবার কাজ চলে আর ছোট বড় নানা আকারের বীজ বোনাও সম্ভব।

এই যন্ত্র পাট, ধান, গম, ডাল ও তৈলবীজ বোনবার জন্যে ইতিমধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা
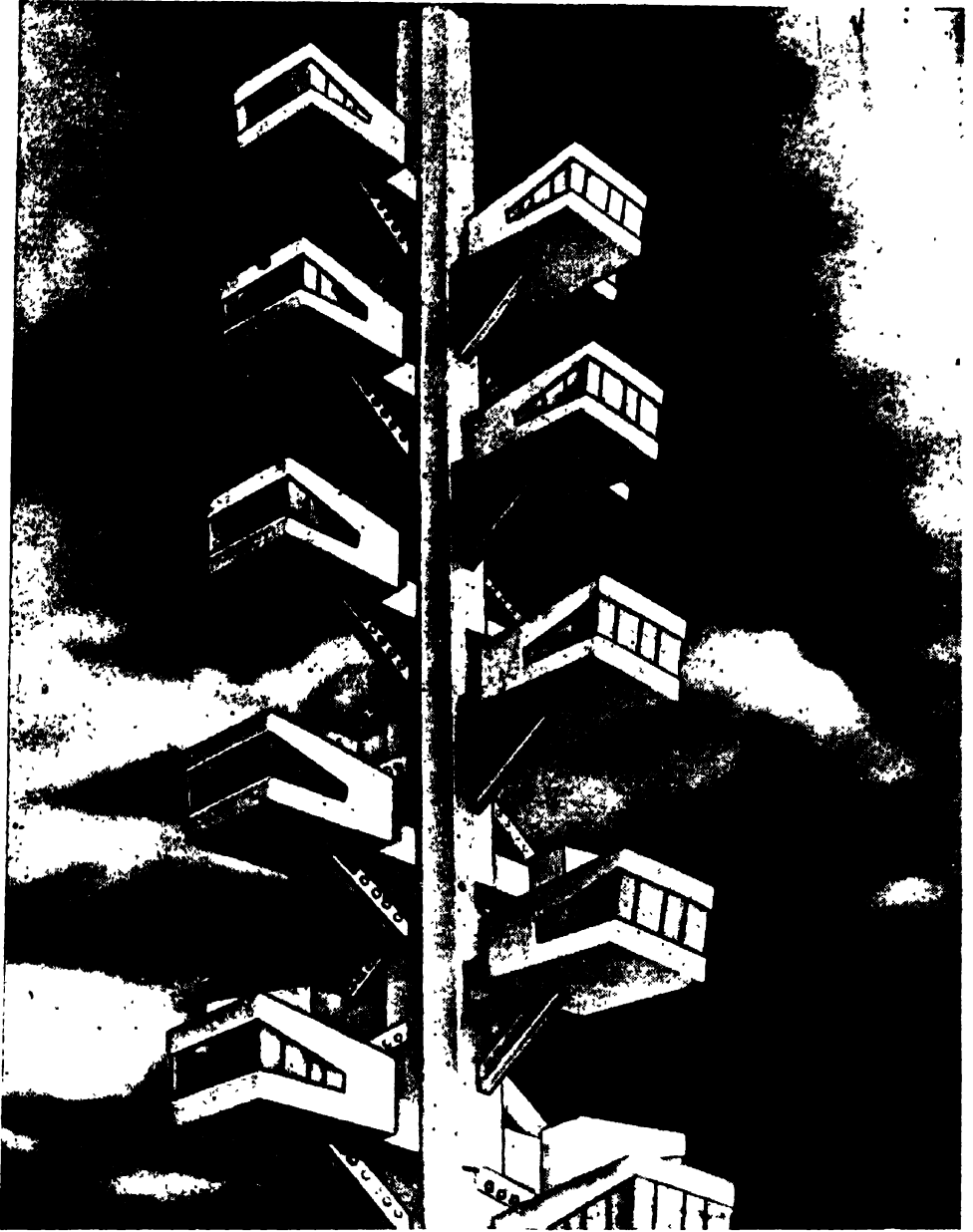
অদ্ভুত বাড়ী

ষ্টুটগার্টের হর্স্ট পি. ডোলিঙ্গের নামক একজন প্রসিদ্ধ স্থপতি সম্প্রতি এই অদ্ভুত বাড়ীর পরিকল্পনা করেছেন। যেখানে নতুন বাড়ী নির্মাণের স্থানাভাব, সেখানে খাটিয়ে নিলেই ২০-৩০ ঘরবিশিষ্ট একটা বাড়ীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা স্তম্ভের মাথায় ফ্রেমের মত করা হয়েছে। এই স্তম্ভ ২৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচু করা যেতে পারে। যতগুলি ঘর দরকার একটি লিফ্‌টের সাহায্যে তুলে ঐ ফ্রেমের উপর বসিয়ে এঁটে দিলেই বাড়ী তৈরি হয়ে যায়।

করে দেখ

দৃষ্টি-বিভ্রম

ছবিটা দেখে তোমাদের মনে হচ্ছে না কি—কালো কাগজ বা মেঝের উপর কাঁটাওয়ালা একটা সাদা রেখা যেন ঘড়ির স্প্রিং-এর মত পাক খেয়ে কেন্দ্রস্থল থেকে বাইরের দিকে চলে গেছে? আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ছবির রেখার যে কোন জায়গা থেকে পেন্সিল বুলিয়ে যাও—দেখবে, রেখাটা মোটেই স্প্রিং-এর মত প্যাঁচানো নয়, সবগুলিই কেন্দ্রের চতুর্দিকে পৃথক পৃথক বৃত্তাকার রেখা।
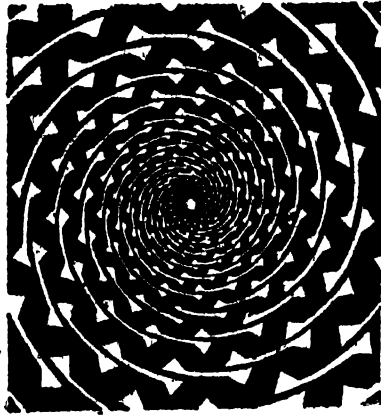
একগাছা সাদা আর একগাছা কালো দড়ি একত্রে পাকিয়ে বিভিন্ন রঙের অথবা নক্সাকাটা মেঝের উপর এইভাবে বৃত্তাকারে সাজিয়ে দিলেও এই রকম দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটবে। এই রকম দৃষ্টি-বিভ্রম কেন ঘটে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। কিন্তু এর প্রকৃত কারণ কি, সে সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকেরা একমত নন।

—গ—

উড়ুক্কু মাছ

সার্থকভাবে আকাশে ওড়বার ক্ষমতা শুধুমাত্র পাখীদের একচেটিয়া হলেও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরও অল্প-বিস্তর এই ক্ষমতা আছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর পাঁচটি শ্রেণীর (মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, বিহঙ্গ ও স্তন্যপায়ী) প্রত্যেকটিতেই উড়ুক্কু প্রাণীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পালকযুক্ত ডানার সাহায্যে পাখীদের আকাশ বিচরণের ক্ষমতাকে সত্যিকারের উড্ডয়ন ক্ষমতা বলা যায়। পাখী ছাড়া অন্যান্য উড়ুক্কু প্রাণীদের ক্ষেত্রে এরূপ উড্ডয়ন ক্ষমতা দেখা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে উড়ুক্কু শব্দটি খুবই সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়—অর্থাৎ হাওয়ায় ভেসে উড়ুক্কু প্রাণী অল্প দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে মাত্র। পাখী ছাড়া যে-সব প্রাণীর ওড়বার ক্ষমতা আছে, তাদের পালক এবং ডানার অস্তিত্ব নেই; তার পরিবর্তে আছে শরীরের উভয় পার্শ্বে ভাঁজ-করা চামড়ার পর্দা। এই পাত্‌লা চামড়া সামনের এবং পিছনের পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ওড়বার সাহায্য করে, যেমন—বাদুর, চামচিকা প্রভৃতি। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধুমাত্র মাছের বেলায়। এখানে পালক এবং ভাঁজ-করা চামড়ার পরিবর্তে আছে পাখ্‌না। উড়ুক্কু মাছ এই পাখ্‌নার সাহায্যেই উড়তে পারে।

মাছের পাখ্‌না দু'রকমের—জোড়া এবং বিচ্ছিন্ন। পাখ্‌নার ভিতরে কাঁটা বা হাড়ের মত শক্ত পদার্থ থাকে। সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে এই পাখ্‌নাগুলি সাঁতার কাটবার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উড়ুক্কু মাছের বেলায় জোড়া পাখ্‌না (Paired fin) ওড়বার কাজে লাগে। বুকের কাছের জোড়া বক্ষপাখ্‌না এবং পিছনের শ্রোণী-পাখ্‌নাগুলি (Pelvic fin) খুবই চওড়া হয়ে থাকে। এগুলি এরোপ্লেনের ডানার মত মাছের শরীরের উভয় দিকে প্রসারিত হতে পারে। দুই ডানাবিশিষ্ট মাছের ক্ষেত্রে শুধু বক্ষপাখ্‌না দুটি এবং চার ডানাবিশিষ্ট মাছের ক্ষেত্রে চারটি পাখ্‌নাই প্রসারিত হয়ে ডানার কাজ করে।

এরোপ্লেন 'টেক অফ'-এর আগে রানওয়েতে যেমন দ্রুতগতিতে চলতে থাকে, উড়ুক্কু মাছও সেরূপ ওড়বার আগে তাদের পাখ্‌নাগুলিকে ভাঁজ করে জলের নীচে দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে থাকে। তারপর খাড়াভাবে জলের উপরে ওঠে এবং পুচ্ছপাখ্‌নাটি (Caudal fin) জলে নিমজ্জিত থাকে। জলের উপরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পাখ্‌নাগুলির ভাঁজ খুলে গিয়ে শরীরের দু-দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দু-দিকে ডানা মেলে দিয়ে মাছটি যখন জলের উপরে আসে, তখন জলে নিমজ্জিত পুচ্ছের আঘাতে জল থেকে খানিকটা উপরে লাফিয়ে ওঠবার শক্তি পায় এবং

সঙ্গে সঙ্গে ডানার উপর ভর করে দ্রুতগতিতে পাখ্‌না বাঁকিয়ে সরল রেখায় বা অর্ধবৃত্তাকারে আকাশে উড়তে থাকে। উড়ুক্কু মাছ যদিও বেশী সময় শূন্যে উড়তে পারে না, তথাপি অল্প সময়েই তারা অনেকটা পথ অতিক্রম করতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, একটি মাছ ৩০ সেকেণ্ড উড়ে ৩০০ গজ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। জলের কোন জায়গা থেকে উঠে শূন্যে কিছুটা পথ অতিক্রম করে আবার জলে গিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ওড়বার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। তখন নতুনভাবে আবার ওড়বার প্রস্তুতি করতে হয়। কোন কোন উড়ুক্কু মাছ আবার একবার উড়ে কিছুটা পথ অতিক্রম করবার পর পুনরায় নেমে শুধুমাত্র পুচ্ছপাখ্‌নাটিকে জলে ডুবিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে পারে।

চারটি ডানাবিশিষ্ট সিপ্‌সেলুরাস।

পাখীরা ওড়বার সময় তাদের ডানা উঠা-নামা করায় এবং এই ডানার আঘাতেই বাতাসের মধ্যে তাদের ওড়া সম্ভব হয়। কিন্তু মাছের বেলায় ঠিক তার উল্টো—ডানা শক্তভাবে লেগে থাকবার জন্যে ওড়বার সময় তাদের ডানা কখনও উঠা-নামা করতে পারে না। কিছু কিছু উড়ুক্কু মাছের ক্ষেত্রে অবশ্য ডানার উঠা-নামা দেখা যায়; তবে ঐ উঠা-নামা বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে সংঘটিত হয়; পেশীর সঙ্গে এই উঠা-নামার কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিকারের ওড়বার সময় উড্ডয়ন পেশীর সাহায্যে ডানা উঠা-নামা করে।

উড়ুক্কু মাছের ওড়বার প্রধান কারণ হলো আত্মরক্ষা। সখ করে এরা ওড়ে না। হাঙর, ডলফিন প্রভৃতি যখন উড়ুক্কু মাছগুলিকে আক্রমণের চেষ্টা করে, তখন

শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্তেই জল থেকে আকাশে উড়ে পালাবার চেষ্টা করে। আক্রান্ত উড়ুক্কু মাছ এককভাবে অথবা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালায়।

উড়ুক্কু মাছের শ্রেণীবিভাগ এবং উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো—
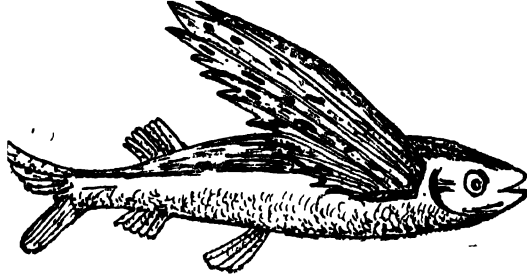
দুই ডানাবিশিষ্ট অ্যাক্সোসিটাস।

(১) প্রকৃত উড়ুক্কু মাছ—অ্যাক্সোসিটাস (Exocoetus), সিপ সেলুরাস (Cypselurus)—এই বিভাগের অন্তর্গত। এইগুলিকেই প্রকৃত উড়ুক্কু মাছ বলা চলে; কারণ

উড়ুক্কু গারনার্ড।
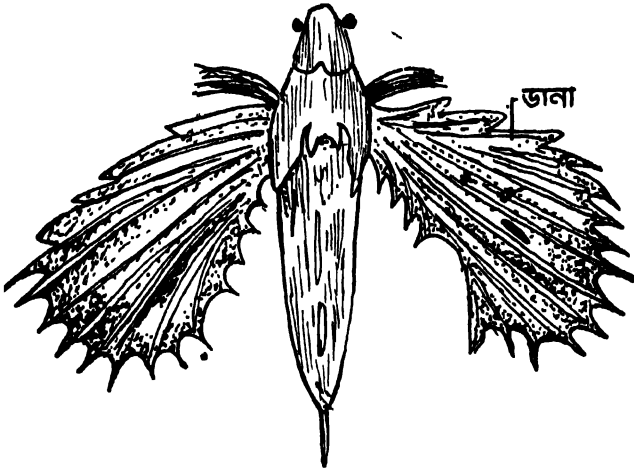
এদের পাখ্নাগুলি খুবই প্রশস্ত এবং এরা অনেকটা পথ উড়ে যেতে পারে। প্রথমোক্ত মাছটি দুই ডানাবিশিষ্ট এবং অপরটি চার ডানাবিশিষ্ট। এরা সামুদ্রিক মাছ।

(২) মিঠা জলের উড়ুক্কু মাছ—দক্ষিণ আমেরিকার গ্যাষ্টারোপেলিকাস

(Gasteropelecus) এবং আফ্রিকার প্যান্টোডন (Pantodon)। সমুদ্রের নোনা জলের পরিবর্তে এদের নদীর জলে পাওয়া যায়। এরা আকারে খুবই ছোট হয়ে থাকে।

(৩) উড়ুক্কু গারনার্ড (Flying Gurnard)—হাইতি উপসাগরে এই মাছ দেখা যায়। এরা খুবই অদ্ভুত ধরণের। ডানা, হাত, পা—এই তিন শ্রেণীর অঙ্গই এই মাছের আছে। অবশ্য সবগুলিই পাখ্‌নার রূপান্তর। বক্ষপাখ্‌না দুটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেগুলি বেশ চওড়া। বক্ষপাখ্‌নার সামনের কিছু অংশ ডানা থেকে পৃথক
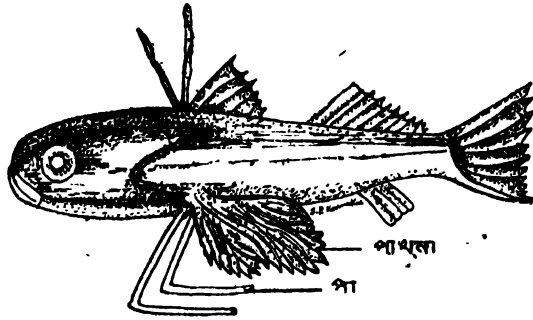
চলমান গারনার্ড।

হয়ে গিয়ে দুদিকে দুটি ছোট হাতের আকার ধারণ করেছে। অঙ্কদেশীয় (Ventral) দুটি পাখ্‌না সরু পায়ের আকার লাভ করেছে। এই মাছের মাথা একটি শক্ত আবরণীর দ্বারা আবৃত থাকে। নিউ ইয়র্ক জুওলজিক্যাল সোসাইটির প্রাণী-বিজ্ঞানী উইলিয়াম বীবের বিবরণ থেকে এই বিচিত্র গারনার্ড সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

গারনার্ড তার প্রশস্ত ডানার সাহায্যে দ্রুত উড়তে পারে। একবার নাকি এই উড়ন্ত গারনার্ডের আঘাতে ষ্টীমলঞ্চে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনেক সময় এদের প্রশস্ত ডানা প্লবতার কাজ করে। ডানা দুটিকে জলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে এরা নির্জীবভাবে জলের উপর ভেসে চলে, মাঝে মাঝে পুচ্ছ-পাখ্‌নার নড়াচড়া ছাড়া আর কোন স্পন্দন দেখা যায় না।

গারনার্ডের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—এদের হেঁটে চলবার ক্ষমতা। দুটি সরু পায়ের (রূপান্তরিত অঙ্কদেশীয় পাখ্‌না) সাহায্যে এরা রীতিমত হেঁটে চলতে পারে।

পা-দুটির বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পিঠের উপরে, পৃষ্ঠ-পাখনা (Dorsal fin) থেকে আরো দুটি সরু অঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে। পায়ে হাঁটবার সময় ঐ দুটি অঙ্গ ভারসাম্য বজায় রাখবার কাজ করে।

শ্রীরমেন দেবনাথ

ফোম গ্লাস

ফোম গ্লাস নামে এক ধরণের কাচ আছে—যা সাধারণ কাচের মত স্বচ্ছ নয়। এই কাচ দেখতে ঘন কালো রঙের। এই কাচ জলের চেয়ে হাল্কা বলে জলে ভাসে। এই কাচের মধ্যে স্পঞ্জের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু এই ছিদ্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। কাজেই এই কাচের কোন এক দিক জলে ডুবিয়ে দিলে স্পঞ্জের মত কাচটাকে ভিজিয়ে দিতে পারে না; অর্থাৎ জলের মধ্যে ডুবিয়ে নিলে স্পঞ্জ যেমন জল শুষে নেয়, এই কাচ কিন্তু সেরূপ জল শুষে নেয় না।

এই কাচ সাধারণ কাচের চেয়ে অনেক সস্তা। কেন না, সাধারণ কাচ তৈরি করতে যে সব জিনিষ নষ্ট হয়, প্রধানতঃ তা থেকেই এই কাচ তৈরি হয়। এই কাচের মধ্যে কয়লার গুঁড়া অর্থাৎ কার্বন মেশানো থাকে। এই কার্বন ফোমিং এজেন্টের অর্থাৎ ফেনায়িত করবার কাজ করে। কাজেই এই ধরণের কাচকে ফোম গ্লাস বা ফেনায়িত কাচ বলে।

এই কাচ খুবই নরম। সাধারণভাবে নখের চাপ দিয়ে এর গায়ে দাগ কাটা যায়। সাধারণ একটা ছুরি দিয়েই এই কাচ খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায়।

এই ফোম গ্লাসের অনেক রকমের ব্যবহার আছে। এই কাচ তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাড়ীর ছাদের উপর এই কাচের আস্তরণ দেওয়া যেতে পারে। কারণ এই কাচ সূর্যের তাপ প্রতিহত করে।

শীতপ্রধান দেশেও এই কাচ তাপ অপরিবাহী হিসাবে ভাল কাজ করে। জল বরফে পরিণত হলে তার আয়তন বেড়ে যায়। শীতপ্রধান দেশে প্রচণ্ড শীতে যখন কলের পাইপের জল জমে বরফ হয়ে যায়, তখন তার আয়তন বৃদ্ধির ফলে পাইপের মধ্যে এত বেশী চাপের সৃষ্টি হয় যে, পাইপ ফেটে যায়। পাইপের বাইরে চার দিকে ফোম গ্লাসের একটা আবরণ দিয়ে দিলে তাপের আদান-প্রদান হয় না এবং তার ফলে পাইপ ফেটে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। এই ফোম গ্লাসকে কর্ক্ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু

পেট্রোলিয়াম জেলী

ছোট কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার ফলে অনেক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। পেট্রোলিয়াম জেলী বা ভেসিলীনের আবিষ্কারও এর ব্যতিক্রম নয়। পেট্রোলিয়াম জেলী—এই নাম থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এটা তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। পেট্রোলিয়াম কাকে বলে, এখানে তা জানা দরকার। পেট্রোলিয়াম হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত এক রকম খনিজ তেল। বিভিন্ন প্রকার হাইড্রো-কার্বনের অণু-পরমাণু মিলিত হয়ে এই খনিজ তেল সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিমাণে এই তেল জমা আছে। সবচেয়ে বেশী পরিমাণে এই তেল সঞ্চিত আছে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পেন্‌সিলভেনিয়ায়। কিন্তু মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা এই তেলকে পৃথিবীর আলোয় বের করে আনা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব-প্রথমে কৃতকার্য হন আমেরিকার বৈজ্ঞানিক জর্জ বিসেল। তিনি ও তাঁর সহকর্মী ড্রেক খনন যন্ত্রের সহায়তায় পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই খনিজ তেল বাইরের আলোয় বের করে আনেন। তাঁর এই কাজের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তরুণ রসায়নবিদ চেস্‌ব্রা-র কানেও এই খবর এসে পৌঁছালো। ব্রুকলীনের এই রসায়নবিদ তেল পরিস্রবণ করবার কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাগজে খবর পড়ে তিনি ঠিক করলেন, পেন্‌সিলভেনিযায় যাবেন। ১৮৫৯ সালের কোন একদিন তিনি পেন্‌সিলভেনিয়ার তেলের খনির প্রাণকেন্দ্র টিটাস্‌ভিলে পৌঁছুলেন।

খনিতে তেল তোলবার কাজ হচ্ছিল। চেসব্রা মনোযোগ দিয়ে তা দেখতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তেল উত্তোলক নলের মুখগুলি কিছুক্ষণ পর পরই মোমজাতীয় একরকম নরম জিনিষের দ্বারা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক শ্রমিককে তিনি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রমিকটি তাঁকে জানালো যে, এটা খনিজ তেলের তলানী। এই তলানী নলের মুখ বন্ধ করে তেল উত্তোলন করবার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এর জন্যে নলের মুখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হয়। কিন্তু তলানীর শুধু দোষ নয়, একটা গুণের কথাও শ্রমিকটি তাঁকে জানালো। শরীরের কোন ক্ষতস্থানে এই তলানী লাগালে এটা আশ্চর্যরকম ভাল ফল দেয়।

চেসব্রা স্থির করলেন যে, তিনি গবেষণাগারে খনিজ তেল থেকে এই মোমজাতীয় তলানী অংশ তৈরি করবেন। টিনভর্তি এই জিনিষ্‌ নিয়ে তিনি ব্রুকলীনে ফিরে গেলেন। কয়েক মাস গবেষণা করবার পর পেট্রোলিয়াম থেকে এই তলানী অংশ

নিষ্কাশিত করবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই তলানীটা হলো অস্বচ্ছ জেলীর মত একটা জিনিং—যার কোন স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নেই। পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরী এই পদার্থটির নামই হলো পেট্রোলিয়াম জেলী।

এবার চেসব্রা তাঁর তৈরী এই জেলীর গুণাগুণ পরীক্ষা করবার কাজে হাত দিলেন। নিজের শরীরের উপরই তিনি পরীক্ষা চালালেন। শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে বা আগুনে পুড়িয়ে তিনি ক্ষত সৃষ্টি করলেন। এই সব ক্ষতে পেট্রোলিয়াম জেলী লাগিয়ে তিনি আশ্চর্য রকম উপকার পেলেন। ইটের কারখানার শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্যে তিনি তাদের এই জেলী দিয়েছিলেন। তারাও এটা ব্যবহার করে উপকৃত হলো। এবার এই জেলী নিয়ে চেস্‌ব্রা ব্যবসায়ে নামলেন। এই জেলীর ব্যবসায়িক নামকরণ করা হলো ভেসিলীন। ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্যে বিনামূল্যে এই জেলী পাঠানো হলো। কাটা, পোড়া প্রভৃতি ক্ষতের পক্ষে এটা যে নিঃসন্দেহে উপকারী—সকলের ব্যবহারের ফলে সেটা প্রমাণিত হলো। ১৯১২ সালে নিউ ইয়র্কের অ্যাসিউরেন্স বিল্ডিং-এ এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই দুর্ঘটনায় দগ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসার কাজে পেট্রোলিয়াম জেলী সব চেয়ে বেশী সহায়তা করে। এই ঘটনার পরেই চেসব্রার জেলী দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি পায়।

কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষতের উপশমই নয়, আরও হাজার রকম কাজে এই জেলী ব্যবহৃত হয়। দূরপাল্লার সাঁতারুরা ঠাণ্ডা জল থেকে নিজের ত্বক বাঁচাবার জন্যে এই জেলী ব্যবহার করেন। ফটোর অবাঞ্ছিত দাগ তোলবার জন্যে ফটোগ্রাফারদের এই জেলী দরকার হয়। ব্রেইলী পড়বার সময় আঙুলের মাথা নরম রাখতে এই জেলী অন্ধদের সাহায্য করে। ব্লেড বা ক্ষুরকে মরচে ধরা থেকে এই জেলী বাঁচিয়ে রাখে। এই শেষ নয়, ট্রাউট মাছ ধরতে বা নকল চোখের জল ফেলতে এই জেলী সমানভাবে কাজে লাগে।

সর্বশেষে ভেসিলীন সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলি। একবার পেট্রোলিয়াম কারখানার নতুন এক কর্মচারী চেসব্রাকে জানালেন যে, ভারতবর্ষের লোকেরা রুটি খাবার সময় মাখনের বদলে এই জেলী ব্যবহার করে। এই মজার কথা শুনে চেস্‌ব্রা কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হলেন না, হেসে জানালেন যে, তিনি নিজেও প্রতিদিন চামচভর্তি এই জেলী খান। চেস্‌ব্রা ছিয়ানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। মরবার সময় তিনি বলে যান, দৈনিক পেট্রোলিয়াম জেলী খাওয়ার জন্যেই তাঁর এই দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব হয়েছে।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

মাকড়সার কথা

আমাদের আশেপাশের অনেক রকম কীট-পতঙ্গের কথা তোমরা জান। এদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের বিশেষ পরিচিত—আবার কেউ কেউ অপরিচিত। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখবে—পরিচিত ও অপরিচিত কীট-পতঙ্গের চেহারায়, চাল-চলনে অদ্ভুত পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে মাকড়সা, ফড়িং, গুবরে পোকা প্রভৃতি নিশ্চয় তোমাদের বিশেষ পরিচিত। এখন তোমাদের পরিচিত মাকড়সা সম্বন্ধেই কিছু বলছি।

এখানে একটা কথা বলে রাখছি—সাধারণতঃ কীট-পতঙ্গ বলতে যা বোঝায়—মাকড়সা সেই শ্রেণীভুক্ত নয়। কীট-পতঙ্গদের শরীর তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা—মাথা, বুক ও পেট। তাদের ছয়টি পা, দুটি চোখ, ও দুটি শুঁড় থাকে। একটা মাকড়সাকে ভাল করে দেখলে দেখবে—এদের শরীর কিন্তু তিন ভাগে বিভক্ত নয়; মাথা আর বুক এদের পৃথক নয়—একসঙ্গে জোড়া। পায়ের সংখ্যা—আট, চোখের সংখ্যা আট। অবশ্য কোন কোন জাতের মাকড়সার আবার ছয়টি চোখও থাকে। মাথার সম্মুখভাগে থাকে দুটি তীক্ষ্ণাগ্র শক্ত চোয়াল। এই চোয়ালের সাহায্যেই মাকড়সা শিকার বা শত্রুকে দংশন করে ঘায়েল করে। কোন কোন মাকড়সার বিষ খুব উগ্র। তবে আমরা সাধারণতঃ যে সব মাকড়সা দেখি, তাদের বিষ খুব মারাত্মক নয়।

মাকড়সার জীবন-কাহিনী খুব কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এরা আমাদের এত বেশী পরিচিত যে, এদের সম্বন্ধে কিছু যে জানবার থাকতে পারে—আমরা তা সাধারণতঃ ভাবি না। মাকড়সার জন্ম সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণের কাহিনী তোমাদের অনেকেরই জানা থাকবার কথা। মাকড়সার জাল বোনবার ধৈর্য দেখে রবার্ট ব্রুসের আত্মবিশ্বাস লাভের কাহিনীও তোমরা শুনে থাকবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ২৫০০০ বিভিন্ন জাতের নানা রকম আকৃতির মাকড়সার সন্ধান পেয়েছেন। বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সার দেহের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ১/৫০ ভাগ থেকে ১১/২"-২" পর্যন্ত হয়ে থাকে। কয়েক জাতের মাকড়সার পাগুলি শরীরের তুলনায় অনেক লম্বা। নেকড়ে জাতীয় মাকড়সার পাগুলি দেহ অপেক্ষা বেশী বড় হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশে ছোট-বড় নানা জাতীয় রকমারি মাকড়সার অভাব নেই। বিভিন্ন জাতের মাকড়সার জীবন-যাত্রা পদ্ধতিতে অদ্ভুত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

শীতপ্রধান দেশের তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই মাকড়সার সংখ্যা সাধারণতঃ

বেশী। সুমেরু অঞ্চল এবং হিমালয় পর্বতের ২২০০০ ফুট উর্ধ্বেও মাকড়সার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মাকড়সা সুদক্ষ শিকারী, শিকারের জন্যে এরা বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে। এরা পুরাপুরি মাংসভোজী। পুরুষদের তুলনায় স্ত্রী-মাকড়সারাই নিপুণ শিকারী। শিকার ধরবার কৌশলও এদের নানা রকম। কেউ জাল বুনে শিকার ধরে, কেউ বাঘ বা বিড়ালের মত ওঁৎ পেতে বসে থাকে—সুযোগ এলে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, আবার কেউ আশেপাশের গাছপালা, লতাপাতার রঙের সঙ্গে নিজের গায়ের রং মিলিয়ে এমনভাবে বসে থাকে—শিকার বুঝতেই পারে না যে, শত্রু নিকটে আছে। শিকার নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে কাছে এলেই তাকে আক্রমণ করে। মাকড়সাদের মধ্যে প্রায় সব ব্যাপারেই সাধারণতঃ স্ত্রী-মাকড়সার প্রাধান্য দেখা যায়। জাল বোনা, ডিম ও বাচ্চা সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে স্ত্রী-মাকড়সারাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রী-মাকড়সার দয়ার উপর পুরুষ মাকড়সাদের নির্ভর করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-মাকড়সা মিলনের পর পুরুষ মাকড়সাকে উদরসাৎ করে ফেলে। অধিকাংশ জাতের মাকড়সার মধ্যে দেখা যায়—স্ত্রী-মাকড়সার দৈহিক আকৃতি পুরুষ মাকড়সার দৈহিক আকৃতির চেয়ে অনেক বড়। এমন কি, কোন কোন জাতের এক ইঞ্চি পরিমিত স্ত্রী-মাকড়সার তুলনায় পুরুষটি প্রায় ১/৩০ ভাগেরও কম হয়ে থাকে। পুরুষ মাকড়সার প্রধান ভূমিকা হচ্ছে বংশবৃদ্ধি করা আর ঘুরে বেড়ানো।

ডিম ও বাচ্চার প্রতি স্ত্রী-মাকড়সার সতর্ক দৃষ্টি থাকে। বাচ্চারা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত এরা ডিমের থলি পাহারা দেয়, নয়তো ডিমের থলি শরীরের কোন অংশে আট্‌কে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে।

ডিম পাড়বার সময় হলে স্ত্রী-মাকড়সা সুতা বুনে ডিমের থলি তৈরি করে। একসঙ্গে এরা অনেক ডিম পাড়ে। ডিমগুলি এক রকম চট্‌চটে আঠালো পদার্থের সাহায্যে একসঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কেউ কেউ নিরাপদ গোপন স্থানে আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমের থলি আট্‌কে রাখে, কেউ কেউ আবার ডিমের থলি তলপেটে সংলগ্ন করে এদিক-সেদিক যাতায়াত করে। পনেরো-কুড়ি দিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং কয়েক বার খোলস বদল করে পূর্ণাঙ্গ মাকড়সায় পরিণত হয়।

মাকড়সার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুতা বোনা। সব জাতের মাকড়সা জাল তৈরি না করলেও সকলেই কিন্তু সুতা বুনে থাকে। এদের তলপেটে কয়েকটি গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি থেকে একপ্রকার তরল পদার্থ সূক্ষ্ম সুতার আকারে বের করে দেয় এবং বাতাসে সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। একেই বলে মাকড়সার বোনা রেশমী সুতা। তিন-চারটি সূক্ষ্ম সুতা একত্রিত হয়ে শক্ত সুতা তৈরি হয়। এই সুতা দিয়েই এরা ডিম পাড়বার থলি ও জাল তৈরি করে।

বাচ্চা অবস্থায় মাকড়সা বাতাসে ভেসে শত শত মাইল দূরে অনায়াসে চলে যেতে পারে। কিন্তু মাকড়সার তো ডানা নেই, তবে এরা কিভাবে বাতাসে ভেসে যায়? অদ্ভুত কৌশলে এরা ভেসে বেড়ায়। বাচ্চা মাকড়সা তার দেহের পিছনের অংশটা একটু উঁচু করে সূতা ছাড়তে থাকে। বাতাসের টানে সূতা অনেকটা লম্বা হলে এরা পা গুটিয়ে সূতায় ভর করে প্যারাসুটের মত বাতাসে ভেসে বহুদূরে চলে যায়।

বিভিন্ন জাতের মাকড়সার জাল বিভিন্ন রকম। কারো জাল খাড়া, কারো জাল ভূমির সমান্তরাল, কারো জাল তেকোণা, কারও বা বহুকোণী। কেউ আবার তাঁবুর মত জাল বোনে। কেউ কেউ এলোমেলোভাবে সূতা ছড়িয়ে রাখে। কারও কারও জাল দেখতে পাত্‌লা কাগজের মত সমতল। এদের জাল বোনবার কৌশল দেখবার মত। জাল বুনতে এদের বেশ মেহনৎ করতে হয় এবং কাজটা সময় ও ধৈর্য-সাপেক্ষ। ডিম ও বাচ্চার মত জালও এদের মূল্যবান সম্পত্তি।

জাল বোনবার সময় প্রথমে একটা গাছের ডাল বা উঁচু কোন কিছুতে সূতা আটকে সেই সূতায় ভর করে কিছুটা নীচে ঝুলে পড়ে। ঝুলন্ত অবস্থায়ই আবার সূতা ছাড়তে থাকে। বাতাসের টানে সূতাটার প্রান্তভাগ উড়তে উড়তে গাছ-পাতা বা অন্য কোন জায়গায় আট্‌কে যায়। সূতাটা টেনে, আট্‌কে গেছে বুঝতে পারলে—সূতা বেয়ে মাকড়সা সেখানে চলে যায়। আবার সেখান থেকে সূতা ছেড়ে পূর্বের মত ঝুলে পড়ে সূতা ছাড়তে থাকে। সেই সূতাটা কোন স্থানে আট্‌কে গেছে বুঝতে পারলে আগের সূতাটা ভর করে প্রথম স্থানে চলে যায়। এইভাবে মাকড়সা ত্রিকোণাকার বা বহুকোণী একটা সূতার কাঠামো তৈরি করে। তারপর ছাতার শলার মত কয়েকটা টানা তৈরি করে। আস্তে আস্তে তলপেটের গ্রন্থি থেকে সূতা ছাড়তে থাকে আর পিছনের দুটা পায়ের সাহায্যে ঘুরে ঘুরে জাল তৈরি করে। একটা জাল বুনতে সাধারণতঃ আধ ঘন্টারও বেশী সময় লাগে। জালের সূতায় অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আঠালো পদার্থ থাকে। শিকার জালে ধরা পড়লেই এই আঠালো পদার্থে আট্‌কে যায়। দু-তিন দিনের মধ্যে জালের এই আঠালো পদার্থ শুকিয়ে গেলে—তখন আবার নতুন করে জাল তৈরি করতে হয়। তাছাড়া জালের কোন অংশ ছিঁড়ে গেলে এরা চট্‌পট মেরামত করে ফেলে। জাল তৈরি হবার পর কেউ কেউ জালের বাইরে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে শিকারের আশায়। জালের একটা সূতা এদের পায়ের বাঁকানো নখের সঙ্গে লাগানো থাকে। শিকার জালে পড়লে মুক্তির আশায় ছট্‌ফট করে এবং পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন সূতায় টান পড়ে। মাকড়সা তখন ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে চোয়ালের সাহায্যে শিকারকে দংশন করে নিস্তেজ করে ফেলে এবং সূতা দিয়ে ব্যাণ্ডেজের মত করে শিকারকে মুড়ে ফেলে। কখনও কখনও সঙ্গে সঙ্গে

এরা শিকারকে উদরসাৎ করে। আমাদের দেশে বাগানে বা বাড়ীঘরের আনাচে-কানাচে এক জাতের মাকড়সা দেখা যায়—এরা জাল বুনে তার মাঝখানে ইংরেজী X অক্ষরের মত একটা চিহ্ন বুনে তার উপর মাথাটা নীচু করে বসে থাকে। মাকড়সা তাদের চোখ চারদিকে ঘোরাতে না পারলেও সব দিকের দৃশ্য ভাল ভাবে দেখতে পায়। বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা নানারকম ফড়িং, পোকামাকড়, মাছি, টিকটিকি, চামচিকা, ব্যাং, ছোট ছোট পাখী, ছোট ছোট মাছ প্রভৃতি শিকার করে থাকে। কোন কোন মাকড়সা নাকি ছোট ছোট সাপও শিকার করে উদরসাৎ করে। মাকড়সা শিকারকে চিবিয়ে খায় না—শিকারের রস-রক্ত চুষে খায়।

জলচর, স্থলচর ও উভচর—সব রকমেরই মাকড়সা দেখা যায়। এদের কারো গায়ের রং ধূসর, কারো গায়ে সাদা-কালো ডোরা-কাটা। সবুজ, বেগুনী, নীল ও রামধনুর মত বিচিত্র রঙের মাকড়সারও অভাব নেই। এরা একাকী থাকে। একটির সঙ্গে আর একটির দেখা হলেই লড়াই বেঁধে যায়। উভয়ে সমকক্ষ হলে লড়াই বেশ জমে ওঠে, নয়তো দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পালাতে না পারলে বেচারীর আর রক্ষা নেই—সবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে মৃত্যু অনিবার্য। তবে দু-এক জাতের মাকড়সা অবশ্য দল বেঁধে বাস করে।

বিরাট আকৃতির মাকড়সা সময় সময় ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর, ব্যাং প্রভৃতি শিকার করে উদরসাৎ করে। ট্র্যাপ-ডোর মাকড়সা মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে অদ্ভুত বাসা তৈরি করে। গর্তের মুখের ঠিক মাপ মত কব্জাওয়ালা গোলাকৃতির ঢাক্না থাকে। এই ঢাক্না এরা ইচ্ছামত খুলে বা বন্ধ করে রাখে। ডুবুরী বা জলচর মাকড়সা দশ-পনেরো মিনিট একনাগাড়ে জলের নীচে থাকতে পারে। মজার কথা কি জান? জলের নীচে থাকলেও এদের গায়ে জল লাগে না মোটেই। জলের মধ্যে এদের শরীর যেন ঝক্‌ঝকে রূপার আস্তরণে আবৃত দেখায়। এরা ছোট ছোট মাছ, অন্যান্য জলচর কীট-পতঙ্গ শিকার করে জীবনধারণ করে।

মাকড়সার রেশমী সুতা কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মাকড়সার জাল দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরবার জাল তৈরি করে। মাকড়সার সুতা দিয়ে ব্যাপকভাবে কাপড় তৈরিরও চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সে চেষ্টা আশানুরূপ সফল হয় নি। জানা যায় ১৭১০ সালে ইংরেজ জীবতত্ত্ববিদ্ ডাঃ থিয়োডর এইচ. স্যাভয় মাকড়সার সুতা দিয়ে এক জোড়া মোজা বুনতে সক্ষম হন। প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ্ Réaumur-কে ব্যাপকভাবে কাপড় বোনবার জন্যে মাকড়সার রেশমী সুতা ব্যবহার করা যায় কিনা—সেই বিষয়ে গবেষণা করতে বলেন। তিনি গবেষণা করে দেখেন—বেশীর ভাগ মাকড়সার সুতাই কোন কাজে লাগে না, যাও কাজে লাগে তার

পরিমাণ খুব কম। তাছাড়া এক পাউণ্ড মাকসার সুতা সংগ্রহ করবার জন্যে কয়েক হাজার মাকড়সার প্রয়োজন হয়। এর পরে অধ্যাপক ওয়াইলার নামক দক্ষিণ ক্যারোলিনার একজন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে চেষ্টা করেন। জালের সুতার পরিবর্তে তিনি সোজাসুজি মাকড়সার সুতা-বোনা গ্রন্থি থেকে সুতা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে দেখা গেছে—এক গজ সুতা যোগাড় করতে ৪৫০টি মাকড়সার দরকার। ৫৪০০টি মাকড়সার দেহ থেকে সংগৃহীত সুতা দিয়ে মোটামুটি ছোট একটা পোষাক তৈরি করা যায়। এভাবে মাকড়সার সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করবার খরচ ও খাটুনীতে পোষায় না বলে এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

ব্ল্যাক উইডো, ট্যারানটুলা মাকড়সার বিষ খুবই মারাত্মক। এদের দংশনে সবল মানুষ পর্যন্ত ঘায়েল হয়, শিশু ও বৃদ্ধদের মৃত্যুর কথা পর্যন্ত শোনা গেছে। যারা একবার এই মাকড়সার আক্রমণ থেকে কোনক্রমে রেহাই পেয়েছে, তারা দ্বিতীয়বার আর এদের কাছে ঘেষতে সাহস পায় না। বড় বড় জীবজন্তু দূর থেকে এদের দেখলে আর এগুতে চায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়েক জাতের মাকড়সা দেখা যায়—যারা পিঁপড়ে-মাকড়সা বা ছদ্মবেশী মাকড়সা নামে পরিচিত। এরা পিঁপড়ের শুঁড়ের মত সামনের দুটি পা-কে উঁচু করে রাখে—দেখে মনে হয় যেন পিঁপড়ের দুটি শুঁড়! এদের রং অনেকটা লাল-পিঁপড়ের মত। দূর থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, এরা পিঁপড়ে নয়—মাকড়সা। এদের অনেকে পিঁপড়ে ও পিঁপড়ের ডিম শিকার করে খায়। কেউ বা আবার শত্রুর চোখে ধূলা দেবার জন্যে লাল-পিঁপড়ের আশেপাশে থেকে শিকার ধরে—কারণ এদের শত্রুরা নালসো পিঁপড়েকে বড় ভয় করে, কাজেই সেখানে আসে না। অনেকে আবার গুবরে পোকার দেহাকৃতি অনুকরণ করে থাকে।

মাকড়সারা কুমোরে পোকাকে ভীষণ ভয় করে। কারণ এরা মাকড়সার ভীষণ শত্রু। মাকড়সা দেখলে আর রক্ষা নেই—এরা তাকে আক্রমণ করবেই। মাকড়সার শরীরে হুল দিয়ে দংশন করে কুমোরে পোকা বিষ ঢেলে দেয়। বিষের ক্রিয়ায় মাকড়সা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন কুমোরে পোকা ঐ নির্জীব মাকড়সাটাকে টেনে নিয়ে যায় তার গর্তের মধ্যে, বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে। সে জন্যে কুমোরে পোকা দেখলেই মাকড়সা আত্মগোপন করে বাঁচবার চেষ্টা করে।

শ্রীদেবব্রত মণ্ডল

অধ্যাপক পি. মাহেশ্বরী এফ. আর. এস. নির্বাচিত

প্রখ্যাত ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক পি. মাহেশ্বরী সম্প্রতি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে আরও দুই জন ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন; তাঁরা হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ বীরবল সাহানী। বিগত ১২৫ বছরের মধ্যে এ-পর্যন্ত সর্বসমেত ১৫ জন ভারতীয় বিজ্ঞানী এফ. আর. এস. মনোনীত হয়েছেন। সর্বপ্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস. হচ্ছেন এ. কার্সেট্‌জী নামে বোম্বাই-এর জনৈক পার্শী ইঞ্জিনীয়ার।

অধ্যাপক মাহেশ্বরীর অধ্যাপনা জীবনের সূচনা হয় এলাহাবাদে এবং তারপর আগ্রা, ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার রীডার ও নবগঠিত জীববিদ্যা বিভাগের প্রধানের পদে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ও প্রধানের পদে যোগদান করেন এবং বর্তমানে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৫৪-'৫৭ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ডীনরূপেও কাজ করেন।

অধ্যাপক পি. মাহেশ্বরী

পি. মাহেশ্বরী রাজস্থানের অধিবাসী। ১৯০৪ সালে জয়পুরে তাঁর জন্ম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস-সি. এবং এম. এস-সি ডিগ্রী লাভের পর তিনি ১৯৩১ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রীতে ভূষিত হন।

তিন দশকের অধিককাল অধ্যাপক মাহেশ্বরী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন এবং উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান ও ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের ২৫০ খানা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাজনের তথ্য নির্ধারণ

এবং ভ্রূণতত্ত্বের উন্নতি বিধান ও কৃত্রিম উপায়ে ফল-মূল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে বহুদিন যাবৎ মনোনিবেশ করে আছেন। কৃত্রিম উপায়ে বীজ ও ফল উৎপাদন সংক্রান্ত তাঁর পরীক্ষা সমূহ বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তাঁর অনন্য সাধারণ অবদানের জন্যে অধ্যাপক মাহেশ্বরী দেশ-বিদেশে নানা সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি এবং ১৯৩৫ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি এবং ১৯৫১ সালে ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভ্রূণতত্ত্ব শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। মার্কিন, জার্মান ও ডাচ উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতির তিনি সদস্য। ১৯৫৯ সালে তাঁকে ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতির বীরবল সাহানী স্মৃতিপদক এবং ১৯৬৪ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সুন্দরলাল হোরা স্মৃতিপদক প্রদান করা হয়। অধ্যাপক মাহেশ্বরী উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা; যথা—গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ভ্রূণতত্ত্ব, Gnetum (বিমলা ভাসিনের সহযোগে), ভারতের অর্থনৈতিক উদ্ভিদের অভিধান (উমরাও সিং-এর সহযোগে), ভ্রূণতত্ত্বে আধুনিক প্রগতি (সম্পাদন) এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান (প্রকাশিতব্য)।

শোক সংবাদ

পরলোকে অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় ঘোষ

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) ১৯শে জুন বেলা আড়াইটার সময় ৭০ বছর বয়সে তাঁর সত্যেন দত্ত রোডস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি "ভাস্কর" নামে পরিচিত ছিলেন এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

তিনি যশোহরের (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) ঘাসিয়ারায় ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি এম. এ. পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি শ্রীমতী মেনকাবালা বসুকে বিবাহ করেন। তাঁর চার পুত্র এবং দুই কন্যা বর্তমান। ডাঃ ঘোষ এডিনবরা থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপনা করবার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ডাঃ ঘোষ ন্যাশান্যাল অ্যাকাডেমি ও সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করবার পর অবসর গ্রহণ করেন।

ডাঃ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটি এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:—গণিতের ভিত্তি; বাংলায় একটি রত্ন; লেখা; মজলিস; কথিকা; ভজহরি; এ জার্মান ওয়ার্ড বুক; এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড বুক; ম্যাট্রিকুলেসন অ্যালজেব্রা প্রভৃতি।

বিবিধ

পূর্বাঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাশিবির

গত ৭ই জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী-ভবনে পূর্বাঞ্চলের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই সভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সাংস্কৃতিক অধিকর্তা মিঃ এস. বি. স্টীল এবং কয়েকজন মার্কিন শিক্ষা-উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাঞ্চলের এই শিক্ষাশিবির সারা ভারত-ব্যাপী গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান-শিক্ষাশিবিরের একটি অঙ্গ। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষা ফাউণ্ডেশনের ধাঁচে ভারতে এই গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাশিবিরের প্রবর্তন হয়। এই বছর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাশিবির আয়োজিত হয় জীববিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে এবং উচ্চতর বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের জন্যে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। কল্যাণী, যাদবপুর, রাঁচী, পাটনা, গৌহাটী, ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এবং কটকের রাভেন-শ কলেজ ও ভুবনেশ্বরের আঞ্চলিক কলেজে। পলিটেকনিক্স্ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা হয় যাদবপুর ও ধানবাদ পলিটেকনিক শিক্ষায়তনে এবং রাঁচীর বিড়লা টেক্‌নোলজি ইনস্টিটিউট ও হাওড়ার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন। দক্ষিণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বামে মার্কিন তথ্য-কেন্দ্রের মিঃ এস. বি স্টীল।

কলিঙ্গ পুরস্কার

রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলবার প্রয়াসের স্বীকৃতি হিসাবে ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার দানের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ ওয়ারেন উইভারকে মনোনীত করেছেন। পুরস্কারের মূল্য এক হাজার পাউণ্ড। ডাঃ উইভার ক্যালিফোর্ণিয়ার ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি ও উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি আমেরিকান বিজ্ঞান-প্রসার সমিতির সভাপতি হন। ডাঃ উইভার বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের অনেক বই লিখেছেন।

শিল্পপতি ও কলিঙ্গ ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন্ বছর কে পুরস্কার পাবেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ শিল্প-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী তা স্থির করে দেন।

মহাকাশে মানুষের আবার বিচরণ

৩রা জুন সকাল ১০টা ১৬ মিনিটে দুজন মার্কিন নভশ্চর, বিমান বাহিনীর মেজর জেম্‌স্ এ. ম্যাকডিভিট এবং মেজর এডওয়ার্ড আর. হোয়াইট জেমিনি-৪ মহাকাশযানটিতে চড়ে মহাকাশ যাত্রা সুরু করেন। বৈদ্যুতিক ত্রুটি ধরা পড়ায় নির্দিষ্ট সময়ের ৭৬ মিনিট পরে মহাকাশযানটি উৎক্ষিপ্ত হয়। মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণের সময় প্রচুর পরিমাণ হল্‌দে রঙের ধোঁয়া এবং আগুন নির্গত হয়।

টাইটান-২ রকেটের সাহায্যে মহাকাশযান জেমিনি-৪ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। রকেটটি দুই পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ে সেকেণ্ডে ১৫৬ গ্যালন করে জ্বালানী নিঃশেষিত হয়। মহাকাশে মানুষের প্রথম পদচারণা বা বিচরণের কৃতিত্ব রুশ মহাকাশচারী লিওনেভের এবং দ্বিতীয়বার তা অর্জন করেন মার্কিন মহাকাশচারী মেজর হোয়াইট। জেমিনি-৪-এর চালক মেজর ম্যাকডিভিট এবং মেজর হোয়াইট তাঁর সহকারী। মহাশূন্যে ভাসবার সময় মেজর হোয়াইট মহাকাশযানের ২৫ ফুট একটি স্বর্ণরজ্জুতে আবদ্ধ ছিলেন। মহাকাশযানটি যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ১৫০ মাইল উর্ধ্বে তখন হোয়াইট হামাগুড়ি দিয়ে মহাকাশযান থেকে মহাশূন্যে বেরিয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় হোয়াইটের মহাকাশে বিচরণের কথা ছিল। কিন্তু মহাকাশচারীদ্বয় ষোল আনা প্রস্তুত হয়ে উঠতে না পারায় তৃতীয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় হোয়াইট মহাকাশে বিচরণ করতে সক্ষম হন। কুড়ি মিনিট হোয়াইট মহাশূন্যে ভাসমান ছিলেন।

মহাশূন্যে বিচরণশীল অবস্থাতেও হোয়াইট মহাকাশযানের চালক ম্যাকডিভিটের সঙ্গে কথাবার্তা চালান।

মহাশূন্যে থাকাকালীন মহাকাশচারীদ্বয় মহাকাশ-ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন—শারীরিক ক্ষমতা, হৃদ্‌যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, অস্থির ধাতব উপকরণ হ্রাস, তেজস্ক্রিয়া, মহাকাশযানের পরিচালন ব্যবস্থা, পৃথিবীর আলোকচিত্র, মেঘলোকের আলোকচিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

মহাকাশচারীদ্বয় জেম্‌স্ ম্যাকডিভিট ও এডওয়ার্ড হোয়াইট জেমিনি-৪ মহাকাশযানে ৪ দিন ধরে কক্ষপথ পরিক্রমার পর ৭ই জুন আটলাণ্টিক মহাসাগরে নেমে আসেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরে অপেক্ষমান একটি উদ্ধারকারী জাহাজ থেকে একটি হেলিকপ্টার গিয়ে তাঁদের জল থেকে তুলে আনে।

কারখানায় সূর্যকিরণ ব্যবহার

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. আই. এন. এ. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা গেছে—বড় বড়

কারখানায় সূর্যকিরণের দ্বারা যন্ত্রাদি চালাবার জন্যে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। সূর্যকিরণ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীতে গবেষণা চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হলে আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে ভারতের বড় বড় কারখানাগুলি ঐ শক্তির সাহায্যেই চলতে পারবে এবং তাপ-বিদ্যুতের ব্যবহার বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

উড়ন্ত তাপমান যন্ত্র

কেপ কেনেডী থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—মহাকাশ থেকে ফিরে আসবার পথে মহাকাশযানকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে অত্যধিক তাপ সহ্য করতে হবে। বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষজনিত এই তাপের তীব্রতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। মানুষের মহাকাশ-পরিক্রমার প্রস্তুতিপর্বে এই তাপের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হবে।

অতএব ২১শে মে উড়ন্ত তাপমান যন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মহাকাশে। পরবর্তী পর্যায়ে ক্যাপস্যুলটি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে নেমে এল পৃথিবীতে।

পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে যখন তাপমান যন্ত্রটা দক্ষিণ আটলান্টিকে এসেনসন দ্বীপের কাছাকাছি অবতরণ করলো, তখন সেটা ২০ হাজার ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে যন্ত্রটাকে অতিকায় উল্কার মত দেখা যাচ্ছিল।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে কিছু দিন সময় লাগবে।

বিমান-গতির নতুন রেকর্ড

ওয়াশিংটন থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করেছেন যে, ওয়াই-এফ জেট বিমান গতির দিক থেকে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছে এবং রুশ রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে।

সোজাপথে বিমানখানা চলেছিল ঘণ্টায় দু' হাজার মাইলেরও বেশী, ঘোরানো পথে ঘণ্টায় ১৬৮৮ মাইল।

ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের উদ্ভাবক মিঃ কেলী জনসন এই নতুন ধরণের বিমানখানার নক্সা তৈরি করেছেন।

১৯৬২ সালে সোভিয়েট ই-১৬৬ জেট বিমান সোজাপথে ঘণ্টায় ১৬৬৫.৮ মাইল উড়ে গিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। সে বিমানখানাই ১৯৬১ সালে ঘোরানো পথে ১৪৯১ মাইল গিয়ে দ্বিতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করে।

বিচ্ছিন্ন হাত সংযুক্ত

টোকিও থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—পথ দুর্ঘটনায় ২০ বছর বয়স্ক এক জাপানী চাষীর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মধ্য জাপানের নাগোয়ার সি.ই.রি. (পবিত্র আত্মা) হাসপাতালের সার্জন ডাঃ শিগেরু ফুকুয়ামা দুর্ঘটনার নয় ঘণ্টা পরে কাটা হাত বেমালুম জুড়ে দিয়েছেন।

ডাঃ ফুকুয়ামা বলেন, হাতের বিচ্ছিন্ন অংশের রক্ত যাতে জমাট বেঁধে না যায় সে জন্যে কাটা হাত বরফে ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে হেপারিন ও লোনা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল।

চাষীর নাম হিকোইচি আরাকি। তার অবস্থা সন্তোষজনক। তবে সে জুড়ে-দেওয়া হাত স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে কিনা, সার্জন সে বিষয়ে কিছু বলেন নি।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৬৫ | অষ্টম সংখ্যা

জৈবরাসায়নিক অনুঘটন

সন্দীপকুমার বসু

বিশাল জীবজগতের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে আশ্চর্য এক জৈবরাসায়নিক ঐক্য বর্তমান। তুলনামূলক জৈবরসায়ন-চর্চার ফলে আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বহু মৌলিক সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাবতীয় জীবকোষের উপাদান প্রায় এক এবং বৃদ্ধির জন্যে সব রকম জীবের মূলতঃ একই ধরণের খাদ্যের প্রয়োজন। জীবন রক্ষার জন্যে দরকার কার্বন, নাইট্রোজেন, শক্তি এবং কয়েক প্রকার খনিজ পদার্থ। এই সবের দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য থেকে জীবকোষ তার সবকিছু রাসায়নিক উপাদান (প্রধানতঃ প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং নিউক্লিক অ্যাসিড) সংশ্লেষণ করে। জীবের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় এই সব পদার্থ জীবকোষে অসংখ্য জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত হয়। এই সব বিক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে শক্তির প্রয়োজন। এই কোষকে আর এক ধরণের বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন ও সঞ্চয় করতে হয়। শক্তিদায়ী ও শক্তিগ্রাহী বিক্রিয়াসমূহের নিরন্তর পারস্পরিক কার্যের ফলেই জীবনের বিকাশ। অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াই সাধারণ উষ্ণতায় ও চাপে অত্যন্ত ধীরগতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অথচ অত্যন্ত জটিল অসংখ্য জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া জীবকোষে সাধারণ উষ্ণতায় ও চাপে সুষ্ঠু, সুনিয়ন্ত্রিত এবং পরস্পর সম্বন্ধভাবে অতিদ্রুত সম্পাদিত হয়। এর কারণ হলো জীবকোষে অসংখ্য সুদক্ষ জৈবরাসায়নিক অনুঘটকের উপস্থিতি। জৈবরাসায়ন-

বিদের দৃষ্টিতে জীবন অসংখ্য সুনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমাহার। সুতরাং জীবনের বিস্ময়কর বিচিত্র প্রকাশের মূলাধার হলো জৈব-রাসায়নিক অনুঘটন।

বিখ্যাত ভৌতরসায়নবিদ অসওয়াল্ডের সংজ্ঞানুযায়ী অনুঘটক এমন একটি পদার্থ যে, নিজে অপরিবর্তিত থেকে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করতে পারে। এমনি একটি অনুঘটক হলো জল। বেকার প্রমাণ করেছেন যে, সামান্য পরিমাণ জল না থাকলে অনেক পরিচিত বিক্রিয়া ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—সামান্য আর্দ্র হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস একত্রিত করে সূর্যালোকে রাখলে গ্যাস দুটি বিস্ফোরণ সহকারে সংযোজিত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। কিন্তু সম্পূর্ণ শুষ্ক গ্যাস দুটির মধ্যে অনুরূপ অবস্থায় কোন রাসায়নিক সংযোজন ঘটে না। জল একটি বিশ্বজনীন (Universal) অনুঘটক। প্ল্যাটিনাম, নিকেল, লৌহ, প্যালাডিয়াম ইত্যাদি ধাতুচূর্ণ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনুঘটক। এগুলি অজৈব অনুঘটনের দৃষ্টান্ত।

অজৈব ও জৈব অনুঘটনের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বৈসাদৃশ্যও কম নয়। দুই ধরণের অনুঘটনেই প্রভাবিত বিক্রিয়ার শুধুমাত্র গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। দুই ক্ষেত্রেই বিক্রিয়ার গতিবেগ অনুঘটকের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়। সাধারণতঃ সামান্য পরিমাণ অনুঘটকই প্রচুর পরিমাণ বিক্রিয়কের বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

অসওয়াল্ডের সংজ্ঞানুসারে বিক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে অনুঘটকের পরিমাণ ও রাসায়নিক সংযুতি অপরিবর্তিত থাকে, তবে তার ভৌতধর্মের কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে অজৈব ও জৈব অনুঘটকের মৌলিক পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। জৈব অনুঘটনের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রভাবিত বিক্রিয়া চলবার সময় অনুঘটকের কার্যকারিতা কমতে থাকে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে অনুঘটকের ক্রিয়াশীলতা হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—বিক্রিয়াজাত পদার্থের বিষক্রিয়া বা অনুঘটকের ভৌতধর্মের পরিবর্তনই উক্ত নিষ্ক্রিয়তার জন্যে দায়ী। অজৈব অনুঘটনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তনের জন্যে অনুঘটকের দক্ষতা হ্রাস পায়।

জৈব ও অজৈব অনুঘটনের মধ্যে আর একটি বিষয়ে আপাত-বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। অজৈব অনুঘটকগুলি কোন বিক্রিয়ার সূচনা করে না, শুধু ধীর গতিসম্পন্ন বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু জৈব অনুঘটনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মনে হয় যে, অনুঘটকটি নতুন বিক্রিয়ার সূচনা করে। উদাহরণ-স্বরূপ, জীবন্ত ঈষ্ট (Yeast) গ্লুকোজ থেকে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত করে। আবার ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিস নামক জীবাণু গ্লুকোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে। কিন্তু একক গ্লুকোজ স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে ইথাইল অ্যালকোহল বা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় না। এই আপাত ব্যতি-ক্রমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অবশ্য দুরূহ নয়। জৈব রাসায়নিক যৌগসমূহের সাধারণতঃ একাধিক-ভাবে বিয়োজিত হবার প্রবণতা থাকে। ধরা যাক, গ্লুকোজ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিক্রিয়ার ফলে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি যৌগগুলি সৃষ্ট হতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এই বিক্রিয়াগুলির গতিবেগ এত ধীর যে, দীর্ঘ সময় পরেও এগুলির কোনটিই পরিমাপযোগ্য পরিমাণে সঞ্চিত হয় না। কিন্তু ঈষ্টের অনুঘটকগুলির সান্নিধ্যে এই সব বিভিন্ন বিক্রিয়া-ক্রমের কোন একটি নির্দিষ্টভাবে এত ত্বরান্বিত হয় যে, সম্পূর্ণ গ্লুকোজই সেই পথে বিয়োজিত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিসের ক্ষেত্রে পৃথক একটি বিক্রিয়াশ্রেণী প্রভাবিত হয়ে

গ্লুকোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে।

উপরিউক্ত উদাহরণ থেকে জৈব অনুঘটনের সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়। প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি অজৈব অনুঘটকগুলি সাধারণতঃ বহু বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু জৈব অনুঘটকগুলি কেবল নির্দিষ্ট ধরণের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি জৈব অনুঘটকের ক্রিয়াশীলতা একটিমাত্র বিক্রিয়ায় সীমিত। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও অজৈব ও জৈব অনুঘটকের নির্দিষ্টতার মাত্রা-পার্থক্যই স্থচিত করে। এথেকে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জৈব অনুঘটন ও অন্যান্য ধরণের অনুঘটনের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে।

পনীর, ভিনিগার, সুরা ইত্যাদি প্রস্তুতিতে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অজান্তে জৈব অনুঘটক ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু এসব অনুঘটকের প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার স্থষ্টি নিতান্ত সাম্প্রতিক ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইটালীয় শারীরবিজ্ঞানী স্প্যালানজানি সর্বপ্রথম এমনি একটি অনুঘটন সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক তখন যান্ত্রিক চূর্ণন-প্রক্রিয়া বলে ধরা হতো। স্প্যালানজানি প্রথম প্রমাণ করেন যে, পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ রাসায়নিক ব্যাপার। কিন্তু যে সব পদার্থের প্রভাবে খাদ্যদ্রব্যের এই রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব হয়, সেগুলি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তখন গড়ে ওঠে নি। ১৮৩৪ সালে থিয়োডোর সোয়ান পাকস্থলীসঞ্জাত পাচক রস থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন একটি পদার্থ পৃথক করেন, যার সান্নিধ্যে আমিষজাতীয় খাদ্য পাচিত হয়। এই পদার্থটিকে তিনি পেপসিন নামে অভিহিত করেন। প্রায় একই সময়ে দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী অঙ্কুরিত বার্লির আরক থেকে ডায়াস্টেজ নামক একটি পদার্থ প্রস্তুত করেন। ডায়াস্টেজের উপস্থিতিতে শ্বেতসার বিযোজিত হয়ে শর্করায় পরিণত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, ঈস্টের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ থেকে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে সুরাসন্ধান (Alcoholic Fermentation) এবং সন্ধান ঘটনকারী ঈস্টকে কিণ্ব (Ferment) বলে। ১৮৩৭ সালে সোয়ান প্রমাণ করেন যে, ঈস্ট এক ধরণের জীবাণু। এই আবিষ্কারের ফলে প্রশ্ন ওঠে, সুরাসন্ধান-প্রক্রিয়া ঈস্টের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, না ঈস্টকোষের পেপসিন বা ডায়াস্টেজের অনুরূপ কোন কিণ্বের প্রভাবে জীবন্ত ঈস্ট ব্যতিরেকেই সুরাসন্ধান ঘটতে পারে? কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তখন ঈস্টকোষ থেকে এমন কোন পদার্থ পৃথক করা সম্ভব হয় নি, যা জীবন্ত ঈস্টের অনুপস্থিতিতে সুরাসন্ধান ঘটাতে সক্ষম। ১৮৬০ সালে দীর্ঘ গবেষণার পর পাস্তুর সিদ্ধান্ত করেন যে, সুরাসন্ধান ঈস্টের জীবন-ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রাণশক্তির সাহায্য ছাড়া কোন সন্ধানই (Fermentation) ঘটতে পারে না।

পাস্তুর-প্রচারিত এই মত তথাকথিত জীবন্ত কিণ্ব (যেমন ঈস্টকোষ) ও নির্জীব কিণ্বসমূহের (যেগুলিকে জীবন্ত কোষ থেকে পৃথক করা যায়, যেমন—পেপসিন, ডায়াস্টেজ ইত্যাদি) মধ্যে প্রভেদ স্থচনা করলো। বার্থেলো প্রমুখ সমকালীন অনেক বিজ্ঞানী এই শ্রেণীবিভাগ সমর্থন না করলেও এর অসারতা প্রমাণ করতে পারেন নি। কিণ্ব শব্দটির এই দ্বৈত ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্যে ১৮৭৮ সালে জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ ভিলহেলম্ কুইনা নির্জীব কিণ্বগুলিকে এনজাইম নামে অভিহিত করেন। এনজাইম শব্দটির অর্থ ইস্টের মধ্যস্থ। জীবন্ত ঈস্টকোষের সন্ধানক্রিয়ার সঙ্গে নির্জীব কিণ্বগুলির ক্রিয়ার সাদৃশ্য থেকে এই নামকরণ হয়েছে।

১৮৯৭ সালে এডুয়ার্ড বুখ্নার আবিষ্কার করেন যে, ঈস্টকোষগুলিকে বালুকাকণার সঙ্গে মিশিয়ে চূর্ণ করলে কোষগুলি ভেঙ্গে যায় এবং এমন একটি আরক প্রস্তুত হয়, যাতে কোন জীবন্ত ঈস্টকোষ থাকে না অথচ এর প্রভাবে গ্লুকোজ থেকে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। পাস্তুর যা অসম্ভব ভেবেছিলেন, বুখ্নার তা সম্ভব করেন। জীবন্ত কোষ ছাড়াই সুরাসন্ধান সম্ভব হলো। প্রমাণিত হলো যে, কোষের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক অনুঘটকের প্রভাবে জীবন্ত ঈস্টকোষ সুরাসন্ধান ঘটায়—এর সঙ্গে প্রাণশক্তির কোন রহস্যময় সম্পর্ক নেই। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে জীবন্ত ও নির্জীব কিণ্বের পার্থক্য দূরীভূত হলো। সব কিণ্বকেই এনজাইম নামে অভিহিত করা হলো। এই আবিষ্কারের জন্যে বুখ্নার ১৯০৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বুখ্নারের আবিষ্কারের ফলে এনজাইমগুলিকে জৈব অনুঘটকরূপে কল্পনা সরা সম্ভব হলো। রসায়নবিদগণ এনজাইমের রাসায়নিক সত্তা নির্ধারণে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু জীবকোষে এনজাইমের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং তাথেকে প্রস্তুত জৈব আরক এমন একটি মিশ্রণ, যাতে কোন্‌টি এনজাইম এবং কোন্‌টি নয়, তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। এজন্যে রসায়নবিদগণ বিভিন্ন এনজাইম পৃথকীকরণ ও বিশোধনে ব্যাপৃত হন।

জীবকোষের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্ন প্রকার সমবায়ে গঠিত বৃহৎ অণুগুলিকে প্রোটিন বলা হয়। বিভিন্ন প্রোটিনে ১০০ থেকে ১০,০০০ অ্যামিনো অ্যাসিড একক থাকতে পারে। বহু জৈবরসায়নবিদের মনে ধারণা হয়েছিল যে, এনজাইমগুলিও প্রোটিন। কারণ অধিকাংশ এনজাইমের অনুঘটন ক্ষমতা সামান্য উত্তপ্ত করলেই নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ প্রোটিনও উত্তপ্ত করলে বিকৃত হয়ে পড়ে। এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করেন সাম্‌নার, ১৯২৬ সালে। ইউরিয়েজ নামে একটি এনজাইম বিশুদ্ধ স্ফটিকাকারে প্রস্তুত করে তিনি দেখান যে, দ্রবীভূত অবস্থায় এই স্ফটিকগুলি ইউরিয়া থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করে। এই স্ফটিকগুলিতে প্রোটিনের সমস্ত ধর্মই বর্তমান এবং যে অবস্থায় প্রোটিন বিকৃত হয়, সে অবস্থায় স্ফটিকগুলির এনজাইম-ধর্মও লোপ পায়। ১৯৩০ সালে নর্থরপ কর্তৃক পেপসিন স্ফটিকীকরণ এবং তার প্রোটিন-সত্তা প্রমাণিত হওয়ায় সাম্‌নারের কাজের গুরুত্ব স্বীকৃত হলো। আজ পর্যন্ত প্রায় একশ'টি এনজাইম স্ফটিকীকৃত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, সবগুলিই প্রোটিন। এনজাইমের বিশিষ্ট অনুঘটন ক্ষমতা তার প্রোটিন-সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সাম্‌নার ও নর্থরপ ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পূর্বালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এনজাইমগুলিকে জীবকোষে সংশ্লেষিত তাপসংবেদী (Thermolabile) উচ্চ আণবিক ভারবিশিষ্ট অনুঘটনক্ষম প্রোটিন অণু বলা যেতে পারে। অনুঘটকরূপে দক্ষতা ও নির্দিষ্টতা উভয়দিক থেকেই এনজাইমগুলি অসাধারণ। ক্যাটালেজ নামক একটি এনজাইমের প্রভাবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড জল ও অক্সিজেনে বিয়োজিত হয়। উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি লৌহচূর্ণ বা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সান্নিধ্যেও ঘটে কিন্তু ওজন অনুপাতে ক্যাটালেজ এই বিয়োজন বিক্রিয়াটির গতিবেগ যে কোন অজৈব অনুঘটকের চেয়ে বেশী ত্বরান্বিত করে। $0°$ সে উষ্ণতায় একটি ক্যাটালেজ-অণু প্রতি সেকেণ্ডে ৪৪,০০০ হাইড্রোজেন পারক্সাইড অণুকে বিয়োজিত করতে পারে। উপরন্তু ক্যাটালেজ কেবল হাইড্রোজেন পারক্সাইডকেই বিয়োজিত করে, কিন্তু লৌহচূর্ণ

বা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অন্যান্য বিক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে।

এনজাইমসমূহের এই অসাধারণ নির্দিষ্টতার কারণ তাদের আণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্যে নিহিত। এনজাইমের ক্রিয়া সম্বন্ধে বর্তমানে প্রচলিত ধারণা হলো এই যে, নির্দিষ্ট বিক্রিয়ক ও এনজাইমের মধ্যে প্রথমে একটি অস্থায়ী যুতযৌগ গঠিত হয়। এই যুতযৌগটি অতঃপর উৎপন্ন দ্রব্য ও এনজাইমে বিশ্লিষ্ট হয়। উক্ত যুতযৌগ গঠনের ক্ষেত্রে এনজাইমের বহিরাকৃতির এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রত্যেক এনজাইমের বহিরাকৃতি এমন এক ত্রিমাত্রিক ছাঁচের সৃষ্টি করে, যা শুধু তার নির্দিষ্ট বিক্রিয়কটিরই উপযুক্ত। নির্দিষ্ট বিক্রিয়ক ভিন্ন অন্য কোন বস্তু এই ছাঁচের উপযোগী না হওয়ায় এনজাইম শুধু তার নির্দিষ্ট বিক্রিয়কের সঙ্গেই যুতযৌগ গঠন করতে পারে। দেখা গেছে, কোন এনজাইমের বিক্রিয়কের সদৃশ রাসায়নিক গঠনসম্পন্ন যৌগের সান্নিধ্যে সেই বিক্রিয়কটির এনজাইম-প্রভাবিত বিক্রিয়ার গতিবেগ হ্রাস পায়। বিক্রিয়কের সঙ্গে গঠনসাদৃশ্য থাকবার ফলে এইসব যৌগ এনজাইম-অণুর যে স্থানে বিক্রিয়ক যুক্ত হয়, সে স্থানটি অধিকার করবার চেষ্টা করে। এই প্রতিযোগিতার ফলে বিক্রিয়কটির এনজাইমের সঙ্গে যুতযৌগ গঠন করবার সম্ভাব্যতা কমে যায়। ফলে বিক্রিয়াটির গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এনজাইম-ক্রিয়ার এই প্রতিযোগিতামূলক দমন (Competitive inhibition) থেকে প্রমাণিত হয় যে, এনজাইম-বিক্রিয়ক যুতযৌগ গঠন এনজাইম-প্রভাবিত বিক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বর্ণালীবিশ্লেষণ থেকে উপরিউক্ত মতের সর্বপ্রধান সমর্থন পাওয়া গেছে। প্রত্যেক পদার্থের আলোক শোষণের ক্ষমতা নির্দিষ্ট। এনজাইম যদি বিক্রিয়কের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে যুতযৌগটির আলোক শোষণ একক এনজাইম বা বিক্রিয়কের আলোক শোষণ থেকে পৃথক হওয়া উচিত। এনজাইম-প্রভাবিত বিক্রিয়ার শোষণ-বর্ণালী (Absorption Spectrum) পর্যালোচনা করে আলোক শোষণের এই প্রত্যাশিত পার্থক্য দেখা গেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এনজাইমগুলি বৃহদাকার প্রোটিন-অণু। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এনজাইম-অণু তার নির্দিষ্ট বিক্রিয়ক অপেক্ষা প্রায় ৫০০ গুণ বৃহত্তর। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, এনজাইম-অণুর সবটুকুই কি অনুঘটনের জন্যে প্রয়োজনীয়? এই প্রশ্নটি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন ওষুধ ও অন্যান্য বহু রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতিতে বিভিন্ন এনজাইম ব্যবহার করা হয়। যদি সম্পূর্ণ এনজাইম-অণুর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নির্দিষ্ট বিক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হয়, তবে হয়তো সেই ক্রিয়াশীল অংশটুকু সংশ্লেষণ করা সম্ভব হতে পারে এবং তার ফলে জীবকোষের সাহায্য ছাড়াই বিভিন্ন এনজাইম সংঘটিত প্রক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে।

এই লক্ষ্যে উত্তরণের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নর্থরপ দেখেছেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেপসিন-অণুর টাইরোসিন এককগুলিতে অ্যাসেটিল মূলক যুক্ত করলে পেপসিনের ক্রিয়াশীলতা লোপ পায়। অপর পক্ষে লাইসিন এককসমূহের অনুরূপ অ্যাসেটিলায়ন (Acetylation) এনজাইমটির সক্রিয়তা নষ্ট করে না। এথেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, পেপসিনের সক্রিয়তার জন্যে টাইরোসিন প্রয়োজনীয়, কিন্তু লাইসিন নয়। সুতরাং এনজাইম-অণুর সমস্তটা অনুঘটনের জন্যে দরকারী নয়। অনুঘটন ক্ষমতা এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি কাইমোট্রিপসিন নামক আর একটি পাচক এনজাইমের সক্রিয় অঞ্চল প্রত্যক্ষতররূপে

নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। DFP নামক একটি পদার্থ কাইমোট্রিপসিনের সক্রিয়তা নষ্ট করে। দেখা গেছে, DFP কাইমোট্রিপসিনের সেরিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরিপাক-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত আরও কয়েকটি এন-জাইমেও DFP সেরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এন্-জাইমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চারটি অ্যামিনো অ্যাসিডের এক সজ্জাক্রমে সেরিনের অবস্থান একই; যথা—গ্লাইসিন অ্যাস-পার্টিক অ্যাসিড-সেরিন-গ্লাইসিন।

কিন্তু উক্ত চারটি অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বিত একটি পেপটাইডের (বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের পরস্পর সংযোগের ফলে উৎপন্ন প্রোটিন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অণু) কোন অনুঘটন-ক্ষমতা নেই। সুতরাং এনজাইমের অবশিষ্ট অংশটিরও নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। কাইমোট্রিপসিনের সক্রিয় কেন্দ্র চারটি অ্যামিনো অ্যাসিড-সমন্বিত এই সজ্জাক্রমটি হাতলশূন্য একটি ছুরির ধারালো দিকের সঙ্গে তুলনীয়। হাতলশূন্য ছুরি যেমন অব্যবহার্য, এনজাইমের অবশিষ্ট অংশ না থাকলে এই সক্রিয় কেন্দ্রটি তেমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের পরস্পর সংযোজনের ফলে উৎপন্ন প্রোটিন-শৃঙ্খলের এক প্রান্তে মুক্ত অ্যামিনো-মূলক ও অপর প্রান্তে মুক্ত কার্বক্সিল মূলক থাকে। এই দুই প্রান্তকে যথাক্রমে N-প্রান্ত ও C-প্রান্ত বলা হয়। জৈব ক্রিয়াশীলতার কোন হানি না ঘটিয়ে কয়েকটি এনজাইমের N-প্রান্ত বা C-প্রান্ত থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পেঁপের রস থেকে পেপেন নামক একটি এনজাইম পাওয়া যায়। এটি ১৮০টি অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বিত একটি প্রোটিন। পেপেন-অণুর N প্রান্ত থেকে ৮০টি অ্যামিনো অ্যাসিড বাদ দিলেও এনজাইমটি সক্রিয় থাকে। রাইবোনিউক্লিয়েজ নামক অপর একটি এনজাইমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ খর্বীকরণ সম্ভব হয়েছে।

জৈবরাসায়নিক অনুঘটনের সাম্প্রতিক প্রগতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সম্পূর্ণ এনজাইম-অণুর এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র এনজাইমের নির্দিষ্ট অনু-ঘটন ক্ষমতার মূলাধার। এনজাইম প্রোটিনের অবশিষ্ট অংশটুকু এই সক্রিয় কেন্দ্রটির উপযুক্ত ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের জন্যে প্রয়োজনীয়। এনজাইমের সক্রিয় কেন্দ্র সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর রাসায়নিক সংশ্লেষণের সম্ভাব্যতা বাড়ছে। ভবিষ্যতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত সক্রিয় কেন্দ্রের অনুঘটন ক্ষমতার জন্যে প্রয়োজনীয় ত্রিমাত্রিক বিন্যাস প্রোটিন অপেক্ষা বহুগুণ ক্ষুদ্রতর কোন অণুর সাহায্যে ঘটানো হয়তো সম্ভব হবে। এই কৃত্রিম এনজাইম স্বভাবতঃই প্রোটিনের চেয়ে স্থায়ী হবে। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে এদের অধিকতর ব্যবহার সম্ভব হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক অভাবনীয় বিপ্লবের সূচনা করবে কৃত্রিম এনজাইম। অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থসমূহের আবিষ্কারের ফলে জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হওয়ায় মৃত্যু-সংখ্যার দিক থেকে বিপাকক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বংশগত রোগ ও বার্ধক্যজনিত ব্যাধির গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়ছে। এই সমস্ত ব্যাধির অধিকাংশই এক বা একাধিক এনজাইমের নিষ্ক্রিয়তার ফল। সুতরাং প্রয়োজনমত এনজাইম সংশ্লেষণ সম্ভব হলে এই সব রোগের নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে। মানুষ হবে সুস্থ, নীরোগ এবং দীর্ঘায়ু। বিজ্ঞানীসমাজের এক বৃহৎ অংশ এই কল্যাণময় সম্ভাবনার রূপায়ণে ব্রতী।

ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলাজনিত বৈশিষ্ট্য

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

ও গাছপালা প্রত্যেকের দেহ-কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। এই ক্রোমোসোম-সংখ্যা প্রজাতি (Species)-বিশেষে দুই থেকে সহস্রাধিক পর্যন্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, ড্রসোফিলা নামক ফল-মাছিতে মাত্র ৪টি, বিড়ালে ৩৮টি, কুকুরে ৭৮টি, ধানে ২৪টি, গমে ৪২টি, ফার্ণজাতীয় গুল্মে ৫১২টি ও রিজোপড (Rhizopod) কীটাণুতে ১,৫০০ থেকে ১,৬০০টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব দেখা যায়। দেহ-কোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা অল্প অথবা ক্রোমো-সোমগুলি বড় বড় হলে ক্রোমোসোম সম্বন্ধে গবে-ষণা করতে বা তাদের সংখ্যা নির্ণয় করতে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু যে সব প্রজাতিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা প্রচুর অথবা ক্রোমোসোম-গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, সে সব ক্ষেত্রে ক্রোমো-সোমের সংখ্যা নির্ধারণে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের দেহকোষের ক্রোমোসোম-সংখ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল। বর্তমানে ক্রোমোসোম বিশ্লেষণের উন্নত প্রণালী ও দেহকোষ সংগ্রহ করবার নতুন পন্থা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের দেহকোষে যে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোসোম আছে, তা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের দেহকোষে দুই প্রস্থে ৪৬টি ক্রোমোসোম থাকে—তার এক প্রস্থের ২৩টি ক্রোমোসোম আসে মাতার নিকট থেকে, আর এক প্রস্থের ২৩টি ক্রোমোসোম আসে পিতার নিকট থেকে। এই ২৩ জোড়া ক্রোমো-সোমের ২২ জোড়ার প্রতি জোড়ার দুটি ক্রোমোসোমের মধ্যে আকৃতি ও আয়তনে সর্বতোভাবে মিল থাকে। ঐ ২২ ক্রোমোসোমকে অটোসোম (Autosome) এবং বাকী একজোড়া ক্রোমোসোমকে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম (Sex Chromosome) বলে। স্ত্রীলোকের দেহকোষে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমো-সোম জোড়াটিকে XX দ্বারা এবং পুরুষের দেহকোষে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম জোড়া-টিকে XY দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। পুরুষের লিঙ্গ-নির্ধারক XY ক্রোমোসোম দুটির মধ্যে আকৃতি ও আয়তনে অমিল দেখা যায়। X ক্রোমোসোমটি লম্বায় Y ক্রোমোসোম অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বড় হয়ে থাকে। পুরুষ সব সময় লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম জোড়ার X ক্রোমো-সোমটি মাতার নিকট থেকে এবং Y ক্রোমো-সোমটি পিতার নিকট থেকে পায়; কিন্তু প্রতি স্ত্রীলোক তার পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকেই একটি করে X ক্রোমোসোম পেয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্যে ২২ জোড়া অটোসোমকে দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হয়। সবচেয়ে বড় অটোসোম জোড়াটিকে এক নম্বর এবং সবচেয়ে ছোট অটোসোম জোড়াটিকে বাইশ নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে।

দেহকোষের মত মানুষের বীজকোষে (Germ Cell) ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়ে (Ovary) ও পুরুষের অণ্ডকোষে (Testis) বীজকোষ উৎপন্ন হয়। প্রতি বীজকোষ বিভক্ত হয়ে জননকোষের (Gamete) সৃষ্টি হয়। এই বিভাগকালে বীজকোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের প্রতি জোড়ার একটি করে ক্রোমোসোম নিয়ে জননকোষে ২৩টি ক্রোমোসোম

সুনির্দিষ্ট হয়। পুরুষের জননকোষকে শুক্রাণু (Sperm) ও স্ত্রীলোকের জননকোষকে ডিম্বাণু (Ovum) বলে। পুরুষ যে শুক্রাণু উৎপন্ন করে, তার অর্ধেকগুলি X ক্রোমোসোম এবং বাকী অর্ধেক Y ক্রোমোসোম বহন করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি ডিম্বাণুতে সব সময় একটি X ক্রোমোসোম থাকে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সংমিশ্রণে এক কোষবিশিষ্ট জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি হয় এবং সেটাই নবজাতকের জন্মের সূচনা করে। Y ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণুর সঙ্গে একটি ডিম্বাণুর মিলনে পুত্রসন্তান (XY) এবং X ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণুর সঙ্গে একটি ডিম্বাণুর মিলনে কন্যাসন্তান (XX) হয়ে থাকে।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জননকোষ প্রস্তুতির সময় বীজকোষস্থিত ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের জোড় বিযুক্তি কালে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যার তারতম্যে অর্থাৎ কোন বিশেষ অটোসোম বা লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম দুটির স্থলে কম বা বেশী সংখ্যক ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকলে অথবা ক্রোমোসোমের আকৃতিতে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটলে নানারকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্ততির উদ্ভব হয়। কোষ-বিভাজনের সময় স্ত্রীলোকের বীজকোষের X ক্রোমোসোম দুটি কখনো কখনো অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে এবং বীজকোষ থেকে এমন দুটি ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে একটিতে দুটি X ক্রোমোসোম এবং অপরটিতে কোন X ক্রোমোসোম থাকে না। অনুরূপভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে একটি শুক্রাণুতে X ও অপরটিতে Y ক্রোমোসোম থাকবার পরিবর্তে একটিতে XY ক্রোমোসোম জোড়া অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং অপরটিতে কোন লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে না। যে সব জননকোষে লিঙ্গ-নির্ধারক কোন ক্রোমোসোম থাকে না, তাদের O দ্বারা সূচিত করা হয়। এই ধরণের অস্বাভাবিক জননকোষের সৃষ্টি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম জোড়া অবিচ্ছিন্ন থাকবার ফলে যে অস্বাভাবিক শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয় এবং তাদের মিলনে যে সন্ততির জন্ম হতে পারে, তা নীচের ছক থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব।

	স্ত্রীলোক (XX)	স্বাভাবিক ডিম্বাণু	অস্বাভাবিক ডিম্বাণু	
পুরুষ (XY)		X	XX	O
স্বাভাবিক	X	XX (কন্যা)	XXX (কন্যা)	XO (কন্যা)
শুক্রাণু	Y	XY (পুত্র)	XXY (পুত্র)	YO (?)
অস্বাভাবিক	XY	XXY (পুত্র)	XXXY (পুত্র)	XY (পুত্র)
শুক্রাণু	O	XO (কন্যা)	XX (কন্যা)	OO (?)

স্বাভাবিক ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন সব সন্ততিই সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে থাকে। ছকের উত্তর পশ্চিম কোণে তাদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হলে অর্থাৎ কোন অস্বাভাবিক ডিম্বাণুর সঙ্গে কোন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক শুক্রাণুর সংমিশ্রণে অথবা বিপরীত ভাবে কোন স্বাভাবিক ডিম্বাণুর সঙ্গে কোন অস্বাভাবিক শুক্রাণুর মিলনে যে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তার শারীরিক ও মানসিক পরিস্ফুটনে নানা রকম অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১৯১৩ সালে কেলভিন ব্রীজ নামে একজন বিজ্ঞানী ড্রসোফিলা মাছির দেহকোষে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমের সংখ্যার তারতম্য দেখেছিলেন। মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমো-

সোমের সংখ্যাও কম-বেশী পাওয়া যেতে পারে বলে অনেক জীব-বিজ্ঞানী অনুমান করতেন। মাত্র ছয় বছর আগে মানুষের দেহকোষে এক জোড়া XY ক্রোমোসোমের পরিবর্তে দুটি X ও একটি Y অর্থাৎ XXY ক্রোমোসোমের খোঁজ প্রথম পাওয়া যায়। XXY ক্রোমোসোমের উত্তরাধিকারী সন্তানের মধ্যে পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এরা সাধারণতঃ দেখতে লম্বা হয়, স্তনযুগল স্ফীত হয়, অণ্ডকোষ ছোট থাকে এবং তাদের শুক্র উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। মাঝে মাঝে তাদের মানসিক বৈকল্যও দেখা যায়। এই রোগের লক্ষণকে ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম (Klinefelter's syndrome) বলে। মাতা অথবা পিতার জননকোষ প্রস্তুতির সময় লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোম জোড়াটি অবিচ্ছিন্ন থাকবার ফলে উপরিউক্ত ধরণের পুত্রসন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। অস্বাভাবিক XX ডিম্বাণুর সঙ্গে স্বাভাবিক Y শুক্রাণুর মিলনে অথবা স্বাভাবিক X ডিম্বাণুর সঙ্গে অস্বাভাবিক XY শুক্রাণুর সংস্পর্শে XXY পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কার অস্বাভাবিক জননকোষের সংমিশ্রণে এই রকম বিসদৃশ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তা সহজে বলা যায় না। তবে লিঙ্গ-অনুগামী কোন বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে এটা নির্ধারণ করা সম্ভব। বর্ণান্ধ মাতা ও সুস্থ পিতার যৌনমিলনে যদি বর্ণান্ধ পুত্রসন্তান হয়, সে ক্ষেত্রে সন্তান মাতার নিকট থেকে দুটি X ক্রোমোসোম ও পিতার নিকট থেকে একটি Y ক্রোমোসোম নিয়ে XXY ক্রোমোসোমের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। আমরা জানি যে, বর্ণান্ধতা রোগ X ক্রোমোসোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন (Recessive) জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাতার দুটি X ক্রোমোসোমে যদি বর্ণান্ধতা রোগের জিন নিহিত থাকে, তাহলে তার মধ্যে বর্ণান্ধতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সুস্থ পিতার X ক্রোমোসোমে বর্ণান্ধতা রোগের জিন থাকতে পারে না; যদি পিতার X ক্রোমোসোমে বর্ণান্ধতা রোগের জিন থাকে, তাহলেই ঐ লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পায়। সন্তান যদি বর্ণান্ধ মাতার নিকট থেকে একটি X ক্রোমোসোম ও সুস্থ পিতার নিকট থেকে XY ক্রোমোসোম লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে বর্ণান্ধতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয় না।

একটি অস্বাভাবিক XX ডিম্বাণু ও একটি অস্বাভাবিক XY শুক্রাণুর মিলনে যে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তার অন্তঃপ্রকৃতি (Genotype) XXXY দ্বারা লেখা হয়ে থাকে। তিনটি X ক্রোমোসোম থাকা সত্ত্বেও Y ক্রোমোসোমের উপস্থিতিতে সন্তানের মধ্যে পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। Y ক্রোমোসোম X ক্রোমোসোম অপেক্ষা ক্ষুদ্র হলেও এর লিঙ্গ-নির্ধারণ ক্ষমতা সমষ্টিগত X ক্রোমোসোম অপেক্ষা প্রবল। কিন্তু ড্রসোফিলা মাছিতে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। সেখানে XXY মাছি পুরুষ না হয়ে স্ত্রী হয়ে জন্মায়।

একটি অস্বাভাবিক XX ডিম্বাণু ও একটি X ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণুর সংস্পর্শে কন্যাসন্তানের উদ্ভব হয় এবং তার দেহকোষে দুটি X ক্রোমোসোমের পরিবর্তে তিনটি X ক্রোমোসোম থাকবার ফলে মোট ৪৭টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই জাতীয় কন্যাসন্তানদের মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতি, ঋতুহীনতা ও বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জননকোষ প্রস্তুতিতে মাঝে মাঝে এমন জননকোষ সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে কোন লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকে না। লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমবিহীন শুক্রাণুর সঙ্গে কোন স্বাভাবিক ডিম্বাণুর সংমিশ্রণে অথবা X ক্রোমোসোমবিহীন ডিম্বাণুর সঙ্গে X ক্রোমোসোম-বাহী শুক্রাণুর মিলনে যে সন্তান সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাদের দেহকোষে মাত্র ৪৫টি ক্রোমোসোম থাকে। তারা আকৃতিতে বেঁটে হয়। তাদের মধ্যে লিঙ্গ-

নির্দেশক অপ্রধান অঙ্গাদির অপুষ্টতা দেখা যায় এবং তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ভুগে থাকে। ১৯৩৮ সালে হেনরী টার্ণার নামে একজন বিজ্ঞানী এই রোগের কথা প্রথম বর্ণনা করেছিলেন। ফলে এই জাতীয় রোগকে টার্ণার সিনড্রোম (Turner's syndrome) বলে। এই সব রোগীর দেহকোষে মাত্র একটি X ক্রোমোসোম থাকে এবং তাদের অন্তঃপ্রকৃতি XO দ্বারা লেখা হয়ে থাকে।

X ক্রোমোসোমবিহীন ডিম্বাণুর সঙ্গে Y ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণুর মিলনে YO অন্তঃপ্রকৃতিসম্পন্ন সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু এই রকম সন্তান উৎপন্ন হবার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এরূপ ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর নিষিক্ত হবার সম্ভবনা বোধ হয় থাকে না। অনুরূপভাবে লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমবিহীন কোন দেহকোষের পরিচয় আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

জননকোষ প্রস্তুতির সময় শুধু মাত্র লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোসোমের সংখ্যার তারতম্যই দেখা যায় না, অনেক সময় যে কোন অটোসোম জোড়ার বিযুক্তিতে বিশৃঙ্খলা দেখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে ২১ নম্বরের জোড়াটি বিযুক্ত না হয়ে একই জননকোষে সন্নিবেশিত হয় এবং এই অস্বাভাবিক জননকোষ অন্য কোন স্বাভাবিক জননকোষের সংমিশ্রণে যে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তার দেহকোষে ৪৬টি ক্রোমোসোমের পরিবর্তে ৪৭টি ক্রোমোসোম থাকে। এই সব ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমগুলিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি কোষে দুটির স্থলে একই ধরণের তিনটি ২১ নম্বরের ক্রোমোসোম আছে। এইরূপ একটি ক্রোমোসোম বেশী থাকবার ফলে সন্তানের বুদ্ধি-বৃত্তির ভীষণ অবনতি দেখা যায়। এদের মাথাটা গোল ও আকারে ছোট হয়। চোখগুলিও ছোট ছোট হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে হাবা-গোবার ভাবটা প্রকাশ পায়। ১৮৬০ সালে ল্যাংডন ডাউন নামে একজন বৃটিশ চিকিৎসক এই ধরণের ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের খোঁজ পেয়েছিলেন। তাদের চোখের পাতার ভাঁজে এশিয়ার মঙ্গোলদের চোখের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকবার দরুণ তিনি এই রোগের নাম দিয়েছিলেন মঙ্গোলীজম (Mongolism) বা মঙ্গোলীয় নির্বুদ্ধিতা। পরবর্তী কালে এই রোগকে ডাউন সিনড্রোম (Down's syndrome) বলে নামকরণ করা হয়েছে। জননকোষ প্রস্তুতির সময় ক্রোমোসোমের বিশৃঙ্খলার কারণ বংশগত, না পরিবেশগত, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। যে সব মাতার দেহকোষ ও বীজকোষে তিনটি ২১ নম্বরের ক্রোমোসোম থাকে, তাদের অর্ধেক সন্ততি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে ও বাকী অর্ধেকের মধ্যে ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণ পরিস্ফুট হবার সম্ভবনা থাকে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে দেখা গেছে যে, মাতার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলীয় নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন সন্তান হবার সম্ভবনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মাতার ৪৫ বা তদূর্ধ্ব বছর বয়সে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় তিন জনের ডাউন সিনড্রোমের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু পিতার বয়সের সঙ্গে ঐ রোগাক্রান্ত সন্তানের উৎপত্তির হার নির্ভর করে না। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, এই জাতীয় সন্তান মাতার অস্বাভাবিক ডিম্বাণু থেকেই সৃষ্টি। ২১ নম্বরের অটোসোম ছাড়া দেহকোষের অন্যান্য অটোসোমের সংখ্যার তারতম্যের কথাও বর্তমানে শোনা যাচ্ছে।

বীজকোষ বিভাজনকালে যদি কোন ক্রোমোসোমের সামান্য অংশ ভেঙ্গে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায় অথবা ভাঙা অংশ অন্য কোন ক্রোমোসোমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তাহলে মানুষের বহিঃপ্রকৃতিতে তার প্রতিফলন দেখা যায়। ক্রোমোসোমের আকৃতিগত বিশৃঙ্খলা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। জননকোষে কোন ক্রোমোসোমের

অংশ যদি বেশীমাত্রায় ভাঙ্গা অবস্থায় থাকে—তাহলে সেই জননকোষ কখনও সুস্থ জননকোষের সঙ্গে নিষিক্ত হতে পারে না। কোন ক্রোমোসোমের সামান্য অংশ ভেঙ্গে গিয়ে অন্য কোন ক্রোমোসোমের সঙ্গে জোড়া লেগে অনেক সময় লম্বাকৃতির ক্রোমোসোমের সৃষ্টি হয়। কখন কখন মঙ্গোলীয় নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন সন্তানের দেহকোষে অবস্থিত বাড়তি ২১ নম্বরের অটোসোমটি আর একটি অটোসোমের সঙ্গে জোড়া লাগা অবস্থায় থাকে। ফলে তার দেহকোষে ৪৭টি ক্রোমোসোমের পরিবর্তে ৪৬টি ক্রোমোসোম দেখা যায়। এমন স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার দেহকোষে অবস্থিত দুটি X ক্রোমোসোমের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা ছোট, যার ফলে তার মধ্যে যৌনাঙ্গের অপুষ্টতা ও ঋতুহীনতার লক্ষণ দেখা গেছে।

ক্রোমোসোমের বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কোন রোগের বা বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক আছে কি না, সে সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা গত ছয় বছর ধরে চলছে। মস্তিষ্কবিকৃতি, বুদ্ধিহীনতা, অপুষ্ট যৌনাঙ্গের উৎপত্তি ও স্ত্রীলোকের ঋতুহীনতা প্রভৃতি ব্যাধির ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্রোমোসোমের বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মাইলয়েড লিউকেমিয়া (Myeloid Leukemia) রোগের সম্পর্কের কথাও বর্তমানে শোনা যাচ্ছে। প্রতিটি ক্রোমোসোমের নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য আবিষ্কৃত হলে মানুষের অনেক কিছু রোগ ও বৈশিষ্ট্যের উৎস সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মাবে এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটবে।

লুই পাস্তুর

শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময়ে জলাতঙ্ক রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না। প্রচলিত প্রথামত কোন পাগ্‌লা কুকুরে দংশন করলে লোকে ছুটে যেত গ্রাম্য কর্মকারের কাছে। কর্মকার উত্তপ্ত লৌহশলাকা রোগীর ক্ষতস্থলে প্রবেশ করিয়ে দিত। ফলে কোন সৌভাগ্যবান রোগী হয়তো মুক্তি পেত, আর বাকী সকলে মৃত্যু বরণ করতো। নয় বছর বয়স্ক এক বালক একদিন অপার বিস্ময়ে অবলোকন করেছিল এই অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতি। তারপর বহুদিন অতীত হয়েছে, সাধারণ মানুষ হয়তো এই রোগমুক্তিকে দৈব ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু ভুলতে পারে নি সে বালক। পঞ্চাশ বছর পরে উক্ত বালকই আবিষ্কার করলো 'অ্যান্টির‍্যাবিস সিরাম'—যার সহায়তায় জলাতঙ্ক রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব। সমগ্র বিশ্ব অপার বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, জলাতঙ্ক রোগ আর দৈব ঘটনা নয়—মানুষের বুদ্ধির কাছে তাও পরাজিত। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো আবিষ্কর্তার নাম। লুই পাস্তুর—লুই পাস্তুর বলে সকলে আত্মহারা হয়ে গেল। স্বীকৃতি পেলেন লুই পাস্তুর চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তকারী অবদানের জন্যে। আজও বিশ্বের প্রতিটি নরনারী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এই মানবাত্মার নাম। আবেগে উদ্বেলিত হয় তাদের বক্ষ, প্রণতি জানায় এই মহান প্রতিভার উদ্দেশ্যে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের পূর্বপ্রান্তে ভোল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন লুই পাস্তুর। তাঁর পিতা

প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। পরে অবশ্য তিনি চামড়ার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পাস্তুরের পিতামাতা কারুরই বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি ছিল পিতার গভীর অনুরাগ। তাই তিনি অবসর বিনোদন করতেন ফরাসী সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে। পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। পিতার ইচ্ছা—পুত্র উপযুক্ত শিক্ষক হিসাবে গড়ে উঠুক। পুত্রও পিতার এই ইচ্ছাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

বাল্যকালে পাস্তুরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় নি। প্রথমে পোর্ট্রেট অঙ্কনের প্রতি পুত্রের বেশী ঝোঁক দেখা যায়। ঐ বয়সেই তিনি যে সব চিত্র অঙ্কন করেন, তার মধ্যেই তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। শৈশবের অঙ্কিত চিত্রগুলি আজও প্যারীর পাস্তুর গবেষণাগারে সংরক্ষিত আছে। এগুলি দেখে মনে হয়, পাস্তুর যদি বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ না করতেন, তবে তিনি বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী বলে পরিচিত হতে পারতেন।

পিতার ইচ্ছামত পুত্র প্রথমেই গেলেন শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে। এই বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাপ্রবণ সরল বালকটি প্রথমেই শিক্ষকদের আকৃষ্ট করলো। তখনই প্রধান শিক্ষকের আদেশে তিনি ভর্তি হলেন বিজ্ঞান বিভাগে। এখানে এসে পাস্তুর নিজেকে উপযুক্ত শিক্ষক হিসাবে গড়ে তুলতে লাগলেন। অবসরকালে তিনি কেলাসের সম্বন্ধে গভীর পড়াশুনা করতেন। কেলাস সম্বন্ধে যতই তিনি গভীরভাবে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন, ততই তিনি চমৎকৃত হয়ে যান। তাঁর ধারণা হলো, এই বিষয়ে পড়াশুনা করবার সুযোগ তো অফুরন্ত। তাই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি ছুটলেন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক বলার্দের কাছে। মনে অনেক আশা—বলার্দ যদি তাঁকে গবেষণার সুযোগ দেন। বলার্দ এই সময় ব্রোমিন নামক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি আবার কেলাসের উপর বক্তৃতা দিতেন। পাস্তুরও উক্ত বক্তৃতাবলী মনোযোগ দিয়ে শোনতেন। কাজেই বলার্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বলার্দ যখন শুনতে পেলেন পাস্তুর তাঁর কাছে গবেষণা করতে চান, তখন তিনি সানন্দে তাঁকে সহকারী হিসাবে গ্রহণ করলেন।

অল্পকালের মধ্যেই পাস্তুরের মৌলিক চিন্তাধারা বলার্দকে বিস্মিত করে। টার্টারিক অ্যাসিডের উপর আলোকের ক্রিয়া কি—সে সম্বন্ধে তিনি তাঁকে গবেষণা করবার জন্যে অনুরোধ করেন। শীঘ্রই পাস্তুর টার্টারিক অ্যাসিডের উপর একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। বলার্দ পাস্তুরের নিবন্ধ পাঠ করে চমৎকৃত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর গবেষণার কথা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বায়টের গোচরে আনেন। বায়টও ফরাসী অ্যাকাডেমীতে লুই-এর নিবন্ধ পেশ করবার আশ্বাস দেন। এইভাবে পাস্তুর বিজ্ঞানীমহলে উদীয়মান কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছেন, কিন্তু হঠাৎ ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে আদেশ এলো—পাস্তুর যেন কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এর ফলে তাঁর গবেষণা একদম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তার অধ্যাপকমণ্ডলী, বিশেষ করে বলার্দ ও বায়ট ফরাসী সরকারের এই অন্যায় আবদার সহ্য করলেন না। তাঁরা ফরাসী অ্যাকাডেমীর অন্যান্য সদস্যের সহযোগিতায় সরকারের কাছে প্রতিবাদ-পত্র পেশ করলেন। কিন্তু সরকারের লালফিতার ফাঁক দিয়ে কোন কার্যই দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হবার নয়। তাই তাঁকে প্রথমে সরকারের আদেশেই গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা ও ফরাসী অ্যাকাডেমীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সরকারের কাছে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ-লিপি পেশ করতে লাগলেন

অবশেষে প্রায় এক বছর পরে তিনি উক্ত চাকুরী থেকে নিষ্কৃতি পেলেন এবং সরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হলেন।

চাকুরীতে যোগদানের এক সপ্তাহের মধ্যেই এই দুঃসাহসী তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি সোজা তাঁর কন্যাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে বসলেন। তিনি লিখলেন—অর্থ আমার একদম নেই বললেই চলে। আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য, কিছু সাহস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে গেলে যদি আমার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হয়, তাহলে আমি সমগ্র জীবন রাসায়নিক গবেষণায় নিয়োগ করবো। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণ খ্যাতি লাভের পর প্যারীতে ফিরে যাবার ইচ্ছা রাখি পিতা শীঘ্রই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আপনার ওখানে যাত্রা করবেন।

আশ্চর্য ফল হলো এই চিঠির। স্পষ্ট বক্তা, সৎসাহসী যুবকের সত্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ হলেন রেক্টর। তিনি সানন্দে তাঁকে আহ্বান জানালেন এবং তাঁর একমাত্র কন্যা মেরী লরেত্‌কে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এই সময় লুই-এর বয়স ছাব্বিশ, মেরীর বাইশ। তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর। শ্রীমতী পাস্তুর প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর স্বামী কি প্রকৃতির লোক। গবেষণা যাঁর প্রাণ, তাঁকে সংসারের প্রাত্যহিক ঝামেলার মধ্যে টেনে আনা অন্যায়। তিনি স্বামীকে সংসারের সমস্ত কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়—গবেষণার নানা রকম কাজ তিনি স্বেচ্ছায় করে দিতেন। এক কথায়—তিনি শুধু সহধর্মিণীই ছিলেন না, সহকর্মীও বটে। ছুটির দিনে তাঁরা ছুটতেন লুঁভার-এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি দেখবার জন্যে অথবা যেতেন অপেরায়। এইভাবে হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিনগুলি কাটছিল বেশ সুখে। কিন্তু হঠাৎ পরপর কয়েকটি শোকাবহ ঘটনা এই সুখী দম্পতীর জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তাঁদের প্রথম কন্যা জেনে নয় বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করে। তার পরেই দু-বছরের মেয়ে কামিলা মৃত্যু-বরণ করে। এরপর বারো বছরের মেয়ে সেমিলি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে সেও বিদায় নেয়। পরপর এতগুলি শোকাবহ ঘটনাও তাঁদের কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারলো না। সমস্ত ব্যথা মুছে ফেলে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চাইলেন তাঁরা তাঁদের সংসার। কিন্তু আবার এলো বিপদ নতুন করে। তাঁদের একমাত্র পুত্র বিশ বছর বয়সে ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। এর মধ্যে এলো এক ভয়াবহ সংবাদ। ফরাসীরা জার্মানদের হাতে পরাজিত হয়েছে এবং সার্জেন্ট পাস্তুর নিখোঁজ। এই সংবাদে লুই অত্যন্ত ভেঙে পড়লেন। এতদিন পরে শেষ সম্বলটুকুও যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! একদম ভেঙ্গে পড়লেন লুই-দম্পতি। তাঁর প্রিয় গবেষণাগার ছেড়ে লুই সমগ্র ফরাসী-দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন। যেখানেই পরাজিত ফরাসী সৈন্যের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পান, সেখানেই তিনি ছুটে যান। এই সময় তিনি এক বিষাদময় সংবাদ সংগ্রহ করলেন। সার্জেন্ট পাস্তুরের ব্যাটালিয়নের বারো শত সৈন্যের মধ্যে মাত্র তিন শত জীবিত। এই খবর পেয়ে মেরী ও লুই ছুটে যান তার মধ্য থেকে তাঁদের পুত্রকে খুজে আনতে। এবার তাঁদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন—পুত্র আহত, কিন্তু জীবিত। এরপর আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁরা তাঁদের একমাত্র পুত্রের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করলেন। এর ফলে পাস্তুর কোন দিনই আর জার্মানদের ক্ষমা করতে পারেন নি। পরবর্তী কালে তাঁর গবেষণার জন্যে বার্লিন থেকে তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

এবার পাস্তুরের বৈজ্ঞানিক অবদানের বিষয় আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলেছি, পাস্তুর প্রথমে কেলাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বিজ্ঞানী বায়ট আবিষ্কার করেছিলেন, স্ফটিক কেলাসের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করালে সমবর্তনের তল (Plane of Polarisation) ঘুরে যায়। পূর্বে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, কয়েক শ্রেণীর কেলাসে আলোকরশ্মি আবর্তিত করাতে হলে কেলাস প্রথমে দ্রবীভূত করাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, চিনি জাতীয় বস্তুকে প্রথমে দ্রবীভূত করে তার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবাহিত করালে তা আবর্তিত হয়ে থাকে।

একজন জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী এইলহার্দৎ মিৎশ্চারলিঘ এই সময় টার্টারিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি দেখলেন, দুই ধরণের টার্টারিক অ্যাসিড আছে—প্রকৃত টার্টারিক অ্যাসিড ও প্যারাটার্টারিক অ্যাসিড। প্রথম প্রকারের অ্যাসিড সমবর্তনে আবর্তিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের অ্যাসিডে তা হয় না। পাস্তুর কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর ধারণা হলো, নিশ্চয়ই এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। তাই তিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি টার্টারিক অ্যাসিডের কেলাসের গায়ে ছোট ছোট নানা ধরণের পল দেখতে পেলেন। তারপর মিৎশ্চারলিঘের নিয়মানুসারে প্যারাটার্টারিক অ্যাসিড প্রস্তুত করলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি কেলাসের গায়ে দুই ধরণের পল দেখতে পেলেন—কতকগুলি ডান দিকে, আর কতকগুলি বাঁ-দিকে। পরে তাঁর এই আবিষ্কার সত্য বলেই প্রমাণিত হলো।

কেলাস সম্বন্ধে গবেষণা এখানেই শেষ নয়, বরং সবে সুরু। এই সময় তিনি জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। অবশ্য রসায়নাগারে তিনি জীবনতত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবুও এই গবেষণাই তাঁকে রসায়নশাস্ত্রের এক বিরাট জগৎ আবিষ্কারের দিকে টেনে নিয়ে যায়—অর্থাৎ এখান থেকেই তিনি ফার্মেন্টেশনের খোঁজ পান।

ফার্মেন্টেশন অর্থাৎ সন্ধান বা গাঁজন কাকে বলে, তা সকলেই জানেন। অনেক সময় স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত গাঁজন আমাদের প্রয়োজনে লাগে। আবার কোন কোন সময় গাঁজন বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আঙুর গেঁজে গিয়ে প্রস্তুত হয় সুরা। আবার সুরা গেঁজে গিয়ে অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে যে পদার্থ দেয়, তাকে বলে শির্কা। দুধের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থ ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়ে দুধের স্বাদ হয় টক। আবার মাংস ও ডিম গেঁজে যাবার ফলে নষ্ট হয়ে যায়।

পাস্তুর যখন জীবনীতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যস্ত, তখন তিনি বেড়াতে গেছেন ভূমধ্যসাগরের তীরে কোন এক সহরে। মদ্য-ব্যবসায়ের জন্যে উক্ত সহর বিশেষ বিখ্যাত। আর ফরাসীদেশ মদ্য প্রস্তুতের ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করে। ওখানকার মদ্য-ব্যবসায়ীরা যখন জানতে পারলো পাস্তুর তাদের সহরে বেড়াতে এসেছেন, তখন তারা ছুটলো তাঁর কাছে। তারা জানালো, তারা কিছুতেই মদ্য রক্ষা করতে পারছে না। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই মদ্যের স্বাদ কটু হয়ে যাচ্ছে; কাজেই ফরাসী দেশের মদ্যের ব্যবসায় অবনতির মুখে। তাদের অনুরোধে পাস্তুর গেলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। গিয়ে দেখলেন সমস্ত মদ্যই উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়। তিনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন।

তারপর তাঁর গবেষণাগারে কিছু গেঁজে যাওয়া

মগু পাঠিয়ে দেবার জন্তে তাদের বললেন। তিনি ফিরে গিয়ে এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ফার্মেন্টেশনের বীজ সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। এর ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুর পরিবর্তন অতি ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই জীবগুলি সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল মাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। তিনি আরও দেখান যে, উত্তাপের সাহায্যে এই সমস্ত জীবের জনন-প্রক্রিয়া প্রতিহত করা যায়। তাঁর পরীক্ষার ফলে মগু-ব্যবসায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো। এই পরীক্ষার ফলেই বিখ্যাত পাস্তুরাই-জেশন পদ্ধতির উদ্ভব হয় এবং দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

এর কয়েক বছর পর রেশম কীট এক প্রকার জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে আবার পাস্তুরের ডাক পড়ে। গভীর অভিনিবেশের সাহায্যে পাস্তুর এই নতুন সমস্যার সুষ্ঠু সামাধান করেন। জীবাণুর হাত থেকে রেশম কীটকে রক্ষা করবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রথম তিনিই করেন।

লুই পাস্তুরের সমগ্র জীবনের সাফল্যের কথা আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, তাঁর সমগ্র জীবনের গবেষণা একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। একটির পর একটি সমস্যা তাঁর হাতে এসে পড়েছে আর তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিয়েছেন। কেলাসের সম্বন্ধে গবেষণা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় জীবনের চিরন্তন রহস্যের মধ্যে। আবার জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি সমবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সমবর্তনের আবিষ্কারের ফলই হলো মাইক্রোব নামক আণুবীক্ষণিক জীবের অস্তিত্ব আবিষ্কার। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করেন যে, প্রাণহীন বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জননপ্রক্রিয়ার ফলে জীবনের উৎপত্তি অসম্ভব। অ্যানথ্রাক্স রোগ থেকেও মুক্তির উপায় তিনি আবিষ্কার করেন। এসব ছাড়াও তিনি গ্যাংগ্রীন, রক্তদুষ্টি ও প্রসব-জ্বর নিরাময়ের উপায়ও আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন না কোন জীব থেকেই এই সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

এর পর ১৮৯৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাস্তুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জীবনের সৃষ্টি-রহস্য

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

গাছপালা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মানুষ প্রভৃতিকে জৈব বা জৈব পদার্থ এবং মৃত্তিকা, খনিজ-পদার্থ প্রভৃতিকে নির্জীব বা অজৈব পদার্থ বলা হয়। মানুষের শরীরের ন্যায় জটিল জীবিত জৈব পদার্থকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, যেমন—মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকাশয় প্রভৃতি প্রাণীতত্ত্বসম্মত (Biological) সমজাতীয় অংশে বিভক্ত করা আবশ্যক। এইরূপ সমজাতীয় অংশকে Homogeneous parts) আমরা পেশী (Tissue) বলিয়া থাকি। বিশ্লেষণের শেষ পর্যায়ে এই সব পেশীগুলি বিভিন্ন পরমাণু হইতে কিভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। কারণ পরমাণুই শেষ পর্যায়ে প্রত্যেক জৈব বা অজৈব পদার্থ সৃষ্টি করে।

যে কোনও পেশীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা বহুসংখ্যক একজাতীয় এককে (Unit) বিভক্ত। এই সব এককের প্রকৃতি কম-বেশী সমগ্র পেশীটির গুণাবলী স্থির করে। জৈব পদার্থের এই প্রাথমিক গঠনমূলক একক সাধারণতঃ কোষ (Cell) নামে পরিচিত। যে পর্যন্ত একটি কোষও পেশীর ভিতর থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতীয় পেশীর প্রাণতাত্ত্বিক গুণাবলী ঠিক থাকিবে। এই হিসাবে এই কোষগুলিকে প্রাণতাত্ত্বিক পরমাণু (Biological atom) বলা চলে। কারণ ইংরেজী পরমাণু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ অবিভাজ্যবস্তু। কোষকে ভাঙিবামাত্র পেশীর গুণাবলী ঠিক থাকিবে না। মাংসপেশীর পেশীকে যদি ক্ষুদ্র করিতে করিতে একটি কোষের অর্ধেক করা হয়, তবে মাংসপেশীর সংকোচন-ধর্ম আর তাহাতে থাকিবে না।

পেশী-সংগঠক কোষ সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্র। গড়ে একটি কোষের ব্যাস প্রায় এক মিলিমিটারের একশত ভাগের এক ভাগ। ডিমের হলুদ রঙের অংশকেও একটি কোষ ধরা হয়। এই ক্ষেত্রে একটি কোষই খুব বৃহৎ আকারের; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ডিমের প্রকৃত জীবনদায়ী অংশ অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক অংশে অবস্থিত থাকে এবং বাকী অংশ ভবিষ্যৎ সন্তানের খাদ্য হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

আমরা সচরাচর যে সকল গাছ বা প্রাণী দেখি, তাহাদের প্রত্যেকটিই বহুসংখ্যক কোষের সমষ্টি। একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীর প্রায় এক কোটি কোটি ($১০^{১৪}$) বিভিন্ন কোষের সমষ্টি।

এক তল (Plane) হইতে দেখিলে বিভিন্ন বস্তুর কোষের আকৃতি প্রদত্ত চিত্রের মত বিভিন্ন প্রকারের। (১, ২, ৩নং চিত্র)।

ক্ষুদ্রতর জৈবপদার্থ আরও ক্ষুদ্রতর কোষ-সমূহের সমষ্টি মাত্র। একটি সাধারণ মক্ষিকা বা পিপীলিকা কতিপয় অর্বুদ কোষের সমষ্টি। কতিপয় জৈবপদার্থ কেবলমাত্র একটি কোষের দ্বারা গঠিত; যথা—অ্যামিবা, ছত্রাক (Fungi) ও ব্যাক্টিরিয়া। একটি ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই এগুলি দৃষ্টিগোচর হয়।

জীবন্ত কোষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাদের তিনটি বিশেষ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—(১) পার্শ্ববর্তী মাধ্যম হইতে ইহাদের দেহ গঠনের উপযোগী জিনিষ লইয়া হজম করা, (২) ইহাদের শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে পদার্থ আবশ্যক, সেই পদার্থে এই সকল জিনিষকে

রূপান্তরিত করা এবং (৩) যখন ইহাদের জ্যামিতিক আকার অতিশয় বৃহৎ হয়, তখন নিজ দেহকে দুইটি সমান পরিমাণের অর্ধকোষে বিভক্ত করা। এই সকল অর্ধকোষ নিজেরা আবার বর্ধিত হইতে পারে। সংক্ষেপে এই তিনটি গুণাবলী হইতেছে—খাওয়া, বর্ধিত হওয়া এবং বংশবৃদ্ধি করা।

জৈব ও অজৈব পদার্থের এই তিনটি গুণের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য অজৈব লবণের একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে:—সাধরণতঃ জানা আছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জল বা কোনও দ্রাবক তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে যে পরিমাণ লবণ ধরিয়া রাখিতে পারে, তাহার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। গরম জলের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণ লবণ দিয়া যদি ক্রমে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ঘরের তাপের সমান তাপমাত্রায় আনা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, ঘরের তাপে সাধারণতঃ ঐ জল যতটা লবণ ধরিয়া রাখিতে পারে, তদপেক্ষা কিছু অধিক লবণ এই জলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাহির না হইয়া থাকিয়া যায়। এখন যদি এইরূপ ঠাণ্ডা করা সম্পৃক্ত (Saturated) জলে একটি লবণের দানা ফেলা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, এই দানাটি ঐ লবণ-জলের মধ্য হইতে লবণ আহরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে পুষ্ট ও বড় হইতে হইতে এমন অবস্থায় পৌঁছিবে, যখন ভারের চাপে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দানাটি ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এখানে মনে হইতে পারে যে, যখন দানাটি লবণ-জল (পারিপার্শ্বিক পদার্থ) হইতে আহার্য সংগ্রহ করিয়া বড় হইল এবং ক্রমে ভাঙ্গিয়া বংশবৃদ্ধি করিল, তখন দানাটিও একটি জৈব পদার্থ। কিন্তু যে খাদ্য-দানাটি গ্রহণ করিল, তাহার কোনও পরিবর্তন না ঘটাইয়া তাহার শরীরের উপর জমাইয়া লইল এবং সমান দুই ভাগে ভাগ না হইয়া বিভিন্ন আকার ও ওজনের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইল। তজ্জন্য লবণের এই পরিবর্তন যান্ত্রিক আহরণ (Mechanical accretion) মাত্র, প্রাণরাসায়নিক হজম-কার্য (Biochemical assimilation) নহে।

১। বৃক্কপেশীর কোষ, ২। মাংসপেশীর কোষ, ৩। মস্তিষ্কের পেশীর কোষ।

তথাপি দেখা গিয়াছে যে, জৈব ও অজৈব পদার্থে মূলতঃ প্রভেদ নাই। ভাইরাস নামক অতি জটিল রাসায়নিক অণু আছে (ইহার প্রত্যেক অণু লক্ষ লক্ষ পরমাণুর দ্বারা গঠিত), যাহা পারিপার্শিক দ্রব্য হইতে অণু সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ঠিক নিজেদের মত অণুতে পরিবর্তন করিয়া থাকে। এই ভাইরাস-কণিকাকে সাধারণতঃ রাসায়নিক অণু এবং সঙ্গে সঙ্গে জৈব পদার্থ বলিয়া ধরা যায় এবং এই ভাইরাস হইতেছে সেই হারাণো শৃঙ্খল, যাহা জৈব এবং অজৈব পদার্থকে একভাবে বাঁধিয়া পার্থক্য দূর করিতেছে।

এখন কোষের কথায় ফিরিয়া আসি। কোষের বৃদ্ধি এবং বংশবৃদ্ধি যদিও জটিল, তথাপি তাহা অণুর ন্যায় অত জটিল নহে। বস্তুর কোষকে জীবিত পদার্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একটি ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা একটি কোষকে পরীক্ষা

করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা অর্ধস্বচ্ছ, চট্‌চটে, আঠালো পদার্থের দ্বারা গঠিত। এইরূপ আঠালো পদার্থের রাসায়নিক গঠন অতি জটিল। এই আঠালো পদার্থকে প্রটোপ্লাজম বলা হয়। এই প্রটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীরের দ্বারা আবৃত থাকে। কোষ-প্রাচীরগুলি প্রাণীদের কোষের ক্ষেত্রে পাত্‌লা এবং নমনীয় এবং বৃক্ষাদির ক্ষেত্রে পুরু এবং ভারী—এই জন্য বৃক্ষাদির দেহ অতিশয় শক্ত হয়। প্রত্যেক কোষের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র বর্তুলাকার জিনিস আছে, যাহাকে কেন্দ্রক (Nucleus) বলা হয়। এই কেন্দ্রক ক্রোমেটিন নামক পদার্থের সূক্ষ্ম জালের দ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ একটি কোষের প্রটোপ্লাজমের বিভিন্ন অংশ সমান স্বচ্ছ থাকায় এই অংশগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া দেখিলেই দেখা যায় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এই বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পরিমাণে রং গ্রহণ করে। জীবিত কোষে রং দিলে কোষ মরিয়া যায়; কিন্তু আমরা বহু জীবিত কোষকে রং দিয়া দেখিয়া তাহাদের ক্রমিক বিবর্তন বা পরিবর্তন সহজেই জানিতে পারি। ক্রোমেটিন বেশী রং গ্রহণ করে বলিয়া ইহাকে কোষের অন্যান্য অংশ হইতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

যখন কোষ বিভক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন ইহার কেন্দ্র-কণিকার জাল-বুনটটি অতিরিক্ত মাত্রায় বিভিন্ন হয় এবং কতকগুলি বিভিন্ন কণিকার দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে হয়। এই কণিকাগুলি সাধারণতঃ তন্তু বা দণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট। এই কণিকাগুলিকে বংশসূত্র বা ক্রমোসোম বলা হয়।

একটি বিশেষ জাতীয় প্রাণীর শরীরের কোষগুলিতে (যৌনকোষ ছাড়া) ঠিক একই সংখ্যক ক্রোমোসোম বর্তমান। ক্ষুদ্র ফল-মক্ষিকা ড্রসোফিলার একটি কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা আট, মটর গাছের (Pea) কোষে এই সংখ্যা চৌদ্দ; শস্যে এই সংখ্যা কুড়ি, আবার ক্রে-মাছে (Cray fish) এই সংখ্যা দুই শত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা সর্বদাই জোড় (Even), কখনই বিজোড় (Odd) নহে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি জীবিত কোষেই (কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত) আমরা দুইটি করিয়া ঠিক একই প্রকারের ক্রোমোসোম দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে একটি মাতার এবং অন্যটি পিতার দেহ হইতে আসে। এই যে দুইটির একটি একটি জোড় (যাহা পিতামাতার দেহ হইতে আসে), তাহার মধ্যে জটিল বংশানুক্রমিক গুণাবলী নিহিত থাকে এবং বংশপরম্পরায় তাহা সমস্ত জীবিত প্রাণীতে সংক্রামিত হয়।

কোষ-বিভাজনের ব্যাপারে প্রারম্ভিক ক্রিয়া আরম্ভ করে ক্রোমোসোম। ইহারা প্রত্যেকে ইহাদের দেহকে ঠিক লম্বালম্বিভাবে দ্বিধা বিভক্ত করে। এই দুই অংশ কিন্তু একই প্রকারের হয়, তবে পূর্বদেহ হইতে সরু হয়। কিন্তু কোষটি একক হিসাবে পূর্বের ন্যায় ঠিকই থাকে।

যখন ক্রোমোসোমের বিভাজন ক্রিয়া চলিতে থাকে, ঠিক সেই সময়ে দুইটি বিন্দু (যাহাকে সেন্ট্রোসোম বলা হয়), যাহারা প্রথমতঃ কোষ-প্রাচীরের কাছাকাছি থাকে, তাহারা ক্রমশঃ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া কোষের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়।

৪। কোষ বিভক্ত হইবার সময় তাহার ক্রোমোসোম ও কেন্দ্রকের ক্রমশঃ পরিবর্তন।

কেন্দ্রকের অন্তর্বর্তী ক্রোমোসোমের সহিত এই পৃথক-হওয়া সেন্ট্রোসোমের সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার পাতলা সূত্রের আবির্ভাব হয় বলিয়া মনে হয়। যখন ক্রোমোসোমগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন এক এক অর্ধাংশ এক এক সেন্ট্রোসোমের সহিত যুক্ত হয় এবং উপরিউক্ত সূত্রের সঙ্কোচনের ফলে পরস্পর হইতে দূরে নীত হয়। যখন এই প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসে, তখন কোষের প্রাচীরগুলি একটি মধ্যরেখা বরাবর ভিতর দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। এইভাবে কোষটি আধাআধি বিভক্ত হয় এবং একটি পাতলা প্রাচীর উভয় অর্ধের মধ্যে সৃষ্ট হয়। দুই অর্ধ এইভাবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং দুইটি নূতন কোষের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই দুইটি শিশু কোষ যদি বাহির হইতে উপযুক্ত খাদ্য পায়, তবে তাহারা তাহাদের পূর্বেকার কোষের আকারে পরিণত হয়। কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণের পর এই নূতন কোষগুলি আবার নিজেরা পূর্বপ্রকারে বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল। কিন্তু যে সকল রাসায়নিক বা বস্তুধর্মীয় শক্তি এই প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী তাহার বিষয় এখনও জানা যায় নাই। সামগ্রিকভাবে কোষ এত জটিল যে, ইহার সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ এখনও সম্ভব হয় নাই। এখন আমরা ক্রোমোসোমের প্রকৃতি কিরূপ, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ বহুকোষের দ্বারা গঠিত জটিল শরীরে কিরূপে কোষ-বিভাজন, নূতন সৃষ্টি বা প্রজনন ক্রিয়ার জন্য দায়ী, তাহা বিবেচনা করা যাক। একটি পূর্ণবয়স্ক মানব-শরীর প্রায় এক কোটি কোটি ($১০^{১৪}$) কোষের দ্বারা গঠিত, ইহা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাজনে একটি কোষ দ্বিগুণ হইয়া যায়। মনে করা যাক "ক" বার পরপর বিভাজিত হইয়া একটি পূর্ণবয়স্ক মানব শরীর গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে এইরূপ একটি সমীকরণ পাওয়া গেল :—$২^{ক} = ১০^{১৪}$, অর্থাৎ ক = ৪৭। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, মোটামুটি ৫০ বার বিভাজিত হইয়া একটি ডিম্বকোষ (Egg-cell) হইতে পূর্ণবয়স্ক মানব-শরীর গঠিত হয়।

যদিও শৈশবে প্রাণীদের কোষগুলির দ্রুত বিভাজন হয়, তথাপি একটি পূর্ণবয়স্ক জীবের শরীরের কোষগুলি সাধারণতঃ বিশ্রামের অবস্থায় থাকে এবং কেবল মাত্র মাঝে মাঝে শরীর রক্ষার জন্য এবং সাধারণ ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাজন ক্রিয়া হয়।

আমরা এখন সেই অতি আবশ্যকীয় বিশেষ শ্রেণীর কোষ-বিভাজনের কথা আলোচনা করিব, যাহা দ্বারা তথাকথিত উদ্বাহী-কোষের (Gamete) সৃষ্টি হয়। এই উদ্বাহী-কোষগুলিই প্রজনন ক্রিয়ার জন্য দায়ী।

কোনও জীবিত দ্বিলিঙ্গযুক্ত (Bisexual) শরীরের অতি প্রথম অবস্থায় ইহার কতকগুলি কোষ ভবিষ্যৎ প্রজনন কার্যের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই কোষগুলি প্রজনন সম্বন্ধীয় বিশেষ অঙ্গে অবস্থিত থাকে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কোষগুলির যত সাধারণ বিভাজন হয়, তাহার তুলনায় এই কোষগুলির অনেক কমসংখ্যক সাধারণ বিভাজন ঘটিয়া থাকে। যখন নূতন সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের নিমিত্ত এই কোষগুলির প্রয়োজন হয়, তখন ইহারা সতেজ অবস্থায় থাকে। পূর্ববর্ণিত সাধারণ কোষগুলির যেভাবে বিভাজন হয়, এই প্রজনন সম্বন্ধীয় কোষগুলির বিভাজন তাহা অপেক্ষা অনেক সরল ও পৃথকভাবে হইয়া থাকে। যে সকল ক্রোমোসোমের দ্বারা ইহাদের কেন্দ্রক গঠিত হয়, তাহারা সাধারণ কোষের ন্যায় দুই ভাগে বিভাজিত না হইয়া কেবলমাত্র পরস্পর হইতে টানের দ্বারা পৃথক হইয়া যায়। এই জন্য প্রত্যেক কোষকেন্দ্র প্রথমতঃ কোষে

যতগুলি ক্রোমোসোম ছিল তাহার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম মাত্র পাইয়া থাকে। (৫, ৬, ৭নং চিত্র)।

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কোষ-বিভাজনে ক্রোমোসোমের সংখ্যা কন্যা-কোষে কমিয়া যায় তাহাকে বিশেষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা Meosis বলা হয় এবং যে সাধারণ বিভাজনে কোষ-কন্যায় ক্রোমোসোমের সংখ্যা কম হয় না, তাহাকে সাধারণ বিভাজন বা Mitosis বলা হয়। বিশেষ বিভাজনের দ্বারা উৎপন্ন কোষগুলিকে শুক্রকোষ (Sperm Cell) এবং ডিম্বকোষ (Egg-cell) অথবা পুং এবং স্ত্রী উদ্বাহী-কোষ বলা হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্রোমোসোমগুলি কেবলমাত্র ঠিক একই জাতীয় দুইটি জোড়ে অবস্থান করে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে। একটি বিশেষ ক্রোমোসোমের জোড় আছে, যাহার দুইটি অংশ স্ত্রী-দেহে ঠিক একই রকমের, কিন্তু পুরুষ-দেহে ভিন্ন রকমের। এই বিশেষ ক্রোমসোমকে যৌন-ক্রোমোসোম (Sex chromosome) বলা হয় এবং তাহারা ক ও খ (X & Y) দুই অংশের দ্বারা বিশেষিত হয়। স্ত্রী-দেহের কোষগুলিতে সর্বদাই দুইটি ক ক্রোমোসোম আছে এবং পুরুষদের কোষগুলিতে একটি ক এবং একটি খ ক্রোমোসোম আছে (এই বিষয়ে স্তন্যপায়ী এবং পাখীদের মধ্যে ঠিক উল্টা অর্থাৎ পাখীদের স্ত্রী-দেহে একটি ক ও একটি খ এবং পুরুষদের দুইটিই ক ক্রোমোসোম আছে)। স্ত্রী-দেহের একটি ক ক্রোমোসোমের স্থানে একটি খ ক্রোমোসোম থাকাই হইতেছে স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পার্থক্য।

প্রজনন-প্রক্রিয়ার সময়ে যদি একটি পুং-উদ্বাহীকোষ (শুক্রকোষ) একটি স্ত্রী-উদ্বাহী-কোষের (ডিম্বকোষ) সহিত মিলিত হয়, তবে মিলনের ফলে দুইটি ক অথবা একটি ক ও একটি খ-এর জন্মের সম্ভাবনা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ। প্রথম ক্ষেত্রে ফল হইবে একটি কন্যা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি পুত্রসন্তান।

একটি স্ত্রী-শরীরে সমস্ত সংরক্ষিত প্রজনন-কোষগুলিতে কেবলমাত্র ক ক্রোমোসোম আছে। এই জন্য এইরূপ স্ত্রী-শরীরের একটি কোষ যখন বিশেষ বিভাজন-প্রক্রিয়ায় দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তখন প্রত্যেক অর্ধকোষ বা উদ্বাহী-কোষ (Gamete) একটি ক ক্রোমোসোম প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পুং-প্রজনন-কোষগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক এবং একটি খ ক্রোমোসোম আছে। এই জন্য যখন ইহার একটি কোষ ঐভাবে বিভক্ত হয়, তখন দুইটি উদ্বাহী-কোষের একটিতে ক ক্রোমোসোম এবং আর একটিতে খ ক্রোমোসোম থাকে।

এখন প্রজনন-প্রক্রিয়ার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। যখন পুং-শুক্রকোষ স্ত্রী-ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হয় (যে প্রক্রিয়াকে মিশ্রোদ্বাহী বলা হয়), তখন একটি পূর্ণকোষ গঠিত হয়। এই পূর্ণকোষ সাধারণ বিভাজন-প্রক্রিয়ায় দুই ভাগে ভাগ হইয়া থাকে (পূর্বে বলা হইয়াছে)। এইরূপে গঠিত দুইটি নূতন কোষ কিছু বিশ্রাম সময়ের পরে পুনরায় প্রত্যেকে দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং কোষগুলির সংখ্যা এইভাবে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক কন্যা-কোষ পুং-কোষের দ্বারা নিষিক্ত প্রারম্ভিক ডিম্বকোষের

উভলৈঙ্গিক জীবের প্রজনন-পদ্ধতি।

(Original fertilized egg) যাহার অর্ধেক মাতা হইতে এবং অর্ধেক পিতা হইতে আসে, সমস্ত ক্রোমোসোমগুলির ঠিক ঠিক প্রতিচ্ছবি (Replica) প্রাপ্ত হয়। পুং-কোষ-নিষিক্ত ডিম্বকোষ কিভাবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবয়ব ব্যক্তিতে পরিণত হয়, তাহার কয়েকটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল। (৮নং চিত্র)।

অ চিত্রে একটি স্থির ডিম্বকোষে একটি শুক্রকোষকে ঢুকিতে দেখা যাইতেছে। দুইটি উদ্বাহী-কোষের মিলন হইলে একটি সম্পূর্ণ কোষে নূতন কর্মপ্রেরণা জাগে। সম্পূর্ণ কোষটি তখন প্রথমে দুইটি, পরে চারটি, তৎপরে ৮টি, পরে

ডিম্বকোষের পূর্ণায়বয় লাভ

১৬টি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয় (আ, ই, ঈ, উ চিত্র দ্রষ্টব্য)। যখন বিভিন্ন কোষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া পড়ে, তখন কোষগুলি এমনভাবে তাহাদিগকে সাজাইতে চেষ্টা করে যেন সকলেই উপরিভাগে থাকিতে পারে, যেখান হইতে তাহারা পারিপার্শ্বিক খাদ্যবহুল মাধ্যম হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। ক্রমোন্নতির এই ধাপে দেহকে একটি মাঝে ফাঁপা বুদ্বুদের ন্যায় দেখায়। পরে ফাঁপা জায়গায় দেয়ালটি ঋ চিহ্নিত চিত্রের ন্যায় বাঁকিতে থাকে। আরও পরে ঌ চিহ্নিত চিত্রের ন্যায় হয়। তখন ইহা একটি মুখখোলা থলির ন্যায় দেখায়। ভুক্তদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিবার এবং নূতন খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য এই খোলা হয়। প্রবাল জাতীয় সাদাসিধা প্রাণীরা ক্রমোন্নতির এই ধাপের বেশী অগ্রসর হয় না। তাহাদের অপেক্ষা উন্নত প্রাণী কিন্তু আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হয়। কতকগুলি কোষ হাড়ে এবং কতকগুলি হজম করিবার, নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার এবং শিরা-উপশিরা প্রভৃতি অঙ্গে পরিণত হয়। এইরূপে এ চিহ্নিত চিত্রের ন্যায় ভ্রূণের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরে ইহারা সমজাতীয় প্রাণীর শিশুতে পরিণত হয় (ঐ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ক্রমবর্ধমান কোষের কতকগুলি শৈশব অবস্থাতেই ভবিষ্যতের প্রজনন-ক্রিয়ার জন্য সংরক্ষিত হয়। যখন পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন এই কোষগুলি বিশেষ বিভাজন-প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্বাহী-কোষ প্রস্তুত করে, যাহা প্রথম হইতে উপরিউক্তরূপ প্রক্রিয়াগুলি করিয়া যায় এবং এইভাবে জীবনপ্রবাহ চলিতে থাকে।

বন্ধন-শক্তি ও পরমাণু-কেন্দ্র

শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র

বন্ধন-শক্তির (Binding Energy) সংজ্ঞা হলো, কোন এমন শক্তি যা নিউট্রন ও প্রোটিয়াম ($_1H^1$) সহযোগে নতুন এক পরমাণু-কেন্দ্র সৃষ্টি হবার সময় নির্গত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন পরমাণু-কেন্দ্রকে ভেঙ্গে তাথেকে নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে আলাদা করবার জন্যে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তার নাম বন্ধন-শক্তি। কোন বিশেষ পরমাণু-কেন্দ্রের বন্ধন-শক্তির বিষয় জানতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হলো, প্রতিটি কণায় (নিউট্রন ও প্রোটন) কতটা পরিমাণ এই শক্তি রয়েছে, তা জানা এবং তা জানতে হলে মোট বন্ধন-শক্তির পরিমাণকে কেন্দ্রে অবস্থিত নিউট্রন ও প্রোটন কণার মোট সংখ্যার দ্বারা ভাগ করতে হবে। সুতরাং কণা-প্রতি এই শক্তিকে $\frac{E_B}{A}$ এইভাবে লেখা যায়। এখানে E_B হলো মোট বন্ধন-শক্তি এবং A হলো নিউট্রন ও প্রোটনের মোট সংখ্যা।

এখন প্রশ্ন হলো, এই শক্তিকে জানবার উপায় কি? একটা পদ্ধতি হচ্ছে—যে সব পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় দুটি কেন্দ্র জোড়া লেগে একটা নতুন পরমাণু-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে এই রূপান্তরে (Transformation) যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তা মাপা এবং তাকে ঐ সৃষ্ট পরমাণু-কেন্দ্রের নিউট্রন ও প্রোটনের মোট সংখ্যার দ্বারা ভাগ করা। যেমন—সবচেয়ে একটা সোজা উদাহরণ ধরা যাক—একটা হাইড্রোজেন পরমাণু যখন একটা নিউট্রন কণাকে নিয়ে ডয়টেরিয়াম নামক নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তখন তাথেকে ২.২২৬ মি. ই. ভো. শক্তির গামা ফটোন নির্গত হয়। তাহলে সংজ্ঞা অনুযায়ী ডয়টেরিয়ামের বন্ধন-শক্তি ২.২২৬ মি. ই. ভো এবং এর কণাপ্রতি বন্ধন-শক্তির পরিমাণ ১.১১৩ মি. ই ভো.। কণাপ্রতি বন্ধন-শক্তি এবং পারমাণবিক ভরের একটা লেখচিত্র দেখানো হলো।

লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে কোবাল্ট (৫৯-৬০) সবচেয়ে বেশী বন্ধন-শক্তিযুক্ত (৮.৮ মি. ই ভো.), অর্থাৎ কোবাল্টের স্থায়িত্ব মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। হাল্কা পদার্থের মধ্যে হিলিয়ামের স্থায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। হিলিয়াম-কেন্দ্রে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে, যাদের মোট ভর হিসাব করলে দেখা যায়—

$$\left.\begin{array}{ll}\text{প্রোটন} & ২ \times ১.০০৭৫৯ \\ \text{নিউট্রন} & ২ \times ১.০০৮৯৮\end{array}\right\} = ৪.০৩৩১$$

কিন্তু হিলিয়াম-কেন্দ্রের আসল ভর হলো ৪.০০২৮, কাজেই ৪.০৩৩১-৪.০০২৮ = ০.০৩০৩ পরিমাণ পদার্থ হিলিয়াম-কেন্দ্রে শক্তি রূপে অবস্থান করছে। আইনষ্টাইনের পদার্থ-শক্তি সূত্র অনুসারে এই শক্তির পরিমাণ ২৮.২ মি. ই. ভো। এই শক্তিই হিলিয়ামের কেন্দ্রকে এত শক্তভাবে বেঁধে রাখতে সহায়তা করছে।

বন্ধন-শক্তির স্বরূপ জানতে হলে দেখতে হবে যে, সত্যিই কম বন্ধন শক্তিবিশিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে জোড়া লাগিয়ে বেশী বন্ধন-শক্তিসম্পন্ন পরমাণু-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করলে শক্তি নির্গত হয় কিনা। পরীক্ষার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং দেখা গেছে, শুধু যে শক্তি নির্গত হয় তাই নয়, সেই শক্তির পরিমাণ গাণিতিক হিসাবে লুপ্ত

পদার্থের (Mass defect) সমতুল্য (আইনষ্টাইন—$E=mc^2$)। পরমাণু-বিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়ার নাম সংযোজন (Fusion)। আধুনিক মারণাস্ত্র হাইড্রোজেন বোমায় এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম-কেন্দ্র সংযোজিত করে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। এই রূপান্তরের ফলে নির্গত বিরাট শক্তিই মারণাস্ত্রের সংহার ক্ষমতার উৎস। আশঙ্কার কিছু নেই, কারণ গণনা করে দেখা গেছে, এরূপ হতে এখনো কয়েক শত বিলিয়ন বছর সময় লাগবে।

কণাপ্রতি বন্ধন-শক্তির উপরই যদি পদার্থের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে পারমাণবিক ভর ৬০ এবং তার কাছাকাছি, এরূপ পদার্থগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশী স্থায়ী। এখন কথা হলো, অন্য সব

লেখচিত্র।
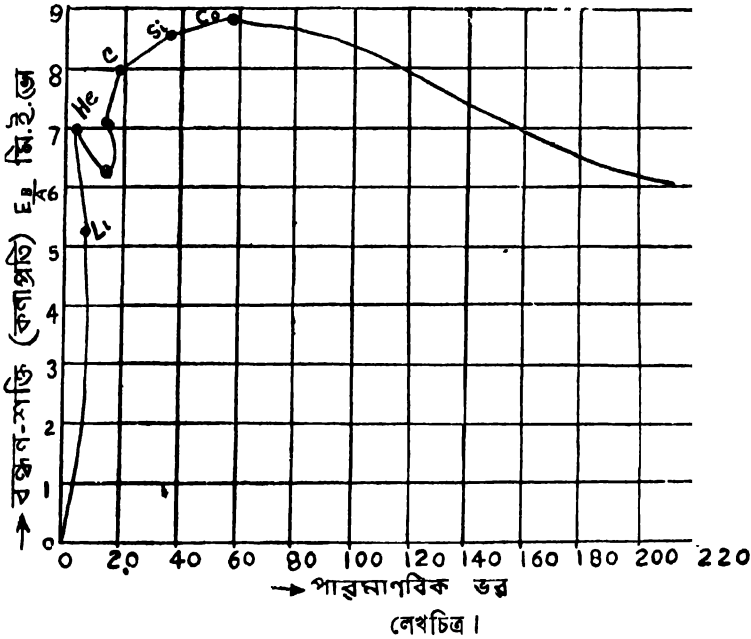
সূর্যে এই রকম সংযোজন প্রতিনিয়ত ঘটছে। সূর্যের বিপুল হাইড্রোজেনরাশি ক্রমাগত সংযোজিত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই সংযোজন প্রক্রিয়াই সৌরশক্তির মূল উৎস। এরই জন্যে সূর্য এক ভীষণ জলন্ত অগ্নিকুণ্ড, যা থেকে নির্গত তাপ ও আলোকই আমাদের প্রাণের উৎস। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই ধারণা পোষণ করেন যে, একদিন সূর্যের হাইড্রোজেন সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবে এবং তখন সূর্য নিবে গিয়ে এক বিরাট অন্ধকারে ডুবে যাবে। তবে

মৌলিক পদার্থগুলি সংযোজিত বা বিভাজিত হয়ে স্থায়ী পদার্থ কোবাল্ট-৬০-এ রূপান্তরিত হচ্ছে না কেন? তার পথে অনেক বাধা রয়েছে। প্রথম অসুবিধা হলো—কেন্দ্র সব সময় কক্ষপথে ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনের দ্বারা সুরক্ষিত, যার ফলে কেন্দ্রগুলি কাছাকাছি এসে সংযোজিত হবার সুযোগ পায় না। আমরা জানি, কেন্দ্রের আয়তন অপেক্ষা পরমাণুর আয়তন প্রায় ১০^{৪} গুণ বেশী। কাজেই দুটি কেন্দ্রের মধ্যে সব সময় এক বিরাট দূরত্ব বজায় থাকে। তাছাড়া এদের ধাক্কা লাগবার সম্ভাব্যতাও খুব কম।

ভারী পদার্থগুলির মধ্যে অর্থাৎ যাদের বন্ধন-শক্তি খুব কম, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিভাজন (Fission) হবার সম্ভাবনা কিছুটা বেশী। কিন্তু তার জন্যেও কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন—যা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় অসুবিধা হলো স্বাভাবিক সংযোজন হবার জন্যে দুটি পরমাণুকে যে পরিমাণ গতিশক্তি সংগ্রহ করতে হয়, তা পার্থিব আবহাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ১৫×১০^{৭} ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় (সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা) পরমাণুর যে গতি-বেগ সৃষ্টি হয়, সেই গতিবেগে পরস্পর ধাক্কা লাগলে সংযোজন হওয়া সম্ভব হতো। এত বেশী তাপমাত্রা পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা নেই। ভাগ্যক্রমে সংযোজন বা বিভাজন—কোন প্রক্রিয়াই স্বাভাবিকভাবে চলবার মত অবস্থা পৃথিবীতে নেই। আর নেই বলেই রক্ষা! তা না হলে এতদিন পৃথিবীটা শুধু একটা জড় পদার্থরূপেই বিরাজ করতো এবং তাতে একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ থাকতো, তা হলো কোবাল্ট। মানুষ, পশু, পক্ষী, জল, বাতাস, গাছপালা—এসব বাদ দিয়ে সেই কোবাল্টের ডেলাটাকে কল্পনা করা যায় কি?

সঞ্চয়ন

গভীর সমুদ্রে নতুন ধরণের টেলিফোনের তার

আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের এক পার থেকে আর এক পারে কথাবার্তা চালাবার পক্ষে ঐ মহাসাগরগুলির ব্যবধান আর দুস্তর নয়। গভীর সমুদ্রের তলায় এক নতুন ধরণের টেলি-ফোনের তার (ক্যাবল) স্থাপনের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হবার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একজন আর একজনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করতে পারেন। এই নতুন ধরণের তার ঐ মহাসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের মধ্যে সেতু রচনা করেছে।

আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে ব্যবধান দশ হাজার মাইলের মত। সমুদ্রতলের এই নতুন ধরণের টেলিফোন ক্যাবলের সাহায্যে এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবার আগে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে কথাবার্তা চলতো বেতারের মাধ্যমে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জনসন জাপানের প্রধান মন্ত্রী ইকেদার সঙ্গে আলাপ করে দুই দেশের মধ্যে এই নতুন টেলিফোন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। আমরা একই সহরে বসে টেলিফোনে যেমন কথাবার্তা বলি, ঠিক তেমনি হাজার হাজার মাইল দূরের দুই দেশের মধ্যেও এই ব্যবস্থায় কথাবার্তা বলা যায়।

আমেরিকার সঙ্গে জাপানের টেলিফোনে এই ঐতিহাসিক যোগাযোগ স্থাপিত হবার পর লণ্ডনের টেলিফোন অফিসের জনৈক কর্মচারীও টোকিওর জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করেন—বেতারে নয়, এই নতুন টেলিফোন ব্যবস্থার মাধ্যমেই। তবে লণ্ডনের ঐ কর্মচারীটি টেলি-ফোনের যে পথে আলাপ চালান, সেই পথটি গিয়েছে ইংল্যাণ্ডের কর্নওয়াল থেকে আমেরিকার নিউজার্সির টাকারটনে। তারপর সে পথ আমে-রিকার স্থলপথ দিয়ে ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলা দিয়ে জাপানে গিয়ে পৌঁচেছে। ইংল্যাণ্ড ও

আমেরিকার মধ্যে এই নতুন টেলিফোনের লাইনটি স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে।

তবে ক্যানাডার সঙ্গে ইউরোপের সমুদ্রতলের বৈদ্যুতিক তার বা ক্যাবলের মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে ১৯৫৬ সাল থেকেই। ঐ পথেই আমেরিকার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের কথাবার্তা চলতো। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এই নতুন ধরণের তার বা ক্যাবলের মাধ্যমে এই প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

বহুকালের গবেষণার ফলেই এই নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থায় একটি তারের মাধ্যমে ১২৮ জনের সঙ্গে একই সময়ে কথাবার্তার আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

আর পুরনো ব্যবস্থায় একটির মাধ্যমে কথা বলা হয়, আর একটিতে আসে উত্তর। এতে দুটি তার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঐ ব্যবস্থায় ৪৮ জনের সঙ্গে একই সময়ে কথা বলা যায়। সম্প্রতি নতুন আর একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এতে একই সময়ে কথাবার্তা বলা যায় ৮৫ জনের সঙ্গে।

সমুদ্রের তলায় এই টেলিফোনের তার বসাবার জন্যে লংলাইন্‌স্ নামে সতেরো হাজার টনের একটি নতুন ধরণের জাহাজ তৈরি করা হয়েছে। এতে অন্যান্য নানা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের মধ্যে আছে সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের যন্ত্রপাতি, তারগুলির জোড়া পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে যন্ত্রপাতি এবং ঘণ্টায় আট মাইল গতিতে ভ্রমণকালে রীলে গুটানো টেলিফোনের তার খোলবার শক্তিশালী যন্ত্র।

এই জাহাজের সাহায্যে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত-মহাসাগরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে এই জাহাজটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড এবং হাওয়াই দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রতলে তার বসাবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এর পরে এর সাহায্যে গুয়াম ও ফিলিপাইন্‌সের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। হাওয়াই ও আমেরিকার মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগ এর আগেও ছিল। এবার আর একটি তার বসানো হচ্ছে।

সমুদ্রের তলায় বৈদ্যুতিক তার বসিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ করবার সুবিধা অনেক। বেতারে বার্তা প্রেরণের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বার্তা প্রেরণের উপর অনেক বেশী নির্ভর করা যায়। কারণ আবহমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটলে অথবা আবহমণ্ডলের অবস্থা খারাপ থাকলে বেতার-বার্তা বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, বার্তা প্রেরণ সম্ভব হয় না। বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না।

বিশ্বের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানাবিধ কাজকর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর সর্বত্র জীবনযাত্রার গতি ত্বরান্বিত হবার ফলে আজ বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

সার বার্ণার্ড লভেল ও রেডিও-টেলিস্কোপ

মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধি অনুসরণে রেডিও-টেলিস্কোপ যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে, জডরেল ব্যাঙ্ক এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনের ডিরেক্টর এবং বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপের নিয়ামক সার বার্ণার্ড লভেলের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সিডনি হল্যাণ্ডস্-এর লেখা উদ্ধৃত করা হলো।

শান্ত ছোট্ট মানুষটি এক পুষ্প প্রদর্শনীতে এগিয়ে এসে করমর্দন করে মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেলেন তাঁর পুরস্কারটি হাতে করে। তাঁর নিজের বাগানের গুজবেরির জন্যে তিনি এই পুরস্কার লাভ করলেন। স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় বিজয়ীদের তালিকায় তাঁর নাম বের হলো।

কয়েক দিন পরে এই শান্ত মানুষটির নাম আবার খবরের কাগজে দেখা গেল। কিন্তু এবার হলো সারা বিশ্বের খবরের কাগজগুলিতে। একটার পর একটা কাহিনী বের হতে লাগলো এবং প্রত্যেকটি কাহিনীর সুরুতে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে এলো—সার বার্ণার্ড লভেল বলেছেন···।

জড্রেল ব্যাঙ্ক এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেশনের ডিরেক্টর এবং বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপের নিয়ামক হিসাবে লভেল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতার ঠিক কেন্দ্রস্থলে।

প্রতিটি নতুন স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপ-গ্রহের—তা সে আমেরিকারই হোক, কি রাশিয়ারই হোক—অগ্রগমনের বিবরণ এসেছে জড্রেল ব্যাঙ্ক থেকে। পরে কৃত্রিম উপগ্রহকে অনুসরণ করা যখন কঠিন হয়েছে—তার মধ্যে অবস্থিত রেডিও যখন আর কাজ করে যেতে পারে নি—তখন সার বার্ণার্ড তাঁর অতিকায় টেলিস্কোপটির সাহায্যে ঠিক পথে উপগ্রহটিকে অনুসরণ করেছেন, যা আর কোন ব্যবস্থাতেই সম্ভব হয় নি।

নক্ষত্র নিয়ে এবং মহাকাশে অভিযানের বিষয় নিয়ে মানুষ আজ অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এই কারণেই ৫০ বছর বয়স্ক সার বার্ণার্ড লভেলের উপর আজ সকলেরই দৃষ্টি। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং রেডিও সকলেই সার বার্ণার্ডের শরণ নেন, যখনই তাঁরা মহাকাশ অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন।

কিন্তু বরাবরই যে তাঁর এই অবস্থা ছিল, তা নয়। সার বার্ণার্ড গ্লষ্টারশায়ার কাউন্টির ওল্‌ডল্যাণ্ড কমন নামে এক শান্ত ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জর্জ লভেল গ্রামের পেট্রোল ষ্টেশন এবং রেডিও মেরামতির ব্যবসা চালাতেন। রবিবারের দিনগুলিতে তিনি প্রচারকের কাজ করতেন।

প্রগতিবাদী জর্জ লভেল বিশেষ নজর রাখতেন, তাঁর ছোট ছেলে আলফ্রেড চার্লস বার্ণার্ডের উপর, যাতে সে ঠিকমত পড়াশুনা করে যেতে পারে। ১৯৩৩ সালে যখন বার্ণার্ড ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন, সেদিন সত্যই তাঁর কাছে ছিল গর্বের দিন।

১৯৩৭ সালের মধ্যে তরুণ বার্ণার্ড—ইতিমধ্যে গবেষণামূলক কাজকর্মে যাঁর বিশেস ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে—ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্যে ডক্টর অব ফিলজফি ডিগ্রি লাভ করলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ইতিমধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু দু'বছর পরে তাঁর কাজে বাধা পড়ে। বৃটেন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় লভেলকেও অন্য বিজ্ঞানীদের মত নানা ধরণের গুপ্ত বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতে হয়। তিনি রেডার উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজের জন্যে টেলি-কমিউনিকেশন্স রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্টে যোগ-দান করেন।

যুদ্ধের সময় লভেল মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা, নেভিগেশনের জন্যে রেডার টেলিভিশন এবং মাইক্রোওয়েভ উপকরণ—যা শত্রুর জাহাজ এবং বিমানের অবস্থান আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে—উদ্ভাবনে সাহায্য করেন।

যুদ্ধ শেষ হলে লভেল পুনরায় ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং মহাজাগতিক রশ্মি

সম্পর্কে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। কিন্তু এইবার তিনি নতুন দিকে কাজ আরম্ভ করলেন, রেডার সম্পর্কে তাঁর যুদ্ধকালীন জ্ঞান প্রয়োগ করে।

তিনি ব্যবহার করেছিলেন পরিবর্তিত সেনা-বিভাগীয় রেডার উপকরণ ও একটি সেকেলে রেডিও-টেলিস্কোপ এবং সেটি নিয়ে কাজ করে খুব ভাল ফল পেতে লাগলেন।

পরীক্ষার ক্ষেত্র একটু ব্যাপক হলে লভেল বুঝতে পারলেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে তাঁর সরঞ্জামকে ঘিরে যে বৈদ্যুতিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা তাঁর কাজের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি চলে গেলেন মাঠে এবং সেখানে গিয়ে বসালেন তাঁর সব যন্ত্রপাতি। এই মাঠটির নামই এখন জড্রেল ব্যাঙ্ক।

ক্রমে ক্রমে লভেল আরও অনেক সব সরঞ্জাম নিয়ে এলেন—তাঁর একটি সরঞ্জাম হলো, ২৮০ ফুট ব্যাসের একটি অনড় রেডিও-টেলিস্কোপ। এই উপকরণটি ব্যবহার করে তিনি নক্ষত্র এবং ছায়াপথ থেকে মহাজাগতিক রশ্মির বিচ্ছুরণ সম্পর্কে অনেক নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করলেন।

১৯৫১ সালে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের স্বীকৃতি হিসাবে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাষ্ট্রোনমির অধ্যাপক এবং জড্রেল ব্যাঙ্ক লেবরেটরির ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন।

লভেল তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর প্রধান টেলিস্কোপ যন্ত্রটি অনড় হওয়ায় পর্যবেক্ষণের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আর একটি বড় টেলিস্কোপ নির্মাণের জন্যে অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হলেন। টেলিস্কোপটিকে চলমান করা হবে স্থির হলো।

১৯৫৩ সালের মধ্যে তিনি এই টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। সেটিই আজ বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ। ১৯৫৭ সালের মধ্যে ২৫০ ফুট ব্যাসের একটি অতিকায় টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়, এটির ওজন হলো ২,০০০ টন। এটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৭০০,০০০ পাউণ্ড। টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্যে কিছুটা তাড়াহুড়া করা হয়। কারণ লভেল চাইলেন আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে পর্যবেক্ষণের কাজে তিনি যেন এই নতুন টেলি-স্কোপটি ব্যবহার করতে পারেন। কাজটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সাধারণের কাছে তার মূল্য রইলো রহস্যে আবৃত।

এই রহস্য এক নিমেষে দূর হয়ে গেল ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে, যেদিন রাশিয়া প্রথম তার স্পুটনিকটি মহাকাশে নিক্ষেপ করলো। লভেলের নির্মিত অতিকায় টেলিস্কোপটি কৃত্রিম উপগ্রহটিকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে গেল, যদিও তার উৎক্ষেপক যন্ত্রটি সংযোগ রক্ষা করে যেতে ব্যর্থ হলো।

রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই জড্রেল ব্যাঙ্ক অবজারভেটরির মূল্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে—লভেল কৃত্রিম উপগ্রহের যাত্রাপথ অনুসরণের কাজে কতটা মূলবান সাহায্য দিতে পেরেছেন।

লভেল এরপর আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন—সমগ্র বৈজ্ঞানিক বিশ্ব এখন বুঝতে পেরেছে, আমাদের এই অনন্যসাধারণ যন্ত্রটির গুরুত্ব কতখানি। মহাকাশের ব্যাপারে বৃটেনের এটি এক মস্ত বড় অবদান।

লভেলের জীবন এখন ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। তিনি ভ্রমণ করেছেন ব্যাপকভাবে, বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে এবং রাশিয়ায়। কিন্তু এখন তিনি তাঁর টেলিস্কোপ নিয়ে আরও বেশী কাজ করবার জন্যে আরও বেশী সময় চান বলেই মনে হয়।

সঞ্চরমান মহাদেশসমূহ

ভারত এক সময়ে দক্ষিণ মেরুর কাছে ছিল। ভূমণ্ডলের মানচিত্র যাঁরা মনযোগ দিয়ে অনুশীলন করেন, তাঁরাই একটা ব্যাপার দেখে চমৎকৃত হন যে, কতকগুলি মহাদেশ অদ্ভুতভাবে একটা আর একটার সঙ্গে জুড়ে যায়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তরেখার সঙ্গে এই অদ্ভুত মিল খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় এবং দেখে মনে হয় যে, এই দুটি দেশ এক সময়ে হয়তো যুক্ত ছিল। জার্মান ভৌগলিক এবং পর্যটক অ্যালফ্রেড ওয়েগেনার প্রায় ৩০ বছর পূর্বে এই সাদৃশ্য সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্দেশ করেন। সঞ্চরমান মহাদেশের বিখ্যাত সূত্রটি তিনিই আবিষ্কার করেন। এই সূত্র অনুযায়ী ৩০ কোটি বছর পূর্বে সমস্ত মহাদেশগুলি এক সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওয়েগেনার এই সংযুক্ত মহাদেশের নাম দেন 'প্যাঞ্জিয়া' (গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হলো সমগ্র স্থলভাগ)। এছাড়া পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ ছিল মহাসমুদ্র। এই সংযুক্ত স্থলভাগ প্যাঞ্জিয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গিয়ে আমাদের বর্তমান মহাদেশগুলির সৃষ্টি করেছে। জলের জাহাজের মত এই মহাদেশগুলি ভূপৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থের উপর একে অন্যের কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। সিলিকন ডাইঅক্সাইডের অভাবের জন্যে পৃথিবীর উপরিভাগের পদার্থ ভারী বা ঘন হয়ে যায়। এর ফলে মহাদেশগুলি এখনও সঞ্চরণশীল। ওয়েগেনার বলেছিলেন যে, উত্তর আমেরিকা ইউরোপ থেকে বছরে এক ফুট করে সরে যাচ্ছে এবং গ্রীনল্যাণ্ড এর চেয়ে দ্রুতগতিতে অর্থাৎ বছরে ১০ ফুট করে সরে যাচ্ছে।

ঐ সময়ে এই সূত্রটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সূত্রটির আবিষ্কারকের অকাল মৃত্যুর ফলে এবং বৈজ্ঞানিক নানারকম বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করবার ফলে এটি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিম জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক এইচ. জি. ওয়াণ্ডারলিচ বলেন যে, নতুন নতুন গবেষণার ফলে এই প্রাচীন সূত্রটি আবার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তবে ওয়েগেনারের সূত্রটি বর্তমানে কিছুটা সংশোধিত আকারে গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি ওয়েগেনার যতটা ভেবেছিলেন, তার চেয়ে অনেক কম গতিতে মহাদেশগুলি সরে যাচ্ছে। কয়েক লক্ষ বছরে মহাদেশগুলি একে অপরের কাছ থেকে বছরে এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ গতিতে সরে যাচ্ছে।

জার্মান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানে ওয়েগেনারের সূত্রটি নতুন করে আবার উজ্জীবিত করছেন। গত কয়েক বছরে বিশ্বের নানা স্থানে যে পেলিওম্যাগ্‌নেটিক পরিমাপ নেওয়া হয়, সেগুলি এই সূত্রটির সমর্থনসূচক। এই রকম পরিমাপ দিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমান চৌম্বক শক্তি অনুযায়ী ধাতুসমূহের প্রাচীন চৌম্বক শক্তির মাত্রা নির্ণয় করতে পারেন। তার অর্থ হলো, চৌম্বক মেরু এবং পৃথিবীর ভৌগলিক মেরু উভয়েই অতি প্রাচীনকাল থেকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ভ্রমণ করেছে। মেরুর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি মহাদেশগুলিও ভূমণ্ডলের উপরিভাগে যথেষ্ট স্থান পরিবর্তন করেছে। আর একজন জার্মান ভূতাত্ত্বিক ডাঃ আর. পি. ফ্লাগ বলেন যে, ভূত্বকের গঠনভঙ্গী পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্য এত বেশী যে, এই দুটি মহাদেশ প্রাচীনকালে পরস্পর সংলগ্ন ছিল—একথা বলা যায়।

কয়েক বছর পূর্বে ভূমণ্ডলীয় আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে যে ফল পাওয়া গেছে, তা আরও বিস্ময়কর। দক্ষিণ

ভাগের মহাদেশগুলিতে, বিশেষ করে ভারতে তুষার যুগের চিহ্নাদি এই পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। তুষার যুগের এই সব চিহ্ন এই সব মহাদেশের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে খাপ খায় না। মহাদেশগুলির বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী তৈরি পেলিওআবহাওয়ামূলক মানচিত্রে দেখা যায় যে, বিষুবরেখার উত্তর ভাগে হলো গ্রীষ্মমণ্ডল এবং বর্তমান বিষুবরেখার চারদিকে তুষারমণ্ডল। কিন্তু ভারত ও দক্ষিণ ভাগের মহাদেশগুলির তুষারের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করে সহজেই বলা যায় যে, প্রায় ২৫ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর এই অংশগুলি দক্ষিণ মেরুর কাছে অবস্থিত ছিল।

ঐ সময়ে বর্তমানের ভূমধ্যসাগর পূর্বদিকে বিপুলভাবে বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমানের ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যে আরব উপদ্বীপ বর্তমানে এই দুটি সাগরকে বিভক্ত করছে, তা আফ্রিকার পূর্বভাগের সংঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এটি উত্তর দিকে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এশিয়া মাইনরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করেছে। পেলিওলজিষ্টগণ এই প্রাচীন বিপুলাকার ভূমধ্যসাগরকে "থেটিস" নামে অভিহিত করেন। ঐ সময়ে ভারত ছিল দক্ষিণ মেরুর বেশ কাছাকাছি। দক্ষিণমেরু বা অ্যান্টার্কটিকায় এখনও সুপ্রাচীন সংযুক্ত মহাদেশের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ভারত উপমহাদেশও আস্তে আস্তে উত্তর দিকে সরে গিয়ে এশিয়ার দক্ষিণভাগে বর্তমান স্থানে অবস্থিত হয়। এই সঞ্চরণের সময় ভারত তার তুষার প্রভাবিত আবহাওয়া হারিয়ে ফেলে এবং বর্তমানের গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে পরিণত হয়।

মহাদেশগুলি কেন এই রকমভাবে সরে যাচ্ছে? ওয়েগেনার বলেছেন—যে শক্তি বিরাট পর্বতমালা তৈরি করে, সেই শক্তিই মহাদেশগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর উপরিভাগ এক জায়গায় নীচু হয়ে অন্য জায়গায় উঁচু হয়ে ওঠে, সেই পদ্ধতিতেই এটা ঘটে থাকে। অধ্যাপক ওয়াণ্ডারলিচের মতে, পৃথিবীর বহিরাবরণের নীচে বহির্বর্তুল যে স্রোত আছে, সেগুলিই পর্বত গঠনের মূলে রয়েছে এবং এর উপরেই পর্বত গঠনের আধুনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। তবে ওয়েগেনারও অবশ্য এই বহির্বর্তুল স্রোতগুলিকেই মহাদেশগুলির সঞ্চরণশীলতার সম্ভাব্য কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তাপের ফলে বস্তুর মধ্যে যে গতি আসে, তাকেই বহির্বর্তুল স্রোত বলা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, আমরা যখন জল গরম করি, তখন তা বেড়ে উপরের দিকে ওঠে এবং উত্তাপ কমে যাবার পর তা আবার নেমে যায়। আধুনিক কেন্দ্রীভূত উত্তাপের সূত্রের মূল কথাও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জল তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ বহন করে বলে এর নাম বহির্বর্তুল স্রোত। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগেও রাসায়নিক বা পারমাণবিক পরিবর্তনের ফলে স্থানীয়ভাবে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং তা মহাদেশীয় আকারে বহির্বর্তুল স্রোতের সৃষ্টি করে। এই স্রোতের ফলেই মহাদেশগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরতে থাকে। যেখানে এই রকম দুটি স্রোত একসঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে এগুলি পৃথিবীর বহিরাবরণকে উপরের দিকে ঠেলে দেয় এবং পর্বতের সৃষ্টি করে। যেখানে দুটি স্রোত পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানে মহা-

দেশগুলিও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই রকম বিচ্ছিন্ন অংশগুলিই আগ্নেয়গিরি দিয়ে চিহ্নিত এবং সেই জায়গাগুলির অস্থায়িত্বের প্রতীক।

অধ্যাপক ওয়াণ্ডারলিচ বলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের তরল পদার্থের গতিকেই এই স্রোত বলা যায়। অনেক কঠিন পদার্থ যেমন স্থান পরিবর্তন করে, তেমনি পৃথিবীর বহির্ভাগের কঠিন পদার্থ অত্যন্ত ধীর গতিতে হলেও ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা ফ্লিওলজিতে এই ব্যাপারটি আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীর বহিরাবরণের বিভিন্ন ভাগ বছরে এক ইঞ্চির ২৫০ ভাগের এক ভাগ থেকে ০'৪ ইঞ্চি পর্যন্ত গতিতে সরে যাচ্ছে। এর ফলে মহাদেশগুলির সঞ্চরণশীলতার গতি বছরে মোটামুটি প্রায় এক ইঞ্চির এক-ষষ্ঠাংশে দাঁড়ায়। ৬০ থেকে ১২০ মাইল গভীরতায় "অ্যাসথেনোস্ফিয়ার" এমন স্রোতের সৃষ্টি করে, যা পৃথিবীর বহিরাবরণের কোন কোন জায়গা সরিয়ে দেয়। কিন্তু ৬০০ থেকে ২০০০ মাইল গভীরতায় বস্তুর সঞ্চরণশীলতা সমগ্র মহাদেশগুলিকে সরিয়ে দেয়। এই দুইয়ের মধ্যভাগের স্তরগুলি বেশী কঠিন এবং বহিরাবরণের সঞ্চরণশীলতার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মহাসমুদ্রের তলদেশের পাতলা আস্তরণের মত মহাদেশগুলিও বিপুল আকারের একখণ্ড মোজেইক বস্তুর মত একে অপরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বা পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে অথবা একে অপরের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

কান্না স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল

চোখের জল নানারকমের অসুখ ধুয়ে দেয়। চোখের জল বিশ্লেষণ করে তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করা যায়, চোখে জল এলে অনেক সময় বেশ আরাম পাওয়া যায়। চোখের জল বিপুল কোন দুঃখ সইতে সাহায্য করে, দর দর ধারায় চোখের জল বয়ে যাবার পর মনে প্রশান্তি আসে। কিন্তু পশ্চিম জার্মেনীর চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, চোখের জল রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলবার পক্ষেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাজেই চোখের জলকে ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশের একটা অপ্রয়োজনীয় নিদর্শন বলে অনেকের যে বিশ্বাস আছে, তা যুক্তিসঙ্গত নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অশ্রু কেবল ভাবাবেগের তীব্রতাই হ্রাস করে না, দেহের অনেক বিষও অশ্রুজলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তবে বিষগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও জানা যায় নি।

জীবিত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই সত্যিকারের অশ্রুবর্ষণ করে কাঁদতে পারে। প্রায়ই বলা হয় যে, কুকুর কাঁদতে পারে, কিন্তু তা সত্যি নয়। এমন কি, বহু কথিত কুম্ভীরাশ্রুকেও সত্যি বলা যায় না, কারণ কুমীরও কাঁদতে পারে না। "কুম্ভীরাশ্রু" প্রকৃতপক্ষে মানুষই বিসর্জন

করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাময়িক পত্রে চোখের জল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠে উৎসাহিত হয়ে ষ্টুটগার্টের একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক অশ্রুর বিষয়টি নিয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করেন। তাঁর এবং তাঁর আমেরিকান সহকর্মীগণের এই অনুসন্ধান, 'ভাবাবেগের এই ভালভ্' সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন কতকগুলি তথ্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে।

প্রকৃতপক্ষে অশ্রু জিনিষটা কি? আভিধানিক অর্থে এটা হলো অশ্রুগ্রন্থির নিঃসরণ এবং হাল্কা দ্রাবকের সংমিশ্রণ। চোখের জলের গবেষকগণ দেখেছেন যে, এই তরল পদার্থে এগুলি ছাড়াও শর্করা, প্রোটিন এবং রোগ-প্রতিষেধক এন-জাইম আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অশ্রুর উপাদান বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, স্বাভাবিক অশ্রু আর পেঁয়াজ কাটবার সময়ে চোখের জল বা ধোঁয়ার সময়ের চোখের জলের রাসায়নিক উপাদান বিভিন্ন রকমের আবার নারীর কান্নার চোখের জল পুরুষের চোখের জলের চেয়ে ভিন্ন।

দেহসঞ্জাত যে বিষ চোখের জল ধুয়ে নিয়ে যায়, সেই বিষ দেহে কি রকমভাবে তৈরি হয়—সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখনও জানা যায় নি। কিন্তু এগুলি যে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়, তাতে সন্দেহ নেই এবং অত্যধিক কোন ভাবাবেগ হলে এগুলি দেহের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এই বিষের প্রতিক্রিয়া হয় অশ্রু উপশিরার উপর; ফলে অশ্রু-গ্রন্থিতে সঞ্চিত জল ছাড়া পেয়ে যায় এবং বিষও জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। যাঁরা কামলা বা পাণ্ডুরোগে ভোগেন, তাঁদের চোখের জল সত্য সত্যই হলদে রঙের হয়। চোখের জলের রাসায়নিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব কিনা, চিকিৎসকগণ এখন তাই পরীক্ষা করে দেখছেন।

তবে অশ্রু সম্পর্কে গবেষণা এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নি। ষ্টুটগার্টের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁরা শীঘ্রই অশ্রু-বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি অনেক রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।

বিজ্ঞানী অ্যাপল্‌টন

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ভিক্টর অ্যাপলটন গত ২২শে এপ্রিল (১৯৬৫) এডিনবরায় নিজের বাড়ীতে পরলোক-গমন করেছেন। অ্যাপল্‌টন-স্তর আবিষ্কারের জন্যে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অ্যাপল্‌টন।

১৮৯২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ব্র্যাডফোর্ডে অ্যাপল্‌টন জন্মগ্রহণ করেন। হ্যান্সন গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করবার পর তিনি কেম্বিজের সেন্ট জন্স কলেজে ভর্তি হন। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপস ডিগ্রীর প্রথম ভাগের পরীক্ষা দেন ১৯১৩ সালে। পদার্থ-বিজ্ঞানে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় পরীক্ষা দেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালে তিনি উইন্টশায়ার পুরস্কার এবং ১৯১৪ সালে হাচিংশন বৃত্তি লাভ

করেন। তিনি জে. জে. টমসন এবং লর্ড রাদারফোর্ডের ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার ফলে তাঁকে ইয়র্কশায়ার সেনাদলে যোগদান করতে হয়। পরে তিনি ইঞ্জিনিয়ারের পদে বদলী হয়েছিলেন।

যুদ্ধের অবসানে তিনি কেম্ব্রিজে ফিরে আসেন এবং ১৯২০ সালে ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী প্রদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। দু-বছর বাদে তিনি আবার সালের শেষের দিক থেকে তিনি বেতার-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে একটি আয়ন স্তরের সন্ধান পান। তাঁর নামানুসারে এটিকে অ্যাপলটন স্তর বলা হয়। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি এস-সি ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন ১৯২৭ সালে। পরে সোসাইটি তাঁকে হিউজেস এবং রয়্যাল পদক প্রদান করেন।
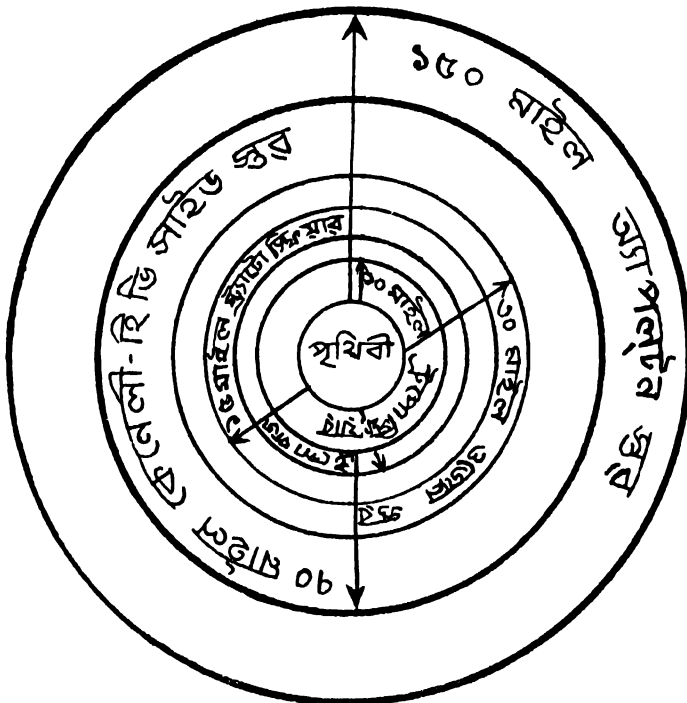
২নং চিত্র।

ট্রিনিটি কলেজে চলে আসেন। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে লেকচারারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালের শেষে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের হুইটষ্টোন অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯২৪

ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলটি কতকগুলি স্তরে বিভক্ত। নীচের বায়ুস্তরটিকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। এর বিস্তৃতি প্রায় ১০ মাইল। তারপর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, ওজোন স্তর, কেনেলী-হিভিসাইড স্তর এবং অ্যাপলটন স্তর। ট্রপোস্ফিয়ার আর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে একটি ছোট স্তর আছে—তাকে বলে

ট্রপোপোজ। শেষের তিনটি স্তরকে আবার D, E এবং F স্তর বলা হয়ে থাকে। F স্তরকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—F_1 এবং F_2 স্তর। ১৯০২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এ. ই. কেনেলী এবং বৃটিশ পদার্থবিদ অলিভার হিভিসাইড যুগপৎ সন্ধান পেয়েছিলেন E স্তরের। তাঁদের নামানুসারে এর নাম দেওয়া হয়েছিল কেনেলী-হিভিসাইড স্তর (২নং চিত্র)।

D, E এবং F স্তরগুলি মিলে আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য থেকে কণিকা, অতিবেগুনী রশ্মি আর নভোরশ্মি আসে পৃথিবীর দিকে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় তারা উপরের স্তরগুলির বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর সংস্পর্শে আসে। তার ফলে পরমাণুগুলি আয়নে পরিণত হয়। আয়নমণ্ডলের স্তরগুলি কিন্তু সর্বদা ভূপৃষ্ঠ থেকে একই উচ্চতায় থাকে না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে আর দিন ও রাত্রিতে এদের উচ্চতার তারতম্য দেখা যায়।

বেতার-তরঙ্গ, আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে বড়। সে জন্যে আলোক-তরঙ্গের চেয়ে বেতার-তরঙ্গ বক্রভাবে যেতে পারে বেশী। প্রেরক-যন্ত্র বেতার-তরঙ্গকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যে তরঙ্গগুলি উপরের দিকে যায়, সেগুলি আয়নমণ্ডলে বাধা পেয়ে নীচে নেমে আসে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার উপরে চলে যায় এবং এভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে। যার ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তের বেতার ষ্টেশনের খবর অপর প্রান্তে অবস্থিত গ্রাহক-যন্ত্রে শুনতে পাওয়া যায়। এই জন্যেই আমরা ঘরে বসে ভয়েস অব আমেরিকা, বি. বি. সি. ইত্যাদি বেতার ষ্টেশনের অনুষ্ঠান শুনতে পাই। আয়নমণ্ডল হলো একটি বিরাট গোলাকার প্রতিফলকের মত (৩নং চিত্র)।

৩নং চিত্র।

যে সকল বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটারের কাছাকাছি সেগুলি D স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। E স্তর ৩০০-৪০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গগুলিকে আর F স্তর ১০০-৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত করে। ১০০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত না হয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। এই বেতার-তরঙ্গের সাহায্যেই আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা পরিমাপ সম্ভব হয়েছে।

অরোরা বোরিয়ালিস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে ১৯২৯ সালে অ্যাপল্‌টন নরওয়ে চলে যান। গবেষণালব্ধ ফলাফল তিনি প্রকাশ করেন ১৯৩১ সালে। ১৯৩৬ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা বিভাগের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। প্রশাসন কার্যে ব্যস্ত থাকলেও তিনি গবেষণা চালিয়ে যান তাঁর গবেষণার সূত্র ধরে রবার্ট ওয়াট্‌সন-ওয়াট এবং তাঁর সহকর্মীরা রেডার যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের সময় জার্মানদের অতর্কিত বিমান আক্রমণ থেকে ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করতে রেডার যন্ত্র যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

সৌরকলঙ্ক দেখা দিলে আয়নমণ্ডলে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়—তা ধরা পড়লো তাঁর গবেষণায়। বেতার-তরঙ্গ যে উল্কাতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে পারে এবং সৌরকলঙ্ক থেকে যে হ্রস্বতর দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ নির্গত হয়, তাও ডাঃ জে. এস্ হে-র সহযোগে তিনি উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফলের উপর নির্ভর করে এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যার ফলে আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা যায়।

প্রশাসন কার্যে দক্ষতার জন্যে ক্রমশঃ তার পদোন্নতি হয়। ১৯৪১ সালে কে. সি. বি. আর ১৯৪৬ সালে জি. বি ই উপাধি পান। ১৯৪৫ সালের অগাষ্ট মাসে পারমাণবিক গবেষণা সম্বন্ধে তিনি বেতার-ভাষণ দেন। তিনি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় দেশ এবং জাতির নিরাপত্তার জন্যে তিনি অনেক কিছু কাজ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল তাঁরই অনুপ্রেরণায়।

১৯৪৭ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বৃটিশ বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন সংস্থার সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। তাছাড়া বেতার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। আন্তর্জাতিক বেতার সংস্থার সভাপতিও তিনি হয়েছিলেন। অধ্যাপনায়ও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৯৫৬ সালে বি বি. সি. থেকে রাইত বক্তৃতামালা প্রদান করেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলভিন বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা দেন তিনি ১৯৬১ সালে। শেষ বয়সে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

তিনি রেভারেণ্ড জে. লংসনের কন্যা শ্রীমতী জেসি লংসনের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর দুটি কন্যা আর স্ত্রী বর্তমান।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান

মানুষের মহাকাশ যাত্রার প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল ঠিক সাঁতার শেখবার মত। সেই পর্ব সে পেরিয়ে এসেছে। মহাকাশে যাত্রা, সেখানে থাকা ও নিজেকে চালিয়ে নেবার কৌশল সে এখন প্রায় আয়ত্ত করেছে। আগামী দিনে সে পরীর মত অন্য প্রাণীর সন্ধানে সীমাহীন আকাশে গ্রহান্তরে উড়ে যাবার কল্পনা করছে।

মঙ্গলগ্রহে কোন না কোন ধরণের প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল থেকেই চলে আসছে। এজন্যেই আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা প্রথমে মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধান নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

তবে পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান প্রথমতঃ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-চালিত মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানের সাহায্যেই করা হবে। আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞান পর্ষতের অভিমত এই যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখবার জন্যে জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর মহাকাশ বিজ্ঞান পর্ষতকে অনুরোধ করেন। গত বছর এই অনুরোধ অনুযায়ী পর্ষতের যে অধিবেশন হয়, তাতে পর্ষৎ উল্লিখিত অভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাপন করেন। ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কোলিন পিটেনড্রিগ।

এই সম্বন্ধে এক রিপোর্টে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে মঙ্গলগ্রহাভিমুখী অভিযান আরম্ভ করবার জন্যে এবং ১৯৭১ সালের মধ্যেই মঙ্গল গ্রহে অবতরণের সময় নির্দিষ্ট করবার জন্যে বলা হয়েছে।

ঐ গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এপর্যন্ত মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়, সেখানে জীবের অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব। ঐ গ্রহে জীবের আবির্ভাব আপনা থেকেই হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে মঙ্গলগ্রহ এবং পৃথিবীর মধ্যে যে প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত সাদৃশ্য রয়েছে, তা ধরা পড়েছিল। তাঁদের পরিভাষায় মঙ্গলকে বলা হতো কুজ এবং ভৌম। এর অর্থ পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ বেরিয়ে এসেছে, পৃথিবী থেকেই এই গ্রহটির সৃষ্টি হয়েছে।

যে সকল গ্রহের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবীর মতই, তাদের সকলের মধ্যেই প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এই যুক্তি অনুসারে প্রাণীর বেঁচে থাকবার মত পরিবেশ মঙ্গলগ্রহে আছে কি না, সে সম্পর্কে প্রথমতঃ তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং ঐ গ্রহের ভৌত বা ফিজিক্যাল এবং রাসায়নিক বা কেমিক্যাল পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ঐ সকল তথ্য এবং এই বিষয়ে পর্যালোচনার ফলে ঐ গ্রহে প্রাণী আছে কি না, কোন সময়ে ছিল কিনা এবং কি ধরণের প্রাণী সেখানে রয়েছে—ইত্যাদি বিবরণ জানা যাবে। যদি কোন প্রাণী নাও থাকে তথাপি এই উদ্যোগ সেই গ্রহের রাসায়নিক গঠনের বিবর্তনের উপর আলোকপাত করবে।

বিভিন্ন গ্রহে মহাজাগতিক রশ্মি ও আবহাওয়ার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রূপকথায় যে অদ্ভুত রকমের জীব-

জন্তুর কথা বলা হয়েছে, সে সকল হয়তো সেই পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। আগামী দিনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে ঐ সকল গ্রহের অজ্ঞাত রহস্য ও পরিবেশ সম্পর্কে নতুন অনেক কিছু জানা যাবে।

মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাক বা না যাক, এই চেষ্টার ফলে এই বিষয়ে বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে; যেমন—সেখানে প্রাণীর সন্ধান পেলে বোঝা যাবে, পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ নয়, যেখানে প্রাণী বর্তমান। আর যদি কোন প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান সেখানে পাওয়া নাও যায়, তবে সংগৃহীত তথ্য পৃথিবীর অনুরূপ ঐ গ্রহের ভূরাসায়নিক ও ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের পর্যালোচনায় সাহায্য করবে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এই তথ্যানুসন্ধানী উদ্যোগের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্রহের মধ্যে যাদের সঙ্গে পৃথিবীর সামঞ্জস্য আছে, তাতে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত হতে পারে

ভারতের পুরাণ শাস্ত্রে ঈশ্বরকে কোটি কোটি ভুবনের স্রষ্টা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ—অতীতে ভারতীয়েরা কেবল একটি গ্রহের অস্তিত্বই নয়, পৃথিবীর মতই মানবঅধ্যুষিত বহু গ্রহের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে প্রায়শঃই গ্রহান্তর যাত্রা ও অন্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের কথারও উল্লেখ আছে।

মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকায় সয়াবীন

সয়াবীন হয়তো একদিন পৃথিবীতে প্রোটিনের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি, সয়াবীন হয়তো মানবদেহের পুষ্টির দিক থেকে পশুর মাংসকেও ছাড়িয়ে যাবে। অচিরেই এমন এক দিন আসতে পারে, যখন মানুষের খাদ্যতালিকায় সয়াবীনের স্থান হবে গুরুত্বপূর্ণ।

পশুদেহের প্রতি এক কিলোগ্রাম মাংসের জন্যে ঐ পশুকে সাত থেকে আট কিলোগ্রাম উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাওয়ানো প্রয়োজন। সয়াবীন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ। সয়াবীন থেকে পশুরা সরাসরি প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পেতে পারে।

সয়াবীন থেকে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, তার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের আহারের উপযোগী বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। দুধের মধ্যে যে প্রোটিন পাওয়া যায়, তারই অনুরূপ পুষ্টিমূল্য সয়াবীনের প্রোটিনেও আছে। স্বভাবতঃই বোঝা যাচ্ছে, অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় সয়াবীনের প্রোটিনের পুষ্টিমূল্য অনেক বেশী। আমেরিকায় মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়নবিদ গবেষক ডাঃ ডি আর. ব্রিগ্স্ সয়াবীনের খাদ্যমূল্য ও খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। ডাঃ ব্রিগ্স্ বলছেন, ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা ৭০ কোটি বুশেল সয়াবীন উৎপাদন করেছেন। এগুলিতে ১,৭০০ কোটি পাউণ্ড প্রোটিন ছিল। প্রায় ১,২০০ কোটি পাউণ্ড প্রোটিন, অর্থাৎ মোট প্রোটিনের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের গ্রহণের উপযোগী বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত করবার মত।

আমেরিকায় উৎপন্ন মোট সয়াবীনের শতকরা এক ভাগ বা দু-ভাগের বেশী বিশুদ্ধ প্রোটিনে রূপান্তরিত হয় না। সয়াবীন উৎপাদনকারী সকল দেশের কথা বিবেচনা করলে এর পরিমাণ আরও অনেক কম হয়ে দাঁড়ায়।

ডাঃ ব্রিগ্সের মতে, সয়াবীনে যে প্রোটিন রয়েছে, তার পূর্ণ সুযোগ নিতে হলে মানুষের রুচির পরিবর্তন করতে হবে। সয়াবীনের প্রোটিন সাধারণতঃ আহার্যরূপে গ্রহণ করা হয় না, যদিও লোকে বহুগুণ বেশী মূল্য দিয়ে সমপরিমাণ জান্তব প্রোটিন সংগ্রহ করে থাকে। সয়াবীনের মত সস্তা ও উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তুকে কাজে লাগাতে হলে মানুষের খাওয়ার অভ্যাস ও রুচি বদ্লাতে হবে। সাধারণতঃ পরিচিত

আস্বাদের খাদ্যবস্তু আহার করতেই মানুষ ভালবাসে, আহারের অভ্যাস মানুষ সহজে বদ্‌লাতে চায় না।

কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ বজায় রেখে কোন খাদ্যবস্তুকে যদি সয়াবীনের প্রোটিনসমৃদ্ধ করে তোলা যায়, তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। এই চেষ্টাই বর্তমানে আমেরিকায় চলছে। ইতিমধ্যেই এমন রুটি তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ সয়াবীন-প্রোটিন আছে, অথচ এর গুণ ও স্বাদের কোন পরিবর্তন হয় নি।

সয়াবীন-প্রোটিনের সঙ্গে চর্বি মিশিয়ে এবং গন্ধ-রং যোগ করে আকার ও স্বাদের দিক থেকে মাংসের মত করে তোলবার পরীক্ষায়ও সাফল্য লাভ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রাণতত্ত্ব কর্মসূচী

বিপুল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট দেখা দিতে পারে। হয়তো বা এই সঙ্কট ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। তার প্রকাশ শুধু খাদ্যের অভাবের মধ্যেই নয় মানুষের পারিপার্শ্বিক ধ্বংসের সাম্প্রতিক প্রবৃত্তির মধ্যেও। বিজ্ঞানীদের সম্মুখে এটি এক বিরাট সমস্যা-বিশেষ এবং সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রাণতত্ত্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ ও প্রাণ-তাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতার দিকে।

প্রাকৃতিক সম্পদের যত্ন ও তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের উপরই মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদ হলো তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিবেশ বলতে বোঝায় কোন বিশেষ জায়গার গাছপালা, জীবজন্তু, মাটি, জল ও আবহাওয়া ইত্যাদি। এই সবের সুনিপুণ সদ্ব্যবহারের জন্যে তার প্রকৃতি জানা দরকার। এর অন্য নাম ইকোসিস্টেম।

ইকোসিস্টেমেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হলো শক্তির স্রোত। গাছপালা সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি আহরণ করে। এই শক্তির একাংশ ব্যবহৃত হয় জৈব মিশ্র পদার্থ তৈরির জন্যে। গাছপালা জৈব মিশ্র পদার্থে (প্রোটিন, সেলুলোজ প্রভৃতি) শক্তি সংগ্রহ করে রাখে। গাছের বড় হওয়া বা সজীব থাকা নির্ভর করে ঐ শক্তির উপর। তবে ঐ শক্তির একাংশ গাছ শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ এবং বেঁচে থাকবার জন্যে ব্যবহার করে। কিন্তু ক্রমে ঐ সংরক্ষিত শক্তি শেষ হয়ে যায়। কাজেই গাছকে দীর্ঘজীবী করতে হলে সৌর-শক্তি দীর্ঘদিন অধিক পরিমাণে সংরক্ষণের কোন উন্নত পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

কৃত্রিম রেশম

ভারতে ইদানীং কৃত্রিম রেশমের (ফাইবার ফ্যাবরিক) উৎপাদন অত্যধিক বেড়ে গেছে। ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৩ সালে তা ১৩০ শতাংশ বেশী হয়েছে। রেয়নের স্যুট, টেরিলিন শার্ট বা নাইলন শাড়ী এক দশক আগেও সবার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এসব কাপড় আজ সাধারণ মানুষেরা ব্যবহার করছে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও এই শিল্প অনেক ধরণের কাপড় তৈরি করছে। প্যারাসুট, প্যারাসুট টেপ, রিবন ও ইনসুলেটিং টেপ তৈরির কাজে এসব কাপড় ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃত্রিম কাপড় হয় দু-রকমের। একটি সেলুলোজ জাতীয়, অন্যটি সেলুলোজ ছাড়া। কাঠ, পাল্প, তুলার প্রাকৃতিক প্রোটিন থেকে তৈরি হয় সেলু-লোজ কাপড়। রেয়ন জাতীয় কাপড় এই শ্রেণীর। অন্য শ্রেণীর কাপড় অর্থাৎ নন-সেলুলোজিক কাপড় তৈরি হয় মিশ্র পলিমার থেকে; যেমন—পলিমাইড থেকে নাইলন, পলিষ্টার থেকে টেরিলিন

প্রভৃতি। এগুলি কয়লা বা তেল থেকে উদ্ভাবিত রাসায়নিক বা পেট্রোকেমিক্যাল পদার্থ থেকে তৈরি হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় এই ধরণের কৃত্রিম কাপড় উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। মানুষ বহুকাল ধরে শুধু সুতীকাপড়, পশম, রেশম ও ফ্লাক্সেরই নাম শুনে আসছিল। কাপড়ের চাহিদার তুলনায় পৃথিবীতে কাপড় তৈরির কাঁচা উপকরণ কম এবং সেই জন্যে অনেক দিন ধরে কৃত্রিম সূতা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছিল বিভিন্ন দেশে। রেশমের বিকল্প কৃত্রিম কাপড় উদ্ভাবিত হলেও পশম ও সুতীকাপড়ের বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নি অনেক দিন পর্যন্ত। হঠাৎ এক বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে— মানুষ একটি নতুন রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে। এর নাম পলিমারিজেশন ও পলিকনডেনসেশন। এই থেকেই মিশ্র ফাইবারের সূত্রপাত হয়। নাইলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৫০ সাল নাগাদ এর উৎপাদন দাঁড়ায় ৭০ হাজার টনে। পরবর্তী পাঁচ বছরে উৎপাদন চারগুণ বেড়ে যায়। কোন শিল্পজাত দ্রব্যই বাজারে এমন হাহাকারী চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে নি।

এই সব মিশ্র ফাইবার উৎপাদনের জন্যে নিখুঁত কলকারখানা এবং অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর দরকার হয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র এই সব কৃত্রিম কাপড়ের চাহিদা ও উৎপাদন অভাবনীয় হারে বেড়ে গেছে। ১৯৬৩ সালে এসবের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১০০ কোটি মিটার। উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্র মোট বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের ২৮ এবং জাপান ২৫ শতাংশ উৎপাদন করে।

এই সব কৃত্রিম কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যে সুতী-শিল্প ব্যাপক গবেষণা-সূচীতে হাত দিয়েছে। সুতীর কাপড়কে গরম করে তোলবার এবং তাতে ইলাষ্টিসিটি দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কাপড় ধৌত করবার পর যাতে না কোঁচ্‌কায়, তার প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে। এমন কাপড় তৈরির চেষ্টা চলছে, যাতে টান পড়লে একটু বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই অনেক গবেষণার সুফল পাওয়া গেছে এবং নতুন নতুন ধরণের কাপড় উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব কাপড়ের ইস্ত্রির দরকার হয় না, শুকাবার জন্যে রোদেও দিতে হয় না।

সস্তায় নতুন ধরণের অ্যালুমিনিয়াম চাদর

দুটি অ্যালুমিনিয়ামের চাদরের মাঝখানে পলিথিলিন দিয়ে এক নতুন ধরণের অত্যন্ত হাল্কা ও মজবুত পদার্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবন করা হয়েছে। নানারকম ক্ষেত্রে এই পদার্থটি ব্যবহার করা যাবে।

বিমান ও জাহাজের দেয়াল, ছোট ছোট নৌকার খোল, মোটর গাড়ীর বডি এবং স্থানান্তরযোগ্য যন্ত্রপাতি বহনের বাক্স প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষ তৈরির কাজে এই পদার্থটি ব্যবহৃত হয়। টেলিফোনের যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে এর ব্যবহার সম্ভব কিনা, পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এর সাহায্যে ট্রে প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষও তৈরি হয়। এই ধরণের অন্যান্য জমানো প্লাস্টিক জাতীয় পাত্‌লা চাদরের সঙ্গে তুলনা করলে এই নতুন পদার্থটির একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হলো, এটিকে ঝালাই করা যায়। তাছাড়া অন্য পদার্থের সঙ্গে আঠা দিয়ে এটি জুড়ে দেওয়া চলে। এতে বল্টু আঁটা যায়, গর্ত করা যায় এবং একে কাঁচি দিয়ে কাটা যায়।

এই অ্যালুমিনিয়াম পলিথিলিনের পদার্থটি খুব অল্প ব্যয়ে তৈরি করা যায়। অন্য যে সব পদার্থ সাধারণতঃ এই ধরণের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে এই নতুন উদ্ভাবিত পদার্থটি ওজনের তুলনায় অনেক বেশী মজবুত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১০ পাউণ্ডের একটি ইস্পাতের চাদরকে চাপ দিয়ে যতখানি বাঁকানো যায়, ঠিক সেই মাপের ৪ পাউণ্ডের এক-

খানি অ্যালুমিনিয়াম পলিথিলিন চাদরকে সম-পরিমাণ চাপের সাহায্যে ঠিক সেই পরিমাণ বাঁকানো যায়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, এই নতুন পদার্থটি কতখানি মজবুত।

ছুখানি অ্যালুমিনিয়াম চাদরের মাঝখানে এক-খানি পলিথিলিন চাদর দিয়ে এই নতুন পদার্থটি তৈরি হয়। প্রথমে এই ভাবে চাদরগুলি সাজিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে এর উপর চাপ দেওয়া হয়। ফলে ছুটি অ্যালুমিনিয়াম চাদরের মাঝখানে পলিথিলিন গলে যায় এবং অ্যালুমিনিয়াম চাদরের উপর ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অ্যালুমিনিয়াম চাদর ছুখানি বেশ মজবুতভাবে জোড়া লেগে যায়। তারপর অতিরিক্ত গলিত পলিথিলিন নিংড়ে বের করে দেবার জন্যে চাপ দেওয়া হয়। এতে ঐ নতুন চাদরটির বেধ কমে গিয়ে ঠিক কাজের উপ-যোগী হয়।

কোনরূপ আঠার সাহায্য না নিয়ে ধাতুর সঙ্গে প্লাস্টিক জুড়ে অল্প ব্যয়ে এমন এক মজবুত পদার্থ এই প্রথম তৈরি করা হলো, যা যে কোন কিছু নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা চলবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই পদার্থটির বহুল প্রচলন হবার একটি কারণ এই যে, ছুটি অ্যালুমিনিয়াম চাদরের মাঝখানে পলি-থিলিন থাকায় এর ওজন হয় হাল্‌কা, অথচ এর শক্তি আদৌ কমে না। ফলে এদিয়ে যে সব জিনিষ তৈরি হয়, তা ওজনে যেমন হাল্‌কা তেমনি মজবুত।

কার্ল পল ও আর্থার স্পেন্সার নামে ছ'জন বিজ্ঞানী এই নতুন পদার্থটি উদ্ভাবন করেছেন। এঁরা দুজনেই নিউ ইয়র্কের বেল টেলিফোন লেবরেটরী-জের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

পুস্তক পরিচয়

পশু-পাখীদের মা—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য; মনা-লোক,—৭, অ্যান্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯; পৃঃ-৪৮; মূল্য—একটাকা চার আনা।

পুস্তকখানিতে লেখক কয়েক রকম পশু-পক্ষী, মাছ, কীট-পতঙ্গের মাতৃস্নেহের বিচিত্র অভিব্যক্তির বিষয় বর্ণনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যগত কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষিত হলেও বইখানা সাধারণ পাঠক, বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার করবে। তবে আশেপাশের পরিচিত পশু, পাখী, মাছ, কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে এ-সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ পুস্তকখানিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করতো।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প—অমরনাথ রায়; শ্রীপ্রকাশ ভবন—৬৫।এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২; পৃঃ-১০৮; মূল্য—দু-টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সহজ ভাষায় ছোটদের জন্যে বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে লেখক সিদ্ধহস্ত। অনেক দিন থেকেই তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ছোটদের জন্যে লিখে আসছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে বিজ্ঞান ও কৌতূহলোদ্দীপক বিভিন্ন বিষয়ে ত্রিশটি ছোট্ট প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বইখানি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবে এবং খুবই আনন্দ লাভ করবে।

গল্পে বিচিত্র বিজ্ঞান—শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়। রীডার্স কর্ণার—৫, শঙ্করঘোষ লেন; কলিকাতা—৬; পৃঃ-৯৬; মূল্য—২.৫০ পয়সা।

পুস্তকখানিতে লেখক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। এতে খাদ্যের কথা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতি-র্বিদ্যা, বেতার-তরঙ্গ, অ্যাটম বম, রকেট, মহাকাশ অভিযান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি বিজ্ঞানের কোন না কোন বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে কৌতূহল জাগাতে পারবে বলেই মনে হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
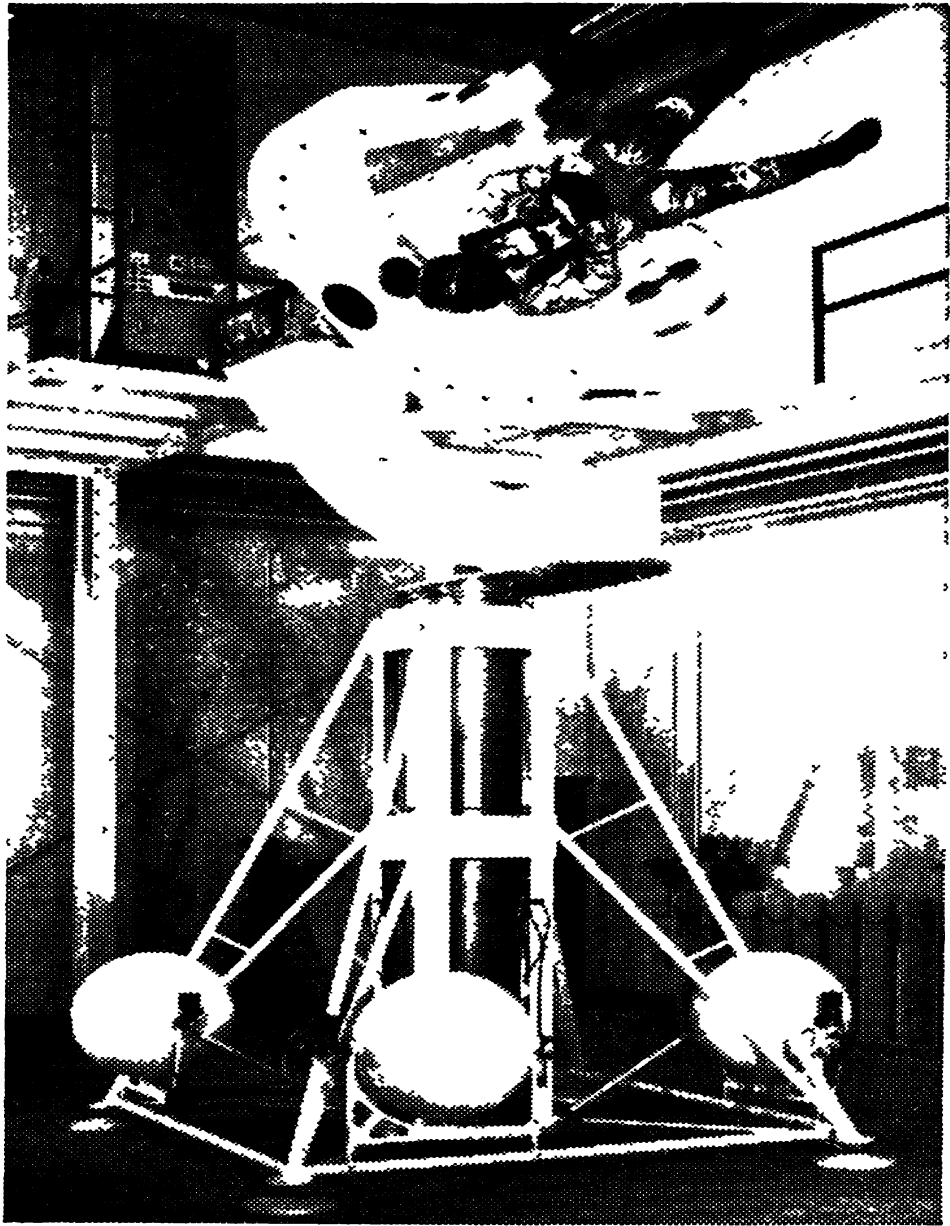
জেনারেল ডিনামিক্স প্ল্যাণ্টে (সান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া) স্থাপিত ভারশূন্যতা সৃষ্টি করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। ভবিষ্যৎ মহাকাশযানে ভারশূন্যতার মধ্যে কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে, তা পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যেই এর ব্যবহার করা হচ্ছে।

করে দেখ

বার্নৌলির সূত্র

মাঝখানে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত লম্বালম্বি মোটা ছিদ্রওয়ালা একটা সুতার কাটিম যোগাড় কর। একখানা তাস বা শক্ত একটা কার্ডের মাঝামাঝি একটা ড্রয়িং পিন (ছবি আঁকবার কাগজ বোর্ডে আঁটবার জন্যে বেশ বড় গোল মাথাওয়ালা ছোট্ট পিন) এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফুটিয়ে দাও। এবার সুতার কাটিমটাকে

ডান হাতে ধর। পিন ফোটানো কার্ডখানাকে বাঁ-হাতে কাটিমের নীচে ধরে কাটিমটার উপরে ছিদ্রের মুখে যত জোরে পার মুখ দিয়ে ফুঁ দাও। ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বাঁ-হাতে ধরা কার্ডখানাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিটা দেখে নাও, কিভাবে ফুঁ দিতে হবে, সহজেই বুঝতে পারবে।

তোমাদের মনে হতে পারে, ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডখানা মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু করে দেখ, তা হবে না। যতক্ষণ ফুঁ দেওয়া চলবে, ততক্ষণ কার্ডখানা নীচে না পড়ে কাটিমটার সঙ্গেই লেগে থাকতে চাইবে।

ফুঁ দিলে কার্ডখানা নীচে না পড়ে উপরের দিকে লেগে থাকতে চায় কেন—এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বার্নোলির সূত্রে (অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস বিজ্ঞানী ডেনিয়েল বার্নোলির নামানুসার এই সূত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে)। এই সূত্রে বলা হয়েছে—যখন কোন বায়বীয় অথবা তরল পদার্থ গতিশীল অবস্থায় থাকে, তখন তার চাপ কমে যায়। গতিবেগ যত বৃদ্ধি পায়, চাপও তত বেশী কমতে থাকে।

কাটিমের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ফুঁ দিলে কার্ডখানার উপর দিয়ে বাতাস খুব জোরে বইতে থাকে। এর ফলে কার্ডের উপরের দিকের বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। কাজেই কার্ডের নীচের দিকের বাতাসের চাপ উপরের চেয়ে বেশী হবার দরুণ কার্ডখানা পড়ে যায় না।

এরোপ্লেন ওড়বার সময় ঠিক এরূপ ব্যাপারই ঘটে। এরোপ্লেনের ডানা দুটি এমনভাবে তৈরি যে, ওড়বার সময় ডানার উপরের দিকে বাতাস নীচের দিকের বাতাসের চেয়ে অনেক দ্রুততর বেগে ছুটতে থাকে। কাজেই ডানার নীচের দিকের চেয়ে উপরের দিকের বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। এর ফলে ডানার নীচের দিকের বেশী চাপের বাতাস ভারী প্লেনকে পড়ে যেতে দেয় না।

—গ—

রামধনু

সূর্যের আলো দেখতে সাদা। বিজ্ঞানী নিউটন সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, এই সাদা আলো প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য রঙীন রশ্মির সংমিশ্রণে গঠিত, যার মধ্যে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল—এই সাতটি রং প্রধান। এটা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। একটি গোলাকার চাকতিতে উপরিউক্ত সাতটি রং পৃথক পৃথকভাবে লাগিয়ে চাকতিটিকে তার কেন্দ্রভেদী একটি আলের উপর খুব জোরে ঘোরালে দেখা যাবে, চাকতির সব রং মিশে সাদা রং হয়ে গেছে। এছাড়া প্রিজমের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মির সাতটি প্রধান রং বেশ ভালভাবেই দেখা যায়।

আকাশের রামধনু প্রাকৃতিক উপায়ে সূর্যরশ্মির সাতটি বিশ্লিষ্ট রঙের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ষাকালে বা অন্য কোন সময়ে যখন সূর্যরশ্মি আকাশে

ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার উপর পড়ে, তখন কোন দর্শক তাঁর পিছন দিকটা সূর্যের দিকে রেখে সামনে রামধনু দেখতে পান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সূর্যরশ্মি ও আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার দ্বারাই রামধনুর সৃষ্টি হয়।

রামধনুর গঠন প্রক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনার আগে আলোর কয়েকটি গুণ, যেমন—প্রতিফলন, প্রতিসরণের বিষয় জানা প্রয়োজন। আলোকরশ্মি এক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে চলবার সময় কোন মসৃণ পদার্থের উপর পড়লে রশ্মিটি বাধা পেয়ে সেই মাধ্যমের ভিতর ভিন্ন দিকে চলে। একেই আলোর প্রতিফলন বলে। আয়না বা মসৃণ কোন ধাতুর পাত থেকে এই আলোর প্রতিফলন সহজেই ধরা যায়। আবার আলোকরশ্মি এক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে সরল পথে চলতে চলতে যখন অন্য এক মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন রশ্মিটি দ্বিতীয় মাধ্যমে তার সরল পথ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে আবার সরল পথে চলে। একেই আলোর প্রতিসরণ বলে। জলের মধ্যে আলোর প্রতিসরণ খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রশ্মির ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতির মাত্রা বিভিন্ন। সাদা আলো-কে যদি প্রিজমের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা যায়, তাহলে আলো বায়ু থেকে কাচে এবং কাচ থেকে বায়ুতে দু-বার প্রতিসৃত হয়। যেহেতু সাদা আলো উপরিউক্ত সাতটি রঙের মিশ্রণ, সেহেতু বিভিন্ন রঙের রশ্মিগুলি প্রিজমের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে বিচ্যুত হয়ে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল রঙের বর্ণালী সৃষ্টি করে।

আকাশে মেঘের জলকণাগুলি ছোট ছোট এক একটি প্রিজমের মত কাজ করে এবং জলকণাগুলির মধ্যে সূর্যরশ্মির প্রতিসরণ, প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণ থেকেই রামধনুর বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। অবশ্য সেই সব রশ্মিই রামধনুর বর্ণালী সৃষ্টিতে সাহায্য করে—যাদের জলকণার মধ্যে এক বা একাধিক অন্তঃপ্রতিফলনের পর বিচ্যুতি (Deviation) সর্বনিম্ন।

প্রধানতঃ দুই রকমের রামধনু দেখা যায়—(১) মুখ্য রামধনু, (২) মাধ্যমিক বা গৌণ রামধনু। প্রাথমিক রামধনু উজ্জ্বল এবং এতে লাল রং বাইরের দিকে, বেগুনী রং ভিতরের দিকে এবং অন্য সব রং এই দুই রঙের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে রামধনুটি দর্শকের চোখের সঙ্গে ৪১° কোণ সৃষ্টি করে।

মাধ্যমিক রামধনু অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল এবং এই ক্ষেত্রে লাল রং থাকে ভিতরের দিকে, বেগুনী রং থাকে বাইরের দিকে। মাধ্যমিক রামধনু প্রাথমিক রামধনুর কয়েক ডিগ্রি উপরে দেখা যায় এবং দর্শকের চোখের সঙ্গে ৫৩° কোণ সৃষ্টি করে। প্রাথমিক রামধনুর মধ্যবর্তী স্থান আকাশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অন্ধকার থাকে। সচরাচর আমরা প্রাথমিক রামধনুই দেখি, আকাশে মাধ্যমিক রামধনু কদাচিৎ দেখা যায়।

এখন মনে করা যাক—চিত্রে ক, খ, গ, ঘ কতকগুলি জলকণার অবস্থান, যেগুলি এমনভাবে অবস্থিত আছে, যাতে সূর্যরশ্মি এদের উপর পড়ে প্রতিসৃত ও অন্তঃপ্রতিফলিত হতে পারে এবং সর্বাপেক্ষা কম বিচ্যুত হয়ে জলকণা থেকে বেরিয়ে আসে। এখন প্রাথমিক রামধনুর গঠন ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির দু-বার প্রতিসরণ ছাড়াও জলকণার ভিতরে একবার অন্তঃপ্রতিফলন হয় এবং বিশ্লিষ্ট বেগুনী ও লাল রশ্মি বহির্গত হয়ে দর্শকের চোখে যথাক্রমে ৪০° ও ৪২° কোণের সৃষ্টি করে। চিত্রে ক ও খ এর ক্ষেত্রে এরূপ দেখানো হয়েছে। সূর্যরশ্মি ক ও খ জলকণার মধ্যে একবার প্রবেশের সময় এবং একবার বের হবার সময় প্রতিসৃত হয়েছে এবং ভিতরে একবার অন্তঃপ্রতিফলিত হয়ে রশ্মির বিশ্লিষ্ট বেগুনী ও লাল রঙের রশ্মি দর্শকের চোখে ৪০° ও ৪২° কোণের সৃষ্টি করেছে। অন্য রঙের রশ্মিগুলি এই দুই রশ্মির মাঝখানে থাকে।
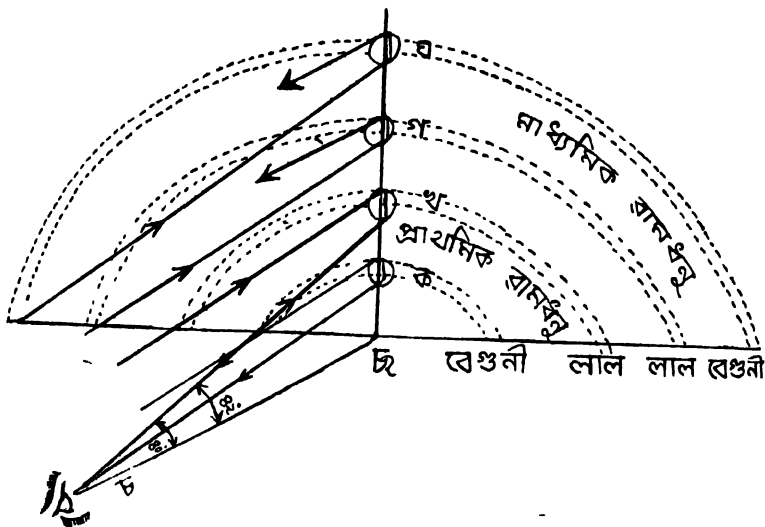
এখন চিত্রে যদি চ-কে ভার্টেক্স (Vertex) চ ছ-কে অ্যাক্সিস (Axis) ধরে লাল ও বেগুনী রঙের রশ্মির জন্যে যথাক্রমে ৪২° ও ৪০°-এর সমান করে দুটি সেমিভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গল শঙ্কু অঙ্কন করা হয়, তাহলে শঙ্কু দুটির পৃষ্ঠে যে দুটি বৃত্তচাপ সৃষ্টি হবে, সেই বৃত্তচাপের উপর ক ও খ-এর মত জলকণা থাকবে, অর্থাৎ ক ও খ জলকণা যেমন প্রাথমিক রামধনু সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, তেমনি ঐ বৃত্তচাপের উপর অবস্থিত সমস্ত জলকণাই প্রাথমিক রামধনু সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। এইভাবে লাল ও বেগুনী রঙের দুটি পৃথক মোটা রশ্মি ধনুকের মত বাঁকা অবস্থায় দেখা যাবে। অন্য রঙের রশ্মিগুলি এই দুই রশ্মির মাঝখানে অবস্থান করে। সুতরাং প্রাথমিক রামধনুতে

বাইরের দিকে দেখা যাবে লাল রং এবং ভিতরের দিকে দেখা যাবে বেগুনী রং। প্রাথমিক রামধনু বেশ উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

মাধ্যমিক রামধনুতে রশ্মি বিপরীত অবস্থায় সজ্জিত থাকে, অর্থাৎ বেগুনী রশ্মি থাকে বাইরের দিকে এবং লাল রশ্মি থাকে ভিতরের দিকে। এক্ষেত্রে বেগুনী ও লাল রশ্মিগুলি দর্শকের চোখে যথাক্রমে ৫৪° ও ৫১° কোণের সৃষ্টি করে। মাধ্যমিক রামধনুতে আলোকরশ্মির দু-বার প্রতিসৃত হওয়া ছাড়াও জলকণার ভিতরে দু-বার অন্তঃপ্রতিফলিত হয়। চিত্র গ ও ঘ জলকণায় আলোকরশ্মি দু-বার প্রতিসৃত ও দু-বার অন্তঃপ্রতিফলিত হয়ে সর্বনিম্ন বিচ্যুতির (Deviation) অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে। প্রাথমিক রামধনুর মত এক্ষেত্রেও দুটি ধনুকাকৃতি মোটা লাল ও বেগুনী আলোকরশ্মি পাওয়া যাবে, কিন্তু ততটা উজ্জ্বল হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন দর্শক যদি রামধনুর দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়, তাহলে কি সে একই রামধনু দেখবে? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, দর্শক এগিয়ে গেলে একটি নতুন রামধনু দেখতে পাবে বটে, কিন্তু নতুন রামধনুটি আগের রামধনুটির সব সর্ত পূরণ করবে এবং সেমিভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গল-এর কোন পরিবর্তন হবে না।

শ্রীসাধনচন্দ্র বল

তারা খসা

"আঁধারের বুক হতে ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা"—এ কিন্তু শুধু কবি মানসের কল্পনাবিলাস নয়। মহাশূন্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে প্রতি মুহূর্তেই শত শত তারা খসে পড়ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন—উল্কাপাত। উল্কাপিণ্ড ধাতু ও প্রস্তর দিয়ে গঠিত। উল্কাপিণ্ড বলতে আমাদের মনে যে পিণ্ডাকৃতি এক বিরাট বস্তুর ধারণা হয়, সেটা সব ক্ষেত্রেই ঠিক নয়। ক্ষুদ্র কণা থেকে বিশাল আকৃতির উল্কা মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ উল্কাই ক্ষুদ্রাকৃতির। উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ থেকে ৫০ মাইল গতিবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকালে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে প্রজ্বলিত হয়ে জ্বলন্ত গ্যাসে সেগুলি পরিণত হয়। অনেক সময় জ্বলন্ত গ্যাস দৃষ্টিগোচরে আসবার পূর্বেই উল্কা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জ্বলন্ত গ্যাসের আভা উল্কার গতিবেগের সূচক। নীলাভ-শ্বেত আভা বিকিরণকারী জ্বলন্ত উল্কা দ্রুততম গতিসম্পন্ন, হরিদ্রাভ উল্কা অপেক্ষাকৃত কম গতিসম্পন্ন এবং লাল আভাযুক্ত উল্কার গতিবেগ সর্বাপেক্ষা কম।

বেশীর ভাগ উল্কার উপস্থিতি ভূপৃষ্ঠের ৪০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে এবং অবলুপ্তি ঘটে প্রায় ১০ মাইলের মধ্যে। অবশ্য কদাচিৎ দু-একটি বিরাট উল্কা বিস্ফোরণের পূর্বেই ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। তখন বহুদূর থেকে গভীর মেঘগর্জনের মত শব্দ শোনা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য পরিক্রমারত ধূমকেতুর পরিত্যক্ত বস্তুই উল্কা। ধূমকেতু থেকে বিচ্যুত ক্ষুদ্রাকার পিণ্ডগুলি অধিকতর বেগে ধূমকেতুর কক্ষে ঘোরে। বহু বছর বাদে দেখা যায়, ধূমকেতুর দেহচ্যুত পিণ্ডগুলি ধূমকেতুর সমগ্র কক্ষপথে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবী যখন এই বিচরণশীল মহাজাগতিক বস্তুগুলির কক্ষে প্রবেশ করে, তখন উল্কাবর্ষণ সুরু হয়।

১৮৩৩ সালের ১২ই নভেম্বর ভোরের দিকে পশ্চিম গোলার্ধে এক উল্কাবর্ষণ হয়েছিল। এরূপ প্রচণ্ড উল্কাবর্ষণ গত কয়েক শতাব্দীতে দেখা যায় নি। সমগ্র আকাশ হাজার হাজার জ্বলন্ত উল্কার আভায় লাল হয়ে গিয়েছিল। ঐ উল্কাস্রোত লিও নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে আগত বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঐ বর্ষণকে 'লিও নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ষণ' নামে আখ্যাত করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই উল্কারাশি বহুপূর্বে অন্তর্হিত কোন ধূমকেতুর ভগ্নাবশেষ।

কখনও কখনও অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পুড়ে যাওয়ার পূর্বেই ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে কোন বিচূর্ণিত গ্রহের অংশ বলে মনে করেন। এরূপ কতকগুলি উল্কা প্রচণ্ড বেগে ভূপৃষ্ঠে পড়ে' ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হয়েছে এবং বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি করেছে। ১৯০৮ সালের ১০ই জুন সাইবেরিয়ায় তুনগুৎসা নদীর কাছে এক বিরাট উল্কাপাত হয়। ত্রিশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত গাছপালা বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের কম্পনে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী এক মানুষ ভূতলশায়ী হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ১ হাজার টনের একটি উল্কা দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার উপর পড়ে এবং প্রায় ২ শতেরও বেশী গর্ত ও উল্কা-গহ্বরের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উল্কা-গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় উত্তর কুইবেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। এই উল্কা-গহ্বরের প্রস্থ দুই মাইলেরও অধিক এবং গভীরতা ১৩০০ ফুট। আমেরিকার সর্ববৃহৎ উল্কা-গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব অ্যারিজোনায় ক্যানিয়ন ডায়াবলের কাছে। এটা এক মাইল প্রশস্ত এবং ৫৭০ ফুট গভীর। বিজ্ঞানীদের অনুমান—প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে কোন এক উল্কাপাতের ফলে এই গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। এই উল্কার আনুমানিক ওজন অন্ততঃ দশলক্ষ টন।

ভূপৃষ্ঠে পতিত সব উল্কাই কিন্তু বিস্ফোরিত হয় না। অবিকৃত অবস্থায় প্রায় ৩৫টি উল্কার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের ওজন এক টনেরও বেশী। এদের মধ্যে

বৃহত্তম হোবা ওয়েষ্ট (Hoba west) উল্কা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার গ্রুটফনটেইনে দেখা গেছে। এর ওজন ৬০ টন।

মিউজিয়ামে রক্ষিত সহস্রাধিক উল্কার মধ্যে আহিনিঘিটো (Ahinighito) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। মেরু পর্যটক রবার্ট. ই. পিয়ারি গ্রীনল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্কের কাছে ৩৪ টন ৮৫ পাউণ্ডের একটি উল্কা দেখেছিলেন। ১৯০২ সালে আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ডের কাছে একটি ১৫ টন ওজনের উল্কা দেখা গেছে। মেক্সিকোতে ২৯ টন, ২১ টন ও ১১ টন ওজনের তিনটি বৃহৎ উল্কা দেখা গেছে।

যদি বৃহৎ আকৃতির কোন একটি উল্কা লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোকিও বা কলকাতার মত কোন বিশাল জনবহুল শহরের উপর পড়তো, তবে হয়তো হাজার হাজার লোকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনহানি ঘটতো। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, অদ্যাবধি এই নভোশ্চারী বস্তুপিণ্ডগুলি জনবহুল শহরগুলিকে বর্জন করেছে।

হারভার্ড মানমন্দিরের উল্কা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফ্লেচার জি. ওয়াটসনের হিসাবে—প্রত্যহ ১ কোটিরও অধিক উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং প্রায় সবগুলিই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এই উল্কাভস্মের জন্যে পৃথিবীর ওজন প্রত্যহ ৫ টন করে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর বিশাল আকারের জন্যে এই বর্ধিত ওজন বহুযুগ বাদেও অনুভব করা যায় না। মেঘশূন্য অন্ধকার রাত্রি উল্কা দর্শনের প্রকৃষ্ট সময় এবং মধ্যরাত্রিতেই সাধারণতঃ উল্কা পর্যবেক্ষণ করা হয়। তখন ঘণ্টায় প্রায় দশটি উল্কা দৃষ্টিগোচর হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, রাত্রির প্রথম কয়েক ঘণ্টায় যত সংখ্যক উল্কা দেখা যায়, ভোরের ৩।৪ ঘণ্টা পূর্বে তার প্রায় দ্বিগুণ উল্কা দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ রাত্রির শেষের দিকে আমরা পৃথিবীর সম্মুখভাগে অর্থাৎ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকি। ফলে পৃথিবীর দিকে আগত উল্কাপুঞ্জ ও পৃথিবী আবর্তনের পথে যে সব উল্কাপুঞ্জকে পাশ কাটিয়ে যায়, তাদের প্রায় সবগুলিকেই দেখতে পাই। কিন্তু মধ্যরাত্রিতে আমরা পৃথিবীর পশ্চাৎ দিকে থাকবার ফলে মাত্র অর্ধেক সংখ্যক উল্কার সাক্ষাৎ পাই।

বছরে প্রায় চৌদ্দবার আকাশে উল্কাবর্ষণ দেখা যায়। সূর্য পরিক্রমাকালে পৃথিবী যখন উল্কাপুঞ্জের কক্ষপথে প্রবেশ করে, তখন এই মহাজাগতিক আতসবাজির খেলা দেখা যায়। বার্ষিক উল্কাবর্ষণের মধ্যে ১১ই অগাষ্টের পারসিউস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে উল্কাবর্ষণ সর্বাধিক দর্শনীয়। নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উল্কা-বর্ষণ ড্রাকো নক্ষত্রপুঞ্জের মস্তক থেকে নির্গত ডায়াকোবিনডিস উল্কাবর্ষণ। এই উল্কারাশির সৃষ্টি 'ডায়াকোবিনডিস-জিনার' ধূমকেতুর দেহ থেকে।

আমেরিকার আবহ-দপ্তরের দু-জন বিজ্ঞানী অনেক পর্যালোচনার পর উল্কাবর্ষণ ও অধিক বৃষ্টিপাতের মধ্যে একটা যোগসূত্রের কথা বলেছেন। আবার ডুইট বি.

ক্লিন ও গ্লেন ডব্লিউ. ব্রিয়ার নামে দু-জন আবহবিদ্ যদিও উল্কাবর্ষণের ফলেই বৃষ্টিপাত হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত নন, তথাপি তাঁরা বেশ জোর দিয়েই বলছেন যে, উল্কাবর্ষণের সঙ্গে অধিক বৃষ্টিপাতের একটা সম্পর্ক আছে। যদি তাঁদের এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়, তবে মানুষ হয়তো বৃষ্টির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিতে সক্ষম হবে।

ডাঃ ই. জি. ব্রাউন নামে একজন অষ্ট্রেলিয় বৈজ্ঞানিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান এবং নিউজিল্যাণ্ডের উল্কাবর্ষণ এবং আনুপাতিক বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে পূর্ববর্ণিত তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বানুসারে যখনই পৃথিবী সূর্য পরিক্রমাকালে বিপুল সংখ্যক উল্কার সংস্পর্শে আসে এবং যখনই বৎসরান্তিক উল্কাবর্ষণ হয়, তখনই পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রচুর উল্কাভস্মের উপস্থিতি দেখা যায় এবং এই সব ঘটনার প্রায় তিরিশ দিন পরে প্রবল বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। ডাঃ ব্রাউনের তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলেন, এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অধিক বৃষ্টিপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। পৃথিবীর বহু স্থানে ১২ই, ২২শে ও ৩১শে জানুয়ারী প্রবল বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। একে ১৩ই ডিসেম্বরের 'জেমিনি' উল্কাবর্ষণের বিলম্বিত ফল বলে অনুমান করা হয়।

এই মতানুসারে আবহমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমষ্টির অস্তিত্বের ধারণা করা হয় এবং এদের ঘনীভূত কোষ (Freezing nuclei) নামে অভিহিত করা হয়। আবহ-বিজ্ঞানে ধারণা করা হয় যে, ঘনীভূত কোষগুলি আবহমণ্ডলে উপস্থিত জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করে বৃষ্টি ও বরফ কণায় পরিণত করে। আবহমণ্ডলের নিম্ন ও উচ্চতলের মধ্যে যথেষ্ট তাপ-বৈষম্য রক্ষিত হলে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। পূর্বোক্ত তত্ত্বের প্রবক্তরা বলেন যে, বেশীর ভাগ ঘনীভূত কোষই উল্কাস্রোত থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে আগত উল্কাভস্ম।

অমল দাশগুপ্ত

চন্দ্রলোকে অভিযান

তোমরা সবাই নিশ্চয় জান, কয়েক বছর ধরে মহাকাশে অভিযান চালিয়েছেন রাশিয়া ও আমেরিকার কয়েকজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। মহাকাশ বলতে কি বোঝায়, তাই বলছি।

আমাদের পৃথিবীর চারদিকে বাতাসের একটা আবরণ আছে। যত উপরে যাওয়া যায়, এই বাতাসের ঘনত্ব এবং চাপ ক্রমশঃ ততই কমে আসে। আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাতাসের চাপ হলো সাধারণভাবে ৭৫০ মিলিমিটার। কিন্তু ১৬০ কিলোমিটার উপরে এই চাপ ক্রমে কমে গিয়ে মোটামুটি ০·৪ মিলিমিটারে দাঁড়ায়। সেই অনুসারে বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়। সেখানে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, আমরা বাতাসের যে চাপে অভ্যস্ত, সেই চাপ আমাদের উপর থেকে সরে গেলে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্যে নানারকম ব্যবস্থা করতে হয়। তা-ছাড়া আর এক কথা—তোমরা মাধ্যাকর্ষণের কথা নিশ্চয়ই জান। দুটি পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীও তার উপরের সকল জিনিষকেই আকর্ষণ করে এবং সেই জন্যে কোন জিনিষকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তা আবার সেই আকর্ষণের ফলে নীচে নেমে আসে। কিন্তু দুইটি পদার্থের মধ্যে দূরত্ব যত বাড়তে থাকে, আকর্ষণের পরিমাণও সেই অনুপাতে কমতে থাকে। দুটি পদার্থের মধ্যেকার ব্যবধান যদি দ্বিগুণ হয়, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ চার ভাগের এক ভাগ, আর তিনগুণ বাড়লে আকর্ষণ কমে নয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। সেই অনুসারে পৃথিবী থেকে যত উপরে ওঠা যায়, পৃথিবীর টান তার উপরে ততই কমে যায়। ক্রমে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়তে হয়, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ খুবই কম—মনে হয় যেন আমরা আকর্ষণের বাইরে চলে এসেছি। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণে অভ্যস্ত আমাদের উপর তার নানা রকম প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

আকাশের যেখানে বাতাসের একান্ত অভাব এবং পৃথিবীর আকর্ষণ নেই, তাকেই বলে মহাশূন্য বা মহাকাশ। এই মহাকাশের এক একটা স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন রকেটে করে ঐ বীরপুরুষগণ। শুধু পুরুষ বলছি কেন, রাশিয়ার একটি বীরাঙ্গনাও ঐ মহাকাশে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে এসেছেন। এই সব কথা তোমরা কাগজে পড়ে থাকবে। এই সকল অসীম সাহসী অভিযাত্রীদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চাঁদে যাওয়া। চাঁদের প্রতি লোভ মানুষের বহুকাল থেকেই। যাহোক, চাঁদে কি আছে, অদূর ভবিষ্যতে অভিযাত্রীরা সেখানে গিয়ে যদি পৌঁছুতে পারেন, তবে কি অমূল্য রত্ন সেখানে গিয়ে পাবেন, সে নিয়েই তাঁদের মধ্যে আজকাল গভীর গবেষণা চলছে। সম্প্রতি

একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, যিনি চাঁদে গিয়ে পদার্পণ করবেন, তিনি হয়তো দেখতে পাবেন তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেছে প্রচুর হীরার স্তরের মধ্যে। এই বৈজ্ঞানিক হলেন লণ্ডন বিশ্ববিত্যালয়ের অন্তর্গত রয়্যাল হলওয়ে কলেজের অধ্যাপক স্যামুয়েল টোলানস্কী।

আমাদের পৃথিবীতে অ্যারিজোনা নামক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন এক সময় খুব বড় একটা উল্কা এসে পড়েছিল। তার ফলে গাছপালা প্রভৃতি সব কিছু ধ্বংস হয়ে প্রকাণ্ড একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এই গর্তের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কালো রঙের হীরা পাওয়া গেছে। উক্ত বৈজ্ঞানিকের মতে, সেই উল্কাটি পৃথিবীতে যেরূপ প্রচণ্ড বেগে পড়েছিল, সেই আঘাতের চাপ ও তাপের ফলেই এই সব হীরার সৃষ্টি হয়েছিল। হীরা সাধারণ অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায়। এটা কয়লারই একটা বিশেষ রূপান্তর। কয়লার উপর বিশেষ চাপ ও তাপমাত্রা প্রয়োগ করে তাকে হীরায় রূপান্তরিত করা যায়। আজকাল এই ভাবে কৃত্রিম হীরা তৈরি করা হয়।

রাতের আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকালে, বিশেষ করে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে, দেখা যায় যে, উল্কার জ্যোতি আকাশ চিরে এক দিক থেকে আর এক দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উল্কা এসে পড়লে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উল্কাগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে এবং ক্ষয়ে গিয়ে ধূলিকণায় রূপান্তরিত হয়। যে সব উল্কা খুব বড়, ক্ষয়ে গিয়েও শেষ হয় না, তাদের কতকগুলি আবার পৃথিবীর সীমার বাইরে চলে যায়, আর কিছু কিছু এসে পৃথিবীতে আঘাত করে।

এখন, চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডলের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। থাকলেও এত কম যে, তার ঘর্ষণে উল্কার ধূলিকণায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যে সব উল্কা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের সীমায় এসে পড়ে, তাদের অধিকাংশই চাঁদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করবে। সুতরাং স্যামুয়েল টোলানস্কির মতে, অ্যারিজোনায় উল্কার আঘাতে যে ভাবে হীরার সৃষ্টি হয়েছে, চাঁদের পৃষ্ঠেও প্রত্যেকটি উল্কার আঘাতে সেরূপ ক্রেটারের সৃষ্টি হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে হীরারও সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর মতে, চাঁদের গায়ে একটি হীরার আস্তরণ পাওয়া যাবে।

তাই যদি হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আর এক কথাও মেনে নিতে হয় যে, চাঁদে কয়লাও পাওয়া যাবে। না হলে কয়লা আসবে কোথা থেকে? উল্কায় তো কার্বন এক হাজারে ছুই ভাগের বেশী পাওয়া যায় না! যাই হোক, মানুষ যখন লেগেছে তখন একদিন তারা চাঁদে গিয়ে পৌঁছুবেই, আশা করা যেতে পারে। তখনই তোমরা সত্যাসত্য জানতে পারবে।

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

চিনি

চিনির সম্বন্ধে তোমরা হয়তো খুব বেশী কিছু জান না। হয়তো চিনি সম্বন্ধে কিছু জানতে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই কৌতূহল জাগে। কাজেই চিনি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আলোচনা করছি।

চিনি একপ্রকার মিষ্টি স্বাদযুক্ত স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। এর কোন বিজারণ ক্ষমতা নেই। চিনি জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। জলীয় দ্রবণে লঘু অ্যাসিডের (Dilute acid) উপস্থিতিতে চিনি আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে পরিণত হয়। চিনিকে অন্তর্ধূম পাতন (Dry distillation) করলে শর্করা চারকোল পাওয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেট প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। চিনি তার মধ্যে একটি। অপর দুটি হলো স্টার্চ—এবং সেলুলোজ। চিনির মধ্যে পড়ে—(১) সুক্রোজ, (২) ফ্রুকটোজ, (৩) গ্লুকোজ, (৪) মধু, (৫) আঙ্গুরের চিনি, (৬) দুধের চিনি ইত্যাদি।

সুক্রোজ—($C_{12}H_{22}O_{11}$) বা আখের চিনি—এটি আখ, তালজাতীয় ফল, বীট, আনারস ও মধুতে বিদ্যমান। আখ ও বীট থেকে পণ্য হিসেবে একে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে আখ মাড়িয়ে চিনি তৈরি করা হতো। আলেকজাণ্ডারের লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে এই আখের চিনি তৈরি করবার কৌশল শিখে গিয়েছিল। তাই এক সময়ে ইউরোপে আখের চিনি 'ভারতীয় চিনি' নামে পরিচিত ছিল। বীট চিনি আবিষ্কার করেন জার্মান রাসায়নিক মারগ্রাফ, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে।

আখ থেকে সুক্রোজ প্রস্তুত ঃ—প্রথমে আখকে ছোট ছোট টুক্‌রা করে কাটা হয়। তারপর পেষণ যন্ত্রে মাড়াই করে তাথেকে রস নিষ্কাশন করা হয়। এই রসকে ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে পোড়া চুন (CaO) মিশানো হয় এবং এই মিশ্রণকে ১০০° সে. উষ্ণতা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে রসের সঙ্গে মিশ্রিত অনেক অবিশুদ্ধ পদার্থ গাদ বা ময়লা রূপে পৃথক হয়ে পড়ে। এই ময়লা ছেঁকে ফেলে আখের রসের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস প্রবাহিত করা হয়। এই সালফাইটেশন সুক্রোজকে জারিত হতে দেয় না। সুক্রোজের সঙ্গে যদি কোন রকম অবাঞ্ছিত অপদ্রব্য তখনও থেকে যায়, তাহলে তা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া সালফার ডাইঅক্সাইড রসকে বিরঞ্জিত (Bleaching) করে থাকে। তারপর রসটা পাম্পের সাহায্যে বড় বড় ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অমুপ্রেষ পাতনের (Vacuum distillation) সাহায্যে গাঢ় করা হয়। এই গাঢ় রসকে এবার ঠাণ্ডা করা হয়। ফলে চিনির কেলাস নীচে পড়ে যায়। এবার

পাত্র থেকে দানাদার চিনি ছেঁকে নিলে যে পদার্থটা পড়ে থাকে, তাকে বলে গাদ বা মোলাসেস (Molasses)। এই গাদ ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল ও রামজাতীয় সুরা তৈরি করবার জন্যে। তাছাড়া গরুর খাদ্যরূপে ও সার হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। চিনির জলীয় দ্রবণ ঘন করে মিছরী তৈরি করা হয়।

নানারকম মিষ্টান্ন, সরবৎ, সিরাপ প্রভৃতি, নানাপ্রকার রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে এবং শর্করা চারকোল, ক্যারামেল প্রভৃতি উৎপাদনে চিনি ব্যবহার করা হয়।

গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ—গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) মধু ও নানাপ্রকার মিষ্টি স্বাদযুক্ত ফলে বিদ্যমান। আঙ্গুরের রসে পাওয়া যায় বলে গ্লুকোজকে আঙ্গুরের চিনিও বলা হয়। বহু উদ্ভিদের পাতায় গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়। আমাদের রক্ত ও মূত্রে সামান্য পরিমাণ গ্লুকোজ থাকে। গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজের ($C_6H_{12}O_6$) সংযোগ গঠিত হয় চিনি। চিনির অ্যালকোহলীয় দ্রবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Dilute HCl) বা সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) মিশিয়ে যদি সেই দ্রবণকে উত্তপ্ত করা যায়, তবে চিনি আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ তৈরি হয়। যেমন—

$$\underset{\text{(চিনি)}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O = \underset{\text{(গ্লুকোজ)}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{(ফ্রুকটোজ)}}{C_6H_{12}O_6}$$
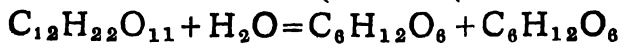
ফ্রুকটোজ অ্যালকোহলে অপেক্ষাকৃত বেশী দ্রবণীয় বলে তা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। অবশিষ্ট দ্রবণ থেকে ফ্রুকটোজ নিষ্কাশিত করা হয় পোড়া চুনের সাহায্যে। কিন্তু গ্লুকোজ অনার্দ্র স্ফটিকাকারে দ্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া আর এক উপায়েও গ্লুকোজ প্রস্তুত করা যায়—অ্যাসিডের সাহায্যে চাল, আলু, ভুট্টা (অর্থাৎ শ্বেতসার) প্রভৃতির আর্দ্র-বিশ্লেষণ করে।

রুটি, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট এবং মদ প্রস্তুতিতে গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। একটা বিশেষ সাংশ্লেষিক পদ্ধতিতে ভিটামিন-সি তৈরি করতে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়। আর ফ্রুকটোজ ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যরূপে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় আখে চিনির পরিমাণ ১২-১৩%; জাভার আখে ১৯%। আগে বীটের ভিতর চিনি পাওয়া যেত প্রায় ৬%; কিন্তু বর্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে বীট মূলে প্রায় ২৮% চিনি পাওয়া যায়। ভারতে বর্তমানে প্রায় ১৬০টি চিনির কল আছে এবং তার মধ্যে অধিকাংশই অবস্থিত বিহার এবং উত্তর প্রদেশে। বলা বাহুল্য বিভিন্ন চিনির মিষ্টতা বিভিন্ন। নীচে কোন্ চিনির মিষ্টতা কি রকম, তা দেওয়া হলো।

দুধের চিনি	— ১	সুক্রোজ	— ৬'৩
সল্ট চিনি	— ২	ফ্রুকটোজ	— ১০'৮
গ্লুকোজ	— ৪'৬	স্যাকারিন	— ৪৪০০

পুলককুমার চট্টোপাধ্যায়

পিরান্‌হা

নানারকম মাছের কথা আমরা জানি। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আকৃতি-প্রকৃতিও বিভিন্ন রকমের। সাধারণতঃ মাছের সঙ্গে আমাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিছু উগ্র স্বভাবের মাছ আছে, যারা যে কোন জন্তু-জানোয়ারকে আক্রমণ করতে দ্বিধা বোধ করে না। মানুষও এই সব উগ্র মাছের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। স্বভাবে হাঙর হচ্ছে এই রকম উগ্র প্রকৃতির মাছ। কিন্তু হাঙরের চেয়েও ভয়ঙ্কর মাছ এই পৃথিবীতে আছে। আজ সেই বিচিত্র মাছের কথাই তোমাদের বলবো। এই মাছের নাম হলো পিরান্‌হা।
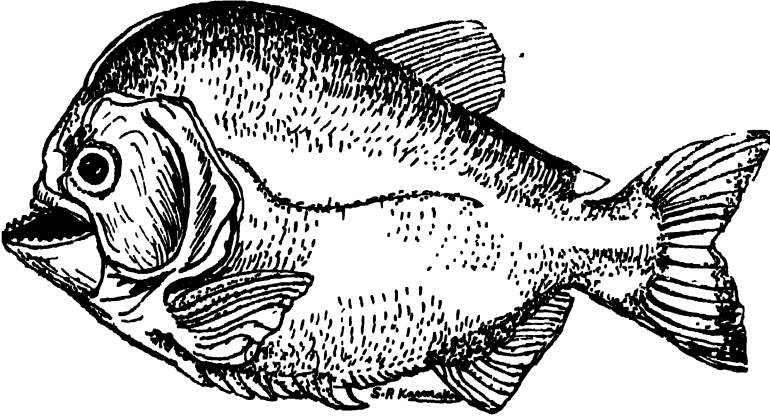
পিরান্‌হা।

পিরান্‌হা মাছের নাম শুনলে মনে হবে যে, স্বভাবের মত এদের চেহারাও বুঝি ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই হিংস্রপ্রকৃতির মাছের দৈর্ঘ্য মাত্র সাড়ে দশ ইঞ্চি। কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণীরা এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। পিরান্‌হার দেহাকৃতি সাধারণ মাছের মতই। কিন্তু চোয়াল ও দাঁতের আকৃতিতেই এদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এদের বেঁটে ও চওড়া চোয়ালে ক্ষুরের মত ধারালো তেকোণা দাঁত বসানো থাকে। মুখ বন্ধ করলে দু-সারি দাঁত একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। এদের চোয়ালের মাংসপেশী সবচেয়ে শক্তিশালী। সাধারণ মাছ ধরবার বঁড়শীকে এরা অনায়াসে দু-টুক্‌রা করে ফেলে। মানুষের শরীর থেকে হাত বা পায়ের আঙুল বিচ্ছিন্ন করতে এদের কোন কষ্টই হয় না। শুধুমাত্র শক্ত ধাতু বা লোহাকাঠের কাছে এদের দাঁত হার মানে। পিরান্‌হার রং রূপালী নীল, পিছনের পাখ্‌নাটা ফিকে লাল। মুখটা ভোঁতা— অনেকটা বুলডগের মত।

পিরান্‌হারা দল বেঁধে বাস করে। শিকার দেখতে পাওয়া মাত্র এরা তড়িৎ-গতিতে শিকারকে কামড়ে ধরে। এরা অসম্ভব রকম তাড়াতাড়ি কামড়াতে পারে আর প্রতি কামড়ে শিকারের দেহ থেকে বড় এক একটা জলপাইয়ের সমান মাংসখণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পাঁচ মণ ওজনের বড় একটা শূওরকে খেতে এদের দশ মিনিটেরও কম সময় লাগে। একবার রক্তের স্বাদ পেলে এরা জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় এবং সে সময়ে স্বজাতিকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

পিরান্‌হার জন্মরহস্য সম্বন্ধে অল্পই জানা গেছে। স্ত্রী-পিরান্‌হা জলমগ্ন কোন গাছে বা শিকড়ে বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার সময় পর্যন্ত এরা ডিমের উপর কড়া নজর রাখে। সে সময় কোন প্রাণী ডিমের কাছে এলেই তাকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করে।

খাদ্যের ব্যাপারে এদের কোন বাছবিচার নেই। মাছ থেকে সুরু করে মানুষ পর্যন্ত যে কোন প্রাণীই এদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ যায় না। এরা ফলও খেয়ে থাকে। এক কথায়, যা পায় এরা তাই খায়—তাই এদের সর্বভুক বলা যেতে পারে।

পিরান্‌হা হলো দক্ষিণ আমেরিকার মিঠা জলের মাছ। যে সব নদী উত্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে, সে সব নদীতে এদের দেখা পাওয়া যায়; যেমন—আমাজন, পারানা, সাওফ্রান্‌সিসকো। চার রকমের উগ্র স্বভাবের পিরান্‌হা আছে। এদের বাসস্থান হলো ভেনিজুয়েলা, ব্রেজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও উত্তর আর্জেন্টিনা। সবচাইতে বড় রকমের পিরান্‌হার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ইঞ্চির মত হয়—কেবল মাত্র রিও সাওফ্রানসিসকোতে এদের দেখা মেলে।

মাছের মধ্যে পিরান্‌হাই সবচেয়ে বেশী মানুষের প্রাণ নিয়েছে। পিরান্‌হা মানুষকে কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্যান্ত অবস্থায় খেয়ে ফেলেছে—এরূপ ঘটনার কথা জানা গেছে। এই জন্যে স্প্যানিয়ার্ডরা এই ভয়ঙ্কর মাছের নামকরণ করেন—ক্যারিবে (Caribe)। ক্যারিবে শব্দের অর্থ হলো নরভোজী।

শ্রীশান্তিকণা মৈত্র

ফড়িং

ছোটবেলায় লাল, সবুজ, কালো, হলদে, নীল প্রভৃতি বিচিত্র রঙের ফড়িং দেখে ধরতে চেষ্টা করে নি—এরূপ ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুবই কম হবে। নালা, ডোবা, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে, মাঠে-ঘাটে এবং অন্যান্য স্থানে এরা উড়ে বেড়ায়। এদের হাত দিয়ে ধরাও খুব সহজ নয়। এরা খুবই সতর্ক থাকে, একটু ভয় পেলেই এক জায়গা থেকে উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় বসে। নানারঙের অসংখ্য ফড়িং যখন কোন স্থানে বসে থাকে বা উড়ে বেড়ায় তখন তাদের প্রতি দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন জাতের নানা আকৃতির ফড়িং আমাদের দেশে দেখা যায়। ফড়িংয়ের চালচলন খুবই অদ্ভুত।

ফড়িংকে দেখলে মনে হয় যেন নেহাৎ গোবেচারী। কিন্তু পতঙ্গদের মধ্যে এরা ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। ছোট ছোট পোকামাকড় এবং স্বজাতিকে এরা শিকার করে আহার করে। এদের চরিত্রের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো—এরা মৃতদেহ খাওয়া তো দূরের কথা, স্পর্শ পর্যন্ত করে না—সদ্য শিকার করা পোকামাকড়ই এরা উদরসাৎ করে।

পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় হিসাব করলে—এরা পৃথিবীর অতি প্রাচীন বাসিন্দা। পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের মতে—প্রায় ২৪ কোটি বছর পূর্বে ফড়িং ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গেরাই প্রথম পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। পেলিওজোয়িক যুগের যে সব পতঙ্গের জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে, তাথেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে, তখন শত শত বিভিন্ন জাতীয় পতঙ্গ পৃথিবীতে ছিল। সে যুগে পতঙ্গদের দেহাকৃতি আধুনিক যুগের পতঙ্গদের দেহাকৃতির তুলনায় অনেক বড় ছিল। আধুনিক ফড়িংয়ের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ Meganeuron এর দেহাকৃতিও ছিল বিরাট। এই হিংস্র প্রাণীর দৈহিক দৈর্ঘ্য ছিল ১৪ ইঞ্চি এবং ডানার বিস্তার ছিল দু-ফুটেরও বেশী। পারমিয়ান এবং ট্রিয়াসিক যুগে পৃথিবীর জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। জুরাসিক যুগের সূচনার সঙ্গে পতঙ্গদের দৈহিক আকৃতিও ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে হয়তো পতঙ্গদের দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকবে। এই সময়েই আধুনিক ফড়িং বলতে আমরা যাদের বুঝি—তাদের আবির্ভাব ঘটে।

জুরাসিক যুগের পরবর্তী কয়েক কোটি বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবী এবং তার অধিবাসীদের নানারূপ পরিবর্তন হয়। অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অক্ষম হওয়ায় চিরতরে পৃথিবী

থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। যারা টিকে থাকে—তাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে হয় নানা পরিবর্তন। অবশ্য সামান্য সংখ্যক জীবের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়—অর্থাৎ তাদের আকৃতি বা স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এই সামান্য সংখ্যক জীবের মধ্যে ফড়িংও অন্যতম। এখনকার ফড়িংয়ের দেহাকৃতি ও স্বভাব জুরাসিক যুগের তাদের জ্ঞাতিদেরই মত।

ফড়িং সর্বদা কর্মব্যস্ত, বিশ্রাম এরা অতি অল্পই গ্রহণ করে। এরা কেউ কারো উপর নির্ভরশীল নয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর থেকে খাদ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ফড়িংয়ের শারীরিক গঠন, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারণের পদ্ধতি এমনই যে, এরা অনায়াসে যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানিয়ে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত।

ফড়িং পুরাপুরি আমিষভোজী। এক ফড়িং তার চেয়ে ছোট অন্য ফড়িংকে আক্রমণ করে হত্যা করে—তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে ডেলার মত করে রস চুষে খায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা উড়ন্ত শিকারকে আক্রমণ করে। লতা-পাতা বা অন্য কোন স্থানে এরা ডানা প্রসারিত করে (ফড়িং ডানা মুড়তে পারে না) এবং লেজটাকে সামান্য উঁচু করে চুপচাপ বসে থাকে। শিকার ধরবার আশায় এরা অনেক সময় বসে থাকে আর গোল মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে থাকে। সুযোগ পেলেই ছোঁ-মেরে শিকারকে আক্রমণ করে। এদের ড্যাবডেবে চোখ দুটি যেন সারা মাথাটাই জুড়ে রয়েছে। মাথাটা ছোট একটু গলার সাহায্যে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত। এদের প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী, ধারালো চোয়াল। এই চোয়ালই এদের প্রধান হাতিয়ার।

ফড়িংয়ের ক্ষুধাও সাংঘাতিক এবং খাদ্যের পরিমাণও বিস্ময়কর। বিজ্ঞানীদের মতে—ফড়িং তাদের দৈহিক ওজনের তুলনায় বেশী ওজনের খাদ্য গ্রহণে সক্ষম। ফড়িংয়ের ওড়বার ক্ষমতাও রীতিমত বিস্ময়কর। অন্যান্য পতঙ্গদের পক্ষে এদের সঙ্গে উড্ডয়নে পাল্লা দেওয়া রীতিমত কঠিন। মিনিটে ১৬০০ বার ডানা আন্দোলিত করে প্রতি ঘণ্টায় এরা ৬০ মাইল বেগে উড়তে সক্ষম।

সাধারণতঃ প্রখর রোদের সময় বেশী সংখ্যক ফড়িংকে বিচরণ করতে দেখা যায়। রোদের তেজ কমে গেলে অনেক সময় এরা চুপচাপ বসে থাকে। প্রখর রোদের মধ্যে উড়ন্ত ফড়িংয়ের রঙের ঔজ্জ্বল্য যেন অনেকটা বেড়ে যায়।

ফড়িং সাধারণতঃ জলের ধারে কাটায়। পুরুষ ফড়িংয়ের বিচরণ স্থানের সীমানা খুব বেশী নয়। ডিম পাড়বার সময় ছাড়া ফড়িং পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে বিচরণ করে।

ডিম পাড়বার সময় হলে পুরুষ ফড়িং তার শরীরের পিছনের দিকে সাঁড়াশীর মত নখরের সাহায্যে স্ত্রী-ফড়িংটির মাথার পিছনটা জোড়ে আঁকড়ে ধরে থাকে। তারপর দুজনে একসঙ্গে উড়তে থাকে।

জলের উপর উড়ন্ত অবস্থায় লেজটাকে বাঁকিয়ে স্ত্রী-ফড়িং জলে ডিম পাড়ে।

কয়েক জাতের স্ত্রী-ফড়িং ডাঙ্গায়ও ডিম পাড়ে। স্ত্রী-ফড়িং তার লেজের প্রান্তদেশে অবস্থিত সরু একটি উপাঙ্গের সাহায্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে।

ডিমগুলির রং কালো এবং আকারে অন্যান্য পতঙ্গের ডিমের তুলনায় বড় হয়। প্রায় দু-সপ্তাহ বাদে ডিম ফুটে কীড়া (Nymph) বের হয়। কীড়াগুলি ছোট থেকে ক্রমশঃ এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চির মত বড় হয়। আকৃতি ছোট গুব্‌রে পোকার মত। শরীরটা চ্যাপ্‌টা এবং পিছনের দিকটা চওড়া ও শিরদাঁড়ার মত উঁচু। জলের আবর্জনার সঙ্গে এদের গায়ের রং এমনভাবে মিশে থাকে যে, এদের সহজে চেনা যায় না। এরা জলের নীচে ঘোরাফেরা করে। ছোট ছোট জলচর পোকা শিকার করে আহার করে। এদের মুখে শুঁড়ের মত লম্বা একটা পদার্থ আছে, তার প্রান্তভাগ দেখতে চামচের মত। সেটা বুকের কাছে ভাঁজ করা থাকে। খানিকটা দূর থেকে এটাকে বাড়িয়ে দিয়ে এবা ছোঁ-মেরে শিকার ধরে। এরা পায়ের সাহায্যে জলের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় আবার প্রয়োজন হলে শরীরের পিছন দিক থেকে পিচ্‌কারির মত তীব্রবেগে জল বের করে জলের ধাক্কায় ছিট্‌কে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায়। খাদ্যবিহীন কাচের চৌবাচ্চায় একাধিক ফড়িংয়ের কীড়া রেখে দেখা গেছে—এরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ কবে এবং বিজয়ী বিজিতকে আহার করে। শিকারের সন্ধানে এরা ধৈর্য সহকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। এদেব মারাত্মক শত্রু হচ্ছে ব্যাঙাচি, মাছ প্রভৃতি প্রাণী। আণুবীক্ষণিক জলচর কীটাণু লাল রঙের মাইট এদের বুকে লেগে থাকে এবং তাদের শরীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে। পরজীবী এই মাইটগুলি ফড়িঙের কীড়াগুলির ভয়ানক শত্রু। কীটগুলি একাধিকবার খোলস বদ্‌লে পূর্ণাঙ্গ ফড়িঙের আকৃতি গ্রহণ করে।

পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে বাচ্চা ফড়িং কোন জলজ লতাপাতা বা গাছের গা বেয়ে জলের কিছুটা উপরে উঠে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। তারপর দেহের চামড়া শুকিয়ে যাবার পর ঘাড়ের কাছ থেকে পিঠের কিছুটা পর্যন্ত উপরের খোলসটা লম্বালম্বি চিড় খেয়ে ফেটে যায়। চিড়-খাওয়া অংশটার ভিতর থেকে একটা মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আসতে থাকে। প্রথমে বের হয় মাথা আর বুক, ক্রমে ক্রমে দেহের বাকী অংশটা বেরিয়ে আসে। প্রথমে ফড়িংটার মাথা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। দেহটা পুরা বেরোবার পর প্রাণীটা পরিত্যক্ত খোলসটা আকড়ে বসে থাকে। তখন তার ডানা আর লেজ থাকে খুব ছোট, শরীরও তখন নরম এবং দুর্বল। এই অবস্থায় এরা উড়তে পারে না। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলতে থাকে এবং লেজটা ক্রমান্বয়ে স্ফীত ও সঙ্কুচিত হতে থাকে। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লেজ ও ডানা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এরা পূর্ণাঙ্গ ফড়িঙে রূপান্তরিত হয়। রোদে এদের শরীর শুকিয়ে কঠিন এবং শক্তিশালী হয়। এর পরে এরা স্বাধীনভাবে আকাশে বিচরণ করতে থাকে।

শ্রীশান্তি চক্রবর্তী

বিবিধ

মঙ্গলগ্রহের রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা

প্যাসাডেনা, ক্যালিফোর্ণিয়া — মেরিনার-৪ নামক মার্কিন মহাকাশযানটি মঙ্গলগ্রহের ছবি পাঠিয়েছে। এই সব ছবি থেকে মঙ্গলগ্রহের অজ্ঞাত পৃষ্ঠদেশের প্রথম পরিচয় পাওয়া যাবে এবং ঐ গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা তাও সম্ভবতঃ জানা যাবে।

১৪ই জুলাই মেরিনার-৪ মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে চলে যায়। মহাকাশযানটির ক্যামেরাগুলি কাজ সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ঠিকমত চলছে কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। মহাকাশযানের টেপ রেকর্ডারটিও প্রথমে ঠিক কাজ করছিল না বলে আভাস পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু পরে জানা যায় যে, সেটি ঠিকমতই কাজ করছে।

মহাকাশযানটি গত ২৮শে নভেম্বর (১৯৬৪) মহাকাশে প্রেরিত হয়। তার পর সাড়ে ৩২ কোটি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ১৪ই জুলাই রাত্রে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে মঙ্গলগ্রহের আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী অবস্থায় পৌঁছায়।

মঙ্গলগ্রহের প্রথম যে চিত্র মানুষের হাতে এসে পৌঁচেছে, পৃথিবীর মরু-অঞ্চলের সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়; কিন্তু এই গ্রহে প্রাণী আছে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু বোঝা সম্ভব হয় নি।

মেরিনার-৪ মহাকাশের পথ পরিক্রমাকালে মঙ্গলগ্রহের সাড়ে দশ হাজার মাইলের মধ্যে যে চিত্র তুলেছে, সেগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। দ্বিতীয় চিত্রের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে দেখা যায় মহাকাশের শূন্য অন্ধকার স্থান এবং চিত্রের এক-দিকে মঙ্গলগ্রহের সামান্য এক অংশ লক্ষ্য করা যায়। মরুভূমির মত এলাকাটির প্রান্তে দাগের মত যা দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো নীচু ধরণের পাহাড়, কালো রঙের মাটি অথবা গাছপালাও হতে পারে।

ম্যাড্রিডের নিকটস্থ রবলিডো ড চ্যাভেলা কেন্দ্রে মেরিনার-৪ কর্তৃক প্রেরিত মঙ্গলগ্রহের তৃতীয় চিত্রের প্রথম সঙ্কেত আসা সুরু হয়।

মহাকাশে ১৫ কোটি মাইল দূর থেকে মেরিনার-৪ মঙ্গলগ্রহের যে রেডিও-ফটো পাঠিয়েছে, তাথেকে বহু শতাব্দীর জিজ্ঞাসা— মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কি না—তার কোন উত্তর মিলবে না।

মেরিনার যে সব ছবি পাঠিয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা বিশ্লেষণ করে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পেয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রযুক্তি-বিজ্ঞান সংস্থার জনৈক বিজ্ঞানী ডাঃ আর বি লেটন বলেন যে, মেরিনার-৪-এর প্রেরিত এই ছবি মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণ দিতে পারবে না।

যে ছবি টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে, তা-থেকে বোঝা যায় যে, মঙ্গলগ্রহের ধার বা কিনারা খুবই তীক্ষ্ন। ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহগামী মহাকাশযান নির্মাণের সময় এটা বিবেচনা করা হবে। মঙ্গলগ্রহে তেমন কোন পাহাড়-পর্বত আছে বলেও মনে হয় না।

মঙ্গলগ্রহের জীবনের সম্ভাবনার কোন আভাস না পাওয়া গেলেও বৈজ্ঞানিকেরা এই ঐতিহাসিক অভিযানের সাফল্যে খুবই উৎফুল্ল হয়েছেন।

প্রথম যে ছবিটি সংগৃহীত হয়েছে, সেটি খুব বোধগম্য নয়। পরের ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হবে বলে মনে হচ্ছে।

ছবিতে কিনারার তুলনায় মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের

ছবি হাল্‌কা বলে মনে হচ্ছে। কিনারায় গভীর কালো মেঘ দেখা গেছে।

ডাঃ লেটন বলেন যে, মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশ সমান এবং ঘন কুয়াশায় ঢাকা। এর ছবি তোলা কঠিন। ছবিতে অনেক দাগ পড়েছে। ক্যামেরা পুরা ছবি ঠিক তুলতে পারে নি।

মঙ্গলগ্রহে খাল আছে বলে অনেকে যে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন, মিঃ লেটন তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ছবির উপরে যে দাগ পড়েছে, তা কিন্তু খাল নয়। ক্যামেরায় ঠিক ছবি ধরা পড়ে নি। উজ্জল মরুভূমির এলাকায় যে দাগ দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো কোন গহ্বর হবে বলে মিঃ লেটন মন্তব্য করেন।

যে এলাকাটি ফটোতে ধরা পড়েছে, তা ইলিসিয়াম মরু না হয়ে অন্য কোন মরু হতে পারে। এটি হয়তো ফ্লেগরা নামে পরিচিত মরু। প্রথম ফটোতে কোন্ মরুভূমির ছবি উঠেছে, আমাদের তা জানবার কোন উপায়ই নেই।

মঙ্গলগ্রহ থেকে প্রেরিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি বিশ্লেষণ করে জেট প্রপালসন লেবরেটরীর (পাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া) অধ্যক্ষ ডাঃ উইলিয়াম পিকারিং জানিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহে কোন এক ধরণের জীবন থাকতেও পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে ৩০,০০০ মিটার উর্ধ্বে যে ধরণের জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, কেবলমাত্র সেগুলিই মঙ্গলে থাকতে পারে (ভূপৃষ্ঠ থেকে অত উঁচুতে কেবলমাত্র জীবাণুই থাকতে পারে)।

ডাঃ পিকারিং আরও বলেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০,০০০ মিটার উর্ধ্বে যে বায়ুর চাপ রয়েছে, মঙ্গলগ্রহের বায়ুর চাপ প্রায় তারই সমান। সেখানকার বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের ভাগ অত্যন্ত বেশী—শতকরা ৭২ ভাগ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ। তাছাড়া নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন রয়েছে শতকরা ৮ ভাগ।

বিজ্ঞানীরা ১৭ই জুলাই মঙ্গলের আরও দুটি ছবি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, মঙ্গলে পার্বত্য এলাকা এবং গিরিখাত দেখা গেছে। বারো মাইল ব্যাসের আগ্নেয়গিরির মুখের মত একটি গহ্বরেরও সন্ধান মিলেছে।

প্যাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া, থেকে প্রেরিত ১৮ই জুলাই তারিখের এক খবরে প্রকাশ—মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-৪ মঙ্গলগ্রহ থেকে বেতারে যে ছবি পাঠাচ্ছে, তাতে এই রহস্যময় গ্রহের রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

১৮ই জুলাই পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ৬ খানা ছবি এসেছে, তার প্রথম তিনখানায় আরো এক রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলিতে মঙ্গলগ্রহে যে ছায়া দেখা গেছে, তা সূর্যের নয়। তার কারণ সূর্য তখন বিপরীত দিকে এবং প্রায় সোজাসুজি নীচের দিক থেকে কিরণ দিচ্ছিল (কারণ তখন মঙ্গলগ্রহের সময় মধ্যাহ্ন ১২টা)। তবে এই ছায়া কিসের?

যতটা আশা করা গিয়েছিল, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল তার চেয়ে অনেক বেশী পাত্‌লা আর চোখে দেখে মনে হয় পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের সঙ্গেই তার মিল বেশী।

কিন্তু জেট প্রোপালশন গবেষণাগারে (পাসা-ডেনা, ক্যালিফোর্ণিয়া) বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মঙ্গলগ্রহে কোন না কোন প্রকারের প্রাণ আছে বলে তাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন।

প্রাথমিক তথ্যাদি থেকে মনে হচ্ছে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে দু-তিন ভাগ বেশী ঘন, আর তার প্রধান অংশ হলো নাইট্রোজেন; অবশ্য কিছু আর্গন গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পও থাকতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমরা পৃথিবীতে প্রাণের যে নানা রূপের সঙ্গে পরিচিত, তার প্রায় কোনটিই ঐ অবস্থায় টিকতে পারে না। তাহলে মঙ্গলে কোন্ ধরণের প্রাণ আছে?

জীববিজ্ঞানী জেরাল্ড সোফেন বলেন—

মঙ্গলে প্রাণ আছে, মেরিনার-৪ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য বা আলোকচিত্রের দ্বারা আমাদের সেই ধারণার কোন পরিবর্তন হয় নি। এসব তথ্য থেকে আমরা যা অনুমান করেছিলাম, তার সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। তবে আমরা এও জানি যে, পৃথিবীতে এমন কয়েক রকমের প্রাণ আছে, যা ঐ ধরণের অর্থাৎ মঙ্গলের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে।

কোন কোন রোগবীজাণু পারমাণবিক চুল্লীর মধ্যে থেকে তার তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করতে পারে। কোন কোন শ্রেণীর জীবাণুর আবার জলেরই কোন প্রয়োজন হয় না—শুষ্ক মরুভূমি খুঁড়লেও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়। আরও এক ধরণের রোগবীজাণু আছে যাদের প্রাণধারণের জন্যে অক্সিজেনের-প্রয়োজন হয় না।

তিনি আরও বলেন—আমি বলছি না যে, মঙ্গল-গ্রহ নানাপ্রকারের প্রাণে সমৃদ্ধ, সম্ভবতঃ খুব অল্পই প্রাণ সেখানে আছে আর তার সন্ধান পেতে আমাদের খুবই খোঁজ করতে হবে। কিন্তু সন্ধান যে পাওয়া যাবে, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

১১ই জুলাই মেরিনার-৪ কর্তৃক গৃহীত মঙ্গলের যে দুটি ছবি বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন, তাতে মঙ্গলের পৃষ্ঠের কয়েকটি গহ্বরের চিহ্ন দেখা গেছে। সেগুলি আগ্নেয়গিরির মুখের মত দেখতে। তবে জেট প্রোপালশন গবেষণাগারের ডাঃ বুস মারে এর কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃত হন।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মার্টিন শোয়ারৎস্‌চাইল্ড ১১ই জুলাই প্যালেষ্টাইনে (টেকসাস) বলেছেন, মেরিনার-৪ কর্তৃক আলোকচিত্র গ্রহণ মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠাবার পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ১৯৮০ সাল নাগাদ মঙ্গলে পৌছানো যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

প্রকৃতির ছলনা

ওয়েলিংটন, নিউজিল্যাণ্ড থেকে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ—মাত্র দুই মিনিট কয়েক সেকেণ্ডের একটি পরীক্ষার জন্যে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এক নগণ্য প্রবাল দ্বীপে ৩০শে মে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছিল। দশ লক্ষাধিক ষ্টার্লিং মূল্যের যন্ত্রপাতি নিয়ে তাঁরা সেখানে হাজির হয়েছিলেন।

সূর্য উঠবে এবং কয়েক মিনিট পরেই চন্দ্রের ছায়া সূর্যকে ঢেকে ফেলবে—আরম্ভ হবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। দেখা যাবে, সৌরবলয় থেকে উৎক্ষিপ্ত সৌরশিখা মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অকস্মাৎ সূর্যের আলোক-প্রবাহের গতিরোধ করে দিল মেঘ। পৃথিবীর বায়ুস্তরে আয়নমণ্ডলে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা দেখে নেবার জন্যে এই বিপুল উদ্যোগ ও আয়োজন এবং পৃথিবীর নানা দেশের কয়েক শত বিজ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল।

প্রবাল দ্বীপের জনহীন বেলাভূমিতে রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পতাকা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছিল এবং তার নীচে অধীর আগ্রহে বসেছিলেন বিজ্ঞানীরা।

মাত্র দুই মিনিট ১৭ সেকেণ্ড স্থায়ী হবে গ্রহণ। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি তথ্য জেনে নিতে হবে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী গবেষণাগারে বসে থেকেও সম্ভব হয় না।

নির্মল নীল আকাশের নীচে বিজ্ঞানী যন্ত্রপাতিগুলির ঢাকনা খুলে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সূর্য উঠবে, তারও কয়েক মিনিট পরে হবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ।

সূর্যগ্রহণ সুরু হবার চরম মুহূর্তটি আসবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন মেঘের ঝাঁক ছুটে এসে সূর্যকে একেবারে ঢেকে ফেললো।

একটি অতি বৃহৎ প্রয়াসের মর্মান্তিক ব্যর্থতা। ক্ষুব্ধ ও হতাশায় ভেঙ্গেপড়া বিজ্ঞানীরা সে মেঘপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে গালিগালাজ সুরু করে দিলেন, কেউ বা ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কেউ বা নিজের টুপিটি খুলে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেললেন।

কেউ কেউ মেঘ, চন্দ্র ও সূর্যের এই ছলনার মধ্যেও মেঘস্তরের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরবীক্ষণের দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিলেন। দেখতে পেলেন, রক্তবর্ণ সৌরশিখা সৌরবলয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অতি সামান্য দৃশ্যই তাঁরা দেখতে পেয়েছেন, যদি পুরা দৃশ্যটা তাঁরা দেখতে পেতেন, তবে নাকি মানুষের জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চার সর্বাধিক আকর্ষণীয় ঘটনাটির তাঁরা সাক্ষী হয়ে থাকতেন।

দুই মিনিটস তেরো সেকেণ্ডের মধ্যে গ্রহণ শেষ। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য—সরলরেখা থেকে সরে যেতে সুরু করলো।

একটি অতিপ্রতীক্ষিত আশার মর্মান্তিক অবসাদের কাহিনী সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞানীরা সেদিন নিজ নিজ দেশের দিকে রওনা হয়ে যান।

সৌর চলচ্চিত্র

প্যাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এ. পি. প্রেরিত খবরে প্রকাশ—বাত্যাতাড়িত অরণ্য—অবশ্য সে অরণ্যে গাছ নেই। গাছ বলতে সেখানে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ অগ্নিশিখা। ঝড়ের মুখে ওরা একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে, আবার খাড়া হয়ে উঠছে, কখনও বা সূর্যদেহে মিলিয়ে যাচ্ছে · এক মুহূর্তও স্থির থাকছে না।

মাউণ্ট উইলসন লেবরেটরীতে সূর্য-দেহের যে চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ অগ্নিতরঙ্গ সূর্য-দেহের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও বা তাথেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সে শিখা ৫ হাজার মাইল দীর্ঘ, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলির বেড় তিন হাজার মাইল।

এই শিখার তাপমাত্রা ২৫ হাজার ডিগ্রি থেকে ১ লক্ষ ডিগ্রি (ফারেনহাইট)।

দূরবিস্তৃত 'অরণ্যে' মাঝে মাঝে 'ঝোপ'ও রয়েছে। সেগুলি আর কিছুই নয়—অপেক্ষাকৃত শীতল এলাকা—অগ্নি-সমুদ্রের 'দ্বীপ'। পৃথিবী থেকে মানুষ এতদিন তাকে সৌরকলঙ্ক বলেই জেনে এসেছে।

সৌর-টেলিস্কোপের সহায়তায় এই চলচ্চিত্রে এখন সূর্যের যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হলো।

কলহের মহৌষধি

নিউ ইয়র্ক থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—নিউইয়র্ক চিড়িয়াখানার চারটা গরিলা সব সময়েই মন-মেজাজ খারাপ করে থাকতো, সর্বদাই তাদের বিরক্তির ভাব—অথবা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি চালাতো।

শেষ পর্যন্ত ওদের খাঁচার বাইরে একটি টেলিভিসন সেট রেখে দিয়ে চমৎকার ফল পাওয়া গেল। এখন আর ঝগড়াঝাটি করে না, মন খারাপ করেও বসে থাকে না।

এই সংবাদটি দিয়েছেন ঐ চিড়িয়াখানার কিউরেটর।

দুর্লভ সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কৃত

দিল্লী থেকে পি টি. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে পোগোমোফোরা নামে একটি দুর্লভ সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে।

এর্নাকুলামে কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত জনৈক ভারতীয় মৎস্য-বিজ্ঞানী এই আবিষ্কারের সংবাদ দিয়েছেন।

এই বিজ্ঞানী হচ্ছেন ডাঃ ই. জি. সাইলাস। তিনি ভারত-নরওয়েজিয়ান প্রকল্প অনুসারে বরুণ নামক জাহাজ থেকে এই অঞ্চলের সমুদ্রে গবেষণা চালাবার সময় এই প্রাণীটিকে আবিষ্কার করেন।

ইতিপূর্বে ভারত মহাসাগরে গবেষণার সময় রুশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এ. ভি. আইভানব

ভারতীয় মহাসাগরে এরূপ প্রাণীর অস্তিত্বের বিষয় জানিয়েছিলেন।

মাছের হাসপাতাল

টোকিও থেকে নাফেন কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—বিশ্বের অনেক দেশেই এখনও মানুষের চিকিৎসার জন্যে যথাযোগ্য উপযুক্ত সংখ্যক হাসপাতাল নেই; কিন্তু জাপানে সম্প্রতি মাছের হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে।

প্রকাশ, নাগোয়ার নিকটে সম্প্রতি জাপানের এই প্রথম মৎস্য হাসপাতালের উদ্বোধন হয়েছে। এই হাসপাতালে এক্স-রে মেসিন, ইনডাষ্ট্রিয়াল টেলিভিশন ক্যামেরা এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি সুবৃহৎ লেবরেটরিও আছে।

মুক্তার জন্যে বিখ্যাত টোবা নদীর তীরে এই মাছের হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছে। এই হাসপাতাল স্থাপনে ব্যয় হয়েছে ৫০,০০০ ডলার।

চাঁদে মানুষের নামা শক্ত হবে

মস্কো থেকে পরিবেশিত এ. পি-র সংবাদে প্রকাশ—চাঁদের উপর এত বেশী ধূলা যে, সেখানে মানুষের পথে নামা বেশ শক্ত হবে। সোভিয়েট রকেট লুনা-৫ মারফৎ এই তথ্য পাওয়া গেছে। ঐ রকেটের যন্ত্রপাতি ভালভাবেই কাজ করেছিল, কিন্তু রকেটটি চাঁদে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল—ধীরে ধীরে নামতে পারে নি।

মহাকাশ গবেষণায় ভারত

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং কয়েকটি দেশের সহযোগিতায় ভারত গত ১৮ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে আকাশে ২৭টি রকেট ছেড়েছে। ত্রিবান্দ্রমের ১০ মাইল উত্তরে থুম্বা থেকে রকেটগুলি ছাড়া হয়েছে।

ঐ সব রকেট ছাড়বার ফলে যে সব তথ্য জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির সঙ্গে একত্রে তা কাজে লাগানো হবে।

পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত বেশ কিছুদিন কাজ করছে, কিন্তু মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা সম্প্রতি আরম্ভ করেছে।

ভ্রম সংশোধন :—গত জুলাই'৬৫ সংখ্যার ৩৯৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ২৩শ পংক্তিতে হবে—"একটি চতুর্থ ঘাতকে দুটি চতুর্থ ঘাতের যোগফলে অথবা সাধারণভাবে দুই-এর বেশী কোন ঘাতকে দুইটি সেই ঘাতের…"

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ | নবম সংখ্যা

প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ

অনিলকুমার ঘোষাল

গ্যাসীয় প্লাজ্‌মার ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাসের মতই প্রচীন। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে গত চার দশকে বৈজ্ঞানিকদের অবিরাম গবেষণার ফলে। প্লাজ্‌মা পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থা—যা কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্য অনেক সময় প্লাজ্‌মাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হইয়া থাকে। গ্যাস আয়নিত হইলে প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয়। প্লাজ্‌মা কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ইহা সমপরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মুক্ত কণিকার সমাবেশ। যখন বিপরীত ধর্মী কণিকাগুলি পৃথক হইবার চেষ্টা করে, তখন শক্তির উদ্ভব হয় এবং ইহাই তাহাদের একত্র থাকিতে বাধ্য করে। প্লাজ্‌মায় উদাসীন (Neutral) কণিকা থাকিতে পারে বা নাও পারে, কিন্তু প্লাজ্‌মা বৈদ্যুতিকভাবে উদাসীন।

প্লাজ্‌মা সম্পর্কিত গবেষণায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ যে আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহার কারণ, মানুষের বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষেত্রে প্লাজ্‌মা সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্য। মহাকাশ-যানের জ্বালানী ম্যাগ্‌নেটোহাইড্রোডিনামিক বিদ্যুৎ উৎপাদক, যাহার সাহায্যে তাপ হইতে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়—থার্মোনিউ-ক্লিয়ার রিয়্যাক্টর প্রভৃতি কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আমরা যেহেতু প্রকৃতিকে জয় করিতে উৎসুক, সেহেতু প্লাজ্‌মা সম্পর্কিত আলোচনা প্রকৃতির অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করিতে পারে।

কিন্তু প্লাজ্‌মা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করিতে চাহিলে প্রথমেই তাহার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কথা আসিয়া পড়ে। ইলেকট্রনের ঘনত্ব ও ইহার বণ্টন (Distribution), ইলেকট্রনের তাপ, আয়নের তাপ, ইলেকট্রন বা আয়নের বেগ, একটি ইলেকট্রনের সহিত অপর একটি ইলেকট্রনের ঘর্ষণ সংখ্যাঙ্ক (Collision Frequency), প্লাজ্‌মার অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও বিভব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রধানতঃ নিরূপিত হয়। এই সকল বৈশিষ্ট্য নিরূপণের বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাদের মধ্যে এক একটি পদ্ধতি এক একটি বৈশিষ্ট্য নিরূপণে উপযোগী; অর্থাৎ সকল প্রণালীকেই সকল বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে সমান নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যায় না। গবেষণাগারে গ্যাসীয় প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে যে পদ্ধতি খুব বেশী ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রয়োগ কৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ল্যাংমুর প্রোব

প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিভব ও ইলেকট্রনের ঘনত্ব মাপিবার ইহা একটি সরাসরি পদ্ধতি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ল্যাংমুর ও মট স্মিথ প্রথম ইহার ব্যবহার করেন এবং তারপর নানা উন্নততর উপায়ে ইহার ব্যবহার হইতেছে। প্রোব (Probe) একটি সরু ধাতু-নির্মিত তার, যাহাকে প্লাজ্‌মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ১নং চিত্রে একটি সাধারণ ল্যাংমুর প্রোব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্লাজ্‌মার মধ্যস্থিত প্রোবের বিভব ধীরে ধীরে পরিবর্তন করিয়া তদনুসারে প্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। যাহাতে প্রোবের একদিক মাত্র প্লাজ্‌মার সংস্পর্শে আসে, সেই জন্য প্রোবে কাচের একটি উপযুক্ত আবরণী থাকে। প্রোবের আয়তন আয়ন এবং ইলেকট্রনের Mean Free Path অপেক্ষা কম হওয়া প্রয়োজন।
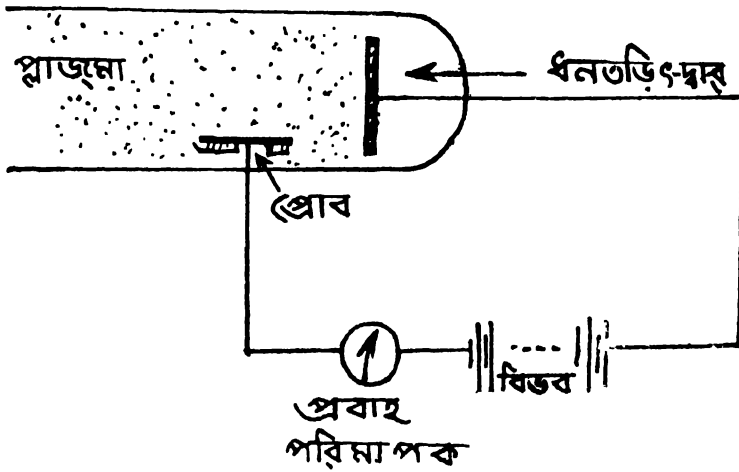
১নং চিত্র।

ল্যাংমুর প্রোব পরীক্ষার ব্যবস্থা।

প্রোব-পদ্ধতির অবশ্য কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্লাজ্‌মার মধ্যে প্রোবে এক সময়ে একটি মাত্র স্থান হইতে প্রবাহ হয়, অর্থাৎ ইহার দ্বারা একই সময়ে সম্পূর্ণ প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব নহে। তদুপরি প্রোবের উপস্থিতিও প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তন করে। দুই বা ততোধিক প্রোব ব্যবহার করিয়া ইদানীং

উন্নততর ভাবে প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ পদ্ধতি স্বভাবতঃই প্রথমোক্ত পদ্ধতি অপেক্ষা জটিলতর।

পরিবাহিতা প্রোব

আমরা জানি, প্রত্যেক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী দোলকে (R. F. Oscillator) একটি কুণ্ডলী থাকে। এই কুণ্ডলী দোলকের কম্পন-সংখ্যা নির্ণয়ে আংশিকভাবে দায়ী। উক্ত কুণ্ডলীর মধ্যে প্লাজ্‌মার নল বসাইলে দোলকের কম্পন-সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। কম্পন-সংখ্যা নির্ভর করে প্লাজ্‌মার নলের পরিবাহিতার উপর। এইভাবে কম্পন-সংখ্যা মাপিয়া প্লাজ্‌মার পরিবাহিতা (Conductivity) এবং তাহা হইতে ইলেকট্রনের ঘনত্ব, ঘষণ-সংখ্যা প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মি পদ্ধতি

ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মির (Microwave) সাহায্যে প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের অনেক ভাল পদ্ধতি আছে। ইলেকট্রনের ঘনত্ব খুব বেশী না হইলে এই পদ্ধতি খুবই সুবিধাজনক, কারণ তখন ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মির বৈশিষ্ট্য ও প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্বন্ধ সরল থাকে। ইলেকট্রনের ঘনত্ব অধিক হইলে অবশ্য এই সম্বন্ধ জটিল হয়।

ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মির গমনাগমনের পথে যদি প্লাজ্‌মাকে স্থাপন করা যায়, তবে রশ্মির বৈশিষ্ট্য, যথা—দশা (Phase) ও বিস্তারের পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তন মাপিয়া প্লাজ্‌মা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তরঙ্গ-বাহকের (Wave guide) মধ্যে প্লাজ্‌মার নল স্থাপন করা যাইতে পারে। এরূপ একটি প্রণালী ২নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। প্লাজ্‌মার নলটিকে এখানে তরঙ্গ-বাহকের সহিত আড়াআড়িভাবে রাখা হইয়াছে। উহাকে লম্বালম্বিভাবে রাখিয়াও প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। এইভাবে বশিষ্ট্য মাপিবার সময় লক্ষ্য রাখা প্রযোজন যে, তরঙ্গ-বাহকের বৃহত্তর বাহু যেন প্লাজ্‌মার নলের ব্যাসার্ধ অপেক্ষা বেশ বড় (অন্ততঃ দশ গুণ) হয়।
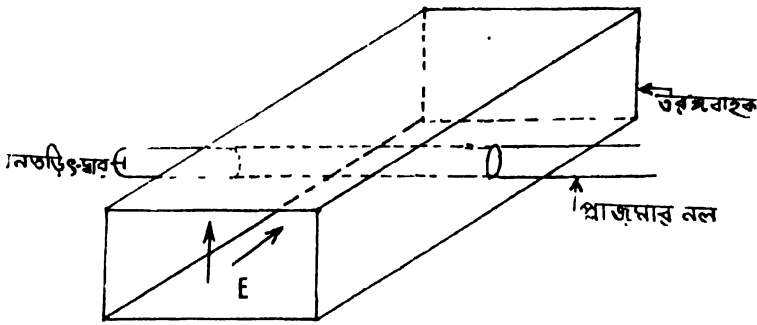
২নং চিত্র।
তরঙ্গ-বাহকে প্লাজ্‌মার নলের অবস্থান।

পরিবাহী ধাতুর দ্বারা গঠিত সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত কোন স্থানকে একটি Cavity বলা যায়। প্রত্যেক ক্যাভিটির নির্দিষ্ট অনুনাদী কম্পন-সংখ্যাঙ্ক আছে। ইহা নির্ভর করে পরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যবর্তী বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর। এরূপ ক্যাভিটি ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মির বর্তনীতে অনুনাদক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনুনাদী সংখ্যাঙ্ক ব্যতীত প্রত্যেক অনুনাদকের গুণ বুঝাইবার জন্য একটি ধ্রুবক ব্যবহার করা হয়—যাহাকে বলে অনুনাদকের Q বা Quality Factor। একটি

নির্দিষ্ট অনুনাদকের Q অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যা; কারণ ইহা অনুনাদকের শক্তি ধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়। একটি প্লাজ্‌মা নলকে একটি অনুনাদকে প্রবেশ করাইলে উহার অনুনাদী কম্পন-সংখ্যা ও Q উভয়ই পরিবর্তিত হয়। এই দুইয়ের পরিবর্তন জানিয়া প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য, যথা—ইলেকট্রনের ঘনত্ব এবং ঘর্ষণের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব। এই পরীক্ষাতেও দুইটি বাহু আছে এবং উভয়কে একই রশ্মির উৎস হইতে শক্তি সরবরাহ করা হইতেছে। এক বাহুতে প্লাজ্‌মা ও বিস্তার-নিয়ামক সংলগ্ন আছে। অপর বাহুতে আছে দশা-পরিবর্তক, সংখ্যাঙ্ক-পরিমাপক ও বিস্তার-নিয়ামক ব্যবস্থা। রশ্মিকে ইচ্ছামত প্রথম বা দ্বিতীয় বাহুর মধ্য দিয়া প্রেরণ করা যাইতে পারে। বাহুদ্বয়ের অপর প্রান্তে আছে ক্রিষ্টাল ডিটেক্টর, পরিবর্ধক ও প্রবাহ-পরিমাপক। প্রথমে
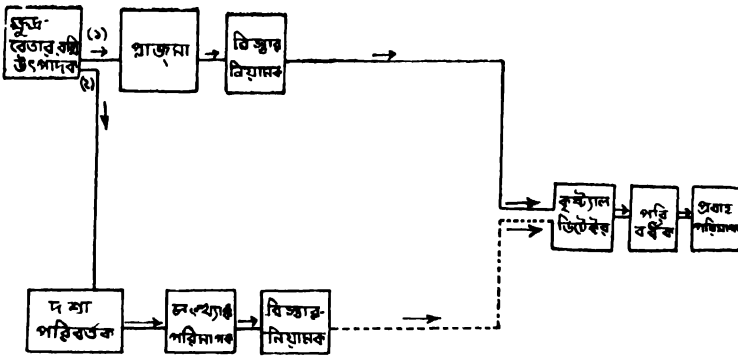
৩নং চিত্র।

ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মি—Interferometer

মনে রাখিতে হইবে যে, অনুনাদকের ব্যাসার্ধ প্লাজ্‌মার নলের ব্যাসার্ধ অপেক্ষা যেন বেশ বড় (অন্ততঃ দশ গুণ) হয়।

ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মি—Interferometer

যখন ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মি অগ্রগমনের পথে প্লাজ্‌মার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন রশ্মির বিস্তার (Amplitude) ও দশার (Phase) পরিবর্তন হয়। প্লাজ্‌মার উপস্থিতিতে রশ্মির বিস্তার কমে, কারণ প্লাজ্‌মা রশ্মির কিছু শক্তি শোষণ করিয়া লয় ও কিছু শক্তি প্রতিফলিত করে। প্লাজ্‌মার পথে গমনের জন্য তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন মাপা হয় Interferometer-এর সাহায্যে। একটি ক্ষুদ্র বেতার-রশ্মির Interferometer-এর অপরিহার্য অংশগুলি ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। ইহার প্লাজ্‌মাহীন অবস্থায় প্রথম বাহু হইতে প্রবাহ মাপা হয়। তারপর প্লাজ্‌মা থাকা অবস্থায় প্রবাহ পরিমাপক ভিন্ন প্রবাহ সূচিত করে। এখন প্রথম বাহু হইতে রশ্মির আগমন বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় বাহুর দশা-পরিবর্তকের দ্বারা রশ্মির দশা পরিবর্তন করিয়া ও বিস্তার-নিয়ামকের সাহায্যে প্রবাহ আবার পূর্বের মাত্রায় ফিরাইয়া আনা হয়। এই ভাবে আনিবার জন্য দশা-পরিবর্তকের যে পরিবর্তন করিতে হইল ও বিস্তার-নিয়ামকের যতখানি পরিবর্তন ঘটাইতে হইল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের Interferometer ব্যবহার করা হইতেছে।

অন্যান্য

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলি পদ্ধতির নাম করা যাইতে পারে, যাহার দ্বারা খুব ভালভাবেই প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য মাপা সম্ভব হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে Spectroscope-এর ব্যবহার। বস্তুতঃ প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে Spectroscopy একটি অতি মূল্যবান অংশ গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা প্লাজ্‌মার রাসায়নিক গঠন, তাপমাত্রা, ইলেকট্রনের ঘনত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে প্লাজ্‌মাকে সামান্যমাত্রও প্রভাবিত না করিয়া অনুসন্ধান করা যায়। প্লাজ্‌মাস্থিত আয়নের উপর নির্ভর করে ইহার গড় গতীয় (Kinetic) শক্তি। আবার আয়নের বিশৃঙ্খল গতি রেখা-বর্ণালীকে ফিতা-বর্ণালীতে রূপান্তরিত করে। ফিতা-বর্ণালীর বিস্তার মাপিয়া আয়নের তাপমাত্রা জানা যায়।

যে গ্যাসীয় ক্ষরণে অতি তীব্র আলোর সৃষ্টি হয়, উচ্চগতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফীর সাহায্যে এরূপ ক্ষরণে ইলেকট্রনের গতি নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য ফটো তুলিবার সময় বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।

থার্মোনিউক্লিয়ার প্লাজ্‌মাতে আয়নের তাপমাত্রা ও ইলেকট্রনের ঘনত্ব জানিবার উপায় হইতেছে থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নিউট্রনের সংখ্যা গণনা করা। গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই গণনাকার্য সহজেই সম্পাদন করা যায়। এই বিশেষ পদ্ধতি Neutron Detection Technique নামে পরিচিত।

জ্যোতিষ্কের কথা

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

রাতের আকাশে যে অগণিত তারকা দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকটি এক একটি সূর্য। সূর্যের মতই তারা তাপ ও আলোক প্রদান করে; তবে অনেক দূরে আছে বলে আকাশে বিন্দুর মত ছোট দেখায়। সূর্য থেকে KM-এর মাপে উপগ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এদের বড় বড় সংখ্যাকে ছোট করে বলবার জন্যে ভিন্ন এক ধরণের একক (Unit)-এর সৃষ্টি হয়েছে। সেটি হলো সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব। এই দূরত্বকে জ্যোতিষিক একক (Astronomical Unit) বলা হয়—অর্থাৎ ১ জ্যোতিষিক একক হলো—১৪৯৪'৫ লক্ষ KM। তারকার দূরত্ব মাপবার বেলায় এই জ্যোতিষিক এককের পরিমাপও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। কাজেই এদের দূরত্ব মাপবার জন্যে আর এক রকম এককের (Unit) সৃষ্টি হয়েছে।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাতে আলোর কিছুটা সময় লাগে। এক সেকেণ্ডে আলোর গতি মোটামুটিভাবে ৩০০,০০০ KM। এক বছরে আলো যত দূর পর্যন্ত পৌঁছায় সেটা হলো জ্যোতিবিদ্যার অন্য একক (Unit)। একেই বলা হয় এক লাইট-ইয়ার বা আলোক-বর্ষ।

১ লাইট-ইয়ার = ৬৩৩১০ জ্যোতিষিক একক (Astronomical Unit) = ৯'৪৬১ × ১০^{১২} অর্থাৎ ৯৪৬১০০০০০০০০০, KM। এই হিসেবে সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে ৮ মিনিট সময় লাগে। এর মানে হলো, সূর্য ওঠবার ৮ মিনিট পরে আমরা দেখি সূর্য উঠেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর এক প্রকার এককের (Unit) কথা এখানে বলে রাখি। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে লাইট-ইয়ার বা আলোক-বর্ষের চেয়ে এই এককের ব্যবহার বেশী। এই একককে বলা হয় পারসেক (Parsec)। পারসেকের পরিমাণ দেওয়া গেল।

১ পারসেক = ৩.২৫৮ আলোক-বর্ষ
= ২০৬২৬৪ জ্যোতিষিক একক
= ৩.০৮৪ $\times$ ১০^{১৩}KM.

এখন যে তারকা আমাদের সবচেয়ে কাছে আছে, তার দূরত্ব প্রায় তিন আলোক-বর্ষ; অর্থাৎ সেই তারকা থেকে আমাদের এখানে আলো আসতে তিন বছর লাগে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৮ মিনিট। আর সবচেয়ে দূরের তারকা থেকে আলো আসতে কত বছর লাগে বলা কঠিন—তবে ১৮০০০ বছর লাগলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

আকাশের তারকাগুলির আকার বিভিন্ন রকমের। এদের বড়-ছোটর পার্থক্য কেবল যে নিকট আর দূরের জন্যে তা নয়, প্রকৃতপক্ষে এরা আকার এবং ওজনে পরস্পর থেকে বিভিন্ন। দেখা গেছে, আকার এবং ওজনে সূর্য সকল তারকার মাঝামাঝি। কোন কোন তারকা সূর্য থেকে আয়তনে বহুগুণ বড়; আবার সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট তারকাও আছে। সূর্যের ব্যাসের ৪৮০ গুণ ব্যাসযুক্ত তারকা যেমন আছে, তেমনি আবার $\frac{১}{১০০}$ অংশ ব্যাসযুক্ত তারকাও দেখা যায়। কিন্তু তারকার ওজনের পার্থক্য এত অধিক নয়। এই পর্যন্ত যা দেখা গেছে, তাতে সবচেয়ে বড় আয়তনের তারকা ওজনে সূর্যের ৩০ গুণ এবং সবচেয়ে ছোটটির আয়তন ০.১৪ গুণ মাত্র। বড়টির নাম α বৃশ্চিক (α Scorpei A) এবং ছোটটির নাম ভ্যান-ম্যানেন (Van-Mannen) তারকা।

আকাশের দিকে তাকালেই দেখা যায় যে, সব তারকার রং এক রকমের নয়। কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি হল্দে, কোনটি বা সাদা। এই রঙের পার্থক্যের কারণ—তারকার বহির্ভাগের তাপমাত্রার বিভিন্নতা। এক খণ্ড লোহাকে আগুনে গরম করতে থাকলে প্রথমে গরম হয়—কোন আলো তা থেকে বের হয় না। আরও গরম হলে গাঢ় লাল এবং ক্রমে উজ্জ্বল লাল ও হল্দে আভা দেখা দেয়। পরে লৌহখণ্ড উজ্জ্বল সাদা রং ধারণ করে। তারকার ক্ষেত্রেও এরূপ হয়। লাল তারকার বহির্ভাগের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, আর নীল তারকার তাপমাত্রা অনেক বেশী। সূর্যের রংও মোটামুটি সাদা। সূর্যের বহির্ভাগের তাপমাত্রা মাঝামাঝি—প্রায় ৬০০০° সেঃ। এই রঙের পার্থক্য অনুসারে তারকাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ হলো—O, B, A, F, G, K, M, R, N, S। আমাদের সূর্য G শ্রেণীর অন্তর্গত। আলোকবিহীন তারকার সন্ধানও পাওয়া গেছে। কেবল তাপমাত্রার পার্থক্যই নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর তারকার মধ্যে অন্যান্য অনেক কিছুতে পার্থক্য আছে। কেবল পার্থক্যই নয়, প্রত্যেক তারকারই বিভিন্ন জীবনেতিহাস আছে। আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারকাদের আয়তন, গুরুত্ব, তাপমাত্রা এবং অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

মনে প্রশ্ন জাগে যে, সূর্য যেমন একটি তারকা এবং গ্রহ-উপগ্রহ যেমন তার সন্তান-সন্ততি হিসাবে অবস্থিত, তাহলে আকাশে যে অগণিত তারকা দেখা যায়, তাদেরও কি সূর্যের মত গ্রহ-উপগ্রহ আছে? হয়তো বা আছে কোন কোন তারকার। সম্প্রতি দুই-একটি তারকার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, অধিকাংশ তারকার গ্রহের কোন সন্ধান মিলে নি। কিন্তু দেখা যায়, কোন কোন তারকা একক নয়—তারা যুগ্ম। দুটি তারকা একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। তাদের সংখ্যা

নেহাৎ কম নয়! ১ ইঞ্চি বাইনোকুলারে যে সব তারকা দেখা যায়, উত্তর গোলার্ধে সেই সব তারকার মধ্যে ৫৪০০টিই যুগ্ম—অর্থাৎ প্রতি ১৮টির মধ্যে একটি যুগ্ম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুইয়ের অধিক তারকায় ৩-৪টি তারকা একত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। অনেক ক্ষেত্রে বড় দুরবীক্ষণেও এই সব তারকাগুলিকে পৃথকভাবে দেখা যায় না। এগুলির আবিষ্কার হয়েছে অন্য উপায়ে।

অনেক তারকা আছে,যাদের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের একটা ধারা আছে—প্রভা ক্রমশঃ কমে, পরে আবার বেড়ে গিয়ে এক সীমায় পৌঁছে, তারপর আবার কমতে থাকে। এই পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ কালের মধ্যে ঘটে থাকে। সব পরিবর্তনশীল তারকার পরিবর্তনকাল এক না হলেও কোন কোন তারকা একই কালের মধ্যে এই পরিবর্তন-চক্র শেষ করে। এই সব তারকাকে পরিবর্তনশীল তারকা বলা হয়। এদের সংখ্যাও খুব কম নয়।

এছাড়া আর এক প্রকারের তারকার সন্ধান পাওয়া গেছে। কোন ক্ষীণজ্যোতি তারকা, যাকে হয়তো সাধারণ দুরবীক্ষণেও দেখা যায় না—হঠাৎ এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, কেবল শুধু চোখে দেখাই নয়, অনেক উজ্জ্বল তারকা থেকেও উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে—আবার কিছুকাল পরে নিষ্প্রভ হয়ে তার প্রায় আগের প্রভায় এসে পড়ে। এগুলিকে নোভা (Nova) অর্থাৎ নবতারকা বলা যেতে পারে।

আমরা কথায় বলি, তারকা অসংখ্য। কিন্তু পরিষ্কার অন্ধকার রাত্রে আমরা খালি চোখে যত তারকা দেখতে পাই, দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা অনুসারে তাদের সংখ্যা ৬০০০ থেকে ৭০০০-এর মধ্যে। যার দৃষ্টিশক্তি প্রখর সে ৭০০০ পর্যন্ত তারকা খালি চোখে দেখতে পারে। তারকার মোট সংখ্যা হবে প্রায় ৩×১০^{১০}-এর মত।

পরিষ্কার অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই সব তারকা সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। মোটামুটিভাবে উত্তর দক্ষিণ দিয়ে এক আলোর ছটা আকাশকে যেন দু-ভাগে বিভক্ত করেছে। এই আলোর ছটাকে ছায়াপথ বলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, তারকাগুলি যেন এরই কাছাকাছি ভীড় করে আছে। ছায়াপথ থেকে দূরে সমকোণের দিকে ক্রমেই তারকার সংখ্যা কম হয়ে এসেছে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ছায়াপথ থেকে দূরে সমকোণের দিকে বেশীর ভাগ তারকাই উজ্জ্বল।

দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে ছায়াপথের আলোর ছটাকে দেখলে দেখা যায় যে, বহু তারকার সমাবেশে এই আলোর ছটার সৃষ্টি। তাদের দূরত্বের জন্যে এবং আমাদের দৃষ্টিপথের কাছাকাছি বলে আমরা এই তারকাগুলিকে পৃথকভাবে দেখতে পাই না—ছটারূপে দেখি। এই কথার অর্থ এই যে, এই ৩×১০^{১০} সংখ্যক তারকা বহু দূরে দূরে অবস্থিত হলেও আকাশের একই দিকে বিস্তৃত রয়েছে—ছায়াপথের সমকোণের দিকে বিস্তার অনেক কম।

এই ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্য সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও অধিক দীপ্তিসম্পন্ন, কোথাও বা অন্ধকার গলিপথে ঢুকে পড়েছে। এই সব দীপ্তি অথবা অন্ধকার যে কেবল তারকার সমাবেশ বা তার অভাবের দরুণ, তা নয়। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, কোন প্রকার শীতল বায়বীয় বা আলোকহীন অতি ক্ষুদ্র কণাসমন্বিত পদার্থ আকাশের সেই সব অংশ ছেয়ে আছে। কোন উজ্জ্বল তারকা যদি এই সমাবেশের কাছাকাছি থাকে, তবে তারই আলোকে তাকে দীপ্তিমান দেখা যায়। এরাও ছায়াপথেরই অন্তর্গত। এদের বলা হয় নীহারিকা।

গ্রহ-উপগ্রহ সকলেই গতিশীল। এই সব তারকারও কি গতি আছে? পরীক্ষার ফলে জানা গেছে—এরাও দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। তাদের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটি ৬ থেকে ১৮ KM পর্যন্ত। সূর্যও চুপ করে বসে নেই।

গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যও প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ KM গতিতে ছুটে চলেছে।

এখন বিশেষ কয়েকটি তারকার পরিচয় দিচ্ছি। একক তারকাকে তারা বা তারকা বলা হয়। কিন্তু আকাশে একসঙ্গে অবস্থান করে বলে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি তারকাকে নক্ষত্রমণ্ডল বা Constellation বলা হয়। যেমন ধ্রুবকে একটি তারকা আর সপ্তর্ষি কোন এক বিশেষ তারকা সমাবেশকে Constellation বা নক্ষত্রমণ্ডল বলা হয়। প্রাচীন কালে এই সব নক্ষত্রমণ্ডলকে এক একটি বিশেষ মানুষ বা জীবজন্তুর মত কল্পনা করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে; যেমন—সপ্তর্ষি—৭ ঋষির নামে। এই সব নক্ষত্রের কল্পনায় জীব-জন্তুর নামও আছে; যেমন—বৃশ্চিক বা Scorpion। বর্তমানে সব তারকাকেই কোন না কোন নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্গত করা হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তারকার নিজস্ব নাম আছে, বাকী সকলের নক্ষত্রের নামেই পরিচয়—নক্ষত্রের পূর্বে ল্যাটিন বর্ণ α, β, γ ইত্যাদি অথবা ১, ২, ৩ যুক্ত করে বিশেষ বিশেষ তারকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ α, β ইত্যাদির ক্রম হয়—উজ্জ্বলতম নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে; যেমন—α Scorpii, Scorpion নক্ষত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা।

সব মাসে আকাশে নক্ষত্রের সমাবেশ এক থাকে না। প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যায় যে, তারকাগুলি ক্রমে পশ্চিমের দিকে অস্ত যায়। কিন্তু আকাশে তাদের উদয়ের স্থান এক থাকে না। আজ সন্ধ্যায় কোন তারকাকে যে জায়গায় দেখা যাবে, দু-চার দিন পরে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেটি আরও পশ্চিমে সরে গেছে। এভাবে ক্রমে ক্রমে একই সময়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—একই তারকা ক্রমে পূব থেকে পশ্চিমে সরে আসে। কিন্তু সব তারকা একই হারে সরে থাকে; কাজেই তাদের সমাবেশ বা সজ্জার কোনই পরিবর্তন হয় না। এই দুই গতির কারণ আমাদের পৃথিবীর গতি। আহ্নিক গতি অর্থাৎ অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তনের ফলে প্রতি রাত্রে তারকাকে ক্রমে পশ্চিমে সরে যেতে এবং অস্তগমন করতে দেখা যায়। আর সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ফলে তারকাকে দিনের পর দিন ক্রমে পশ্চিমে সরতে দেখা যায়। আজ কোন এক সময়ে আকাশের গায়ে কোন এক স্থানে যে তারকা আছে, ঠিক এক বছর পরে অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পূর্বের জায়গায় উপস্থিত হলে আমরা পূর্বের সেই তারকাকে আকাশে ঠিক একই স্থানে দেখতে পাব। প্রকৃতপক্ষে তারকার এই স্থান পরিবর্তন থেকেই আমরা পৃথিবীর গতির বিষয় জানতে পারি। তা না হলে পৃথিবী স্থির না গতিশীল, তা জানা কঠিন হতো।

এই সব তারকার মধ্যে একটি তারকাকে কিন্তু জায়গা বদল করতে দেখা যায় না। সেটি হলো ধ্রুবতারা। উত্তর দিকে তার অবস্থিতি। একে চিনতে হলে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে চেনাই খুব সহজ। এই ধ্রুবনক্ষত্রও অন্যান্য তারকার মতই গতিশীল। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময়ে উত্তর আকাশে লক্ষ্য করলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকারে একই রঙের উজ্জ্বল ৭টি তারকার সমাবেশ দেখা যাবে। এর মাথার দুটি তারকাকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে সামনের দিকে টেনে নিলে যে তারকার প্রায় উপর দিয়ে যাবে, সেটিই হলো ধ্রুবতারা। ধ্রুবনক্ষত্রটি দেখতে বিশেষ বড় নয়। সপ্তর্ষির সবকয়টি তারকার চেয়ে ক্ষীণ, তবে তার আশেপাশের অন্য সব তারকার চেয়ে উজ্জ্বল। মনে হবে যেন এই ধ্রুবকে ঘিরেই আকাশের সব তারকা বৃত্তাকারে পূব থেকে পশ্চিমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই গতির মধ্যে ধ্রুব থেকে তাদের দূরত্ব সব সময়েই এক থাকে। পৃথিবীর অক্ষরেখার উপর আছে বলে ধ্রুবতারার কোন গতি দেখা যায় না।

ধ্রুবনক্ষত্রের যে দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, তার উল্টা

দিকে প্রায় সমদূরত্বে আর একটি বিশেষ পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল আছে—ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia)। ৫টি তারকা মিলে যেন ইংরেজী W অক্ষরের মত হয়েছে।

সপ্তর্ষির লেজের লাইনকে তেমনই বক্রভাবে বাইরের দিকে প্রসারিত করলে দুটি বড় তারকার পাশ দিয়ে যায়। প্রথমটির রং লাল—নাম চিত্রা (Acturus)। অপরটি নীল—নাম স্বাতী নক্ষত্র (Spica)।

অক্টোবর মাসের প্রতি সন্ধ্যায় পূবের আকাশ থেকে আরম্ভ করে ফেব্রুয়ারীর পশ্চিম আকাশে এক নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থান দেখা যায়। তার নাম কালপুরুষ (Orion)। একে এক যোদ্ধা পুরুষ-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের প্রায় মাথার উপর দিয়ে এর গতিপথ। দক্ষিণ-পূব দিকে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হলো লুব্ধক (Serius)।

তা ছাড়া কৃত্তিকা (Pleiades) নামে এক নক্ষত্র-মণ্ডল আছে—যাকে চেনা খুব সহজ। সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মার্চ পর্যন্ত আমাদের আকাশে দেখা যায়। এই মণ্ডলে ৬।৭টি তারকা এমনভাবে জড়াজড়ি করে আছে যে, তাদের গুণে নিতে অসুবিধা হয়। কালপুরুষের পশ্চিম দিকে এর অবস্থান। কালপুরুষ ও কৃত্তিকার মাঝামাঝি একটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণের তারকা—নাম তার রোহিণী (Aldebaran)।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, বড়ই হোক, কি খুব ছোটই হোক, কতকগুলি তারকার বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে। সেগুলি হলো পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণের কক্ষপথের উপরে বা নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত তারকা। প্রসঙ্গান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হতে পারে।

ইটের কথা

শ্রীফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়

মানুষের নগর-সভ্যতার ইতিহাসে ইটের ছাপ অনস্বীকার্য। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুস ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণে ইট ব্যবহার করে আসছে। খৃষ্টের জন্মেরও বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ইটের ব্যবহারের কথা জানতে পারা গেছে। মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে, রামায়ণ-মহাভারতেও এদেশে প্রাচীন কাল থেকে ইটের ব্যবহারের কথা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারা গেছে।

ইট বলতে বুঝায় অজৈব পদার্থে তৈরি ষট্-সমান্তর পার্শ্ব-বিশিষ্ট ঘনক্ষেত্রের আকৃতির এমন বস্তু, যা সহজেই নাড়াচাড়া করা যায় এবং যার দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ ও উচ্চতা প্রস্থের একটু কম। পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন মাপের ইট তৈরি হয়ে থাকে, যেমন—

স্থান	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা যথাক্রমে
বৃটেন	৮ ৩/৪", ৪ ১/২", ২ ৫/৮", (অথবা ২ ৭/৮").
আমেরিকা	৭ ৩/৪", ৩ ৩/৪", ২ ১/৪"
গ্রামীন বাংলা ইট	১০", ৫", ৩"
বাংলা পি. ডব্লিউ. ডি.	৯ ১/২", ৪ ৩/৪", ২ ১/২"
বোম্বাই "	৯", ৪ ১/৪", ২ ১/২"
উত্তর ভারত "	৯ ৩/৪", ৪ ৩/৪", ২ ৭/৮" ইত্যাদি।

ইট তৈরির প্রধান উপাদান মাটি (Clay)। তাছাড়াও মাটির সঙ্গে থাকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ পর্যন্ত অ্যালুমিনা, ৫০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত বালুকা আর কিছু পরিমাণ লোহার অক্সাইড এবং ম্যাগ্নেসিয়া। অ্যালুমিনা মাটির প্রধান উপাদান এবং অন্যান্য উপাদানকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখে, মাটির নমনীয়তা রক্ষা করে এবং কাঁচা ইট পোড়াবার পর ইটকে শক্ত করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং সুমিশ্রিত বালি কাঁচা ইট শুকাবার সময় বাষ্পীভবন ও ইটের সংকোচন রোধ করে, পোড়াবার পর ইটের আকার রক্ষা করে। লোহার অক্সাইড প্রধানতঃ ইটের লাল রঙের জন্যে দায়ী, আর ম্যাগ্নেশিয়ার কাজ বলতে বোঝায় কিছু পরিমাণ সংকোচন রোধ এবং ইটকে হল্দে রঙে পরিণত করা।

ইট তৈরি করতে গেলে সাধারণতঃ চারটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। যেমন :—

প্রথমতঃ সুবিধামত জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ মাটি কেটে নিতে হবে। এই মাটির ভিতর থেকে উদ্ভিদ, শক্ত ডেলা, নুড়ি, পাথর ইত্যাদি বাছাই করে ফেলে দিতে হবে। এর পরের কাজ হচ্ছে মাটির সঙ্গে সঠিক পরিমাণে খড়িমাটি এবং বালি মেশানো। জমির উপর প্রথমে বালি, তারপর খড়িমাটি এবং তারপর মাটি সাজানো হয় এবং পরিমাণমত জল ঢেলে ইট তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়।

এর পরের কাজ হচ্ছে মোল্ডিং। মোল্ডিং-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইট তৈরির জন্যে প্রস্তুত মাটিকে একটা সঠিক আকার দেওয়া। এর জন্যে প্রধানতঃ কাঠের বা ইস্পাতের ছাঁচ ব্যবহার করা হয় এবং ছাঁচের আকার ইটের আকারের চেয়ে একটু বড় হয়। যেমন—ধরা যাক, ৯২/৪" × ৪২/৪" × ২৩/৪" আকারের ইট তৈরি করা হবে। এর জন্যে ১০২/৪" × ৫২/৪" × ৩" আকারের ছাঁচ নেওয়া হয়। ছাঁচের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি ফেলে হাত দিয়ে চারদিকে চাপ দেওয়া হয় এবং তারপর লোহার তার দিয়ে উপরের মাটি বাদ দিয়ে কাঁচা ইট রোদে শুকাবার জন্যে বিছানো হয়।

১ নং চিত্র· সাধারণ ইট·

২ নং চিত্র· ইটের কাজ·

এছাড়া যন্ত্রের সাহায্যেও মোল্ডিং করা যেতে পারে। হাতের চেয়ে যন্ত্রের সাহায্যে মোল্ডিং করলে অল্প সময়ে অনেক বেশী ইট পাওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানে হাতে মোল্ডিং করা হয়।

এর পরের কাজ হচ্ছে কাঁচা ইট শুকানো। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাটির উপরকার জলকণা বাষ্পীভূত করা। তাছাড়া এই সময়েই ইট প্রধানতঃ শক্ত হতে থাকে—যাতে কাঁচা ইট পোড়াবার সময় যেটুকু নাড়াচাড়া দরকার, তা সহ্য করতে পারে। সাধারণতঃ রোদেই ইট শুকানো হয়। এই হচ্ছে ইট শুকাবার প্রাকৃতিক উপায়। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে উষ্ণ বাষ্প-প্রবাহের দ্বারাও ইট শুকানো যায়।

অবশেষে আসে ইট পোড়াবার পালা। ইট সাধারণতঃ ভাটা (Kiln) বা পাঁজায় (Clamp) পোড়ানো হয়। ইট পোড়াবার পর সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; যেমন—

১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাটিতে মিশ্রিত জল বাষ্পীভূত হয়। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত জল বাষ্পীভূত হতে ৪০০° থেকে ৬০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

এর পরে হচ্ছে জারণের (Oxydation) পালা। এই সময় অক্সিজেনের সঙ্গে মাটির নানাবিধ উপাদানের সংযোগে বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া

সংঘটিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে $4FeO+O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$। এর জন্যে প্রধানতঃ ৩০০° থেকে ৯০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রার প্রয়োজন।

সর্বশেষে হয় ভিট্রিফিকেশন। এই সময় ইট শক্ত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। এর ফলে মাটির একাংশ গলে যায় এবং অন্যান্য অংশের সঙ্গে লেগে থাকে। এর জন্যে ৯০০° সেণ্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কাঁচা ইট পোড়ানোই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্য পর্যায়ে ত্রুটি হলেও ভাল করে পোড়ানো ইট কাজের পক্ষে উপযোগী। অপর পক্ষে কাঁচা ইট পোড়ানো ভাল না হলে অন্যান্য কাজ আশানুরূপ হওয়া সত্ত্বেও খারাপ ইটের উৎপাদন বেড়ে যায়। সুতরাং এই পর্যায়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ইটের আকার ও গুণের তারতম্য অনুযায়ী স্থপতিরা একে চারটি ভাগে ভাগ করে থাকেন। যেমন—প্রথম শ্রেণীর ইট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট, তৃতীয় শ্রেণীর ইট এবং ঝামা ইট। আকার, ওজন, রং, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সব দিক থেকেই প্রথম শ্রেণীর ইট সর্বোৎকৃষ্ট। তারপর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ইটের স্থান। ঝামা ইট প্রধানতঃ বিভিন্ন কংক্রিটের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এই গেল সাধারণ ইটের কথা। তাছাড়া আজকাল নানা ধরণের ইট তৈরি হচ্ছে। মাটির বদলে কয়লার ছাইয়ের সাহায্যেও ইট তৈরি করা যায়। প্রধানতঃ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, রেলওয়ে ও বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে কয়লার ছাই উৎপন্ন হয়। একমাত্র সিন্ধ্রির সার কারখানা-তেই প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ টন পর্যন্ত কয়লার ছাই উৎপন্ন হয়ে থাকে। আগে এগুলি দিয়ে কোন কাজ হতো না—নষ্ট হয়ে যেত। এখন কয়লার গুঁড়া, ছাই এবং মাটি যথাক্রমে ৬০:৪০ অথবা ৫০:৫০ অনুপাতে মেশানো হয় এবং ৯০০° থেকে ১০০০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পুড়িয়ে এই ধরণের ইট তৈরি করা হয়। তৈরি হবার পর এর রং হয় গাঢ় ধূসর, বেশ শক্ত হয় এবং নানারকম কাজে ব্যবহার করা যায়।

তাছাড়া প্রধানতঃ চুন এবং বালির সাহায্যেও ইট তৈরি করা যায়। বালি, চুন এবং অন্যান্য পদার্থ যথাক্রমে ৯০:১:৩ অনুপাতে নিয়ে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে মেশানো হয়। এই মিশ্রণ ইস্পাতের ছাঁচে ঢেলে যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে শক্ত ও গাঢ় পদার্থে পরিণত করা হয়। তারপর কাঁচা ইট বায়ুশূন্য ইস্পাতের সিলিণ্ডারে মুখবন্ধ করে রাখা হয় এবং উষ্ণ বায়ু-প্রবাহের দ্বারা পোড়ানো হয়। এই ধরণের ইটকে ইচ্ছামত নানা রঙে পাওয়া যেতে পারে। তবে প্রধানতঃ ফিকে সাদা হয়ে থাকে তাছাড়া লাল বা সবুজ রংও করা যেতে পারে এগুলি দীর্ঘস্থায়ী।

তাছাড়া বর্তমানে সিমেণ্ট ও বালির ইট, সিমেণ্ট-চুন-বালির ইট, সিমেণ্ট কংক্রিটের ফাঁপা ইট প্রভৃতি বেশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমান ভারতে ইটের চাহিদা, উৎপাদন এবং ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সামান্য কিছু বলে এই বিষয় শেষ করবো। আজকের ভারতে ইটের চাহিদা খুব বেশী, কারণ এদেশে গৃহ-সমস্যা খুব প্রকট এবং একথা অনস্বীকার্য যে, বাড়ী তৈরির প্রধান উপাদান ইট জনসাধারণের ব্যক্তিগত চাহিদা ছাড়াও ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত সরকারী কাজের জন্যে প্রচুর ইটের চাহিদা রয়েছে। আজকের দিনে শুধু বাড়ী তৈরির জন্যেই নয়, বড় বড় রাস্তা, বাঁধ, বন্দর, বাতিঘর, বিমানপোত রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি বহুবিধ কাজের জন্যেও অসংখ্য ইটের দরকার।

কিন্তু ভারতে ইটের উৎপাদন এখনও আদিম অবস্থাতেই রয়ে গেছে এবং এদেশে চাহিদার

তুলনায় ভাল ইটের উৎপাদনের পরিমাণ সত্যই খুব কম। এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছে ইট উৎপাদনে বেশী পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম নিয়োগ। ভারতবর্ষে মাটি কাটা থেকে ইট পোড়ানো পর্যন্ত প্রতিটি কাজ অতি মন্থর ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়। অপর পক্ষে বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে প্রচুর ইট উৎপন্ন হয়ে থাকে। এদেশে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইটের কারখানা স্থাপিত হয়। একথা ঠিক যে, ব্যক্তিগত মূলধনে বড় বড় যন্ত্রস্থাপন, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া ব্যাপক যান্ত্রীকরণের ফলে হয়তো বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। তাই সব দিক বিবেচনা করে এক্ষেত্রে অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

ট্র্যানজিষ্টরের গোড়ার কথা

শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস

১৮৯৫ সালে জে. জে. টমসন কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কার করবার পর থেকে তখনকার দিনের এবং তার পরবর্তী কালের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের নিকট পদার্থ-বিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার নতুন একটা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানে তাই সব ঘটনাকে ইলেকট্রন মতবাদ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। রেডিওর আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগেই করেছেন; কিন্তু ট্র্যানজিষ্টারের আবিষ্কার প্রায় ১৫।১৬ বছর আগের ঘটনা। কি ভাবে ট্র্যানজিষ্টরের ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তা একটু জেনে রাখা দরকার।

ট্র্যানজিষ্টারের বিষয় আলোচনা করবার আগে থার্মো-আয়নিক ভাল্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন এবং কি ভাবে এই থার্মো-আয়নিক ভাল্ব ব্যতীত ট্র্যানজিষ্টরের ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, তা আলোচনা করবো।

রেডিও-বর্তনীতে (Radio Circuit) থার্মো-আয়নিক ভাল্ব ব্যবহার করা হয়—একথা আমরা কম-বেশী মোটামুটিভাবে সবাই জানি। সাধারণ ভাবে বায়ুশূন্য কাচের বাল্বের মধ্যে সূক্ষ্ম তারের কুণ্ডলী অর্থাৎ ফিলামেণ্ট এবং অ্যানোড (Anode) দিয়েই এই ভাল্ব প্রস্তুত করা হয়। সাধারণ ভাবে প্রস্তুত এই ধরণের ভাল্বকে ডায়োড (Diode) ভাল্ব বলে। ফিলামেণ্ট এবং অ্যানোডের মধ্যবর্তী স্থানে একটি তারের জাল (Grid) স্থাপন করলে প্রস্তুত হবে ট্রায়োড (Triode) ভাল্ব। এছাড়া টেট্রোড (Tetrode), পেণ্টোড (Pentode) প্রভৃতি ভাল্বের গঠন-প্রণালীও পূর্বানুরূপ। যখন কোনও ভাল্বের ফিলামেণ্টের দুই প্রান্তে কোন বিভব-প্রভেদ (Potential difference) সৃষ্টি করা হয়, তখন ঐ ফিলামেণ্টের উপরিভাগ থেকে অসংখ্য থার্মো-আয়ন নির্গত হয় এবং ঐ নির্গত থার্মো-আয়ন আলোর গতির সমান গতিতে (৩×১০^{১০} সেণ্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে) অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। ফিলামেণ্ট থেকে নির্গত থার্মো-আয়নের চলাচলের ফলে ভাল্বের ভিতরে সৃষ্টি হয় থার্মো-আয়নিক প্রবাহ এবং এই থার্মো-আয়নিক প্রবাহকে রেডিও-বর্তনীতে কাজে লাগানো হয়।

ট্র্যানজিষ্টরের ভিতরে কিন্তু কোন বায়ুশূন্য ভাল্ব থাকে না—এখানে বায়ুশূন্য ভাল্বের

পরিবর্তে সেমিকণ্ডাক্টর (Semiconductor) জাতীয় কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন চালনা করে বিদ্যুৎ-প্রবাহের কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। এখানে জানা দরকার যে, সেমিকণ্ডাক্টর পরিবাহী এবং অপরিবাহীর অন্তর্বর্তী এক তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থ। সাধারণভাবে আমরা সবাই জানি যে, পরিবাহীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়; অপরিবাহীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থের ধর্ম কিরূপ ?

বায়ুশূন্য স্থানের ভিতরে যে ভাবে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয়, কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের প্রবাহ ঠিক সেই ভাবে হয় না। কঠিন পদার্থের ভিতরে ইলেকট্রনের স্বাভাবিক গতি (৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে) বজায় থাকে না। বায়ুশূন্য স্থানে ইলেকট্রন মুক্তভাবে স্বাভাবিক গতিতে চলাচল করে; কিন্তু কঠিন পদার্থে অসংখ্য অণু-পরমাণুর ভিতর দিয়ে মুক্তভাবে চলাচল করা সম্ভব নয়। তাই প্রথম অণু থেকে দ্বিতীয় অণু, দ্বিতীয় অণু থেকে তৃতীয় অণু, তৃতীয় অণু থেকে চতুর্থ অণু—এইভাবে কণ্ডাক্টর বা সেমিকণ্ডাক্টরের ভিতর ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটে থাকে। স্বাভাবিক বলে যে সব কঠিন পদার্থের ইলেকট্রনকে স্থানচ্যুত করা যায় না, সাধারণভাবে সেই সব পদার্থকে অপরিবাহী বলা হয়।

এছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থ আছে, যা আমরা কেলাসিত অবস্থায় পেয়ে থাকি। কেলাসিত অবস্থায় প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যের পরমাণুগুলি পর্যাবৃত্ত আকারে (Periodic form) সজ্জিত থাকে। এদের মধ্যে দুটি পরমাণুর মধ্যস্থিত দূরত্বকে ক্রিষ্ট্যাল ল্যাটিশ বলে। বিভিন্ন কেলাসের ক্রিষ্ট্যাল ল্যাটিশ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ একে অ্যাংষ্ট্রম ($১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার) এককে প্রকাশ করা হয়। জার্মেনিয়াম ঠিক এমনই একটি কেলাস এবং এই জার্মেনিয়ামকে ট্র্যানজিষ্টরের ভিতরে ব্যবহার করে বায়ুশূন্য ভাল্‌বের অভাব পূরণ করা হয়।

কিভাবে এই জার্মেনিয়াম কেলাসকে কাজে লাগানো হয়, ইলেকট্রন মতবাদ অনুযায়ী তা একটু পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। জার্মেনিয়াম পরমাণুর গঠন সাধারণ পরমাণুর গঠনের মত। কেন্দ্রীনকে (Nucleus) কেন্দ্র করে ৪টি কক্ষ (Orbit) আছে এবং এই ৪টি কক্ষে মোট ৩২টি ইলেকট্রন আছে। ইলেকট্রন সজ্জার সাধারণ সূত্রানুযায়ী ($N = 2n^2$) প্রথম ৩টি কক্ষে মোট ২টি ইলেকট্রন আবদ্ধ অবস্থায় আছে। এখানে N কক্ষে অবস্থিত মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং n-এর মান প্রথম অক্ষে ১, দ্বিতীয় অক্ষে ২, তৃতীয় অক্ষে ৩—ইত্যাদি। অবশিষ্ট ৪টি ইলেকট্রন ৪র্থ কক্ষে অবস্থিত এবং এই ৪টি ইলেকট্রনকে মুক্ত ইলেকট্রন বলা হয়। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি পার্শ্ববর্তী অন্য পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম।

বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম ক্রিষ্ট্যাল গঠনের সময় তার আভ্যন্তরীণ পরমাণুগুলি নিজেদের ভিতর ল্যাটিশ আকারে সজ্জিত হয়ে যায়। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি পার্শ্ববর্তী পরমাণুর সঙ্গে সমভাবে অংশ গ্রহণ করে। কাজে কাজেই কোনও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র মুক্ত ইলেকট্রনের অভাবে কোন প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে না। এই হচ্ছে 0°K তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের অবস্থা। এখন যদি খুব অল্প পরিমাণ অ্যান্টিমনি (প্রায় ১০০ মিলিয়ন ভাগে ১ ভাগ) জার্মেনিয়ামের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়, তবে ঐ মিশ্রণ জার্মেনিয়াম ও অ্যান্টিমনির মিশ্রণ-ক্রিষ্ট্যালে পরিণত হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অ্যান্টিমনির পরমাণুতে ৫টি মুক্ত ইলেকট্রন বিদ্যমান। জার্মেনিয়ামের ৪টি মুক্ত ইলেকট্রন অ্যান্টিমনির ৪টিমুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অ্যান্টিমনির অবশিষ্ট ১টি ইলেকট্রন তড়িৎ-

পরিবাহীর কাজ করে। এই অবিশুদ্ধ অ্যান্টিমনি জার্মেনিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জার্মেনিয়াম সেমিকণ্ডাক্টরের মধ্যে তড়িৎ পরিবহনের সহায়তা করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অ্যান্টিমনির পরিবর্তে বোরন ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতু যুক্ত করে জার্মেনিয়ামের ভিতর পরিবাহিতার সহায়তা করা যায়। যেহেতু বৈদ্যুতিক প্রবাহকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হিসাবে কল্পনা করা হয়, সেহেতু অ্যান্টিমনি সহ জার্মেনিয়াম কৃষ্ট্যাল ব্যবহার করে ট্র্যানজিষ্টরে ভাল্‌বের অভাব পূরণ করা হয়।

শিক্ষাব্রতী ও জনহিতৈষী ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

দেখতে দেখতে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীর বৎসর উদযাপিত হয়ে এলো। সংবৎসরব্যাপী এই আয়োজনের সমাপ্তি পর্বে তাঁর বিষয়ে কিছু লেখা বা আলোচনার উদ্দেশ্য—তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা। আমরা যেন শতবার্ষিকীর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়ে আলোচনার যবনিকা পাত না করি, বরং এই স্মরণীয় বছরে যে আলোচনা সুরু হলো, তা চিরকাল যেন দেশের জনগণের ভিতর সজীব থাকে। বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ে এবং পুরাতত্ত্বের মধ্যে তাঁর নির্দেশিত কর্মপন্থা অবলম্বন করে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসুগণ যেন হিন্দুদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানের বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

একথা সকলেরই সুবিদিত আছে যে, আচার্য-দেব প্রথম জীবনে দার্শনিক Hegel (১৭৭০-১৮৩১) মতবাদের সবিশেষ অনুগামী ছিলেন; কিন্তু পরে অবশ্য তাঁর উক্ত মতবাদের পরিবর্তন হয়। দর্শনাচার্যদেব যে সব মৌলিক মতবাদ উপস্থাপিত করে গিয়েছেন, তা নিয়ে প্রবন্ধটি ভারাক্রান্ত করা প্রয়োজন বোধ করি না—ইতিপূর্বে তা নানা পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য দর্শন বিষয়ে অগাধ বারিধিতুল্য তাঁর জ্ঞান-গরিমা সকলকে স্তম্ভিত করে দেয়।

জ্ঞানরাজ্যে দর্শনাচার্য ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান অমূল্য হয়ে থাকবে সুলেখক ও কবিরূপে। দেশ-বিদেশের যে সব সুধী ও মনীষীবৃন্দ সশ্রদ্ধচিত্তে আচার্যদেবের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী প্রাজ্ঞ সার মাইকেল স্যাড্‌লার (ইনিই এক সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষণ কমিশনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তদনুযায়ী এই কমিশন "স্যাডলার কমিশন" নামে পরিচিত)। ডাঃ শীলের সঙ্গে সার মাইকেলের পরিচয় ও কাজের ফলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে এবং সার মাইকেল ব্রজেন্দ্রনাথকে অন্যতম গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। সার মাইকেলের মত জ্ঞানীও ব্রজেন্দ্রনাথকে "Guide, philosopher and friend" বলে স্বীকার করেছিলেন।

এখানেই শেস নয়। সার মাইকেল ব্রজেন্দ্র-নাথের ইংরেজি রচনাশৈলীরও এই প্রসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখ ও সুখ্যাতি করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথের ইংরেজি Vocabulary-তে দখল এবং রচনা-বৈশিষ্ট্য। সার মাইকেলের মতে ইংরেজির মত বিদেশী ভাষায় যে সব ভারতীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান মনীষী। এক কথায় সার মাইকেলের শ্রদ্ধাঞ্জলির ভাবার্থ যা

দাঁড়ায়, তা হলো এই যে, ব্রজেন্দ্রনাথের মত জ্ঞানীর সংস্পর্শে এসে স্যার মাইকেল বিশেষরূপে লাভবান হয়েছিলেন।

শুধু তথ্য ও মৌলিকতাপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করেই ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, অন্য লেখকের পুস্তকে মুখবন্ধ লিখে বা কোন প্রকাশোন্মুখ পত্রিকার প্রতি শুভকামনা ও অনুরাগ জানিয়ে প্রেরণা দিতেও এই চিন্তানায়ক পরাঙ্মুখ হতেন না। শেষোক্ত রকমের এক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করি।

"বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর BENGAL MAGAZINE প্রকাশ হয়তো তারই অন্যতম কারণ। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল যে, এই মাসিক পত্রিকায় হাল্কা ধরণের কিছু লেখা থাকলেও মূলতঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হবে এবং দেশের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীর উপযুক্ত হবে। যাঁরা প্রবন্ধাদি রচনা করে পত্রিকাখানিকে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার দে, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্রকুমার শীল* প্রভৃতি ছিলেন।

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জনহিতব্রতী প্রয়াস অন্য ভাবেও দেখা যায়। ১৯১৪ খৃষ্টশতকে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের কাছ থেকে রামমোহন লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার হিন্দুদর্শন বিষয়ক পুস্তকাবলী ক্রয়ের জন্যে এককালীন এক সহস্র মুদ্রার এক বিশেষ দান প্রাপ্ত হন। যাঁরা পুস্তক মনোনয়নের কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী ও বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ দেখা যায়।

১৯১৪ খৃস্টশতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তমিস্রাপূর্ণ সময়ে চারের পল্লীর (Ward IV) যুদ্ধত্রাণ সভা আহূত হয় ১০ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫-৩০মিঃ রামমোহন লাইব্রেরীতে। এই সভায় যাঁদের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা কৃষ্টদাস লাহা, ডাঃ এস. পি. সর্বাধিকারী, রেভারেণ্ড জে. ওয়াট এবং অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা যায় যে, হিন্দুদর্শনের ছাত্রমহলের জন্যে তাঁর বক্তৃতা-কক্ষ অবারিত-দ্বার ছিল। বিষয়বস্তু ছিল তুলনামূলক দর্শন (বেদান্ত জ্ঞানতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্র Vedanta Epistemology and Logic)। স্থান নির্দেশিত ছিল দ্বারভাঙা বিল্ডিংস্-এর দ্বাদশ সংখ্যক কক্ষ এবং সময় দেওয়া ছিল বেলা ১১-১২টা (সোম ও বুধবার) এবং বিকাল ৩-৪টা (মঙ্গল ও শুক্রবার)।

ডাঃ শীল কুচবিহারেও এককালে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর বাসগৃহে রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কুচবিহার কলেজের অধ্যাপকগণ সমবেত হতেন ও তাঁর নির্দেশে অধ্যয়নে রত থাকতেন। এই রকমের ক্লাসে অনেক সময়ে কলকাতা থেকে যশস্বী ব্যক্তিগণও সমবেত হতেন আচার্যদেবের পার্শ্বে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়—"বাংলার সমকালীন ছাত্রমহল তাঁর চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর নিকট থেকে প্রেরণা লাভ করতেন।"

দর্শনশাস্ত্রী হয়েও ডাঃ শীল বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বিজ্ঞানী-মন, অনুসন্ধিৎসা ও নিপুণ গবেষণার সঠিক পরিচয় লাভ করতে হলে "The Positive Sciences of the Ancient Hindus" বইখানি পড়া দরকার। বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে মৌলিক অনুসন্ধান-কার্য বিদ্বৎসমাজকে চমৎকৃত করে। যদি বলা হয় যে, বইখানি নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে

---

*মনে হয় "ব্রজেন্দ্রনাথ"-এর পরিবর্তে ভ্রমবশতঃ "ব্রজেন্দ্রকুমার" লিখিত হয়েছে—লেখক।

আবহমানকাল, তবে বোধহয় কিছু অতিরঞ্জিত হবে না।

পুস্তক মধ্যে বাস্তববাদী (Positive—নেতিবাচক বা অধ্যাত্মবাদের বিপরীতধর্মী, বিজ্ঞানের কাল কার্যতঃ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টশতক অবধি ব্যাপ্ত। পাঠকবর্গ যাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করেন, তার জন্যে লেখকের প্রথমেই স্পষ্টোক্তি—"আমি এক ছত্রও লিখি নি যা অতি পরিস্ফুট নজিরের উপর স্থাপিত নয়।" ("I have not written one line which is not supported by the clearest text.")। বিষয়-বস্তু নির্বাচন করবার কাল যেমন ব্যাপক ছিল, গ্রন্থ-মধ্যে বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গেরও সীমা ছিল বহুদূর বিস্তৃত। পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি কিছুই এর মধ্যে বাদ দেওয়া হয় নি। কত নিখুঁত পরিমাপ-পদ্ধতি প্রাচীন হিন্দুদের ছিল তা জানতে পারা যাবে যখন পুস্তকমধ্যে পাঠ করা যায় যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ত্রুটি সেকেণ্ডের প্রায় ৩৪,০০০ ভাগ পরিমাপ করে! গ্রন্থ প্রণেতার মন্তব্য হলো—"This is of special value in determining the exact character of Bhaskara's claim to be regarded as the precursor of Newton in the discovery of the principle of the Differential Calculus ..This claim .. is absolutely established ; it is indeed far stronger than Archimedes' to the conception of a rudimentary process of Integration."

উদ্ভিদের প্রাণশক্তিতে যে বিশ্বাস ছিল প্রাচীন হিন্দুদের—তা ব্রজেন্দ্রনাথ মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সপ্রমাণ করেছেন। ইত্যাকার নানাভাবে লুপ্তপ্রায় আপাত নূতন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে গ্রন্থ মধ্যে। মূলে গ্রন্থের বিষয়বস্তুটি ছিল ডাঃ শীলের পি-এইচ ডি. থিসিস। তাইতো আচার্যদেবের দীর্ঘকালের সহকর্মী অধ্যাপক কে, বি, মাধব এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—He could discuss Riemann's Zeta Function, Mathematical theory of evolution, referendum, hydro-electric problems and transition from pre-scientific medicine to scientific medicine with the grace and ability of a Dean of All Faculties.

ডাঃ শীল শুধু কি এই রকমের বহুবিধ কলা-বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন? আইনের অভিজ্ঞতাও এত ছিল যে, মহীশূরের সাংবিধানিক সংস্কারের (Constitutional Reforms in Mysore) জন্যে যে বিবরণী পেশ করেন, তাকে কয়েকটি ব্যাপারে ভারতীয় আইন ১৯৩৫ অগ্রবর্তী বলা যায়।

আবার এরূপ প্রতিভাবান পুরুষই গীতার বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন নিপুণভাবে।

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জীবদ্দশায় সম্মান প্রাপ্তি ঘটেছে ভাল রকম। আবার নিজে জ্ঞানী-গুণী হয়েও সমকালীন জ্ঞানী-মহাত্মার সমাদরেও অংশ গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ হন নি। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮, কবিবর রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি। যোগ্য সম্বর্ধনার জন্যে বিদগ্ধ সমাজ ব্যস্ত। সেদিনের সেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্যে আমন্ত্রণ লিপিতে যে সব মহাজ্ঞানী স্বাক্ষর করে সেই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে সেই স্বাক্ষরগুলির আলোক-প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল।

Mysore Economic Conference এর অন্যতম সদস্য ছিলেন ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই সংস্থা বহুবিধ সমস্যার সমাধান করবার জন্যে গঠিত হয়েছিল। বৎসরাধিককাল শিক্ষা-

শিক্ষা ও ছয়টি স্তরে পেশাগত শিক্ষার (Vocational training) খসড়া পরিকল্পনা রচনা তিনি করেছিলেন। বলাবাহুল্য এই সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মের জন্যে মহীশূর রাজের নিকট থেকে উপযুক্ত সম্মাননা প্রাপ্তি তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল।

মহীশূরে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্যসূচী আরও প্রাণবন্ত করেছিলেন—এতে একাধারে তাঁকে সমসাময়িক চিন্তাধারার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হয়েছিল এবং অপর পক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভারতের অমূল্য সংস্কৃতির সম্বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তাঁরই নির্দেশে নথিপত্র ও পুরাতত্ত্বানুগ হওয়ার ইতিহাস বিষয়টি আরও সুসম্বদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষাবিদ ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কয়েক খণ্ডে সবিশেষ সপ্তম, নবম, দশম এবং দ্বাদশ খণ্ডে যা লিখে গিয়েছেন, তার মূল্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। এই বিবরণীটি ভারতীয় গবেষক পণ্ডিতদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল এবং স্যার মাইকেল স্যাড্লার এই মর্মে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ সাগ্রহ মনোযোগ সহকারে দৃক্‌পাত করবেন ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিত কমিটির কতক কতক প্রশ্নের জবাবের প্রতি।

কোন সপ্রশংস উক্তিই ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরিশেষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি তাঁর উদ্দেশ্যে, যিনি কল্পনা প্রভাবে বহু ব্যাপকভাবে, অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন—বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—

"I was one with the woods ; my body, the Earth ;
I budded in the buds, and burgeoned fresh
In the green shoots ; the tendrils were my veins ;
My eyes blossomed one very bush ; my arms
Waved in the tall spiked grass ; in the white fog
The hill-side breathed with me ; the twirling leaves
Vibrated through the pores of my own skin ;
I was one with the woods ; my body, the Earth."

সূর্যের ভবিতব্য

অত্রি মুখোপাধ্যায়

ভূতত্ত্ববিদ একথা স্বীকার করবেন না যে, হেলম্‌-হোলৎজ প্রস্তাবিত সূর্য সংকোচন আজো ঘটছে এবং এরই ফলে একমাত্র সূর্য নিরন্তর শক্তি জুগিয়ে চলেছে। মানুষের ইতিহাস রচিত হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত হেল্‌মহোলৎজের মতানুযায়ী শতাব্দীতে দুই কিলোমিটার হারে যদি সূর্যের সংকোচন সত্যি সত্যি ঘটে থাকতো তবে পদার্থবিজ্ঞার সূক্ষ্মতম যন্ত্রের চোখে তা এড়িয়ে গেলেও ভূতত্ত্ববিদের খাতায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যেতো। ভূতত্ত্ববিদের গবেষণায় দেখা গেছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সূর্যের পরিবর্তনও ঘটে নি।

সূর্যের অমিত শক্তির উৎস কোথায়—এই রহস্যের আজ সর্বসম্মতিক্রমে সমাধান হয়েছে। আপাত অফুরন্ত এই শক্তি বা তেজের মূলে রয়েছে তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়া। একথা সবাই জানেন, সূর্যের আলোর বর্ণালী থেকে তার ভিতরে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন ইত্যাদি কয়েকটি হাল্কা এবং কিছু ভারী পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মোটামুটি হিসাবে সূর্যের মধ্যে রয়েছে—এক ভাগ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর কার্বন, এক ভাগ লোহা ইত্যাদি, পাঁচ ভাগ হিলিয়াম এবং বাকী অংশ হাইড্রোজেন। একথাও হয়তো অনেকেই জানেন যে, সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় ২০,০০০০০০ সেন্টিগ্রেডের মত। এরূপ তাপমাত্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত বস্তুগুলি তাদের চতুর্থ অবস্থা, অর্থাৎ প্লাজ্‌মা অবস্থায় রয়েছে। একথা খুবই স্পষ্ট যে, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারী পদার্থের কেন্দ্রীনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলতে পারলে যে প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয়, সূর্যে সেভাবে তেজের উদ্ভব হতে পারে না, কারণ সূর্যে এসব মৌলিক পদার্থগুলির অস্তিত্বের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে, তাতে আরেকটি প্রক্রিয়ার কথা ভাবতে পারা যায়। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন অর্থাৎ প্রোটন যদি পরস্পর মিলিত হয় এবং মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীন সৃষ্টি করে, তাহলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবার কথা এবং তা হয়ও। কেন্দ্রীন-কণিকাগুলি পরস্পর মিলিত হলে তাদের সম্মিলিত ভর কমে যায় এবং সেই পরিমাণ ভরের আত্মপ্রকাশ ঘটে শক্তিতে। আইনষ্টাইন প্রদত্ত আপেক্ষিতাবাদ এর গুণাত্মক এবং পরিমাণাত্মক সম্পর্ক দিয়েছে এভাবে—

$$\text{শক্তি} = \text{ভর} \times (\text{আলোর বেগ})^2$$

অর্থাৎ এক গ্র্যাম বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে ২০,০০০,০০০,০০০,০০০ ক্যালরি তাপ পাওয়া যাবে।

বস্তুতঃ এই বৈকল্পিক প্রক্রিয়াতেই সূর্যতেজের সৃষ্টি হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন রয়েছে সূর্যের অভ্যন্তরে, প্রক্রিয়াটি সুরু করে দেবার মত রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে তাপমাত্রা এবং ঘনত্ব। হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীনগুলি মিলনের পর হিলিয়াম-কেন্দ্রীনের (পরবর্তী ভারী মৌলিক পদার্থ) সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শক্তি বের করে দিচ্ছে। কেন্দ্রে সৃষ্ট এই শক্তি তারপর পরিচালন, পরিবহন এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বাইরে বেরিয়ে আসছে। পরিচলনের জন্যে যে প্রচণ্ড তাপবিভব থাকা প্রয়োজন, কার্ডলিং-এর মতে—সূর্যের কেন্দ্রের চারধারে শতকরা দশ অংশ জুড়ে তা আছে।

অবশ্য আমাদের লক্ষ্য অন্যখানে। দু-রকম পন্থা অবলম্বন করে তারার কেন্দ্রের হাইড্রোজেন

হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং নক্ষত্রবিশেষে কোন্ প্রক্রিয়া কাজ করবে, তা নির্ভর করে কেন্দ্রের তাপমাত্রার উপর। প্রথম প্রক্রিয়ায় চারটি প্রোটন, কার্বন এবং নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রীনের জন্ম দেয়, কার্বন ও নাইট্রোজেন ক্যাটালিষ্ট হিসাবে কাজ করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় এত সহজেই হাইড্রোজেনের রূপান্তর ঘটে না। একটি প্রোটন আর একটির সঙ্গে শক্তিশালী সংঘর্ষ ঘটিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় একটি ডয়টেরিয়াম সৃষ্টি করে। এটি আবার আর একটি প্রোটনের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে হিলিয়ামের একটি সমঘর মৌলে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে সৃষ্ট সমঘর মৌল আর একটি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি স্বাভাবিক হিলিয়াম-কেন্দ্রীন সৃষ্টি করে।

সূর্যের চেয়ে যে সব তারকার তাপমাত্রা অনেক বেশী, সে সব তারকার শক্তির জোগান দিয়ে চলেছে এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। সূর্যে এই দুই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এবং ঘনত্বের মাঝামাঝি একটা মূল্য থাকায় এই দুই প্রক্রিয়াই কমবেশী কাজ করে চলছে। প্রত্যেক সেকেণ্ডে সূর্য প্রায় ৮০০ টন হাইড্রোজেন খরচ করে ফেলছে এবং এই একই ভাবে চলতে থাকলে সূর্যের সবটুকু হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হতে লাগবে পাঁচ হাজার কোটি বছর।

সূর্যের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানতে হলে তারকাদের গঠন নিয়ে কিছু আলোচনা প্রায় অপরিহার্য। সূর্যের বহিরাবরণ কেন্দ্রে সাংঘাতিক রকমের চাপ দিচ্ছে, কেন্দ্রের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এই চাপের পরিমাণ প্রায় ১০০০,০০০,০০১,০০০ পাউণ্ড। এই চাপ সম্পূর্ণভাবে মাধ্যাকর্ষণজাত। এই সাংঘাতিক চাপে পড়ে যে কোন গ্যাসীয় গোলকের চুপসে যাবার কথা। সূর্যের ভিতর থেকে অন্য একটি বিপরীত চাপ এই চাপকে সামলে রেখেছে; শেষোক্ত এই চাপের জন্যে দায়ী ভিতরকার প্রচণ্ড উত্তাপ। এই ধরণের ভারসাম্যকে বলে চাপ-ভারসাম্য।

সমস্ত তারকার ক্ষেত্রেই আরেক ধরণের চাপের প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রত্যেক নক্ষত্রই কেন্দ্রে সৃষ্ট শক্তির বিরাট একটা অংশকে নিরন্তর বাইরের মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই কারণে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কমে যাওয়া উচিত এবং তা সত্যিই যদি কমে, তবে চাপ ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং নক্ষত্রটি অবশ্যম্ভাবী একটা দুর্ঘটনার মুখে পড়বে। কিন্তু এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতে দিচ্ছে না এই দ্বিতীয় ধরণের ভারসাম্য, ঠিক যতটা শক্তি আলো ও তাপ হিসেবে বাইরে চলে যাচ্ছে, তাকে পুষিয়ে দেবার জন্যে আগে শক্তি সৃষ্টির এক স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে প্রত্যেক তারকারই। একে বলে শক্তির ভারসাম্য।

আধুনিক তত্ত্ব বলে, সূর্য যখন জন্মেছিল, তখন তার তাপমাত্রা আজকের মত এত বেশী ছিল না, চেহারাটাও আজকের চেয়ে অনেক গুণ বড় ছিল। চাপ-ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা যতক্ষণ না হয়েছে, এই গ্যাসীয় গোলক ততক্ষণ সঙ্কুচিত হয়েছে, আর তার ফলে কেন্দ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওদিকে বাইরের এই তাপের বেশ খানিকটা অংশ ছড়িয়ে পড়ছে। এই ভাবে কিছু দিয়ে এবং কিছু রেখে কেন্দ্রের তাপমাত্রা এবং ঘনত্ব এক সময়ে তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়া সুরু করে দেবার পক্ষে যথোপযুক্ত হয়ে উঠলে হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে পরিবর্তনের মাধ্যমে সূর্যের চাপ-ভারসাম্যের পত্তন হয়েছে। মানুষের ইতিহাসের মাপকাঠিতে সে মুহূর্তটুকু যদিও ইতিহাসের অনেক পিছনে, তথাপি সূর্যের ইতিহাস বলে, সূর্য সবেমাত্র ঐ মুহূর্তটুকু কাটিয়ে এল।

এবারে আমাদের আসল কথায় আসা যাক।

যখন কেন্দ্রের সবটুকু হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যাবে, তখন সূর্যের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? সেই দুর্ঘটনা ঘটতে যতই দেরী থাক না কেন, সেটা যে ঘটবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন কেন্দ্রে তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, তেজের উৎস যাবে ফুরিয়ে। কিন্তু তখনো শক্তির-ভারসাম্য সূর্যের মধ্যে সক্রিয় – সূর্যকে এই দুর্ঘটনা থেকে এই ভারসাম্যই রক্ষা করবে। কেমন করে? উত্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলবেন, কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্কোচন সুরু করে দেবে; ফলে তাকে ঘিরে হাইড্রোজেনের একটা পাত্‌লা স্তরের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকবে এবং এক সময়ে এর তাপমাত্রা হাই-ড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে উঠবে—সূর্যে আবার নতুন করে শক্তির উৎপাদন সুরু হবে।

কেন্দ্র কিন্তু তখনো তার ছোট হওয়া থামাবে না, সে ছোটই হতে থাকবে, যতক্ষণ না তার ভিতরকার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী হয়। তারপর নির্দিষ্ট এক ঘনত্বে পৌঁছে গেলে আর এক ধরণের চাপ কাজ করে কেন্দ্রের সঙ্কোচন থামিয়ে দেবে। কেন্দ্র সঙ্কোচন থামিয়ে ফেললে—না সঙ্কোচন, না তাপকেন্দ্রীন—কোন প্রক্রিয়াই কেন্দ্রে কাজ করবে না। ফলে সূর্য তখন একটা সমতাপমাত্রার হিলিয়াম পিণ্ড বহন করে নিয়ে চলবে। তাকে ঘিরে পাত্‌লা গ্যাসের আবরণে তখনো অবশ্য শক্তি উৎপন্ন হতে থাকবে।

অতঃপর সূর্যের ভাগ্যে শুধুমাত্র কেন্দ্রের হিলিয়াম পিণ্ডটির আকৃতি বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবে না। আবরণে সৃষ্ট হিলিয়াম এসে ক্রমশঃ আছ্‌ড়ে পড়বে এই পিণ্ডটিতে। এভাবে আছ্‌ড়ে পড়বার ফলে পিণ্ডের তাপাঙ্ক সাংঘাতিক রকম বৃদ্ধি পাবে। হিলিয়াম গোলক তখন জ্বলতে সুরু করে দেবে। আর এই অবস্থায় যেমনটি মেস্টেল দেখিয়েছেন, কেন্দ্রে চাপ-ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং যাবেও। ফলে দাঁড়াবে এই—যতখানি শক্তি বাইরে চলে যেতে পারছে, তার অনেক বেশী তৈরি হতে থাকবে কেন্দ্রে। কেন্দ্র তখন চকিতে সম্প্রসারণ সুরু করে দেবে এবং একটা বিস্ফোরণের মত অবস্থার সৃষ্টি হবে। তবে এই ধরণের অবস্থায় স্থায়িত্ব খুবই অল্প, যতখানি শক্তি বাইরে চলে যাচ্ছে, তার বেশী কেন্দ্রে তৈরি হওয়ার দরুণ কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা এবং আকার বাড়তে থাকবে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকিরণ-চাপ হিলিয়াম প্রজ্বলনকে আয়ত্তে এনে ফেলতে পারবে—কেন না, কেন্দ্র সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ঠাণ্ডাও হতে থাকবে।

আকাশের কোন কোন সাধারণ তারকাকে হঠাৎ একদিন দারুণ দীপ্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠতে দেখা যায়, তারপরে আবার তা একদিন অপরিচিত নক্ষত্রের ভীড়ে হারিয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলেই এই তারকার হঠাৎ এত দীপ্তি দেখা যায়। এদের বলে নতুন তারা।

সূর্য কি এই ধরণের নতুন তারা হয়ে যেতে পারে? জ্যোতির্বিজ্ঞানী উত্তর দেবেন—না। এমন একদিন অবশ্য আসবে, যখন সূর্যের সবটুকু হাই-ড্রোজেনের সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে যাবে, সূর্যে তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরির পথ সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। সূর্যের গাত্র থেকে তেজ অনবরত বাইরে যাবার দরুণ সূর্য সেদিন থেকে নিবতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হতে থাকবে। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর আকার পরিগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে 'ডিজেনারেটিং প্রেসার' ঠিক তক্ষুনি এই সঙ্কোচন থামিয়ে দেবে। সঙ্কোচন না হলেও ভিতরের তাপাঙ্ক অবশ্য কমতেই থাকবে। হঠাৎ ফেটে পড়বার ফাঁড়া কাটিয়ে সূর্যের তখন ঠাণ্ডা হবার পালা। তারপর একদিন আমাদের সূর্য নাম না জানা অগণিত মৃত তারকাদের দলে ভিড়ে যাবে।

তবে একটা কথা। সূর্যের কেন্দ্রে হিলিয়াম তৈরি হবার পর তা ঠিক সেই জায়গাতেই রয়ে যায়। যেহেতু সূর্য নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে, হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর মেশবার কথা নয়। তবে সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের এর উপরে কিছু হাত আছে কিনা, তা এখনো নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। যদি সূর্যে এরকমের দুর্ঘটনা প্রকৃতই ঘটে, যেমনটি এপর্যন্ত বলা হলো, সূর্যের ঠিকুজি তাথেকে আলাদা হবে। তবে তার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

সঞ্চয়ন

অড়হর ডাল

অড়হর আমাদের দেশে সাধারণতঃ বর্ষজীবী ফসল হিসেবে চাষ করা হয়, যদিও অড়হর গাছ কয়েক বছর বাঁচতে পারে। খুব সম্ভব বহুকাল আগে আফ্রিকা থেকে একে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে (১৯৬৩-৬৪) প্রায় ২৪'২ লক্ষ হেক্টার জমিতে অড়হরের চাষ করা হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২'৯ লক্ষ টন। ভারতে গড় ফলন হেক্টার প্রতি মোট ৪৮৫ কে জি. মাত্র। সাধারণতঃ ডালের জন্যেই চাষ করা হয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে প্রোটিনের সরবরাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ডালের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলায় অড়হরের চাষের জমির পরিমাণ (১৯৬১--৬২) ৩৮,৪০০ হেক্টার এবং গড় ফলনের পরিমাণ ৬০০ কে.জি র কিছু বেশী। গাছের সবুজ পাতা বা ডগা সবুজ সার অথবা গরুর খাদ্যের জন্যে ব্যবহার করা হয়। শুকনো ডালপালা দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করা যায়। শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ ক'রে বলে মাটির উন্নয়ন, ভূমিক্ষয় নিবারণ ইত্যাদির জন্যে অড়হরের চাষ করা হয়। এই গাছ খরা বা অনাবৃষ্টি সহ্য করতে পারে, কিন্তু গোড়ায় জল জমা হলে অথবা মাটির জল ঠাণ্ডায় জমে গেলে তা সহ্য করতে পারে না। সাধারণতঃ এই গাছগুলি লম্বায় ৯ থেকে ৩'৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনুর্বর জমিতেও এর চাষ করা যায়; কাজেই ডাল শস্যের মধ্যে ভারতে অড়হরের স্থান দ্বিতীয়।

শুকনো এবং আর্দ্র উভয় আবহাওয়াতেই এই গাছ ভালভাবে জন্মায়—তবে শুষ্ক আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন। ভাল ফসলের জন্যে ফুল ফোটা এবং ফল পাকবার সময় আকাশ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকা দরকার।

প্রায় সব রকম মাটিতেই অড়হরের চাষ করা চলে—কেবলমাত্র মাটিতে চুনের অভাব থাকলে চলবে না। জলনিকাশী হালকা অথবা মাঝারি জমিতে সবচেয়ে ভাল ফসল জন্মায়, কারণ মাটিতে রস থাকবার ফলে শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

সাধারণতঃ খরিফে বর্ষার সুরুতে আষাঢ় মাস থেকে চাষ করা হয়। ফসল পাকতে জলদি জাতের ৬ মাস এবং নাবি জাতের প্রায় ৮½ মাস সময় লাগে। উন্নত জাতের টি-১নং ফসল ৪½ মাসেই তৈরি হয়ে যায়। অড়হর অনেক ক্ষেত্রেই মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হয়—জোয়ার, ভূট্টা, তূলা, চীনাবাদাম ইত্যাদি খরিফ ফসলের সঙ্গে।

শুধু অড়হরের চাষে স্থানীয় চাষের রীতি অনুযায়ী শুঁটি জাতীয় নয়, এমন অন্যান্য ফসলের সঙ্গে শস্য-পর্যায় অনুসরণ করা হয়। মিশ্র ফসলের প্রয়োজন অনুযায়ী জমি তৈরি করা হয়ে থাকে। একক চাষে এক বার হাল এবং ২-৩ বার বিদা দিয়ে মোটামুটি জমি তৈরি করা হয়। বৃষ্টি সুরু হলে বীজবপন করা হয়।

মিশ্র ফসলে সব সময়ই সারিতে চাষ করা হয়। একক ফসলে ছিটিয়ে এবং সারিতে, উভয় ভাবেই বীজ বোনা হয়ে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ছিটিয়ে বোনবার চেয়ে সারিতে বোনায় শুধু যে বীজ বা অন্যান্য খরচ কম হয় তাই নয়, ফলনও বেশী হয়ে থাকে। ছিটিয়ে বোনায় হেক্টার প্রতি ১১-১৭ কে.জি. বীজ লাগে। পশ্চিম বাংলায় পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৬০ সেন্টিমিটার সারিতে ৬০ সেঃ মিঃ দূরে দূরে বীজ বপন করে অড়হরের সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এতে হেক্টার প্রতি মোটে ৪½—৫½ কে.জি. বীজের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম বাংলায় টি-৭নং-এর ভাল ফল দেয়। পূর্বোক্ত টি-১নং যদিও খুবই তাড়াতাড়ি পাকে (৪½ মাসে) তবুও গাছের বাড়, শুঁটি এবং তার মধ্যের দানার সংখ্যা প্রভৃতির বিচারে টি-২১নং অড়হর ৬ মাসে পাকলেও প্রায় দ্বিগুণ ফলন হয়ে থাকে। টি-২১নং-এর সঙ্গে তুলনামূলক টি-১নং-এর এই ফলাফল বেশ কয়েক বছর উত্তর-প্রদেশে পরীক্ষা করবার পর জানা গেছে।

সাধারণতঃ মিশ্র ফসলের প্রয়োজন অনুযায়ী নিড়ানী ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রথম ফসল উঠে যাবার পর বিদা ইত্যাদি দেওয়া হয়, যাতে অড়হরের গাছগুলি সতেজ হয়ে উঠতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, যে উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ মিশ্র চাষ করা হয়ে থাকে, তাতে একটি ফসল মার খেলেও সমূহ লোকসান তাতে হয় না, এই ধারণা ঠিক নয়। সব রকম সম্ভাব্য মিশ্র চাষ এবং একক ফসলের তুলনায় একক ফসলের লাভের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রেই বেশী পাওয়া গেছে।

আশ্বিন থেকে ফুল ফোটা সুরু হয় এবং ২-৩ মাস ধরে ফুল ফোটে। মাঘ-ফাল্গুনে একই ডালে পাকা শুঁটি এবং ফুল উভয়ই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৬-৮½ মাসে ফসল পাকে। শুঁটি পাকবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে করে তুলে নিতে হয় এবং পরে যখন সব পাতা শুকিয়ে ঝরে গিয়ে গাছ শুকিয়ে যায়, তখন মাটি ঘেঁসে আঁটি বেঁধে মরাইয়ের উঠানে নিয়ে যেতে হয়। গাছ শুকিয়ে গেলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অথবা গরু দিয়ে মাড়াইয়ের কাজ করা হয়। পশ্চিম বাংলায় গড়ে হেক্টার প্রতি ৬০০ কে. জি গড় ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু ৬০×৬০ সেঃমিঃ দূরত্বে চাষের পরীক্ষায় হেক্টারে ২৪০০ কে. জি-এরও বেশী ফলন পাওয়া গেছে। কাজেই সযত্নে চাষ করলে অড়হরের চাষে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশে অড়হরের ঢলে-পড়া রোগই ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। উন্নত জাতের গাছই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। তবে সর্বদাই খেয়াল রাখা উচিত যে, আক্রমণকারী ছত্রাক মাটিতে বাসা বাঁধে এবং ক্রমান্বয়ে পরবর্তী ফসলকে আক্রমণ করে যায়। কাজেই ক্রমান্বয়ে অড়হর চাষ না করে পর্যাক্রমে অন্যান্য ফসলের চাষ করলে রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। এই বীজের দ্বারা এই রোগ বাহিত হয় না। সুপার ফস্‌ফেট এবং গোবর সার প্রয়োগে আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

অড়হরের পোকার আক্রমণ তেমন বেশী হয় না, তবে আক্রমণ ব্যাপক হলে ৪% জলে গোলা ডি. ডি. টি সিঞ্চন করে উপকার পাওয়া যায়।

নতুন পদ্ধতিতে হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা

যদি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, অথবা অন্য কোন কারণে যদি হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, অথবা স্বাভাবিক ছন্দে না চলে অনিয়মিত ভাবে স্পন্দিত হতে থাকে, তাহলে সেই অবস্থায় রোগীর জীবনের মেয়াদ থাকে মাত্র ৪ মিনিট। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে রোগীর যদি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে ক্রমক্ষীয়মান রক্ত সরবরাহের ফলে অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বৈদ্যুতিক স্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের মাসাজ এবং ওষুধ হৃৎপিণ্ডকে আবার কর্মক্ষম করে তুলতে পারে। কিন্তু এর জন্যে মাত্র ৪ মিনিট সময় হাতে থাকে। একমাত্র হাসপাতালেই এত অল্প সময়ের মধ্যে ডাক্তার পাওয়া যেতে পারে।

ওয়েষ্টফেলিয়ার মুনষ্টার (পশ্চিম জার্মেনী) বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে অতি আধুনিক এমন এক যন্ত্র বসানো হয়েছে, যা কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের এই সঙ্কট-মুহূর্তটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানিয়ে দেয়। এই চিকিৎসাগারের ডাইরেক্টর অধ্যাপক ডব্লিউ. এইচ. হাউস হৃৎপিণ্ডের রোগজনিত মৃত্যু সম্পর্কে খুবই অনুসন্ধিৎসু। হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দনের রোগীদের শয্যার ধারে কার্ডেলার্ম নামক বেশ বড় ধরণের এই যন্ত্রটি বসানো থাকে। বিশ্ববিখ্যাত সিমেন্স কোম্পানীর চিকিৎসার যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শাখা এরলানজেনের সিমেন্স রেইনিগার কোম্পানী এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক ও নির্মাতা। এই মেসিনটি হৃৎপিণ্ডের কাজের বৈদ্যুতিক গ্রাফ তৈরি করে। যে মুহূর্তে এই বৈদ্যুতিক কার্ডিওগ্রাম স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিকের দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে—রোগীর বিপজ্জনক অবস্থায় যা সব সময়েই সম্ভব হতে পারে, সেই মুহূর্তেই একটি ছোট্ট ট্রান্সমিটার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একটা সঙ্কেতের মাধ্যমে কর্তব্যরত ডাক্তারকে জানিয়ে দেয়। ডাক্তার ৬০ থেকে ৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে রোগীর কাছে এসে শয্যার অপর দিকে স্থাপিত আর একটি মেসিন দিয়ে রোগীকে দুটি বা একটি বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে দেন। রোগীর বুকের উপর দুটি ইলেকট্রোড রাখা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে একটি বা দুটি শক্‌ই সাধারণতঃ যথেষ্ট। এর পরে রোগ অনুযায়ী অন্য চিকিৎসা করা হয়।

জটিল হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর সংখ্যা আজকাল সব দেশেই বেড়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলিতে রক্ত চলাচলে বাধার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার নানা কারণ থাকতে পারে। করোনারি ধমনীতে যদি রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়, তাহলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলির ক্ষতি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কাজেও বাধার সৃষ্টি করে। অত্যধিক আহার, অতিরিক্ত কাজ বা অত্যন্ত উচ্চাশাজনিত মানসিক চাপ এবং অন্যান্য প্রভাবকে এই রোগের সম্ভাব্য কারণ বলে ধরা হয়। হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টির প্রকৃত কারণ যদিও এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি, তবুও এই উপসর্গটি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে। গত দশ বছরে পশ্চিম জার্মেনীতে এই রকম রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই সংখ্যা আরও বেশী।

কি কি কারণে হৃদ্‌রোগে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু হয়? মুনষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এইচ. পোরথিন দুটি সম্ভাব্য কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। রক্ত চলাচলে বাধার ফলে, যে মাংসপেশীগুলি হৃৎপিণ্ডকে কর্মক্ষম রাখে, সেগুলি যদি হঠাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং রোগীর আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হতে সুরু করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসাই কাজে আসে না। কিন্তু মাংপেশীগুলি সক্ষম থাকলে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও

চার মিনিটের মধ্যে চেষ্টা করলে তা আবার চালু করা যায়। ডাঃ পোরথিন একে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত "জৈব বৈদ্যুতিক স্পার্কিং" বন্ধ হয়ে যাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে নিয়মিত স্পার্কিং না হলে যেমন ইঞ্জিন চলে না, ঠিক তেমনি হৃৎপিণ্ডের ইঞ্জিনেরও নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিতভাবে স্পার্কের প্রয়োজন। প্রকৃত কোন স্পার্ক যে হয় না এবং হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে কোন বিস্ফোরণ ঘটে না, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই তুলনার অর্থ হলো, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা ছন্দ রেখে বৈদ্যুতিক স্পার্ক হতে থাকে, যার ফলে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়। এই অতি সামান্য বৈদ্যুতিক স্পার্ক হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলিতে সঙ্কোচন আনে। যদি কোন বৈদ্যুতিক স্পার্ক না হয়, তাহলেই হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই বাইরে থেকে যদি কোন কিছু দিয়ে এই বৈদ্যুতিক ডিস্চার্জকে আবার কার্যকরী করে তোলা যায়, তাহলে অচল হৃৎপিণ্ডকে সচল করে তোলা যায়।

হৃৎপিণ্ডের সব জায়গাই এই রকম স্বয়ংক্রিয় ডিস্চার্জের পক্ষে উপযুক্ত নয়। স্বয়ংক্রিয়তার জন্যে কতকগুলি বিশেষ স্থান আছে, বিশেষ করে ডানদিকের অরিকলের পিছনের দেয়ালটা এর পক্ষে উপযুক্ত স্থান। গতি সঞ্চার করবার বা হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করবার মূল উৎস এখানেই অবস্থিত বলা যায়। এই বিশেষ স্থানটির কোষগুলিতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সুপ্ত থাকে, তা স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত স্বয়ংক্রিয় ধাক্কায় আপনা থেকেই পরিবর্তিত হয়। আয়নগুলির নড়াচড়ার ফলে বৈদ্যুতিক চার্জ স্থান পরিবর্তন করে বলে এই পরিবর্তন আসে। আয়নগুলি হলো বৈদ্যুতিক শক্তি নিহিত অণু। এর ফলে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। "পোলারবিহীন" এই স্থানটি তার নিজের গতি হৃৎপিণ্ডের সমগ্র মাংসপেশীগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। এই গতি সঞ্চারকারী স্থানটি যদি কোন কারণে কাজ করতে অসমর্থ হয়, তবে হৃৎপিণ্ডও থেমে যায়। বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে যদি এই গতি-সঞ্চারকারীকে উত্তেজিত করতে পারা যায়, তাহলে একটা সঙ্কোচনের সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে গতি-সঞ্চারকারীকে আবার সচল করে তুলতে পারে।

ধুকপুক করে অথবা কাঁপে—এই রকম হৃৎপিণ্ডকে বিপজ্জনক জটিলতাসম্পন্ন হার্ট বলা যায়। এই রকম ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের গঠনই অন্য ধরণের হয়ে থাকে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে অনুপযুক্ত জায়গায় ভুল গতি-সঞ্চারকারীর সৃষ্টি হয় এবং এগুলি হৃৎপিণ্ডকে কতকগুলি ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে ফেলে এবং এগুলি একে অপরের বিরোধী কাজ করতে থাকে। গতি-সঞ্চারকারী সৃষ্টি না করে, ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি নিজেরাই বৈদ্যুতিক শক্তি আকর্ষণ করে নিতে পারে। এর ফলে হৃৎপিণ্ডে পাম্প করবার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে এবং তা একেবারে বন্ধ হয়েও যেতে পারে। এই রকম ক্ষেত্রে যদি সময়মত বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়া যায়, তাহলে যে স্থানগুলি বৈদ্যুতিক ডিস্চার্জ হরণ করছিল, সেগুলিকে নষ্ট করে মূল বিদ্যুৎ-উৎসকে সজীব করে তোলা যায় এবং তখনকার মত অবস্থাকে আয়ত্তে আনা যেতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সিমেন্স রেইনিগার মেসিনটিতে একটি বেতার ট্র্যান্সমিটার আছে। ডাক্তার যেখানেই থাকুন না কেন, একটি পকেট রিসিভারে তিনি এই সঙ্কেত শুনতে পান। সঙ্গত কারণেই এই বিপদ-সঙ্কেত জোরে বাজে না, কেবলমাত্র কর্তব্যরত চিকিৎসক এই সঙ্কেত শুনতে পান। পকেট রিসিভারে অনুসন্ধান করবার একটি ব্যবস্থাও আছে। এতে ডাক্তার বেতারে কার্ডিওগ্রামের অবস্থাও জানতে পারেন। মেসিনটি যে মুহূর্তে বিপদ-সঙ্কেত জানায়, তখন থেকেই গ্রাফটি পরীক্ষা করতে থাকে। ডাক্তার তখনই

শুনতে পান যে, সত্যি সত্যি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে কিনা অথবা সেটা একটা সামান্য গোলযোগ মাত্র। কারণ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ায় সামান্য গোলযোগ হলেও বিপদ-সঙ্কেত পাঠায়। রিসিভারে অনুসন্ধান করবার যে ব্যবস্থা আছে, তার সাহায্যে ডাক্তার, বিপদ-সঙ্কেত না হলেও যে কোন সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার অবস্থা জানতে পারেন।

মুনষ্টার চিকিৎসাগার স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণকারী হিসাবে ৮০ জন রোগীর উপর এই মেসিনটি ব্যবহার করেছে। এর ফলে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। অনেক রোগীর জৈব বৈদ্যুতিক "স্পার্কিং প্লাগ" এত খারাপ হয়ে যায় যে, তা আর ভাল করা যায় না। মুনষ্টারের প্রধান চিকিৎসক অধ্যাপক সাওার প্রাশম্যান এই রকম একটি যন্ত্র বসাবেন। তারপর তিনি রোগীর হৃৎপিণ্ডে দুটি ছোট প্ল্যাটিনামের ইলেকট্রোড বসাবেন এবং তাথেকে দুটি সরু তার একটি ছোট ম্যাচ বাক্সের মত কৌটায় লাগিয়ে দেবেন। এক বর্গইঞ্চি আকারের এই বাক্সে থাকবে দুই থেকে পাঁচ বছর চলতে পারে—এই রকম শক্তির অতি ক্ষুদ্র ব্যাটারী, কয়েকটি ট্র্যান্‌জিষ্টর, একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদক অন্যান্য যন্ত্র। পেটের মধ্যে এক পাশে এই ক্ষুদ্র বাক্সটি বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ব্যাটারী বদ্‌লাবার জন্যে কয়েক বছর পর পর সেটি বের করে নেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারটি খুবই সহজ। ইলেকট্রোড দুটি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চিরদিনের জন্যে থাকে। এই ছোট যন্ত্রটি ৬ ভোল্ট শক্তিতে হৃৎপিণ্ডকে প্রতি মিনিটে ৭০টি কৃত্রিম ধাক্কা দেয়। এক সেকেণ্ডের আড়াই হাজার ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত এই ধাক্কা স্থায়ী হয়। মুনষ্টারের চিকিৎসকগণ সুইডেনে তৈরি "এলেমা" নামক গতি-সঞ্চারকারী বাক্সটি ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে বহু রোগী বেঁচে যান এবং কোন রকম অসুবিধা ভোগ না করে স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করেন।

কীট-বিনাশে ভারতীয় কৃষি-গবেষণাগারের উদ্যোগ

ডাঃ এস. প্রধান এই সম্পর্কে লিখেছেন—শ্রেণী হিসাবে কতকগুলি কীট মানুষের পরম শত্রু-বিশেষ। মানুষ যে জিনিসকে নিজের বলিয়া মনে করিতে চায়, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটির উপর কোনও না কোন কীট আক্রমণ করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, ২৫ কোটি হইতে ৫০ কোটি বৎসর পূর্বে কীটের সৃষ্টি হয়, আর মানুষের সৃষ্টি হয় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। ইহা হইতে কীট ও মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। তাহা ছাড়া যত জাতের কীট আছে, তাহা অন্যান্য সকল প্রকার জীবজন্তুর জাতের তুলনায় বেশী। সংখ্যা ও কাল গণনার দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কীট প্রথম হইতেই মানুষকে চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিয়াছে।

তৎসত্ত্বে মানুষ আজও কীট-সমস্যা আদৌ উপলব্ধি করে নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ বোধ হয় কীটের বিশেষ রকমের সূক্ষ্মতত্ত্ব। কীট-গুলি তাহাদের জীবনসংগ্রামে এই বৈশিষ্ট্যকে সর্বাধিক কাজে লাগাইয়াছে। সাধারণতঃ কীট-গুলি এত ছোট যে, খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। বাস্তবিক পক্ষে কীটগুলি এত বড় নয় যে, পঙ্গপালের আক্রমণের ন্যায় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের কৃত ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে চাক্ষুষ ধারণা জন্মিতে পারে।

দারুণ মহামারী ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শস্যের উপর পোকামাকড়ের উপদ্রব ঘটিলে কিছুদিন আগে পর্যন্তও লোকে প্রায়ই উদ্বিগ্ন হইত না। আর তাহারা যেটুকুও বা উদ্বিগ্ন হইত, তাহাও তাহারা মহামারী দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়া যাইত। কীটের খেলা এইরূপ সূক্ষ্ম হইবার ফলে লোকের মনে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা জন্মিত। সেই জন্য প্রাচীন পুঁথিপত্রে পোকামাকড়ের আশানুরূপ উল্লেখ নাই। ইহা ক্ষতিকারক কীট সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য।

যখন আমরা অতি প্রাচীন পুঁথিপত্রে মধু, রেশম ও গালা উৎপাদক কীটের উল্লেখ পাই, তখন পোকামাকড়ের সূক্ষ্ম বিবর্তনের খেলা কিছুটা পরিষ্কার হইয়া যায়। মানুষ এই সকল মূল্যবান দ্রব্যের জন্য এই শ্রেণীর কীট সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

মহাভারতের জতুগৃহের গল্পের কথা সকলেই জানেন। এই গল্প হইতে বুঝা যায় যে, ঐ যুগে গালা ও উহার দাহ্যতার কথাও সকলের জানা ছিল। সংস্কৃত লক্ষ কথা হইতে লাখ কথার উৎপত্তি। 'লক্ষ' কথার অর্থ একশত হাজার এবং উহা এইরূপ অর্থবোধক যে, অসংখ্য ছোট ছোট কীট হইতে গালার সৃষ্টি।

মধুর কথার উল্লেখ বহুস্থানে আছে। বিবিধানুষ্ঠানে মধু অপরিহার্য। অন্ততঃ প্রথম শতাব্দীতে মধু-সংগ্রাহক মধুমক্ষিকাকে ষটপদা অর্থাৎ ছয় পদবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিবার পূর্বে ইহার সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হইয়াছিল। শব্দটির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য এই কথা হইতে বিচার করা যাইতে পারে যে, বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ পি. কে. ল্যাটরিল ১৮২৫ সালে হেক্সাপোডা কথাটি রচনা করিয়াছিলেন।

রেশম সম্পর্কে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন ভারতীয় রাজা খৃষ্টপূর্ব ৮৭০ অব্দে তৎকালীন পারস্যের রাজার নিকট রেশমী বস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন। ভারতীয়গণ শুধু যে রেশমী কাপড় তৈয়ারী করিতে জানিত তাহা নয়, কিভাবে পোকা রেশম তৈয়ার করে, তাহাও তাহারা সযত্নে লক্ষ্য করিয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, গুটিপোকা যেমনভাবে নিজের লালা হইতে রেশমের গুটি প্রস্তুত করে, তেমনিভাবে ভগবান নিজের সত্ত্বা হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার কীট সম্বন্ধে এইরূপ গভীর জ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে ক্ষতিকর কীট সম্পর্কে জ্ঞান সে যুগে অপ্রত্যাশিতভাবে কম ছিল। অথর্ববেদ, সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে শস্য, পশু ও মানুষের ক্ষতিকারক কীট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মন্ত্র আছে। এই সকল মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, যদিও কীটের উপদ্রব যথার্থই নিদারুণ ছিল, তাহা হইলেও ঐ সকল সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তেমন জ্ঞান ছিল না।

বহু প্রাচীনকাল হইতে কীট ও মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু কীটের আকার ক্ষুদ্র বলিয়া কীট উপহাসের বস্তু ও কীটতত্ত্ববিদ উপহাসের পাত্র হইয়া রহিয়াছে।

কীটের যে ভয়ানক ক্ষতিকারক ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা ভারতে সত্বর উপলব্ধি করা হয় নাই, কারণ লোকের মনে এইরূপ ধর্মবিশ্বাস ছিল যে, যতটা সম্ভব কম প্রাণীনাশ করিতে হইবে; বিশেষতঃ সখ চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক কম প্রাণী নাশ প্রয়োজন। এই সম্পর্কে মহাভারতের মুনির গল্প স্মরণীয়। মাণ্ডব্য মুনির কীট সংগ্রহ করিবার ও কীটের গায়ে কাঁটা ফুটাইবার সখ ছিল। এই সখের জন্য তাঁহাকে দণ্ড হিসাবে জীবনপাত করিতে হয়। এই অপরাধের জন্য তিনি নিজে এক লৌহদণ্ডের আগায় বিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কীটের উপদ্রবে কৃষির যে ক্ষতি হয়, তাহা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করা হয় এবং তাহার ফলে ক্ষতিকারক কীট সম্পর্কে অনুসন্ধান সুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১৯০৬ সালে বিহারের পুসায় ভারতীয় কৃষি-গবেষণাগারে কীটতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়।

বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে এইটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথম হইতে এই বিভাগের কাজের ফলে ভারতের সকল স্থানে কীট-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রথম কীটতত্ত্ববিদ ই. ম্যাক্সওয়েল লেফরয় ১৯০৬ সালে 'ভারতের কীট উপদ্রব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি ১৯০৯ সালে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন—উহার নাম "ভারতের কীট জীবন"। এইভাবে কীট-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

পরে ভারতের অন্যান্য কেন্দ্র হইতে ১৯১৩ সালে 'চিকিৎসা বিষয়ক কীটতত্ত্ব', ১৯১৪ সালে 'দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি কীট', ১৯১৪ সালে 'ভারতের অরণ্যকীট' প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচটি কীট-বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সম্মেলনের কার্যবিবরণী আজ ভারতের কীট-বিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান সম্পদ। এই সময় হইতে কৃষি-গবেষণাগার তাহার ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯৬৪ সালে এপ্রিল মাসে ইহার উদ্যোগে এক বৃহৎ কীট-বিজ্ঞানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কীট-বিজ্ঞানী-গণ 'ভারতে কীটতত্ত্ব' শীর্ষক এক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি যে সকল অনুসন্ধান চালান হয় এখানে, তাহার কতকগুলি বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, এই গবেষণাগার আবিষ্কার করিয়াছে যে, যদি নিমবীজের শাস-ভিজান জল শস্যের উপর ছিটান যায়, তবে পঙ্গপাল উহার উপর দুই তিন সপ্তাহ আক্রমণ চালাইতে পারে না। চল্লিশ বৎসরাধিক কাল গবেষণার ফলে পঙ্গপাল বিনাশের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেগুলি সত্ত্বেও, পঙ্গপাল আসিয়া পৌঁছিলে কৃষক নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিত। এখন সেরূপ অসহায় হইতে হয় না। কৃষক গ্রামের গাছ হইতে নিমবীজ সংগ্রহ করিয়া জমাইয়া রাখিতে পারে এবং পঙ্গপালের আক্রমণ ঘটিলে সে শস্যের উপর নিমের জল ছিটাইয়া দুই তিন সপ্তাহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

গবেষণাগারের আর এক কৃতিত্ব হইল, অ্যাফিড উপদ্রবের আক্রমণ হইতে সরিষা ফসলের নিরাপত্তা বিধান। অ্যাফিডের আক্রমণের সময় হইতে তিন সপ্তাহ অন্তর শতকরা ১ ভাগ গামা বি. এইচ. সি. ছিটাইলে ঐ উপদ্রব দূর হয়।

গবেষণাগার শস্য-সংরক্ষণের এক উন্নত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। উহাকে বলা হয় পুসা ষ্টোরেজ বিন। উহা ভারতের পল্লীঅঞ্চলের অবস্থার উপযোগী। এই ব্যবস্থায় মাটির গোলা ঘরের দেওয়ালে অ্যালকাথিনের পাত্‌লা চাদর মুড়িয়া দিতে হয়। ফলে বাহিরের জলকণা প্রবেশ করিতে পারে না এবং সঞ্চিত শস্য হইতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়, তাহাতে কীট ধ্বংস হইয়া যায়। এই গবেষণাগার ডি. ডি. টি-এর ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে এক নূতন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে ডি. ডি. টি. প্রয়োগের ফলে কীটের স্নায়ুর মধ্যে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক স্পন্দনের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং স্নায়ুর গঠনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার বেশী এই তৎপরতা রোধ করা যাইতে পারে না। যখন ডি. ডি. টি. প্রয়োগের ফলে স্নায়ুস্পন্দনের তৎপরতা এই সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন কীট অবশ হইয়া মরিয়া যায়।

গবেষণাগারের আর একটি মতবাদ অনুসারে, পঙ্গপালের প্রজনন পঙ্গপালের শত্রুর দ্বারা সীমিত হয়। আধা-মরুভূমি অঞ্চলে পঙ্গপাল খুব বেশী সংখ্যায় জন্মায়। আধা-মরুভূমি অঞ্চলে পঙ্গপাল এমন সময়ে জন্মে, যখন আবহাওয়া পঙ্গপালের শত্রুর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে অর্থাৎ আবহাওয়া প্রখর রৌদ্রে অত্যন্ত গরম ও নীরস হইয়া উঠে। অতিরিক্ত গরমের সময় পঙ্গপালের

সরীসৃপ জাতীয় শত্রু মরুভূমি ও আধা-মরুভূমি হইতে লোপ পায়। ফলে আবহাওয়া পঙ্গপালের পক্ষে প্রখর হইলেও সেগুলি শত্রুর অবর্তমানে খুব বেশী ডিম ছাড়িতে পারে। এই সময় পঙ্গপালের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। সৌর-কলঙ্ক বৃদ্ধি পাইলে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এবং উত্তাপ কমিয়া যায়। সরীসৃপের উপদ্রব বাড়ে, ফলে পঙ্গপাল প্রজনন কমিয়া যায়।

ভারতে জাহাজ নির্মাণ-শিল্পের অগ্রগতি

১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিশাখাপট্টমে ভারতের প্রথম জাহাজ-কারখানায় নির্মিত ৪ হাজার টনের প্রথম জাহাজ 'জলউষা' জলে ভাসাইয়া দেন। ইহা একটি বৃহৎ ঘটনা। কারণ ভারত যে বিশ্বের জাহাজ নির্মাণক্ষম দেশগুলির মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম করিয়াছে, তাহা এই ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ১৯৪৬ সালে অগ্রণী হিসাবে সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর প্রচেষ্টায় বিশাখাপট্টমে ৫০ একর জমির উপর এই জাহাজ কারখানা স্থাপিত হয়। বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের শতকরা ৯৯ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য সমুদ্রপথে চলে। তাহার বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য-পণ্যের বেশ কিছু অংশ চলাচলের জন্য আধুনিক ধরণের নিজস্ব জাহাজ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। ভারতে নূতন জাহাজ নির্মিত হইলে তাহার দ্বারা এদেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাইবার একটা উপায় হইবে।

স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতের নিজস্ব যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, তাহার দ্বারা তাহার সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৫ ভাগ পর্যন্ত চালান সম্ভব হইত। তখন শুধু ভারতের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নয়, জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের প্রসারের জন্যও সরকারের পক্ষে উদ্যম সহকারে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ঘটে। এই উদ্দেশ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে বিশাখাপট্টম জাহাজ-কারখানা স্থাপন করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জাহাজ-কারখানার চারিটি জাহাজ নির্মাণের বার্থ গড়িয়া উঠে। ঐ বার্থগুলিতে ৫৫০ ফুট লম্বা আধুনিক ধরণের ডিজেল-ইঞ্জিন চালিত জাহাজ নির্মাণের সরঞ্জাম রহিয়াছে। পঞ্চম বার্থে ছোট জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ঐ জাহাজ-কারখানায় ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মূল্যের জাহাজ নির্মিত হইয়াছে গত নভেম্বর (১৯৬৩) পর্যন্ত এই জাহাজ-কারখানায় মোট ২,৬০,০০০ টনের জাহাজ নির্মাণ করিয়া ভারতীয় জাহাজ মালিক-দিগকে দেওয়া হইয়াছে। গত ১৫ই নভেম্বর (১৯৬৩) ৩৯তম জাহাজটি জলে ভাসান হয়।

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডে এখন শুধু ভারতীয় কর্মীগণই কাজ করেন। আধুনিক জাহাজ নির্মাণের সহিত জড়িত সকল প্রকার কারিগরি ব্যাপারে তাঁহারা প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বিশাখাপট্টম ইয়ার্ডে এখন ৫ হাজারের বেশী কর্মী, টেক্নিসিয়ান ও ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত আছেন। ভারতের নূতন জাহাজ নির্মাণ-শিল্প চালনার জন্য আবশ্যক নিপুণতা ও জ্ঞান নূতন শিক্ষানবিশদের মধ্যে সঞ্চারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডে গত কয়েক বৎসর যাবৎ একটি

ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা চালান হইতেছে। কেরালার কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজ-কারখানা সংস্থাপনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার জন্য নিপুণ কর্মী এই সকল শিক্ষাপ্রাপ্ত টেক্‌নিসিয়ান ও ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্য হইতে পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় আনুমানিক ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাহাজ-কারখানার আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে এই সকল কাজ সম্পূর্ণ হইবে। কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানের ২৫ হাজার ডি. ডবলিউ. টি. হইতে বাড়িয়া ৪০ হাজার ডি. ডবলিউ. টি হইবে। সরকার আনুমানিক ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাহাজ-কারখানার অংশ হিসাবে বিশাখাপট্টমে একটি ড্রাই ডক নির্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। এই জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভূমিকর্ষণ-যন্ত্র

শ্রীঅমিয়কুমার দাশ

জমিতে বীজ বপন বা চারাগাছ রোপণ—যা-ই করা হোক না কেন, আগে চাই ভালভাবে জমি কর্ষণ করা। জমি কর্ষণের জন্যে যে যন্ত্রগুলির ব্যবহার প্রচলিত, সেই যন্ত্রগুলিকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা—প্রাথমিক কর্ষণ-যন্ত্র ও মাধ্যমিক কর্ষণ-যন্ত্র। কর্ষিত, কিন্তু বেশ কয়েক মাস বা এক সালের জন্যে অনাবাদী জমি চাষ করতে প্রাথমিক কর্ষণ-যন্ত্র চালানো হয় এবং এই বিভাগের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ধরণের লাঙ্গল, যেমন—মাটি উল্টানো লাঙ্গল বা মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল, দুই পক্ষ-বিশিষ্ট লাঙ্গল, চাকৃতি লাঙ্গল ইত্যাদি। প্রাথমিক কর্ষণের পরে জমিতে বীজ বোনবার আগে পর্যন্ত যে সব চাষ দেওয়া হয় এবং এজন্যে যে সব যন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেই যন্ত্রগুলি মাধ্যমিক কর্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে পড়ে। জমিতে লাঙ্গল দেবার পর আসে জমির ডেলামাটি ভাঙ্গবার কাজ এবং তার জন্যে চালানো হয় নানা ধরণের বিদা (Harrow); যেমন—কাঁটা-শলাকাযুক্ত বিদা, স্প্রিং-শলাকাযুক্ত বিদা, চাক্‌তি বিদা ইত্যাদি। এরপর আসে কর্ষিত জমির মাটি সমতল করবার কাজ। এটা সাধারণতঃ মই দিয়ে করে নেওয়া হয়। বিদা চালাবার ফলে মাটির কণাগুলি বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এতে মাটির কণার রন্ধ্রপথগুলির নিরবচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয়। তাই উপরের স্তরের কর্ষিত শিথিল মাটি একটু সংহত করা দরকার, যাতে নীচের মাটির কণার সঙ্গে কৈশিক সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাহলে জমির আর্দ্রতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন—কেন না, জমি তৈরির এটাই একরকম শেষ কাজ, আর এর পরই বীজ বোনা হবে এবং জমির ঐ আর্দ্রতা কৈশিক নালী দিয়ে বীজের কাছে পৌঁছুতে পারবে এবং তাতে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হতে পারবে। এই কাজের জন্যে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, ও উড়িষ্যায় অল্পবিস্তর মই দিয়েই হয়। বিহারে মইয়ের সঙ্গে অনেক সময় কাঠের তক্তা চালানো হয়। উত্তর প্রদেশেও কাঠের তক্তার অধিক প্রচলন আছে, তবে ওখানে এটাকে প্যাটেলা বলে। এছাড়া, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং আরও অন্যান্য অঞ্চলে কাঠ ও

পাথরের রোলার ব্যবহার করা হয়। আজকাল জমিতে সবুজ সার মেশাবার প্রচলন হওয়ায় জলাজমিতে ঐ কাজের সুবিধার জন্যে সবুজ সার দলন যন্ত্র ব্যবহার কবা হয়। আবার ধান রোপণের জমি কাদা করবার জন্যে ব্যবহৃত হয় কাদান যন্ত্র বা প্যাড্‌লার।

মাটি তার নিজ ভারে অনেকটা সংহত হয় আর এই সময় যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে বৃষ্টির জলে প্রবাহিত মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি তার ফাটল ও রন্ধ্রপথে ঢুকে যায়, তাতে মাটির কণাগুলি আরও কাছাকাছি আসবার সুযোগ পায় এবং ক্রমশঃ শুকিয়ে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। এই সংহত ও কঠিন মাটির
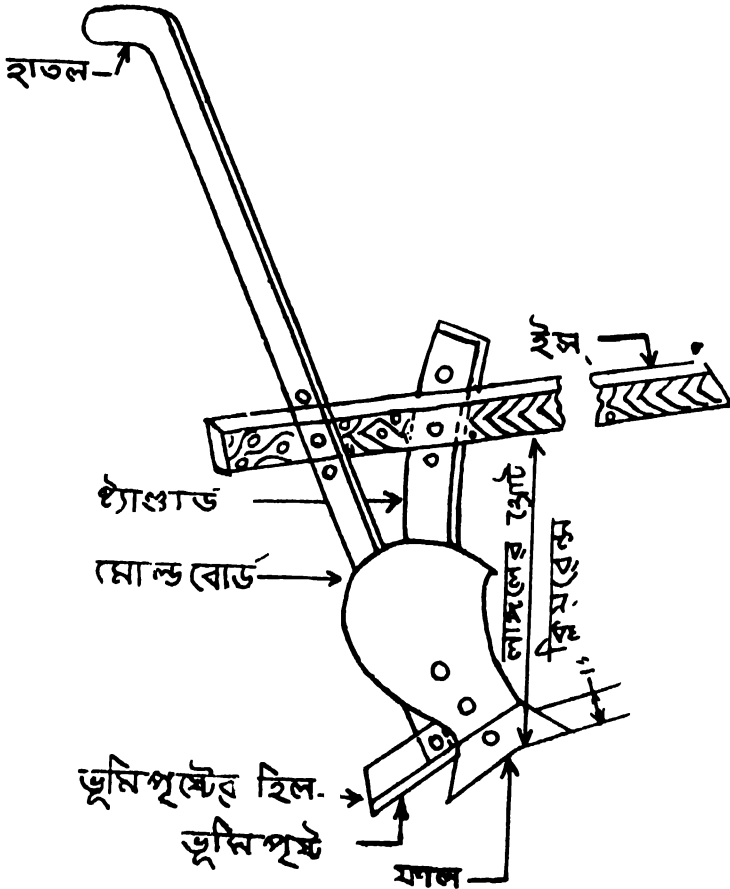
মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল
চিত্র - ১

এখন প্রাথমিক কর্ষণ-যন্ত্র—লাঙ্গল বিষয়ক আলোচনায় ফিরে আসা যাক। কৃষিকার্যে লাঙ্গলের ব্যবহার অপরিহার্য। শস্য লাগাবার পূর্বে ক্ষেতের মাটি চাষ করে গুঁড়া করা দরকার। কেন না, কর্ষিত জমি কয়েক মাস মাত্র অনাবাদী থাকলেও উপর দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে প্রথমতঃ তা বিদীর্ণ করা হয়। পরবর্তী কর্ষণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা মাটি আরও ভুর্‌ভুরে ও দানাদার করা হয়। এতে মাটির দানার উপরিভাগের কালি (Area of grain surface) যেমন বেড়ে যায়, তেমনি শস্যের শিকড়

অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটি থেকে অজৈব খাদ্য গ্রহণের সুযোগ পায়।

ভালভাবে জমি তৈরি করতে হলে আগে চাই জমিতে লাঙ্গলটা ভালভাবে দেওয়া আর তার জন্যে দরকার উন্নত ধরণের লাঙ্গল। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল সেই ধরণের উন্নত লাঙ্গল, যা মাটি কাটতে এবং উল্টাতে পারে। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের (চিত্র ১) প্রধান কার্যকরী অংশ তার তলদেশ, ফাল, পক্ষ বা মোল্ডবোর্ড, ভূমিপৃষ্ঠ ও ফ্রগ—লাঙ্গলের তলদেশের চারটি প্রধান অংশ। এ ছাড়া ইস, হাতল এবং জোত বা হিচ্ প্রভৃতি লাঙ্গলের আনুষঙ্গিক অংশগুলিও আছে।

লাঙ্গলের তলদেশের অংশগুলির বিস্তৃত বিবরণ

(১) ফাল—লাঙ্গলের তলদেশের যে অংশ সর্বপ্রথম মাটির মধ্যে প্রবেশ করে ও মাটি কাটে, সেটাই হলো লাঙ্গলের ফাল (চিত্র ২)।

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের ফালের প্রধান অংশগুলির মধ্যে আছে—ফালের অগ্রভাগ ও তার ঠিক বিপরীত দিকের অংশটা ফালের উইং। ফালের ধারালো অংশটাকে বলা হয় ফালের থ্রোট। ফালটাকে সমতল ভূমিতে সোজা করে বসালে ফালের থ্রোট এবং সমতল ভূমির মধ্যে খানিকটা ফাঁকা স্থান দেখা যায়। ঐ ফাঁকা স্থানটাকে ফালের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স (চিত্র ৭) বলে। ফালের অগ্রভাগ থেকে পশ্চাদ্দিক পর্যন্ত বরাবর এক টুকরা লোহা ওয়েল্ড করে জোড়া লাগানো থাকে, যেটাকে ফালের গানেল বলা হয়।

(২) পক্ষ বা মোল্ডবোর্ড—ফালের পিছন দিকে অবস্থিত অবতল আকৃতির অংশটাই পক্ষ বা মোল্ডবোর্ড (চিত্র ১)। কর্তিত মাটির চাঙ্গর মোল্ডবোর্ডের শিনের (চিত্র ৭) উপর দিয়ে যখন পুরাপুরি মোল্ডবোর্ডের বক্রতার উপর এসে পড়ে, তখন ঐ চাঙ্গর কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং অবশেষে উল্টে পড়ে।

(৩) ভূমিপৃষ্ঠ—লাঙ্গলের তলদেশের যে অংশ খাতের দেয়াল বেয়ে চলে, সেই অংশকে ভূমিপৃষ্ঠ (চিত্র ১) বলে। ফালি খাত পক্ষের উপর যে চাপ দেয়, তাতে লাঙ্গলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। লাঙ্গল মাঠে চালাবার সময় দু-রকম পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে; যথা—ঊর্ধ্বগামী শক্তি, যা লাঙ্গলকে খাত থেকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা করে এবং ঐ সমপরিমাণ নিম্নগামী শক্তি, যা তাকে

খাতের মধ্যে রাখতে চায়। লাঙ্গলের উপর ফালি খাতের এই নিম্নমুখী চাপ বা শক্তিকে নাশ করা ভূমিপৃষ্ঠের কাজ। ভূমিপৃষ্ঠের শেষ প্রান্তের যে অংশটুকু ভূমি স্পর্শ করে, সেই অংশকে ভূমিপৃষ্ঠের হিল বলে। ভূমিপৃষ্ঠের হিল অংশটাতেই মাটির বেশ ঘর্ষণ লাগে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর ফলে লাঙ্গলের সাকৃশন (চিত্র ৩ ও ৪) বিনষ্ট হয়। তাই অনেক লাঙ্গলে ভূমিপৃষ্ঠের হিল পৃথক খণ্ডে তৈরি করা হয়, যাতে সেটা ক্ষয়ে গেলে সমস্ত ভূমিপৃষ্ঠ বদ্‌লাবার দরকার হয় না, শুধু হিলটা বদ্‌লালেই চলে।

(৪) ফ্রগ—এই জিনিষটা লাঙ্গলের তলদেশের এমনই একটা অংশ, যা পূর্ববর্ণিত তিনটি অংশকে একত্রে সংহত করে। যেহেতু লাঙ্গলের তলদেশের সমস্ত অংশগুলিই ফ্রগের উপর আটকানো থাকে, সেহেতু ফ্রগকে লাঙ্গলের তলদেশের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। লাঙ্গলের তলদেশের অংশগুলি যদি ঢালাই লোহার তৈরি হয়, তাহলে দেখা যায় একাধিক অংশ একত্র সম্মিলিতভাবে ঢালাই হয়েছে এবং সেই সম্মেলনে সব সময়ই ফ্রগ থাকে, যেমন—ফ্রগ ও ভূমিপৃষ্ঠ; ফ্রগ, পক্ষ ও ভূমিপৃষ্ঠ; ফ্রগ, ভূমিপৃষ্ঠ ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড একত্রে ঢালাই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়।

(৫) ষ্ট্যাণ্ডার্ড—ভূমিপৃষ্ঠের উপর থেকে ফ্রগের পাশ বেয়ে যাওয়া পক্ষের পিছন দিকে অবস্থিত উল্লম্ব অংশটিই ষ্ট্যাণ্ডার্ড। এর উপরিভাগে কতকগুলি গর্ত ড্রিল করা থাকে, যাতে সুবিধামত জায়গায় ইস্ বাঁধা যায়। এটা সরাসরি মাটি কাটবার কাজে আসে না বলে তলদেশের অংশ হিসাবে একে ধরা হয় না।

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের সংশ্লিষ্ট অংশ

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের তলদেশের এবং আনুষঙ্গিক অংশগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সংশ্লিষ্ট অংশ আছে; যেমন—কোল্টার, জয়েন্টার বা স্কিমার, গেজ হুইল ইত্যাদি। বলদ-চালিত লাঙ্গলে এই অংশগুলির যতটা না আবশ্যকতা আছে, ট্র্যাক্টর মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলে কিন্তু শুধু কোল্টার বা কোল্টার ও জয়েন্টারের একত্র ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন। চাকৃতি আকারের ঘূর্ণায়মান কোল্টার লাঙ্গলের ফালের ঠিক উপরিভাগে লাগানো থাকে এবং এর কাজ হলো ফালের আগে আগে সরু ফালির মত অল্প গভীর মাটি কাটা। এতে খাতের দেয়াল ভাঙ্গা ভাঙ্গা বা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো হয় না আর মোল্ডবোর্ডের শিন অংশকেও জোর করে খাতের মধ্যে ভেদ করতে হয় না। গেজ হুইল কোন কোন বলদ-চালিত খাটো ইস্‌যুক্ত মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের জোত বা হিচের ঠিক পিছনের দিকে লাগাতে দেখা যায়। লাঙ্গল স্থানান্তরে নিয়ে যেতে ও নিয়ে আসতে এবং একই গভীরতায় চাষ করতে গেজ হুইল সাহায্য করে। ট্র্যাক্টর লাঙ্গলেরও একেবারে পশ্চাদ্ভাগে একটা হুইল লাগানো থাকে, যেটাকে খাত হুইল বা ঘূর্ণায়মান ভূমিপৃষ্ঠ হুইল বলে। এই হুইলের কাজ লাঙ্গলের উপর কার্যকরী পার্শ্বচাপ বিনষ্ট করা ও তার ভারসাম্য বজায় রাখা।

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল উপযোজন

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দিয়ে উপযুক্তভাবে কাজ পেতে হলে নিম্নলিখিত উপযোজনগুলির বিষয় জানা দরকার।

(১) উল্লম্ব সাকৃশন—কোন সমতল ভূমির উপর একত্রিত লাঙ্গলের তলদেশ সোজা করে বসালে দেখা যাবে যে, শুধু ফালের অগ্রভাগ ও ভূমিপৃষ্ঠের হিল ভূমি স্পর্শ করে আছে আর তাদের মধ্যবর্তী স্থান ভূমি থেকে একটু উঠে থাকায় খানিকটা খালি জায়গাও দৃষ্ট হয়। ঐ খালি জায়গাটিই লাঙ্গলের উল্লম্ব বা ডাউন বা বটম্ সাকৃশন। খালি জায়গার পরিমাণ যেখানে সবচেয়ে বেশী, সেখানটা মেপে লাঙ্গলের উল্লম্ব

সাকৃশন (চিত্র ৩) নির্ণীত হয়। উল্লম্ব সাকৃশন খুব বেশী অথবা খুব কম হলে উভয় ক্ষেত্রই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উল্লম্ব সাকৃশন খুব বেশী রাখলে ফাল মাটির মধ্যে অধিক পরিমাণে ঢুকে লাঙ্গলের ক্ষমতার অধিক মাটি কাটতে চাইবে। ফলে লাঙ্গল ঝাঁকুনি খাবে এবং তার ভারবহনও বেড়ে যাবে। উল্লম্ব সাকৃশন খুব কম রাখলে আবার ফাল উপযুক্ত গভীরতায় মাটি না কেটে লাঙ্গলকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দিতে চাইবে। ফলে, অগভীর ও এব্ড়ো-খেব্ড়ো খাত কাটা হবে। থেকে ভূমিপৃষ্ঠের হিল পর্যন্ত পাশাপাশি ধরলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা বা খালি জায়গা রয়েছে। ফালের গানেল ও ভূমিপৃষ্ঠ যেখানে মেলে, সেখানে খালি জায়গার পরিমাণ অধিক এবং সেটা মেপেই লাঙ্গলের অনুভূমিক, সাইড বা ল্যাণ্ড সাকৃশন নির্ণয় করা হয়। আবার চিত্র ৪ তে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমন ভাবেই লাঙ্গলের তলদেশ কাৎ করে কোন সমতল ভূমির উপর শুইয়ে দিয়েও অনুভূমিক সাকৃশন পাওয়া যায়। ঠিকমত এই সাকৃশন দিতে

চিত্র ৬
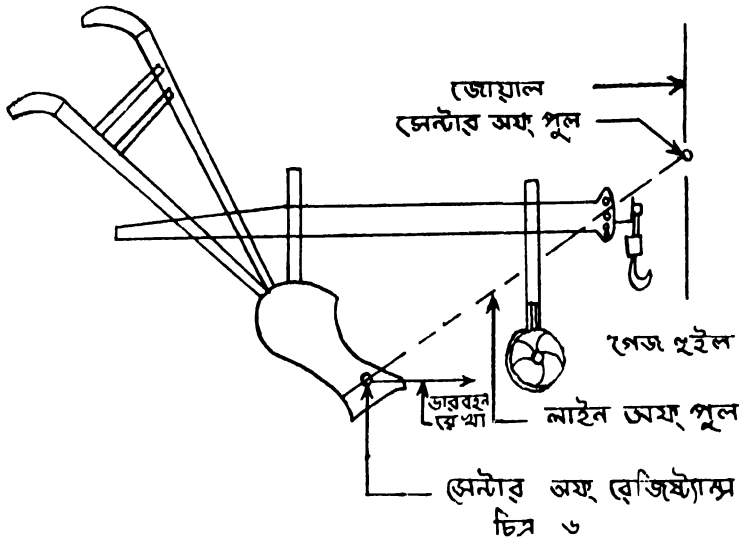
বিভিন্ন ধরণের মাটির উপযোগী উল্লম্ব সাকৃশনের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। কাদামাটির উল্লম্ব সাকৃশনের পরিমাণ হাল্কা বা বেলে মাটির পরিমাণ থেকে বেশী। বেলে মাটির উল্লম্ব সাকৃশন ৩/১৬" থেকে ১/৪" ও কাদামাটির উল্লম্ব সাকৃশন ১/৪" থেকে ১/২" পর্যন্ত হতে পারে।

(২) অনুভূমিক সাকৃশন—উল্লম্ব সাকৃশন মাপবার সময় একত্রিত লাঙ্গলের তলদেশ যেমন রাখা আছে, ঠিক সেভাবে রেখেই একটা স্ট্রেট এজ বা এক টুকরা সুতা ফালের অগ্রবিন্দু পারলে লাঙ্গল তার মাপ অনুযায়ী পুরা খাত কাটবে। অনুভূমিক সাকৃশন খুব বেশী রাখলে লাঙ্গল তার মাপের অধিক চওড়া খাত কাটবার দিকে ঝুঁকবে, ফলে ভারবহন বেড়ে যাবে। আবার তা খুব কম রাখলে লাঙ্গল পুরা মাপ অপেক্ষা কম চওড়া খাত কাটবে। বিভিন্ন প্রকার মাটি অনুযায়ী অনুভূমিক সাকৃশন ৩/১৬" থেকে ৫/১৬"-এর মধ্যে রাখা যেতে পারে।

(৩) মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের মাপ—ফালের উইং স্পর্শ করে ভূমিপৃষ্ঠ যে রেখায় অবস্থিত,

সেই রেখার সমান্তরাল রেখা টেনে তাদের লম্বমান দূরত্ব মেপে লাঙ্গলের মাপ (চিত্র ৫) নির্ণয় করা হয়।

(৪) মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স—ফালের অগ্রভাগ থেকে ইস্ পর্যন্ত লম্বমান দূরত্বকে লাঙ্গলের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স বলে। এটি মাপবার সময় ফালের অগ্রভাগের ১" পিছন থেকে ইস্-এর নিম্নাংশ পর্যন্ত দূরত্ব (চিত্র ১) লওয়া হয়। যে জমিতে লম্বা লম্বা আগাছা ও জঞ্জাল বেশী থাকে, সে জমিতে অধিক থ্রোট ক্লিয়ারেন্সযুক্ত লাঙ্গল চালানো দরকার। বলদ-চালিত লম্বা ইস্‌যুক্ত লাঙ্গলের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স ১৪" থেকে ১৮"-এর মধ্যে থাকে।

(৫) ফালের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স—ফালের থ্রোট অর্থাৎ ফালের ধারালো অংশের সমস্তটাই ভূমির সঙ্গে মিশে থাকে না। ফালের উইং ও তার অগ্রভাগের মধ্যবর্তী অংশ কিছুটা উঠে থাকে। ভূমি থেকে উঠে থাকা ঐ ফাঁকা জায়গাটাকেই ফালের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স (চিত্র ৭) বলে। যে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি লাঙ্গলের তলদেশকে খাত থেকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দিতে চায়, সেই সব উর্ধ্বগামী শক্তির সমতার কিয়দংশ নিম্নগামী শক্তি ফালের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স প্রদান করে।

(৬) জোত বা হিচ্ উপযোজন—বলদের জোয়ালে ইস্ বেঁধে লাঙ্গলের গতি প্রদানকারী শক্তি সংযোগ করা হয়। জোয়ালে লাঙ্গল বাঁধবার প্রণালীটাকেই বলদে লাঙ্গল জোতা বলা হয়। ঠিকমত লাঙ্গল জোতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের খুব সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ জোয়ালের মাঝামাঝি

চিত্র ৭
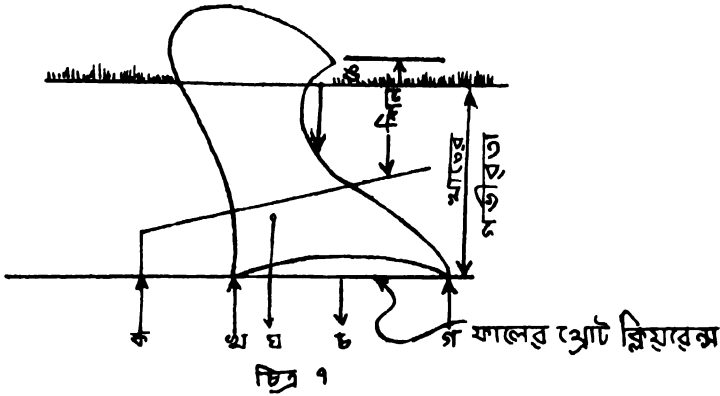
উর্ধ্বমুখী শক্তি ↑, ক—ভূমিপৃষ্ঠের উপর খাতের দেয়ালের চাপ, খ—ফালের উইং-এ খাতের তলার চাপ, গ—ফালের অগ্রভাগে খাতের তলার চাপ। নিম্নমুখী শক্তি ↓; ঘ—লাঙ্গলের ভারের চাপ, চ—ফালের থ্রোট ক্লিয়ারেন্স থেকে উৎপন্ন সাকশন চাপ, ঙ—মোল্ডবোর্ডের উপর ফালি খাতের চাপ।

ইস্ বেঁধে লাঙ্গল জুতে দেওয়া হয়। লাঙ্গল জোত্‌বার সময় এটা জানা প্রয়োজন যে, যদি লাঙ্গল ঠিক তার সেণ্টার অফ রেজিষ্ট্যান্স থেকে সোজা সামনের দিকে টানা হয়, তাহলে লাঙ্গল আয়াসে কাজ করবে। আমরা জানি যে, লাঙ্গল চলবার সময় কতকগুলি পরস্পর বিরোধী শক্তি লাঙ্গলকে অতিক্রম করে চলতে হয়। অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐ সমস্ত শক্তির সমতা লাঙ্গলের তলদেশের একটিমাত্র বিন্দুতে নিহিত। ঐ বিন্দুটাকেই সেণ্টার অফ রেজিষ্ট্যান্স (চিত্র ৫

ও ৬) বলা হয়। বলদ-চালিত লাঙ্গলে ঐ বিন্দুটি যেদিকে ভূমিপৃষ্ঠ আছে, সেদিক থেকে লাঙ্গলের মাপের ⅓ অংশ দূরে এবং মোল্ডবোর্ড ও ফাল যে রেখায় মিশেছে, সেই রেখায় অবস্থিত। আবার জোয়ালের যে জায়গায় ইস্ বাঁধা হয়, সেই জায়গাটাকে সেণ্টার অফ পুল (চিত্র ৬) বলা হয়। লাঙ্গল ঠিকভাবে জোতা তখনই হয়েছে বলা যেতে পারে, যখন সেণ্টার অফ পুল থাকে সেণ্টার অফ্ রেজিষ্ট্যান্স-এর ঠিক সম্মুখে। যে কাল্পনিক রেখা জোয়ালের সেণ্টার অফ পুলের সঙ্গে জোয়ালের সেণ্টার অফ রেজিষ্ট্যান্সকে মিলিত করে, সেই রেখাকে (চিত্র ৬) লাইন অফ পুল বলে। লাঙ্গলের সেণ্টার অফ রেজিষ্ট্যান্স থেকে লাঙ্গলের সম্মুখভাগে চলবার পথের সমান্তরাল যে কল্পিত রেখাটি চিত্রে (চিত্র ৫ ও ৬) দেখানো হয়েছে, সেই রেখাটিকে ভারবহন রেখা বলে।

মাঠে লাঙ্গল চলবার সময় তার সমতা রক্ষা করবার জন্যে যে পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তিগুলি লাঙ্গলের উপর কাজ করে, তাদের কতকগুলি ঊর্ধ্বমুখী আর কতকগুলি নিম্নমুখী। ঊর্ধ্বমুখী শক্তি লাঙ্গলের যথোচিত গভীরতায় খাত কাটায় বাধা সৃষ্টি করে এবং খাত থেকে জমির উপর দিকে লাঙ্গলকে ঠেলে উঠিয়ে দিতে চায়। লাঙ্গলের তলদেশের যে তিনটি অংশ কর্তিত খাতের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করে, সেই তিন অংশেই মৃত্তিকার চাপজনিত ঊর্ধ্বমুখী শক্তি (চিত্র ৭) কার্যকরী হয়; যেমন—ভূমিপৃষ্ঠের উপর খাতের দেয়ালের চাপ আর ফালের উইং ও অগ্রভাগের উপর খাতের তলার চাপ। ঊর্ধ্বমুখী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী নিম্নমুখী শক্তিগুলি (চিত্র ৭) হচ্ছে লাঙ্গলের ভারের চাপ, ফালের থ্রোট্ ক্লিয়ারেন্স থেকে উৎপন্ন সাক্‌শন চাপ ও মোল্ডবোর্ডের উপর ফালি খাতের ভারের চাপ।

বিজ্ঞান-সংবাদ

যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি অক্ষরে রূপান্তরিত

সম্প্রতি পশ্চিম বার্লিনে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে পশ্চিম জার্মেনীর এক সুপ্রসিদ্ধ ইলেকট্রিক কোম্পানী একটিবিদ্যুৎ-চালিত "কম্পোজিটার" যন্ত্র প্রদর্শন করেন। একটি বিশেষ যন্ত্র ধ্বনিকে অক্ষরে রূপান্তরিত করে। যন্ত্রটির আবিষ্কারক ডাঃ কুচ্ছ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বললে তা আপনিই লেখা হয়ে যাবে। এই অদ্ভুত যন্ত্রটি তৈরি করতে সাত বছর সময় লেগেছে। সাফল্য লাভ করবার পূর্বে যন্ত্রটিতে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। তবুও যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয়েছে, এখনও এমন কথা বলা যায় না। এই যন্ত্র দীর্ঘ ভাষণ, কবিতা আবৃত্তি বা দীর্ঘ বাক্যালাপ লিখতে সক্ষম নয়। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, অদূর ভবিষ্যতেই তা করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে যন্ত্রটি 'শূন্য' থেকে 'নয়' পর্যন্ত শব্দ অক্ষরে রূপান্তরিত করতে পারে। বলবার সময় উচ্চারণে বিকৃতি ঘটলেও যন্ত্রে লেখায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

বিভিন্ন ব্যক্তির স্বরে যে শব্দ-কম্পনের পার্থক্য ঘটে, সে তারতম্যের জন্যে অক্ষর তৈরির সময় যন্ত্রের কার্যে কোন বাধা আসবে না।

অনুবাদক টাইপ রাইটার ছিল প্রদর্শনীর দ্বিতীয় বিস্ময়। এই জাতীয় যন্ত্র পশ্চিম জার্মেনীতে তৈরি হচ্ছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, জার্মান ভাষা এই যন্ত্রের দ্বারা কিভাবে অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে যায়। একথা সত্য যে, এই অনুবাদের কোন

সাহিত্যিক মূল্য নেই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি যথাযথ ভাবে অন্যভাষায় রূপান্তরিত হতে পারে। তাথেকে অন্য ভাষায় ব্যাকরণ ইত্যাদি শুদ্ধ করে নেওয়া যেতে পারে। মূল ভাষা থেকে এই রূপান্তর প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কম মূল্যবান নয়। ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ প্রগতি দেখা দিয়েছে, উপরের দুটি উদাহরণ তার মাত্র সঙ্কেত দিচ্ছে।

পাকস্থলীর ক্ষতের জন্যে যকৃৎই দায়ী

পাকস্থলীতে প্রচুর অম্ল জমলে ক্ষত দেখা দেয়। কিন্তু কেন যে পাকস্থলীতে অম্লাধিক্য ঘটে এবং অন্যান্য যে সব কারণে পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়, এতদিন তা অস্পষ্ট ছিল।

পশ্চিম জার্মেনীর চিকিৎসক অধ্যাপক ফ্রিডরিশ স্টেন্টজনের পাকস্থলীর ক্ষতের আসল রহস্য আবিষ্কার করেছেন। হামবুর্গের সার্জিক্যাল ইউনিভার্সিটি ক্লিনিকের প্রধান চিকিৎসক পশুদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, পাকস্থলীর ক্ষতের মূলে রয়েছে যকৃতের কোন না কোন রকম গোলমাল। ইতিপূর্বে এসম্বন্ধে যেসব পরীক্ষা হয়েছিল, তাতেও দেখা গেছে যে, পাকস্থলীর ক্ষতে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা সত্তরজন যকৃতের অসুখেও ভোগে। তাতে চিকিৎসকদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, পাকস্থলীর ক্ষতের দরুণ পাকস্থলী ঠিকমত কাজ না করায় যকৃৎ খারাপ হয়ে যায়। অধ্যাপক স্টেন্টজনের কিন্তু ঠিক এর বিপরীত কথা শুনিয়েছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, প্রথমে যকৃৎ খারাপ হয় এবং পরে সেই কারণেই পাকস্থলীতে ক্ষত দেখা দেয়। যকৃতের অন্যতম একটি কাজ হলো এই যে, পাকস্থলীর পিছনের অংশে গ্যাসট্রিন নামে যে হর্মোন সৃষ্টি হয় তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে রক্তস্রোতের মাধ্যমে সেটির অতি অল্প মাত্রা পাকস্থলীর সামনের অংশে গিয়ে পৌঁছয়। যকৃৎ যেন ঠিক দাঁড়িপাল্লার কাজ করে এবং মেপে দেয় ঠিক কতটুকু গ্যাসট্রিন দরকার। বাড়্‌তি গ্যাসট্রিন যকৃতের মধ্যে থেকে যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হয়ে যায়। যকৃৎ যদি খারাপ হয়, তাহলে এই কাজ ঠিকমত হয় না এবং তার ফলে পাকস্থলীর সামনের দিকে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসট্রিন আসতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তা থেকে পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

এসম্বন্ধে অধ্যাপক স্টেন্টজনের আরও যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, যকৃতে এমন কিছু পদার্থ জন্মায়, যাতে অতিরিক্ত গ্যাসট্রিন গলে যায়। এখন সেই পদার্থটি যদি রাসায়নিক উপায়ে পৃথক করা যায়, তাহলে পাকস্থলীর ক্ষত চিকিৎসায় সেই জিনিষটিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলবে—ঠিক যেভাবে বহুমূত্র রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসকেরা ইনসুলিনের ব্যবহার করেন। সেই পদার্থটি কি—জানা গেলেই, পাকস্থলীর ক্ষতের, তথা অম্লাধিক্য রোগের সুরাহা হবে বলে মনে হয়।

অবরুদ্ধ ধমনীর অস্ত্রোপচারের নতুন পদ্ধতি

হঠাৎ ধমনীতে রক্তের দানা বেঁধে যাওয়ার ব্যাপার আজকাল প্রায়ই দেখা যায় এবং এটা একটা ভয়ঙ্কর রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কোন প্রধান ধমনীতে রক্ত দানা বেঁধে যায়, তাহলে রক্তস্রোত সেখানেই বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগীর প্রাণহানির যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দেয়। হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে রক্ত দানা বাঁধে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রক্ত দানা বাঁধে তলপেট কিম্বা উরুর ধমনীতে। তখন পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। শরীরের ঐ অংশে রক্ত চলাচলে দারুণ ব্যাঘাত ঘটায়। পশ্চিম জার্মেনীতে এই রোগের দরুণ

হাজার হাজার রোগীর পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মেনীর অস্ত্র-চিকিৎসকেরা এই বিপজ্জনক রক্তে দানা বাঁধার প্রতিকারে সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় এক নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁরা যে শুধু রোগীর পা বাঁচাচ্ছেন তাই নয়, পায়ের স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

পশ্চিম জার্মেনীর একটি বড় হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ কে. ই. লুজ এই নতুন অস্ত্রোপচারের কৌশল সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। এই পদ্ধতি তিন স্তরে বিভক্ত। রক্তে দানা বাঁধবার দরুণ যদি কোন ধমনীর সামান্য অংশ আক্রান্ত হয়, তাহলে ধমনীর সেই অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে দু-দিকের দুই প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হয়। তবে রক্তে দানা বাঁধলে সাধারণতঃ ধমনীর বেশ অনেকটা অংশ আক্রান্ত হয়। ধমনীর সে ক্ষেত্রে একটা আলাদা পথ তৈরি করা হয়। ধমনীর যে অংশে দানা বেঁধেছে, সেই অংশ কেটে বাদ দিয়ে কাটা ধমনীর দুই মুখে একটা বাঁকানো প্লাস্টিকের নল লাগিয়ে দেওয়া হয়, যার মধ্য দিয়ে রক্তচলাচল করে। ডাঃ লুজের মতে এই পদ্ধতিটা যেন ঠিক একটা বন্ধ রাস্তার পাশ কাটিয়ে আরেকটা পথ করে দেওয়া। তৃতীয় ধরণের রোগে অস্ত্রোপচারের দরকার হয় না। কারণ এতে কোন একটা প্রধান স্নায়ু আক্রান্ত হয়, যাকে বলে "নার্ভাস সিম্প্যাথিকাস"। এই রকম হলে যেখানে রক্ত দানা বাঁধে ঠিক তার উপরে ঐ স্নায়ুকে আটক করা হয়। এর ফলে প্রধান ধমনীর চারপাশের ছোট ছোট সব ধমনী ফুলে ওঠে ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট ছোট ধমনীগুলি বড় ধমনীর কাজ চালাতে সুরু করে ও পায়ে প্রচুর রক্ত সরবরাহ হতে থাকে। পশ্চিম জার্মেনীর বিভিন্ন হাসপাতালে এই সম্বন্ধে আরও ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে।

মানব-দেহে তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাব

শারীরিক সুস্থতা, কর্মশক্তি বৃদ্ধি, স্নায়বিক উদ্বেগ, মাথাধরা, ক্লান্তি, অনিদ্রা ও অবসাদ—সবই আবহাওয়া অথবা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ঘটতে পারে। কথাটা দক্ষিণ জার্মেনী সম্বন্ধে খুব খাটে, কারণ সেখানে যখন সময় সময় শুষ্ক গরম বাতাস "ফোইন" চলে (উত্তর ভারতের 'লু'-র মত), তখন জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

আবহাওয়া ও মানব-দেহের মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান প্রচুর গবেষণার ফলে আশ্চর্য ফল পেয়েছে। দেখা গেছে, আবহাওয়া পরিবর্তনের ঠিক পূর্বে ও পরিবর্তনের সময়ে রাস্তাঘাটে নানারকম দুর্ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া যখন "ফোইন" হয়ে ওঠে, দক্ষিণ জার্মেনীর সার্জনেরা তখন পারতপক্ষে কোন অস্ত্রোপচার করেন না। কারণ তাঁরা দেখেছেন অস্ত্রোপচারের পর ঐ সময় নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বার্লিনের ডাক্তার জেকেরিয়াস লক্ষ্য করেছেন যে, আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলে জন্মের হার বৃদ্ধি পায় এবং তাপ কমে এলে জন্মহার হ্রাস পায়।

এই তথ্য জানবার পরেও গবেষকেরা সন্তুষ্ট না থেকে এই বিষয়ে অধিকতর তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গবেষণা করে চলেছেন। গত দশ বছর যাবৎ আবহাওয়ার উপর মানব-দেহের নির্ভরতা, তথা ব্যক্তিগত আবহাওয়া সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে প্রাণী-বিজ্ঞানী, শারীর-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ কাজ করে-যাচ্ছেন।

এতকাল ধারণা ছিল চন্দ্র, সূর্য ও বায়ুমণ্ডল মানব-দেহকে প্রভাবান্বিত করে, কিন্তু এসব কথা এখন ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মিউনিখের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডাক্তার আর. রাইটার মনে করেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে দুই লক্ষ স্পন্দনবিশিষ্ট (ফ্রিকোয়েন্সি) দ্রুত পরিবর্তনশীল তড়িৎ-ক্ষেত্রগুলি দেহের

উপর আবহাওয়ার প্রভাব বিস্তারের জন্যে দায়ী। এই তড়িৎ-ক্ষেত্রগুলি আবহাওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী বেতার-তরঙ্গের মত প্রসারিত হয় ও আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে তাদের গতিবেগের পার্থক্য ঘটে।

রাইটারের এই মতবাদ এখন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাধীন। যদি প্রমাণ হয় যে, তড়িৎ-ক্ষেত্রগুলি মহাকাশে বেতার-তরঙ্গের মত চলাফেরা করে, তবে এই আবিষ্কার মানব-দেহে আবহাওয়ার প্রভাবের সমস্যা আরও জটিল করে তুলবে।

খাদ্যদ্রব্যের বিষ কীটঘ্ন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্যোগ

নির্বিচারে রাসায়নিক কীটঘ্ন দ্রব্যাদি প্রয়োগ করলে যে সকল কীট-পতঙ্গ মানুষের উপকারে আসে, তাদের এবং অন্যান্য প্রাণীর বিশেষ ক্ষতি করা হয়। এছাড়া এর ফলে খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয়ও দূষিত হয়ে থাকে।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের ধারণা—বিচার-বিবেচনা করে এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করলে এই বিপদ এড়ানো যেতে পারে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে যে বিষ রয়েছে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা সে সকল নিয়েও গবেষণা করেছেন এবং এই সকল দ্রব্য কীটঘ্ন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা, সে সম্পর্কেও পরীক্ষা করে দেখছেন।

প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে যে বিষ রয়েছে, সে বিষয়ে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ আর্ভিং লীনার গবেষণা করেছেন। তিনি কোন কোন ধরণের মটর ও শিমের মধ্যে বিষের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলি মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব দ্রব্য বেশী পরিমাণে খেলে পশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। কিন্তু মানব-দেহে এই সকল দ্রব্যের সেই রকম কোন ক্রিয়া হয় না। তাঁর মতে, রান্না করবার ফলে এই বিষ নষ্ট হয়ে যায়। তবে ডাঃ লীনার বলেন, রান্না করলেও কোন কোন মটর ও শিমের বিষ একেবারে নষ্ট হয় না এবং তা থেকে রোগের কারণ ঘটলেও সেই রোগ গুরুতর হয় না। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—যে সকল খাদ্যে আয়োডিন রয়েছে, তা খেলে রোগ এড়ানো যেতে পারে; অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যে প্রাকৃতিক কারণে যে বিষ দেখা যায়, তা সব সময়েই রোগের কারণ হয় না এবং হলেও তা মারাত্মক হয় না—সহজেই তা নিবারণ করা যায়। পার্সনিপ এক ধরণের সব্জী। এর মূল গাজরের মত। বিজ্ঞানীরা এর মধ্যেও মায়রিস্টিসিন নামে এক প্রকার বিষের সন্ধান পেয়েছেন। এই বিষ পাইরেথ্রামের মত কীটঘ্ন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকার এক প্রকার ফুল থেকে এই পাইরেথ্রাম সংগ্রহ করা হয়।

শল্যচিকিৎসার অভাবনীয় উন্নতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই শল্যচিকিৎসার অভাবনীয় উন্নতি হয়ে আসছে। শল্যচিকিৎসার এই নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা হলো, কৃত্রিম ফুস্‌ফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের আবিষ্কার। এখন শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে শরীরের মারাত্মক গলদ ঠিক করে দেওয়া যায়। এমন কি, মানব-দেহের সচল যন্ত্রগুলির পরিবর্তনও করা যায়।

হৃদ্‌যন্ত্রের বিকল ভাল্‌ভের জন্যে মানুষকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কৃত্রিম ভাল্‌ভ লাগিয়ে আজকাল মানুষের যন্ত্রণা দূর করা যায়। এই কৃত্রিম ভাল্‌ভে খুব একটা বেশী কিছু কাজ না হলেও যা হয় তাও কম নয়। অদূর ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

শরীরের খুব সামান্য দোষ-ত্রুটি থেকে খুব বড় রকমের রোগ হতে পারে। ইদানীং এর প্রতিকারের একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এর

নাম মাইক্রোসার্জারি। এই ধরণের শল্য-চিকিৎসার প্রধান প্রতিবন্ধক হলো শরীরের এসব ক্ষুদ্র দোষগুলি চিকিৎসকের চোখে ধরা পড়ে না। তাছাড়া এসব অতি ক্ষুদ্র অংশের উপর অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে। তবে ইদানীং কিছু নতুন যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রোপচার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে চোখে খুব ভালভাবে না দেখেও অস্ত্রোপচার করা যায়। সূক্ষ্ম রক্ত কণিকা ও স্নায়ুতন্তুর উপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব কাজে লাগে। যুক্তরাষ্ট্রে গত তিন বছর যাবৎ শ'-দুই চিকিৎসক এই মাইক্রোসার্জারি প্রয়োগ করছেন এবং বর্তমানে অনেকে এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

এই মাইক্রোসার্জারির জন্যে প্রধানতঃ প্রয়োজন হলো অতি সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। গত বছর পনেরো যাবৎ শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যান্য মাইক্রোসার্জারির ক্ষেত্রে মাইক্রো-স্কোপের ব্যবহার সুরু হয় ১৯৬০ সাল থেকে।

শল্যচিকিৎসার উন্নতির ক্ষেত্রে চোখের কর্নিয়ার উপর অস্ত্রোপচার (গ্র্যাফ্‌টিং) একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এর ফলে অনেক অন্ধও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। অস্থিভঙ্গের চিকিৎসায় ক্ষতস্থানে ধাতুর বা প্লাষ্টিকের যন্ত্রাংশ ঢুকিয়ে হাত-পা ঠিক করে দেওয়াও একটি অভাবনীয় উন্নতি। এর ফলে ইদানীং জন্মাবধি পঙ্গু অনেক ব্যক্তি আবার চলতে ফিরতে পারছেন। এসব ক্ষেত্রে আরও অনেক উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে শল্যচিকিৎসায় ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো শরীরের রুগ্ন অঙ্গের পরিবর্তন। এখন কোন দাতা তাঁর নীরোগ অঙ্গ দান করলে অন্য ব্যক্তির রুগ্ন অঙ্গ কেটে তা সেখানে বসানো যায়। এই ভাবে আজকাল অনায়াসে যকৃৎ পরিবর্তন করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক যকৃৎ ঠিক কাজ করে না। তথাপি এই ধরণের গ্র্যাফ্‌টিংয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। পরে হয়তো ওভারি, প্লীহার এবং গ্ল্যাণ্ডেও এইভাবে গ্র্যাফ্‌ট করা সম্ভব হবে। এখনও শল্যচিকিৎসায় প্রধান লক্ষ্য হলো রুগ্ন অঙ্গের অপসারণ। রক্তের ট্র্যান্সফিউশন ও অ্যানেস্থেসিয়ার উন্নতির সঙ্গে বহু রোগ দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

আজকাল অবশ্য অস্ত্রোপচার করে রুগ্ন অঙ্গ অপসারণের পরিবর্তে সেই অঙ্গে ওষুধ দিয়ে রোগ দূর করবার পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এখন যদি কোন অঙ্গ বাদও দিতে হয়, তাহলে তার পরিবর্তে সেখানে অন্য টিস্যু বা অঙ্গ স্থাপনেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। পেট এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুর উপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইদানীং অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অঙ্গের অপসা-রণের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। তবে একদিন শুধু ওষুধ দিয়েই ক্যান্সারের চিকিৎসা করা সম্ভব হবে, তবে সেদিন আসতে অনেক দেরী। কেন না, ক্যান্সার নানান ধরণের হয়ে থাকে এবং কোন একটি মাত্র ওষুধই যে সব রকমের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কাজ দেবে, তা মনে হয় না। তবে এখনও এমন ওষুধ আছে, যা ক্যান্সারের প্রসার বন্ধ বা শ্লথ করে দিতে পারে; এমন কি, কিছু দিনের জন্যে তা ক্যান্সারকে নিশ্চিহ্নও করে দিতে পারে। এসব ওষুধ সম্প্রতি বেরিয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে সঠিকভাবে এখন কিছু বলা যায় না।

শল্যচিকিৎসার এই ব্যাপক উন্নতির ফলে সাধারণ চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং প্রাণী-বিজ্ঞানও যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। রক্তের শ্রেণী এবং রোগের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তা এইভাবে জানা গেছে। আভ্যন্তরীণ গ্ল্যাণ্ডের অপসারণ সম্পর্কিত অস্ত্রো-পচারের ফলেও মানব-দেহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। গ্যাসট্রিক ও ডুয়োডোন্যাল আলসারের উপর অস্ত্রোপচারের ফলে রক্তের লাল

কণিকা গঠন ও হজম করার ব্যাপারে পেটের (ষ্টমাক) ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। মস্তিষ্কের স্নায়ুর উপর অস্ত্রোপচার করে বিশেষজ্ঞেরা মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।

ম্যালেরিয়া দূরীকরণের চেষ্টা

ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞেরা জানতে পেরেছেন যে, প্রথমবার ওষুধ দিয়ে মানব-দেহে ম্যালেরিয়ার বীজাণু এবং মাঠে-ঘাটে মশা যতটা ধ্বংস করা যায়, পরে আর ততটা হয় না। এই সব প্যারাসাইট ও অ্যানোফিলিশ ক্রমেই এই সব ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।

যুদ্ধের আগে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কর্মসূচী খুব সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯৪৮ সালের মধ্যে ভারতে ম্যালেরিয়ায় ২০ লক্ষ লোক মারা যায় এবং ৩০ শতাংশ লোক প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভোগে। গত বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় মাত্র ৫০ হাজার লোক, কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রমণে একজনেরও মৃত্যু হয় নি।

কিন্তু প্যারাসাইট ও মশা দমন করতে না পারলে এই ধরণের সাফল্য কোন কাজেই লাগবে না। এই জন্যে সম্প্রতি জেনিভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই বৈঠকে প্যারাসাইট ও মশার প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এক প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্রুশ ছওয়াট বলেন যে, এসম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা কঠিন। কেন না, এসব ওষুধ অনেক ওষুধের মিশ্রণে তৈরি। বিভিন্ন প্রাণীর উপর এই ওষুধের প্রভাব বিভিন্ন। মানুষের উপর এই ওষুধের পরীক্ষা ভিন্ন সঠিক-ভাবে কিছু জানা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছা-সেবকদের উপর পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সম্মেলন মনে করেন যে, প্যারাসাইট ও মশা সামান্য প্রতি-রোধ-ক্ষমতা অর্জন করলেও তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাদের মতে, ক্লোরোকুইন জাতীয় ওষুধ এখনও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় শ্রেষ্ঠ ওষুধ। তবে প্যারাসাইট প্রভৃতির প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকা দরকার। অন্যথায় স্বাস্থ্য-কর্মীদের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ভাইরাস নির্ণয়ের নতুন পন্থা

পুনার এণ্টেরিক ভাইরাস রিসার্চ লেবরেটরিতে একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে পানীয় জলে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। হেপাটাইটিস, পোলিও প্রভৃতি রোগ পানীয় জলের ভাইরাস থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জলে ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়, তাতে কিছু ভাইরাসের সন্ধান নাও মিলতে পারে। নতুন পদ্ধতির নাম টিস্যু কালচার পদ্ধতি।

অতি ক্ষুদ্র বস্তুর ওজন নির্ণয়ের অভিনব যন্ত্র

ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা এনসাই-ক্লোপিডিয়াতে দুটি অক্ষর যোজনা করলে এর ওজন কতখানি বেড়ে যাবে, তাও বর্তমানে বলে দেওয়া যায়।

"মডেল ১০১ কোয়ার্ট্জ্ ক্রিষ্ট্যাল মাইক্রো-ব্যালেন্স" নামে একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র জিনিষের ওজন করা সম্ভব হয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া বা বইয়ের সামান্য একটি অক্ষরের ওজনও এই যন্ত্রটি বলে দিতে পারে।

পেনসিলভ্যানিয়ার পিট্স্বার্গস্থিত ওয়েষ্টিং হাউস রিসার্চ লেবরেটরী কর্তৃক মাত্র এই কারণেই এটি উদ্ভাবিত হয় নি--মহাকাশযানের একটি জরুরী প্রয়োজন মেটানো এবং অতি ক্ষুদ্র অণুর যথাযথ ওজন নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র ৮.৫ পাউণ্ড। এর কতকগুলি অংশ এত সূক্ষ্ম যে, সবগুলি খালি চোখে দেখাই যায় না।

সহজে বহনযোগ্য রেফ্রিজারেটর

রচেষ্টারের বার্গজো ম্যাটিক কর্পোরেশন (নিউ-ইয়র্ক) সহজে বহনযোগ্য একপ্রকার রেফ্রিজারেটর তৈরি করেছেন। এগুলি ওজন ১৫ পাউণ্ড থেকে ৩৯ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের ভিতরে '৩৭ থেকে ১'১ ঘনফুট জায়গা আছে। ১১০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক সেল বা অটো সিগারেট লাইটারের সাহায্যেই এটি চালু করা যায়। এই ধরণের কোন কোন রেফ্রিজারেটর আবার প্রোপেন গ্যাসের সাহায্যেও চালু করা যায়। এর মধ্যেই ঐ গ্যাসের ট্যাঙ্ক থাকে; তাতে ঐ যন্ত্রটি ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত চালু থাকতে পারে। এতে কোন আওয়াজ হয় না।

বেদনা-নাশক ভেষজ

ওষুধের সাহায্যে ব্যথা-বেদনা দূর করবার বিষয়টি বর্তমানে ভেষজ বিজ্ঞানের অন্যতম শাখায় পরিণত হয়েছে। ক্যান্সারের মত দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে যারা কষ্ট পায়, তাদের যন্ত্রণা ও ব্যথা-বেদনা উপশমের জন্যে চিকিৎসকেরা আফিম বা মরফিন ইঞ্জেকশনের বিধান দিতেন। আফিম ও আফিম-ঘটিত ওষুধ দীর্ঘকাল ব্যবহারের একটা বিপদ আছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারের পর সেটা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। রোগমুক্তির পরেও রোগীরা আফিম ব্যবহার ছাড়তে পারে না।

এই বিষয়টি বিবেচনা করেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় ভেষজ সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হন। নিউ ইয়র্কের আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির গবেষণার ফলে পেন্টাজোসিন নামে নতুন একটি ওষুধ উদ্ভাবিত হয়। এটি আফিম বা মরফিনের মতই কাজ করে। ডাঃ এভরেটমে এবং ডাঃ নাথান এ-ডি বেঞ্জোমরফ্যান্স নামে রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকেই এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন। দীর্ঘকাল বেদনা উপশমের ওষুধ প্রয়োগের ফলে রোগীর যাতে ঐ ওষুধ নেশায় দাঁড়িয়ে না যায়, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁরা গবেষণা চালিয়েছিলেন। কেন্টাকির লেকসিংটনস্থিত এডিকশন রিসার্চ সেন্টারে পেন্টাজোসিন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যন্ত্রণাদায়ক রোগ থেকে মুক্তিলাভের পর রোগীরা এই ওষুধ গ্রহণও ছেড়ে দিয়েছে।

বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার জন্যে কৃত্রিম ইনসুলিন আবিষ্কারও এই বিষয়ে গবেষণার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ প্রোটিনের উপাদান যে কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে তৈরি হতে পারে, তা এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

বেদনা-নাশক ভেষজ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় মানসিক ব্যাধিরও কয়েকটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে; যেমন—ম্যাসক্যালিন, সাইলো সায়েবিন প্রভৃতি। ম্যাসক্যালিন পিওট নামে মরুভূমির এক প্রকার ক্যাক্টাস বা মনসা জাতীয় গাছ থেকে এই ওষুধ তৈরি হয়েছে। আর সাইলো সায়েবিন তৈরি হয়েছে এক ধরণের ছত্রাক থেকে। এই সকল ওষুধ গ্রহণের ফলে যে দৃষ্টি-বিভ্রমের সৃষ্টি হয়, তা মানসিক ব্যাধি নিরাময়ে সাহায্য করে থাকে। তবে এই ওষুধের বিধান একমাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই দিতে পারেন।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান

(আলোচনা-সভা)

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কিভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জনসংযোগ সমিতির উদ্যোগে গত ৭ই অগাষ্ট, শনিবার অপরাহ্ণ ৩২ টার সময় ৯২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজের সাহা ইন্‌ষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। ঐসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

পরিষদের সহযোগী সম্পাদক ও জনসংযোগ সমিতির আহবায়ক শ্রীজয়ন্ত বসু সভার প্রারম্ভে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রসারে পরিষদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন— এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান যাদুঘর, খেয়ালখুসী-কেন্দ্র, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যে শিক্ষা-শিবির স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ পরিকল্পনা পরিসদের রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্য পরিষদ

পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে সেগুলির রূপায়ণের চেষ্টা সুরু হবে। অনতিবিলম্বে পরিষদের কার্যসূচী হলো কলিকাতা ও শহরতলীর বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। এই বক্তৃতাগুলিকে মনোজ্ঞ করবার জন্যে যতখানি সম্ভব শ্লাইডের সাহায্য নেওয়া হবে ও বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও আয়োজন করা হবে। বক্তৃতার জন্যে যে বিষয়গুলি নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলি হলো 'অণু-পরমাণুর জগৎ,' 'বিদ্যুতের কথা', 'টেলিভিসন,' 'গ্রহ-নক্ষত্রের কাহিনী' ও 'মহাকাশ অভিযান'। যে বিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা হবে, তার নিকটবর্তী অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও যাতে ঐ বক্তৃতা-সভায় যোগ দেয়, সে জন্যে সেই সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ১৪ই অগাষ্ট, শনিবার বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম বক্তৃতাটির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে শ্রীবসু জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি বক্তৃতার সঙ্গে যাতে বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কিত কয়েকটি মডেল ও সহজ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও দেখানো যায়, সে জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। সায়েন্স ফর চিলড্রেন ও বিড়লা টেক্‌নোলজিক্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম-এর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এই বিষয়ে তাঁরা সাহায্য পাওয়ার আশা রাখেন।

শ্রীবসু আরও বলেন যে, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটিতে একটি নতুন দপ্তর খোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঐ দপ্তরের প্রবন্ধ লেখবার জন্যে তিনি সমবেত সুধীবৃন্দ, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট আবেদন জানান। পরিষদের কার্যালয়ের ঠিকানায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদকের নামে ঐ সব প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে প্রথমে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার কয়েকটি মূলগত ত্রুটির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্যে বিজ্ঞানের যে পাঠ্যসূচী গৃহীত হয়েছে, তার বিষয় নির্বাচনে বহুস্থলে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ও কতকগুলি বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহও বটে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের

পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এমন সব 'কূটকচালে' অঙ্ক আছে, যা কেবল পক্ককেশ বৃদ্ধদের উপযুক্ত বলা যেতে পারে। এর ফলে একান্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলি ছাত্রদের নিকট পরিষ্কার হয় না। সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষকেরা সে বিষয়ে চিন্তা করেন না। এমন কি, প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারেও অনেক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের 'বাড়ী থেকে করে নিয়ে এসো' বলেই ক্ষান্ত হন।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার ফল ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে যা দেখতে পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে অধ্যাপক বসু বলেন যে, বুদ্ধির দিক থেকে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা বিদেশী ইঞ্জিনীয়ারদের সমতুল্য হলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত কম বলে প্রতিপন্ন হয়।

অধ্যাপক বসু মন্তব্য করেন যে, এসব সত্ত্বেও আমাদের নিরাশ হলে চলবে না, আমাদের যথা-সাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার ত্রুটিগুলি দূর করা যায়, আর সেই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলিতে যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তাতে সহযোগিতা করে এই প্রচেষ্টাকে সফল ও সার্থক করে তোলবার জন্যে তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানান। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নিজেদের হাতে যন্ত্রপাতি বানাবার ও নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পায়, সে বিষয়ও তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

অতঃপর বহুমুখী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষিকা শ্রীমতী সতী দেবী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিজ্ঞানের বইতে যে সব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়, তা সকল ক্ষেত্রে এক নয় এবং অনেক বাংলা প্রতিশব্দ ইংরেজী শব্দের প্রকৃত অর্থও বহন করে না। তাছাড়া, বিজ্ঞান পড়ানো হয় বাংলাতে, আর প্রশ্ন হয় ইংরেজীতে। এতেও ছাত্র-ছাত্রীদের খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

শ্রীমতী সতী দেবী বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের যা পড়ানো হয়, তার সঙ্গে তাদের যথাসম্ভব চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি শিবপুরের উদ্ভিদ উদ্যানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। ওখানকার ও এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যদি উদ্ভিদাদি বা যন্ত্রপাতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত দেখাবার ব্যবস্থা করেন, তবে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পথ অনেকখানি সুগম হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন।

পরিষদের বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন যে, এছাড়াও যদি পরিষদের পক্ষে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান সম্পর্কিত চার্ট ও মডেল ধার দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও ঐগুলি দেখবার সুযোগ পাবে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ভাল চার্ট বা মডেলের খুব অভাব বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এরপর সর্বশ্রী শ্যামল কর (রেডিও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট), কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, (রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, রাধানগর, হুগলী।) অমূল্যধন দেব, মহাদেব দত্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রস্তাবিত হয়।

পরিষদের বিজ্ঞান প্রসারের পরিকল্পনা শুধু কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ না রেখে মফস্বলেও একে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। মফস্বলের বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের সক্রিয় সহযোগিতা এজন্যে একান্তভাবে কাম্য। বিদ্যালয় ছাড়াও ক্রমে ক্রমে

পাঠাগার প্রভৃতি জনপ্রতিষ্ঠানেও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল, চার্ট ধার দেবার জন্যে পরিষদকে ঐগুলি তৈরি করতে হবে বা সংগ্রহ করতে হবে এবং এর জন্যে যে অর্থব্যয় হবে, তা পূরণ করবার জন্যে ভাড়া বাবদ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় যাতে বিজ্ঞানের ভাল বই আরো অনেক লেখা হয়, পরিষদকে সে জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কারিগরী বিদ্যার চর্চা আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজন, অথচ এই বিষয়ে বই বাংলা ভাষায় দুর্লভ। এজন্যে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রকাশকদের সঙ্গে সম্ভব হলে এই সব বিষয়ে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

যে সব বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্রের সঙ্গে ধারা বিবরণী ইংরেজী ভাষায় রয়েছে, তাদের অন্ততঃ কতকগুলিকে বাংলা ভাষায় অনূদিত করবার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পাঠকদের অভিমত প্রকাশের জন্যে একটি 'চিঠিপত্রের দপ্তরের' প্রয়োজন। পত্রিকাটিকে আরো আকর্ষণীয় করবার জন্যে প্রশ্নোত্তর, বৈজ্ঞানিক ধাঁধা প্রভৃতির ব্যবস্থাও কাম্য।

পরিশেষে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সম্পাদক শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ আলোচনায় যোগদানের জন্যে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, আলোচিত কতকগুলি বিষয়ে পরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। পরিভাষা প্রণয়নের জন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেছেন, পরিষদের কোন প্রতিনিধিই তাতে আমন্ত্রিত না হওয়ায় পরিভাষা রচনা বা পরিবর্তনের ব্যাপারে পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এসব সত্ত্বেও প্রস্তাবিত বিষয়গুলি যাতে কার্যকরী করা যায়, তার জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

সভার শেষে বিড়লা টেক্‌নোলজিকাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম ও ব্রিটিশ ইনফর্মেশন সার্ভিস-এর সৌজন্যে সংগৃহীত 'জেম্‌স্‌ ওয়াটের চায়ের কেট্‌লী' ও 'টেলিভিসন কিভাবে এই কাজ করে' নামক দুটি বিজ্ঞানবিষয়ক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

গুঞ্জনকারী পাখী (হামিং বার্ড) বাচ্চাগুলিকে খাবার দিচ্ছে।

করে দেখ

স্বয়ংক্রিয় সাইফন

পূর্বে তোমাদের কাছে সাধারণ সাইফনের কথা বলেছি। ধর, টেবিলের উপর এক গ্লাস জল রাখা আছে। গ্লাসটাকে কাৎ না করে সেই জল টেবিলের নীচে রক্ষিত পাত্রে কেমন করে আনা যায়? ইংরেজী U-অক্ষরের মত বাঁকানো একটা কাচের নলে জল ভর্তি করে উল্টে নিয়ে তার একটা বাহু গ্লাসে ডুবিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাইরের দিকে রাখা বাহুটার ভিতর দিয়ে গ্লাসের জল নীচে নেমে আসছে। নলটাতে জল ভর্তি না করেও নলের বাইরের বাহুটাতে মুখ দিয়ে একটু বাতাস টেনে নিলেও জল
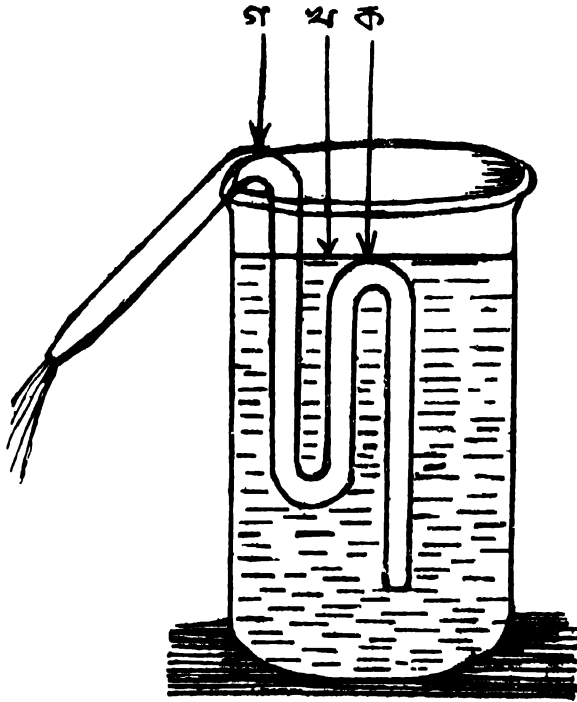
পড়তে থাকবে। কিন্তু এছাড়াও আর এক রকমের সাইফন তৈরি করা যায়, যাতে জল ভর্তি করবার বা মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নেবার প্রয়োজন হয় না। সাইফনটাকে গ্লাসের জলে বসিয়ে দেওয়া মাত্রই গ্লাসের সবটুকু জল আপনা-আপনিই নলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে আসবে।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, একটা লম্বা কাচের নলকে তেমনিভাবে তিন জায়গায় বাঁকিয়ে নাও। সেটাই হবে একটা স্বয়ংক্রিয় সাইফন। নলের সরু মুখটা গ্লাসের বাইরের দিকে রেখে সাইফনের বাকী অংশটা গ্লাসের জলে ডুবিয়ে দিলেই দেখবে—গ্লাসের জল নলের সরু মুখটা দিয়ে ফোয়ারার মত সজোরে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

কেন এমন হয়? সাইফনের ক-চিহ্নিত বাঁকটি জলে ডুবে যাওয়া মাত্রই গ্লাসের জল নলের বাঁক ঘুরে খ-চিহ্নিত জলতলের সমতা রক্ষার জন্যে নলের অপর দুটি বাহুতেই উপস্থিত হবে এবং ইনার্সিয়ার দরুণ আরও খানিকটা উঠে গিয়ে গ-চিহ্নিত বাঁক অতিক্রম করে সাইফন চালু করে দেবে। কাচের নল ছাড়া রাবার, প্লাষ্টিক বা অন্য কোন জিনিষের নল দিয়েও এরূপ সাইফন তৈরি করে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

—গ—

সাবান

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে আমরা সবাই চাই। শরীরকে পরিষ্কার রাখতে হলে প্রধানতঃ যে জিনিষের প্রয়োজন, সেটা হলো সাবান। তাই সভ্য মানুষেব পক্ষে সাবান আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের আগের লোকেরা কিন্তু এহেন প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবহার মোটেই জানতো না। সাবানের ব্যবহার না শিখলেও তাদের শরীর পরিষ্কার রাখতে হতো। এজন্যে তারা শাকসব্জির রস, গাছপালার ছাই, জলপাইয়ের তেল আর সাজিমাটি ব্যবহার করতো। কি দিয়ে অঙ্গসংস্কার করলে পরিশ্রম কম হয় আর শরীরও ভালভাবে পরিষ্কার হয়—সে সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করতে করতেই সাবানের আবিষ্কার সম্ভব হয়। ফরাসীরাই সকলের আগে সাবানের ব্যবহার শিখেছিল।

সবচেয়ে পুরনো বই—যাতে সাবানের কথা জানা যায়, সেটা লেখা হয়েছিল খৃষ্টীয় প্রথম শতকে। বইটা লিখেছিলেন রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি। তিনি দু-রকম সাবানের উল্লেখ করেছেন। একটা হলো কঠিন সাবান, অপরটা কোমল সাবান। চুলের রং উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে এই সাবান ব্যবহৃত হতো। রোমানরা জার্মানদের কাছ থেকে সাবানের ব্যবহার শেখে। সবচেয়ে পুরনো সাবান তৈরি হয়েছিল গাছের ছাই আর ছাগলের চর্বি থেকে। ইউরোপের লোকেরা সাবানের ব্যবহার শেখে উনিশ শতকে। সমাহিত পম্পেই নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে সম্পূর্ণ

একটা সাবানের কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারখানায় পাওয়া সাবানের সঙ্গে আজকালকার সাবানের বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ সাবান বলতে আমরা বুঝি চৌকা বা গোল এক টুক্‌রা পরিষ্কার জিনিষ, যা জলের সঙ্গে ফেনা তৈরি করে। কিন্তু রসায়নবিদ্‌দের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমরা অন্য জিনিষ দেখতে পাব। তাঁদের মতে, সাবান হলো চর্বি ও ক্ষারের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি একটা মিশ্র পদার্থ। Fatty Acid বা চর্বির অ্যাসিড বিভিন্ন পদার্থের (যেমন—সোডিয়াম, পটাশিয়াম) সঙ্গে ক্রিয়া করে তাদের লবণ তৈরি করে। এই সব ধাতব লবণই হলো সাবান। ক্ষারের কাজ হলো জিনিষ পরিষ্কার করা। কিন্তু এই ক্ষার মুক্ত অবস্থায় ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই ক্ষারের বিভিন্ন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ, যেমন—জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা হয়। এই উদ্ভিজ্জ তেলের মধ্যে আছে নারকেল তেল, তূলা-বীজের তেল, জলপাইয়ের তেল প্রভৃতি। কঠিন সাবান তৈরি করবার সময় চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেল কষ্টিক সোডার সঙ্গে ফোটানো হয়। এরপর সেই দ্রবণে কিছু লবণ মেশালে মুক্ত সোডা ও গ্লিসারিন সাবান থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই গ্লিসারিন হলো মিষ্টি একটা পদার্থ, যা চর্বির ভিতর থাকে। কোমল সাবানের জন্যে সোডার বদলে পটাশের দরকার। উদ্ভিজ্জ তেল আর পটাশ ফুটিয়ে এই সাবান তৈরি করা হয়।

সোডা যে তৈলাক্ত পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে' সাবান তৈরি করে সেটা ছোট্ট একটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তৈলাক্ত একটা কড়াতে এক চামচ কাপড়-কাচা সোডা ও একটু জল নিয়ে সেই মিশ্রণকে ভালভাবে ফোটালে দেখা যাবে—কড়ার তলায় সাবান তৈরি হয়ে গেছে।

বড় কারখানায় কিভাবে সাবান তৈরি হয়, এবার সে কথায় আসা যাক। মস্ত বড় এক রকম পাত্রে সাবান তৈরি হয়। কোন কোন পাত্র এতই বড় যে, এক পাত্র সাবান বহন করবার জন্যে দশ-বারোটা লরীর দরকার হয়। পাত্রের চারধারে ধাতব নলের ব্যবস্থা থাকে। এর ভিতর দিয়ে বাষ্প চালিয়ে পাত্রটাকে উত্তপ্ত করা হয়। ভিন্ন প্রবেশ-পথ দিয়ে চর্বি ও ক্ষার পাত্রের ভিতরে আসে। প্রথমে চর্বি পাত্রে প্রবেশ করে ও দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ হলো চর্বির অ্যাসিড (Fatty Acid), অপরটা গ্লিসারিন। এই চর্বির অ্যাসিড ক্ষারের সঙ্গে ক্রিয়া করে' সাবান তৈরি করে। এই দ্রবণে লবণ যোগ করলে গ্লিসারিন থিতিয়ে তলায় চলে যায়। সাধারণ কাপড়-কাচা সাবানের বেলায় এই গ্লিসারিনকে বাইরে বের করে নিয়ে অন্য কাজে লাগানো হয়। এরপর সাবান পরিস্রুত করবার পালা। অপরিস্রুত সাবানকে ভাল করে ফুটিয়ে পরিস্রুত করা হয়। এই ফোটাবার কাজ দু সপ্তাহ ধরে চলে। এবার পরিস্রুত গন্ধহীন সাবানকে বাইরে আনা হয়। কাপড়-কাচা সাবানের ক্ষেত্রে

এর সঙ্গে রেজিন (রজন) মেশানো হয়—তাই এর রং হলদে। গায়ে মাখবার সাবানে রং ও সুগন্ধি মেশানো থাকে।

নানারকম সাবান আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিছু সাবান আছে, যেগুলি স্বচ্ছ। সাধারণ সাবানকে অ্যালকোহলে গুলে পরিস্রুত করলে একটা স্বচ্ছ তলানী পাওয়া যায়। এই অংশকে বাইরে এনে শক্ত করে নিলে স্বচ্ছ সাবান তৈরি হয়। গ্লিসারিন সাবানে সাবান ও গ্লিসারিন সমানুপাতে থাকে। নাবিকদের জন্যে একরকম সাবান আছে, যা সমুদ্রের জলের সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। এর নাম মেরিন সোপ। কিছু সাবান জলে ভাসে। গরম অবস্থায় সাবানের ভিতর বাতাস ঢুকিয়ে তাকে জলের চেয়ে হাল্‌কা করা হয়।

সাবানকে যে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা চলতে পারে, এটা আবিষ্কার করেন হামবুর্গের উনা (Unna)। সাবানের সঙ্গে বিভিন্ন জিনিষ, যেমন—কার্বলিক অ্যাসিড, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, আয়োডিন, সোহাগা, কর্পূর, গন্ধক প্রভৃতি মিশিয়ে একে ত্বকের পক্ষে উপকারী করে তোলা হয়। পশু-পাখীর পক্ষে আর্সেনিক সাবান উপকারী। জোলাপ হিসেবেও কিছু সাবান ব্যবহৃত হয়।

সাবান দু-ভাবে আমাদের শরীর বা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করে। প্রথমতঃ ঘামের সঙ্গে লোমকূপ দিয়ে শরীরের কিছু তেল বের হয়। এই তেলে ধূলা-ময়লা জমে শরীর বা পোষাককে ময়লা করে ফেলে। আমরা যখন সাবান ব্যবহার করি, তখন সাবানের ভিতরের তেল শরীরের এই তেলের সঙ্গে মিশে সাবানের ক্রিয়ায় বাইরে চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ ধূলা ও কয়লার কণা সাবান-জলের সঙ্গে আট্‌কে যায়। জলে ধুলে এই সব ময়লা চলে গিয়ে শরীর বা পো াককে পরিষ্কার করে তোলে।

আজকের দিনে সাবান একটা সহজলভ্য বস্তু। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই সাবান প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। এর কারণ এই যে, সাবানের জন্য বরাদ্দ চর্বি তখন বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির কাজে লাগতো। সে সময়ে একখণ্ড সাবান কিনতে কতটা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হতো, তা ভাবলে আজ অবাক হতে হয়।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি

দেশ জুড়ে পাদ্রীরা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন

ব্যাপারটা কি? ইটালীর এক ডাক্তার নাকি যন্ত্রের মধ্যে মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে বাড়িয়ে তুলেছেন! ঘটনাটি কয়েক বছর আগেকার। পাদ্রীদের অসন্তোষের কারণ বোঝাও শক্ত নয়—ঈশ্বরের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আনন্দের সঙ্গে জানালেন, জীবন সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন তাঁদেরই একজন। কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির প্রশ্নটি খুব পুরনো নয়, যদিও জীবন সৃষ্টির প্রশ্নটি খুবই পুরনো, বলতে গেলে মানুষের আদিমতম প্রশ্নই সেটা—কোথা থেকে এলাম? অবশ্য মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে জীবন দান বা জীবন সৃষ্টির চেষ্টা বহুকাল ধরে বহুবার হয়েছে। সে পথে সফলতার লিখিত বিবরণও ছড়িয়ে আছে অনেক। জীবনদানের পথে বিজ্ঞানীরাও সফলতা লাভ করেছেন। তাঁরা ৫০০০০০০০০ বছরের সুপ্ত জীবাণুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। বরফের নীচে পড়ে থাকা দশ লক্ষ বছরের পুরনো চিংড়িকে বাঁচিয়ে তোলা গেছে। সেগুলি আবার প্রজনন-ক্ষমতার পরিচয়ও দিয়েছে। এসব সফলতা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাঁদের উদ্যম, তাঁদের শক্তি, সবই সফল হবে, যেদিন তাঁরা নিজের হাতে আনকোরা একটি নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারবেন।

জীবন সৃষ্টির কথা যখন জীবতাত্ত্বিকেরা ভাবতে সুরু করেছেন, তখন প্রথম বাধা এসেছিল প্রচলিত কতকগুলি ধারণা থেকে। যেমন, একটি প্রশ্ন—জীবন কি আদৌ সৃষ্টি হয়েছিল, না আবহমানকাল থেকেই জীবন আছে? কেউ কেউ বললেন, জীবন অন্য গ্রহ থেকে ভেসে এসেছে। অতএব পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাছাড়া অঙ্গারঘটিত জৈব পদার্থ, যা আমরা উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে পাই—তা কি আপনা-আপনিই তৈরি হতে পারে? জৈব পদার্থ সৃষ্টি হবার পিছনে কাজ করে জীবনীশক্তি। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই জীবনীশক্তিকে দার্শনিকেরা নিজেদের মতবাদ সমর্থনের জন্যে হাতের পাঁচ হিসেবে বহুবার বহুভাবে ব্যবহার করেছেন। এঁদের সবার বিরুদ্ধে প্রথম প্রচণ্ড ধাক্কা এলো ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, যখন ফ্রিডরিখ হ্বোলার সম্পূর্ণ অজৈব পদার্থ থেকে কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া তৈরি করলেন—যা কেবল প্রাণীদেহ থেকেই পাওয়া যায়। সেই থেকে একের পর এক কৃত্রিম উপায়ে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হতে লাগলো, জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হলো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে।

জীবন-রহস্যের নানা অলিগলির সঙ্গে পরিচয় হবার পর প্রাণতাত্ত্বিকেরা দেখলেন, প্রাণের আদিমতম নিদর্শন হলো এককোষী জীব, আর উন্নত জীবদেহও গঠিত হয়েছে কোটি কোটি কোষের সমাবেশে। এই কোষগুলি গঠিত হয়েছে প্রধানতঃ অঙ্গার-বিশিষ্ট যৌগিক অণুর সাহায্যে। তাদের বলা হলো প্রোটিন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, প্রোটিনের মধ্যে রয়েছে অপেক্ষাকৃত সরল এক ধরণের অণু, যার নাম অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রোটিন হতে পারে অনেক রকমের। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল দেখায় হিমোগ্লোবিনের জন্যে। এটাও একধরণের প্রোটিন, আর অন্যান্য প্রোটিনের মধ্যে এর আকার খুব বড়—এক সেন্টিমিটারের ১০০০৪০০০-এর সমান। আজ জৈব রসায়নবিদেরা নানা প্রকার প্রোটিন তৈরি থেকে যত রকম অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন, তার সবই পরীক্ষাগারে তৈরি করেছেন। দেখা গেছে, সব রকম প্রোটিন তৈরি হবার মূলে আছে বাইশটির মত অ্যামিনো অ্যাসিড। পরীক্ষাগারে নানারকমের প্রোটিনও তৈরি হয়েছে, তবে সেগুলি অপেক্ষাকৃত সরল; যেমন—দশ বছর আগে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Du Vigneaud এবং তাঁর সহকর্মীরা কৃত্রিম উপায়ে অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসোপ্রেসিন নামে দুটি প্রোটিন তৈরি করেছেন। এই প্রোটিন দুটি তৈরি হয়েছে ১২টির মত অ্যামিনো অ্যাসিডের সমাবেশে। জৈব রসায়ন দিন দিন যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে বোঝা যায়—অদূর ভবিষ্যতে ইচ্ছামত অতিকায় প্রোটিন অণু তৈরিও সম্ভব হবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার—কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, একদিন সে কথাও ভাবতে হয়েছে। এই প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর জানা থাকলে কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির পথে আরও তাড়াতাড়ি এগোনো যেত। এই ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হ্যারল্ড উরে এবং তাঁর ছাত্র স্ট্যানলি মিলার। কয়েক বছর আগে উরে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আদিম পৃথিবীর আবহাওয়া গঠিত হয়েছিল মূলতঃ মিথেন, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের সমাবেশে। পৃথিবীর বয়স তখন খুব কম, আর সে সময় অনবরত চলতো প্রচণ্ড বজ্রপাত। হয়তো বা বজ্রের বিদ্যুৎ-শক্তি মিথেন, অ্যামোনিয়া আর হাইড্রোজেনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছিল জটিল জৈব পদার্থের। হয়তো বা সৃষ্টি হয়েছিল অ্যামিনো অ্যাসিডের, তারপর তাথেকে সৃষ্টি হলো প্রোটিনের। এই প্রোটিনই নানা বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিল একটি জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম। সেই থেকে সুরু হলো জীবনের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা। অধ্যাপক উরের ছাত্র তেইশ বছরের যুবক স্ট্যানলি মিলার ভাবলেন, মাষ্টার মশাইয়ের 'আইডিয়া'-টিকে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়! মিলার বিশেষ ধরণের কাচের নলের মধ্যে অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেন ভর্তি করে তার মধ্য

দিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষরণের ব্যবস্থা করেন। এই বৈদ্যুতিক ক্ষরণ বজ্রের ভূমিকা গ্রহণ করলো। আট দিন পরে পরীক্ষা করা হলো—কি নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে? বিপুল বিস্ময়ে মিলার দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে নানা অ্যামিনো অ্যাসিড আর জৈব অ্যাসিডের একটি পূর্ণ শ্রেণী। তাহলে কি উরে যেমনটি ভেবেছিলেন, তেমনি ভাবেই জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল? হতে পারে! আদিম বায়ুমণ্ডলে যে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া আর মিথেন ছিল, তার তো কোন প্রমাণ নেই! অবশ্য শনি এবং বৃহস্পতির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সেগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই অনেকে মনে করেন.—আদিম পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যখন কঠিনতর অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার বায়ুমণ্ডলে ঐ তিনটি গ্যাসের বাহুল্য থাকা হয়তো অসম্ভব ছিল না।

কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির পথে এক নতুন দিশারী হলেন অধ্যাপক স্ট্যানলি। তিনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভাইরাসের গঠন-রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন। ভাইরাস বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের কারণ। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এক এক রকমের জীবাণু। স্ট্যানলি তামাক পাতার এক ধরণের ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন, ঐ ভাইরাস (বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন টোবাকো মোজেইক ভাইরাস) আসলে এক ধরণের প্রোটিনের কেলাসিত অণু। তার আণবিক ওজন ৪৫০০০০০০, লম্বায় সেটা এক সেন্টিমিটারের $\frac{৩}{১০০০০০০০}$ ভাগ, আর তার ব্যাস হলো এক সেন্টিমিটারের $\frac{১৭}{১০০০০০০০০০০}$ ভাগ। ঐ ভাইরাসটির আর এক বিচিত্র দিক উন্মোচিত হলো, যখন দেখা গেল সেটা আগাগোড়া ফাঁপা। ফাঁপা অংশটির মধ্যে রিবোনিউক্লিক নামে এক প্রকার অ্যাসিডের অণুগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। সেটা নাকি এই ভাইরাসের দশগুণ লম্বা। আরও দেখা গেল, ঐ রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের খাঁজে খাঁজে আট্‌কে আছে ২২০০টি প্রেটিনের সাব-ইউনিট। প্রত্যেকটি সাব ইউনিট তৈরি হয়েছে ১৫৮টি করে অ্যামিনো অ্যাসিডের সমাবেশে। জৈব রাসায়নিকদের মতে, এটা নাকি একটা অতি সরল গঠনের ভাইরাস। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, অধ্যাপক ফ্রেঙ্কেল-কনরাট প্রোটিনের সাব-ইউনিট অংশটি মূল ভাইরাস থেকে আলাদা করে ফেলতে সক্ষম হলেন। তিনি সেটা তামাক গাছের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিলেন। কোন ফল হলো না। কিন্তু তাদের রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এনে দেখা গেল, তারা আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে ঐ অ্যাসিডের সঙ্গে। পরিশেষে সৃষ্টি হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসের। তাহলে কি আমরা কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম? কিন্তু প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিড—এই দুটার কোনটাই তো কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয় নি। তারপর একটা বিরাট প্রশ্ন—ভাইরাস সজীব, না নির্জীব। কেউ বললেন নির্জীব, কারণ তারা পরজীবী, তারা নির্জীব রাসায়নিক

বস্তুর মত কেলাসিত হয়। কেউ বললেন—পরজীবিতা কি নির্জীবতার লক্ষণ? মানুষের পেটের কৃমিও তো পরজীবী। তাছাড়া ভাইরাসের মধ্যে বংশগত গুণাগুণ বর্তাতে দেখা যায়, যেটা সজীবতার একটি বিশেষ লক্ষণ। আসলে কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির পথে আমরা ততদূরই এগিয়েছি, যতদূর 'নির্জীব বা সজীব,' প্রশ্নটি আসে না। যেদিন এই প্রশ্নটার চূড়ান্ত উত্তর পাওয়া যাবে, সেদিন জৈব রাসায়নিকদের কাছে খুলে যাবে আর এক নতুন জগতের দরজা।

অশেষকুমার দাস

সাগরের রহস্য

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, সীমাহীন জলরাশি গিয়ে মিশেছে দিগন্তরে, আর কাছের জলরাশি নিরন্তর পাড়ে আছড়ে পড়ছে—সৃষ্টি করছে ফেনার সমুদ্র, উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে জলবিন্দুর মেঘ। এটুকুই শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য—আমরা কখনো ভেবে দেখি না, ঐ গভীরের অন্তরে রয়েছে কত রহস্য! সেখানে কত অদ্ভুত জীব, কত অদ্ভুত গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, খাদ, গুহা—সে সব খোঁজ-খবর, পঠন-পাঠন করেন বিজ্ঞানীরা—সমুদ্র-বিজ্ঞানী।

সাগর-পাড় থেকেই আরম্ভ হয়েছে জল। কিন্তু এই জলের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। প্রথমেই পাড়ের যে অংশ রয়েছে জলের নীচে, তা বহুদূর পর্যন্ত নিতান্তই অগভীর। পাড় থেকেই তা ঢালু হচ্ছে বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত ক্ষীণ ঢালু হয়ে চলেছে বহুদূর—কখনো হয়তো মাইলখানেক, কখনো বা পাঁচ-দশ মাইল—এমন কি, পৃথিবীতে অনেক জায়গায়ই আছে প্রায় শ'খানেক মাইলেরও উপর। তার পরই হচ্ছে আসল সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের গভীর খাদ। এপর্যন্ত দেশেরই অংশ বিস্তারিত হয়েছে সমুদ্রে। একে বলা হয় মহাদেশিক তাক (Continental shelf)। এই মহাদেশিক তাক যেখানে শেষ হলো, সেখানেই সমুদ্র হঠাৎ নেবে গিয়ে শেষ হলো—তার অতল গভীরের এই স্থানকে বলা হয় মহাদেশিক ঢাল (Continental slope)। তারপর চললো সাগর-তল মাইলের পর মাইল, শত শত, হাজার হাজার মাইল, যতক্ষণ না সে পৌঁছালো আবার আর এক মহাদেশে অর্থাৎ আর এক মহাদেশিক ঢাল ও তাকে।

এই ঢালটি সর্বত্র একই রকম সোজা ও মসৃণ নয়। কোথাও হয়তো সে কিছুদূর নেমে গেছে সহজভাবে—তারপর আবার কিছুদূর হয়তো সমান ঢালাই,

আবার কিছুদুর বাদে আরম্ভ হলো ঢাল। সমুদ্রের নীচে সব জায়গাই মাটি নয়। সেখানে আছে বিস্তর পাথর—ঢালাই পথের মাইলের পর মাইল, বড় বড় পাথরের চাং, তাতে আছে ফাঁটল, গুহা, গহ্বর, খিলান। আর সেই সব গুহা-গহ্বরে বাস করে অসংখ্য ছোট ও বড় মাছ, ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, কাঁকড়া আর নানা রকমের অদ্ভুত জীব। সমুদ্রের নীচে গাছপালাও রয়েছে নানারকম। সে সবই জলজ গাছ, আকারে ছোট ছোট—সবই গুল্মজাতীয়। লতানে গাছও আছে অনেক, কিন্তু সাধারণভাবে গাছ বলতে আমরা যা বুঝি, সে রকম বৃক্ষ বা মহীরুহ সেখানে নেই।

সমুদ্রের রং সাধারণতঃ হয় নীল, কিন্তু নানা জায়গায় দেখা যায় নানা রকম। সেটা হয় নানা কারণে। কখনো কখনো নাবিকেরা সম্মুখে দেখতে পেয়েছে—সমুদ্রটা লাল, লালে লালময়। প্রথম প্রথম নাবিকেরা অবাক হতো, কিন্তু এখন আমরা জানি সেটা হয় এক রকম সামুদ্রিক জীবের আবির্ভাবে। সে সব জীব অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত, যাদের গায়ের রং গাঢ় লাল। মাইলের পর মাইল জুড়ে কোটি কোটি সংখ্যায় তারা ভাসতে থাকে সমুদ্রের উপরিভাগে, যার জন্যে সমুদ্রের উপরিভাগ এবং সমুদ্রের কোন একটা বিশেষ অংশ ঐরকম লাল দেখায়।

সমুদ্রের পাড়ের কাছের রং প্রায়ই হয় ঘোলা খয়েরী। সেটা হবার কারণ হচ্ছে, পাড়ের উপর সমুদ্রের ঢেউ উঠে কেবলই আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে পাড়ের ধূলা-বালি, মাটি নিয়ে। তাছাড়া নদীর মুখে উপর থেকে বহু দূরদেশের ধূলা-বালি, মাটি তার স্রোতে বয়ে নিয়ে এনে তো ফেলছেই। তাই মহাদেশের কাছ ঘেঁষে যে জায়গা, নিতান্ত পাহাড়ী না হলে তা ঘোলাটে ও বিবর্ণ খানিকটা হবেই। তারপর একটু দূরে গিয়ে যখন সে ধূলা-বালিটা জলের নীচে থিতিয়ে পড়ে, তখন হয় সবুজ। তারপর আরও ভিতরে গভীর সমুদ্র গিয়ে হয় নীল। এও শুধু দিনের বেলায়, সাধারণ পরিষ্কার দিনে নিতান্তই তার উপর-মুখে। তার ভিতরের রংটা অগভীর সমুদ্রে সবুজ, গভীর সমুদ্রে উপর দিকটা নীল ও নীচে ঘন নীল—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Indigo। আরও নীচে অতলস্পর্শী অন্ধকার।

মিঃ বিবে (Beebe) নামক এক সমুদ্র-বিজ্ঞানী ব্যাথিস্ফিয়ার (Bathysphere) বলে সমুদ্রে-নামা এক যন্ত্রে সমুদ্রের নীচে বহু ঘোরাফেরা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন, সমুদ্রের নীচে সূর্যের আলো প্রবেশ করে মাত্র আড়াই শ' ফ্যাদম (ছয় ফুটে এক ফ্যাদম) পর্যন্ত। এই হিসেব হচ্ছে, মানুষের চোখ যা ধরতে পারে তাই। সমুদ্রে নামানো ক্যামেরা সূর্যের আলো ধরেছে এই দূরত্বেরও ডবল দূরত্বে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ-শ' ফ্যাদম নীচে।

সমুদ্রের মাছ ও অন্যান্য জীব সারা সমুদ্রে উপরে-নীচে ঘুরে বেড়ায় না। তাদের এক একটি বিশেষ বিশেষ স্তর আছে। কেউ কেউ থাকে একেবারেই উপরে, কেউ কেউ থাকে সমুদ্রের একেবারে তলায়, আবার কেউ থাকে মাঝখানে। এই মাঝের জায়গাটিকে আবার বিশেষ মাছ বা জীবের বসবাসের জন্যে বৈজ্ঞানিক মতে দু'ভাগ করা হয়েছে—উপর তলা ও নীচ তলা; অর্থাৎ সারা সমুদ্রকে চারটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। এর এক এক ধাপে এক এক বিশেষ ধরণের মাছ ও জীবের বাস।

সমুদ্রের একেবারে তলায়, অর্থাৎ গভীর অন্ধকার সমুদ্রে রয়েছে সব অদ্ভুত মাছ, যাদের গা থেকে বিচ্ছুরিত হয় আলো। কারু মাথায়, কারু গায়ে সারি সারি যেন আলোর মালা। ঐ অন্ধকারে এই আলোর সাহায্য না হলে ওরা বাঁচতেই পারতো না, খাবার খুঁজতেও পারতো না, নিজেদের জাত-ভাইদেরও চিনতে পারতো না। এরা দেখতে হয় অনেকটা রাতের জাহাজের মত, যখন দূর থেকে তার গবাক্ষ-পথে আলোটুকুই শুধু দেখতে পাওয়া যায় অথচ দেহটি থাকে অন্ধকার। মিঃ বিবে গভীর সমুদ্রে হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। তাঁর ব্যাথিস্ফিয়ারের তীব্র সন্ধানী-আলো (Search light) ফেলে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওরা মাছ।

মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের সম্বন্ধ অনাদি কালের। মানুষ আদিমকাল থেকেই মাছ ধরতে সমুদ্রে ঢুকেছে। অন্ততঃ পাড়ের কাছাকাছি তো বটেই। পরবর্তীকালে যখন একটু এগিয়েছে সভ্যতার দিকে, তখন সে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, দিগ্বিজয়ে—এমন কি, দস্যুতা করতেও। তিমি শিকার করতে গিয়েছে মেরু-সমুদ্রে, মুক্তা তুলতে ডুব দিয়েছে অতলে। কিন্তু এরা সবাই গিয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে—নিতান্তই পেটের দায়ে, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে কেউই যায় নি—যদিও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে এদের সবারই দান আছে অনেক। সমুদ্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, অজানাকে জানবার ইচ্ছা একেবারেই আধুনিক, দু-এক শতাব্দীর ব্যাপার মাত্র।

ডুবুরীরা মুক্তা তুলতে সমুদ্রের নীচে যাচ্ছে বহুদিন থেকেই, কিন্তু নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে প্রথম সমুদ্রে ডুবেছেন এডমণ্ড হ্যালী নামে এক ভদ্রলোক, তাঁর নিজের তৈরি জলে-ডোবা যন্ত্র ডুবুরী ঘণ্টাতে (Diving Bell) করে ১৬৯০ সালে। তিনি সমুদ্রের নীচে ষাট ফুট পর্যন্ত যেতে সক্ষম হন। তার পূর্বে অতদূর কোন ডুবুরীও ডোবে নি। জন লেথব্রীজ নামে এক ভদ্রলোক ডুবুরীর পোষাক পরে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ঠিক ঐ দূরত্ব অর্থাৎ ষাট ফুট পর্যন্ত জলের নীচে পৌঁচেছিলেন। খালি হাত-পায় অর্থাৎ ডুবুরীর পোষাক না পরে মানুষ আজ পর্যন্ত সাগর-তলে যেতে সক্ষম হয়েছে দু'শ ফুট। খালি হাত-পায়ে, কিন্তু পিঠে অক্সিজেনের ব্যাগ নিয়ে নেমেছে ৩০৭ ফুট। ১৯৩৪ সালে ডাঃ বিবে ও মিঃ বার্টন তাঁদের ব্যাথিস্ফিয়ারে করে গিয়েছিলেন

৪৫০০ ফুট। হাউওট ও উইল্‌ম্‌ নামে দুই ভদ্রলোক আরও এক উন্নত ধরণের ব্যাথিস্কিয়ারে করে ১৯৫৪ সালে সমুদ্রের নীচে ১৩২৮৭ ফুট পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছেন।

এঁরা সবাই সমুদ্রের নীচের বহু সংবাদ সংযোজনা করেছেন মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে। তবুও বিরাট সমুদ্রের তুলনায় সে জ্ঞান আজও অতি সামান্য।

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

পঙ্গপালের কথা

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে বর্তমান যুগকে কীট-পতঙ্গের যুগ নামে আখ্যা দেওয়া উচিত। কারণ হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীর কীট-পতঙ্গের পরিসংখ্যান গ্রহণ করলে দেখা যাবে, তাদের মোট সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর চেয়ে অনেক অনেক বেশী। মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে প্রায় সব সময়েই নানা রকম কীট-পতঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। মানুষের শত্রু হিসেবে নাম করা চলতে পারে, মশা-মাছি আর পঙ্গপালের। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতিই বোধ হয় করে পঙ্গপাল। কৃষিকার্যের প্রায় গোড়া থেকেই পঙ্গপাল শস্যের ক্ষতি করে আসছে। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২৪০০ বছর আগের একটি মিশরীয় পিরামিডে পঙ্গপালের কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক ও চীনা সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। সবচেয়ে ভাল বিবরণ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ বাইবেলে। তাতে মেমারে পঙ্গপালের আক্রমণের উল্লেখ আছে। এতে যে পঙ্গপালের বিবরণ আছে তার নাম 'মরুভূমির পঙ্গপাল' (Schistocerca gregaria)। আজও এরাই সবচেয়ে সাংঘাতিক পঙ্গপাল।

পঙ্গপাল ঝিঁঝিপোকা আর কয়ার ফড়িঙের অতি নিকট আত্মীয়। প্রকৃতপক্ষে পঙ্গপাল এক ধরণের কয়ার ফড়িং, কারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় পঙ্গপাল নামে আলাদা কোন পতঙ্গ নেই। যদিও পঙ্গপাল শস্যের ভয়ানক ক্ষতি করে, তথাপি কয়ার ফড়িংকেও বাদ দেওয়া চলে না, কারণ এরাও কম ক্ষতিকর নয়। পঙ্গপালের সঙ্গে ফড়িঙের তফাৎ হলো, পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু কয়ার ফড়িং তা করে না। আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় কয়ার ফড়িঙের উৎপাত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। প্রকৃতপক্ষে এই পঙ্গপাল আর কয়ার ফড়িং প্রায় সব কয়টি মহাদেশেই দেখা যায়। যদিও ইউরোপে এদের উৎপাত কম, তবুও বিশেষ করে স্পেন, ইটালী আর বলকান রাজ্যে এরা যথেষ্ট ক্ষতি করে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে আফ্রিকা আর মধ্যেপ্রাচ্য। আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা সাংঘাতিক ধরণের লাল পঙ্গপালের জন্মস্থান। এদের বৈজ্ঞানিক নাম

Nomadacris septemfasciata। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যায় বাদামী পঙ্গপাল। এদের নাম Locusta pardalina। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়ও অবশ্য সামান্য পঙ্গপাল দেখা যায়, কিন্তু এখানে কয়ার ফড়িং সবচেয়ে সাংঘাতিক। একমাত্র ১৯৫২ সালে আমেরিকার উটা প্রদেশে লক্ষ লক্ষ ডলারের শস্য পঙ্গপাল নষ্ট করে ফেলেছিল। প্রাচ্য দেশে বিশেষতঃ চীন, ফিলিপাইন, বোর্ণিও প্রভৃতি জায়গায় এক ধরণের পঙ্গপাল দেখা যায়, তাদের নাম Locusta migratoria manilensis। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির পঙ্গপাল।

পঙ্গপাল ছাড়া অন্যান্য কীট-পতঙ্গও শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। তবুও পঙ্গপালের ক্ষতির তুলনা নেই। যদিও এসম্বন্ধে সঠিক পরিসংখ্যান তৈরি করা সম্ভব নয়, তবুও লণ্ডনের Anti-Locust Research Centre ১৯২৫-৩৪—এই কয়েক বছরের হিসেব করে দেখেছেন, পঙ্গপাল পৃথিবীর প্রায় দেড়-শ' কোটি পাউণ্ড মূল্যের শস্য খেয়ে ফেলেছে। বর্তমানে এই সংখ্যা সম্ভবতঃ দিগুণ হবে। ১৯৫৪-৫৫ সালে আফ্রিকার মরোক্কোতেই পঙ্গপাল সাড়ে চার কোটি পাউণ্ডের শস্য নষ্ট করেছে। প্রত্যেক দেশেই পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ ১৯২৯ সালে গ্রেট বৃটেনেই এই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম একটি সংস্থা গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, পঙ্গপাল কর্তৃক আক্রান্ত সব দেশের বিবরণ গ্রহণ করে এর নিয়ন্ত্রণের জন্যে পরামর্শ ও সাহায্য দান করা।

পঙ্গপাল আর কয়ার ফড়িঙের জীবনযাত্রা একই রকম। মাদী পঙ্গপাল মাটির মধ্যে গর্ত করে এক সঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ঠাণ্ডা দেশে ঐ ডিম সারা শীতকাল ঐ রকম অবস্থায় থাকবার পর বসন্তকালে বাচ্চা ফুটে বের হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা বের হয়। অন্যান্য কীটের মত এদের কোন শূককীট হয় না। একেবারে পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপালের মতই দেখতে হয়। একমাত্র ডানা থাকে না বাচ্চাদের, আর আকারেও ছোট হয়। কয়ার ফড়িঙের সঙ্গে পঙ্গপালের তফাৎ হচ্ছে, কয়ার ফড়িঙের বাচ্চা জন্মের পর কিছুদিন পর্যন্ত বেশী দূর চলতে পারে না আর খাদ্যস্পৃহাও কম থাকে। অন্যদিকে পঙ্গপালের বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গেই দলবেঁধে লাফাতে থাকে। এরা অত্যন্ত ক্ষতিকারক শস্যের পক্ষে। দলবদ্ধ অবস্থায় এরা কয়েক বর্গমাইল জায়গা জুড়ে থাকতে পারে আর সর্বদাই এগিয়ে চলে। এই সময় ওরা কোন প্রাকৃতিক বাধা, যেমন—কোন গর্ত বা নদী-নালা মানে না। এই ভাবেই এদের ডানা গজিয়ে যায়। এই সময় এরা দল বেঁধে উড়ে চলে যায় বহু দূরে। পঙ্গপালের এই ঝাঁক অনেক সময় প্রায় ২০০ বর্গমাইল পর্যন্ত হতে পারে। এই ঝাঁকে থাকে লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল। এদের ওজন হবে শত শত টন। এই ঝাঁক প্রায় দু-হাজার মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে, অবশ্য মাঝ পথে থেমে থেমে বহু শস্য বিনষ্ট করবার পর। এই ভাবে উপর দিয়ে

উড়ে যাবার সময় এরা সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখলেই সেখানে নেমে পড়ে আর নিমেষে সমস্ত শস্যের ধ্বংসসাধন করে দূরান্তরে উড়ে যায়। একমাত্র ইট, পাথর ছাড়া পঙ্গপালের হাত থেকে অন্য কোন বস্তু নিষ্কৃতি পায় না। এর ফলে আক্রান্ত দেশে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। এই কারণে বিভিন্ন দেশে পঙ্গপাল নিবারণের জন্যে নানাবিধ কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে।

পঙ্গপাল নিবারণ এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণায় গ্রেট বৃটেনের দান যে সবচেয়ে বেশী, এতে কোন দ্বিমত নেই। এই বিষয়ে গবেষণায় Anti-Locust Research Institute-এর বি. পি. উভারভ্ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই বিষয়ে ১৯২১ সালে তিনি Phase Theory নামে এক নতুন মতবাদ প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পঙ্গপাল বিভিন্ন রকম ব্যবহার করে। যেমন—দলছাড়া অবস্থায় এরা শস্যের ক্ষতিকারক নয়, তখন এদের খাদ্যের প্রতি মোটেই মনোযোগী মনে হয় না; অথচ দলবদ্ধ হওয়া মাত্রই এদের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সমগ্র বিশ্বেই পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বিষয়ে অবশ্য কেবল মাত্র অর্থ ব্যয় করলেই চলে না, গভীর গবেষণারও প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কতকগুলি বিষয় জানা দরকার; যেমন—সাধারণভাবে এক একটি ঝাঁকে কত পঙ্গপাল থাকে বা থাকতে পারে? এরা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কতখানি শস্যের ক্ষতি করতে পারে? পঙ্গপালের জন্মস্থান সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পঙ্গপাল কখনও এক জায়গায় অপেক্ষা করে না। সর্বদাই এরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে। উড়োজাহাজে করে পঙ্গপালের পিছনে পিছনে গিয়ে দেখা গেছে, এরা যন্ত্রের মতই কাজ করে। কোন শস্যক্ষেত্রে নামতে হলে এরা একসঙ্গেই নামে আবার সে জায়গা ত্যাগ করবার সময়ও এক সঙ্গেই উড়ে যায়।

এখন পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও দুচার কথা বলা অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন প্রতিটি আক্রান্ত দেশের। বর্তমানে এই বিষয়ে বহু নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা—পঙ্গপালের জন্মস্থানে তাদের ডিম অথবা বাচ্চা নষ্ট করে ফেলা। এর জন্যে কীটনাশক তেলই প্রশস্ত। বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ব্যবহারে এতে খুব সুফল পাওয়া যায়। অবশ্য ছোট ছোট বাচ্চা পঙ্গপালই এতে মারা যেতে পারে। প্রতি একর জমিতে ৩ পাউণ্ড ঐ জিনিষ ব্যবহারে বেশ ভাল ফলই পাওয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপাল মারবার কাজে অবশ্য ঐ কীটনাশক পাউডার বিশেষ সুফল দেয় না। এতে খরচও বেশী। পঙ্গপাল মারবার কাজে পরিদর্শক দল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদের কাজ হবে পঙ্গপালের জন্মস্থান খোঁজ করা। এদের এই বিষয়ে বিশেষভাবে দক্ষ করে তোলা দরকার। আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে নানারকম সাধারণ উপায়েও পঙ্গপাল মারতে

অভ্যস্ত সেখানকার আদিম অধিবাসীরা—বিশেষতঃ আগুন ও কেরোসিন তেলের সাহায্যে।

পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উড়োজাহাজের ব্যবহার। এতে প্রয়োজন খুব হাল্কা ছোট উড়োজাহাজের। অবশ্য এর ব্যবহারে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। তাহলেও এতে সুফল খুব বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায়। পঙ্গপাল অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়োজাহাজ থেকে কীটনাশক দ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য আকাশে উড়ন্ত পঙ্গপালের উপরেও উড়োজাহাজের সাহায্যে কীটনাশক তেল বা পাউডার ছড়ানো হয়। এই কাজে বিশেষভাবে শিক্ষিত পঙ্গপাল-নিয়ন্ত্রণকারী দলের প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই কাজের সময় উড়োজাহাজের সঙ্গে মাটিতে অবস্থিত দলের সঙ্গতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যদিও নানা উপায়ে মানুষের এই মারাত্মক শত্রুর ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তথাপি আজও এরা অত্যন্ত কঠিন সমস্যার কারণ হয়ে আছে। এই বিষয়ে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ

ভারত মহাসাগরে মৎস্যের সন্ধান

ভারত মহাসাগরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মিলিত উদ্যোগে মৎস্য প্রভৃতি খাদ্যের সন্ধান করা হচ্ছে। অ্যানটম ব্রন নামে একটি গবেষণামূলক মার্কিন জাহাজের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই মহাসাগরের ডেলগোয়া উপসাগরের কিছুটা দূরে প্রচুর চিংড়ি ও গলদা চিংড়ির সন্ধান পেয়েছেন। আমেরিকার ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন সম্প্রতি এই কথাটি জানিয়েছেন। তাঁরাই এই তথ্যানুসন্ধানী জাহাজটি দিয়েছেন। ভারত মহাসাগরের তলায় যে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য রয়েছে, তার সন্ধান অ্যানটন ব্রনের বিজ্ঞানীরাগত বছরেও দিয়েছিলেন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী আমেরিকার ফিশ অ্যাণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস-এর ব্যুরো অব কমার্শিয়্যাল ফিশারীজ-এর বিশেষজ্ঞগণ আরবের ওমান ও মাসকটের উপকূল থেকে কয়েক শত মাইল দূরে যে প্রচুর মৎস্য রয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছেন।

প্রচণ্ড শক্তিশালী রকেট

মার্কিন বিমান বাহিনীর টাইটান-সি নামে প্রচণ্ড শক্তিশালী রকেটটি ১৭ই জুন মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এর ধাক্কা প্রায় ২৯ লক্ষ পাউণ্ডের সমান। গত ৭ই মে থ্রি-এ নামে এই ধরণের আর একটি পরীক্ষামূলক রকেট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এর ধাক্কার পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ড। প্রথমে এই রকেট পৃথিবীর কাছে থেকে বৃত্তাকার চক্রে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে। পরে উর্ধ্বে উঠে প্রায় চক্রাকারে এবং পূর্ণ চক্রাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই রকেটের মুখে ছিল ৮০ পাউণ্ডের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ

গত মার্চ মাসে জেমিনী মহাকাশযান উৎ-

ক্ষেপণের সময় মহাকাশযাত্রী ভার্জিল গ্রীসম এবং জন ইয়ং যে ধরণের রকেট ব্যবহার করেছিলেন, টাইটান থ্রি-সি-এর উৎক্ষেপণের সময়েও তেমনি ওর পাশে আরো দুটি রকেট থাকে।

টাইটান-সিই হবে পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী রকেট। তবে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এর চেয়েও শক্তিশালী রকেট নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন। এটির নির্মাণকার্য ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে এবং এর ধাক্কার পরিমাণ হবে ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড।

উপগ্রহবাহী শনি (স্যাটার্ন) রকেট উৎক্ষেপণ

কেপ কেনেডি, ফ্লোরিডা থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—আমেরিকা ৩০শে জুলাই পক্ষীরাজ (প্যাগাসাস) উপগ্রহবাহী একটি বিরাট 'শনি' (স্যাটার্ণ) রকেট উৎক্ষেপণ করেছে। উপগ্রহটিতে এমন কয়েকটি প্যানেল আছে, যা দু-এক বছরের মধ্যে কোন মহাকাশচারী মানুষ খুলে নিতে পারবে। জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

পূর্ব ব্যবস্থা মত ভারতীয় সময় ঠিক সাড়ে ছটায় 'স্যাটার্ন-১০' রকেটটি পাঠানো হয়। পক্ষীরাজ উপগ্রহটির পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে গড়ে ৩৩২ মাইল উপরে থেকে পৃথিবী-পরিক্রমার কথা আছে। ছোট ছোট উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধানই এই উপগ্রহ প্রেরণের লক্ষ্য।

উপগ্রহটি এমন প্যানেল দিয়ে ঢাকা আছে, যা খুলে নেওয়া যায়। ভবিষ্যতে কোন এক সময় (এখনও দিন স্থির হয় নি) জেমিনীর অ্যাপোলো মহাকাশযান থেকে কোন মহাকাশ-চারী মানুষ মহাকাশে বহির্গত হয়ে পক্ষীরাজের সঙ্গে একত্রে মহাকাশচাণের সময় ঐ প্যানেল খুলে নেবে।

ভারত তিন বছরে মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারে

বোম্বাই থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ—ভারত তিন বছরের মধ্যেই মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারে, অবশ্য যদি পর্যাপ্ত সম্পদাদি পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত তথ্যটি প্রকাশ করেছেন ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বিক্রমভাই সরাভাই।

তিনি আরও বলেন, আগামী মার্চ (১৯৬৬) মাসে ত্রিবান্দ্রমের নিকটবর্তী থুম্বা থেকে ভারতে তৈরি প্রথম রকেট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হবে। ফ্রান্সের সহযোগিতায় রকেট তৈরির প্রকল্প রূপায়ণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

আগামী বছরে একটি পরিবহন রকেট সমেত ২২টি রকেট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব রকেটের যন্ত্রপাতি অধিকাংশই হবে ভারতের তৈরি।

তিনি বলেন – কারিগরি জ্ঞান ভারতের আছে। কয়েকজন তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী রকেট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিদেশী প্রশিক্ষণও লাভ করেছেন।

বৃহত্তম রুশ উপগ্রহ

মস্কো থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—সোভিয়েট রাশিয়া একটি ১২.২ টন ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ ১৬ই জুলাই মহাকাশে পাঠিয়েছে। রাশিয়া বা আমেরিকা এত বেশী ওজনের উপগ্রহ আগে কখনও উৎক্ষেপণ করে নি। এটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটন—১।

উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট মহাজাগতিক রশ্মিকণা পরি-মাপের জন্যে এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ঐ রশ্মিকণা মহাকাশচারীদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

এই বিপুল ওজনের মহাকাশযান ও আরও ৫টি ছোট কস্‌মস কৃত্রিম উপগ্রহ একই দিনে

পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি প্রচেষ্টাই ভবিষ্যতে মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের প্রস্তুতির অঙ্গ বলে পরিগণিত হতে পারে। একটি বেতার-প্রেরক যন্ত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ পরিমাপক যন্ত্র এই উপগ্রহে আছে। এই সব যন্ত্রপাতি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে চলছে।

মৃত্যু উপত্যকায়

পোর্ট মোরেস্‌বি থেকে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ—নিউগিনির পূর্বপ্রান্তীয় মালভূমিতে যে ৮ হাজার স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের অর্ধেকেরই 'অন্তিম হাসি' নামক একটি রহস্যজনক রোগে মৃত্যু একরূপ সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

পাপুয়া (নিউগিনি) চিকিৎসা-গবেষণার উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সার ম্যাকফারলিন বারনেট সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, অতি শীঘ্র একটি ঔষধ আবিষ্কৃত না হলে এদের বাঁচাবার কোন পথ নেই। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার নারী এই দুর্জ্ঞেয় রোগে মারা গিয়েছে। মেয়েরাই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বেশী।

সাধারণতঃ মস্তিষ্কেই রোগের প্রথম আক্রমণ ঘটে। রোগী নিজের মাংসপেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তার মাথাসহ সারা দেহটিই তখন এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।

এর পর ধীরে ধীরে মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর উপরও রোগী কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকে না। ফলে মনে হয়, সে যেন ক্রমাগতই হাসছে। রোগটির নাম সরকারী ভাষায় 'কিরো'—কিন্তু অনেকেই এটাকে বলে থাকেন, 'অন্তিম হাসি'। শেষ মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও সে প্রাণহীন হাসির বিরাম নেই।

সার ম্যাকফারনিল বলেন—কিরো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক অমীমাংসিত সমস্যারূপে বিরাজ করছে।

গান বাজনায় শুনে বেশী দুধ

হায়দরাবাদ থেকে পি. টি. আই প্রেরিত এক খবরে জানা যায়—গানবাজনা শুনে গরু ও মহিষ নাকি বেশী দুধ দিতে পারে।

তিরুপাতি দেবস্থানম আয় ও সম্পদের দিক থেকে ও পরিচালন ব্যবস্থায় দেশের সমৃদ্ধ মন্দির-গুলির মধ্যে অন্যতম। দুধের জন্যে তাঁদের একটি বিরাট গোশালা আছে। ১৯৬৪ সালে ওই দেবস্থানম ২৫৬১ টাকা দিয়ে একটি রেডিওগ্রাম কেনেন। দুধ দুইবার সময় গরু-মহিষকে তাঁরা বাঁশী, বীণার বাজনা আর 'সুপ্রভাত' সঙ্গীত শুনিয়ে থাকেন। এক বছরে ওই গোশালায় ১৬,৮৭১ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ২৬,২৯১ পাউণ্ড দুধ পাওয়া গেছে।

৪ঠা অগাষ্ট রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি এই তথ্যটি জানান।

অক্টোপাস জননী

পঃ বার্লিন থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—পশ্চিম বার্লিনের চিড়িয়াখানায় একটা কৃত্রিম জলাশয়ের অধিবাসী অক্টোপাস, গত এপ্রিল মাসে নিজের আটখানা হাতই ধীরে ধীরে খুঁটে খেতে আরম্ভ করেছিল শুনে সবাই বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের আর যেটুকু বাকী ছিল, সেটাও সে পূর্ণ করে দিয়েছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সে ২০ হাজার ডিম পেড়েছে।

চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর সাংবাদিকদের কাছে বলেন, এই অক্টোপাসটা যে স্ত্রী জাতীয়, সেটা আমাদের জানা ছিল না। আমরা বিস্মিত হয়েছি যে, সে এখন আর নিজের দেহ ভক্ষণ করছে না। এখন তার জীবন স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক খাদ্যই খাচ্ছে—আর উৎকণ্ঠিতভাবে ডিমগুলিকে পাহারা দিচ্ছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৬৫ | দশম সংখ্যা

পেট্রোলিয়াম

স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

'পেট্রোলিয়াম' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—প্রস্তরজাত তৈল (Petra=rock; Oleum=oil)। প্রকৃতপক্ষে এই খনিজ তৈল মাটির নীচে শিলাস্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চিত থাকে। এর ঠিক উপরের স্তরেই থাকে একপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থ। একে বলা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস—যার প্রধান উপাদান (শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী) হচ্ছে মিথেন (CH_4)। খনিজ তৈলকে মাটির নীচ থেকে উপরে তোলবার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকে বলে ড্রিলিং; অর্থাৎ মাটিতে নলকূপের মত এক অপ্রশস্ত অথচ গভীর গর্ত করা হয়, যে গর্ত পেট্রোলিয়ামের স্তর পর্যন্ত পৌঁছান দরকার। খনি-বিশেষে এই গর্তের গভীরতা ৫০০০ ফুট বা তারও বেশী হতে পারে। খুঁড়তে খুঁড়তে নলের মুখ যেই খনিজ তৈলের স্তর ভেদ করে, অমনি গ্যাসের প্রচণ্ড চাপে নলের ভিতর দিয়ে তৈল উপরে উঠে আসে, আর সেই সঙ্গে বের হয় বালি, লবণাক্ত জল ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

মাটির নীচে পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে অনেকগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে। রক্তের লোহিত কণিকার রঞ্জক পদার্থ হেমিন (Haemin) এবং তাছাড়া নানাপ্রকার জীবাশ্ম পেট্রোলিয়ামের খনি অঞ্চলে পাওয়া গেছে। কাজেই মনে হয় পেট্রোলিয়াম একটি জান্তব পদার্থ। আবার গাছের সবুজ রঙের উৎস যে ক্লোরোফিল, তাথেকে উৎপন্ন কতকগুলি পদার্থ কোন কোন খনিজ তৈলে পাওয়া গেছে। এতে মনে হয়,

পেট্রোলিয়াম একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ। হয়তো বা কোনদিন আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে গাছপালা ও প্রাণীসহ কোন অরণ্য মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হয় এবং সেখানে তাপ, চাপ ও জলের প্রভাবে তাদের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটেই পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি আধুনিক মতবাদের অবতারণা করা প্রয়োজন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, বড় বড় গ্রহের (যেমন—শনি বা বৃহস্পতির) বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান মিথেন। কাজেই একথা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও একদা প্রচুর মিথেন ছিল। পরে তা অতিবেগুনী রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে উচ্চতর হাইড্রোকার্বনসমূহে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলিয়াম তো কতকগুলি ছোট বড় হাইড্রোকার্বন অণুরই সমষ্টি! তাছাড়া তেজস্ক্রিয়তার ফলে উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে একটি হলো হিলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যেও প্রায়ই কিছু পরিমাণ হিলিয়াম পাওয়া যায়। কাজেই খনিজ তৈলের উৎপত্তি সম্পর্কে উপরিউক্ত মতবাদটিও একেবারে যুক্তিহীন নয়।

প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় ১০০ কোটি টন তৈল উত্তোলন করা হয়। তার মোটামুটি হিসাব নিম্নরূপ :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪০ কোটি টন
মধ্যপ্রাচ্য	২০ " "
ভেনেজুয়েলা	১৫ " "
রাশিয়া	১০ " "
অন্যান্য দেশ	১৫ " "
ভারত	১০ লক্ষ টন

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রয়োজনের তুলনায় ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। আসামের খনিগুলি থেকে বছরে প্রায় ৬ কোটি গ্যালন তৈল উত্তোলিত হয়। এছাড়া মহারাষ্ট্রের ক্যাম্বে, পাঞ্জাবের ক্যাংরা উপত্যকা, পশ্চিম বঙ্গের ক্যানিং, কচ্ছের রাণ এলাকা ও গুজরাটের কোন কোন অঞ্চলে নাকি প্রচুর তৈলের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং খনন-কার্যও সুরু হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানা দরকার যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা আমরা কোন অঞ্চলে তৈলের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি বটে, কিন্তু তৈলের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক অনুমান করা সম্ভব নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত খনন-কার্য শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তৈলের সঠিক পরিমাণ জানা যায় না।

খনি থেকে সদ্য-উত্তোলিত তৈলকে বলা হয় Crude oil বা অশোধিত তৈল। এর রং যেমন নিকষ কালো, তেমনি দুর্গন্ধযুক্ত। কিন্তু এই কুৎসিত-দর্শন বস্তুটি থেকে আজকাল অন্ততঃ ২০০টি অতিপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে। খনিজ তৈলের রাসায়নিক উপাদানগুলি নিম্নরূপ—

শ্রেণী	উদাহরণ
(১) প্যারাফিন বা অ্যাল্কেন	মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6) ইত্যাদি
(২) ন্যাপ্থিন	সাইক্লোপেন্টেন (C_5H_{10}), সাইক্লোহেক্সেন (C_6H_{12}) ইত্যাদি
(৩) অ্যারোমেটিক্স	বেঞ্জিন (C_6H_6), টলুয়িন ($C_6H_5.CH_3$) ন্যাপথালিন ($C_{10}H_8$) ইত্যাদি।
(৪) অক্সিজেন-ঘটিত পদার্থ	ফেনল, ন্যাপ্থিনিক অ্যাসিড প্রভৃতি

শ্রেণী	উদাহরণ
(৫) সালফার-ঘটিত পদার্থ	হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), মারক্যাপটান (R—S—H), থাইয়োইথার (R—S—R) প্রভৃতি
(৬) নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ	পিরিডিন, কুইনোলিন, ইনডোল, পরপাইরিন ইত্যাদি
(৭) ভস্ম	সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের অক্সাইড।

খনিজ তৈলের অন্তিম বিশ্লেষণ (Ultimate analysis) নিম্নরূপ :—

কার্বন = ৮৩-৮৫ % ; হাইড্রোজেন = ১১-১৪ % :
অক্সিজেন = ১ % ; সালফার = ১·৫ % ;

কোনও খনিজ তৈলের প্রধান উপাদান অনুসারে উক্ত তৈলের নামকরণ করা হয়। যেমন—কোনও তৈলের যদি প্যারাফিন প্রধান উপাদান হয়, তবে তাকে বলা হবে প্যারিফিনিক ক্রুড। তেমনি প্রধান উপাদান ন্যাপ্‌থিন হলে তার নাম হবে ন্যাপ্‌থিনিক ক্রুড।

খনি থেকে তৈল উত্তোলনের পর তাকে পাইপের সাহায্যে কোনও দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে পাতন-প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধন করা হয়। শোধনাগার (Refinery) কখনও খনির খুব নিকটে স্থাপন করা হয় না; কারণ প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। কাজেই একবার এতে আগুন লাগলে সমস্ত খনিটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অপরিশুদ্ধ (Crude) তৈলকে আংশিক পাতন করলে তা কতকগুলি বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্ক-বিশিষ্ট (Boiling range) অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম Refining বা শোধন। অপরিশুদ্ধ তৈলকে প্রথমে একটি প্রকোষ্ঠে উত্তপ্ত করা হয়; অতঃপর তাকে বাষ্পীভূত অবস্থায় একটি সুউচ্চ টাওয়ারের নিম্নভাগে প্রবেশ করানো হয়। এই টাওয়ারটির নাম Bubble Tower। এর মধ্যে বিভিন্ন উচ্চতায় কতকগুলি প্লেট সাজানো থাকে। খনিজ তৈলের বাষ্প যতই নল বেয়ে উপরে উঠতে থাকে, ততই তা শীতল হয় এবং বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন প্লেটে সঞ্চিত হয়। যে অংশটির স্ফুটনাঙ্ক সবচেয়ে বেশী, তা সঞ্চিত হয় সর্বনিম্ন প্লেটে। আর যে অংশের স্ফুটনাঙ্ক সবচেয়ে কম, তা সঞ্চিত হয় সর্বোচ্চ প্লেটে। পাতিত তৈলের কিছু অংশ সাধারণতঃ ঠাণ্ডা করে টাওয়ারের উপর থেকে নীচে প্রবাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম Reflux; এর ফলে আংশিক-পাতন প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হয় এবং পৃথকীকৃত অংশগুলি অধিকতর বিশুদ্ধ হয়। যে যে অংশগুলি পাতনের ফলে উৎপন্ন হয়, তাদের নাম ও ব্যবহার তালিকাকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো :—

নাম	স্ফুটনাঙ্ক	উপাদান	ব্যবহার
(১) গ্যাসীয় পদার্থ	৩০° সে. পর্যন্ত	$C_1 - C_5$	... পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হলো।
(২) পেট্রোলিয়াম ইথার	৪০° – ৭০° সে.	$C_5 - C_8$	... দ্রাবক
(৩) গ্যাসোলিন বা পেট্রল	৭০° – ১২০°	$C_8^1 - C_{10}$	... মোটর গাড়ীর জ্বালানী এবং ড্রাই-ক্লিনিং

নাম	স্ফুটনাঙ্ক	উৎপাদন	ব্যবহার
(৪) ন্যাপ্‌থা	১২০°—১৮০°	$C_{10}-C_{12}$ ···	দ্রাবক
(৫) কেরোসিন	১৮০°—৩০০°	$C_{12}-C_{16}$ ···	জ্বালানী হিসাবে।
(৬) গ্যাস-অয়েল	৩০০°—৪০০°	$C_{16}-C_{18}$ ···	ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে এবং পেট্রল তৈরি করতে।
(৭) লুব্রিকেটিং অয়েল	৪০০° থেকে বেশী	$C_{18}-C_{20}$ ···	যন্ত্রপাতি পিচ্ছিল (lubricate) করতে।
(৮) প্যারাফিন ওয়াক্স	কঠিন	$C_{20}-C_{30}$ ···	মোমবাতি, মলম ও ভেসেলীন তৈরি হয়।
(৯) পিচ্‌	—	—	রাস্তা নির্মাণ।

পেট্রোলিয়াম শোধনের সময় যে গ্যাসগুলি উৎপন্ন হয় তাতে থাকে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8), বিউটেন (C_4H_{10}), ইথিলিন (C_2H_4), প্রপিলিন (C_3H_6), বিউটিলিন (C_4H_8) ইত্যাদি। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে থাকে প্রচুর মিথেন।

মিথেনকে ১২০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সেটা ভেঙ্গে অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন করে—

$$2CH_4 \rightleftharpoons C_2H_2 + 3H_2$$

বিভাজিত গ্যাসমিশ্রণে প্রায় ৮% C_2H_2 থাকে; একে মিথাইল-পাইরোলিডিনে শোষিত করে পৃথক করা হয়।

C_2H_2 এবং HCl গ্যাসমিশ্রণকে $HgCl_2$ অনুঘটকের উপর দিয়ে ১০০°—১৮০°C তাপমাত্রায় প্রবাহিত করলে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। একে পলিমারাইজ করলে পাওয়া যায় পলিভিনাইল ক্লোরাইড রাবার, সংক্ষেপে বলা হয় P. V. C.

$$C_2H_2 + HCl \longrightarrow CH_2=CHCl$$

$$nCH_2=CHCl \longrightarrow (-CH_2-CHCl-)_n$$
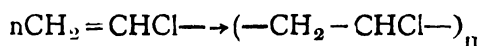
শিট হিসাবে মেঝে তৈরি করতে ও ক্ষয়কারী (Corrosive) রাসায়নিক পদার্থ স্থানান্তরের জন্যে P. V. C. পাইপ ও পাত্র ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এর প্রধান ব্যবহার হলো বৈদ্যুতিক তারে অপরিবাহী আস্তরণ হিসাবে।

১৭০°—২১০°C তাপমাত্রায় C_2H_2 ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড বাষ্প জিঙ্ক-অ্যাসিটেট অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে ভিনাইল অ্যাসিটেট উৎপন্ন করে। এথেকে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট (P. V. A.) প্রস্তুত হয়—

$$CH_3COOH + HC\equiv CH \rightarrow CH_3COO-CH=CH_2$$

$$nCH_3COO-CH=CH_2 \rightarrow (CH_3COO-\underset{1}{C}H-CH_2-)_n$$
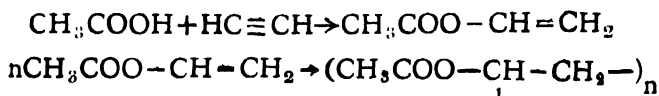
নানাপ্রকার রং ও আঠালো পদার্থ তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

কিউপ্রাস ক্লোরাইড অনুঘটকের উপস্থিতিতে দুটি C_2H_2 অণু যুক্ত হয়ে মনোভিনাইল অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন করে। এটি HCl-এর সঙ্গে ৩০°-৬০°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ক্লোরোপ্রিন পাওয়া যায়—

$$2HC\equiv CH \rightarrow HC\equiv C-CH=CH_2$$

$$HC \equiv C{-}CH = CH_2 + HCl \rightarrow CH_2 = C.Cl{-}CH = CH_2$$
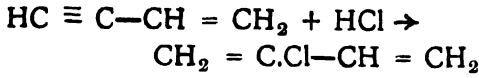
একে পলিমারাইজ করলে অতি প্রয়োজনীয় এক প্রকার কৃত্রিম রাবার উৎপন্ন হয়। এর নাম নিয়োপ্রিন। হাইড্রোকার্বনকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাসম্পন্ন রাবারগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

HCl দ্রবণে কপার ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে C_2H_2 হাইড্রোজেন সায়নাইডের সঙ্গে ৭০°-৯০°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল উৎপন্ন হয়—

$$HC \equiv CH + HCN \rightarrow CH_2 = CH{-}CN$$
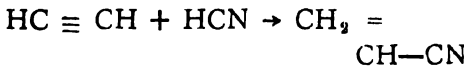
পাশ্চাত্ত্য দেশে এথেকে কৃত্রিম বস্ত্র, যথা—অরলন, অ্যাক্রিলিন প্রভৃতি তৈরি করা হয়। নাইট্রাইল রাবার তৈরি করবার পক্ষেও এটিই প্রধান উপাদান। এর দ্বারা নির্মিত পাইপ জলপূর্ণ করে দমকল বাহিনী আগুন নিবাবার কাজে ব্যবহার করে।

উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিথেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় হাইড্রোজেন ও কার্বন-মনোক্সাইড। এথেকে মিথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়—

$$CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3H_2$$

$$CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$$
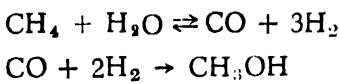
এটি ব্যবহৃত হয় বিমানের জ্বালানী হিসাবে, দ্রাবক হিসাবে এবং ফরম্যালডিহাইড ও ডাই-মিথাইল টেরিথ্যালেট তৈরি করতে। এই শেষোক্ত পদার্থটি টেরিলিনের একটি প্রধান উপাদান।

তাপ প্রয়োগ করলে মিথেন বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন ও কার্বন-ব্ল্যাক উৎপন্ন করে—

$$CH_4 \rightarrow C + 2H_2$$

কার্বন-ব্ল্যাকের প্রধান ব্যবহার মোটর গাড়ীর টায়ার তৈরি করতে। একটি টায়ারের ওজনের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগই কার্বন-ব্ল্যাক।

৬৮ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপ ও ৩০০°C তাপমাত্রায় H_3PO_4 ও SiO_2 অনুঘটকের উপস্থিতিতে ইথিলিনের সঙ্গে ষ্টিমের বিক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় ইথাইল অ্যালকোহল—

$$C_2H_4 + H_2O = C_2H_5OH$$
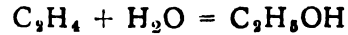
এথেকে বিউটানল, অ্যাসিট্যালডিহাইড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়।

সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে উচ্চ অথবা নিম্ন চাপে ইথিলিনকে পলিমারাইজ করে প্রস্তুত হয় পলিথিন। এথেকে ফিল্ম, শিট, ব্যাগ, পাইপ, কেব্‌ল্, বোতল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অনুরূপভাবে ইথিলিন ও বেঞ্জিনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় পলিষ্টাইরিন। এর দ্বারা রেফ্রিজারেটর, গ্রামোফোন ও রেডিও প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ তৈরি করা হয়।

বিউটেন থেকে প্রস্তুত হয় বিউটাডাইন—

$$C_4H_{10} \xrightarrow{Cr_2O_3/Al_2O_3} C_4H_6$$
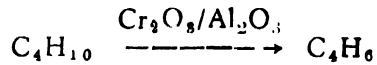
অতঃপর ষ্টাইরিন ও বিউটাডাইনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রস্তুত করা হয় SBR নামক কৃত্রিম রাবার।

ঘন নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা সাইক্লোহেক্সেনকে জারিত করলে অ্যাডিপিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এর সঙ্গে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিনের বিক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় নাইলন। এথেকে কেবল যে পোসাকই প্রস্তুত হয় তা নয়—টুথব্রাস, বোতাম প্রভৃতিও তৈরি হয় এবং পর্বতারোহণের জন্যে বা সমুদ্রের নীচে নামবার জন্যে নাইলনের শক্ত দড়ি ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে পেট্রোলিয়ামের একটি অত্যাশ্চর্য ও অত্যাধুনিক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করবো। সম্প্রতি ফ্রান্সের লাভেরা অঞ্চলের একটি গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, পেট্রোলিয়ামের উপর এক বিশেষ ধরণের ঈষ্টের (Yeast) ক্রিয়ার ফলে এর Fermentation হয় এবং প্রোটিন উৎপন্ন হয়। এর ফলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান মানবগোষ্ঠীর খাদ্য-সমস্যারও আংশিক সমাধান সম্ভব হতে পারে।

সাপের কথা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—প্রায় ১৩ কোটি বৎসর আগে, যখন খড়িমাটির স্তর গঠিত হইতেছিল, তখন টিকটিকি হইতে ক্রমবিকাশের ফলে পৃথিবীতে সাপের উদ্ভব হইয়াছে। সেই জন্য কোন কোন অজগর শ্রেণীর সাপের শরীরের দুই দিকে এখনও পায়ের চিহ্নস্বরূপ দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি বাহির হইয়া থাকিতে দেখা যায়। মিশরে একটি পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ সাপের জীবাশ্ম (Fossil) পাওয়া গিয়াছিল। প্রায় দশ হাজার বৎসর আগেকার নূতন প্রস্তরযুগের হরিণের শিঙে সাপের মূর্তি উৎকীর্ণ থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং আদিম গুহাবাসী মানব যে সাপের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

এই পৃথিবীতে মেরুপ্রদেশ, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ড ব্যতীত আর সকল দেশেই জল, স্থল, ভূগর্ভ, বৃক্ষ, পর্বত, গিরিগহ্বর এবং মরুভূমিতে প্রায় ২০০০ রকম সাপ বসবাস করে।

সর্প সরীসৃপজাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত। ইহাদের রক্ত শীতল; অর্থাৎ ইহাদের শরীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবে উত্তপ্ত বা শীতল হইয়া থাকে। সাধারণ পশু-পক্ষীর ন্যায় ইহাদের শারীরিক তাপমাত্রা স্থির নয়।

সচরাচর অধিকাংশ সর্পের জৈব ও শারীরিক ক্রিয়া ৫০° ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে ১০৫° ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে স্বাভাবিক থাকে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর তাপমাত্রা ইহা অপেক্ষা ঠাণ্ডা বা গরম হইলে বেশীর ভাগ সাপ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

উত্তর ইউরোপে এডার সাপ ৬৮° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় দেখা যায়। দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলে এই পর্যন্ত কোন সাপই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল একরকম বোড়া সাপ ৫০° ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ অবধি আর্জেন্টিনার সান্তাক্রুজ প্রদেশে পাওয়া যায়। হিমালয়ের বোড়া সাপ সাধারণতঃ সাত হইতে দশ হাজার ফুট উঁচু জায়গায় দেখা গেলেও কোন কোন সময় ইহাদিগকে ১৬০০০ ফুট উঁচু পাহাড়েও পাওয়া যায়। আল্পস্ পর্বতে দশ হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও এডার সাপ বিচরণ করে। উত্তর আমেরিকায় বন্ধনী সাপ ৬১° ডিগ্রী অক্ষাংশে ল্যাব্রাডর অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। মেক্সিকোর পার্বত্য অঞ্চলে ১৪৫০০ ফুট উচ্চে এক জাতীয় র‍্যাটেল সাপকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। সিন্ধু, আরব ও সাহারা মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরে কয়েক জাতীয় বোড়া সাপ বাস করে। এই সব সাপ সূচালো মুখাগ্রের সাহায্যে সহজেই বালির মধ্যে গর্ত করিতে পারে। ইহাদের নাসারন্ধ্র ইচ্ছামত বন্ধ করিবার জন্য চামড়ার একরকম আবরণ থাকে।

সাপের শরীর—মস্তক, দেহাংশ ও লেজ—এই তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সাপের অপাঙ্গদেশের নিম্নভাগই উহার লাঙ্গুল।

সাপের শরীর বহুসংখ্যক শল্ক বা আঁশে আবৃত। সাপ দুই-তিন মাস অন্তর খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহারা দুর্বল, অসহায় এবং অন্ধবৎ হইয়া নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে। সাপের চোখের পাতা নাই; উহা স্বচ্ছ চর্মে আবৃত।

শ্রেণী হিসাবে প্রত্যেক সাপের ১৮০ হইতে ৪০০টি পর্যন্ত কশেরুকা (Vertebra) থাকে।

কোন কোন সাপের ৩০০ জোড়া পঞ্জরাস্থি আছে। আমাদের ফুস্‌ফুসের সংখ্যা দুইটি, কিন্তু অধিকাংশ সাপের একটি মাত্র ফুস্‌ফুস থাকে। ইহাদের কেবল দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, বাম ফুস্‌ফুস একেবারেই থাকে না কিম্বা খুব ছোট ও অপূর্ণ অবস্থায় থাকে। সাপের হৃৎপিণ্ড তিনটি কুঠ্‌রিবিশিষ্ট এবং দেহের তুলনায় ইহাদের মস্তিষ্ক খুবই ছোট। সাধারণতঃ শরীরের অনুপাতে সাপের মস্তিষ্ক শতকরা মাত্র ·০১ ভাগ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের মস্তিষ্ক দেহের অনুপাতে ২·৮% হইয়া থাকে। সাপের মূত্রাশয় নাই। পুরুষ সাপের দুইটি জননেন্দ্রিয় থাকে।

ক্রুদ্ধ গোখুরা ও চন্দ্রবোড়ার ফোঁসফোঁস গর্জন অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ইহারা প্রথমে প্রচুর পরিমাণে বায়ু গ্রহণ করিয়া পরে নাসিকার সাহায্যে তাহা সজোরে পরিত্যাগ করে। এই জন্যই উহাদের ফোঁসফোঁস শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে সাপ শ্বাস গ্রহণ না করিয়া জলের মধ্যে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে পারে। ইহারা সম্পূর্ণ মসৃণ জায়গার উপর দিয়া চলিতে পারে না; কিন্তু খরখরে ভূমির উপর দ্রুতবেগে চলিতে পারে। সমতল ভূমিতে ইহাদের আঁকা-বাঁকা গতি ঘণ্টায় তিন-চার মাইলের বেশী হয় না। দৈবাৎ জলে পড়িলে সকল রকমের সাপই সাঁতার কাটিতে পারে।

লতাগুল্মাদি পরিপূর্ণ জঙ্গল, অন্ধকারাবৃত গর্ত, পুরাতন প্রাচীরের ফাটল, পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝের নিম্নস্থ গর্ত এবং অন্যান্য নিভৃত স্থানে সাপের বাস। সাধারণতঃ তাড়া করিলে ইহারা পলায়নের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পলায়নের সুযোগ না পাইলে অথবা সামান্য আঘাত পাইলেও দংশন না করিয়া ছাড়ে না। আমাদের দেশের রাজগোখরা এবং আফ্রিকার মাম্বা এক সময় দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করে।

যে সকল সাপ সর্বদা মাটির নীচে অন্ধকার গর্তের মধ্যে থাকে, তাহারা প্রায় অন্ধ বলিলেই হয়। ইহারা কেবল আলো-ছায়ার পার্থক্য বুঝিতে পারে। আর যে সকল সাপ ভূমির উপরে বাস করে, তাহাদের দূরের দৃষ্টি ক্ষীণ হইলেও কোন চলন্ত বস্তু সহজেই তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাপের অতিবেগুনী রশ্মি অনুভূতির শক্তি না থাকিলেও ইহাদের লোহিতাতীত তাপ-রশ্মি অনুভূতির আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। র‍্যাটেল ও অন্যান্য বোড়া জাতীয় সাপের নাক ও চোখের মাঝখানে একটি করিয়া ছোট গর্ত থাকে। এই ছিদ্রদ্বয় লোহিতাতীত তাপ বিকিরণ সম্পর্কে বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন। কোন কোন বোড়া সাপের কাছে হাত রাখিয়া দেখা গিয়াছে, উহারা এক ফুট দূর হইতেই হাতের উত্তাপ অনুভব করিতে সক্ষম। এক ডিগ্রী ফারেনহাইটের এক তৃতীয়াংশ মাত্রা তাপও ইহারা অনুভব করিতে পারে।

সাপের বাহ্যিক কোন কান বা কানের পর্দা নাই, তবে ইহাদের মস্তকের মধ্যে অন্তঃকর্ণের অস্তিত্ব আছে। সাপ বায়ুবাহিত শব্দকম্পন শুনিতে পায় না, তবে খুব প্রবল শব্দের ফলে ভূমি প্রকম্পিত হইলে সহজেই সেই কম্পন অনুভব করে।

যতদূর জানা যায়, সাপের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বেশ অনুভূতিসম্পন্ন। মুখের মধ্যে তালুর শেষ প্রান্তে প্রায় নাসারন্ধ্রের কাছে ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবস্থিত। ইহারা সব সময় দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা বাহির করিয়া বাতাস হইতে বস্তুকণা গ্রহণ করিয়া মুখের ভিতর ঐ বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন স্থানে স্থাপন করে। ইহার ফলে উহাদের খুব সূক্ষ্ম গন্ধবোধ হইয়া থাকে। সাপের ভারসাম্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা খুবই আশ্চর্যজনক।

বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও হেমন্তকালে সচরাচর সর্পজাতির যৌন-সম্মিলন ঘটে। এই সময় স্ত্রী-সর্পের দেহ হইতে বিশেষ একরকম গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। পুং-সর্প এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটে আগমন করে। স্ত্রী-সর্প, জাতি হিসাবে দুই হইতে চারি মাস গর্ভ-ধারণ করে এবং ১০টি হইতে ১০০টি পর্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ লতাপাতা ও ঘাসের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। পচনশীল উদ্ভিদ হইতে তাপ উৎপন্ন হইবার ফলে দুই-তিন মাস পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। রাজ-গোখরা লতাপাতা ও ঘাস একত্রিত করিয়া একরকম বাসা প্রস্তুত করে এবং উহার মধ্যে ডিম পাড়ে। উত্তর আমেরিকার কাদা-সাপ নরম মাটি খুঁড়িয়া বোতলের মত গর্ত তৈয়ার করে এবং উহার মধ্যে ডিম পাড়ে। সমস্ত সামুদ্রিক সাপ, বোয়া এবং অধিকাংশ বোড়া সাপ ডিম পাড়ে না, বাচ্চা প্রসব করে। সমুদ্রের সাপের একটি বা দুইটি বাচ্চা হয়, কিন্তু বোড়া জাতীয় সাপের এককালে দশটি হইতে আশিটি পর্যন্ত বাচ্চা হইয়া থাকে।

কখনও কখনও যৌন-মিলনের অনেক দিন পরে স্ত্রী-সর্প ডিম্ব প্রসব করে। একবার একটি নীল স্ত্রী-সাপ চার বৎসর সম্পূর্ণ আলাদা থাকিয়াও সজীব (Fertile) ডিম পাড়িয়াছিল। আর একবার আমেরিকার এক বিড়ালাক্ষী স্ত্রী-সাপ ছয় বৎসর পরে অনেকগুলি প্রাণশক্তিসম্পন্ন ডিম পাড়িয়াছিল।

সচরাচর প্রায় সব রকমের সাপ চার বৎসর বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়। একটি কালো গোখরা এবং একটি অ্যানাকোণ্ডা জাতীয় অজগর সাপ ২৯ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল। বোয়া জাতীয় একটি অজগর ২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। একটি নেকড়ে সাপ ২৩ বছর এবং একটি নীল সাপ ২৫ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল।

সাপ মাত্রেই মাংসাশী জীব। খাদ্য গলাধঃ-করণের সময় সব রকম সাপের বায়ুনালী মুখের সামনে চলিয়া আসে। সেই জন্য উহাদের শ্বাস বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। চোয়ালের গঠন-বৈচিত্র্য ও অস্থিসংস্থানের জন্য সাপ তাহার মুখবিবর ইচ্ছামত প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারে। অধিকাংশ সাপ ব্যাং, ইঁদুর, শামুক, টিকটিকি, ছোট পাখী এবং নানারকম পোকামাকড় উদরস্থ করিয়া জীবনধারণ করে। অজগর সাপ খরগোস, হাঁস-মুরগী, ছাগল, শূকর, হরিণ প্রভৃতি ধরিয়া উদরসাৎ করে। শ্যামদেশের এক জাতীয় জলচর সাপ মাছ ধরিয়া খায়। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের কোন কোন শ্রেণীর সাপ পাখীর আস্ত ডিম উদরস্থ করিয়া থাকে। ডিমের খোলা ভাঙ্গিবার জন্য ইহাদের গলার মধ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

উত্তর আমেরিকার রাজসাপ অন্যান্য বিষাক্ত বোড়া জাতীয় সাপ (Vipers) উদরস্থ করিয়া থাকে। ইহারা নিজেরা বিষধর না হইলেও, র‍্যাটেল ও অপরাপর বোড়া সাপের বিষ সহজেই প্রতিরোধ করিতে পারে। আফ্রিকার উখো সাপ বোড়া সাপের বিষ সহজেই ধ্বংস করিতে পারে। এই দেশের রাজগোখরা সর্পভুক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহারা অন্যান্য নির্বিষ সাপ উদরসাৎ করিয়া প্রাণধারণ করিলেও ইহাদের নিজেদের বিষ নষ্ট করিবার কোন ক্ষমতাই নাই।

কোন কোন বোড়া ও অজগর কিছুমাত্র আহার্য গ্রহণ না করিয়াও কখনও কখনও এক বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

শীতকালে সাপ দলবদ্ধ হইয়া কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়া শীত-ঘুমে (Hibernate) কাটায়। এই সময় ইহারা মোটেই পানাহার করে না এবং তাহাদের দেহক্রিয়াও খুব মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। সাধারণতঃ ইহারা শরৎকালে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহের মধ্যে যথেষ্ট চর্বি সঞ্চয় করে এবং শীত-ঘুমের সময় এই সঞ্চিত

স্নেহ জাতীয় পদার্থ ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া উহাদের জীবনীশক্তি প্রদান করে। শীতপ্রধান দেশে সচরাচর ১৩৫ দিন হইতে ২৭৫ দিন পর্যন্ত শীত-ঘুমে কাটায়। বাতাসের তাপমাত্রা ৪৮°—৫০° ফারেনহাইট হইলেই শীত-ঘুম আরম্ভ হয়, আর প্রথম সৌরকরোজ্জ্বল দিনে যখন বায়ুর তাপমাত্রা ৪৬·৪° ফারেনহাইট হয়, তখন শীত-ঘুমের অবসান ঘটে।

বিসাক্ত সাপের উপরের চোয়ালের দুই পাশে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দুইটি বিষদাঁত থাকে। সাপের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র এই বিসদাঁত। দাঁত দুইটি ইঞ্জেকশন দিবার সূচের মত ফাঁপা; এই জন্য সহজেই বিষ গড়াইয়া আসে। বিষ দাঁতের পশ্চাতে আরও কয়েকটি দাঁত থাকে। কোন কারণে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে এই অতিরিক্ত দাঁত দুই সপ্তাহ কিম্বা আরও কম সময়ে সক্রিয় বিসদাঁতে পরিণত হয়। এই জন্য সাপুড়েরা কিছুদিন অন্তর তাহাদের পালিত সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। বিষধর সাপের চোখের পশ্চাতে একটি করিয়া বিষগ্রন্থি অবস্থিত এবং উহা হইতে একটি সরু নালী আসিয়া বিষদাঁতের সহিত সংযুক্ত হয়। দংশন করিবার সময় ঐ বিষগ্রন্থি হইতে বিষ ঐ নালী ও বিষদাঁতের মধ্য দিয়া দষ্ট স্থানে প্রবেশ করে।

সাপের বিষ শিকারকে কাবু করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সদ্য সংগৃহীত সর্পবিষ দেখিতে অনেকটা সরিষার তৈলের মত; শুষ্ক করিলে গঁদের মত হইয়া যায়, কিন্তু উহার তীব্রতা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, গোল্ড ক্লোরাইড ও ব্লিচিং পাউডারের সংস্পর্শে আসিলে বিসের অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

ডাক্তার পার্কার বলেন, প্রত্যেক বিষধর সর্পের গরলেই নিম্নোক্ত বিশেষ কয়েক রকম রাসায়নিক উপাদান কম-বেশী পরিমাণে থাকে; যেমন—

১। স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদকারক বিষ, যাহার প্রভাবে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্র অবশ হইয়া পড়ে।

২। রক্ত জমাটকারী বস্তু, যাহার জন্য থ্রম্বোসিস হয়।

৩। রক্ত জমাট বাঁধিবার বিপরীত বস্তু, যাহার জন্য প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

৪। রক্তকণিকা ধ্বংসকারী পদার্থ, যাহার প্রভাবে রক্তবাহী শিরা ও ধমনীর গাত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৫। এইগুলি ছাড়াও এমন একটি জিনিষ আছে, যাহার জন্য বিষ সহজেই সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সাপের বিষ এক রকম জটিল প্রোটিন জাতীয় পদার্থ।

সকল রকম প্রাণীই সাপের বিষে ঠিক সমান ভাবে প্রভাবিত হয় না। একই সাপের বিষ বিভিন্ন জাতীয় জীবের উপর বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া করে। গোখরার বিষ প্রয়োগে খরগোস, কুকুর অপেক্ষা দুই গুণ বেশী—কিন্তু এশিয়াবাসী বেঁজী অপেক্ষা ২৫ গুণ বেশী প্রভাবিত হয়। ডায়মণ্ড র‍্যাটেল সাপের যে পরিমাণ বিষে ইঁদুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার ছয় গুণ বিষ প্রয়োগে খরগোস বা গিনিপিগের মৃত্যু ঘটে। অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণসর্পের যে মাত্রার বিষে বানর মারা পড়ে, তাহার কুড়ি গুণ বিষ প্রয়োগ করিলে সমান আকারের বিড়ালের মৃত্যু ঘটে। ইউরোপের কাঁটাচুয়ার (Hedgehog) ও এশিয়াবাসী বেঁজীর সর্পবিষ প্রতিরোধ করিবার খানিকটা স্বাভাবিক শক্তি আছে। আর্জেন্টিনা-বাসী ভামের এক কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমাণ রক্তরস যে পরিমাণ বোড়া সাপের বিষ ধ্বংস করে, সেই মাত্রার বিষের প্রভাবে কয়েকটি পায়রার মৃত্যু ঘটিতে পারে।

সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহার দশগুণ লোক সর্পদষ্ট হয়।

নিম্নে কয়েকটি দেশের সর্পাঘাতের পরিসংখ্যান দেওয়া হইল—

দেশ	মৃত্যুর হার	জনসংখ্যা
বর্মা	১৫	প্রতি ১০০০০০
ভারতবর্ষ ও ব্রেজিল	৫	প্রতি ১০০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬	প্রতি ১০০০০০০০
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২	প্রতি ১০০০০০০০
ইউরোপ	৬	প্রতি ১০০০০০০০
ইংল্যাণ্ড	২	প্রতি ১০০০০০০০

শুধু মানুষই নয়, প্রতি বৎসর অনেক গরু, ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতি সর্পদংশনে প্রাণ হারায়।

১৮৯৪ সালে ফ্রান্সের অধ্যাপক ডাক্তার ক্যালমিটি সর্পবিষের প্রতিষেধক অ্যান্টিভেনিন আবিষ্কার করেন। এই ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ :—প্রথমে একটি ঘোড়াকে সামান্য পরিমাণ সর্পবিষ ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে বিষের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু পূর্ব প্রক্রিয়ার ফলে ঘোড়ার রক্তে এমন এক বিষবিধ্বংসী বস্তু উৎপন্ন হয় যে, তখন আর সাপের বিষ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অতঃপর ঐ ঘোড়ার রক্ত লইয়া উহার রসভাগ (Serum) পৃথক করিয়া কাচের আধারে রাখা হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে অ্যান্টিভেনিন প্রয়োগ করিলে সহজেই উহা বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করে।

ছোট ছোট তেলিয়া সাপ মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়। অপর দিকে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যানাকোণ্ডা নামক অজগর জাতীয় সাপ লম্বায় ৩০ ফুট এবং ওজনে তিন-চার মণ পর্যন্ত হইতে পারে। রাজগোখরা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বিষধর সর্প। ইহারা ১৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। দক্ষিণ চীন, হিমালয় অঞ্চল, সুন্দরবন, আসাম, বর্মা এবং বালী, সিলিবিস ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে রাজগোখরা বাস করে। ইন্দোচীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় সোনালী রঙের উড্ডুক্কু সাপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর সাপ উড়িবার সময় নতোদর হইয়া নিজের শরীরকে অর্ধখণ্ডিত বাঁশের মত চ্যাপ্টা করিয়া বাতাসে ভর দিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে অনায়াসে বিচরণ করে। গাছের এক ডাল হইতে তিন-চার ফুট দূরে অন্য ডালে ইহারা এক এক সময় লাফাইয়া গমনাগমন করে।

উত্তর আমেরিকার র‍্যাটেল সাপ এক জাতীয় বোড়া। ইহারা ৪ হইতে ৮ ফুট লম্বা হয়। ইহাদের লেজের শেষ প্রান্তে কতকগুলি হাড়ের মত চাকৃতি পর পর সজ্জিত থাকে। সন্ত্রস্ত বা ভীত হইলে এইগুলি নাড়াইয়া র‍্যাটেল সাপ ঝুমঝুমির মত শব্দ করে। এই আওয়াজ দশ-পনেরো গজ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক রকম থুথু-নিক্ষেপকারী গোখরা (Spitting Cobra) আছে, ইহাদিগকে রিংহলস্ কোব্রা বলে। ইহারা প্রায় আট ফুট দূর হইতে শত্রুর চোখ লক্ষ্য করিয়া পিচকারীর মত বিষের ধারা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এক এক সময় বিষের প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি স্থায়ীভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের জলে যে সকল সাপ বাস করে তাহাদের লেজ দাঁড়ের মত চ্যাপ্টা হয়। সেই জন্য উহারা অনায়াসে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটিতে পারে। ইহারা দৈর্ঘ্যে ৩ হইতে ৮ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সামুদ্রিক সাপই বিষধর। ইহাদের নাসারন্ধ্রে চামড়ার ঢাক্না থাকে এবং উহাকে ইচ্ছামত বন্ধ করিতে পারে।

সাধারণ মানুষ প্রতি মাসে নিজের শরীরের প্রায় সমান ওজন জল পান করিয়া থাকে। আর সাপ এক বৎসরে দেহের ওজনের সমপরিমাণ জল গ্রহণ করে।

সাপের প্রধান শত্রু মানুষ। ইহা ছাড়া বেজী, শূকর, ঈগল পাখী, বাজ, প্যাঁচা, ধনেশ পাখী

এবং আফ্রিকার কেরানী পাখী সর্প শিকারে বিলক্ষণ দক্ষ। কুমীর, গোসাপ, বড় বড় মাছ ও ব্যাংও সর্প ভক্ষণ করিতে বিশেষ পটু।

শুনা যায় আফ্রিকার কোন কোন আদিম জাতি তীরের ফলায় সাপের বিষ মাখাইয়া জীবজন্তু শিকার করে। কখনও কখনও প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আফ্রিকার আদিবাসীরা শত্রুর গমনপথে বিষধর মাম্বা সাপ বাঁধিয়া রাখে। সময় সময় সহজে মাংস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জীবজন্তুর যাতায়তের রাস্তায় তাহারা বিষাক্ত বোড়া সাপ বাঁধিয়া রাখে। এইভাবে কোন কোন দিন দশটি পর্যন্ত মহিষ মারা পড়ে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হ্যানিবল শত্রুপক্ষের জাহাজে হাঁড়িভর্তি বিষধর সাপ নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন।

সাধারণ গোখরা দংশন করিলে প্রায় ২০০ মিলিগ্রাম পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু ইহার এক-দশমাংশ মাত্রার বিসই মানুষের পক্ষে মারাত্মক। চন্দ্রবোড়া একবার কামড়াইয়া ১০০ মিলিগ্রাম বিষ ঢালিতে পারে, কিন্তু ৪০ মিলিগ্রাম পরিমাণ বিষেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। সাধারণ করাইতের বিষ গোখরার বিষ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক তীব্র; কিন্তু রঞ্জিত করাইতের (Banded Krait) বিষ ইহা অপেক্ষাও যোল গুণ অধিক শক্তিশালী

সাধারণের বিশ্বাস সাপুড়েরা বাঁশী বাজাইয়া বিষধর সাপ বশীভূত করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, সাপুড়ের বংশীধ্বনির পরিবর্তে তাহার বাঁশী, হাত বা হাঁটুর আন্দোলনই কেবল গোখরা সাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেই আন্দোলনের সহিত তাল রাখিয়া ইহারা ইতস্ততঃ ফণা সঞ্চালন করে। সর্পজাতির প্রকৃতি ও গতিবিধি উত্তমরূপে জানা থাকিবার ফলে সাপুড়েরা সুকৌশলে বিষধর সাপ ধরিয়া দক্ষতার সহিত খেলা দেখাইতে পারে। অভিজ্ঞতা, অভ্যাস এবং প্রধানতঃ ক্ষিপ্রতার জন্য সাপ তাহাদিগকে দংশন করিতে পারে না।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন—সাপ যখন ফণা বিস্তার করিয়া সোজা হইয়া ওঠে, তখন কৌশলক্রমে মাথার পিছন দিক শক্ত করিয়া ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেই একেবারে অসাড় হইয়া পড়ে। জুলিয়ান হাক্সলী ও এইচ. জি. ওয়েলস্ তাঁহাদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Science of Life'-এ লিখিয়াছেন—The Indian snake charmer knows that if a cobra is suddenly grasped behind the head and pressed on the back of the head, when it is in the threatening attitude, it becomes cataleptic and wax-like.

মেক্সিকো প্রদেশে এক জাতীয় রেড ইণ্ডিয়ান সাপুড়ে নিজেদের শরীরে পুনঃপুনঃ র‍্যাটেল সাপের বিষদাঁতের আঁচড় কাটিয়া অল্পে অল্পে সর্পবিষের টিকা লইয়া থাকে, ইহার ফলে তাহারা বিষ প্রতিরোধ করিবার এমন ক্ষমতা অর্জন করে যে, তখন আর বিষধর র‍্যাটেল তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

পৃথিবীর নানা দেশেই ধর্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্প-কলায় প্রতীকরূপে সর্পচিহ্নের প্রাধান্য বর্তমান। বিচিত্র গতিভঙ্গী, অদ্ভুত আকার, সুন্দর বর্ণ ও সাংঘাতিক বিষের জন্য সাপ প্রাচীনকাল হইতেই জগতের সকল দেশের জনসাধারণের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগাইয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাচীনকালে এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও সর্পপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। গ্রীস, মিশর, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সর্প-উপাসনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিষধর সর্পের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বোধ হয় এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই দেশে

প্রয়াগ, হরিদ্বার ও দাক্ষিণাত্যে একাধিক সর্পদেবতার মন্দির আছে। বাংলা দেশে এখনও প্রতি বৎসর ঘটা করিয়া মনসা দেবীর পূজা করা হয়। মহাভারতে পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞের কথা সকলেই পড়িয়াছেন। তন্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্পাকার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও রোগ নিরাময়ের প্রতীকরূপে এখনও সর্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফ্লোরোকার্বন

রমাপ্রসাদ সরকার

পর্যায়সারণীর সপ্তম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ্যালোজেন মণ্ডলীর পুরোবর্তী মৌল ফ্লোরিন তার উগ্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সগোত্রীয় অন্য তিনটি মৌল থেকে (ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন) উচ্চ আসন লাভ করেছে রসায়নবিদের চিন্তা-জগতে। এর বিক্রিয়াশীলতা আর বিস্ফোরণ-দক্ষতা দেখে একটি ছাত্র একদা সত্যই মন্তব্য করেছিল—"Fluorine is the wildest member of the group of hooligans"। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে ফ্লোরিনের সংযোগকালে যে উচ্চমাত্রার শক্তিপ্রবাহ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তারই ফলে সংঘটিত হয় এর দহন আর বিস্ফোরণ। কিন্তু বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর সাফল্য একদিকে যেমন উদ্দাম নদীপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, প্রকৃতির এই খেয়ালী মৌলটির উচ্ছ্বাসকেও তেমনি সংহত করেছে—তাকে প্রয়োগ করেছে মানবসভ্যতার উন্নততর রূপায়ণে। কার্বন বা অঙ্গারের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে ফ্লোরিন থেকে তৈরি হয়েছে ফ্লোরোকার্বন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বহু যৌগিক পদার্থ, যার স্বজাতির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে রসায়নবিদের গবেষণাগারে। আর সেই সঙ্গে এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র সুপ্রসারিত হয়ে উঠে এর উৎপাদন ক্ষেত্রকে বিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নল থেকে মুক্ত করে স্থান দিয়েছে রসায়ন-শিল্পের সুবৃহৎ উৎপাদন-আগারে।

কার্বন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে তৈরি হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে ফ্লোরিনের বিক্রিয়ায় হাইড্রোকার্বন থেকে কার্বনসংলগ্ন এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয় অপ্রতিহত-প্রভাব ফ্লোরিনের স্থান সংকুলান করতে। এক কক্ষ-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর দুর্বলতার সুযোগে ফ্লোরিন অধিকার করে নেয় তার জায়গা। কিন্তু ফ্লোরিনের অসংযত উচ্ছ্বাসে যে প্রভূত পরিমাণ তাপশক্তি উদ্ভূত হয় ($CH+F_2-CF+HF+103$ KCal) তার তীব্রতাকে সহ্য করতে পারে না নবজাত যৌগিক পদার্থটি; তাই সে নিরুপায় হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে। কিন্তু ফ্লোরিনের এই দুর্ধর্ষ প্রবৃত্তিকে দমন করে তাকে সৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন এই যুগের বিজ্ঞানীরা। এই ব্যাপারে তাঁরা যে সব সক্রিয় পন্থা নির্দেশ করেছেন, তা হলো এই—

(১) নাইট্রোজেনের মত একটি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় মৌলের সাহচর্যে ফ্লোরিন নিজের তীব্রতাকে বহুলাংশে সংযত করে নেয়। পারিপার্শ্বিকের নিষ্ক্রিয়তা এই ব্যাপারে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই কার্বন টেট্রাক্লোরাইড জাতীয় নিষ্ক্রিয় দ্রাবকের মাধ্যমে ফ্লোরিনকে সংযত করা সহজতর হয়ে ওঠে।

(২) কিন্তু শুধু দ্রাবকের মাধ্যমেই নয়, বাষ্পাকারেও নাইট্রোজেন-ফ্লোরিন জোটের সঙ্গে

জৈব যৌগের বিক্রিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হতে পারে না। এতে উত্তপ্ত (১০০°-২০০° সেন্টিগ্রেড) এবং সোনা বা রূপার আস্তরণ লাগানো তামার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে তাপ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তামা AuF_3 ও AgF_2 গঠনের (গোল্ড ফ্লোরাইড ও সিলভার ফ্লোরাইড) একটি পীঠস্থান হিসাবে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয় বলে বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনুমান করা হয় যে, AuF_3 বা AgF_2 বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবার ফলে ফ্লোরিন যে নবজন্ম গ্রহণ করে, তারই পরোক্ষ ফল হিসাবে তার বিক্রিয়া-বেগ যথেষ্ট শান্ত গতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(৩) তাই বলে শুধু তামাকেই এক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে একনায়কত্ব চালাবার অধিকার দেওয়া হয় নি। ২০০°-৩০০° সে তাপমাত্রায় কোবাল্টিক ফ্লোরাইডের (CoF_3) উপর দিয়ে জৈব যৌগটিকে বাষ্পাকারে সঞ্চালিত করেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে মূল বিক্রিয়াটি এই ধরণের :

$$R{-}H + CoF_3 = R{-}F + CoF_2$$
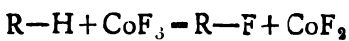
জৈব-যৌগ　　কোবাল্টিক ডাইফ্লোরাইড

কোবাল্টিক ডাইফ্লোরাইডকে ৩৫০° সে. তাপমাত্রায় ফ্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে কোবাল্টিক ট্রাইফ্লোরাইড পুনরুৎপাদনের সুযোগ এই পদ্ধতিতে রয়েছে।

(৪) বর্তমান যুগের অপরিহার্য উপকরণ তড়িৎ-শক্তিও ফ্লোরিনের উপর নিজের খবরদারী করতে ছাড়ে নি। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের মাধ্যমে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে জৈব অ্যাসিড, অ্যামিন, ইথার ইত্যাদির হাইড্রোজেনকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে। এতে ইস্পাতের বিশ্লেষণ-পাত্র ও নিকেলের তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করে ৬ ভোল্টের চেয়ে নিম্ন মানের তড়িৎ-শক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোন্ কৌশলে ফ্লোরিনের দাপট সংহত করা হয়, তা সঠিকভাবে জানা নেই। তবে ধরে নেওয়া হয় যে, অ্যানোডে নিকেলের একটি উচ্চতর ফ্লোরাইড তৈরি হয়ে আবার ভেঙে যায় নবরূপী ফ্লোরিনকে জন্ম দেবার সময়।

ফ্লোরিনকে সংবরণ করবার এত উপায় বের করেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিশ্চিন্ত হন নি। তাই ফ্লোরিনের সাহায্যে আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকার্বন তৈরি করবার আরও অনেক উপায় তাঁরা খুঁজে বের করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো Swart-এর বিক্রিয়া। এতে হাইড্রোকার্বনটির হ্যালোজেন-উপজাতকে কোন পঞ্চযোজী অ্যান্টিমনি হ্যালাইডের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করানো হয় অ্যান্টিমনি ট্রাইফ্লোরাইডের সঙ্গে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার অ্যান্টিমনি ট্রাইফ্লোরাইড ও হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের যৌথ সহযোগিতায়ও ফ্লোরিনভুক্তির কাজটি নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে। এই বিক্রিয়ার একটি অসাধারণত্ব এই যে, এর সাহায্যে কার্বন ছাড়াও অন্যান্য মৌলের ফ্লোরিন উপজাত তৈরি করা যেতে পারে। $SiClF_3$ ও $POClF_2$ এই ধরণের উপজাত যৌগেরই উদাহরণ।

কার্বনের সঙ্গে ফ্লোরিনের সমন্বয় সাধনের এই অপরিসীম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে উদ্ভাবিত হয়ে বহুবিধ ফ্লোরোকার্বন শিল্প-জগতে এসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই নতুন ধরণের যৌগগুলিতে ফ্লোরিনের সমস্ত চপলতা কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, সে নিজেকে নিয়োজিত করেছে মানবের কল্যাণসাধনে। সেখানে তার উত্তেজনা নেই, উদ্দামতা নেই, নেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্মিলিত হবার প্রবল তাড়না। বাস্তবিকই এর নিরাসক্তি রসায়ন-জগতে এক বিস্ময়ের সূচনা করেছে।

শৈত্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ফ্লোরোকার্বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ফ্লোরিনযুক্ত

ক্লোরোকার্বন, যাদের বলা হয় ক্লোরোক্লোরোকার্বন —এই ব্যাপারে যে ভূমিকা নিয়েছে, তা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। শিল্প-জগতে Freon নামে পরিচিত এই সমস্ত যৌগিক পদার্থের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ও অদাহ্যতার সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে আরও কতকগুলি আশ্চর্য গুণের। এরা বিষাক্ত নয়, স্বাদ ও গন্ধ কিছুই এদের নেই এবং এরা ক্ষয়কারী নয়। সেই সঙ্গে এরা যথেষ্ট স্থায়ী এবং এদের স্ফুটনাঙ্কও খুব কম। এই সমস্ত গুণের জন্যে বর্তমানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও শৈত্য উৎপাদন—এই দুই কাজেই Freon খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতিবছর ১,৩০,০০০ টনেরও অনেক বেশী Freon উৎপাদিত হচ্ছে।

ফ্লোরোকার্বনের সর্ববৃহৎ প্রয়োগ-ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে প্লাষ্টিকের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে অগ্রণী Polytetra-fluoroethylene (PIFE)-এর মধ্যে বহুবিধ বিপরীত গুণের এক আশ্চর্য সমাবেশ হয়েছে। ইথিলিনের চারটি হাইড্রোজেনকে ফ্লোরিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে প্রাপ্ত এই রেজিন অন্য যে কোন জটিল রেজিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উচ্চ বা নিম্ন যে কোন তাপমাত্রা, বিভিন্ন দ্রাবক, অম্ল, ক্ষার, জারক পদার্থ প্রভৃতির প্রতি এর অবিচলিত নিরাসক্তি আর সেই সঙ্গে এর উচ্চ ঘাত সহনশীলতা একে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি যান্ত্রিক কাজে অগ্রাধিকার এনে দিচ্ছে। এর ঘর্ষণাঙ্ক যেমন অত্যন্ত কম—প্রায় বরফের সমান, এর তড়িৎ-ধর্মও তেমনি অসাধারণ। এটিই একমাত্র প্লাষ্টিক, যার পরিবাহিতামুক্ত তড়িৎ-সঞ্চরণ ধ্রুবক (Dielectric Constant) তাপমাত্রা বা কম্পনাঙ্কের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। রান্নার পাত্র প্রভৃতিতে আস্তরণ দেওয়া থেকে সুরু করে বড় বড় গঠনমূলক কাজে এর প্রয়োগ এত বেড়ে উঠেছিল যে, আমেরিকা ও বৃটেনে এর সরবরাহ বেশ কিছুদিন ধরে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন রাখা হয়েছিল।

ফ্লোরোকার্বনগুলির মধ্যে এই PTFE-ই প্লাষ্টিক-জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম নয়। ফ্লোরিনের সঙ্গে দু-একটি ক্লোরিন পরমাণু মিশিয়ে দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনের উপযোগী বহু প্লাষ্টিকও তৈরি হয়েছে। ট্রাইফ্লোরোক্লোরোইথিলিন এই ধরণের একটি স্বচ্ছ প্লাষ্টিক। আবার হেক্সাফ্লোরোপ্রোপিলিন ও ভিনিলিডিন ফ্লোরাইড থেকে Viton-A নামে এক ধরণের রাবার জাতীয় জিনিষ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলি ৫০০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায়ও নিজেদের কর্মক্ষমতা হ্রাস করবে না। শব্দোত্তর গতিসম্পন্ন বিমান, রকেট এবং কয়েক ধরণের জেট ইঞ্জিনের বিভিন্ন কাজে এটি তাই খুব ব্যবহৃত হচ্ছে। Silastic L 5153 নামে আর একটি রাবারও জেট ইঞ্জিন এবং অন্যান্য কাজে খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

জল আর তেল প্রতিরোধের বিস্ময়কর ক্ষমতা থাকায় ফ্লোরোকার্বনের প্রয়োগ-ক্ষেত্র বিস্তৃততর হবার আরও সুযোগ পেয়েছে। তাই বর্ষাতি তৈরিতে এই ফ্লোরোকার্বন বেশ সহজেই নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে। এছাড়াও পিচ্ছিলকারী পদার্থ হিসাবে ফ্লোরো-এষ্টারের ব্যবহার হচ্ছে খুবই বেশী। ভারী ভারী যন্ত্রের বিয়ারিং-এ ৪০০°—৫০০° ফাঃ তাপমাত্রায় এসব ফ্লোরো-এষ্টার অবিকৃত থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফ্লোরোকার্বনের আর একটি বড় অবদান রয়েছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। এথেকে তৈরি ফিল্ম বর্তমানের যে কোন জিনিষের চেয়ে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও ফ্লোরোকার্বন তার বহুমুখী কার্যকারিতার পরিচয় দিয়েছে। ফ্লুওথেন নামে একটি নতুন চেতনানাশক পদার্থ বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি খুব দ্রুত কাজ করে অথচ এর কোন বিষক্রিয়া নেই। সর্বোপরি এই চেতনানাশক পদার্থটি বিস্ফোরক নয়। ফ্লোরিন-সংযুক্ত আরও কয়েকটি চেতনানাশক পদার্থ শীঘ্রই আবিষ্কৃত হতে চলেছে—যেগুলি বর্তমানে লভ্য চেতনানাশক

পদার্থগুলির চেয়ে অধিকতর উপযোগী হবে। ক্যান্সার প্রতিরোধেও কয়েকটি ফ্লোরোকার্বনের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

হ্যালোজন-মণ্ডলীর পুরোধা এই ফ্লোরিন নিয়ে বিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও শেষ হয় নি। এখনও গবেষণা চলছে—অনুসন্ধান চলছে, কেমন করে এই মৌলটিকে মানবের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করা যেতে পারে। চক্রাকৃতি জৈব-যৌগের অর্থাৎ গন্ধবাহী (Aromatic) পদার্থের ফ্লোরিন-উপজাত উদ্ভাবন এই সব পরীক্ষার সাফল্যেরই একটি দিক সূচিত করছে। বেঞ্জিনকে ফ্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবার সুযোগ দিয়ে বিক্রিয়াটিকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে ধাপে ধাপে—প্রত্যেক পর্যায়ে অধিকতর সংখ্যায় হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করছে ফ্লোরিন স্বয়ং। এই সকল নবজাত অণু থেকে ক্ষারের সাহায্যে কিছু হাইড্রোজেন ও সেই সঙ্গে কিছু ফ্লোরিনকে অপসৃত করে বিস্ময়কর গুণাবলী-সম্পন্ন রাবার ও প্লাষ্টিক তৈরির এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এই সকল ফ্লোরো-গন্ধবহ যৌগের (Fluoro-Aromatics) আরও ব্যবহার রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। অ্যানিলিন-ঘটিত রং, নাইট্রো-বিস্ফোরক, নাইলন, টেরিলিন, পলিষ্টাইরিন, অ্যাসপিরিন, হাইড্রাজিন প্রভৃতি অনেক কিছুর ফ্লোরিনঘটিত বিকল্প পদার্থ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

এই সব পদার্থের উৎপাদনের মধ্যে নিহিত তত্ত্বীয় দিকটিও বিজ্ঞানীর কাছে এক গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইলেকট্রন-আকর্ষণকারী ফ্লোরিন সমন্বিত এই সব যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়াশীলতার অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা বহু নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি অসম চক্রবিশিষ্ট (Heterocyclic) জৈব-যৌগগুলিতেও ফ্লোরিন হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করছে—এরূপ তথ্যও পাওয়া গেছে। এই ব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে সালফা ড্রাগের ফ্লোরিন-ঘটিত বিকল্প প্রস্তুত হয়ে ফ্লোরোকার্বনের অবদানকে আরও ব্যাপক করে তুলবে।

ফ্লোরিনের এই জয়যাত্রা নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করছে। ভূপৃষ্ঠের আস্তরণে যে বিপুল পরিমাণ ফ্লোরিন ছড়ানো রয়েছে, তার ব্যবহারের প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হয়েছে এসব ফ্লোরো-কার্বনের আবিষ্কারের মাধ্যমে। ফ্লোরোকার্বনের প্রস্তুতিতে দ্বিতীয় প্রয়োজন কার্বনের, যা আমরা প্রচুর পরিমাণেই পাবো তেল এবং কয়লা থেকে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধরণের শর্করাকেও ফ্লোরো-কার্বন উৎপাদনে সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সব সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্লোরিন যে বলিষ্ঠ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে, তা দেখে একজন মার্কিন বিজ্ঞানী যথার্থই বলেছেন—"Fluorine is a halogen on the move."

নিগ্রো বিজ্ঞান-সাধক জর্জ ওয়াশিংটন কারভার

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জর্জ ওয়াশিংটন কারভার এক ক্রীতদাস বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতামাতা উভয়েই ছিল মোজেস কারভার নামক এক বিরাট খামার মালিকের কেনা গোলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসৌরি ষ্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ডায়মণ্ড গ্রোভ নামক স্থানের নিকটেই ছিল এই খামার। শিশুর বয়স যখন মাসখানেক, তখন তাঁহার পিতাকে নিলামে কেনা হইয়াছিল।

তখন আমেরিকায় উত্তর ও দক্ষিণ ষ্টেটগুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। কারভারের খামারের অদূরেই ছিল যুদ্ধভূমি। ডায়মণ্ড গ্রোভও এই যুদ্ধের হানাহানি হইতে মুক্ত ছিল না। যে সকল আমেরিকান নিজেদের 'অখণ্ড মার্কিন'—এই নীতির সমর্থক বলিয়া প্রচার করিত, তাহাদের এক এক দল হানাদার হামেসা রাত্রির অন্ধকারে খামার আক্রমণ করিয়া দাসদের ভীতির সঞ্চার করিত এবং মুক্তি দিবার নামে তাহাদিগকে ছিনাইয়া লইত।

চন্দ্রলোকে উদ্ভাসিত এক শীতের রাত্রে হঠাৎ একদল হানাদার কারভারের খামার আক্রমণ করিয়া কয়েকজন ক্রীতদাসকে হরণ করিল। এই লুণ্ঠিতদের মধ্যে ছিল শিশু জর্জের মাতা—কোলের শিশুর বয়স তখন ছয় মাস মাত্র। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পথ কর্দমাক্ত—সমস্ত রাত্রি তুষারের মধ্যে চলিয়া শেষ রাত্রির কুয়াশায় হানাদারদের সহিত এই বন্দী ক্রীতদাসের দল মুসৌরি ষ্টেট অতিক্রম করিয়া আরকানসাস অঞ্চলে পৌঁছিল। পথের কষ্টে শিশুর মাতার মৃত্যু হইল, ছোট শিশুটি হানাদারের নির্মম হস্তের বোঝা হইয়া পড়িল।

মোজেস কারভারের প্রতিনিধি হানাদারদের অনুসরণ করিয়া ইতিমধ্যে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শিশুটি ঘুংড়ি কাশিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, কখন ইহার মৃত্যু হইবে নিশ্চয়তা ছিল না। কারভারের প্রতিনিধি দুই শত ডলার মূল্যের একটি দৌড়ের ঘোড়ার বিনিময়ে শিশুকে ফিরাইয়া চাহিল। ঘোড়ার ঘুংড়ি কাশির সম্ভাবনা ছিল না, রুগ্ন শিশুর বাঁচিয়া থাকাও অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় হানাদারেরা বিনিময়ে রাজী হইয়াছিল। শিশুকে কারভারের খামারে ফিরাইয়া আনা হইল।

গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) শেষে আমেরিকার নিগ্রো দাসের মুক্তি ঘোষিত হইল; কিন্তু অল্প-সংখ্যক খামারের মালিক মানবতা সুলভ সহানুভূতির প্রেরণায় তাহাদের সহায়হীন আশ্রিত দাসদের প্রতি দায়িত্ব বিস্মৃত হইতে পারিল না। নিঃস্ব কারভার পরিবার ছোট শিশুটির লালন-পালনের ভার লইয়াছিল এবং যে পর্যন্ত এই শিশু আশ্রয় পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত গৃহে স্থান দিয়াছিল।

এই ছোট শিশু গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজে সাহায্য করিত। এই কর্মনিষ্ঠা ও সাধুতার জন্যই শিশুটি জর্জ প্রভু পরিবার হইতে জর্জ ওয়াশিংটন কারভার এই পূর্ণ নামটি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

জর্জ প্রাতঃকালে ঘরের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই খামার ও বনের মধ্যে যেন কিসের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত! কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ সুরু হইবার পূর্বেই সে ফিরিয়া আসিত। আবার বৈকালের দিকে বনে-জঙ্গলে যাইত। কেহ বুঝিত না—বনে-জঙ্গলে এই বালক কি খেলা খেলিতে যায়!

পরবর্তী কালে কারভার বলিয়াছেন—"যখন আমি ছোট্টটি ছিলাম, আমার জ্ঞানাকাঙ্খা ছিল অফুরন্ত। বনবাদার আমার ভাল লাগিত। প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড, গাছপালা প্রত্যেকটি পশু, পোকা-মাকড় এবং প্রাণী সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হইত। আমার একটি গোপন উদ্যান ছিল, সেখানে আমি রুগ্ন গাছের চিকিৎসা করিতাম এবং গাছগুলিকে নতুন জীবনে উজ্জীবিত করিতাম।"

জীবনের প্রথম দশ বৎসর এই বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর নীল মলাটের Webster's Spelling Book ছিল একমাত্র শিক্ষার পুস্তক। জঙ্গলে একটি গাছে ফোকর কাটিয়া উহার মধ্যে সযত্নে বইখানি রাখা হইত। জর্জ বনের ফুল, লতাগুল্ম, শ্যাওলা প্রভৃতি এই অদ্ভুত পুস্তক আধারের নিকট আনিত এবং বিপুল আগ্রহে বইয়ের পাতার মধ্যে তাহার সংগৃহীত দ্রব্যগুলির বর্ণনার জন্য শব্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। কোন স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এই পুস্তকের প্রত্যেকটি শব্দ তাহার সম্পূর্ণ শেখা হইয়া গিয়াছিল।

নিকটেই কয়েক মাইল দূরে, মুসৌরি অঞ্চলেই নিয়োসো সহরে কাঠের এক কামরায় এক পাঠশালা ছিল। শিক্ষা-ক্ষুধাতুর জর্জ সেই স্থানে গিয়া পড়িবার জন্য মনিবের নিকট প্রার্থনা জানাইল। গৃহযুদ্ধের শেষে মোজেস কারভারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় চাষের সহায়ক দশ বৎসর বয়স্ক এই বালককে ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে ছিল খুবই লোকসানের ব্যাপার। কিন্তু সে এই বালকের উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি করিল না। কেবল মাত্র বলিল—বড়ই দুঃখের বিষয় আমি তোমাকে কোন আর্থিক সাহায্য করিতে পারিব না। ক্ষুদ্র বালক সাহসের সহিত বলিল—আমি কাজ করিতে পারি, আমি রোজগার করিয়া পড়িব।

বৃহৎ পৃথিবীতে বালক বাহির হইয়া পড়িল। ছোট সহর নিয়োসোতে যখন এই রুগ্ন বালক হাঁটিয়া প্রবেশ করিল—এক হাতে Spelling Book আর এক হাতে বস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র পুটুলী—তখন তাহার মনে ভয় হইল। এত ঘোড়া, এত গাড়ী, এত মানুষ এই সহরে! রাস্তার পাশের বাড়ী ঘেঁষিয়া খালি পায়ে সে পথ চলিতে লাগিল। অবশেষে এক ছোট নীচু জামার দোকানের উপর এক খড়ের গুদামে ঘুমাইবার স্থান জোগাড় করিল। যখন সে নরম খড়ের উপরে শুইয়া পড়িল, তখন তাহার মনে হইল, জীবনে পূর্বে কখনও সে এরূপ দুর্বলতা অনুভব করে নাই। নতুন স্থানের উন্মাদনায় তাহার ক্ষুধার উদ্রেক বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরদিন সকালে যখন ঠাণ্ডার মধ্যে ক্ষুৎপীড়িত অবস্থায় জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার খেয়াল হইল—এতক্ষণ সে কিছুই খায় নাই এবং খাবার চেষ্টাও করে নাই।

স্কুলে পড়া ছিল একটা মজার জিনিষ। লাজুক, আগ্রহশীল-চোখ, সদা-হাস্যমুখ এই নিগ্রো বালক ছোট ছোট কাজের রোজগার হইতে পেটের অন্ন এবং গায়ের বস্ত্রের সংস্থান করিত। খামারে থাকিবার সময় যেমন খুব প্রত্যুষে উঠিয়া বনে-জঙ্গলে অনুসন্ধানে যাইত, এখানেও সেরূপ কাজে ও স্কুলে যাইবার পূর্বে তাহা চলিতে লাগিল। স্কুলের পড়ার কাজ শেষ করিয়া চিঠি লাগাইত, দোকান ঘর ঝাঁট দিত, জুতা পালিশ করিত। সহরের দয়ালু লোকেরা তাহাকে

যে কোন কাজ দিত, সে তাহাই করিত। এক বৎসরের মধ্যে এই এক কুঠুরীর কাঠের ঘরের স্কুলের মাষ্টার যে শিক্ষা দিতে পারে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিল, কিন্তু তাহার জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিল না—তাহার আরও জ্ঞান চাই।

সে সুযোগ একদিন সকালে জুটিল। জর্জ একটি নূতন বাগান তৈয়ার করিয়াছিল। সেখান হইতে সহরে ফিরিয়া রাস্তায় পায়চারি করিতেছে, এমন সময়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি এক খচ্চরের টানা গাড়ীতে তাহাকে কিছুদূর লইয়া যাইতে রাজী হইল। লোকটি ছিল কান্‌সাস ষ্টেটের অন্তর্গত ফোর্ট স্কট নামক স্থানের যাত্রী। দূরত্ব ৭৫ মাইল। জর্জ তাহার সহিত ফোর্ট স্কটে যাইতে চাহিল, কারণ সেখানে একটি হাই স্কুল ছিল। যাত্রীটি তাহাকে সঙ্গে নিতে রাজী হইলে জর্জ অবিলম্বে তাহার গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, কারণ তাহার নিজের তল্পিতল্পা বলিতে বিশেষ কিছুই ছিল না, যাহার জন্য সে অপেক্ষা করিবে। অনাথ বালক চলিল নূতনের সন্ধানে নিয়োসোর দিকে, আর ফিরিয়াও চাহিল না।

ফোর্ট স্কটের এক পরিবারে রান্না, বাসন মাজা এবং ঘর তদারকের এক চাকুরী লইয়া জর্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। 'কিছু না হইতে কিছু তৈয়ার করিবার' বিরাট প্রচেষ্টা এবং সাধনা জর্জ এই সময় সুরু করে। তাহার জীবনের আরম্ভ দাসত্বের মধ্যে। গায়ে খাটিয়া তাহাকে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান—এমন কি, নিজের নাম অর্জন করিতে হইয়াছে। এখন নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন আরম্ভ হইল।

সাত বৎসর পরে জর্জ এই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। শিক্ষার তখনও অনেক বাকী। Webster's Spelling Book-এ তাহার শিক্ষা আরম্ভ, এক-কুঠুরী কাঠের ঘরের মধ্যে পরবর্তী শিক্ষা, কিন্তু আসল শিক্ষা সে পাইয়াছে প্রকৃতির কাছে—মাঠে ও বনে। এই সময় তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর।

স্কুলের পড়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই রুগ্নদেহ লোকটির শরীরের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল। এককালের রোগা শিশু দুই বৎসরের মধ্যে ছয় ফুট লম্বা সুস্থ সবল যুবকে পরিণত হইয়াছিল।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া জর্জ পূর্ব মনিবের আশ্রয়ে ফিরিয়া গিয়াছিল। কারণ ইহাই ছিল তাহার আপনার গৃহ। কারভার পরিবার গৌরবের সহিত বলিত—এই সময় তাহাকে কেবল পাকশালার কাজে নিযুক্ত থাকিবার ফলেই এরূপ শারীরিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। জর্জ যখন খামারে কাজ করিত, তখন তাহাকে তাহার মাতার ব্যবহৃত একটি পুরাতন চরখা দেওয়া হইয়াছিল। এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন সে অতি যত্নের সহিত নিজের কাছে রাখিত। বহুদিন পরে তাঁহার এক বন্ধু বলিয়াছেন যে, পুরোহিত যেমন ভক্তি সহকারে বেদী স্পর্শ করে, জর্জ তেমনই শ্রদ্ধার সহিত মাতার এই চরখা স্পর্শ করিত। হয়তো প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে এই চরখাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া তবে শয্যা গ্রহণ করিত।

নীল মলাটের ছোট স্পেলিং বইখানি, এক কুঠুরীর নিয়োসোর পাঠশালা ও ফোর্ট স্কটের উচ্চ বিদ্যালয় তাহার জ্ঞানের ক্ষুধাকে ক্রমান্বয়ে ক্ষুরধার করিয়া তুলিয়াছিল। অর্থের সম্বল তাহার মোটেই ছিল না। কিন্তু সে মোটেই নিরুৎসাহ হইবার নহে। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, 'কিছু না হইতেও কিছু করা যায়'।

কারভারের খামারের কাজের অবসরে গ্রীষ্মের সময় জর্জ আইওয়া কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন পাঠাইল। তাহার আবেদন গৃহীত হইল এবং নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইল। কলেজে ভর্তি

হইবার সময় প্রায় আগত, কোন খবর না পাইয়া জর্জ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে চিঠি আসিল, তাহার ভর্তির আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

আইওয়া সহরে পৌঁছাইলে রেল টিকিট প্রভৃতি কেনায় তাহার হাতের প্রায় শেষ কপর্দকটি ব্যয় হইয়া গেল। কি আনন্দ, আজ সে উচ্চ শিক্ষার জন্য এক নূতন সহরে আসিয়াছে! মনে মনে কল্পনা করিল, একটা ধোপার দোকান করিয়া সে পড়িবার খরচ চালাইবে।

যুবক জর্জ গৃহে প্রবেশ করিতেই কলেজের অধ্যক্ষ (ডীন) মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। হঠাৎ একটি বিমর্ষের ম্লানিমা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—"হাঁ জর্জ ওয়াশিংটন কারভারের পরীক্ষার উত্তর পত্র পাওয়া গিয়াছে, সে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কলেজে নিগ্রো ভর্তি করা হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই জিনিষটা আমাদের বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই।"

জর্জ ওয়াশিংটন কারভার দুঃখের হাসি হাসিল—তাহাতে বিক্ষোভের চিহ্ন মোটেই ছিল না। বলিল—"হাঁ, তাহার নিজেরই ভুল হইয়াছে, আমার জাতির উল্লেখ করা উচিত ছিল।" একবারও বলিল না যে, সে কপর্দকশূন্য, নিঃস্ব, ক্ষুধার্ত। নম্রভাবে অভিবাদন জানাইয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল। তাহার ক্ষুদ্র দ্রব্যাদির ছোট ঝুলিটি সে বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা হাতে লইয়া স্থান ত্যাগ করিল। তাহার আশা পূর্ণ না হওয়ায় সে নিশ্চয়ই হতাশ হইয়াছিল, কিন্তু পরাজয় মানিল না—যে কলেজে নিগ্রো ভর্তি করে, সে সেই কলেজে পড়িবে।

এক বৎসর ধরিয়া নানা কাজ—রাঁধুনীর কাজ, কার্পেট পরিষ্কারের কাজ প্রভৃতি করিবার পর সে আইওয়া ষ্টেটের ইণ্ডিয়ানোলা নামক স্থানের সিম্পসন কলেজে ছাত্ররূপে প্রবেশ করিল। কলেজের প্রবেশিকা ফি এবং একটি ধোলাই ঘর বা লণ্ড্রির সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যয় নির্বাহের পর তাহার হাতে রহিল মাত্র দশ সেন্ট।

প্রায় এক সপ্তাহ অর্ধাহারে কাটিবার পর তাহার দোকানে কাজ আসিতে লাগিল। ভদ্র, মিষ্টভাষী এই নিগ্রোর বন্ধু জুটিতে লাগিল। বন্ধুরাই তাহাকে কাজ আনিয়া দিত। এইরূপে সিম্পসন কলেজে তাহার তিনটি মূল্যবান বৎসর কাটিয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইওয়া সেন্ট কলেজে ভর্তি হইলেন। অতীত জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব কলুষিত করে নাই। তিনি ছিলেন জনপ্রিয়—কেবল সরলতা ও সহৃদয় বন্ধুত্বের জন্য নহে, তাঁহার নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও যোগ্যতার জন্যও বটে। তিনি ভাল গান গাহিতে এবং পিয়ানো বাজাইতে পারিতেন। এই জন্য কলেজের ঐক্যতান-নাট্যশালায় তাঁহার আদর ছিল খুবই। আবার চিত্র অঙ্কনেও ছিল তাঁহার খুব পাকা হাত। ছবি আঁকিবার খেয়াল তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই অভ্যাস তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে সহায়ক হইয়াছিল।

আইওয়া ষ্টেট কলেজ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এস্-সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ রসায়ন বিভাগে তাঁহাকে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেন। আরও দুই বৎসর পরে এখান হইতে তিনি এম. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। এখানে শিক্ষকতা করিবার সময় এই নিগ্রো রাসায়নিক এবং শিক্ষাব্রতী তাঁহার সহকর্মী এক শিক্ষকের পুত্রকে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেনরী ওয়ালেস।

ইতিমধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন কারভারের যোগ্যতার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিগ্রো জাতির কর্মবীর বুকার টি. ওয়াশিংটন

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আলাবামার টাস্কিজি ইনষ্টিটিউটে কৃষি-রসায়নের শিক্ষকরূপে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইলেন। এই নিগ্রো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ষোল বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। কারভার এখানে কৃষি-রসায়ন বিভাগ খুলিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। এক পূর্বতন দাস-মালিকের প্রদত্ত ভূমিতে একমাত্র শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মাত্র ৪০টি নিগ্রো ছাত্র লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে একটি ছোট স্কুলরূপে স্থাপিত হয়। নিগ্রোদের মধ্যে স্থাপিত গীর্জার পাশের জমিতে এক ভাঙ্গা চালাঘরে যে স্কুলের জন্ম, আজ তাহার জমির পরিমাণ ২০০০ একর, পাকা বাড়ীর সংখ্যা ১০০ এবং তহবিলের পরিমাণ ২ কোটি ডলার এবং ছাত্রসংখ্যা ১৫০০-এর উপরে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বুকার ওয়াশিংটনের পক্ষে কারভারকে মোটা চাকুরীর লোভ দেখাইবার কোন সামর্থ্য ছিল না। নিতান্ত জাতির সেবাকার্যে তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বুকার ওয়াশিংটন নিজে ছিলেন জাতির সেবক, কাজেই এই মহৎ কার্যে তাঁহার সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। কারভার এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন এবং ভগবৎ-নির্দিষ্ট এই মহৎ কাজে চিরজীবনের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

দুই বৎসর এখানে কাজ করিবার পর বিদায় লইয়া কারভার আইওয়া ষ্টেট কলেজে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিবার জন্য যোগদান করিলেন। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর ফিরিয়া আসিয়া বাকী জীবন টাস্কিজিতে কাটাইয়াছিলেন।

বুদ্ধি, চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা কিরূপে গবেষণাগার তৈয়ার সম্ভব, টাস্কিজির এই ইন্‌ষ্টিটিউটটি তাহার এক অদ্ভুত নিদর্শন। এখানে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না এবং তাহা ক্রয় করিবার অর্থও ছিল না। ডাঃ কারভারের মত উপযুক্ত লোক ঠিক জায়গায় আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের কাজই ছিল 'কিছু না হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা'।

তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রগণের কাজ ছিল, ক্লাসের সময়ই টাস্কিজির অলিগলির আবর্জনার মধ্যে দরকারী জিনিষ খুঁজিয়া বেড়ান। খালি বোতল, পরিত্যক্ত টিন বা কৌটা, ছেঁড়া তার এবং ফেলে দেওয়া সকল জিনিষই ছিল তাহাদের নিকট দরকারী। এই সকল তুচ্ছ দ্রব্যাদি হইতেই গবেষণাগার প্রস্তুত সুরু হয়। বহুদিন পরে অবশ্য গবেষণাগারটি অর্থের বিনিময়ে নূতন উপকরণ ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তক্তার বেঞ্চিতে বসিয়া পরিত্যক্ত এসেন্সের শিশি টেষ্ট টিউবরূপে ব্যবহার করিয়া ডাঃ কারভার যেরূপ আনন্দ পাইতেন, এরূপ বোধ হয় কেহ পায় নাই।

গবেষণার উপকরণ থাকুক আর না থাকুক, জরুরী সমস্যার সমাধানে অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ স্টেটগুলির শ্বেত ও অশ্বেত (নিগ্রো) লোকদের জীবনে এক ভয়ানক বিপদের মেঘ দেখা দিয়াছিল। তুলার চাষই ছিল তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। একদিকে তুলার ফলন কমিয়া গিয়াছিল; অন্যদিকে একপ্রকার তুলাকীট (Boll-weevil) বাকী তুলা ধ্বংস করিতেছিল।

ডাঃ কারভার এই সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করিলেন—যেন তাঁহার গবেষণার ত্রুটিতেই এই অনাচার বা বিপর্যয় ঘটিতেছে! শৈশব হইতেই তাঁহার অভ্যাস ছিল ভোর ৪টায় শয্যাত্যাগ এবং তাহার পর গাছ ও ফুলের সন্ধানে বনে বনে ভ্রমণ। এখন তিনি তুলার ক্ষেতে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। তুলাগাছ এবং বাল্‌তি বাল্‌তি মাটি সংগ্রহ করিয়া গবেগণাগারে আনা তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইল। সহরের উপকণ্ঠে ১২ একর জমিতে তুলার বদলে অপর কোন নূতন ফসলের চাষই ছিল তাঁহার পরীক্ষার বিষয়। দিবারাত্র বিরামহীন পরিশ্রম চলিয়াছে—তাঁহার গবেষণা

সার্থক হইয়াছে। এইবার তিনি সকলকে জানাইবার মত কিছু বলিবেন।

এদিকে খামারের মালিকেরা অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছিল—আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করুন, তুলার কীট আমাদের সর্বনাশ করিল।

এক সাধারণ সভায় ডাঃ কারভার ঘোষণা করিলেন—"মিঠা আলুর (Sweet potato) চাষ করুন, আরও ভাল হয় যদি চীনাবাদামের (Peanut) চাষ দেন।" টাস্কিজি ইনষ্টিটিউটের প্রচারপত্র চতুর্দিকে বিতরিত হইতে লাগিল।

কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক খামারের মালিক তাঁহার উপদেশমত কাজ করিল। ডাঃ কারভার ১২ একর জমির চাষের সফলতা সম্পর্কে জোর প্রচার করিতে লাগিলেন। এই জমিতে পূর্বের মালিক তুলার চাষ করিত এবং প্রতি একরে পাঁচ ডলার লোকসান দিয়া চাষ ছাড়িয়া দিয়াছিল। পরের-বৎসরই ডাঃ কারভার এবং তাঁহার ছাত্রেরা ইহাতে মিঠা আলুর চাষ করিয়া ৭৫ ডলার লাভ করে। তার পরের বৎসর চীনাবাদামের চাষে ১৫০ ডলার লাভ হয়। ১২ বৎসরের আবর্তিত চাষের (Crop rotation) ফলে এবং সার প্রয়োগের দ্বারা এই জমিতে প্রতি একরে ৫০০ পাউণ্ড তুলা জন্মাইতে পারা গেল। এক একরে এক গাঁট তুলা (বেল—৫০০ পাউণ্ড) উৎপাদনের ফলে দক্ষিণ স্টেটগুলিতে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

ডাঃ কারভার কৃষকের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াই কাজ শেষ করিতেন না, নিজে জমির মাটি ঘাঁটিতেন। 'আপনি আচরি কর্ম অপরে শেখান' ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। কয়েকজন চাষী (Farmer) চীনাবাদামের (তাহাদের ভাষায় গুবার বলা হইত) বেশী করিয়া চাষ দিল, ফলে জমির উৎপাদনশক্তি বাড়িতে লাগিল। দক্ষিণ দেশের খামার মালিকদের আয় বাড়িয়া চলিল।

ইহাতে আবার এক বিপদের সূচনা হইল। চীনাবাদামের উৎপাদন খুব বাড়িয়া যাওয়ায় দাম পড়িয়া গেল—ক্রেতার অভাব হইল। এখন আর জমির দোষ দেওয়া যায় না। এই নূতন সমস্যার জন্য ডাঃ কারভার নিজেকে দোষী মনে করিলেন। তাঁহার জন্যই তো চীনাবাদামের বেশী উৎপাদন হইয়াছে! তাঁহাকেই এই নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

এখন তিনি চীনাবাদাম লইয়া নূতন গবেষণায় মগ্ন হইলেন। নিজে ছিলেন একজন ভাল রাঁধুনী—পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ইহার দ্বারা কত রকম নূতন খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। চীনাবাদামে খাদ্যপ্রাণ-এ এবং বি উভয়ই বর্তমান। তিনি নিজে চিত্রশিল্পী ছিলেন, পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, ইহার দ্বারা রং-প্রস্তুত সম্ভব কি না।

প্রথমে বারোটি, পরে পঞ্চাশটি নূতন দ্রব্য চীনাবাদাম হইতে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেন। চীনাবাদামের চাহিদা বাড়িল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গবেষণাগারে চীনাবাদাম হইতে একশতটি নূতন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইল। পরে ১৫০টি এবং শেষ পর্যন্ত ৩০০টি নূতন দ্রব্য চীনাবাদাম হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি মিঠা আলু লইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা হইতে পূর্ণ ভোজের সবগুলি—কফি হইতে মধুরেণ সমাপয়েৎ পর্যন্ত সমস্ত পদগুলি এই মিঠা আলু হইতেই প্রস্তুত করা সম্ভব হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) আমেরিকায় গমের অভাবে "গমহীন" দিন পালন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় ডাঃ কারভার মিঠা আলু হইতে ময়দা প্রস্তুত সম্বন্ধে গবেষণা করেন। মিঠা আলুর ময়দা প্রস্তুত হইলে টাস্কিজির ছাত্রদের মধ্যে ইহার প্রথম পরীক্ষা হয়। এই নূতন ময়দা ডাঃ কারভার মার্কিন সরকারের সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন

এবং সরকারও ইহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন লাভের প্রত্যাশা করেন নাই।

এই নীরব বৈজ্ঞানিক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। তাঁহার কোন আবিষ্কার তিনি পেটেন্ট করেন নাই। যে কেহ তাঁহার আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। কেহ মূল্য দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন।

এক সময় চীনাবাদামের চাষে এক প্রকার পোকার উপদ্রব দেখা দেয়। খামারের মালিক-গণ নমুনা পাঠাইলে ডাঃ কারভার পরীক্ষা ও গবেষণার পর উহার প্রতিবিধানের পথ দেখাইয়া দেন। কৃতজ্ঞ মালিকেরা ডাকযোগে তাঁহাকে একখানি মোটা অঙ্কের চেক পাঠাইয়া দেন এবং পত্রযোগে আরও অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ডাঃ কারভার তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত এই চেক ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ভগবান যদি চীনাবাদাম সৃষ্টির জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে আমি কেন ইহাকে পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য মজুরী লইব? ইহাই ছিল তাঁহার অদ্ভুত যুক্তি।

ডাঃ কারভার সরলভাবে জীবনযাপন করিতেন। গবেষণাগার হইতে দেড় মাইল দূরে দুইটি ছোট কুঠুরী ছিল তাঁহার বাসগৃহ। একটি আল্পাকার কোট—তাহাও নানাস্থানে ছিন্ন, নিজ হাতে তালি দেওয়া—তাঁহার দেহের আবরণ ছিল। নিজের জুতা নিজেই মেরামত করিতেন। সেই ছেলেবেলায় অভ্যাস—খুব প্রত্যুষে বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ এবং গাছপালা সংগ্রহ—তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন। সংগৃহীত গাছগাছড়া লইয়া ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। বনের ফুল-লতাগুল্ম-প্রেমিক এই নিগ্রো বিজ্ঞানীকে কোন মেয়ে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই—তিনি ছিলেন অকৃতদার।

আলাবামার ডোথান নামক নগণ্য স্থানটি ছিল চীনাবাদাম চাষের প্রধান কেন্দ্র। ১৯০০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩০০০ মাত্র। ১৯৩৭ সালে স্থানটির সমৃদ্ধি বাড়িয়া জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২০,০০০। ১৯০০ সালে চীনাবাদামের উৎপাদন হইত প্রায় ৫০ টন। ইহা বাড়িয়া ডোথানের আশেপাশে ৭৫.০০০ টন উৎপন্ন হইতে লাগিল—নগণ্য চীনাবাদামের ফসল এক বিরাট কৃষিপণ্যে পরিণত হইল।

যে মধ্যবয়সী সরল জীবন বিজ্ঞানী-শিক্ষাব্রতীর চেষ্টায় কৃষিবিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল, লোকে তাঁহাকে ধীরে ধীরে চিনিয়াছিল। ১৯২৩ সালে ডাঃ কারভারকে Spingarn Medal দ্বারা সম্মানিত করা হয়। আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে যাঁহার অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই এই বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

মিঠা আলু এবং চীনাবাদাম সম্পর্কিত নানা রকম আবিষ্কারের জন্য আমেরিকায় ডাঃ কারভারের নাম ছড়াইয়া পড়ে। দক্ষিণ স্টেটগুলিতে কেবল আলু ও চীনাবাদামের চাষ করিলেও হয়তো চলিতে পারিত; কিন্তু ডাঃ কারভারের ইচ্ছা—চাষের আবর্তনের (Rotation of crops) দ্বারা যাহাতে আরও ভাল এবং বেশী তুলা হয়—তুলার চাষ একেবারে পরিত্যক্ত না হয়।

তুলাকে আরও কি কাজে লাগাইতে পারা যায়, এই বিখ্যাত রসায়নবিদ্ সেই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। রাস্তা নির্মাণের কাজে অ্যাস-ফাল্টে তুলার দড়ির টানার দ্বারা লোহার শিক ব্যতীতই কিরূপে জমাটের (Concrete) কাজ করা যায়, তাহা আবিষ্কার করেন। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন ঋতুর ঠাণ্ডা ও উত্তাপে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে রাস্তার ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস পাইল।

কৃষির যাহা কিছু ফেলা যায় বা পরিত্যক্ত হয়, তাহা লইয়াই ছিল ডাঃ কারভারের গবেষণা। তিনি তুলার গাছ হইতে নকল রবার, চীনাবেরীর (জামবিশেষ) ছাই হইতে পটাশ, পপ্লার

গাছের ছাল হইতে রেশম এবং পরিত্যক্ত কাঠের টুক্‌রা হইতে নকল পাথর বা মার্বেল প্রস্তুত করেন।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগারের আকর্ষণ ছাড়াও এই বৃদ্ধ লোকটির ছবি আঁকিবার ঝোঁক কিছুমাত্র কমে নাই। চীনাবাদাম ও মিঠা আলু হইতে তিনি বহু রং আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও আলাবামার কাদামাটি হইতে ছবি আঁকিবার বহু গুঁড়া রং তৈয়ার করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা নিজেও ছবি আঁকিতেন।

তিনি স্মৃতি হইতে ছবি আঁকিতেন। একটি ফুলদানিতে মনের মত ফুলগুলি সাজাইয়া সামনে রাখিতেন এবং কিছুক্ষণ পরে সরাইয়া ফেলিতেন, পরে আর কখনও দেখিতেন না। সেই দিনই বা কয়েক সপ্তাহ পরে—এমন কি, কয়েক মাস পরে সেই ফুলগুলির ছবি আঁকিতেন। একবার এক বন্ধুকে একটি গোলাপ ফুলের ছবি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ফুলগুলি তিনি ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলেন, যদিও ছবি আঁকা হইয়াছে একমাস আগে।

মিশরের পিরামিডে যে খাঁটি নীল রং ব্যবহৃত হইয়াছে, আলাবামার পাহাড়ের সাধারণ মাটি হইতে তিনি সেরূপ রং প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইহাও 'কিছু না হইতে কিছু প্রস্তুতের' অন্যতম নিদর্শন। ভগবৎ অনুগ্রহেই তাঁহার পক্ষে সকল আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

টাস্কিজি ইনষ্টিটিউটের সীমানার মধ্যে এবং উহার কার্যেই তাঁহার জীবন কাটিয়াছিল। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে কদাচিৎ এই সীমার বাহিরে গিয়াছেন। ১৯৩০ সালে এক ঐতিহাসিক কারণে বাহিরে গিয়াছিলেন Howley Sinoot Bill সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে। আমেরিকার কৃষিপণ্যকে রক্ষা করিবার জন্য এই বিলের খসড়ায় বিভিন্ন শস্যের উপর উচ্চ আমদানী শুল্ক প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণী চীনাবাদাম চাষী মালিকদের আন্দোলন সত্ত্বেও এই পণ্যের উপর কোন আমদানী করের প্রস্তাব ছিল না। বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্বে সাক্ষ্য গ্রহণ মাত্র বাকী ছিল। ডাঃ কারভার সাক্ষ্য দিতে রাজী হইলেন। প্রত্যেক সাক্ষীর জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট ছিল, এক মিনিটও বেশী দিবার ব্যবস্থা ছিল না। ডাঃ কারভার সর্বশেষে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। কমিটির সভ্যেরা তখন খুবই অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন—কেহ ঝিমাইতেছেন, কেহ করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। চীনাবাদাম সম্পর্কে Ways and Means কমিটির মতামত যেন ঠিক হইয়া গিয়াছেন, আর কিছু ভাবিবার নাই।

যখন পুরাতন কোট-প্যান্ট পরিহিত এই বৃদ্ধ নিগ্রো সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলেন, তখন দুই তিন জন মাত্র কমিটির সভ্য মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তাঁহার কোটের বোতামের ঘরে একটি সদ্যতোলা লাল গোলাপ শোভা পাইতেছিল। নিজের তৈয়ারী চীনাবাদাম হইতে প্রস্তুত জুতার কালিতে নিজের হাতে পালিস করা চক্‌চকে জুতা ছিল তাঁহার পায়ে।

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—'আমি আমার সৃজনকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান তুমি কি জন্য চীনাবাদাম সৃষ্টি করিলে? তারপর নিজেই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে লাগিলাম।'

যখন বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন কমিটির সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেছিলেন, কিন্তু বক্তৃতা চলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা থামিয়া গেল। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ হইল। অর্ধ-নিদ্রিত সভ্যেরা শুনিবার জন্য মাথা তুলিলেন। বক্তা চীনাবাদামের অদ্ভুত কাহিনীর বাস্তব চিত্র সাদা কথায় সভ্যদের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। নির্ধারিত সময় ১৫ মিনিটের এক মিনিট থাকিতেই

তিনি বসিয়া পড়িলেন—সকলে নীরব। সকলের চোখই ছিল এই প্রবীণ নিগ্রোর দিকে।

একজন কংগ্রেস সভ্য দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—'মহাশয়, বলুন বলুন, আরও বলুন। সকলেই আরও শুনিতে চাহিলেন, বলিয়া উঠিলেন—'বলুন, বলুন।' ডাঃ কারভার ধীরে ধীরে উঠিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল চোখে যে হাসিটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সভ্যগণ আরও প্রীত হইলেন। চীনাবাদাম হইতে যত কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অদ্ভুত ইতিহাস বলিলেন। বলিলেন তাঁহার প্রথম লেবরেটরির আশ্চর্য কাহিনী।

বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট ছিল ১৫ মিনিট, কিন্তু কমিটির সভ্যগণ দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই দক্ষিণ স্টেটের প্রতিনিধি ডাঃ কারভারের বক্তৃতা শুনিলেন এবং যখন বিল আইনে পরিণত হইল, তখন দেখা গেল চীনাবাদাম রক্ষণ শুল্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণ স্টেটে শিক্ষিত নিগ্রোকেও কেহ প্রীতির চোখে দেখিত না। কিন্তু ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কারভার বৃদ্ধ বয়সেও নিগ্রো এবং শ্বেত উভয়ের নিকট সম্মান পাইয়াছিলেন। বনেদি সাদা আমেরিকানরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, ডাঃ কারভারের দৃষ্টান্ত সকলের অনুসরণ করা উচিত। একজন সাহিত্যিক লিখিয়াছিলেন যে, খুবই আশ্চর্য একজন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাস দক্ষিণ স্টেটগুলির এক বৃহৎ অংশকে দাসত্বমুক্ত করিল।

খুব সরলভাবে জীবনযাপন করিয়া তিনি এক লক্ষ ডলারের কিছু বেশী সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অর্থের প্রতি লোভবশতঃ টাকা জমান নাই। এডিসন ফাউণ্ডেসন তাঁহাকে বার্ষিক বেতন দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালে একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহার ৭০,০০০ ডলার মারা যায়। কেহ এই ক্ষতির উল্লেখ করিলে তিনি হাসিয়া বলেন 'আমার মনে হয়, অপর কেহ আমার চেয়ে এই টাকার সদ্ব্যবহার করিয়াছে।' কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কর্মই ছিল তাঁহার জীবন, জীবনই কর্ম।

নিজের কোন মোটর গাড়ী ছিল না, যদিও আমেরিকায় মজুরেরও অনেক সময় নিজের গাড়ী থাকে। মাথার টুপি (হ্যাট) ছিল একটি মাত্র। হাঁটিয়া চলিতেন, কারণ চলিবার সময় অনেক কিছু দেখা যায়। নানা ধরণের অদ্ভুত কোট, প্যাণ্ট, মাথার হ্যাট মিলিয়া তাঁহার ছিল এক অভিনব পোষাক। একবার ১৯৩১ সালে, যখন তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর, বন্ধুরা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাউন এবং টুপি পরিতে বাধ্য করিয়াছিলেন—টাস্কিজি ইন্‌স্টিটিউটে তাঁহার সম্মানার্থে একটি ব্রোঞ্জ ফলকের উন্মোচন উপলক্ষ্যে।

অতি কষ্টে তিনি এই সম্মেলনের এক কোণে বসিয়াছিলেন। সকলের বক্তৃতা শেষ হইলে দেখা গেল, তিনি অস্থিরভাবে এক হাতে পাখার আড়ালে হাওয়া খাইতেছেন। তাঁহাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেও তিনি নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে অতি কষ্টে গাউন সামলাইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'এই সকল পোষাক আমি কখনও পরি নাই, আর কখনও পরিব না।' আর কিছু না বলিয়া হাতপাখার হাওয়া করিতে করিতে লেবরেটরিতে চলিয়া গেলেন এবং চীনাবাদামের ছাই হইতে পটাস প্রস্তুতের পরীক্ষার যাহা বাকী ছিল, তাহা শেষ করিলেন।

ডাঃ কারভার সকলকে ভালবাসিতেন এবং মানুষের প্রতি তাঁহার প্রেম ছিল অপরিসীম। কিন্তু অপচয়, আলস্য এবং অলস-কৌতুহলী মানুষ দেখিলে তাহার আতঙ্ক হইত। এই পক্বকেশ বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিতেন—'কৌতুহলের দ্বারা ক্ষতি হয়, যদি ইহা নূতন জ্ঞান অর্জনের সহায়ক না হয়। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আকাঙ্খা ফলপ্রসু করিতে হয়।'

১৯৩৯ সালে ডাঃ কারভারকে রুজভেল্ট স্মৃতি-

পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার পরের বৎসর নিজের উপার্জিত শেষ কপর্দকটিও টাস্কিজি ইনষ্টিটিউটের Carver Creative Research Laboratories-এ দান করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগার নির্মাণে মোট দুই কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছিল—বিভাগের সংখ্যা ছিল আটটি। একটি বিভাগে শিশু-পক্ষাঘাত রোগের ব্যবস্থা আছে। ডাঃ কারভার চীনাবাদাম হইতে একপ্রকার তৈল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা পক্ষাঘাতের এক প্রধান ঔষধ।

মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি এত কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার জন্য কোন মূল্য—এমন কি, কোন পুরস্কার লইতে নারাজ ছিলেন। কেহ প্রশংসা করিলেও তাহা তিনি অপছন্দ করিতেন।

এককালের রুগ্ন শিশু যাহাকে এক অশ্বের বিনিময়ে কেনা হইয়াছিল, তাহার জীবনের বহু দুঃখ, দৈন্য এবং বাধাবিঘ্নের ইতিহাস অনেকেরই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বমানবের হিতার্থে তিনি যে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন মানুষের উপকারে আসিবে। নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া প্রতিদানে কিছুই চান নাই—এমন কি, একটি ধন্যবাদেরও প্রত্যাশা করেন নাই। এমন সোনার মানুষ ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন কারভার। প্রাচীন কালে জন্মিলে তিনি 'ঋষি' আখ্যা পাইতেন।

১৯৪৩ সালের ৫ই জানুয়ারী সাধনার কর্মভূমি টাস্কিজিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সয়াবিন

নলীগোপাল মুখোপাধ্যায়

সয়াবিনের গাছ একপ্রকার ভেসজ উদ্ভিদ। এই গাছগুলি বেশী বড় হয় না। সয়াবিনকে বাংলা দেশে গেঁড়ি বা গৌরী কলাই বলে। চীনদেশে ইহার জন্ম। ডাক্তারীতে বলে গ্লাইসিন বা গ্লাইকল। রাসায়নিক সার পদার্থ হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসেটিক অ্যাসিড। ইহাতে ছানা বা আমিষজাতীয় (Protein) উপাদান সর্বাপেক্ষা বেশী। এই গাছগুলি ত্রিপত্রবিশিষ্ট। আমার বাগানে অনেক চেষ্টায় দুটি মাত্র গাছ জন্মিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বীজ বোনা চলে। কার্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে ইহার শুঁটি পাকে। মাটি তৈয়ারির সময় একরপ্রতি একশত মণ গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিলে ভাল হয়। পরে গাছ একটু বড় হইলে একরপ্রতি দেড় মণ সুপার-ফসফেট সার দেওয়া দরকার। ইহা শুঁটিজাতীয় গাছ—এই জন্য নাইট্রোজেনঘটিত সার দিবার প্রয়োজন নাই। জমি প্রস্তুত হইলে দুই ফুট দূরে দূরে সারি তৈয়ার করিতে হয়। প্রতি সারিতে এক-হাত অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। একরপ্রতি ৭॥০ সের বীজই যথেষ্ট। বীজ বপনের ২১ দিন পর প্রথম নিড়ান দিতে হয়। ছিটাইয়া বোনাও চলে—তাহাতে একরপ্রতি দশ সের বীজ লাগে। গাছ ৯ ইঞ্চি বড় হইলে দ্বিতীয় বার নিড়ান দিতে হয়। গোড়ায় মাটি দিলে ভাল হয়। ফসল উঠিবার পর মাটিতে যে খড় ও শিকড় পড়িয়া থাকে, তাহাতে বেশ নাইট্রোজেন থাকে। একই জায়গায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ২।৩ বৎসর চাষ করা চলে। পুরাতন গ্রন্থিসহ শিকড়যুক্ত গাছ চাষ দিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। ইহা গরু-মহিষের ভাল দুগ্ধ-বৃদ্ধিকারী খাদ্য।

ইহার বহু জাত আছে। মণ হিসাবে একরপ্রতি বিভিন্ন জাতের উৎপাদন নিম্নলিখিত প্রকার

দেখা গিয়াছে :—(১) মামোতান ২৪'১৯, (২) একাডিয়া ১৯'৩১, (৩) *উন্নত ধরণের পেলিক্যান ১৬'৮২, (৪) বিলোক্সী ১৬'৫০, (৫) ৫-এফ ১৬'৫৪, (৬) ট্যানার ১২'৩৭, (৭) প্যালমেট্টো ১২'২০, (৮) চিরোকু ১১'৮৩, (৯) সি. এন. এস ১১'৭১, (১০) সেমিনোল ৯'৩৬, (১১) জ্যাকসন ৮'৭৪ (১২) লী ৮'৬৯, (১৩) ইয়েল নন্দ ৭'২১, (১৪) কাষ্ঠহরিদ্রা ৪'৪১। মোটামুটি ফলন একরপ্রতি ২০ হইতে ৩০ মণ। ইহাদের দানা হলুদ, সবুজ, বাদামী বা কালো রঙের হয়। নিজের ভিতরই পরাগ জন্মে। উন্নত ধরণের সয়াবিনের মধ্যে বড় সাদা, বড় মালি, সবুজ এবং কে-১৬ প্রধান। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে সাধারণতঃ ফসলের ক্ষতি হয় না।

মানুষের দেহকোষের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতেছে ছানা বা আমিষজাতীয় পদার্থ। আমাদের প্রধান প্রধান খাদ্যে নানাপ্রকার উপাদান থাকে। নিম্নের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, খাদ্যের মধ্যে সয়াবিনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে দেহের চর্বি কমিয়া দেহকে বেশ হাল্কা ও প্রফুল্ল করে।

	সয়াবিন	গো-দুগ্ধ	গুঁড়া-দুধ	চাউল	গম	চিনাবাদাম	ডাল
১। ছানা জাতীয়	৪৩'২	৩ ৩	৩৫'৬	৬'৭	১২'১	২৬'৭	২২'৩
২। চর্বি „	১৯'৫	৩ ৬	১'০	০'৭	১'৭	৪৮'৭	১'৭
৩। শর্করা „	২০'২	৪'৮	৫২'০	৭৭'৪	৭২'২	২০'৩	৫৭'২
৪। লৌহ „	১১'৫	০'২	—	১'৯	৭'৩	—	৮'৮
৫। চুন „	০'২৪	০'১২	—	০'০১	০'০৪	—	০ ১৪
৬। লবণ „	০'৬	৪'৭	—	—	—	—	—
৭। ফস্‌ফরাস	০'৬৯	০'০৯	—	০'১৬	০'৩২	—	০'২৬
৮। প্রতি শত গ্র্যামে তাপ-মূল্য	৪৩২	৬৫	৩৫৯	৩৪৩	৩৫৩	৬১৬	৩৩৩

আন্তর্জাতিক এককে প্রতি শত গ্র্যামে ভিটামিন-এ সয়াবিনে আছে ৭১০, গরুর দুধে আছে ১৮০ এবং ভিটামিন-বি সয়াবিনে আছে ৩০০ এবং গরুর দুধে মাত্র ১১। এই দুই প্রকার ভিটামিনের বিচারেও সয়াবিনের দুধ হইতেছে শ্রেষ্ঠ। অপুষ্টিজনিত রোগে শিশুদের এবং রক্তের চাপ, বহুমূত্র ও অতিরিক্ত ওজন কমাইতে সয়াবিনের শক্তি অসাধারণ।

সয়াবিন হইতে শতকরা প্রায় ১৮ ২০ ভাগ পর্যন্ত তেল পাওয়া যায়। রান্নার জন্যও এই তেল ব্যবহৃত হয়। তেল হাল্কা হরিদ্রাভ বলিয়া অন্য তেলের সঙ্গে সহজেই মিশ্রিত করা চলে। রং, সাবান, বার্নিশ এবং কলকব্জা পরিষ্কার করিবার কাজে এই তেল ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন ও তাহার আনুসঙ্গিক উপাদান হইতে প্লাষ্টিক, লিনোলিয়াম, কৃত্রিম রবার, শিরিষের আঠা, সার বিশোধক, অয়েল ক্লথ, ছাপার কালী, জল-নিরোধক তন্তু, ঔষধের তেল এবং সিমেন্ট ও তন্তুজ দ্রব্যের জল-নিরোধক পদার্থ প্রস্তুত হয়। চর্বি ও নকল মাখন (Margarine) এই তেল হইতে প্রস্তুত হয়। এই তেলের দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা।

সয়াবিনের দুধের দই ও পানীয় আমেরিকায় উপাদেয় খাদ্য। সয়াবিন কলাই সামান্য একটু ভাজিয়া উপরের খোসা ছাড়াইবার পর যাঁতায় পিষিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়। এই ময়দা হইতে রুটি ও লুচি করা হয়। চীনদেশে দুধ, দই, আচার, চাট্‌নি, সস্ (Sauce) প্রভৃতি সয়াবিন হইতে প্রস্তুত হয়। সয়াবিন বিশেষ গুরুপাক নহে। দুই ভাগ সাধারণ ময়দার সহিত এক ভাগ সয়াবিনের ময়দা মিশাইয়া নানাপ্রকার

মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করা চলে। নুড্ল (Noodles), ঝোল (Soup), মিষ্টান্ন, আইসক্রীম গুঁড়া, প্রাতর্ভোজনের জন্য খাদ্য, মাংসের প্রসাধক (Extender) সয়াবীনের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার অঙ্কুর, জলে ভিজান দানা এবং গন্ধী মশলার গুঁড়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিনের কাঁচা বীজকোষগুলি তরকারী হিসাবে কুটিয়া অতি উপাদেয় খাদ্য তৈয়ার হয়।

দুধ প্রস্তুত করিতে হইলে সয়াবিনের কলাই ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তখন একটু ডলিয়া লইলেই বাহিরের খোসা পৃথক করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়। নরম দানাগুলি নিঙাস করিয়া শিলে বাটিতে হয়। এই পিষ্ট লেই (কাই বা গোলা—paste) কিছু কিছু করিয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া সাধারণ দুধের ন্যায় তরল হইলে ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই দুধে ফেনাও হয়। ১৫।২০ মিনিট ফুটাইয়া লইলে দুধে বেশ সরও পড়ে। দুধে কাঁচা ডালের ন্যায় একরকম গন্ধ হয়। তেজপাতা দিয়া জ্বাল দিলে এই গন্ধ অধিকাংশই দূরীভূত হয়। গোলার ছিব্ড়া হইতেও বিবিধ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হয়। ছিব্ড়ার সহিত চিনি ও আটা মিশাইয়া ডালদা বা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে নারিকেল কোড়ার ন্যায় খাদ্য হইবে। ছিবার সহিত আটা ও চিনি মিশাইয়া চাপাটি করিয়া একটু ভাজিয়া লইলে মাছের ডিমের ন্যায় সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হয়। আমি প্রতিদিন এই খাদ্য খাইতেছি। ছিব্ড়ার সহিত আটা, লবণ, গোলমরিচ বা সরিষার গুঁড়া প্রভৃতি মিশাইয়া বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত হয়, অবশ্য তেলে একটু ভাজা দরকার। ঈষদুষ্ণ দুধে লেবুর রস দিয়া ছানা কাটা হয়। এই ছানার একরকম গন্ধ হয়। এই গন্ধ নিবারণের জন্য কিছু কলার নির্যাস (Essence of banana) দিলেই চলে। এই ছানা হইতে রসগোল্লা, জিলাপী, লেডিকেনি প্রভৃতি মিষ্টি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সর বাটিয়া বা দই মন্থন করিয়া মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করা চলে। দই প্রস্তুত করিতে একটু গাঢ় দুধই ভাল। দই অতি চমৎকার পড়ে। দইয়ের জন্য কিছু সাজা মিশাইয়া দিতে হয়। দইয়ে কোন গন্ধ হয় না এবং খাইতে সাধারণ দইয়ের মত। তবে একটু চিনি মিশাইয়া দই পাতিতে হয়। আমি প্রত্যহ এই দই খাইয়া থাকি। জ্বাল দিয়া ও ঘুটিয়া দিলে দুধ হইতে ক্ষীর প্রস্তুত হয়। ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। তবে কিছু চিনি মিশাইয়া লওয়া দরকার। ক্ষীর হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, পিঠা, ক্ষীরপুলি, সন্দেশ, পায়স প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। অল্প ব্যয়ে ও সামান্য পরিশ্রমে বহু বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন এই দুধের বিশেষত্ব। বর্তমানে দার্জিলিং প্রদেশে এই সয়াবিন জন্মে এবং কলিকাতার নিউ মার্কেটে বেনেতি (মুদি) দোকানে প্রতি কিলো সয়াবিন দেড় টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। কাঁচা সয়াবিন একটু বড় আকারের বরবটির ন্যায়। শ্যামবাজারে শীতকালে পাওয়া যায় তরকারীর দোকানে। এক ভদ্রলোক সয়াবিন গুঁড়াইবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র বর্তমানে ব্যবহার করিতেছে—যন্ত্রের নাম তিনি দিয়াছেন "মিল্ক-বিন"। মানুষের দুধে L-fucose নামক দুষ্প্রাপ্য শর্করা বর্তমান। গরুর দুধে তাহা নাই। সয়াবিনে তাহা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

সঞ্চয়ন

পেঁপের চাষ

পেঁপের আদি বাসস্থান গ্রীষ্মমণ্ডলস্থিত মধ্য আমেরিকায়। বর্তমানে পৃথিবীর গ্রীষ্ম ও উপগ্রীষ্ম মণ্ডলের প্রায় সর্বত্রই পেঁপের চাষ হয়ে থাকে। খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে পেঁপের প্রথম আবির্ভাব হয়।

প্রচুর ফলন এবং পুষ্টিমূল্যের জন্যে পেঁপের নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। চাষআবাদের কাজে পেঁপের চাষে যে পরিমাণ লাভ হয়, তার তুলনা হয় না। উন্নত কৃষির সমর্থক চাষীরা বছরে ১ হেক্টার জমি থেকে কেবলমাত্র পেঁপের চাষেই ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। আমাদের দেশের সর্বত্র—এমন কি, দার্জিলিং জেলায় ৪,০০০ ফুট উচ্চতায় পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পেঁপের চাষ করা যেতে পারে। পাকা পেপে অতি উপাদেয় এবং এতে শর্করা ও হজমকারী কিণ্ব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। শুধু তাই নয়, এতে খাদ্যপ্রাণ-ক ও গ বেশ ভাল পরিমাণেই থাকে।

কাঁচা পেঁপেতে দুধের মত যে সাদা রস থাকে, তাকে পেপেইন বলে। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য-বস্তু জীর্ণ করবার অসাধারণ রাসায়নিক ক্ষমতা এর আছে। আমাদের দেশে মাংস সুসিদ্ধ করবার জন্যে কাঁচা পেঁপের টুক্‌রা দেওয়া হয়। কাঁচা পেঁপের পেপেইন এখানে মাংসকে সিদ্ধ করতে সাহায্য করে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কাঁচা পেঁপের গুঁড়া বা টুক্‌রা টিনে বদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এই কাজের জন্যে। এই কিণ্ব পদার্থটি পেঁপে থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এক মাত্র পেপেইন উৎপাদনের জন্যেই পেঁপের চাষ শিল্পভিত্তিক হতে পারে। পেপেইন উৎপাদন সহজ, এর বাজার মূল্য বর্তমানে প্রতি কিলো ৪২.৮ টাকা।

পেঁপের চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ না করবার প্রধান কারণ হচ্ছে—বেশী উৎপাদনের দরুণ বাজার মূল্য কমে যাওয়া। কাজেই কলিকাতা ও অন্যান্য বড় সহরের ফল বা কাঁচা সব্‌জি সরবরাহ করবার সঙ্গে যদি পেপেইন উৎপাদন গ্রাম্য পদ্ধতিতেও করা হয়, তবে কাঁচা বা পাকা পেঁপের বাজার মূল্য কিছু কম পেলেও কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু যে কোন ফসলের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে লাভ হবে।

পেঁপের শিকড়গুলি মোটা, রসালো অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং সীমাবদ্ধ। কাজেই পেঁপে গাছের গোড়ায় জল জমলে মরে যায়। জলনিকাশী দোআঁশ অথবা বেলে দোআঁশ মাটি খুবই উপযোগী। শিকড় ১ হাতের বেশী গভীরে যায় না, কাজেই পাহাড়ী অঞ্চলে সামান্য মাটি থাকলেও পেঁপের চাষ করা সম্ভব। যে সব মাটি গভীর এবং যাতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ আছে, বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পেঁপে চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পেঁপে বেশ ভাল ভাবে জন্মায়। ভালভাবেই খরা সহ্য করতে পারে, কিন্তু ঝড়ো বাতাস এবং মাটিতে জমে যাওয়া জল সহ্য করতে পারে না।

ব্যাপক চাষের ফলে খাঁটি জাতের পেঁপের বীজ পাওয়া দুষ্কর; কারণ কাছাকাছি বিভিন্ন জাতের পেঁপে উৎপাদন করলে মৌমাছির দ্বারা পরাগ নিষেকের ফলে মিশ্রণ হতে বাধ্য।

আমাদের দেশে প্রচলিত নামি জাতের মধ্যে

লম্বাটে ধরণের ওয়াশিংটন এবং প্রায় গোলাকার হানিডিউ পেঁপে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সিলোন এবং সিঙ্গাপুরের জাতও প্রচলিত আছে। পেঁপে গাছ সাধারণতঃ তিন রকমের হয়ে থাকে। পুরুষ গাছে কেবলমাত্র পুরুষ ফুলই হয় এবং তাতে কোন ফল ধরে না। স্ত্রী গাছের ফুল পরাগ নিষিক্ত হয়ে ফল হয় এবং ফলের জন্যে কেবলমাত্র স্ত্রী গাছেরই প্রয়োজন। এছাড়া উভলিঙ্গ গাছও থাকে, উৎপাদনের দিক থেকে যার কোন মূল্য নেই। পেঁপের বীজের দ্বারাই চারা তোলা হয়, কিন্তু ফুল না ফোটা পর্যন্ত গাছ স্ত্রী, পুরুষ অথবা উভলিঙ্গ হবে কিনা, তা কখনও বলা যায় না। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ওয়াশিংটন জাতের শতকরা ৬০টি স্ত্রী গাছ, শতকরা ২০টি পুরুষ এবং শতকরা ২০টি উভলিঙ্গ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বাগানের বীজ থেকে পেঁপের চারা তুললে স্ত্রী গাছ অর্থাৎ ফলবান গাছের সংখ্যা শতকরা ৪০-৬০টি হতে পারে। এই কারণেই পেঁপের চারা বসাবার সময় প্রতি গর্তে দুটি করে চারা লাগাতে হয়। চারা বসাবার সাত মাস পরে যখন সমস্ত গাছে ফুল ফুটে যায়, তখন সমস্ত স্ত্রী গাছ এবং শতকরা ১০টি পুরুষ গাছ রেখে বাকী পুরুষ এবং উভলিঙ্গ গাছ তুলে ফেলা হয়।

উঁচু বীজতলায় যেভাবে সব্জির চারা তৈরি করা হয়, সেভাবেই পেঁপের চারা করতে হবে। এক বিঘৎ অন্তর লাইনে দু-আঙ্গুল দূরে দূরে এক আঙ্গুল গভীর করে বীজ বপন করতে হয়। মাটির উপরে কিছু খড় বিছিয়ে দিলে মাটি সহজে শুকিয়ে যেতে পারে না। বপন করবার পরেই ঝরণা দিয়ে জল দিতে হবে এবং বৃষ্টির দিন ছাড়া ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক দিন জল দিয়ে যেতে হবে। ১৫-২০ দিনের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়ে চারা বেরিয়ে আসবে। শীতের দিনে কয়েক দিন বেশী সময় লাগে। প্রায় ২ মাস পরে চারা যখন ১ বিঘৎ কি তার চেয়ে কিছু বেশী লম্বা হবে, তখন তাদের জায়গামত বসানো চলবে। বীজতলা থেকে চারা ওঠাবার আগে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিলে চারা সহজে তোলা যাবে। এক হেক্টারের উপযোগী চারার জন্যে বীজতলায় ২১০-২১৫ গ্র্যামের মত শুকনো বীজ বসাতে হবে।

আষাঢ় মাস পেঁপের চারা বসাবার উপযুক্ত সময়। যে উঁচু জমিতে পেঁপের চারা বসানো হবে, তাকে গভীরভাবে হাল এবং মই দিয়ে সমান করে তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির সময়ই হেক্টার প্রতি ২৮ টন ভালভাবে পচানো গোবর বা যে কোন জৈব সার মাটির সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

পাঁচ-ছয় হাত দূরে দূরে সারিতে ½ হাতখানেক গর্ত করে দুটি করে চারা মেঘলা দিনে বসাতে হয়। মেঘলা দিনে আবহাওয়া শীতল হবার দরুণ গাছ সহজে ঢলে পড়ে না এবং লেগে যায়। অন্যথায় বিকেলের দিকে চারা বসানো ভাল। চারা বসাবার সময় মাটি যথেষ্ট আর্দ্র থাকা প্রয়োজন।

অনেক সময় খামারের রাস্তার দুধারে কিংবা বাড়ীর সীমানায় চারা বসানো হয়। সেই সব ক্ষেত্রে হাতখানেক গভীর গর্ত করে এক ঝুড়ি জৈব সার মিশিয়ে মাটি তৈরি করে রাখতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অন্য জায়গা থেকে চারা এনে বসানো হয়। চারা ১ বিঘতের বেশী লম্বা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চারা বেশী লম্বা হলে তাকে খাড়া রাখবার জন্যে কাঠি বেঁধে দিলে ভাল হয়।

চারা লেগে যাবার পর তার গোড়ায় মাটি সেচের সুবিধার জন্যে থালার আকারে একটু গভীর করে রাখতে হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী, সেখানে গোড়ায় মাটি দিয়ে তাকে ঢালু করে থালার আকারে দিতে হয়। জল নিকাশের দিকে

লক্ষ্য রাখা উচিত। কিছুদিন বাদে বাদে প্রয়োজনমত হাত নিড়ানি অথবা চক্রবিদ দিয়ে মাটি খোঁচানো এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে হয়।

পেঁপে গাছ যদিও ১৫-২০ বছর বাঁচতে পারে, তবুও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গাছ ৪-৫ বছরের বেশী রাখা উচিত নয়। যেহেতু ১ বছরের বেশী জমিতে থাকে, সেহেতু যে সব জৈব সার গাছ দীর্ঘকাল ধরে গ্রহণ করে তাদের ব্যবহার করা চলে। গাছ প্রতি ½—১ কিলো হাড়ের গুঁড়া বছরে দুবারে প্রয়োগ করা চলে, বর্ষা এবং শীতের স্বরুতে। অনেক সময় খোলও প্রয়োগ করা হয়; এই সঙ্গে এক ঝুড়ি করে জৈব সার প্রয়োগ করা ভাল। সার প্রয়োগের পরিমাণ স্থানীয় কৃষিকর্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করাই উচিত। পুরুষ গাছগুলির জন্যে সার প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। সার প্রয়োগের পরেই বৃষ্টি না হলে সেচ দিতে হবে।

সাত মাসে গাছে ফুল এসে প্রায় ১ বছরে ফল তোলবার উপযোগী হয়। এই সময়ের মধ্যেই কাঁচা পেঁপে তুলে পাতলা করে দেওয়া ভাল—যাতে বাকীগুলি পুষ্ট হয়ে পাকতে পারে। হেক্টার প্রতি ১১০০ গাছের মধ্যে পুরুষ গাছ বাদ দিয়ে যদি ১৫০০ গাছ ২০ কিলো করেও ফল দেয়, তাহলেও ৩০ টন ফল পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এর দ্বিগুণ ফলন পাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

পেঁপে ফলের দুধের মত সাদা রস শুকিয়ে পেপেইন তৈরি হয়। পুষ্ট বড় আকারের সবুজ এবং মজবুত ধরণের ফল, যার বয়স প্রায় ৩ মাস হয়েছে—সেগুলি থেকেই রস সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ হাতীর দাঁতের বা বাঁশের ছুরি অথবা ঐ জাতীয় অধাতব পদার্থ দিয়ে ফলের গায়ে ১ আঙ্গুল দূরে দূরে ৩-৪টি লাইনে অল্প গভীর করে চিরে দেওয়া হয়। এইভাবে ৪-৫ দিন অন্তর মোট ৫ দিন সকালে এই কাজ করা হয়। দুপুরের মধ্যেই রস সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়, পরে ভালভাবে শুকাবার জন্যে। প্রতি গাছ থেকে বছরে ⅛-¼ কিলো পর্যন্ত রস পাওয়া যেতে পারে। বৃষ্টি বা মেঘলা আবহাওয়ায় যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো যায়। পেঁপের শুক্‌নো রস এই অবস্থায় অথবা বিশুদ্ধিকরণের পর বাজারে বিক্রী করা হয়।

পেঁপে গাছের রোগ বা পোকার উপদ্রব বেশী নেই বললেই চলে। তবে এর মধ্যে গোড়া-পচা রোগ—জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা না থাকলে হয়ে থাকে। আক্রমণ বেশী হলে গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। ফলের গায়ে রোদ লাগাবার জন্যে অ্যানথ্যাকনোজ ছত্রাকের আক্রমণ হয়। ফল মোটা কাগজ অথবা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিলে আক্রমণ হতে পারে না। এছাড়াও বারগাণ্ডি মিশ্রণ * সিঞ্চন করেও উপকার পাওয়া যায়।

কুটেমারা পেঁপের একটি মারাত্মক ভাইরাস রোগ। আক্রান্ত গাছ নজরে পড়া মাত্র সম্পূর্ণ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পৃথিবীর বাজারে পেপেইনের প্রচুর চাহিদা আছে। আমাদের কাঁচা সব্জি এবং পাকা ফলের প্রয়োজনও কম নয়। পেপেইন রপ্তানী করে কিছু বিদেশী মুদ্রা আয় করা যায়। কাঁচা এবং পাকা পেঁপে বাজারে চালান দিয়ে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা আয়ের ব্যবস্থা খুব কম ফসলেই সম্ভবপর। দুঃখের বিষয় এপ্রিল '৬৪ থেকে জানুয়ারী '৬৫ পর্যন্ত আমরা পেপেইন বিদেশে চালান দিই নি, উপরন্তু ৮৫ কেজি আমদানী করেছি—প্রতি কেজির পিছনে ৪২.৮ টাকা হিসেবে বিদেশী মুদ্রা খরচ করে'। কাজেই পেঁপের চাষে মনোযোগ দেবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

---

* বারগাণ্ডি মিশ্রণ তৈরি করার পদ্ধতি—

তুঁতে ২ কিলো এবং কাপড়কাচা সোডা ২½ কিলো আলাদা মোট ২৫০ লিটার জলে গুলে নিয়ে মাটি, কাঠ অথবা কলাই করা পাত্রে তুঁতে গোলা জলে সোডার জল ঢালতে হবে এবং ঢালবার সময় একটা কাঠি দিয়ে গোলা জল নাড়তে হবে। তৈরি মিশ্রণ এবার গাছে দেওয়া যাবে।

ক্যান্সারের সঙ্গে ভাইরাস সংক্রমণের সম্পর্ক

কোন কোন ক্যান্সার কি মানুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমণের জন্যেই হয়ে থাকে? যদি তাই হয়, তাহলে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। কারণ ভাইরাস রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা হলো এমন একটি ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা কাজ হতে পেরেছে এবং এখনও হচ্ছে।

কেউই এখনও নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি যে, মানুষের কোন একটি ক্যান্সার রোগ ভাইরাস থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ততঃ দু-রকমের ক্যান্সার, যেমন—লিউকেমিয়া এবং চোয়ালের টিউমার, যা আফ্রিকান শিশুদের মধ্যে বেশী দেখা যায়—ভাইরাসের আক্রমণে ঘটতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। একথা স্পষ্টভাবেই জানা গেছে যে, অনেক রকমের ক্যান্সারই ভাইরাস সংক্রমণের জন্যে হচ্ছে না এবং যদি তা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তবে জানতে হবে, তার আরও অনেক সম্ভাব্য কারণ আছে।

ভাইরাস কোন কোন ক্যান্সরের কারণ, একথা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই সব ক্যান্সার প্রতিরোধ করা, চিকিৎসা করা এবং সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তোলা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সম্ভব হবে অন্য যে সব ধরণের ক্যান্সার রয়েছে, তাদের প্রকৃতিও ভাল করে জানা যাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায়, বিশ্বের সর্বত্র ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২,১৭৫,০০০ এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তা বেড়ে হয় ২,৬২৩,০০০—বৃদ্ধির এই হার হয় শতকরা ২০ ভাগ। ক্যান্সার এখন বিশ্বে মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ, কার্ডিওভ্যাসকুলার বা হৃদ্‌রোগের পরেই তার স্থান। আজ ৫,০০০,০০০-এরও বেশী লোক ক্যান্সারে ভুগছে বলে জানা যায়। একের পর এক সংক্রামক রোগগুলি দূর হলে ক্যান্সারই প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগ বলে গণ্য হবে।

এই জন্যেই ক্যান্সারের কারণ সম্পর্কে কোন নতুন রকমের গবেষণা এবং চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন রকমের আশার কথা ব্যক্ত হলে তা পৃথিবীময় সাড়া না জাগিয়ে পারে না।

১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে ডাঃ গ্যাডিনো নেগরোনি ও ডাঃ ডেভিড আর. ইনম্যান উত্তর লণ্ডনে মিল্‌ হিল্‌-এর ইম্পিরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ ফাণ্ড্‌ লেবরেটরিতে কাজ করবার সময় যে সব শিশু নানা ধরণের লিউকেমিয়া রোগে ভুগছে, তাদের অস্থিমজ্জা থেকে প্রমাণিত ভাইরাস স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হন।

লিউকেমিয়া মাত্রেই হলো শ্বেত রক্তকোষের ক্যান্সার (Cancers of the white blood cells), যাতে অস্থিমজ্জার তন্তু, যা এই কোষ তৈরি করেছে অনিয়ন্ত্রিত কোষ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে—সব রকম ক্যান্সার টিউমারের ক্ষেত্রে যে ভাবে হয়ে থাকে—অতি দ্রুত কোষ উৎপাদন করে চলে।

এখনও প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি যে, অস্থিমজ্জার কোষগুলিতে যে ভাইরাস কণিকা পাওয়া গেছে,

তাই অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাবৃদ্ধির (যার ফলে লিউ-কেমিয়া উৎপন্ন হচ্ছে) প্রকৃত কারণ। ব্যাপারটি প্রমাণ করতে হলে প্রয়োজন হবে সেই কণিকা-গুলিকে বানর অথবা অন্য কোন জন্তুর দেহে সঞ্চারিত করবার এবং সেই সঙ্গে দেখা যাবে যে, কণিকাগুলি একই ধরণের টিউমার সৃষ্টি করেছে।

এমনও হয়তো সম্ভব (যদিও ক্রমশঃ তা নয় বলেই মনে হচ্ছে) যে, অস্থিমজ্জার কোষগুলির ভাইরাস লিউকেমিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তা রোগের কারণ নয়। উদাহরণস্বরূপ অনেক ক্ষেত্রেই টিউমারের কোষে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও তা টিউমার সৃষ্টির কারণ নয় বলেই জানা গেছে। এক্ষেত্রে একটা কথা হলো এই যে, অনেক দিন আগেই জানা যায় যে, ভাইরাস জন্তুর দেহে কোন না কোন রকমের লিউকেমিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

১৯৬৪ সালে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য জন্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে বোঝা গেছে যে, জন্তুর মধ্যে যে লিউকেমিয়া রোগ ঘটে, তা অনেক সময় ভাইরাস সংক্রমণেরই ফল।

লিউকেমিয়ার কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, আর এক রকমের ক্যান্সারের কারণ হলো এক রকমের ভাইরাস। এই ক্যান্সারটি হলো 'বার্কিটস টিউমার', যা আফ্রিকার শিশুর চোয়ালে ঘটতে দেখা যায়।

এর কারণ যে এক রকমের ভাইরাস, তা প্রথম শোনা যায় ডাঃ রবার্ট হ্যারিস ও তাঁর সহকর্মীরা যখন মিল্ হিল্ লেবরেটরিতে রোগের এপিডেমি-ওলজি পরীক্ষা করে দেখছিলেন তখন। আরও জানা যায় যে, এই ভাইরাসের বৃদ্ধি ও প্রসার উষ্ণ আর্দ্র এলাকাতেই সাধারণতঃ ঘটে থাকে।

কথাটা যে সত্য, তার প্রমাণ হলো রোগটি সাধারণতঃ নিম্ন এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, উচ্চতর বা শুষ্কতর এলাকায় তা প্রায় অজ্ঞাত।

রোগের বিস্তার সম্পর্কে যে মানচিত্রটি তৈরি হলো, তা কীটবাহিত রোগের মানচিত্রেরই অনুরূপ। এতেই মনে করা হলো যে, 'বার্কিটস্ টিউমার' এর কারণ হয়তো একটি ভাইরাস, বিশেষ করে ব্যাক্টিরিয়া যখন অনুপস্থিত এবং কীটের দ্বারা বাহিত হবার অন্য কোন কারণ যখন আর দেখা যাচ্ছে না।

এই ক্যান্সার রোগ দেখা গিয়েছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে গাম্বিয়া থেকে কঙ্গো পর্যন্ত ও পূর্ব উপকূলে সোমালিয়া থেকে মোজাম্বিকের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত। যে সব অঞ্চল ৫,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত, সেখানে এই রোগ একেবারেই দেখা যায় নি।

রোগবাহী কীট, যথা—সেট্‌সি মাছি ও মশা যেখানে দেখা গেছে, সেখানেই দেখা গেছে এই টিউমারের আধিক্য। কীটের অবস্থানের সঙ্গে টিউমারের অবস্থানের এই যে মিল, তা পরোক্ষ-ভাবে ভাইরাস মতবাদেরই সমর্থক।

ইঁদুরের শরীরে ২৩ রকমের ক্যান্সার সৃষ্টি করা গেছে এবং অন্য যত রকমের ক্যান্সার আছে তা উৎপন্ন করা গেছে অন্য সব জন্তুর মধ্যে (র‍্যাবিট ও ফেরেট প্রভৃতি)। তথাকথিত পলিওমা ভাইরাস (Polyoma virus) সঞ্চারিত করে। এই জন্তুগুলির মধ্যে যে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়, তা ভাইরাস সংক্রমণ-

জনিত সন্দেহ নেই এবং এই ক্যান্সারের ফলে দেখা দেয় টিউমার। টিউমারটি প্রায় সব সময়ই দেখা দেয় জন্তুটির চোয়ালে, ঠিক 'বার্কিট'স্ টিউমারের' মতই।

ভাইরাস মতবাদের আর একটি পরোক্ষ প্রমাণ হলো এই যে, এই রোগটি প্রায় সব সময়ই পাঁচ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, বয়স্কদের মধ্যে কদাচিৎ তার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। কন্ট্রোল মেকানিজমে ভাঙ্গন ধরবার ফলে কোষের উপর ক্যান্সারের যে আক্রমণ হয়ে থাকে, তার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না। কারণ এই ভাঙ্গন বেশী বয়সের জিনিষ। কিন্তু ভাইরাসের আক্রমণ এই সব বয়সেই সম্ভব, যখন শরীরে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠবার সময় পায় নি।

আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণ সম্প্রতি উপস্থাপন করেছেন লণ্ডনের মিডলসেক্স হস্পিটাল ও মেডিক্যাল স্কুলের ব্ল্যাণ্ড সাটন ইনষ্টিটিউটের ডাঃ মাইকেল এপস্টিন। এর বিশদ বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বার্কিট্স্ টিউমারের কারণ যখন সত্য সত্যই ভাইরাস সংক্রমণ বলে মনে করা হলো, তখন সেই ভাইরাসের সন্ধানে সচেষ্ট হবার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তখন পর্যন্ত তা অদৃশ্য হয়েই ছিল। ডাঃ এপস্টিন বার্কিট্স টিউমার থেকে কোষ নিয়ে তাথেকে টিস্যু কালচার করেছেন এবং আজ পর্যন্ত এই ধরণের একটি কালচারকে দশ মাস ধরে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং আর একটি কালচারকে পাঁচ মাস ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন।

টিস্যু কালচারে কোষের লক্ষণাদি পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলে স্পষ্টই দেখা গেছে ভাইরাস কণিকার উপস্থিতি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এই পরীক্ষা চালানো হয় এবং এই ভাইরাস কণিকা যে কোন জ্ঞাত ধরণের নয়, তাও এথেকে জানা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটা বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের সঙ্গে এক রকমের ভাইরাসকে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু রোগ হিসাবে বার্কিট্স্ টিউমার এখন সারানো সম্ভব। যাহোক, আসল কথা হলো এক রকমের ক্যান্সার যখন ভাইরাসের জন্যে ঘটতে পারে, তখন অন্য অনেক রকমের ক্যান্সারও ভাইরাসের জন্যে হতে পারে, একথা বিশ্বাস করা যায়। গবেষণা এখন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলেছে।

তরল ধাতুর প্রবাহ

অরুণকুমার বসু

কঠিন ধাতুপিণ্ডকে ঢালাই কারখানায় চুল্লীতে গলানো হয়। তারপর সেই তরল ধাতুকে ঢেলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ছাঁচের মধ্যে। গলিত ধাতু এই ছাঁচের ভিতর কঠিন হয়ে প্রার্থিত বস্তুটির রূপ নেয়। আপাতদৃষ্টিতে কাজটি সহজ মনে হয়—ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়া হলো, আর ধাতুটিও যেন অত্যন্ত সহজভাবেই ছাঁচের ভিতর প্রার্থিত বস্তুটির রূপ নিল। কিন্তু কাজটি অত সহজ নয়। ধাতু যখন জলের মত তরল হয়, তখনই তাতে নানা জটিলতা দেখা যায়। যেমন ধরা দেখা যাবে যে, গলনাঙ্কে তার আয়তন হঠাৎ বেড়ে যায় এবং তারপরই আবার অন্য এক হারে আয়তনের সঙ্কোচন সুরু হয়। এই সঙ্কোচন-প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে, যে পর্যন্ত ছাঁচের তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রার সমান না হয়। ইস্পাতে এই সঙ্কোচনের মাত্রা অনেক বেশী। তাছাড়া এই যে আয়তনের সঙ্কোচন হচ্ছে, সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে; যেমন—ঢালাইয়ের সময়কার তাপমাত্রা ও ধাতুটিতে অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ ইত্যাদি। তরল
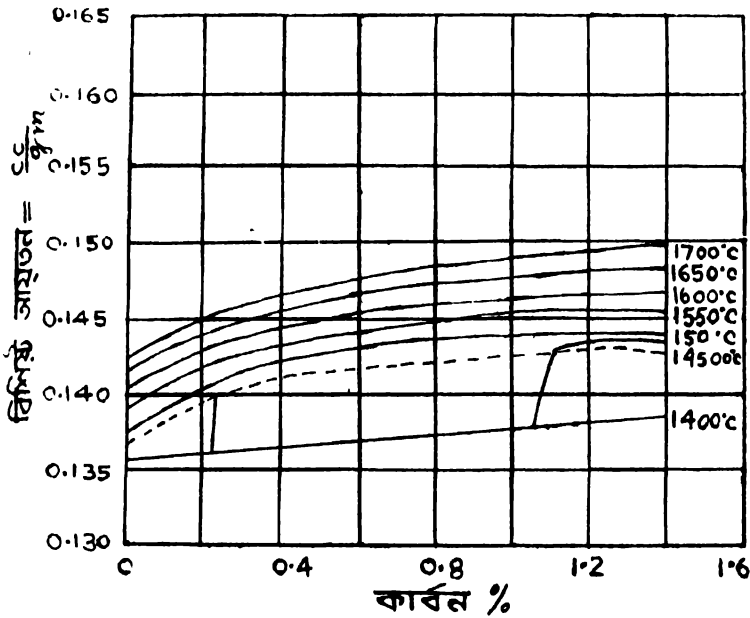
১নং চিত্র।

যাক, ধাতুর তরল অবস্থা থেকে ঘনীভূত অবস্থায় উপনীত হওয়া। ঢালাইয়ের তাপমাত্রা থেকে গলনাঙ্ক পর্যন্ত তরল ধাতুর আয়তন এক হারে সঙ্কুচিত হতে থাকে। যদি ধাতুটি ঢালাই লোহা হয়, তাহলে ধাতুর প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা একটি ব্যাপক ও অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী বিষয়। এখানে কয়েকটি বিষয় আমরা আলোচনা করবো। আলোচনাটি লৌহ ধাতুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিশিষ্ট আয়তন (Specific volume) এবং তাপমাত্রা :—কোন পদার্থের বিশিষ্ট আয়তন বলতে আমরা বুঝি, ঐ পদার্থটির প্রতি একক বস্তুমাত্রার (mass) আয়তন; অর্থাৎ মেট্রিক মাপে বলতে গেলে, বিশিষ্ট আয়তন $= \frac{\text{cu. cm}}{\text{gram}}$। এখন তরল ধাতুর এই বিশিষ্ট আয়তন নিয়ে পরীক্ষা করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশিষ্ট আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে—যেমন দেখানো হয়েছে ১নং চিত্রে। এখানে আরও দেখা যাচ্ছে যে, বিশিষ্ট ইত্যাদি কয়েকটি অত্যাবশ্যক ব্যবহারিক গুণ দেবার জন্যে তাতে কার্বন এবং অন্যান্য কয়েকটি ধাতু (যেমন—সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি) মেশাতে হয়। ঢালাইয়ের জন্যে যে লোহা তৈরি করা হয়, সেটা মূলতঃ লোহা এবং কার্বনের একটি মিশ্র ধাতু (Alloy)। ২নং চিত্রে দেখা যাবে—এই বিশিষ্ট আয়তন কার্বনের মাত্রার উপরও নির্ভরশীল। এই সঙ্গে বিশিষ্ট আয়তনের উপর অন্যান্য ধাতুগুলিরও প্রভাব দেখানো হলো। এইখানে ধাতুবিদেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, লৌহ-কার্বনের মিশ্র ধাতুগুলির
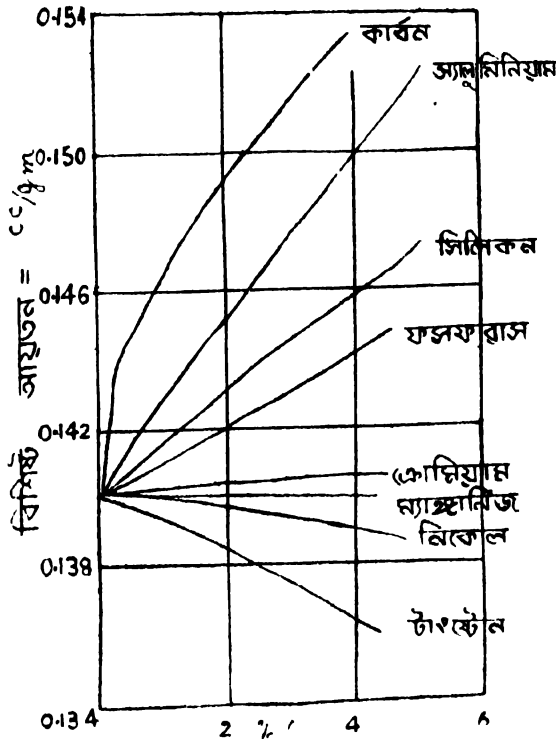
২নং চিত্র।

আয়তনের বৃদ্ধি শুধু মাত্র তাপমাত্রার উপরই নির্ভরশীল নয়, উপরন্তু কার্বনের শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। কার্যক্ষেত্রে বিশুদ্ধ লোহার ব্যবহার কম। এই লোহা ঢালাই করা হয় না। লোহাকে আরও শক্ত, প্রসার্য (Ductile) বিশিষ্ট আয়তন ধাতুর তাপমাত্রা এবং কার্বনের শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে।

ধাতুমল এবং তরল ধাতু :—ধাতুপিণ্ডকে গলাবার সময় যে ধাতুমলের সৃষ্টি হয়, তা দূর করবার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হয়। তবুও

ঢালাইয়ের সময় কিছুটা ধাতুমল (Slag) ছাঁচের ভিতর চলে যায়। তাছাড়া যখন চুল্লী থেকে গলিত ধাতু ঢালাইয়ের পাত্রে ভর্তি করা হয়, তখন বেশ কিছুটা ধাতুমল চলে আসে। এই ধাতুমলকে যতদূর সম্ভব বন্দী করে রাখতে হবে, যাতে সে মূল ছাঁচটির ভিতর না চলে যায়। ছাঁচের ভিতর চলে গেলে যে বস্তুটি তৈরি হবে, তার কার্যক্ষমতা প্রচুর কমে যায়। গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলে হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়ে বিপুল ক্ষতি ও বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। এই ধাতুমল পৃথক করবার জন্যে কয়েকটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। সবচেয়ে কার্যকরী ও সহজ প্রক্রিয়া হচ্ছে, ধাতুটিকে ঢালাই-পাত্রে কিছুক্ষণ রেখে বড় বড় হাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করা। ধাতুমলের গুরুত্ব তরল ধাতু অপেক্ষা কম; সুতরাং উদ্‌স্থিতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে তাকে তরল ধাতুটির উপরে ভেসে উঠতে হবে। তারপর তাকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই জন্যে বড় ঢালাইয়ের আগে ধাতুটিকে কিছুক্ষণ ঢালাই-পাত্রে রাখা হয়। কিন্তু কতক্ষণ রাখা হবে, সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি বেশীক্ষণ রাখা হয়, তাহলে ধাতুর তাপমাত্রা দ্রুত কমে গিয়ে তরল ধাতুটি মোটা হয়ে যাবে। এতে ছাঁচটির প্রতিটি অংশে ভালভাবে ধাতু প্রবাহিত হবে না। সুতরাং আমাদের হিসেব করতে হবে যে, কতক্ষণে ধাতু-মলের টুক্‌রাগুলি ভেসে উঠবে।

ধরা যাক, ধাতুমলের একটি টুক্‌রার আয়তন V এবং তরল ধাতুটির গুরুত্ব ρ; সুতরাং টুক্‌রাটির উপর উর্ধ্বমুখী চাপ $=(\rho V - M)$; এখানে M = টুক্‌রাটির বস্তুমাত্রা (mass)।

এখন এই উর্ধ্বমুখী বলের জন্যে ধাতুমল উপরের দিকে উঠতে সুরু করবে। কি বেগে উঠবে, তা জানা যায় ষ্টোকের সূত্র থেকে। এই সূত্র অনুসারে বস্তুটির উর্ধ্বগতি যদি v হয়, তাহলে $v = \frac{2}{9} \cdot \frac{a^2 g \Delta\rho}{\mu}$; এখানে a = বস্তুটির ব্যাসার্ধ $\Delta\rho$ = বস্তুটি এবং তরল পদার্থটির গুরুত্বের অন্তর। এটা gm/c.c-তে প্রকাশ করা হয়। এখানে μ = তরল পদার্থটির অ্যাবসলিউট ভিস্‌কোসিটি (Absolute viscosity)। এটা প্রকাশ হয় $gm - cm^{-1} sec^{-1}$-এ।

তরল পদার্থটির এই উর্ধ্বমুখী চাপ শুধু ধাতুমলের উপরই পড়বে না, সংস্পর্শে যা কিছু কঠিন পদার্থ রয়েছে, প্রত্যেকটির উপরই পড়বে। এর ফলে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার হবে। প্রথমতঃ, ছাঁচটির উপরের অংশে যে বাক্সটি রয়েছে অর্থাৎ Cope-part, তার উপর ঐ চাপের মোট পরিমাণ কত। যদি দেখা যায় উপরের অংশের মোট ওজন এই চাপের তুলনায় যথেষ্ট নয়, তাহলে বাড়্‌তি ওজন এর উপর চাপিয়ে দিতে হবে, যাতে গলিত ধাতুর চাপে উপরের বাক্সটি উঠে না পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, যে বস্তুটি তৈরি হচ্ছে, সেটি ফাঁপা হতে পারে অথবা ভিতরে এক বা একাধিক শূন্য স্থান থাকা দরকার হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে কাজটি আরও জটিল হয়ে পড়ে। তখন ঐ সকল শূন্য স্থান সৃষ্টি করবার জন্যে ছাঁচটির ভিতর বালির তৈরি নমুনা বসিয়ে দেওয়া হয়। এগুলিকে কোর (Core) বলে। এখন এই চাপ এই কোরগুলির উপরেও পড়বে। সুতরাং কোরগুলিকে কতটা চাপ সহ্য করতে হচ্ছে, তারও একটা ধারণা থাকা দরকার।

তরল ধাতুর প্রবাহ:—কোন তরল পদার্থের প্রবাহ মূলতঃ তার গুরুত্ব এবং ভিস্‌কোসিটির উপর নির্ভর করে। যখন অভিকর্ষের আকর্ষণে প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তখন তরল পদার্থটির গুরুত্ব যত বেশী হয়, প্রবাহ ততই সহজভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এর ভিস্‌কোসিটি বেশী হয়, তাহলে তরলের আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ের ফলে প্রবাহ কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যায়; যেমন— ধরা যাক, তরল ইস্পাতের প্রবাহ। ইস্পাতের গুরুত্ব জলের গুরুত্ব অপেক্ষা ৭·৭ গুণ অধিক।

কিন্তু তরল অবস্থায় এর ভিস্‌কোসিটি প্রায় জলের সমান। সুতরাং তরল ইস্পাতের প্রবাহ জলের চেয়ে অনেক সহজে তাড়াতাড়ি হবে। এখানে ভিস্‌কোসিটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এটা হচ্ছে তরলের একটি ধর্ম। এর ফলে তরলের বিভিন্ন অংশের মধ্যের আপেক্ষিক কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা জানা প্রয়োজন। কারণ আমরা যে দুটি লৌহজাত ধাতু ব্যবহার করি, অর্থাৎ ঢালাই লোহা এবং ইস্পাত, সেগুলি মূলতঃ লৌহ-কার্বনের একটি মিশ্র ধাতু। ৩নং চিত্রে কার্বনের সঙ্গে ভিস্‌কোসিটির পরিবর্তনের একটি গ্রাফ দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে,
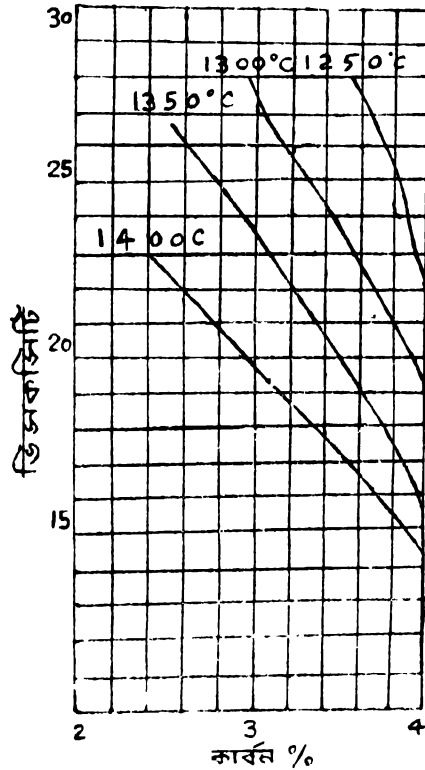
৩নং চিত্র।

গতিকে বাধা দেওয়া হয়; অর্থাৎ একে আমরা তরলের আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বলতে পারি।

কাইনেমেটিক ভিস্‌কোসিটি :—যদি v = কাইনেমেটিক ভিসকসিটি হয়, তাহলে—

$$v = \frac{\text{তরল পদার্থটির ভিসকোসিটি}}{\text{তরল পদার্থটির গুরুত্ব}}$$

। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রবাহ কত সহজ হবে। যে সব তরলের v-এর মান যত কম, সেই সব তরলের প্রবাহ তত সাবলীল।

এই ভিসকোসিটির উপর কার্বনের পরিমাণের কার্বনের শতকরা মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিস্‌কোসিটি কমছে। এই চিত্র থেকেই ধাতুর তাপমাত্রা ও ভিস্‌কোসিটির মধ্যে সম্পর্কটিও জানতে পারা যায়। কোন নির্দিষ্ট কার্বনমাত্রার ধাতুর ভিস্‌কোসিটি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে কমতে থাকে।

এবার আর একটি বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ঢালাইয়ের সময় ধাতুটি চুল্লী থেকে সরাসরি গিয়ে ছাঁচের ভিতর পড়ে না। চুল্লী থেকে বের করে তাকে রাখা হয় ঢালাই-পাত্রে। তারপর

সেই পাত্র থেকে দরকারমত ধাতু ঢেলে নেওয়া হয়। এই পাত্রে ধাতুটি স্থির অবস্থায় থাকে। পাত্রের নীচে থাকে একটি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রটি একটি স্টপারের সাহায্যে বন্ধ থাকে। লিভারের দ্বারা ঐ স্টপারটি বন্ধ করা বা খোলা যায়। এখন স্থির ধাতুটির যে চাপ এবং বেরিয়ে আসবার সময় যে গতিবেগ—এই দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। ৪নং চিত্রে দেখানো হয়েছে তরল ধাতুপূর্ণ একটি পাত্র। এখানে অত্যন্ত কম ভিস্কোসিটির কোন ধাতু নেওয়া হয়েছে।
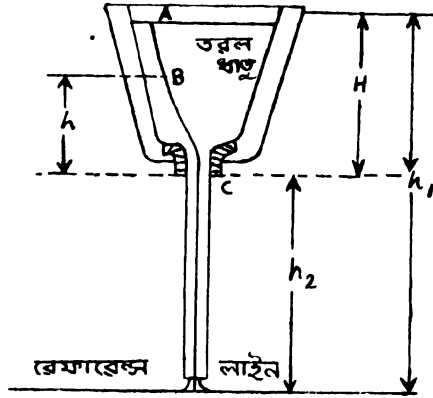
চিত্রে ABC একটি গড় স্ট্রীমলাইন, অর্থাৎ এর যে কোন চলন্ত ধাতুকণার গতিপথ তরল ধাতুটির প্রবাহের সঙ্গে একমুখী; অর্থাৎ ABC রেখার উপর দিয়ে যে প্রবাহ হয়, সেটি ঘূর্ণী প্রকৃতির নয়। এখন ABC-এর উপর যে কোন বিন্দু B-এর উচ্চতা h, চাপ P এবং নির্গমন বেগ v ধরে নিলাম। এখন বার্নৌলির সূত্র ব্যবহার করতে পারি। এই সূত্র অনুসারে—যদি কোন তরলের সামান্য কিছু অংশ একটি বিন্দু থেকে অপর কোন বিন্দু পর্যন্ত বিনা ঘর্ষণে প্রবাহিত হয়, তাহলে ঐ পরিমাণ তরলের মোট শক্তি, প্রবাহের সময় সর্বদা স্থির থাকবে।

৪নং চিত্র।

সুতরাং চাপশক্তি + গতিশক্তি + স্থিতিশক্তি = একটি ধ্রুবক
(Pressure Energy) (Kinetic Energy) (Gravitational Energy) (Constant).

কিন্তু মোট শক্তি = চাপশক্তি + গতিশক্তি + স্থিতিশক্তি।

তাহলে ৪নং চিত্র থেকে পাই—

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2$$

এখানে P_1 ; v_1 ; h_1 = A বিন্দুতে চাপ, গতি এবং উচ্চতা।

P_2 ; v_2 ; h_2 = C ,, ,, ,, ,, ,,

এখন তরলটির উপর চাপ পড়ছে বায়ুমণ্ডল থেকে,

$$\therefore P_1 = P_2$$

সুতরাং বার্নৌলির সূত্রটি এই আকার নিচ্ছে—

$$\frac{v_1^2}{2} + gh_1 = \frac{v_2^2}{2} + gh_2$$

অথবা, $\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) = g(h_1 - h_2) = gH$; $H = h_1 - h_2$ = পাত্রে তরল ধাতুর গভীরতা

এখন A বিন্দুতে পাত্রের সমতলের ক্ষেত্রফল, C বিন্দুতে নির্গমন পথের সরু মুখের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। সুতরাং v_2, v_1 অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হবে অর্থাৎ নির্গমন পথের ভিতর ধাতুর গতিবেগ অনেক বেশী হবে।

সুতরাং আমরা লিখতে পারি—

$$\frac{1}{2} v_2^2 = gH \therefore v_2^2 = 2gH$$

এই সম্পর্কটির সাহায্যে আমরা জানতে পারি, কি হারে তরল ধাতু নির্গমন পথের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এই হার জানতে পারলে সেই অনুসারে পথের ব্যাসটি হিসেব করা যাবে। ধরা যাক, Q = প্রতি সেকেণ্ডে প্রবহমান ধাতুর পরিমাণ

= V. A c.c/Sec

V = নির্গমন গতি

A = নির্গমন পথের ক্ষেত্রফল।

$$\therefore V = \frac{Q}{A} \text{cm/Sec, কিন্তু } V = \sqrt{2gH}$$

$$\therefore Q = A\sqrt{2gH} \text{ c.c/Sec}$$

কিন্তু বাস্তবে Q-এর পরিমাণ হিসাবের চেয়ে অনেক কম। ঘর্ষণজনিত বাধা এর কারণ। এই জন্যে উপরের সূত্রটি বদলে নেওয়া হয়।

$Q = KA\sqrt{2gH}$: দেখা গেছে $K = 0·6$

$$\therefore Q = 0·6A\sqrt{2gH}$$

এরপরও অবশ্য Q-এর মান ক্রমশঃ কমে আসবে। কারণ পাত্রের ভিতর ধাতুর গভীরতা ক্রমশঃ কমে আসে।

নির্গমন সময় :—ধরা যাক t সময়ে ধাতুর উচ্চতা H থেকে h-এ কমে আসে। নীচের সমীকরণ থেকে t-এর মান পাওয়া যায়।

$$t = \frac{A'}{KA}\sqrt{\frac{2}{g}}(\sqrt{H} - \sqrt{h})\text{; এখানে}$$

A′ = পাত্রের সমতলের ক্ষেত্রফল।

কিন্তু ঐ সময় যদি Q′ পরিমাণ ধাতু বেরিয়ে আসে,

$$\therefore Q' = A(H - h) \text{ অর্থাৎ } h = H - \frac{Q'}{A}$$

$$\therefore t = \frac{A'}{KA}\sqrt{\frac{2}{g}}\left(\sqrt{H} - \sqrt{H - \frac{Q'}{A}}\right)$$

এতক্ষণ ছাঁচের ভিতর তরল ধাতুর প্রবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্বগত আলোচনা করা হলো এখানে একটি আলোচনা বাদ পড়ে যাচ্ছে। ঢালাই-পাত্র থেকে ধাতু সোজাসুজি ছাঁচের উপর পড়ে না, আলাদা এক বা একাধিক নালীর ভিতর দিয়ে একে ছাঁচের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়। এই নালীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ধাতুর কিছুটা শক্তি ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় হয় প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে ; যেমন—ঘর্ষণ, প্রবাহের দিক পরিবর্তন, নালীর মাপের হঠাৎ পরিবর্তন হওয়া ইত্যাদি। এই ক্ষয়কে ডায়নামিক হেড দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই ডায়নামিক হেড বলতে তরলের প্রতি একক আয়তনে গতিশক্তির পরিমাণ বোঝায়।

সুতরাং ডায়নামিক হেড $= \frac{1}{2}\rho v^2$; ρ = তরলটির ঘনত্ব। আমরা কয়েকটি কারণ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

নালীর বাঁক এবং মাপের পরিবর্তনজনিত ক্ষয় :—ধরা যাক, ΔE হচ্ছে কোন বাঁকের মুখে পড়ে তরল ধাতুটির শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ সুতরাং বার্নৌলির সমীকরণ অনুসারে—

$$P_1+\frac{\rho v_1^2}{2}+\rho g h_1=P_2+\frac{\rho v_2^2}{2}+\rho g h_2+\Delta E.$$

$$\therefore \Delta E=(P_1-P_2)+\frac{\rho}{2}(v_1^2-v_2^2)+\rho g(h_1-h_2)$$

। এখন নালীর মাপের হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষয়, সেটিও এই সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

ঘর্ষণজনিত ক্ষয়—নালীর দেয়াল এবং ধাতুর প্রবাহের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়। ধরা যাক, এই ক্ষয়ের ফলে ΔP হচ্ছে চাপ হ্রাসের পরিমাণ। নীচের সমীকরণটির সাহায্যে ΔP-এর মান বের করা যায়—

$$\Delta P=\lambda.\frac{l}{d}.\frac{\rho v^2 m}{2}.$$

এখানে d = নালীর ব্যাস

l = নালীর দৈর্ঘ্য

vm = ধাতুটির গড় গতিবেগ

ρ = তরল ধাতুটির গুরুত্ব

λ = প্রতিরোধ গুণাঙ্ক (Resistance-coefficient)

= ডায়নামিক হেড-এর (Dynamic head) গড় ক্ষয়।

= নালীর দৈর্ঘ্য

সুতরাং λ নালীর মাপ এবং প্রবাহের উপর নির্ভরশীল।

নালীর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ এর ব্যাসের গুণিতক হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এখন $\Delta P=\rho g h$, যদি আমরা ΔP-কে ধাতুর গভীরতা দিয়ে প্রকাশ করি।

$$\therefore h=\frac{\lambda}{g}.\frac{l}{d}.\frac{v^2 m}{2}.$$

এখানে h=যে পরিমাণ উচ্চতা ক্ষয় হলো। তরল ধাতু-প্রবাহের কয়েকটি তত্ত্বগত দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। ব্যাপক এবং বিশ্লেষণধর্মী ঢালাই-বিদ্যার এগুলি অতি সামান্য কয়েকটি বিষয়। একজন ঢালাই-ইঞ্জিনীয়ার যখন কোন উৎপাদন-প্রক্রিয়া ঠিক করেন, তখন এরকম বহু জটিলতার গ্রন্থি তাঁকে খুলতে হয়। প্রতিটি বিষয় গভীর-ভাবে বিবেচনা করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। ভুল সিদ্ধান্তের মাশুল হয় পর্বতপ্রমাণ।

মহাকাশের বাধা

অমল দাশগুপ্ত

মহাশূন্যের অনাবিষ্কৃত রহস্য বহুযুগ ধরে মানুষকে হাতছানি দিচ্ছে। মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—অধ্যবসায় ও জ্ঞান নিয়োজিত করেছে মহাকাশকে জয় করবার জন্যে। মহাকাশের বাধা অতিক্রমে মানুষ অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। আশাবাদী মানুষ বিশ্বাস করে কোন কুমারী গ্রহে তার পদসঞ্চার আজ আর কল্পনাবিলাস নয়।

মহাকাশের প্রথম বাধা কিন্তু মানুষ নিজেই। কি ধরণের মানুষ মহাকাশ যাত্রার উপযোগী, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতের অমিল আছে। আমেরিকার বিমান বাহিনীর একজন চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডন ফ্লিকিংগারের মতে, সর্তকতা ও বাস্তবের মুখামুখী হবার ক্ষমতাই মহাকাশ-যাত্রায় প্রধান প্রয়োজন। তিনি বলেন—ধীর, স্থির ও আত্মবিশ্বাসীরাই একাজে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ফিলিপ সলোমন বলেন—আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিরা সীমিত স্থানে অত্যল্প সময়েই ভেঙ্গে পড়েন, অন্যদিকে বহির্মুখীন ব্যক্তিদের মন বাহ্যিক বস্তুতেই কেন্দ্রীভূত থাকে। সুতরাং পৃথিবীর বাইরেও তাঁরা বহু সময় অতিবাহিত করতে পারেন। রাইট-প্যাটারসন বিমান-ঘাঁটির এরো-মেডিক্যাল লেবরেটরির ডিরেক্টর কর্ণেল জন. পি. স্টাপ মনে করেন—অআত্মীয়, বন্ধুহীন, অবিবাহিত স্ত্রীলোকই আদর্শ মহাশূন্য ভ্রমণকারী হতে পারেন। তাঁর মতে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মনোনয়নে দুটি প্রধান যুক্তি আছে—স্ত্রীলোকের দেহের ওজন পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম এবং তাঁরা পুরুষের চেয়ে অধিকতর হয়ে থাকেন। ভবিষ্যৎ মহাকাশ-যাত্রা দীর্ঘসময় চলতে পারে বলে এই যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক টি চার্লস হেলভি স্ত্রী ও পুরুষের সহাবস্থানমূলক মহাকাশ-যাত্রার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মহাকাশের যাত্রা-সঙ্গী হবেন দু-জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি পুরুষদের সমতা-রক্ষাকারিণী হবেন এবং তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করবেন। তিনি অবশ্যই একজন বৈজ্ঞানিক হবেন এবং মহাকাশ-যাত্রার গণনা কার্যের ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত থাকবে। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ডাঃ উইলসে বি. ওয়েবও উপরিউক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—নিঃসঙ্গ মহাকাশ-যাত্রায় সঙ্গিনীর উপস্থিতি মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে, না বিপরীত ফল দেবে—সেটাও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। র‍্যানডল্ফ্ বিমান-ঘাঁটির অ্যাভিয়েশন মেডিসিন স্কুলের প্রধান. কর্ণেল জর্জ আর. স্টেইন-কাম্পের মতে, কোন মানুষই না ঘুমিয়ে কাজ করতে পারে না; সুতরাং নিদ্রা বা বিশ্রামের সময় তাঁর কাজের ভার নেবার জন্যে অন্ততঃ একজন লোক দরকার—যিনি কথাবার্তা বলেও নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারেন।

মহাকাশের দ্বিতীয় বাধা ভারশূন্যতা। মানুষের উপর দীর্ঘসময় ভারশূন্যতা কিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে, সে বিসয়ে কেউই নিশ্চিত নন। নিউ মেক্সিকোর হলোমন বিমান-ঘাঁটির এরো-মেডিক্যাল ফিল্ড লেবরেটরিতে এবং অ্যাভিয়েশন মেডিসিনের স্কুলে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, স্বেচ্ছাসেবকদের এক-তৃতীয়াংশ ভারশূন্যতায় অস্বস্তিকর উপসর্গে ভোগেন। ভারশূন্যতা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সিগ্‌ফ্রিড জে. গেরাথিউল বলেন—ভবিষ্যৎ মহাশূন্য-নাবিকদের অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে নির্বাচন করতে হবে। ভারশূন্যতার ধারণা অপেক্ষাকৃত নতুন। ১৯৫০ সাল থেকে আমেরিকায় ভারশূন্যতা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ভারশূন্যতায় মহাকাশ-নাবিকের পক্ষে খুসীমত চলাফেরা করা সম্ভব নয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থা তাকে মহাকাশযানের মধ্যে ভাসিয়ে রাখবে। মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় মহাকাশযানে প্রয়োজনমত কি ভাবে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলাফেরা করা যায়, সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলছে। শোষক জাতীয় (Suction type) জুতা বা চৌম্বক জুতা নিয়ে পরীক্ষা চলছে, যাতে মহাশূন্য-যাত্রীরা পোতের মধ্যে দেয়ালে, মেঝে বা ছাদে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা 'রিয়্যাক্টর গান' নামে একটি যন্ত্র নিয়েও পরীক্ষা চালাচ্ছেন। এটি একটি উচ্চ চাপে রক্ষিত বায়ুপূর্ণ বোতল, যেটা মহাকাশ-যাত্রীর পিছনে বাঁধা থাকবে। বোতলের সঙ্গে একটি নজোলযুক্ত নল সংযুক্ত থাকবে। মহাকাশ-যাত্রী যে দিকে যেতে ইচ্ছুক, তার বিপরীত দিকে ট্রিগার টিপে তিনি কিছু বায়ু বের করে দেবেন এবং এই উচ্চ চাপের বায়ু তাকে ঈপ্সিত দিকে চালিত করবে। ভারশূন্যতার জন্যে অবশ্য নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়, তবে অনভ্যস্ত ভারশূন্যতায় মানুষের কতটা নিদ্রাকর্ষণ হবে, সেটা চিন্তার বিষয়। জেনারেল ফ্লিকিংগার বলেন, ক্লান্তিনাশক গভীর নিদ্রার জন্যে ঔষধ ব্যবহার বিধেয়। এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশপোতে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টির কথা চিন্তা করছেন। তাঁরা বলেন, অবিরাম ঘূর্ণনের ফলে মহাকাশ-যানে মাধ্যাকর্ষণের বোধ সৃষ্টি করা যায়।

মহাকাশের তৃতীয় বাধা, ২৪ ঘণ্টা দিবা-রাত্রিক্রমের অবলুপ্তি। মহাকাশচারী পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা দিবা-রাত্রিক্রমের অবলুপ্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন কিনা, এই প্রশ্নও মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের চিন্তিত করেছে। বহু পরীক্ষার পর দেখা গেছে যাত্রা সংক্ষিপ্ত হলে মানুষ এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ মহাকাশ-যাত্রা কয়েক মাস—এমন কি, কয়েক বছরও চলতে পারে। এই দীর্ঘ সময় মানুষকে তার অভ্যস্ত দিবা-রাত্রিক্রমের বাইরে রাখলে, অর্থাৎ সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী দিন বা সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী রাত্রিতে মানুষ চরম মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তি অনুভব করে। যদি এই অবস্থাকে আরো দীর্ঘতর করা যায়, তবে মানুষ স্নায়বিক বিকারে আক্রান্ত হয়।

মহাকাশের চতুর্থ বাধা—মনুষ্যদেহের বেগ ধারণ-ক্ষমতা। মনুষ্যদেহ কতটা বেগ সহ্য করতে পারে, সে সম্বন্ধে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁদের মতে, মানুষের ধারণ-ক্ষমতার বহির্ভূত বেগ অদ্যাবধি সৃষ্টি হয় নি। অত্যধিক ত্বরণের ফলে মানুষের দেহ বেঁকে বসে। মহাকাশ-নাবিক অনায়াসে প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে ভ্রমণ করতে পারেন, যদি তাঁর মহাকাশ-পোতের গতি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দ্রুত বর্ধনশীল ত্বরণ মাধ্যাকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়; ফলে মানুষের ওজনও বেড়ে যায়। মাধ্যাকর্ষণের এই বৃদ্ধি যদি অত্যধিক এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়, তবে দেহের মারাত্মক ক্ষতি—এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশযান উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হবার সময় ও বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় মহাকাশ-নাবিকেরা প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করেন। গবেষকেরা অনেক পরীক্ষার পর দেখেছেন, বিভিন্ন মানুষের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

অধ্যাপক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুসারে কম গতিসম্পন্ন কোন যান অপেক্ষা দ্রুততর গতিসম্পন্ন যানে সময় অপেক্ষাকৃত ধীরে অতিবাহিত হয়। এই তত্ত্বানুসারে মহাকাশে বছরের পর বছর ভ্রমণরত কোন মহাকাশ-যাত্রী

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর তার বন্ধু বা পরিবার-বর্গকে তাঁর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্ক দেখতে পাবেন। আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার (N.A.S.A.) অধ্যক্ষ টি. কিথ গ্লেন্নান বলেন—এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে ১/১০০০০০০০ ভাগ সঠিক সময়জ্ঞাপক পারমাণবিক ঘড়ির প্রস্তুতি চলছে। দুটি একই প্রকারের ঘড়ির মধ্যে একটিকে মহাকাশযানে করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং অপরটি ভূপৃষ্ঠে রক্ষিত থাকবে। দুটি ঘড়িই একসঙ্গে চালিয়ে দেওয়া হবে। মহাশূন্যে অবস্থিত ঘড়িটি যদি এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ও স্লো যায়, তবে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের দেশ-কাল (স্পেস-টাইম) তত্ত্বটি নির্ভুল প্রমাণিত হবে; অর্থাৎ আলোর সম-গতিসম্পন্ন কোন মহাকাশযান যদি নির্মাণ করা সম্ভব হয়, তবে সেই যানের আরোহীরা বহুবর্ষব্যাপী মহাকাশ ভ্রমণের পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পাবেন, তাঁরা তাঁদের সহপাঠীদের তুলনায় অনেক কম বয়স্ক।

মহাকাশের পঞ্চম বাধা—সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও আলোক। সূর্যকিরণের প্রচণ্ড তাপ থেকে মহাকাশ-নাবিককে রক্ষার জন্যে মহাকাশ যানের অভ্যন্তরে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা দরকার। এসম্বন্ধে রকেট-গবেষণার পথিকৃৎ অধ্যাপক হারমান ওবার্থ একটি সরল ও কার্যকরী পন্থার কথা বলেছেন। যেহেতু কালো রং সূর্যরশ্মিকে শোষণ করে এবং সাদা রং সূর্যরশ্মিকে প্রতি-ফলিত করে, সেহেতু তাঁর মতে, মহাকাশ-যানের বহিরাবরণের একটি দিকে সাদা রং এবং অন্য দিকটিতে কালো রং করে নিয়মিত পর্যায়ক্রমে যদি একবার সাদা দিক ও একবার কালো দিক সূর্যের দিকে মুখ করে ঘোরানো যায়, তবে যানের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কার্বন ডাইঅক্সাইড দূরীকরণ এবং আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখবার জন্যে যানের মধ্যে উৎকৃষ্ট বায়ুচলাচল-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

মহাকাশ-যাত্রীরা নিরাপদে বুধগ্রহের চেয়েও সূর্যের নিকটে যেতে পারেন।* তবে সূর্য থেকে মহাকাশযানের নিরাপদ দূরত্ব নির্ভর করে মহাকাশ-যানের তাপনিরোধক ক্ষমতার উপর। সূর্যের মারাত্মক এক্স-রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি ও প্রচণ্ড তাপরশ্মি প্রতিহত করবার উপযোগী করে মহা-কাশের বহিরাবরণ তৈরি করা উচিত। বিশেষ করে সূর্যের তাপরশ্মিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা ধরণের তাপনিরোধক সঙ্কর ধাতু ও মৃত্তিকা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁদের মতে, মহাকাশযানের বহিরাবরণ দুটি প্রকোষ্ঠের হবে এবং প্রকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান শীতল রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বহিঃ-প্রকোষ্ঠটির বাইরের দিকে কালো সিলিকার আস্তরণ লাগানো থাকবে। সূর্যের পারমাণবিক বিচ্ছুরণ থেকে মহাকাশযানকে রক্ষার জন্যে মহাকাশযানকে সীসার পাত দিয়ে আবৃত করতে হবে।

মহাশূন্যের প্রখর সূর্যালোক মহাকাশ-নাবিকের ক্ষণিক অন্ধত্ব আনতে পারে; সুতরাং প্রখর সূর্যা-লোককে প্রতিহত করবার জন্যে মহাকাশযানের জানালায় বিশেষ ধরণের আবরণ লাগানো প্রয়োজন। মহাকাশ-নাবিকের চোখেও বিশেষ ধরণের চশমা ব্যবহার করা উচিত। মহাকাশের ষষ্ঠ বাধা—পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত বিকিরণ বলয় (Radiation belt)। আমেরিকার প্রেরিত এক্স-প্লোরার-১ ও পায়োনীয়ার-৩ উপগ্রহদ্বয় মারফৎ জানা গেছে যে, পৃথিবীকে দুটি বিকিরণ বলয় ঘিরে রেখেছে। বিকিরণ বলয়গুলি অমিত শক্তিসম্পন্ন ধন তড়িৎ-কণা (Proton) দিয়ে গঠিত এবং সেগুলি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্যে পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-

* সূর্য থেকে বুধগ্রহের দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল।

বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জেম্‌স্ ভ্যান অ্যালেনের নামানুসারে এই বিকিরণ বলয়গুলির নাম দেওয়া হয়েছে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়। অন্তর্বলয়টি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ মাইল থেকে ৩৪০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বহির্বলয়টি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০০০ মাইল থেকে ১২০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। আমেরিকার প্রেরিত এক্সপ্লোরার-৬ উপগ্রহের দ্বারা একটি তৃতীয় বিকিরণ বলয় সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি সুরু হয়েছে ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০০০ মাইল থেকে এবং এর গভীরতা প্রায় ৩০০ মাইল।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জন সিম্পসন বলেন—মহাকাশযানকে মারাত্মক ধন তড়িৎ-কণার হাত থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এই শক্তিশালী তড়িৎ-কণাগুলির ভেদকারী ক্ষমতা অসাধারণ। সুতরাং তাঁর মতে—এই বলয়গুলির উচ্চতায় কোন উপগ্রহ স্থাপিত করা উচিত হবে না। তাঁর মতে দ্রুত গতিশীল মহাকাশযানের পক্ষে এই বিকিরণ বলয়গুলি কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। মহাকাশযানটিকে ১ ইঞ্চি মোটা সীসার পাত দিয়ে আবৃত করলে শতকরা ৯০ ভাগ বিকিরণ প্রতিহত করা যাবে এবং ৬ ইঞ্চি মোটা সীসার পাত ব্যবহার করলে শতকরা ৯৯ ভাগ বিকিরণ বন্ধ করা যাবে।

অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা যে, মানুষ হয়তো বা কোনদিন আলোর গতির প্রায় সমান গতি বেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুসারে কোন বস্তুর গতি বেগ আলোর গতি বেগের নিকটবর্তী হতে পারে; কিন্তু সেই বেগে পৌঁছাতে বা অতিক্রম করতে পারে না। অনেক মহাকাশ-বিজ্ঞানী কিন্তু আলোর গতির তুল্য গতি সৃষ্টির প্রয়াসকে নিছক কল্পনা বলে মনে করেন। অবশ্য রকেটে রাসায়নিক জ্বালানীর পরিবর্তে যখন পারমাণবিক জ্বালানীর ব্যবহার সফল হবে—ইংরেজ রকেট বিশেষজ্ঞ আর্থার সি. ক্লার্ক বলেন—তখন হয়তো ঘন্টায় ১০০০০০ মাইল বেগে মহাকাশযান চালনা সম্ভব হবে। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির প্রেসিডেন্ট ডাঃ লি. ডুব্রিজ বলেন—প্লুটো পর্যন্ত মহাকাশ-যাত্রা হয়তো বা সফল হতে পারে; কিন্তু নক্ষত্রাভিমুখী মহাকাশ-যাত্রা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। মানুষ যে কোন দিন আলোর তুল্য গতিবেগ সৃষ্টিতে সমর্থ হবে, এসম্বন্ধে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ভ্যান অ্যালেন বিশেষ আশাবাদী নন। তাঁর মতে এই গতিবেগের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা মহাশূন্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর অবস্থিতি। মহাশূন্যে প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক ঘনসেণ্টিমিটার স্থান অধিকার করে থাকে। ১ সেণ্টিমিটার ১ ইঞ্চির প্রায় $\frac{২}{৫}$ অংশ। সুতরাং ডাঃ ভ্যান অ্যালেনের ধারণা অনুসারে যখন কোন মহাকাশযান আলোর গতিবেগের প্রায় $\frac{৩}{১০}$ ভাগ গতিতে অর্থাৎ প্রায় ৫৬০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে ধাবিত হবে, তখন মহাকাশযানের অগ্রভাগের সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে ৯০০ কোটি ধন তড়িৎ-কণা ও সমসংখ্যক ঋণ তড়িৎ-কণার সংঘাত হবে। মহাকাশযানের বিপুল গতির জন্যে এই সংঘাত বিকিরণ সীমার প্রায় ঘণ্টায় ২ কোটি রণ্টজেনের সমান। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০০০ রণ্টজেন বিকিরণই মানুষের পক্ষে মারাত্মক। ডাঃ অ্যালেনের মতে, মহাকাশযানকে সীসার পাত দিয়ে আবৃত করলে অবশ্য বিপদ কমানো যায়, কিন্তু তাহলেও যানের বহিরাবরণ নিরন্তর সংঘাতের ফলে ক্ষয়িত হতে থাকবে।

মহাকাশের সপ্তম বাধা—মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ড। ঘন্টায় হাজার হাজার মাইল বেগে ধাবিত উল্কা থেকে মহাকাশযানকে রক্ষা করবার কথাও বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন। ক্ষুদ্রাকার উল্কাপিণ্ডগুলি মহাকাশযানে ছিদ্র করতে এবং বৃহদাকারগুলি মহাকাশযানকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে পারে। অনেক গবেষক ঘাত রোধের জন্যে মহাকাশযানে একটি দ্বিতীয় বহিরাবরণের

পরিকল্পনা করছেন। মহাকাশযানে দ্বিতীয় বহিরাবরণের সর্বাপেক্ষা অসুবিধা হলো, এতে যানের ওজন অনেক বৃদ্ধি পাবে। উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে মহাকাশযানের সংঘর্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশযানে রেডার ব্যবহারের কথা চিন্তা করছেন, যেটা আগত উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের গতিপথও পরিবর্তিত করবে। জনৈক রুশ বৈজ্ঞানিক মহাকাশযানের গতিপথে আগত উল্কাপিণ্ডসমূহকে উল্কা বিধ্বংসী কামান (Anti-meteor gun) দিয়ে ধ্বংস করবার কথা বলছেন। এই পদ্ধতিতেও রেডারের সাহায্যে উল্কাপিণ্ডের অবস্থিতি নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কামান দিয়ে বিধ্বস্ত করা হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ভারত মহাসাগর খাদ্যসম্পদে সমৃদ্ধ

মার্কিন গবেষণা-জাহাজ অ্যান্টন ব্রুন এবছর প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান থেকে ফিরে এসেছে। এই জাহাজে যে সব বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা জানিয়েছেন যে, ভারত মহাসাগরে মাছের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়েছিল, তার ফলাফল থেকে এরকম অনুমান করা হচ্ছে যে, আরব সাগরে প্রচুর পরিমাণ মাছ আছে। মস্কট ও ওমান উপকূল বরাবর একবার মাত্র জাল ফেলে মাত্র ৪৫ মিনিটে তিন টন মাছ ধরা হয়েছে।

বৃটিশ গবেষণা-জাহাজ ডিস্কভারীর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, আরব সাগরে ফস্ফেটের পরিমাণ অন্যান্য মহাসাগরের পাঁচ গুণ বেশী।

জুন'৬৫ মাসে ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের এক সভায় পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের দিক থেকে সমুদ্র-বিজ্ঞান, আবহ-বিজ্ঞান, নৌভূবিদ্যা এবং ভূপদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি দিক থেকে এই সব প্রাপ্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

সুবিশাল মহাসাগরের আয়তন ২ কোটি ৮০ লক্ষ বর্গমাইল। পৃথিবীর আয়তনের শতকরা ১৪ ভাগ দখল করে আছে এই মহাসাগরটি। ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক সমীক্ষা চলছে ১৯৫৯ সাল থেকে। ২৪টি দেশের বিজ্ঞানীরা এতে যোগ দিয়েছেন।

এই মহাসাগরের একটি দিকে স্থলভাগ। আর কোন মহাসাগরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে নি। এই মহাসাগরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বছরে দুবার চলতি বায়ুবেগ ও স্রোতধারার গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।

মৎস্য-বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদেরা এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যটিকে অনাবিষ্কৃত খাদ্য সঞ্চয়ের সূত্র বলে মনে করে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার লা জোলায় স্ক্রিপস ইনষ্টিটিউশন অব ওসেনোগ্রাফীর ডাঃ আর. এল ফিশার সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক নতুন আবিষ্কারের কথা বলেন। তিনি দেখেছেন—ভারত মহাসাগরের তলদেশে খাত রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বৈশিষ্ট্য যেমন ট্রেঞ্চগুলি, তেমনি এই খাতগুলি ভারত মহাসাগরের বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রতিক নবাবিষ্কৃত খাতগুলির মধ্যে দুটিতে ভূকম্পন অনুভব করা গেছে। ভূবিদ্যার দিক থেকে বিবেচনায় এই দুটি খাত অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ডাঃ ফিশার বলেন, মহাসাগরের তলদেশে যে পলি পড়ে, তা পরীক্ষা করলে প্রাচীন-কালের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা হদিস পাওয়া যেতে পারে।

মাসাচুসেট্সের উড্‌স্ হোল ওসেনোগ্রাফিক ইনষ্টিটিউশনের ডাঃ এ. আর মিলার বলেন যে, বৃটিশ, সোভিয়েট ও মার্কিন জাহাজগুলি লোহিত সাগরের মাঝখানে যে উষ্ণ জলের সাক্ষাৎ পেয়েছে, তাতে লবণের পরিমাণ এত বেশী, যার তুলনা মেলে না। আমেরিকার গবেষণা-জাহাজ অ্যাটলাণ্টিসের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ২ হাজার মিটার গভীরে তাপমাত্রা ৫৯.২ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং লবণের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ।

বৃটিশ ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফীর আর. আই. কুরী বলেন, আরব সাগর ও উত্তর-পূর্ব সোমালি উপকূলের ২০০ মাইল বরাবর অসংখ্য মরা মাছ ইতস্ততঃ ছড়ানো লক্ষ্য করা গেছে। তিনি বলেন যে, এথেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, উপকূল বরাবর গ্রীষ্মকালে অতি শীতল জলের সংস্পর্শে এসে এই মাছগুলি প্রাণ হারিয়েছে। এখানকার জলের তাপ ছিল ১৩ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। অথচ বিষুবরেখার কয়েক ডিগ্রী দূরে জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হলো ২৩ ডিগ্রী।

পশ্চিম জার্মেনীর সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণা-কেন্দ্রের ডাঃ জি. ডিয়েট্রিক এবং ভারত মহাসাগর অভিযান কর্মসূচীর ডিরেক্টর ডাঃ এন. কে. পানিক্কর বলেন যে, ছয় বছরের এই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ মৌলিক গবেষণার পর্যায়ে পড়ে। বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাঁরা বলেন, এই সব গবেষণার ফলে মৎস্য শিকারের নতুন জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছে, বিমান চালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহের গতি নিরূপণ সম্ভব হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের স্থান নিরূপণ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দুধের বদলে নূতন তরল খাদ্য

সোয়ানউইক (ডার্বিশায়ার)—সোয়ানউইকের ইণ্টারন্যাশনাল ভেজিটেরেনিয়ান ইউনিয়নের অষ্টাদশ বিশ্ব কংগ্রেসে যোগদানকারী ১৬টি দেশের (ভারত সহ) প্রতিনিধিদের সম্মেলনে সম্প্রতি বলা হয়েছে যে, এক রকমের নতুন তরল খাদ্য উদ্ভাবিত হয়েছে, যা দুধের স্থান নিতে পারবে।

এই খাদ্যকে বলা হচ্ছে প্ল্যাণ্ট-মিল্ক—সব্জি এবং সব্জির পরিত্যক্ত অংশ থেকে এই খাদ্য উৎপাদন করা হয়। এটির উদ্ভাবক হলেন জনৈক রসায়নবিদ্ ডাঃ এইচ. বি. ফ্র্যাঙ্কলিন। এই খাদ্যটি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে একটি কোম্পানী ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে।

কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও মেডিক্যাল প্র্যাকটি-শনার ডাঃ এলান স্টডার্ড এই প্ল্যাণ্ট-মিল্কের কথা প্রতিনিধিদের জানান। তিনি বলেন—খাদ্যটি যে সব দেশে দুধ নেই বা দুধের অভাব রয়েছে, সেই সব দেশের কল্যাণ সাধন করবে।

তিনি বলেন, প্ল্যাণ্ট-মিল্ক সাধারণ দুধের তুলনায় দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন এবং এই দুধ ঠাণ্ডা জায়গায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যাবে। গরুর দুধের মতই এই দুধ দেখতে। এই নতুন পদার্থটি যদিও মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বাজারে ছাড়া হয়েছে, তবু এর চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

দু'বছর অন্তর এই কংগ্রেস বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—প্রতিনিধিগণ উন্নয়নশীল দেশে নিরামিষ আহারের সম্ভাব্য সুবিধার বিষয়টি এই সঙ্গে আলোচনা করে দেখেন। প্রতিনিধিরা স্থির করেছেন যে, পরবর্তী কংগ্রেস ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে।

অন্ধজনের পথ চলবার অভিনব যন্ত্র

অন্ধজনের পথ চলবার অতিসহজ একটি যন্ত্র সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রটি দুই ব্যাটারীর একটি টর্চের মত। হাতের মুঠায় শক্ত করে ধরে অন্ধব্যক্তিরা যখন এই যন্ত্রটি নিয়ে পথ চলেন, তখন সামনে কোন মোড় বা বাধা পড়লেই এতে কম্পনের মাত্রা বেড়ে ওঠে। হাতের তেলোতে সেই কম্পনের স্পর্শে তাঁরা যে রাস্তার মোড়ে বা কোন খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা বুঝতে পারেন।

যন্ত্রটি পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি হয়েছে এবং কয়েকটি যন্ত্র পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে। অন্ধজনেরা একলাই এই যন্ত্রের সাহায্যে উঁচু-নীচু পথ পাড়ি দিয়েছেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন, চৌমাথায় এসে ঠিক পথটি বেছে নিয়ে চলতে পেরেছেন। এতে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

যন্ত্রটির মুখের ব্যাস আলোর মাত্রানুযায়ী কমানো বা বাড়ানো হয়। আলোর মাত্রার তারতম্য এই যন্ত্রে কম্পনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কম্পন সেকেণ্ডে চার থেকে ৪০০ বার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আলোর মাত্রানুযায়ী যন্ত্রটিকে ঠিক করে নিয়ে অন্ধজনেরা এর সাহায্যে পথের উপর অতি পাত্‌লা কাপড়ের অবস্থিতিও জানতে পারেন। অবশ্য যন্ত্রটি ব্যবহারের পূর্বে একটু শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

ক্যালিফোর্ণিয়ার মেনলো পার্কস্থিত সান্টাবিটা টেক্‌নোলজীতে এই বিষয়ে আরও গবেষণা চলছে। এই যন্ত্রটির পুরা নাম 'বিশপ লিউকাস এনভিরনমেন্ট্যাল সেন্সর' সংক্ষেপে বলা হয় ব্লেস।

মার্কিন বিমান বাহিনীর কেম্ব্রিজস্থিত গবেষণাগারে ওয়ালটন বি. বিশপ এই বিষয়ে গবেষণা করেন এবং সান্টাবিটা টেক্‌নোলজির রবার্ট এল. লিউকাস বিশপের তত্ত্বকে কার্যকরী রূপদান করেন।

শ্রবণ-যন্ত্র সম্পূর্ণ ঢাকা থাকলে এবং কোন কিছু শোনা সম্ভব না হলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ চালানো যেতে পারে কি না, সে বিষয়ে গবেষণার ফলেই এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়। মহাকাশযাত্রীদের চোখ ও কান মহাকাশে যখন নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকে, তখন এই যন্ত্রটি খুবই কাজে লাগতে পারে। সান্টাবিটা টেক্‌নোলজি কর্তৃক নির্মিত এই ট্যাক্‌টাইল ট্রান্সডিউসার যন্ত্রটি হাতে থাকলে—বিজ্ঞানীদের ভাষায়—হাতের তেলোতে শ্রবণের অনুভূতি জাগাবে।

কিছুটা অনুশীলন করলেই কোন্ কম্পনে ব্যঞ্জনবর্ণ ও কোন্ কম্পনে স্বরবর্ণ বোঝায়, তা বোঝা যেতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটির আরও উন্নতিসাধনে নিযুক্ত রয়েছেন।

ঘুমের মধ্যেও ছাত্রেরা শিখতে পারে

প্রায় ৩০ বছর আগে অ্যালডুস হাক্সলি যখন তাঁর বিখ্যাত বই 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড' লিখেছিলেন, তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—কি ভাবে মানুষের প্রতিভাকে ঠিকমত কাজে লাগাবার জন্যে অবচেতন মনের মধ্য দিয়ে তাদের শেখাবার কাজ চলতে পারে। সে সময় তাঁর এই ধারণাটা কষ্টকল্পিত বলেই মনে হয়েছিল।

কিন্তু আজ সত্যসত্যই ঘুমের মধ্যে শিক্ষা বা যাকে 'হুইস্পার টিচিং' বলে, তা দেওয়া সম্ভব—বহু দেশই হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষার এই অন্যতম সহায়কের মূল্য বুঝতে পেরেছে।

বৃটেনের প্রথম স্লিপ লার্নিং ডরমিটরিটি উত্তর লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টেডে অবস্থিত। এটি পরিচালনা করছেন মিঃ জিওফ্রে ষ্টকার। তিনি এই নতুন বিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষক ও স্লিপ লার্নিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।

ডরমিটরির প্রতিটি বিছানার বালিসের নীচে রাখা হয় একটি করে ছোট লাউস্পীকার।

এটিকে যুক্ত রাখা হয় বিছানার পাশে রাখা টেপ-রেকর্ডার ও টাইম-সুইচের সঙ্গে।

ছাত্রটি শুতে যাবার সময় যন্ত্রটিকে টেপের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। তার পর রাত্রে যথা সময়ে এটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলতে সুরু করে এবং শিক্ষকের সমস্ত নির্দেশ বালিসের মধ্য দিয়ে তার কানের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে।

ছাত্রটির ঘুম কিন্তু তাতে ভাঙ্গে না, তার অবচেতন মন কেবল কাজ করে চলে এবং এই ভাবে গৃহীত সমস্ত তথ্যই সে ধরে রাখতে পারে তার নিজের স্মৃতির ভাণ্ডারে।

মিঃ ষ্টকারের আরও কয়েকজন ছাত্র এই যন্ত্র নিয়ে নিজেদের বাড়ীতে বসে পরীক্ষা চালাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ এক জন ছাত্র সম্প্রতি এই সময় বাঁচাবার পদ্ধতিতে একটি বিদেশী ভাষা শিখে ফেলতে পেরেছে। সে বলে, একরাত্রে সে বহু নতুন শব্দ ও তার অর্থ লিখে ফেলে।

এথেকে মনে হয়, ঘুমের মধ্যে শেখাবার এই ব্যবস্থা সর্বত্র গৃহীত হলে শিক্ষার সমগ্র প্যাটার্ণ হয়তো বদলে যাবে। সারা দিনের ক্লান্তির মধ্য দিয়ে যেটুকু শেখা সম্ভব, তার চেয়ে অনেক বেশী শেখা সম্ভব হবে ঘুমের মধ্যে বিনা কষ্টে এবং অনেক তাড়াতাড়ি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলেছেন যে, একজন ছাত্র ছয় মাসে স্বাভাবিক ক্লাস রুমে বসে যেটুকু শিখতে পারে, তা সে শিখতে পারে ঘুমের মধ্যে মাত্র এক সপ্তাহে।

ঘুমের মধ্যে মন অনেক গ্রহণশীল থাকে এবং ঘুমের মধ্যে চিত্ত-বিক্ষেপের কোন কারণ থাকে না, সেই জন্যে দিনের বেলার শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সমস্যাই ঘুমের মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দূর করা যেতে পারে।

মিঃ ষ্টকার বলেন—স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা নিয়ে ছাত্রদেরও আর দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ থাকবে না, মনঃসংযোগ করবার প্রশ্নও আর থাকবে না অথবা কোন বিষয় কঠিন হলে সে বিষয় নিয়ে পড়বার ক্ষমতা সম্বন্ধে দুর্ভাবনাও আর থাকবে না।

অতি দ্রুত ত্রুটি-সন্ধানক্ষম যন্ত্র

বৃটেনের একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে ত্রুটি-সন্ধান করতে পারে (Ultrasonic flaw detector), এমন একটি যন্ত্র নিয়ে কাজ হচ্ছে। এই ধরণের অন্য সব রকম যন্ত্রের চেয়ে এটি অনেক বেশী কার্যকরী বলে দাবী করা হয়েছে।

ত্রুটি-সন্ধানের ব্যাপারটি অনেক সময় খুবই কঠিন হয়ে দেখা দেয়। এই কাজ যাতে সহজে হতে পারে, সেই জন্যেই এই নতুন যন্ত্রটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি কারখানায় সাধারণ কাজকর্মে অথবা লেবরেটরীতে উচ্চতর গবেষণার কাজে ব্যবহারের উপযোগী। একটি মনিটর ইউনিট সহযোগে এটি এক পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষণ ও রেকর্ডিং ব্যবস্থা পরিচালনা স্বচ্ছন্দে করতে পারে।

একই যন্ত্র দিয়ে এখন কংক্রিট ও ইস্পাত দুই-ই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে—অথচ আগে দু রকম যন্ত্রের প্রয়োজন হতো এই দু রকমের কাজের জন্যে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা
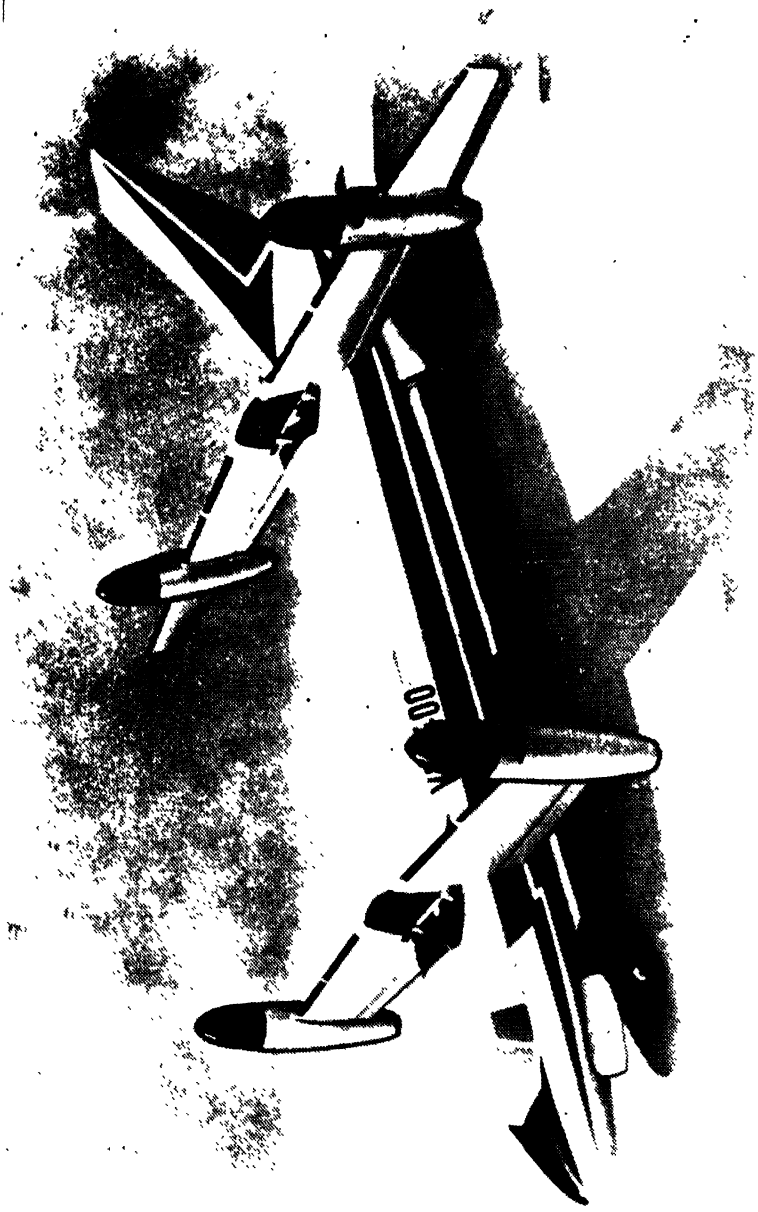
ব্রেমেনের (পশ্চিম জার্মেনী) একটি বিমান প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত বিমান ভি. সি. ৪০০। এই বিমান সোজাসুজি আকাশে উঠে যেতে পারে।

করে দেখ

অদ্ভুত তীর

তাপ প্রয়োগে অধিকাংশ পদার্থ প্রসারিত হলেও রাবারের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাই দেখা যায়। তাপ প্রয়োগে রাবার সঙ্কুচিত হয় এবং ঠাণ্ডায় প্রসারিত হয়ে থাকে। খুব সহজ ব্যবস্থায় এটা তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

চার ইঞ্চি চৌকা একটা কাগজ বা কাঠের বাক্স সংগ্রহ কর। একখানা কার্ডবোর্ড থেকে কাঁচি দিয়ে বেশ একটু চওড়া করে একটা তীর কেটে নাও। ফিতার মত সামান্য চওড়া একটা রাবারের ব্যাণ্ড যোগাড় করতে হবে। বাক্সটার চারধারে রাবারের ব্যাণ্ডটা পরিয়ে দাও। এবার কার্ডবোর্ডের তীরটার লেজের প্রান্তভাগে লম্বা একটা
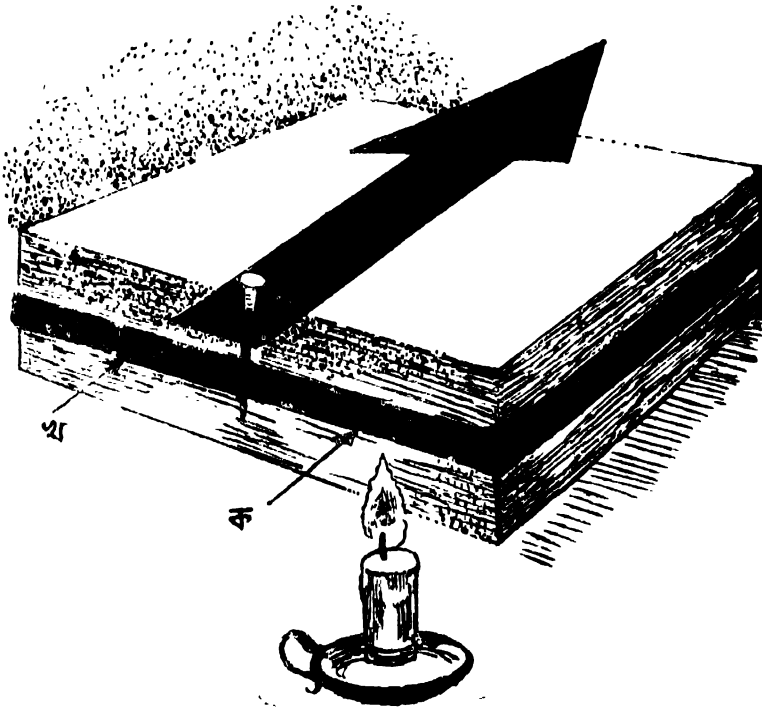
আলপিন প্রায় শেষ অবধি এমনভাবে ফুটিয়ে দাও যেন তীরটা আলপিনের সঙ্গে বেশ এঁটে থাকে। তীর সমেত পিনটাকে এবার বাক্সের গায়ের রাবারের ব্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে গলিয়ে দাও। কি ভাবে করতে হবে ছবিটা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

এখন একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি অথবা একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রাবার ব্যাণ্ডটার ক-চিহ্নিত স্থানের কাছাকাছি আনলেই দেখবে—তীরটা আস্তে আস্তে বাঁ-দিকে ঘুরে যাচ্ছে। জ্বলন্ত কাঠি বা বাতিটাকে সরিয়ে যদি খ-চিহ্নিত স্থানের নিকটে আন, তাহলে তীরটা আবার ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘুরে আসবে। তাপ প্রয়োগে রাবার যে সঙ্কুচিত হয়, এই পরীক্ষা থেকে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

—গ—

পৌরাণিক গল্প

আমাদের হাতে যতগুলি হাড় আছে, তাদের নামকরণ সম্বন্ধে সুন্দর একটা গল্পের প্রচলন আছে। তোমাদের কাছে আমি সেই গল্পটাই বলবো।

সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যে তিন জায়গায় সভ্যতার বিকাশ হয়, গ্রীস দেশ তাদের অন্যতম। এই গ্রীস দেশের দেবতাদের রাজা ছিলেন জুডা। তাঁর বাড়ী ছিল সমুদ্রের ধারে। দেবতাদের অধিপতি জুডা সকলের সকল অবস্থা ও মনের কথা জানতে পারতেন। তাঁর তুই কন্যা ছিল—জেমিনী আর হ্যামলেট। ছোট মেয়ে হ্যামলেট ছিল সর্বাঙ্গসুন্দরী—এমন কি, তাঁর চুলগুলিও উজ্জ্বল সোনালী বর্ণের বলে মনে হতো। তুই বোন প্রত্যহ সমুদ্রের ধারে ভ্রমণে বের হতো। পড়ন্ত সূর্যের আলোতে চুলের শোভা আরও ফুটে উঠতো। সকলেই হ্যামলেটের রূপ ও চুলের প্রশংসা করতো। তা দেখে জেমিনীর খুব হিংসা হলো। সে হ্যামলেটের সুন্দর চুলগুলিকে নষ্ট করবে বলে মনস্থির করলো। জেমিনী মনে মনে ঠিক করলো যে, আগামীকাল সে হ্যামলেটকে নিয়ে অনেক দূরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে এবং সেখানেই সে হ্যামলেটকে হত্যা করবে। দেবাধিপতি জুডা কিন্তু আগে থেকেই এই মতলব বুঝতে পারলেন। সে জন্যে তিনি হ্যামলেটকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আগে থেকে তিনটি জিনিষ দেন—একটি সাপ, একজোড়া জুতা ও একটি নৌকা। জুতা তুটির একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে, ঐগুলি পায়ে থাকলে অদৃশ্য হওয়া যেত। পরদিন জুডা হ্যামলেটকে ভ্রমণের সময় ঐ তিনটি জিনিষ সঙ্গে নিতে এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে বলেন। পরদিন জেমিনী তাঁর ছোট বোনের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে অনেক দূরে বেড়াতে গেল। সেখানে হ্যামলেটের চুল কাটতে গিয়ে দেখলো তাঁর চুলে সাপ জড়ানো রয়েছে, তাই আর চুল কাটা হলো না। তারপর সে হ্যামলেটকে

সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মারবে বলে ঠিক করলো। সেটা বুঝতে পেরে হ্যামলেট জুতো পরে নিজেকে অদৃশ্য করে দিল, তারপর নৌকা করে পালিয়ে গেল। জেমিনীর কৌশলটা সফল হয়েছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা সফল হয় নি। পিতা জুডা বড় মেয়ের এই দুষ্কৃতির জন্যে তাকে কঠোর শাস্তি দিলেন। তিনি আকাশে জলন্ত তারার সাহায্যে জেমিনীর এই কৃতকর্মকে এমনভাবে লিখে দিলেন যেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ
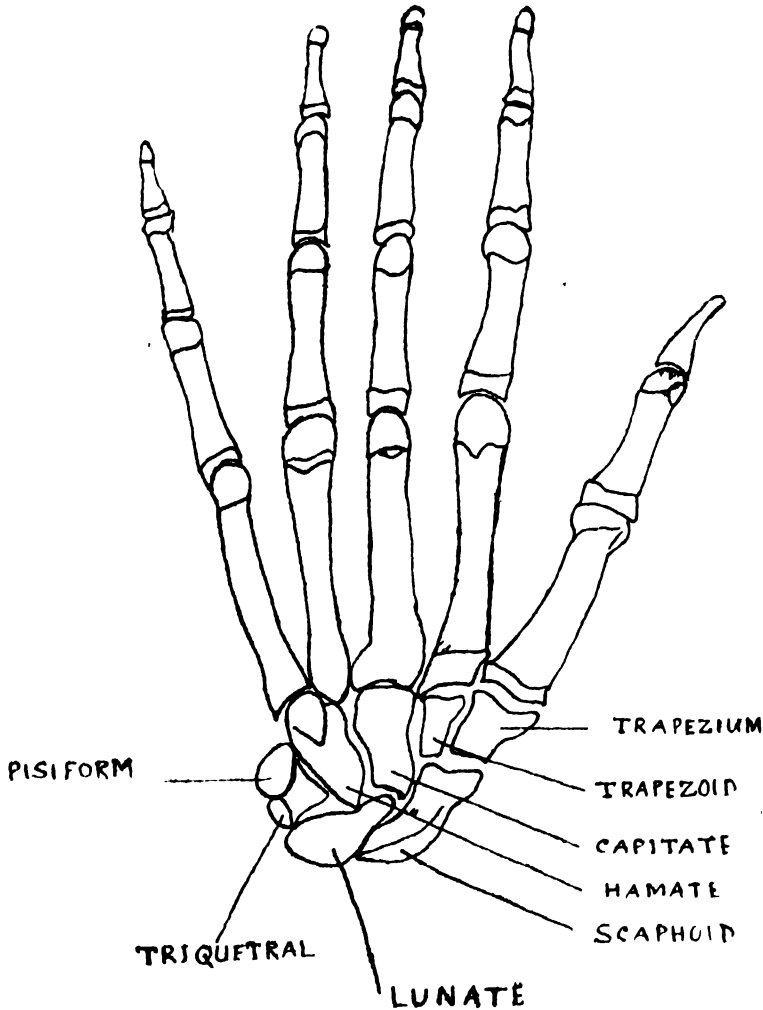
ঐ অপরাধের কথা জানতে পারে। তিনি লিখেছিলেন—"Gemini Tried Captivate Hamlet. Schemed Lost, Tries Performed." জেমিনী অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এবং নিজের অপরাধের জন্যে পিতার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলো। কন্যার কান্নাকাটিতে দেবতা জুডার মন গলে গেল। তিনি বললেন—আমি যখন একবার

লিখে দিয়েছি তখন সে লেখা আর মোছা যাবে না। তবে তুমি যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করেছ ও ক্ষমা চাইছ, তখন কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তিনি তখন আকাশের ঐ লেখা থেকে কতকগুলি অক্ষর তুলে নিয়ে পৃথিবীতে ফেলে দিলেন, যাতে আর কেউ ঐ লেখার কোন অর্থ করতে না পারে। ঐ অক্ষরগুলি পৃথিবীতে এসে মানুষের হাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণ লোকেরা পৃথিবীর ঐ অক্ষরগুলি খুঁজে পেল না। জুডা যে অক্ষরগুলি পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিয়েছিল বলে গল্পে আছে—সেই অক্ষরগুলি থেকে মানুষের হাতের এক একটি হাড়ের নামকরণ হয় (চিত্র দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঠিক যেভাবে অক্ষরগুলি আকাশে ছিল ঠিক সেই ভাবে পাশাপাশি হাড়ের মধ্যে নিজেদের স্থান গ্রহণ করেছে।

আকাশে জুডার লেখা { Gemini Tried Captivate Hamlet, Schemed Lost ; Tries Performed.

শব্দ		অক্ষর		হাড়ের নাম
Gemini	থেকে	Tm	(ল্যাটিন অর্থ অনুযায়ী)	Trapezium
Tried	থেকে	Td		Trapezoid
Captivate	থেকে	Cap		Capitate
Hamlet	থেকে	Ha		Hamate
Schemed	থেকে	Sca		Scaphoid
Lost	থেকে	L		Lunate
Tries	থেকে	Tq		Triquetral
Performed	থেকে	P		Pisiform

মিনতি চট্টোপাধ্যায়

ঘুড়ি ওড়বার রহস্য

নীল আকাশের গায়ে যখন লাল রঙের ঘুড়ি ওড়ে তখন তা কত সুন্দরই না দেখায়! ফুরফুরে বাতাসে ভর দিয়ে যখন ঘুড়িটা সুরসুর করে বহুদূরে মেঘের কাছে উড়ে যায়, তখন আমরা কতই না আনন্দ পাই! কিন্তু ঘুড়ি হাওয়ায় ভর করে কিভাবে ওড়ে? ঘুড়ি ওড়বার মূলে যে একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য লুক্কায়িত আছে, তার খবর হয়তো আমরা অনেকেই জানি না।

ঘুড়ি ওড়াতে গেলে দেখা যায়—আকাশে যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন ঘুড়ি বেশ বোঁ বোঁ করে উড়তে থাকে। আর যখন বাতাস থাকে না, তখন ঘুড়ি ওড়াতে গেলে বাতাসের বিপরীত দিকে কিছুটা দৌড়াতে হয়। এখন এর কারণ আলোচনা করা যাক।
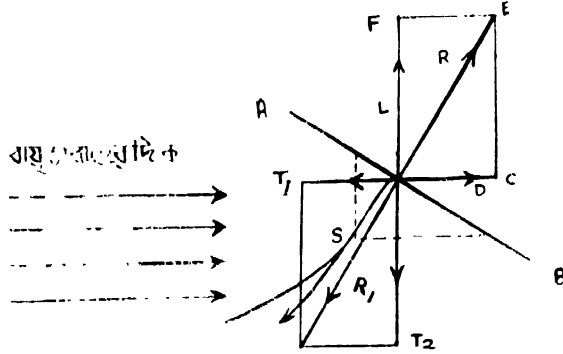
উপরের ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে—ঘুড়ি কি করে ওড়ে। মনে করা যাক, AB একটি ঘুড়ি। ঘুড়িটা বাতাসের প্রবাহের সঙ্গে একটা কোণ (Angle) করে অবস্থান করছে। এইরূপ অবস্থানকালে ঘুড়িটার উপর দুটি শক্তি কার্যকরী হচ্ছে। একটা হচ্ছে ঘুড়িটার সুতার টান। এই টানটা কিন্তু আসছে, যে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে তার হাত থেকে। আর একটা হচ্ছে ঘুড়িটার ওজন। সেটা তো নিশ্চয়ই নীচের দিকে ক্রিয়া করবে। বলা দরকার যে, সুতার টানটাও নীচের দিকে S চিহ্নিত স্থানে ক্রিয়া করছে। যাই হোক, দেখা গেল এই দুটি শক্তির Resultant হচ্ছে R_1।

এখন যদি ঘুড়িটাকে বাতাসে ভাসতে হয়। তাহলে ঐ শক্তি R_1-এর সমান একটা বিপরীত শক্তি থাকতে হবে। চিত্রানুযায়ী R হচ্ছে ঐ শক্তি।

তাই যখন বাতাস জোরে প্রবাহিত হয়, তখন বাতাসই ঐ শক্তি R প্রদান

করে। আর যখন বাতাস থাকে না, তখন কিছুদূর দৌড়ে ঐ শক্তি অর্জন করে নিতে হয়; অর্থাৎ ঐ শক্তি R না থাকলে ঘুড়ি নীচে নেমে আসবে।

এখন যদি ঐ শক্তি R-কে দুটি Component-এ পরস্পর সমকোণে dissolve করি, তাহলে চিত্রানুযায়ী দুটি শক্তি L ও D পাই। L হচ্ছে লিফ্‌ট (Lift), অর্থাৎ এটি ঘুড়িটার ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং D (ড্র্যাগ)—যেটা সুতার টানের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে' ঘুড়িটাকে উপরে উঠতে সাহায্য করে।

এই হলো ঘুড়ি ওড়বার রহস্য। এই রকম কত রহস্যই না লুকিয়ে আছে আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে—তার কতটুকুরই বা সন্ধান পাই?

শ্রীসুশীলকুমার নাথ

আয়োডিন

বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আবিষ্কার এক একটি বিস্ময়। ১৮১১ সালে প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে ফরাসী রসায়নবিদ বার্নার্ড কোর্টিস সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে সোরা তৈরি করা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। কারণ যুদ্ধের গোলা-বারুদ তৈরি করতে হলে সোরা অপরিহার্য। সোরা তৈরিতে সাফল্য লাভ না করলেও এথেকেই আবিষ্কার হলো আয়োডিনের এবং তার সঙ্গে কোর্টিসের নাম অমর হয়ে রইলো রসায়নের ইতিহাসে।

আয়োডিনের নাম শোনে নি, এমন লোক খুব কমই আছে। কারণ কাটা-ছেঁড়ায় এতদিন টিংচার আয়োডিনই ছিল একমাত্র সেপ্‌টিক প্রতিষেধক। আজকাল অবশ্য অন্যান্য নানারকম ওষুধ বেরুবার ফলে সেপ্‌টিক প্রতিষেধক হিসেবে আয়োডিনের মূল্য অনেকটা কমে গেছে, তবে শরীরের একটা অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে আয়োডিনের প্রয়োজন কিন্তু অত্যাবশ্যকীয়ভাবে রয়ে গেছে। কারণ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিটি মানুষকেই প্রতিদিন কিছু পরিমাণে আয়োডিন গ্রহণ করতে হয়।

মানুষের শরীরের জন্যে বারোটি উপাদান অপরিহার্য; যথা—আয়োডিন, জিঙ্ক, কপার, কোবাল্ট, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সালফার, ম্যাগ্নেসিয়াম, সোডিয়াম এবং ক্লোরিন। এদের মধ্যে আয়োডিনের পারমাণবিক ওজন হলো সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ ১১৭। এই সব অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই শরীরের নানারকম প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আয়োডিনের কেবলমাত্র একটি

কাজ। প্রতিটি মানুষের গলার সামনে যে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আছে, সেখানে তৈরি হয় থাইরয়েড হর্মোন নামে একজাতীয় রস। শরীরের প্রতিটি কোষের কর্মক্ষমতার সমতা রক্ষা করা হলো এই রসের কাজ। এই রস সৃষ্টিতে যে সব উপাদান সাহায্য করে, তার মধ্যে আয়োডিনের দান সর্বাপেক্ষা বেশী।

শরীরে আয়োডিনের অভাব হলে থাইরয়েড হর্মোন-এর পরিমাণ কমে যায়। ফলে শরীরের কোষগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে আয়োডিনের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হর্মোন সংগ্রহ করতে গিয়ে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের আকৃতি যায় বেড়ে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের এই বর্ধিত অবস্থাকেই বলা হয় Goiter বা গলগণ্ড।

গলগণ্ড সাধারণতঃ বাইরের দিকেই হয়, কিন্তু কোন কোন সময় ভিতরের দিকে বেড়ে গিয়ে খাদ্যনালী—এমন কি, শ্বাসনালীরও ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। আয়োডিনের অভাবই যে গলগণ্ডের প্রধান কারণ, একথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রমাণ করেন কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী—তাঁদের মধ্যে ডেভিড মেরিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রতিটি মানুষের শরীরের জন্যেই আয়োডিন অপরিহার্য, কিন্তু এর পরিমাণ অবশ্য খুবই কম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—ছোট বড় মেয়ে-পুরুষ সকলেরই দৈনিক মাত্র এক মিলিগ্র্যামের দশ ভাগের এক ভাগ আয়োডিনই যথেষ্ট। এই প্রয়োজন মেটাতে আমাদের অবশ্য দোকান থেকে আয়োডিন কিনে খাবার দরকার নেই। যে সব জমিতে আয়োডিন আছে, সেই জমির ফল বা শাকসব্জীতেও যথেষ্ট পরিমাণে এই পদার্থ থাকে। এমন কি, যে সব গরু এই সব জমির ঘাস খায়, তাদের দুধেও প্রচুর আয়োডিন থাকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। জাপানের লোকেরা সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেতে খুব ভালবাসে বলে ওদেশে গলগণ্ড খুব কমই দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রীস দেশের লোকেরাও এর ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন ছিল। গলগণ্ড সারাবার জন্যে তারা সামুদ্রিক উদ্ভিদ পোড়ানো ছাই ব্যবহার করতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় আয়োডিন সংগ্রহের সবচেয়ে সহজ উৎস হলো নুন। সমুদ্রের জল থেকে যে নুন তৈরি হয়, তাতে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে এবং তা থেকেই আমরা এই অপরিহার্য বস্তুটি সংগ্রহ করতে পারি।

সুস্মিতাপ্রসন্ন কর

প্রাণীদের দেশান্তর গমন

প্রায় সব প্রাণীই জীবনধারণের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। কেউ বাসস্থানের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়, কেউ বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায় এবং নির্দিষ্ট সময় পরে ফিরে আসে। কেউ আবার নতুন জায়গায় বাসস্থান তৈরি করে। প্রাণীদের এই দেশান্তর গমন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। এখনও বিভিন্ন দেশে এই সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্যাদি জানবার জন্যে গবেষণা চলছে। এখানে কয়েকটি প্রাণীর দেশান্তর ভ্রমণের কথা বলবো।

প্রাণীদের ভ্রমণের পথ হচ্ছে—স্থল, জল আর আকাশ। বাসস্থানের কাছাকাছি ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করা এবং বাসস্থানে ফিরে আসা—এর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই। কিন্তু দলবদ্ধভাবে এক স্থান থেকে শত শত মাইল দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া, আবার সেখান থেকে পূর্বস্থানে ফিরে আসা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। এদের গমনাগমনের পথও নির্দিষ্ট এবং সেই পথ অনুসরণ করেই তারা স্থানান্তরে গমন করে। অবশ্য কোন কোন প্রাণীর ভ্রমণ-পথের দূরত্ব খুব বেশী নয়।

কিন্তু প্রাণীরা এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায় কেন? বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে অনুমান করেন—প্রতিকূল আবহাওয়া, বংশবৃদ্ধির তাগিদ, খাদ্যাভাব প্রভৃতির জন্যে প্রাণীরা দেশান্তরগামী হয়। কোন এক অঞ্চলে খাদ্যাভাব ও স্থানাভাব ঘটলে তারা অন্য জায়গায় খাদ্যের সন্ধানে বা বংশবৃদ্ধির জন্যে গমন করে। জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণও প্রাণীরা স্থানান্তরে চলে যায়।

সব প্রাণীই বহু দূরদেশে চলে যায় না। আর যারা যায়, তাদের ভ্রমণের মধ্যেও নানা রকম পার্থক্য দেখা যায়। কারো ভ্রমণ হয় প্রতি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা ঋতুতে; কেউ কেউ নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভ্রমণ করে না। আবার কেউ কেউ হঠাৎ প্রবল বাতাসের বেগে অথবা ভাসমান কোন বস্তুর উপর আশ্রয় গ্রহণ করে জলস্রোতে একদেশ থেকে অন্য দেশে ভেসে যায়। আর মানুষও এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে যায়। তবে বায়ুর বেগ, জলস্রোত বা মানুষের নিয়ে যাবার ব্যাপারে প্রাণীদের নিজের কোন ভূমিকা নেই।

অধিকাংশ দেশান্তরগামী প্রাণীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—এরা দলবদ্ধভাবে স্থান ত্যাগ পছন্দ করে। একদল চলতে থাকলে অন্য স্থানের সেই জাতীয়

প্রাণীরা ক্রমে ক্রমে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। এর ফলে দলটি শেষ পর্যন্ত বিশালাকৃতি ধারণ করে। নতুন স্থানে উপস্থিত হয়ে কেউ নির্জন স্থানে আস্তানা তৈরি করে, আবার কেউ জনাকীর্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। নিয়মিত দেশান্তরগামী প্রাণীদের পূর্বপুরুষ যে পথ ধরে যে স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—এদের পরবর্তী বংশধরেরাও সেই পথ অনুসরণ করে সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। তবে এর ব্যতিক্রম কখনও কখনও হয় নানা কারণে। সহজাত সংস্কারবশে প্রাণীরা দেশান্তর গমনের সময়, পথ ও স্থানের বিষয় উপলব্ধি করতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে এই সব প্রাণীদের বাসস্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে—তারা ঠিক নিজের আস্তানায় ফিরে এসেছে।

ধূসর কাঠবিড়ালী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার সময় পথে খাদ্যোপযোগী যে সব শস্য ও ফল পায়, তা খেয়ে উজাড় করে দেয়। এক সময় পেনসিলভেনিয়ায় দেশান্তরগামী ধূসর কাঠবিড়ালী হত্যার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রজাপতিদের মধ্যে ইউরোপের মনার্ক বাটারফ্লাই-এর দেশান্তর গমন উল্লেখযোগ্য। শীতকালে এরা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে নির্ধারিত জায়গায় উড়ে আসে। আবার গ্রীষ্মকালে পূর্বস্থানে চলে যায়। সাধারণতঃ হাজার ফুট উপর দিয়ে এরা ঘণ্টায় প্রায় ২৫ মাইল বেগে উড়ে আসে। ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসিফিক গ্রোভে (কীট-পতঙ্গের সংরক্ষিত বিচরণস্থল) প্রতি বছর শীতকালে লক্ষ লক্ষ মনার্ক বাটারফ্লাই-এর আবির্ভাব ঘটে।

পঙ্গপালের দেশান্তর গমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যে সব দেশের উপর দিয়ে এরা উড়ে যায়, সে সব দেশ এদের আগমনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ এরা ফসলের মারাত্মক শত্রু। উড়তে উড়তে যেখানে অবতরণ করে, সেখানেই মরুভূমির সৃষ্টি করে—গাছপালা, ক্ষেতের শস্য প্রভৃতি কিছুই বাদ দেয় না। তদুপরি অসংখ্য ডিম পেড়ে বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করে যায়।

দেশান্তরগামী পঙ্গপাল তাড়াবার জন্যে ঢাক-ঢোল, কেনেস্তারা, শিঙ্গা প্রভৃতি বাজানো হয়, যাতে এরা নীচে না নামে। কখনও কখনও পঙ্গপাল অবতরণ করে কিছুক্ষণ পরেই উড়ে চলে যায়—সময়বিশেষে কয়েক দিনও অবস্থান করে। এরা দিনে কুড়ি থেকে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হলে আরও বেশী দূর পর্যন্ত যেতে পারে। বিভিন্ন দেশে পঙ্গপালের ভ্রমণ সম্বন্ধে সতর্ক নজর রাখা হয়। এক দেশে এদের আবির্ভাব হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশকে এদের গতিবিধি সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পঙ্গপাল দলবদ্ধভাবে উড়ে যায়। পঙ্গপালের ঝাঁকে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সংখ্যাবৃদ্ধিই পঙ্গপালের দেশান্তর গমনের প্রধান কারণ বলে বিজ্ঞানীদের

ধারণা। দেশান্তর গমনের পূর্বে এরা এক এক জায়গায় জমায়েৎ হয়—তারপর হঠাৎ ঝাঁক বেঁধে উড়তে সুরু করে। উড়ন্ত ঝাঁকের সঙ্গে ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানের পঙ্গপালের ঝাঁক এসে যোগ দেয়। আমাদের দেশেও অনেকবার পঙ্গপালের অভিযান হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কলিকাতার উপর বিশাল পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা গিয়েছিল ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে।

বাইসন শীতকালে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এবং গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান অঞ্চলে গমন করে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এদের স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ। এরাও দলবদ্ধ অবস্থায় শত শত মাইল দূরবর্তী স্থানে চলে যায়। নির্ধারিত স্থানে যাবার সহজতম পথ এরা সহজাত সংস্কারের বশে ঠিক করতে পারে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এরা পথ ঠিক রাখে।

বল্গাহরিণ দলবদ্ধভাবে ৫০।৬০ মাইল দূরবর্তী স্থানে চলে যায়, আবার বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্থানে ফিরে আসে। চলমান অবস্থায় কারো পা কোন কারণে জখম হলে সে কোনক্রমে কোন নদী বা হ্রদের কাছে এসে বিশ্রাম নেয়; সুস্থ হলে আবার চলা সুরু করে। কিন্তু ইতিমধ্যে দলের অন্যান্যেরা নির্ধারিত স্থানে চলে যায়।

কই, চিংড়ি প্রভৃতি নতুন জলের উৎস সন্ধানে ডাঙ্গার উপর দিয়ে চলতে থাকে। বেশী দূর পর্যন্ত যেতে না পারলেও এদের চলবার ভঙ্গী বড় অদ্ভুত। কান্‌কোর কাঁটার সাহায্যে কইমাছ আঁকাবাঁকাভাবে ডাঙ্গার উপর দিয়ে অগ্রসর হয়। চিংড়ি তার পায়ের সাহায্যে বুকে হেঁটে চলে। বর্ষার প্রারম্ভে এভাবেই তারা স্থানত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়।

বাণ-মাছের জন্ম ও বৃদ্ধি সমুদ্রে হলেও এরা সাধারণতঃ নদী, হ্রদ বা অন্যান্য জলাশয়ে বাস করে। কিন্তু গ্রীষ্মের শেষভাগে ডিম পাড়বার সময় হলে স্ত্রী ও পুরুষ বাণ-মাছ দলবদ্ধভাবে সমুদ্রযাত্রা করে। বাচ্চারা বড় হয়ে আবার পিতা-মাতার পথ অনুসরণ করে। স্যামন মাছও ডিম পাড়বার সময় দলে দলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়।

টুনা মাছ ডিম পাড়বার সময় দলবদ্ধভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্রে চলে যায়। এদের ভ্রমণ-পথ হাজার মাইলেরও বেশী হতে পারে। এরা সাধারণতঃ ঘণ্টায় দশ মাইল সাঁতার কেটে যায়। নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত দিন-রাত সাঁতার কাটতে থাকে। সময় সময় এরা দুই হাজার মাইলেরও বেশী পথ ভ্রমণ করে থাকে।

লেমিং নামক ইঁদুরের মত প্রাণীর দেশান্তর গমনের অর্থ ই হলো মৃত্যু বরণ করা। এদের এই অভিযানকে বলা হয়—'মৃত্যু অভিযান'। দলে দলে এরা উঁচু পাহাড়-পর্বত থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসে এবং সমুদ্রের দিকে চলতে থাকে। সংখ্যা

ও খাদ্যাভাব এদের দেশান্তর গমনের প্রধান কারণ। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড এদের বাসভূমি। নীচের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে এদের দেশান্তর গমন কিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার!

১৯৬৩ সালের ৬ই অক্টোবর সুইডেনের এক খবরে জানা যায়—সুমেরু অঞ্চলের কোটি কোটি লেমিং সুইডেনের পর্বতমালার মধ্য থেকে নিম্নভূমিতে নেমে আসে। বহু লেমিং গাড়ীর চাকার তলায় পিষে মারা যায়। অনেকে জলে ডুবে মরে। এরা সেখানকার কূপ ও নদীর জল দূষিত করে ফেলে। বড় বড় বাড়ীতেও এরা হানা দেয়। গত কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম লেমিং সেখানে হানা দেয়। এদের শেষ গন্তব্য স্থল ছিল সমুদ্র এবং কোটি কোটি লেমিং সমুদ্রের জলে ডুবে প্রাণ হারায়। সাধারণতঃ দেখা যায়—প্রতি তিন বছর অন্তর এরা খাদ্যের সন্ধানে নিম্নভূমিতে নেমে আসে। প্রথম দিকে এরা ২৪ ঘণ্টাই একটানা চলতে থাকে। কয়েক দিন বাদে মাঝে মাঝে চলা বন্ধ করে দেয়। কোথায়ও কিছুক্ষণ থামে—তারপর আবার চলতে সুরু করে। লেমিং সর্বদাই সোজাসুজি চলে এবং চলার পথে ব্যাপক হারে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

এক জাতের সন্ন্যাসী কাঁকড়া (Hermit Crab) ডিম পাড়া এবং দেহের নতুন খোলা (যার মধ্যে এরা আশ্রয় নেয়) সংগ্রহের জন্যে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে সমুদ্র-যাত্রা করে। এরা সাধারণতঃ সৈনিক কাঁকড়া নামে পরিচিত। এরা সৈনিকের মত শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে সুরু করে। সে জন্যেই এদের বলা হয় সৈনিক। এই কাঁকড়া সমুদ্র থেকে বহু দূরে জঙ্গলে বাস করে। সেখান থেকে মাইলের পর মাইল হেঁটে সমুদ্রে উপস্থিত হয়। এই ভ্রমণের সময় ছাড়া এদের কদাচিৎ জঙ্গলের বাইরে দেখা যায়। ভ্রমণের সময় উপস্থিত হলে এরা দলে দলে আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাঁধা যদি উপস্থিত হয়, তবে আঁকাবাঁকা পথে চলে। এদের স্বভাবের বিশেষত্ব হচ্ছে—বাসভূমি থেকে দূরে নিয়ে ছেড়ে দিলেও ঠিক সোজাপথ বরাবর চলে সমুদ্রে পৌঁছে যায়। এদের যাত্রার কোন বিরাম নেই, সমুদ্রে না পৌঁছান পর্যন্ত এরা দিন-রাত্রি চলতে থাকে। কখনও কখনও একনাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ চলতে থাকে। দেহের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো খোলা পরিত্যাগ করে সমুদ্র থেকে শুক্তির পরিত্যক্ত খোলা সংগ্রহ করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সমুদ্রে ডিম পাড়বার পর পর এরা ছত্রভঙ্গ হয়ে স্বস্থানে ফিরতে সুরু করে। কেউ একা থাকে, আবার দুই-তিনটি সৈনিক কাঁকড়াকে সময় সময় একসঙ্গে চলতে দেখা যায়। ফেরবার পথে তেমন কোন ব্যস্ততা দেখা যায় না। অনেকে তাদের আদি বাসস্থানে না ফিরে নতুন স্থানে বাসা তৈরি করে।

দেশান্তরগামী প্রাণীদের মধ্যে কয়েক জাতের পাখীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাজার হাজার মাইল ভ্রমণকারী এই সব পাখী প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে কৌতূহল

সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে কেউ দিনে, কেউ বা রাতে, আবার কেউ দিন ও রাতে ভ্রমণ করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্লোভার পাখী প্রতিবছর নির্দিষ্ট ঋতুতে আলাস্কা থেকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বা তারও দক্ষিণে উড়ে যায় এবং বসন্তকালে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। হাজার হাজার মাইল পথ ভ্রমণকালে প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে এরা সময় সময় দিকভ্রষ্ট হয় বা মারা যায়।

আর্কটিকের টার্ণ পাখী সুমেরু থেকে কুমেরু অঞ্চলে উড়ে চলে যায়। ক্যালি-ফোর্ণিয়ার সোয়ালো পাখী প্রতিবছর অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আমেরিকায় উড়ে যায় এবং মার্চ মাসে পুনরায় ফিরে আসে।

মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের স্যাণ্ড গ্রাউস (Sand grouse) পাখী সারা শীতকাল সাধারণতঃ ভারতবর্ষে অতিবাহিত করে। বংশবৃদ্ধির জন্যে স্থানাভাব ঘটলে সময় সময় এরা ইংল্যাণ্ডেও উড়ে যায়। পেট্রেল (Petrel) পাখী বছরের বেশীর ভাগ সমুদ্রের উপর কাটিয়ে দেয়। ডিম পাড়া ও বাচ্চা পালনের জন্যে এরা কুমেরুর নির্জন তুষারাবৃত ভূখণ্ডে উড়ে যায়।

নিউজিল্যাণ্ডের ব্রোঞ্জ কোকিল ফ্লাইক্যাচার পাখীর বাসায় ডিম পেড়ে ২২০০ মাইল দূরবর্তী সলোমন দ্বীপপুঞ্জে উড়ে চলে যায়। তাদের বাচ্চারাও বড় হয়ে সেখানে উড়ে গিয়ে বড়দের সঙ্গে মিলিত হয়।

সোনালী প্লোভার ডিম পাড়বার পর আর্কটিক বা সুমেরু থেকে আর্জেন্টিনায় উড়ে যায় আবার ভিন্ন পথে আর্জেন্টিনা থেকে আর্কটিকে ফিরে আসে। ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে খুব উঁচু দিয়ে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়। সময় সময় খাদ্য সংগ্রহের জন্যে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নেয়; তারপর আবার উড়তে সুরু করে।

শীতকালে আমাদের দেশেও বিভিন্ন দেশ থেকে নানা জাতের পাখী এসে থাকে। শীতের শেষে প্রায় সবাই ফিরে যায়। গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষ থেকে কোন কোন জাতের হাঁস বহু দূরবর্তী দেশে চলে যায় আবার শীতের সময় ফিরে আসে। হিমালয় পর্বত থেকেও বহু পাখী আমাদের দেশে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আগমন করে। আবার কোন কোন জাতের পাখী আমাদের দেশের বাইরে না গিয়ে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং আবার ফিরে আসে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ

থুম্বা থেকে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ

ত্রিবান্দ্রম থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—কিছুদিন পূর্বে ভারতের থুম্বা রকেট ঘাঁটি থেকে একটি জুড়ি-ডার্ট রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়।

এই পর্যায়ে এটিকে নিয়ে মোট ১২টি রকেট উৎক্ষেপণ করা হলো। উর্ধ্বের বায়ুস্তর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

রকেটটি চমৎকারভাবে কাজ করেছে। বায়ুস্তর সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যে সকল জিনিষ রকেটটিতে পুরে দেওয়া হয়েছিল, এক লক্ষ ৮৩ হাজার ফুট উর্ধ্বে গিয়ে সেগুলি ছেড়ে দেয়। সেখান থেকে নীচের দিকে ৯৮,২০০ ফুট পর্যন্ত রেডারের সহায়তায় সেগুলির অবস্থা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

ব্লাষ্ট ফার্ণেসের উপযোগী তাপসহনক্ষম ইট

যাদবপুরের কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃত্তিকা গবেষণাগার সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল থেকে রিফ্র্যাক্টরী বা তাপসহনক্ষম ইট প্রস্তুতের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই ইট ইস্পাত শিল্পের ব্লাষ্ট ফার্ণেস ও অন্যান্য চুল্লীতে তাপ-নিরোধক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

বর্তমানে ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় তাপ-নিরোধক ইট এদেশে তৈরি হয় না এবং সবটাই বিদেশ থেকে চড়া দামে আমদানী করতে হয়। এই নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে বলে আশা করা যায়।

এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা অত্যধিক চাপ ও তাপে শতকরা ৯৫ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড-যুক্ত তাপ-নিরোধক ইট প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই ইট ১৮১০ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপও সহ্য করতে পারে। ভারতে এই ইট অনেক কম খরচে উৎপাদন করা যাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

সমুদ্রের সম্পদ

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য জেনকেভিচের মতে, পৃথিবীর সমুদ্রগুলি রত্নের আকর হয়ে বিরাজ করছে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে তিনি জানিয়েছেন, পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে ৮০ লক্ষ টন সোনা, ৮ কোটি টন নিকেল, ১৬ কোটি টন রূপা এবং ৮০ কোটি টন মলিবডিনাম রয়েছে।

লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সামুদ্রিক জীব-বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে প্রায় ১৪০ কোটি ঘনকিলোমিটার জল রয়েছে এবং প্রতি লিটার জলে ৩৫ গ্র্যাম খনিজ লবণ রয়েছে।

জেনকেভিচ বলেন, এমন দিন আসবে যখন সমুদ্রতলে কূপ খনন পৃথিবীতে নলকূপ খননের মতই একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠবে। সেদিন সমুদ্রের সকল রত্ন মানুষের হাতের মুঠায় চলে আসবে।

ভূতত্ত্ব, ভূরসায়ন, ভূপদার্থ-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের অনেক প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রয়েছে। সেগুলির জবাব পেতে হলে যেতে হবে সমুদ্রতলে। সেখানে শুধু সমুদ্রের কথাই জানা যাবে না—পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জবাবও মিলবে।

অনাবিষ্কৃত গ্রহ

মস্কো থেকে এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—লেনিনগ্র্যাড জ্যোতির্বিজ্ঞান

মন্দিরের অধ্যাপক চেবোতারেভের মতে, সৌরমণ্ডল যতটা বড় বলে এতদিন আমরা জেনে এসেছি, আসলে সে তার চেয়ে ৫৭৫০ গুণ বড়। সৌরমণ্ডলের সুদূর প্রান্তে এখনও অনাবিষ্কৃত বহু গ্রহ রয়েছে।

চেবোতারেভ বলেন, সৌরমণ্ডলের ব্যাস হচ্ছে চার লক্ষ ৬০ হাজার ইউনিট। প্রতিটি ইউনিট ১৫ কোটি কিলোমিটারের সমান।

সূর্যের যে সব গ্রহের কথা আমরা জানি, তন্মধ্যে প্লুটো রয়েছে সর্বাপেক্ষা দূরে, কিন্তু তার কক্ষপথের ব্যাস হচ্ছে মাত্র ৮০ ইউনিট। সমগ্র সৌরমণ্ডলের ব্যাসটি এর সঙ্গে তুলনা করলে প্রকৃত অবস্থাটি বোঝা যাবে।

সৌরমণ্ডলের একেবারে প্রান্ত-সীমায় রয়েছে অতিকায় বাষ্পপুঞ্জ—মাধ্যাকর্ষণের টানে সেগুলি থেকে ধূমকেতু বেরিয়ে আসে।

জ্ঞানাঞ্জন শলাকা

লস্ এঞ্জেলস্ থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—একজন যা শিখে রেখেছেন বা বুঝে রেখেছেন অথবা মুখস্থ করেছেন, ইঞ্জেকসন করে তা আর একজনের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার বিস্ময়কর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। লস্ এঞ্জেলসে সমবেত এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে সম্প্রতি সংবাদটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, এটা করা সম্ভব। এমন দিন আসবে, যখন মানুষ অনায়াসেই অপরের অধীত বিদ্যা, অর্জিত অভিজ্ঞতা বা তার জীবন-স্মৃতির অধিকারী হতে পারবে। কষ্ট শুধু এই যে, একটি ইঞ্জেকসন নিতে হবে।

জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা থেকে সহজভাবে যা বলা যায়, তা হচ্ছে এই যে, জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যবাহক অণুর ন্যায় জীবদেহে স্মৃতি-বাহক রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের অণুও রয়েছে। এই অণু মানুষের সকল স্মৃতি, সকল অভিজ্ঞতা, সকল শিক্ষা বহন করে থাকে। এই অণুকে আলাদা করে নিয়ে কারো দেহে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হলো—একজনের মুখস্থ পড়া অপরের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে।

তুষার স্তূপে চার বছর

কোপেনহেগেন, রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—১৯৬১ সালের মে মাসে ২০ জন মার্কিন বিজ্ঞানী ভাসমান তুষার স্তুপে চড়ে আলাস্কা থেকে গ্রীনল্যাণ্ড রওনা হন। ৫ই জুলাইয়ের খবর—গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের কাছে কোন স্থানে সেই তুষার স্তুপটিকে ভেসে যেতে দেখা যায়। উত্তর মেরু সাগরের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানীদের এই চার বছরের সফর গত মে (১৯৬৫) মাসে শেষ হয়। সফর শেষ হওয়ার পর তাঁদের ঐ তুষার স্তুপ থেকে তুলে আনা হয়।

ডেনমার্ক ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ঐ তুষার-স্তুপ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে চান। উত্তর আটলাণ্টিকের গরম জলের এলাকায় পড়ে তুষার-স্তুপটি গলে গেলেই তাঁরা সফর ত্যাগ করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু তুষার স্তুপের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরবর্তী খবর জানা যায় নি।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫২।৮, ব্যানার্জী পাড়া রোড,
কলিকাতা-৪১

২। শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস
"সাধনালয়"
পুরুলিয়া রোড,
রাঁচী, বিহার

৩। রমাপ্রসাদ সরকার
৪১, শহীদ কলোনী
পোঃ পানিহাটি
২৪ পরগণা

৪। অনাথবন্ধু দত্ত
২৬, পীতাম্বর ঘটক লেন,
কলিকাতা-২৭

৫। ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়
পি-১১৪, লেক টাউন,
কলিকাতা-২৮

৬। অরুণকুমার বসু
১/২, বাজেশিবপুর রোড,
হাওড়া

৭। অমল দাসগুপ্ত
আবহাওয়া অফিস
পোঃ গৌহাটি বিমান বন্দর
গৌহাটি, আসাম

৮। মিনতি চট্টোপাধ্যায়
২০, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন,
কদমতলা, হাওড়া

৯। শ্রীসুশীলকুমার নাথ
পোঃ মণ্ডলপাড়া,
(ভায়া—শ্যামনগর)
গ্রাম—স্থিরপাড়া
২৪ পরগণা

১০। সুনিচাপ্রসন্ন কর
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
বেহালা শাখা
কলিকাতা-৩৪

১১। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ও ৭, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৬৫ | একাদশ সংখ্যা

বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা ও ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব

দীপক বসু

ভূমিকা

সৃষ্টির আদি কাল থেকেই রাত্রির আকাশ মানুষকে বিস্মিত করেছে। সেখানকার অগণিত নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে সে চমৎকৃত হয়েছে। তাদের নিয়ে করেছে নানা জল্পনা-কল্পনা। তবে এই কল্পলোক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্য আরম্ভ হয়েছে অনেক পরে—সঠিক ভাবে বলতে গেলে ১৬১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারীর এক মনোরম সন্ধ্যায়। ঐ সময়েই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও তাঁর নিজের হাতে তৈরি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশের এক অদৃশ্য অঞ্চলকে একেবারে নিজের ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগন-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের এই প্রথম প্রচেষ্টা। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ অবশ্য আমরা অনেক এগিয়েছি। আমেরিকার মাউন্ট উইলসন ও মাউন্ট প্যালোমার মানমন্দিরদ্বয়ে অবস্থিত যথাক্রমে ১০০ ইঞ্চি ও ২০০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দুটি বিশাল দূরবীক্ষণ আমাদের দৃষ্টিসীমাকে করেছে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু মানুষ তাতেও সন্তুষ্ট হয় নি। কারণ এই সব দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলির কার্যক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

আমরা জানি যে, দূর-দূরান্তের জ্যোতিষ্কমণ্ডল থেকে যে বিভিন্ন তরঙ্গমালা বিশাল নিস্তব্ধ মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে আসছে, তার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ —আলোক-তরঙ্গ— আমাদের বায়ুমণ্ডলের সকল বাধা ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। শুধু মাত্র তার সাহায্যেই এই সব যন্ত্র দূর আকাশের যা

কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে আলোক ছাড়া অন্যান্য যে সব তরঙ্গ পৃথিবীর বুকে হয়তো এসে পড়ছে, তাদের ক্ষেত্রে এই দূরবীক্ষণ সম্পূর্ণ অচল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হার্ৎজ কর্তৃক বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কৃত হবার মাত্র ছয় বছর পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সার অলিভার লজ এবং পরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন যে, সূর্য ও বহির্বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হচ্ছে ও পৃথিবীতে রেডিও যন্ত্রে আমরা তা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকি। বহিরাকাশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বেতার-তরঙ্গও এই একই জাতীয়।

প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা দরকার যে, আলোক-তরঙ্গ ও বেতার-তরঙ্গ মূলতঃ একশ্রেণীর তরঙ্গ-মালারই অন্তর্গত—যার নাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এগুলি ছাড়া অবশ্য বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালার অন্তর্ভুক্ত আরও নানারকমের তরঙ্গ আছে; যেমন—গামা রশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি ইত্যাদি।
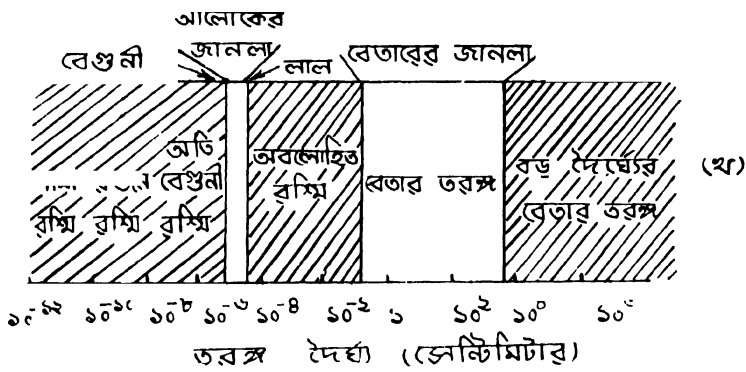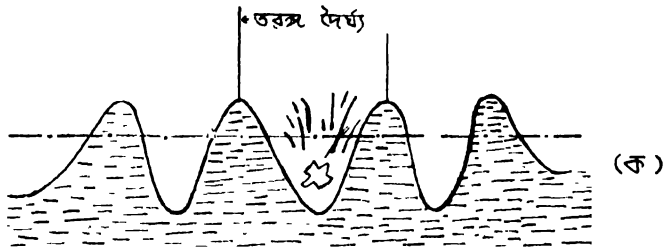
১নং চিত্র।

(ক) জলে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে।

(খ) জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালা, এদের মধ্যে একমাত্র সাদা চিহ্নিত দৃশ্য-আলোক (৪×১০^{-৫}—১.২×১০^{-৫} সে মি.) ও বেতার-তরঙ্গ (১ সে. মি – ৩০ মি.) ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। অন্যান্য সব তরঙ্গই পথে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়।

এসে পড়ছে। আলোকের পরিবর্তে বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে আমরা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের এদের সকলেরই ধর্ম আসলে একই রকমের, তফাৎ শুধু এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো, যে কোন তরঙ্গের পাশাপাশি দুটি উচ্চতম বা নিম্নতম অংশের মধ্যে দূরত্ব। ১নং ছবি থেকে

দেখা যাবে, বেতার-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের চেয়ে শত সহস্র গুণ বড়। উভয়ের একই গতিবেগ—সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল।

অঙ্ক কষে দেখা গেছে যে, মহাজগতের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ-কণিকার গতিবিধি থেকে বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে। এই সব বেতার-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করলে বহির্বিশ্বের ঐ সকল অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানতে পারা যাবে। এরই ফলে গঠিত হলো বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা নামে বিজ্ঞানের নতুন শাখা। আলোকের পরিবর্তে এক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গমালাকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। আবার কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে উৎপন্ন বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গমালাকেও পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত উপায়ে সূর্য, ছায়াপথ, সুদূরের নীহারিকা ও মহাশূন্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই দ্বিতীয় উপায়টি পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থিত জ্যোতিষ্কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এদের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র, আমাদের সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ ও উল্কাপিণ্ড।

একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, জ্যোতির্বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটন—এর বর্তমান তো বটেই, তাছাড়া এর অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ। শুধু মাত্র ব্রহ্মাণ্ডের কতকগুলি নক্ষত্র ও নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট নন। আলোক-তরঙ্গের সাহায্যে পর্যবেক্ষণকারী যে সব দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে এতকাল তাঁরা গর্বিত ছিলেন, দেখা গেল ব্রহ্মাণ্ডের নানা জটিল রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে সেগুলি কার্যকরী নয়। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তার ভাগ্য সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এইসব মতবাদের সত্যতা নির্ধারণের জন্যে যে সব জ্যোতিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে, তারা সব রয়েছে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট অতিকায় প্যালোমার দূরবীক্ষণেরও দৃষ্টিসীমার বাইরে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবাগত এই 'বেতার বিভাগ' এগিয়ে এসেছে 'আলোক বিভাগে'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে একযোগে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের জন্যে।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান কি ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের সাহায্য করছে, সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বেতারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, সে কথা প্রথমে বলা হবে। ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ তারপর বর্ণিত হবে। সর্বশেষে আলোচিত হবে এই সব মতবাদের উপর বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব।

দুটি মাত্র 'জানালা'

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ১নং চিত্রে যে বিশাল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালা দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে আলোক ও বেতার ছাড়া অন্য কোন তরঙ্গ কি বহির্বিশ্ব থেকে এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ছে না? বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ মহাজগতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পৃথিবীতে আসছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের মধ্যে সকলে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌছাতে পারে না, পথে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। চিত্রে দুটি মাত্র অংশকে সাদা দেখানো হয়েছে। কেবলমাত্র এই সাদা-চিহ্নিত দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট তরঙ্গই সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছায়। অন্যান্য দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। তাদের বেলায় রয়েছে বায়ুমণ্ডলের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সাদা অংশ দুটি যেন সেই প্রাচীরের গায়ে দুটি 'জানালা'। একটিকে বলা যায় 'আলোকের জানালা'—সেখান দিয়ে শুধু মাত্র আলোক-তরঙ্গই প্রবেশ করতে পারে, অপরটি 'বেতারের জানালা'—সেখান দিয়ে

আসতে পারে শুধু মাত্র বেতার-তরঙ্গ। বায়ুমণ্ডলের প্রাচীর ভেদ করে অন্য কোন তরঙ্গের ভূপৃষ্ঠে প্রবেশাধিকার নেই। এই দুটি জানালা দিয়েই—অর্থাৎ এদের দ্বারা সীমাবদ্ধ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বহিরাগত তরঙ্গের সাহায্যেই আমরা ব্রহ্মাণ্ডকে 'দেখতে' পাই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এইভাবে আমাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

এতকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'আলোকের জানালার' মধ্য দিয়েই পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্তমানে 'বেতারের জানালাটি' খোলবার ফলে—অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডল থেকে আগত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালাবার ফলে তাঁদের দৃষ্টিসীমা আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বেতারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তা হলো 'বেতার-ব্রহ্মাণ্ড' এবং তা 'আলোক ব্রহ্মাণ্ড' অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

যদিও সার অলিভার লজ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সূর্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গকে পৃথিবীতে বসে ধরবার ব্যাপারে নানাজল্পনা-কল্পনা করেছিলেন, তথাপি উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে তাঁদের চেষ্টা সফল হয় নি। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি হয়েছে মাত্র তেত্রিশ বছর পূর্বে। এর আগে পর্যন্ত আকাশের কোন অঞ্চল থেকে সত্য সত্যই বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পড়ছে কিনা, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের ছিল না। বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয় লাভের সুযোগ ও গৌরবের অধিকারী হচ্ছেন কার্ল গুথে ইয়ান্স্কি। সেটা ছিল ১৯৩২ সাল। যুবক ইয়ান্স্কি তখন আমেরিকায় বেল টেলিফোন গবেষণাগারের ইঞ্জিনীয়ার। দূরপাল্লার বেতার টেলিফোন ব্যবস্থার নানা খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে খুব স্পষ্টভাবে এক জাতীয় হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেলেন। প্রথমে পার্থিব কোন কারণেই এই শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এরিয়েলের অবস্থান ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঐ অদ্ভুত শব্দের উৎস পৃথিবীর বাইরে—আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে; অর্থাৎ ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে ঐ হিস্ হিস্ শব্দ সৃষ্টি করেছে। ইয়ান্স্কির এই চমকপ্রদ আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অবদান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্ভবতঃ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ ইয়ান্স্কি তাঁর এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারকে আর বেশী দূর অনুধাবন করতে পারেন নি এবং ১৯৪০ সালের কাছাকাছি গ্রোটে রেবারের কিছু পর্যবেক্ষণ ছাড়া তখনকার মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই নতুন পরিচ্ছেদের সেখানেই সমাপ্তি ঘটলো।

সুদীর্ঘ দশ বছর বিরতির পর বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের গল্প আবার আরম্ভ হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আর এক দৈব ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বৃটিশ সেনাবাহিনীর রেডার যন্ত্রগুলি তখন হিটলারের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণকে ব্যর্থ করবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূল ভাগে সক্রিয়। প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা দরকার যে, রেডার যন্ত্রের সাহায্যে অতি শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ নীচে থেকে ঝলকে ঝলকে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। কুয়াশা, মেঘ ইত্যাদি সকল বাধা অতিক্রম করে তা বহুদূরের চলমান বিমানের গায়ে ধাক্কা লেগে আবার ফিরে আসে। এই প্রত্যাগত তরঙ্গমালাকে পর্যবেক্ষণ করে শত্রুপক্ষের আগমন-বার্তার সকল খবর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জানতে পারা যায়। যাহোক ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন বিকেলের দিকে এই সব রেডার যন্ত্রে এক অভিনব বেতার-সঙ্কেত ধরা পড়লো। প্রথমে বিশেষজ্ঞেরা ভাবলেন—এ হলো রেডারগুলিকে অকেজো করে

দেবার জন্যে জার্মানদের এক নতুন রকমের ধাপ্পা। কিন্তু সেই অদ্ভুত সঙ্কেত উপর্যুপরি কয়েক দিন ধরে প্রতিদিন বিকেলে মোটামুটি একই সময়ে পশ্চিম উপকূল ভাগে কার্যরত প্রায় সবগুলি রেডার যন্ত্রেই পরিলক্ষিত হতে লাগলো। সার জে. এস হে ছিলেন তখন বৃটিশ সেনাবিভাগে বেতার গবেষণা-শাখার অধিকর্তা। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই বেতার-সঙ্কেত আসছে সূর্য থেকে। সূর্যের উপর তখন প্রকাণ্ড একটা সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা অবশ্য যুদ্ধকালীন গোপনতার জন্যে তখনকার মত চেপে রাখা হলো।

এর অল্প কিছুদিন পরে উপরিউক্ত হে ও তাঁর সহকর্মী ষ্টুয়ার্ট বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর এক নতুন শাখার উদ্বোধন করেন। তাঁরা দেখলেন, উপরিউক্ত রেডার যন্ত্রের সাহায্যে উল্কাপিণ্ড নিয়ে গবেষণা করলে সে সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পারা যাবে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে সমস্ত ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর সমগ্র পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেল নব আবিষ্কৃত বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই তিনটি শাখাকে নিয়ে—সৌর বেতার-তরঙ্গ, ছায়াপথ ও সুদূরের নীহারিকা থেকে আগত তরঙ্গ এবং উল্কার বেতার-প্রতিধ্বনি।

পর্যবেক্ষক যন্ত্র—বেতার-দূরবীক্ষণ

বেতার-জ্যোতির্বিদগণ যে যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন, আলোক-দূরবীক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়েছে 'বেতার-দূরবীক্ষণ'। বেতার-দূরবীক্ষণ মূলতঃ আমাদের বাড়ীতে ব্যবহৃত রেডিও বা বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের মতই, তবে আরও অনেক উন্নত ধরণের কৌশলে গঠিত। রেডিও ষ্টেশন থেকে আগত বেতার-তরঙ্গের তুলনায় মহাশূন্য থেকে আগত তরঙ্গমালা এত ক্ষীণ যে, সাধারণ গ্রাহক যন্ত্রে সেগুলিকে ধরবার কথা কল্পনাই করা যায় না। সৌভাগ্যবশতঃ বিজ্ঞান-জগতে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের আবির্ভাব ঘটেছে এমন একটি সময়ে, যখন আমাদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কলা-কৌশল উন্নতির চরম শিখরে আসীন।
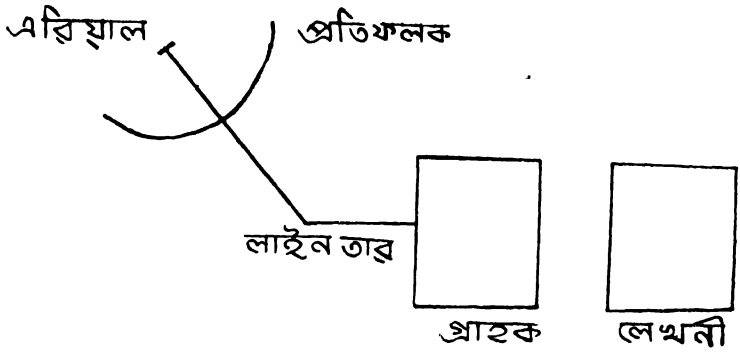
২নং চিত্র।

বেতার-দূরবীক্ষণ। প্রতিফলকের উপর পতিত বেতার-তরঙ্গ এরিয়েলে ধরা পড়ে। তরঙ্গমালা সেখান থেকে তারের মাধ্যমে এসে পড়ে গ্রাহক-যন্ত্রে। এখানে পরিবর্ধিত ও সুসম্বদ্ধ হবার পর লেখনী-যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়।

২নং চিত্রে বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির একটি নমুনা দেখানো হয়েছে। ছবিতে প্রধানতঃ তিনটি অংশ দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি এরিয়েল। এর কাজ

হচ্ছে শূন্য থেকে বেতার-তরঙ্গ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়টি একটি গ্রাহক যন্ত্র। এটি সংগৃহীত তরঙ্গমালাকে পরিবর্ধিত ও সুসম্বদ্ধ করে। সর্বশেষে রয়েছে পরিমাপক বা লেখনী যন্ত্র। দূরাগত বেতার সঙ্কেতকে লিপিবদ্ধ ও পরিমাপ করাই হচ্ছে এর কাজ। এরিয়েল-গ্রাহক-লেখনী সমন্বিত এই যন্ত্রের নাম বেতার-দূরবীক্ষণ।

আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে যখন পৌঁছায়, তারা মোটেই শক্তিশালী নয়। ছাদের উপর থাকে। পদার্থবিদ্যার ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে যে, অধিবৃত্তাকার ফলকের উপর পতিত রশ্মিমালা প্রতিফলিত হয়ে একটি মাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়—যার নাম ফোকাস। প্রকাণ্ড অধিবৃত্তাকার থালার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গমালা এই ফোকাসে এসে একত্রিত হয় এবং সেখান থেকে তারের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে এসে পৌঁছায়।

গ্রাহক যন্ত্রটি আমাদের বাড়ীর রেডিও যন্ত্রের মতই উন্নত ধরণের ব্যবস্থা। লেখনী যন্ত্রটি কিন্তু
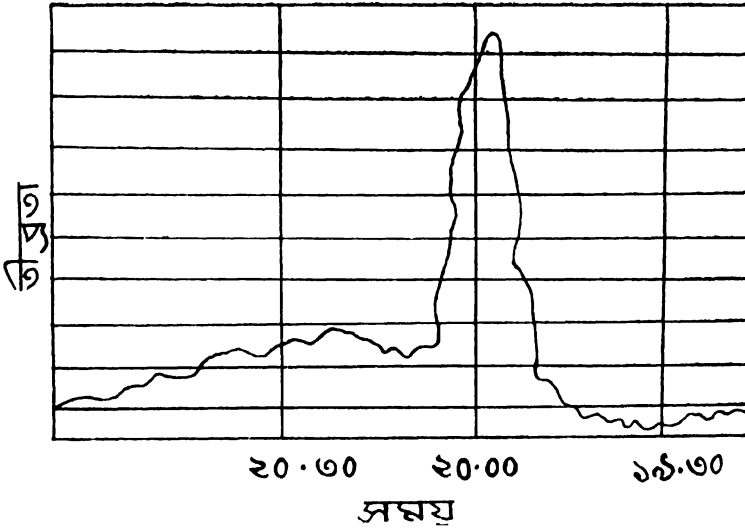
৩নং চিত্র।

ছক কাগজের লিপি। কোন বিশেষ মুহূর্তে ছক কাগজের উপর লেখনীর অবস্থান আগত তরঙ্গের তীব্রতা সূচিত করে। এই চিত্রটি ইংল্যাণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরে আকাশের একটি বিশেষ দিকে নির্দিষ্ট এরিয়েলের উপর দিয়ে একটি বেতার নক্ষত্র চলে যাবার সময় গৃহীত হয়।

একটি মাত্র তার দিয়ে তৈরি যে এরিয়েলের সঙ্গে আমরা পরিচিত, এক্ষেত্রে তা অচল। তাই মূল এরিয়েলের সঙ্গে একটি প্রতিফলক যুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রতিফলক-সমন্বিত এরিয়েলটি সুবিধামত সব দিকেই ঘোরানো সম্ভব। ফলে এর সাহায্যে আকাশের যে কোন দিকে তাকানো চলে। প্রতিফলকের আকৃতি সাধারণতঃ অধিবৃত্তাকার হয়ে বড়ই অদ্ভুত। একটি ছোট্ট কলম এখানে আপন মনে ছক কাটা কাগজের উপর নাচতে থাকে। কাগজটি আস্তে আস্তে এক দিকে সরে যাচ্ছে, আর কলমটিও নাচতে নাচতে তার উপর দাগ কেটে চলেছে। কোন বিশেষ মুহূর্তে ছক কাগজের উপর লেখনীর অবস্থান আগত তরঙ্গের তীব্রতা সূচিত করে। ৩নং চিত্রে একটি দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে।

সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই যে, লাউড স্পীকারের সাহায্যে মহাশূন্যের এই সব বেতার-সঙ্কেত ইচ্ছা করলে কানে শোনবারও ব্যবস্থা করা যায়। সূর্য এবং আমাদের ছায়াপথের বার্তা অনেকটা মৃদু শিসের মত শোনায়। কিন্তু এরিয়েলটিকে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে নির্দেশ করলে সেখানে প্রচণ্ড গর্জন শোনা যায়—হয়তো বৃহস্পতির অধিবাসীরা অত্যন্ত হৈ চৈ প্রিয় !

বেতার-ব্রহ্মাণ্ড

ব্রহ্মাণ্ড প্রধানতঃ কতকগুলি ছায়াপথ, নীহারিকা ও তারকার দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে সূর্য হচ্ছে পৃথিবীর নিকটতম অতি সাধারণ একটি তারকা-বিশেষ। আমাদের খুব কাছে আছে বলে সূর্যকে নানা উপায়ে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। ১ নং চিত্রে যে বিশাল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালা দেখানো হয়েছে, সূর্য এই সব রকমের তরঙ্গই বিকিরণ করে। সূর্য যখন মোটামুটি 'শান্ত' তখন এই সব তরঙ্গের অবস্থা থাকে খুবই ক্ষীণ। একে বলা হয় 'শান্ত সূর্যের বিকিরণ'। কিন্তু সূর্যে যখন সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব হয় ও তৎসহ বিস্ফোরণ ঘটতে আরম্ভ করে, তখন তরঙ্গমালা অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় আগত তরঙ্গকে বলা হয় 'বিক্ষুব্ধ সূর্যের বিকিরণ' এবং তা শান্ত সূর্যের বিকিরণ অপেক্ষা কয়েক হাজার গুণ শক্তিশালী। বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সৌর বিকিরণের সঙ্গে নানারূপ পার্থিব ঘটনার যোগাযোগ লক্ষ্য করা গেছে; যেমন—চৌম্বক ঝটিকা, মেরু-জ্যোতি, বেতার-সংযোগের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।

আমাদের ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্র সভ্যদের মধ্যে অন্যতম সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে এক কোণে পড়ে আছে। আমাদের ছায়াপথ ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আরও অগণিত ছায়াপথ ও নীহারিকা। ছায়াপথ হচ্ছে অসংখ্য তারকা ও ধূলিকণার সমষ্টি আর নীহারিকা হচ্ছে প্রধানতঃ গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। কালক্রমে এই গ্যাস থেকেই জমাট বেঁধে নক্ষত্রপুঞ্জের জন্ম হয়। দূরবীনের মধ্য দিয়েও ছায়াপথের নক্ষত্রগুলিকে আলাদাভাবে দেখা যায় না। উভয়কেই সাদা মেঘের মত উজ্জ্বল পদার্থ বলে মনে হয়। এই সব জ্যোতিষ্কগুলি দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। কোনটার আকার লম্বা, কোনটা আংটির মত গোল, কোনটা দেখতে ঘোড়ার মুখের মত, কোনটা আবার জিলীপির মত প্যাঁচানো বা কুণ্ডলী আকৃতির। আমাদের ছায়াপথ শেষোক্ত আকৃতির (৪নং চিত্র)। মেঘমুক্ত ও জ্যোৎস্নাবিহীন রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকালে খালি চোখেই দেখা যাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত আব্‌ছা সাদা মেঘের মত বিশাল একখণ্ড আলোকপুঞ্জ। সাধারণভাবে আমরা একেই বলি 'আমাদের ছায়াপথ। প্রকৃতপক্ষে আকাশের গায়ে খালি চোখে ছোট বড় যত নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাদের সকলেই আমাদের ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। সাদা মেঘের মত আলোকপুঞ্জটিতে তারকার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বলে দূর থেকে ঐ রকম দেখায়। এক দিক থেকে অপর দিকে ছায়াপথের বিস্তৃতি ১০০,০০০ আলোক-বর্ষ এবং মধ্যস্থল প্রায় ২০,০০০ আলোক-বর্ষ গভীর। সূর্য রয়েছে এক পাশে—কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে। মহাজাগতিক ধূলিকণা ছায়াপথের কেন্দ্র ও আরও কোন কোন অঞ্চলকে আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে অন্তরালে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ইয়ান্‌স্কির অভিনব আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে বেতারের চোখে সবই ধরা পড়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের তাই পরে সন্দেহ হলো—জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টির কারণ যাই হোক না কেন, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জ থেকেও নিশ্চয়ই বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হচ্ছে।

এই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই বেতার-জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর

প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি কোণ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন বেতার-তরঙ্গ বিকিরণকারী নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে। এর ফলেই আবিষ্কৃত হলো একাধিক 'বেতার-নক্ষত্র'। বেতার নক্ষত্র কথাটি অবশ্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কারণ দৃশ্যমান নক্ষত্রদের সঙ্গে এদের কোনই সম্পর্ক নেই। এগুলি আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত বেতার-তরঙ্গের উৎস-বিশেষ থেকে ক্যাসিওপিয়া বেতার-নক্ষত্রের অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ধারিত হবার পর মাউন্ট প্যালোমারের বিজ্ঞানীরা বিশাল ২০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণকে সেই দিকে নির্দেশ করেন এবং সেখানে একটি নতুন নীহারিকার সন্ধান পান। কিন্তু গোল বাঁধলো সিগনাসকে নিয়ে। এক্ষেত্রেও অতিকায় দূরবীক্ষণের চোখে একটি আলোকপুঞ্জ ধরা পড়লো বটে, কিন্তু তার
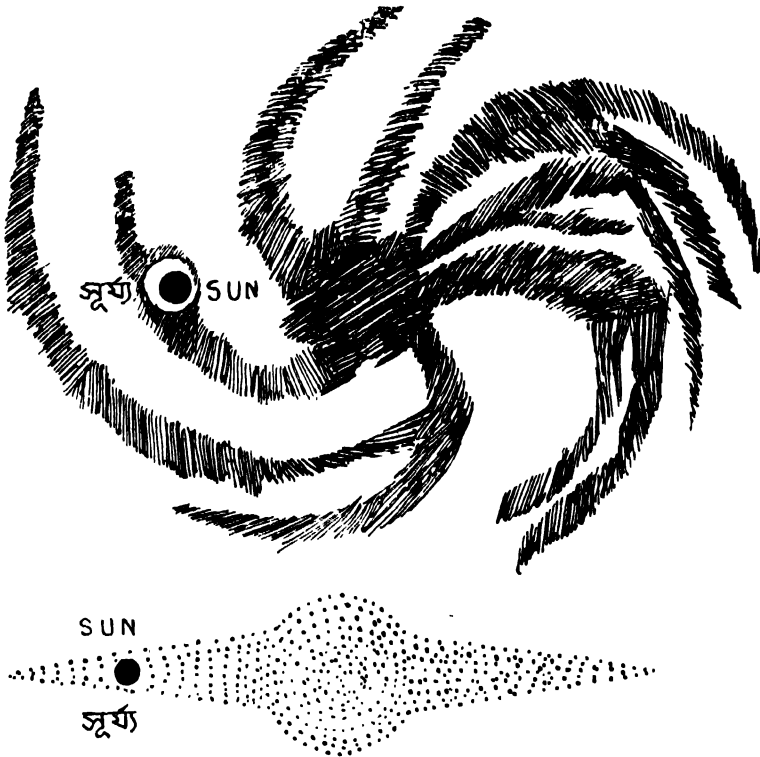
৪নং চিত্র।

আমাদের ছায়াপথ। উপরে—বাইরে থেকে দেখলে যেমন দেখাবে, নীচে—একধার থেকে দেখলে যেমন দেখাবে। আর একদিক থেকে অপর দিকে এর বিস্তৃতি ১০০,০০০ আলোক-বর্ষ। সূর্য রয়েছে এক পাশে, কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে।

বা কেন্দ্র মাত্র। বিশেষ কেন্দ্রটি যে নক্ষত্রমণ্ডলে রয়েছে, তার নামানুসারেই এর নাম হয়। এদের মধ্যে ক্যাসিওপিয়া ও সিগ্‌নাস নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত কেন্দ্রদ্বয় হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং তাই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে বেতার-কেন্দ্রের অবস্থান ঠিক মত মিললো না। পরে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, সিগ্‌নাসমণ্ডলে রয়েছে প্রকৃতপক্ষে দুটি বেতার-কেন্দ্র (৫ নং চিত্র), আলোকের কেন্দ্রটির উত্তর দিকে তারা অবস্থিত। দুটি দূরবর্তী ছায়াপথের

সংঘর্ষের ফলেই সিগ্‌নাসমণ্ডলে এই বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

ক্যাসিওপিয়া ও সিগ্‌নাস ছাড়া বর্তমানে আরও অনেক বেতার-নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ছায়াপথের মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে অ্যাণ্ড্রোমিডা ছায়াপথ—অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্র-মণ্ডলে। আমাদের ছায়াপথ থেকে এর দূরত্ব হতে আরম্ভ করে। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ঐ বছরই চীনা জ্যোতির্বিদগণ আকাশে একটি নতুন তারকার আবির্ভাবের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে ছোট নক্ষত্রটির মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং তারই ফলে এই জাতীয় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। টাইকো-ব্রাহে এবং কেপ্‌লার অতি-তারকাদ্বয়ও এইভাবেই সৃষ্ট। সেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছিল যথাক্রমে ১৫৭২ এবং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে।
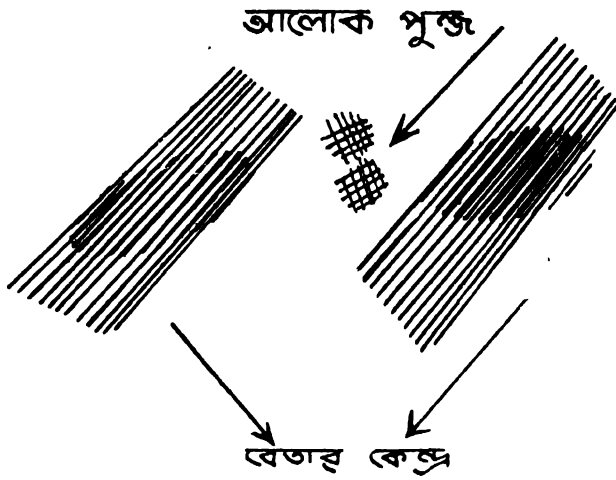
৫নং চিত্র।

সিগ্‌নাস বেতার-নক্ষত্রের চেহারা। মাঝখানে আলোকপুঞ্জ, দু-পাশে দুটি বেতার-কেন্দ্র। এখানে দুটি দূরবর্তী ছায়াপথ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে বলে বিশ্বাস।

প্রায় ৭৫০,০০০ আলোক-বর্ষ এবং আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রায় সবদিক দিয়েই আমাদের ছায়া-পথের মত। ক্র্যাব নেবুলা বা কর্কট নীহারিকা আমাদের ছায়াপথেরই অন্তর্ভুক্ত একটি অতি-তারকা। এর অবস্থা খুবই চমকপ্রদ। পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এর ভিতরের গ্যাসীয় পদার্থ এখনও বিপুল বেগে আয়তনে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির হার থেকে হিসাব করা হয়েছে যে, ১০১৪ খৃষ্টাব্দে কর্কট নীহারিকা একটি ছোট বিন্দুমাত্র ছিল এবং কোন কারণে তারপর স্ফীত

পিউপিস এবং জেমিনী নক্ষত্রমণ্ডলেও ছোট ছোট নীহারিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। সিগ্‌নাসের মত সংঘর্ষমান ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে পারসিউস এবং সেণ্টাউরাস নক্ষত্রমণ্ডলে। ভার্গো-মণ্ডলে (যেন বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি) ডিম্বাকৃতি এই বেতার-কেন্দ্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ধূমকেতুর মত একটি পুচ্ছ।

আলোক-বিজ্ঞানীদের কাছে এতকাল যা সম্পূর্ণ অজানা ছিল, এই জাতীয় অনেক জ্যোতিষ্কেরই সন্ধান এইভাবে পাওয়া গেল বেতারের সাহায্যে।

মহাকাশ থেকে বেতার-দূরবীক্ষণ এদের খুঁজে বের করবার পর আলোক-দূরবীক্ষণ এদের কতকগুলিকে মানুষের দৃষ্টিগোচরে এনেছে। কিন্তু সত্যিকারের মহাশূন্য বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্বর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোন দিনই কোন কথা বলতে পারেন নি। ঐ অঞ্চলের প্রকৃত উপাদান সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণার জন্যে আমরা বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেই সম্পূর্ণভাবে ঋণী। ভ্যান্ ডি হুল্‌স্ট্ নামে জনৈক ডাচ বৈজ্ঞানিক ১৯৪৫ সালে অঙ্ক কষে বলেছিলেন—বিশেষ অবস্থায় একটি নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণু ২১ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করতে সক্ষম এবং মহাশূন্যে এই জাতীয় নিরপেক্ষ হাইড্রোজেনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ১৯৫১ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা আমাদের ছায়াপথের মধ্যে তথাকথিত শূন্য অঞ্চলে হাইড্রোজেন পরমাণুর সন্ধান পেলেন। পরে অন্যান্য স্থানের বিজ্ঞানীরাও আন্তর্নাক্ষত্রিক প্রদেশ থেকে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গের সন্ধান পান। মহাশূন্যে হাইড্রোজেনের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। এর ফলে আমাদের ছায়াপথের বিভিন্ন অংশই শুধু নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ সহজতর হলো।

বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। বিশ্বাস করা সত্যই কষ্টকর যে, নক্ষত্র, ছায়াপথ ও মহাশূন্য ছাড়া আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহপুঞ্জও বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে। কিন্তু একথা আজ সত্য যে, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও শনিগ্রহ থেকে বেতার-তরঙ্গ আসছে এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমন কি, এত স্নিগ্ধ শান্ত যে চন্দ্র—যে নাকি আলোকের জন্যে সূর্যের কাছে ঋণী—সেও কিন্তু ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে থাকে।

এতক্ষণ বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হলো, তার সব ক্ষেত্রেই বেতার-তরঙ্গের উৎসটি হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং বহির্বিশ্বের কোন এক অংশ। পূর্বেই বলা হয়েছে, বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরও একটি শাখা আছে। এক্ষেত্রে বেতার-কেন্দ্রটি কৃত্রিম এবং পার্থিব কোন অঞ্চলেই তার অবস্থান। 'বেতার প্রতিধ্বনি' বা 'রেডার প্রক্রিয়া' নামে পরিচিত এই পদ্ধতিতে উল্কা সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছে। চোখে দেখে উল্কা সম্বন্ধে গবেষণা এতকাল ছিল খুবই অসুবিধাজনক; কারণ দৃশ্যমান উল্কা ক্ষণস্থায়ী, দিনের বেলায় উল্কা দেখা যায় না এবং রাত্রিতেও উল্কা দেখতে হলে কুয়াশা ও মেঘমুক্ত এবং জ্যোৎস্নাবিহীন আকাশ দরকার। বেতারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ আজ এই সব রকম অসুবিধাই দূর করেছে। উল্কা বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটে যাবার সময় শুধু নিজেই জ্বলে যায় না, পথের বায়ুকণাকে আয়নিত করে দেয়। ভূপৃষ্ঠের উপর কোন কেন্দ্র থেকে শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করলে আয়নিত অঞ্চল বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলিত তরঙ্গমালাকে ধরে তাকে বিশ্লেষণ করলে উল্কার গতিবিধি নির্ধারণ করা যায়। বহুদিন পর্যন্ত উল্কা ছিল ব্রহ্মাণ্ডের একটি রহস্য। এরা কোথা থেকে আসে? এরা কি সৌরজগতের অধিবাসী, না প্রকৃতপক্ষে সুদূরের কোন নীহারিকা বা মহাশূন্যের অন্য কোন অঞ্চল থেকে এসে সাময়িকভাবে সূর্যের বাঁধনে ধরা পড়ে যায়? এসব প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। ম্যাঞ্চেষ্টার ও ক্যানাডায় দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার ফলে আজ তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, উল্কা আমাদের সৌরজগতেরই সভ্য—বহিরাঞ্চলের কোন 'সাময়িক পর্যটক' নয়। উল্কাপিণ্ড সৌরজগতের মধ্যে কয়েক লক্ষ বছর ঘোরবার পর এক সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে। তার এই সুদীর্ঘ জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত

মাত্র আমরা তাকে দেখতে পাই। এর পরেই হয় তার মৃত্যু। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেতার প্রতিধ্বনির এই পদ্ধতিটি চন্দ্র এবং কয়েকটি গ্রহ পর্যবেক্ষণের কাজেও লাগানো হয়েছে।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম অবদান হচ্ছে 'কোয়াসার'। এই নতুন ধরণের জ্যোতিষ্ক সম্প্রতি জ্যোতির্বিদ-মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত জোরালো শক্তিবিশিষ্ট বিভিন্ন তরঙ্গের বিকিরণ হচ্ছে কোয়াসারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের অবস্থান পৃথিবী থেকে অনেক দূরে; যেমন—একটির দূরত্ব ৫৩০০ লক্ষ আলোক-বর্ষ—ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিসীমার অর্ধেকেরও বেশী! এদের বেলায় দেখা গেছে, বেতার পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত অবস্থানের সঙ্গে দৃশ্য বস্তুর অবস্থান নিখুঁতভাবে মিলে যায়। আলোক-দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখলে কোয়াসারকে দেখায় ছায়াপথ থেকে অনেক ছোট, বস্তুতঃ নক্ষত্রেরই মত। কিন্তু আলোক, বেতার ও অতিবেগুনী রশ্মির মাধ্যমে এগুলি থেকে যে বিপুল শক্তি বিকিরিত হয়, তা যে কোন বড় ছায়াপথ বা নীহারিকা থেকে নির্গত শক্তির ১০০ গুণ এবং সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। বিস্ময়ের ব্যাপার আরও আছে। কোয়াসার থেকে বিকিরিত আলোকের ঔজ্জ্বল্য কয়েক মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কাল পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০টি কোয়াসারের সন্ধান পাওয়া গেছে। জ্যোতিষ্ক থেকে শক্তি বিকিরণের যে সব প্রক্রিয়ার কথা বিজ্ঞানীদের জানা আছে, তার কোনটা দিয়েই এত ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তু থেকে এত অধিক পরিমাণ শক্তি নির্গমনের ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না।

এইভাবে বেতারের সাহায্যে আকাশকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে, সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ, আমাদের ছায়াপথ, কাছের ও দূরের নীহারিকাপুঞ্জ এবং মহাশূন্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ সর্বক্ষণ আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ছে। আমাদের দৃষ্টিসীমা কখনও যদি বেতার-তরঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে এই বহু পরিচিত সমুজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশের এক নতুন রূপ আমরা দেখতে পাব—সে হচ্ছে বেতার রূপ। আলোক-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বহুকাল একটা গর্ব ছিল যে, তাঁরা আকাশের প্রায় সকল জ্যোতিষ্কেরই সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কল্পনায় আসে নি যে, অনেক জ্যোতিষ্কই প্যালোমার মানমন্দিরের 'অতিকায় চক্ষু'র দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কারণ বহিরাগত বেতার-তরঙ্গ এতে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ ও বিভিন্ন মতবাদ

এ-যুগের জ্যোতির্বিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো এই যে, বহু দূরবর্তী ছায়াপথগুলির রং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে—ক্রমশঃ লালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ। তা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের তাকাতে হবে ১নং ছবির দিকে। দৃশ্য আলোক-তরঙ্গমালার মধ্যে বেগুনী রং হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ এবং লাল দীর্ঘতম। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের ঐ সকল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত আলোকমালার রং লালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশ্ন হলো—কেন এরকম হবে? রেল লাইনের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দূর থেকে একটি ইঞ্জিন যখন বাঁশী বাজাতে বাজাতে ক্রমশঃ কাছে আসতে থাকে, তার আওয়াজ ক্রমেই কর্কশ থেকে কর্কশতর হয়ে আসে। ইঞ্জিনটি ঠিক যে মুহূর্তে সামনে দিয়ে চলে গেল, সেই মুহূর্তেই কর্কশতা যেন অনেকটা কমে যায়। শব্দের কর্কশতা নির্ভর করে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। দেখা গেছে যে, যদি দর্শক ও তরঙ্গ-বিকিরণকারী বস্তুর মধ্যে একটি আপেক্ষিক

গতি থাকে, তবে দুজনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকিরিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পায় এবং তদ্বিপরীতভাবে একটি কমলে অপরটিও কমতে থাকে। পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের কাছে ঘটনাটি ডপ্‌লার প্রক্রিয়া নামে পরিচিত।

সুদূরের ছায়াপথ থেকে আগত আলোকের রং, তথা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এর তাৎপর্য কিন্তু খুবই চমকপ্রদ। দূরবর্তী ছায়াপথগুলি আমাদের থেকে ক্রমশঃ দূরে নিরুদ্দেশ যাত্রার গতিবেগও কিন্তু খুব কম নয়! আরও মজা হচ্ছে—যত দূরের ছায়াপথ, গতিবেগও ততই বেশী। এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা বেশী যে বেগ লক্ষ্য করা গেছে, তা হলো আলোকের গতি-বেগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই বেগ যেখানে আলোকের বেগের সমান, সেখানেই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ দৃষ্টিসীমা। তারপর যা কিছু আছে, সবই চিরকালের জন্যে আমাদের দৃষ্টির অগোচর। কারণ সে সব স্থান থেকে বিকিরিত তরঙ্গ অনন্ত-
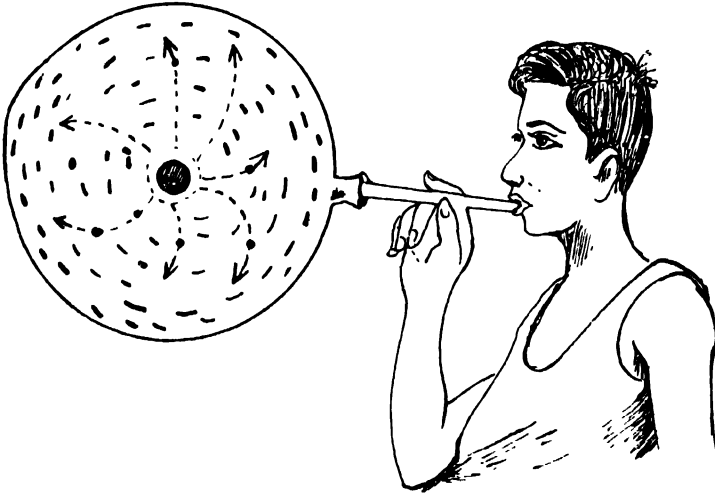
৬নং চিত্র।
একটি বেলুনের গায়ে কয়েকটি দাগ দিয়ে বেলুনটিকে ফোলালে দেখা যাবে, দাগগুলি সব পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডও ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে বলে তার উপরকার ছায়াপথগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সরে যাচ্ছে; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে।

বিকিরণকারী ছায়াপথ ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে স্বভাবতঃই সেখান থেকে আগত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বর্ধিত হবে। একটি বেলুনের গায়ে কয়েকটি চিহ্ন এঁকে বেলুনটি ফোলালেই দেখা যাবে, দাগগুলি যেন পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (৬ নং চিত্র)। ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও এমনিই। ছায়াপথগুলির পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাদের এই কাল ধরে উন্মত্ত বেগে ছুটে কখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারবে না।

ব্রহ্মাণ্ডের স্ফীতি যদি সত্য হয়, তবে আমরা ক্রমশঃ অতীতের দিকে পিছিয়ে গেলে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাব, যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়তো একটি জমাট ক্ষুদ্র পিণ্ডের অবস্থায় মাত্র ছিল। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সেই পিণ্ডাবস্থাতেও কোন কারণে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার ফলেই এই প্রসারণ সুরু হয়েছে ও ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ক্রমশঃ বদ্‌লাচ্ছে। এই মতবাদ অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তনশীল। প্রসারণের

হার থেকে হিসাব করে দেখা গেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এই দশা ছিল আজ থেকে দশ সহস্র কোটি বছর পূর্বে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণকে স্বীকার করে নিয়ে অপর যে মতবাদ দেওয়া হয়েছে, তা প্রথমটির ঠিক বিপরীত। এর সমর্থকেরা মনে করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডকে খুব বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, তা অপরিবর্তনশীল বা স্থিতিশীল প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াপথগুলি দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানগুলিতে আবার নতুন ছায়াপথ গঠিত হচ্ছে। তাই সামগ্রিকভাবে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সব কিছুই যেন একই অবস্থায় থেকে যাচ্ছে।

এই দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের উভয়েরই বিপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি দেখানো যায়, যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যেমন প্রথমটির গোড়ার কথাই হচ্ছে সেই আদিম পিণ্ড। এই বস্তুটি এত বড় বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে সঙ্কুচিত অবস্থায় কি ভাবে ধরে রাখতে পারে, তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, স্থিতিশীল ব্রহ্মাণ্ডে মহাশূন্যের মধ্যে আপনা-আপনি বস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে—এটা বস্তুর সংরক্ষণ মতবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অপর একদল বৈজ্ঞানিকের মতে—ব্রহ্মাণ্ড 'স্পন্দনশীল' অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড পর্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত হচ্ছে ও একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে। আমরা বর্তমানে এই প্রসারণের পর্যায়ে রয়েছি বলেই আমাদের মনে হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড শুধু প্রসার্যমান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দূরাগত আলোক-তরঙ্গের রং পরিবর্তনের ঘটনাটি সম্প্রতি অন্য একভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে দেখানো যায় যে, দূরবর্তী ছায়াপথের আলোক অন্য ছায়াপথের মাধ্যাকর্ষণের মধ্য দিয়ে আসবার সময়ে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লালের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এই ধারণা সত্য হলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ আর স্বীকার করা চলবে না এবং তার উপর নির্ভরশীল উপরিউক্ত উভয় মতবাদই একেবারে বাতিল হয়ে যাবে।

বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার অবদান

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে সব বিভিন্ন মতবাদের কথা এতক্ষণ বলা হলো, সে সবই বিজ্ঞানীদের কল্পনা-প্রসূত এবং কাগজে-কলমে অঙ্ক কষে নির্ধারিত। কারণ এই সকল বিভিন্ন মতবাদকে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করা এতদিন সম্ভব হয় নি। কিন্তু বর্তমানে বেতার দূরবীক্ষণের সাহায্যে অনেক অসুবিধা দূর হয়েছে এবং এই জাতীয় পর্যবেক্ষণের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডে সকল ছায়াপথই একদিন সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে একই সময়ে সৃষ্ট হয়েছিল। তাই তাদের সকলেই এক বয়সী। কিন্তু স্থিতিশীল ব্রহ্মাণ্ডে ছায়াপথের বয়স বিভিন্ন; কারণ অপেক্ষাকৃত পুরনোরা আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সেই স্থানে সৃষ্ট হচ্ছে নতুন নতুন ছায়াপথ। আবার, প্রথম মতবাদ অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ আরম্ভ হবার সময় সকল ছায়াপথই পরস্পরের খুব কাছাকাছি প্রায় আবদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং এখন তারা পরস্পর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ও ক্রমশঃ পড়ছে। কিন্তু স্থিতিশীল ব্রহ্মাণ্ডের সমর্থকেরা বলেন, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছায়াপথগুলি একই অবস্থায় আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম আলোক-দূরবীক্ষণও এই সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। অপর পক্ষে বেতার-জ্যোতির্বিদদের চোখে ইতিমধ্যেই একাধিক সংঘর্ষমান ছায়াপথ ধরা পড়েছে। পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডকে মেনে নিলে দেখা যাবে, ব্রহ্মাণ্ডের সেই আদিম পিণ্ড অবস্থাতে ছায়াপথগুলি একেবারে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে ছিল। সেই অবস্থা থেকেই যদি

প্রসারণ আরম্ভ হয়ে থাকে, তবে বলা যেতে পারে, আমরা যত অতীতের দিকে পিছিয়ে যাব, ততই সংঘর্ষমান ছায়াপথের সংখ্যাও বেশী দেখতে পাব। এইভাবে কয়েক শত কোটি বছর পূর্বে প্রসারণ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরে—বেশ কিছু সংখ্যক ছায়াপথকে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষমান অবস্থায় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যেতে পারে। কিন্তু স্থিতিশীল মতবাদের অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে কখনও এরকম দেখা যাবে না। তাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা কি—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান বা অল্প আগের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো। অনুরূপভাবে খুব দূরের জ্যোতিষ্ক-গুলি—যেমন, যারা কয়েক শত কোটি আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত—তাদের পর্যবেক্ষণ করে ব্রহ্মাণ্ডের আদিম অবস্থা আমরা দেখতে পারি। কারণ সেই সময়ে যে সব তরঙ্গমালা বিকিরিত হয়েছিল, তারাই কয়েক শত কোটি বছর ভ্রমণ করবার পর এতদিনে আমাদের কাছে এসে পৌঁছালো। কাজেই খুব কাছের ও খুব দূরের জ্যোতিষ্কদের পর্যবেক্ষণ করলেই ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান ও অতীতকে তুলনা
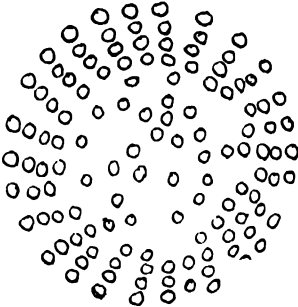
(ক)
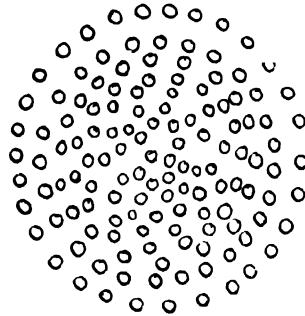
(খ)

৭নং চিত্র।

ব্রহ্মাণ্ডের চেহারা। (ক) পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড—এক্ষেত্রে সুদূরের ছায়াপথগুলি পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে ও কাছের গুলি দূরে ছড়িয়ে পড়েছে।
(খ) স্থিতিশীল মতবাদ অনুসারে অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ড—নিকটে ও দূরে ছায়া-পথের ঘনত্ব সমান।

অপরিবর্তনীয়, না পরিবর্তনশীল—তা জানতে হলে আমাদের সুদূর অতীতের ব্রহ্মাণ্ডের চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার তুলনা করে দেখতে হবে

এখন, আমরা জানি যে, এক আলোক-বর্ষ দূরে যে জ্যোতিষ্কটিকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃতপক্ষে তা এক বছর আগে সেই জ্যোতিষ্কটির অবস্থা নির্দেশ করছে। কারণ যে আলোক আমাদের কাছে আজ এসে পৌঁচেছে, তা সেই জ্যোতিষ্ক থেকে রওনা হয়েছিল এক বছর আগে, তাই আমাদের কাছাকাছি যে সব জ্যোতিষ্ক রয়েছে, তাদের পর্যবেক্ষণ করলেই ব্রহ্মাণ্ডের করা যাবে। যদি দেখা যায় যে, নিকটবর্তী ছায়াপথগুলি থেকে দূরবর্তী ছায়াপথগুলি পরস্পরের বেশী কাছাকাছি রয়েছে, অর্থাৎ তাদের ঘনত্ব বেশী, তবে বুঝতে হবে, অতীতে সব ছায়াপথই পরস্পরের খুব কাছাকাছি ছিল এবং বর্তমানে তারা ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তনশীল। তদ্বিপরীতভাবে ছায়াপথের ঘনত্ব যদি বিভিন্ন দূরত্বে একই থাকে, তবে আমরা ধরে নেব যে, ব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্তনীয় (৭নং চিত্র)।

বর্তমানে বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ছায়াপথের ঘনত্ব নির্ধারণ করা

হচ্ছে। কিন্তু জ্যোতিষ্কদের সঠিক দূরত্ব সোজাসুজি পরিমাপ করা খুবই অসুবিধাজনক। তাই এই ব্যাপারে অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। যে জ্যোতিষ্ক আমাদের যত বেশী কাছে, সে তত উজ্জ্বল, তার বিকিরণ তত তীব্র এবং যে যত দূরে, তার বিকিরণ তত ক্ষীণ। জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্য বা বিকিরণের তীব্রতাকে তার দূরত্বের পরিমাপক হিসাবে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন তীব্রতাসম্পন্ন বিকিরণকারী জ্যোতিষ্কের সংখ্যা উপরিউক্ত উভয় মতবাদ থেকেই অঙ্ক কষে হিসাব করা যায়। বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ এই সংখ্যার সঙ্গে তা তুলনা করলেই বিভিন্ন মতবাদের প্রমাণ পাওয়া যাবে। স্বভাবতঃই এই পর্যবেক্ষণে ক্ষীণতম বিকিরণকারী জ্যোতিষ্ককেও গণ্য করতে হবে। কারণ যে জ্যোতিষ্ক যত ক্ষীণ, সে আমাদের তত বেশী দূরে আছে, ফলে তার মাধ্যমে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের তত বেশী অতীত অবস্থাকে দেখতে পাচ্ছি। তাই দুটি বিরুদ্ধবাদী মতবাদের মধ্যে প্রত্যাশিত তফাৎটাও তত বেশী করে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। তবে পর্যবেক্ষকগণকে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে, তাঁরা যেন আমাদের কাছাকাছি অবস্থিত কিছু ক্ষীণ জ্যোতিষ্কের সঙ্গে দূরবর্তীদের মিশিয়ে না ফেলেন।

গত কয়েক বছরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অষ্ট্রেলিয়াতে এই জাতীয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক রাইল ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্যবেক্ষণের ফলাফল কিন্তু স্থিতিশীল মতবাদকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে—দুইয়ের মধ্যে একেবারে মিল নেই। এথেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ব্রহ্মাণ্ড মোটেই অপরিবর্তনীয় নয়, তা পরিবর্তনশীল। এদিকে আবার, ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বহু সংখ্যক বেতার-নক্ষত্র নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। তার ফলাফল কিন্তু স্থিতিশীল মতবাদকেই কিছুটা সমর্থন করে। অবশ্য এঁদের পর্যবেক্ষণের সকল তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। তাই প্রসার্যমান ব্রহ্মাণ্ডের দুই বিরুদ্ধবাদী মতবাদের কোন্‌টি খাঁটি, তা নির্ধারণ করতে হলে আমাদের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

উপসংহার

পরিশেষে এই কথা বলা যেতে পারে যে, মাত্র ত্রিশ বছর আগে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা নামে বিজ্ঞানের যে নতুন শাখার অবির্ভাব হয়েছে, গত দুই দশকের মধ্যে তা আশাতীতভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বিজ্ঞানীরা আজ বুঝেছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ মানচিত্র যদি আঁকতে হয়, তবে বেতার-দূরবীক্ষণই তাঁদের প্রধান হাতিয়ার, সে ক্ষেত্রে আলোকের সাহায্য খুব কার্যকরী নয়। বর্তমানে বেতার-জ্যোতির্বিদদের হিসাবে ৩০০০-এরও কিছু বেশী বেতার-তরঙ্গ বিকিরণকারী কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ১০০-টিরও কম সংখ্যক তথাকথিত বেতার-নক্ষত্রকে দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই সনাক্তকরণের ফলে বেতার-নক্ষত্রদের একটি অদ্ভুত প্রকৃতি লক্ষ্য করা গেছে—এরা প্রায় সকলেই একেকটি অসাধারণ বস্তু। যেমন, কোনটি সংঘর্ষমান ছায়াপথ, কোনটির সৃষ্টি হয়েছে তারকার বিস্ফোরণের ফলে, কোনটি দুর্বোধ্য কোয়াসার ইত্যাদি।

এই ভাবে বেতার-ব্রহ্মাণ্ডকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর সর্বত্রই রয়েছে কোন না কোন আকারে বস্তুর সমাবেশ। আমাদের পৃথিবী, গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ বা তথাকথিত মহাশূন্য—যেখানেই হোক না কেন, সর্বত্রই বস্তুর মৌলিক কণিকা সমূহ প্রচণ্ডভাবে ছুটাছুটি করছে। বিভিন্ন অবস্থায় বিদ্যুৎ-কণিকার এই গতির ফলেই সৃষ্টি হয় বিকিরণের এবং এই বিকিরণই হচ্ছে সুদূর

পর্যবেক্ষণের একমাত্র উপায়। এথেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি—ব্রহ্মাণ্ড কোথাও এবং কখনও নিশ্চল নয়, সে সর্বত্র এবং সর্বদাই 'সক্রিয়'।

মানুষের বৈজ্ঞানিক অবদানের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সে তার ঐকান্তিক সাধনার ফলে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে। তাই একথা হয়তো আজ জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বও তার কাছে অজানা থাকবে না। এই ব্যাপারে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা বর্তমানে তার প্রধান সহায়। ব্রহ্মাণ্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের উপর এর প্রভাব ইতিমধ্যেই মানুষ উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এই সব মতবাদ সম্বন্ধে তার ধারণা এখনও যথাযথভাবে পরিষ্কার হয় নি।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা এখনও কৈশোর অতিক্রম করে নি। এই অল্প বয়সেই যে সব অবদানের পরিচয় সে দিয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন কৌশলে যে সব দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশগুলিতে আরও বড় বড় এরিয়েল ও অন্যান্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে। এগুলি যখন এক সঙ্গে কাজ করবে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের আরও অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হবে—সন্দেহ নেই। আমরা বোধ হয় খুবই সৌভাগ্যবান যে, এই যুগে জন্মেছি, যখন মানুষের অনেক দুঃস্বপ্নও বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

অথর্ববেদে স্বাস্থ্য ও রোগ সম্বন্ধে ধারণা

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

সুপ্রাচীন ভারতে আর্যগণের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ চতুর্বেদের অন্যতম অথর্ববেদ। কোন্ সময়ে এই বেদ-গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে বহু মতদ্বৈধ বর্তমান। বালগঙ্গাধর তিলকের (১) মতে, অথর্ববেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা অংশে উষার আহ্বান সম্বন্ধীয় মন্ত্রগুলি হইতে তাঁহার ধারণা হয় যে, আর্যগণ যখন উত্তর মেরুবাসী ছিলেন, তখনই এই বেদ রচিত হইয়াছিল; কারণ উষার ঐ রূপ উত্তর মেরু ছাড়া অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বশেষ হিমবাহ যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ হইতে ৮,০০০ বৎসরের মধ্যবর্তী কোনও সময়ই অথর্ববেদের কাল। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত (২) এবং ফার্কুহার্ট (৩) এই বেদে ঋগ্বেদের অনেকগুলি মন্ত্রের পুনরুল্লেখ লক্ষ্য করিয়া ইহাকে ঋগ্বেদের পরবর্তীকালীন গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। উভয় বেদের মন্ত্রগুলির রচনা-শৈলীর সাদৃশ্য হইতে স্বতঃই মনে হয় যে, অথর্ব-বেদ ঋগ্বেদের সমসাময়িক [উইন্টারনিট্জ্ (৪) এবং জলীর (৫) মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩,০০০ হইতে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে] না হইলেও খুব বেশী পরবর্তী নহে। আবার অথর্ববেদের উনবিংশ কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে কোন কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক (৬) বলেন যে, এই গ্রন্থের রচনাকাল

১৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং অথর্ববেদের প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত। ভিষগাচার্য শুশ্রুতের মতে, হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ, পরবর্তী কালে পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিচিত হইলেও তাহা অথর্ববেদ হইতেই সমুদ্ভূত এবং সেই কারণে এই বেদের একটি 'উপাঙ্গ' ছাড়া আর কিছুই নহে। কুটুম্বিয়ার (৭) ধারণা, ধর্মের অনুশাসন এবং অলঙ্ঘনীয়তার ছাপ দেওয়ার জন্যই অথর্ববেদের এই উপাঙ্গকে একটি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চম বেদের আসন দেওয়া হইয়াছিল।

অথর্ববেদের 'প্রপাঠক' বা খণ্ড অংশগুলির মত ঋগ্বেদে কোন অংশবিশেষ নাই, কিন্তু ঋগ্বেদের মতই কাণ্ড, বিভাগ বা অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলি আবার কতকগুলি সূক্তে বিভক্ত। সূক্তগুলি দুই প্রকারের—(১) অর্থসূক্ত এবং (২) পর্যায়সূক্ত। প্রথম প্রপাঠকে, প্রথম হইতে সপ্তম কাণ্ড, দ্বিতীয় প্রপাঠকে অষ্টম হইতে দ্বাদশ এবং তৃতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ এবং পরিশিষ্টে ঊনবিংশ এবং বিংশ কাণ্ড। সুতরাং অথর্ববেদে সাকুল্যে চারিটি বিশেষ খণ্ড, কুড়িটি কাণ্ড, ৫৯৮টি সূক্ত এবং ৫০৩৮টি পদ্য আছে।

প্রথম হইতে ঊনবিংশ কাণ্ডের মধ্যে ইতস্তত: মোটামুটিভাবে দেহ-সংস্থান (Anatomy), শ্বসন, রক্তসংবহন, খাদ্যের পরিপাক, পুষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় শারীরবৃত্ত (Physiology), স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগের প্রতিষেধক, বহু রোগের লক্ষণসমূহ এবং তাহাদের চিকিৎসা, শুধু ওষধির সাহায্যেই নহে, সূর্যাতপ, জল ও নির্মল বায়ুর দ্বারা চিকিৎসা এবং রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও দীর্ঘায়ু লাভ সম্বন্ধে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া অ্যালবার্ট (৮) তাঁহার "চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস" নামক পুস্তকে বলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে ঐতিহাসিকদের মনে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, স্বাস্থ্য ও রোগ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সর্বপ্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল ধর্মগ্রন্থ ও মন্ত্র-তন্ত্র হইতেই

নবম কাণ্ডে, বিস্ময়কর মানব-দেহ ও গুল্ফসন্ধি, পদ, করাঙ্গুলি এবং দেহরন্ধ্রগুলি (৯.২.১), জানুসন্ধি এবং ঊরু (৯.২.২), জানু, ঊরু, নিতম্ব এবং তদুপরি নমনীয় দেহকাণ্ডযুক্ত দৃঢ় ঋজুদেহ (৯.২.৩), গ্রীবা, বোঁটাযুক্ত স্তন (৯.২.৪), শক্তিধর বাহু এবং দেহোপরি স্কন্ধ (৯.২.৫), চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও মুখের সাতটি রন্ধ্র (৯.২.৬), দুইটি চোয়ালের মধ্যবর্তী সুপুষ্ট রসনা (৯.২.৭), ললাট ও করোটির পশ্চাদ্‌ভাগ দ্বারা আবৃত মস্তিষ্ক (৯.২.৮) এবং সর্বশেষে কি ভাবে অথর্বন মস্তিষ্ককে শিরোদেশ ও হৃদয় হইতে পৃথকভাবে জুড়িয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে শুদ্ধস্রোতকে পরিবাহিত করিয়াছেন, তাহারও বিবরণ আছে। তাছাড়া কেশ, অস্থি, স্নায়ু, পেশী ও মজ্জা (৯.৮.১১) (৯.৮.১২) ঊরু, পদ, জানুসন্ধি, শির, হস্ত, মুখমণ্ডল পর্শুকাসমূহ, স্তনবৃন্ত প্রভৃতি (৯.৮.১৪), শির, হস্ত, মুখমণ্ডল, জিহ্বা, গ্রীবা, কশেরুকাসমূহ যথাস্থানে সংযোজিত অবস্থায় ত্বকের দ্বারা আবৃত (৯৮.১৫) এবং এইভাবেই দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট মরমানবদেহে তাঁহাদের প্রবেশ ও অধিষ্ঠান ঘটিয়াছিল (৯৮.১৩)। এই কাণ্ডেই শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়

(ক) "প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস, দৃষ্টি, শ্রুতি, অবিনশ্বরতা ও নশ্বরতা, বহিঃশ্বাস ও ঊর্ধ্বশ্বাস, বাক্যবিন্যাস, মন প্রভৃতির দ্বারা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি'র (৯,৮,৪) উল্লেখের পর যে শ্বসন-ক্রিয়ার সাহায্যে এই সকলই সম্ভব হয় এবং যাহার ফলে মানুষ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠ হয়, তাঁহাকে প্রণাম জ্ঞাপন করা হইয়াছে (৯.৪.১); যথা—

(খ) "হে প্রশ্বাস, হে নিঃশ্বাস! দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায়, তোমাকে প্রণাম"। (৯ ৪.৭)

(গ) "হে শ্বসন (বায়ু), তোমার প্রিয় এবং প্রিয়তর যে দেহ, তাহার মধ্যে রোগ প্রতিকারের এবং সুস্থ জীবনধারণের ক্ষমতা দান কর।" (৯.৪ ৯)

(ঘ) "পিতা যে ভাবে প্রিয় পুত্রকে আবৃত করিয়া রাখেন, সকলের প্রভু শ্বসনবায়ু। সেই ভাবেই তুমি শ্বসনকারী ও শ্বসনহীন সবকিছুকে ঢাকিয়া রাখ।" (৯ ৪,১০)

(ঙ) "শ্বসন বায়ুই বিরাজ, শ্বসন বায়ু সহজ পথ এবং তাহাই সকল উপাসনা"। (৯.৪.১২)

(চ) "মানুষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, ভ্রূণেরও শ্বসন আবশ্যক, যখনই তাহার অভ্যুদয় ঘটে, তখনই সে প্রসূত হয়।" (৯.৪.১৪)

(ছ) "শ্বসন বায়ু! আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে আমি (গর্ভ) জলে ভাসমান ভ্রূণে পরিণত হইব। আমি তোমাকে আমার দেহে আবদ্ধ রাখিব।" (৯.৪.২৬)

(জ) "সূর্য ও বায়ু মানুষকে যথাক্রমে চক্ষু ও শ্বাস দিয়াছেন।" (৯ ৮.২১)

নিঃশ্বাস বায়ুর (কার্বন ডাইঅক্সাইড?) সাহায্যে চাউল ও বার্লির শ্বেতসারের উৎপত্তি হয় তাহারও উল্লেখ আছে, যথা—"প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসই ধান্য ও যব……যবের মধ্যেই শ্বসনবায়ু অধিষ্ঠিত, নিঃশ্বাসেরই নাম ধান্য।" (৯.৪.১৩)

"শ্বসন বায়ুই শির, খাদ্য ও মনকে রক্ষা করে"। (৯.২ ২৭)

"মানুষের উৎপত্তির স্থান, ব্রহ্মার আবাস-দুর্গের কথা যে জানে, বৃদ্ধ বয়সের আগে দৃষ্টি এবং শ্বাস-বায়ু তাহাকে ত্যাগ করে না"। (৯.২.৩০)

ইহার পরই বিস্ময়ের সঙ্গে শাশ্বত চিরন্তন প্রশ্নের অবতারণা, "কে মানুষের মধ্যে বায়ুস্রোতকে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস রূপে প্রবাহিত করিতেছেন? কে সংগোপনে তাহার মধ্যে এই সকল ঘটাইয়াছেন? কে তাহাকে প্রজননের ক্ষমতা দিয়াছেন? কে দিয়াছেন তাহাকে বুদ্ধি-বিবেচনা? কে শিখাইয়াছেন তাহাকে নাচ এবং গান?" (৯.২.১৭)

শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া এবং তাহাদের ব্যত্যয় পরবর্তী ঘটনা। যেমন—"নারীর মধ্যে ভগবান দিলেন বৈচিত্র্য (রঙের) এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা" ৯.৮.১৭), "নিদ্রা, ক্লান্তি, দুঃখ, বার্ধক্য, মাথার টাক, পাকাচুল, প্রভৃতির প্রবেশ ঘটিল পরে" (৯ ৮ ১৯), "চৌর্য, কুকার্য, ত্রুটি, সততা, ত্যাগ, গৌরব, বীর্য, শক্তি ও প্রভুত্বের প্রবেশও ঘটিল' (৯.৮.২০), "বৃদ্ধি এবং হ্রাস, বদান্যতা ও কার্পণ্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও প্রবেশ করিল" (৯.৮.২১), "পুলক, আনন্দ, সম্ভোগ ও উপভোগ, উচ্চহাস্য, দৌড়-ঝাঁপ, নৃত্যও দেখা দিল।" (৯.৮.২৪)

পরিশেষে সিদ্ধান্ত করা যায় "অতএব যে পুরুষকে এইভাবে সম্পূর্ণরূপে জানে, তাহার মনে হয়, এই তো ব্রহ্মা, কারণ তারই মধ্যে সকল দেবতার অধিষ্ঠান। (৯.৮ ৩২)

ঊনবিংশ কাণ্ডে আছে প্রার্থনা—"মুখে আমার ভাষা দাও, নাসিকায় দাও শ্বাস, চোখে দাও দৃষ্টি, কানে দাও শ্রুতি, দাও আমাকে অশ্বেত কেশ, অভগ্ন দাঁত এবং বাহুতে বিপুল শক্তি" (১৯.৬০.১)। আরও আছে—"দাও আমার উরুতে বল, জঙ্ঘার ক্ষিপ্রতা এবং পদতলে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার ক্ষমতা, যাহাতে আমার সবকিছু অক্ষত ও অব্যাহত থাকে এবং আমার কখনও পতন না ঘটে"। (১৯.৬০.২)

অক্ষতযোনি কুমারী সম্বন্ধে আছে "ঐরূপ কন্যা পিতৃ, মাতৃ কিংবা ভ্রাতৃগৃহে বাস করিবে এবং পিতা কর্তৃক সম্প্রদত্তা অবস্থায় অবগুণ্ঠনাবৃত শির না হওয়া পর্যন্ত অসিত, কাশ্যপ ও গয়ার মন্ত্রোচ্চারণে তাহার যোনিদেশ উন্মুক্ত হইবে না।" (১.১৪.২০)

প্রজনন-ক্ষমতা, গর্ভসঞ্চার, গর্ভাবস্থা এবং যথাসময়ে সন্তান প্রসব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত ধারণারও প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

(ক) "পুরুষদেহে উৎপন্ন ও বর্ধিত বীজ-পাতনে নারীদেহে পুত্রোৎপাদন হয়", (৬.১১.২);

(খ) দেবতা-যুগল তোমার দেহে যে দুইটি নল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই আছে তোমার প্রজনন-ক্ষমতা", (৬.১৩৮.৪);

(গ) "তোমার দেহে কম্পিত তীরফলকের মত একটি পুং-ভ্রূণের প্রবেশ ঘটুক এবং এইস্থানে দশ মাস (চান্দ্র ?) পর্যন্ত বর্ধিত তোমার একটি বীর পুত্র প্রসূত হউক", (৩.২৩.২) ;

(ঘ) "যে সকল দৈব ওষধির পিতা স্বর্গ, মাতা পৃথ্বী এবং মূল সিন্ধু, তাহাদের প্রভাবে তোমার পুত্রলাভ ঘটুক", (৩.২৩.৬) ;

(ঙ) "স্বাভাবিক গর্ভবতী নারীর দেহ শিথিল অস্থিসন্ধিগুলি আলগা হউক সন্তান-প্রসব কালে", (১০.১১.১) ;

(চ) "পূষান্ তাহার গর্ভমুক্ত করুন, আমরা যোনিকে আলগা করিয়া দিই, পূষান্ তাহাদের শিথিল করিয়া দিন", (১.১১.৩) ;

(ছ) "মূত্রাধারকে ঠেলিয়া যোনি ও বস্তিদেশকে আলগা করিয়া গর্ভফুলকে ভ্রূণ হইতে পৃথক করিবার পর তাহা নামিয়া আসুক", (১.১১.৫) ;

(জ) "মাংস, চর্বি ও মজ্জা হইতে বিমুক্ত নানা রঙীন চিহ্নযুক্ত পিচ্ছল গর্ভফুল, কুকুরের আহার্যরূপে নামিয়া আসুক", (১.১১ ৪) ;

(ঝ) "বাতাসও মনের মত উড়িতে উড়িতে পাখী যেভাবে নামিয়া আসে, সেইভাবে দশমাসের ভ্রূণ গর্ভফুলসহ অবতরণ কর", (১ ১১.৬)।

সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রসব-পরবর্তী ব্যবস্থার মধ্যে শিশুর সস্তান দুইটির উপর কিছুক্ষণ জননীর হস্তা-বলেপনেরও উল্লেখ আছে। (৭.৬.১)

শিশুর দুইটি দন্তোদ্গমের পর মাতৃস্তন্যদান বন্ধ করিয়া কি করা উচিত, সেই সম্বন্ধে আছে— শিশু তখন খাইবে ভাত, যব, শিম ও তিল— তাহাতেই তাহার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটিবে। ঐ সঙ্গে ঐ সদ্য উদ্গত দাঁত দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"দেখ, সাবধান, তোমরা যেন পিতা-মাতাকে আহত করিও না।" (৬.১৪০.২)

পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবেও ধান্য, যব, তিল এবং অন্যান্য শস্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(ক) "তোমার প্রতি ধান্য ও যব প্রসন্ন হউক। এদের দ্বারা রোগের প্রদাহ দূর হইবে এবং পেটের ব্যথাও দূর হইবে," (৭.২.১৮) ;

(খ) "চাষের দ্বারা লব্ধ শস্যজাতীয় ফসলের দুগ্ধ পান কর, এরূপ খাদ্যের কোন অনিষ্টকর ক্রিয়া নাই," (৭.২.১৯)।

রৌদ্র, জল ও বায়ু শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই নহে, রোগ আরোগ্যের জন্যও অত্যাবশ্যক বলিয়া বর্ণিত।

(ক) "জল শুধু রোগ প্রতিষেধকই নহে, রোগনিবারকও বটে! জল সর্বরোগহর, তাহা তোমাকে নীরোগ করুক," (৬ ৪১.৩) ;

(খ) "বাতাস নিম্নে প্রবাহিত হউক, সূর্যালোক নিম্নে অবতরণ করুক, অহননীয়া গাভীর দুগ্ধ নামিয়া আসুক, ঐ সঙ্গে তোমার রোগ যন্ত্রণাও হ্রাস পাইবে" (৬ ৯১.২) ;

(গ) "তোমার শ্বাস যেন বন্ধ হয় না, তোমার নিঃশ্বাস যেন ভিতরে আবদ্ধ থাকে না, সকলের অধিকর্তা সূর্য যেন তাঁহার রশ্মির দ্বারা তোমার মরণকে প্রতিহত করেন," (৫.৩০ ১৬) ;

(ঘ) "আকাশ হইতে সূর্যের সপ্তরশ্মি নদী ও সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিয়া রোগের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করে," (৭.১০৭.১১২) ;

(ঙ) "তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ হইতে প্রপাত সিন্ধুনদের স্বর্গীয় জল আমার বুকের জ্বালা (অম্বল-রোগ জনিত ?) দূর করুক," (৬.২৪.১০) ;

(চ) "যাহার দ্বারা চক্ষু, গুল্ফ এবং পদতলের সম্মুখভাগে প্রদাহ ঘটে, সর্বরোগহর—সর্বরোগের ভিষকরূপী জলের দ্বারা তাহার প্রতিষেধ হউক," (৬ ২৪.২)।

জ্বর, শিরঃপীড়া ও অন্যান্য শিরোরোগ, কর্ণ-পীড়া, বিলোহিত রোগ (রক্তশূন্যতা), শ্লৈষ্মিক প্রদাহ, হ্যাবা বা কামলা রোগ, ক্রিমিরোগসমূহ, কুষ্ঠব্যাধি, আমাশয় ও অন্যান্য আন্ত্রিক রক্তপাত, বুকজ্বালা, সশব্দ পেটকাঁপা, মাথায় টাক, ক্ষিপ্ততা, নানা বৈষিক ক্রিয়া এবং ক্ষেত্রিয় নামে একটি

সীমাবদ্ধ স্থানিক (Endemic) রোগেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—

(ক) "শিরঃপীড়া, শিরোরোগ, কর্ণপীড়া, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগকে আমরা মন্ত্রের দ্বারা দূরীভূত করি," (৯.৮.১) ;

(খ) "প্রমত্ততাই অন্ধত্ব ঘটায়, প্রতিটি শিরঃ-পীড়া ...." (৯ ৮.৪) ;

(গ) "ছিন্ন ও ক্ষীয়মান প্রত্যঙ্গ, ও তাহার বিশালপাক রোগ, এই সকলই...... .." (৯.৮.৫) ;

(ঘ) "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কামলারোগ এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের অস্বাভাবিক শব্দ আমরা মন্ত্রের প্রভাবে দূর করি," (৯ ৮.৯) ;

(ঙ) এমন একটি মলমের উল্লেখ আছে, যাহার দ্বারা কামলা রোগ, তক্‌মন (ম্যালেরিয়া ?), শ্লেষ্মা-রোগ—এমন কি, সর্প-দংশনেরও চিকিৎসা করা হইত (৪ ৯ ৮)। এই ফলপ্রদ মলমটিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"হে মলম, একটির পর একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক অস্থিসন্ধিতে প্রলিপ্ত হইয়া তুমি পরাক্রমশালী মধ্যমাশীর মত (রোগ) যক্ষ্মাকে বিদূরিত কর," (৪ ৯ ৯) ;

(চ) "বলাসা (শ্লেষ্মা রোগ ?) ভস্মীভূত হউক"...(৯.১০.১০) ;

(ছ) গুহ্যদ্বার পথে পেটের 'ভুটভাট' শব্দ (কহাবতা) দূর হউক। মন্ত্রোচ্চারণে আমি সকল বৈষিক ক্রিয়া দূর করি," (৯৮.১১) ;

(জ) "উদর, ফুস্‌ফুস, নাভি এবং হৃদয় হইতে আমি সকল বৈষিক ক্রিয়া দূর করি," (৯.৮.১২) ;

(ঝ) "বুক জ্বালা ও কামলা রোগ সূর্যের প্রতি উর্ধ্বে ধাবিত হউক এবং তাহার সর্বশরীরে লোহিতাভা দেখা দেওয়াতে তাহার সকল ব্যাধি দূর এবং দীর্ঘজীবন লাভ হউক," (১.২২.২) ;

(ঞ) "অস্থি ও অস্থিসন্ধির রোগ সংশ্লিষ্ট শ্লেষ্মাজনিত হৃদ্‌রোগ (Rheumatic heart ?), যাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্থিসন্ধিগুলিকে অক্ষম করিয়াছে, তাহাকে দূর কর" (৬.১৪.১)।

নিঃসংজ্ঞ (Anæsthetic) ও গুটিকাকার (Nodular) ত্বক্‌যুক্ত দুই প্রকারের কুষ্ঠব্যাধি এবং একটি বিশেষ ওষধির দ্বারা তাহাদের সাফল্য-জনিত চিকিৎসারও উল্লেখ আছে ; যেমন—

(ক) "হে কৃষ্ণ ওষধি ! হে রঞ্জনী, তুমি কুষ্ঠব্যাধিজনিত ত্বকের পলিত অংশগুলিকে স্বাভাবিক করিয়া দাও।" (১.২৩.১) ;

(খ) "হে রঙীন ওষধি, কুষ্ঠব্যাধিজনিত ত্বকের পলিত অংশগুলিকে দূর করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরাইয়া আন," (১.২৩.২) ;

(গ) "অসুরীগণ (Asura wome।) কুষ্ঠ-ব্যাধি নিরোধক এই ঔষধটি প্রথমে প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহার দ্বারাই পলিত ত্বকাংশগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং ত্বক তাহার স্বাভাবিক রূপ ফিরিয়া পাইয়াছে," (১২৪২)।

তকমন নামে একটি বিশেষ রোগের উল্লেখ আছে ; তাহার স্থানিকত্ব, প্রাদুর্ভাবের সময় ও বিশিষ্ট রোগলক্ষণসমূহের বিবরণ হইতে মনে হয়, তাহা 'ম্যালেরিয়া' রোগ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয়।

(ক) "হে শৈত্যাধিক্যময় জ্বররোগ তোমাকে প্রণাম ! একান্তরী, দ্ব্যন্তরী, ত্র্যন্তরী কিংবা বিরামহীন অতি তাপমাত্রাযুক্ত (Intermittent, tertiang, quarterner or remittant with high temperature) জ্বররোগ, তোমাকে প্রণাম," (১.২৫.৪) ;

(খ) তুমি দেহকে অতি তাপে দগ্ধ করিয়া দেহকে পীতাভ (রক্তশূন্য ?) করিয়া তোল," (৫.২২.২) ;

(গ) "এই জ্বরে ত্বক লোহিতাভ হয় ও তাহার উপর কালো কালো দাগ থাকে", (৫.২২.৩) ;

(ঘ) "শৈত্য, কাশি, কম্পন এবং পরবর্তী

উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত হে জ্বর, তোমার প্রক্ষেপ ভীতিসঙ্কুল", (৫.২২.২০) ;

(ঙ) "ত্র্যন্তরী, দ্ব্যন্তরী, অবিরাম শরৎকালীন শৈত্য ও তাপযুক্ত জ্বর, গ্রীষ্মকালীন এবং বর্ষাকালীন জ্বর তোমার প্রভাবে বিদূরিত হউক" [১.১১৬ (১২১).১]।

এরূপ জ্বররোগে ফলপ্রদ কুষ্ঠ নামে একটি ঔষধেরও উল্লেখ আছে। সেই সম্বন্ধে দেখা যায় যে তুষারধবল পর্বতে তাহার উৎপত্তি এবং সেই স্থান হইতে তাহা পূর্বাঞ্চলের লোকেদের কাছে বাহিত হইয়া "কুষ্ঠ" নামে পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"হে গিরিজ শক্তিমান কুষ্ঠনামা উদ্ভিদ, তুমি এস্থানে তক্মন নামক রোগকে নাশ ও নির্মূল কর, (৫.৪.১)।

"সুউচ্চ পিতৃজাত কুষ্ঠ, সুউচ্চ তোমার অভিধান, তোমরা উভয়ে যক্ষ্মাকে বিদূরিত কর এবং এই জ্বরের জীবনীশক্তিকে নষ্ট কর", (৫ ৪.৯)।

এই ঔষধটি অন্যান্য রোগ, যেমন—উপহাত্য (Head disease attack), চক্ষুরোগ এবং কোন কোন দেহিক রোগেরও ফলপ্রদ দৈব ঔষধ বলিয়া গণ্য ছিল, (৫.৪.১০)।

ক্রিমিগুলিকে—(১) কুরুরু, (২) আলগণ্ডুস, (৩) কলুন, (৪) অবস্কব এবং (৫) ব্যাঘ্রির (চতুরক্ষিযুক্ত শ্বেতবর্ণ)—এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। কোন কোনটির রক্তশোষণের জন্য দুইটি করিয়া শৃঙ্গ (দাঁত ?) এবং কোন কোনটির মুখে বিষধারণের আধারও থাকে। ক্রিমিগুলি পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, গুল্ম, গৃহপালিত পশু এবং জল হইতে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং সকলেই সূর্যকরের প্রভাবে নষ্ট হয়, এইরূপ ধারণা ছিল (১.৩২.২,৩ এবং ২.৩১ ২,৩)।

"আদিত্য উদিত হইয়া তাঁহার রশ্মির দ্বারা সকল প্রকার ক্রিমিকে নাশ করুন," (১.৩২ ১) এবং অন্যত্র পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হইয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল (পরজীবী) জীবাণু ও ক্রিমিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন", (৫.২৩.৬)

'বিষ' প্রতিষেধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার উল্লেখ আছে—

(ক) "এই জলের দ্বারা বারণাবতী অমৃতময় হইবে এবং তাহার প্রভাবে সকল বিষের ক্রিয়া প্রতিহত হইবে", (৪.৭ ১);

(খ) "এইরূপ করম্ভের (Gruel) দ্বারা পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের বিষের নাশকতা লোপ পাইবে", (৪.৭.২);

(গ) "স্নেনসহ তিলের কাথ ধূমায়িত অবস্থায় গ্রহণ করিলে ক্ষুধার্ত রুগ্নলোক রক্ষা পাইবে", (৪.৭.৩)।

সর্পবিষের প্রতিষেধক একটি উদ্ভিদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

(ক) "ডোরাকাটা, কৃষ্ণসর্প এবং পৃদাকু সর্পের অর্ধেক বিষ ইহার দ্বারা নষ্ট হয়", (৭.৫৬.৫৮);

(খ) "এই উদ্ভিদ মধুরাস্বাদ যুক্ত, ইহা হইতে মধু-রস ক্ষরিত হয় এবং ইহার প্রভাবে শুধু সর্প-বিষই নহে, কীট-পতঙ্গের দংশনজনিত বিষও নষ্ট হয়," [৭,৫৬(৫৮),১];

(গ) "যখনই দংশন কিংবা চোষণের ফলে দেহে বিষ সঞ্চারিত হয়, তখনই বৈবিক ক্রিয়াকে নষ্ট করিবার জন্য আমরা তোমার শরণাপন্ন হই," [৭.৫৬(৫৮)৩]।

ক্ষিপ্ততার প্রতিষেধক সম্বন্ধে আছে—

(ক) "এই যে লোকটি হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় চীৎকার করিতেছে, হে অগ্নি, তুমি তাহাকে ঔষধটি দাও যাহাতে তাহার মস্তিষ্ক-বিকার দূর হয়" (৬.১১১.১) ;

(খ) "যদি তোমার চিত্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অগ্নি তোমার মনকে প্রশমিত করুন। আমি আমার সুপরিজ্ঞাত ঔষধের দ্বারা তোমার মনোবিকার দূর করিব," (৬ ১১১.২) ;

(গ) "দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণজনিত পাপ এবং দানব-প্রভাবিত পাপজনিত মনোবিকার আমার সুপরিজ্ঞাত ঔষধের দ্বারা বিদূরিত হইবে," (৬.৩.৩)।

মাথার চুল পড়া, টাক, অসংবৃত কেশ প্রভৃতি দৈহিক সৌন্দর্যের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ঐ সকলের প্রতিষেধক ছিল মধুসহ যব এবং শামী উদ্ভিদ; যথা—

(ক) "তুমি নেশার উপাদান; পতনোন্মুখ ও অবিন্যস্ত কেশহেতু মানুষ লোকের কাছে উপহাস্যাস্পদ হয়—তাহাই তোমার দ্বারা প্রতিহত হয়। হে শামী, তুমি শত শাখা বিস্তার করিয়া বর্ধিত হও," (৬.৩০.২);

(খ) "মহাপত্র শোভিত পূত উদ্ভিদ! বৃষ্টিধারা তোমার মহত্ত্বকে বর্ধিত করে। জননী যেমন পুত্রের প্রতি মমতাসম্পন্না, তুমিও কেশের প্রতি সেইরূপ হও," (৬.৩০.৩);

(গ) "বীতহব্য এই ওষধিকে অসিতের গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া জমদগ্নি তাহার কন্যার কেশবৃদ্ধির জন্য খনন করিয়াছিলেন," (৬.১৩৭.১);

(ঘ) "(এর প্রভাবে) কেশ সুদীর্ঘ হউক এবং জলজ আগাছার (Reed) মত কৃষ্ণকেশদাম গজাইয়া উঠুক," (৬.১৩৭.২);

(ঙ) "কেশমূলকে সুদৃঢ় কর কেশ প্রান্তকে এবং মধ্যাংশকেও প্রসারিত কর; হে ওসধি তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ কেশদাম জলজ আগাছার (Reed) মত গজাইয়া উঠুক," (৬.১৩৭.৩);

(চ) "পুরাতন কেশগুলিকে সুদৃঢ় কর, অনুদ্গত কেশকে উদ্গত কর এবং উদ্গতগুলিকে দীর্ঘতর কর," (৬.১৩৬.৩);

(ছ) "তোমার যে সকল চুল পড়িয়া গিয়াছে এবং যেগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, তাহাদের উপর আমি এই ফলপ্রদ ঔষধি প্রয়োগ করি," (৬.১৩৬.৩)।

ক্ষেত্রিয় নামক স্থানিক (Endemic) রোগের জন্য কয়েকটি পৃথক পৃথক ঔষধের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা:—

(ক) "ঈষৎ শ্বেত বাদামী রঙের সন্ধিযুক্ত যব ও তিলের খণ্ডের দ্বারা এই রোগ নিরাময় হউক," (২.৮.৩);

(খ) "দ্রুতগতি এক শ্রেণীর হরিণের মাথায়ও ইহার ফলপ্রদ ঔষধ বিদ্যমান—ঐ শিঙের দ্বারাও ক্ষেত্রিয় বিদূরিত হয়," (৩.৭.২);

(গ) "জলও সর্বরোগহর ও সর্বরোগনাশক—তাহার দ্বারাও তোমার ক্ষেত্রিয় রোগ দূর হউক," (৩.৭.৫);

(ঘ) "যদি কোন দূষিত পানীয় হইতে তোমার দেহে ক্ষেত্রিয় রোগের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার জানা ঔষধের দ্বারা তোমাকে নিরাময় করিব," (৩৭.৬)।

ধূনা বা গুগ্গুলুও রোগপ্রতিষেধক বলিয়া বর্ণিত; যথা—"যাহার নাকে ধূনা বা গুগ্গুলুর সুরভি পৌঁছিয়াছে যক্ষেরা তাহাকে বাধা দিতে পারে না, কিংবা অভিশাপও তাহাকে স্পর্শ করে না," (১৯.৩৮.১)।

আঘাতজনিত রক্তক্ষয়কে বন্ধ করিবার জন্য রক্ত-প্রণালীগুলির উভয় প্রান্ত এবং মধ্যমাংশের উপরও চাপ দিয়া তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল; যেমন—

(ক) "নীচে, উপরে এবং মাঝখানেও চাপ দাও; যদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালীর রক্তপাত বন্ধ হয়, তাহা হইলে বৃহৎগুলিরও (ধমনীর?) রক্তপাত বন্ধ হইবে", (১.১৭.২);

(খ) "শত শত ধমনী এবং সহস্র শিরার মধ্যবর্তী অংশগুলি এবং প্রান্তগুলিও একত্র বন্ধ হইয়া যাইবে," (১.১৭.৩)।

অবিরত রক্তমোক্ষণের (Flux) জন্য—(ক) "অসুরগণ বহুদূর পর্যন্ত খননের পর ক্ষত-নিরাময়ক এই ঔষধটি প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহাই রক্তক্ষরণের ফল-প্রদ ঔষধ" (২.৩.৩) এবং (খ) "উপপিকা বা

পিপীলিকাগণ সমুদ্র হইতে এই ঔষধটি লইয়া আসিয়াছে—তাহাই রক্তমোক্ষণের ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার দ্বারা রোগের প্রশমন ঘটে," (২.৩.৪)।

ছড়িয়া যাওয়ার জন্য এবং বিদ্ধক্ষতের জন্য পিপ্পলি নামক জামজাতীয় (Berry) ফল ঔষধ বলিয়া গণ্য হইত, (২.৩.৪) ; ঐ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে —"অসুরেরা তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিল দেবতারা তাহাকে তুলিয়াছেন এবং ইহা বাতক্ষতের যেমন তেমনই ছড়িয়া যাওয়া ক্ষতেরও ফলপ্রদ ঔষধ," (৬.১০৯.৩)।

ভগ্নাস্থি এবং সন্ধির অস্থির স্থানচ্যুতির (Fracture and dislocation) চিকিৎসা-প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ ছিল—

(ক) "তোমাদের দেহে যাহা ছিন্ন, প্রদগ্ধ কিংবা নিষ্পেষিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ধাতা অতি সুচারুরূপে সন্ধির সঙ্গে সন্ধিকে সংযোজিত করুন," (৪.১২.২) ;

(খ) "অস্থিমজ্জা অস্থিমজ্জার সঙ্গে, অস্থিসন্ধি অস্থিসন্ধির সঙ্গে সংযোজিত অবস্থায় তাহার উপর স্খলিত পেশী এবং ভগ্ন অস্থি স্বাভাবিক হউক," (৪.১২.৩) ;

(গ) "মজ্জার সঙ্গে মজ্জা, চর্মের সঙ্গে চর্মের সংযোগে শোণিত, অস্থি ও পেশীর সঙ্গে পেশী উদ্গত হউক" (৪.১২.৪) ;

(ঘ) "কেশের সঙ্গে কেশের এবং ত্বকের সঙ্গে ত্বকের সংযোগে রক্ত ও ভগ্নাস্থি আবার জোড়া লাগুক", (৪.১২.৫) ;

(ঙ) যদি হঠাৎ গর্তে পড়িয়া গিয়া কিংবা নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা কোন অস্থি ভগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে রথের কোনও অংশকে সন্ধির সঙ্গে সন্ধির সংযোগে বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য," (৪.১২.৭) ;

জলজ উদ্ভিদের নলাকার কাণ্ডাংশের দ্বারা মূত্রাশয় হইতে মূত্র বহিষ্কারের দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্রতা দূর করিবার উল্লেখও আছে ; যথা—

(ক) "তোমার দুইটি গবিনীবাহিত যে মূত্র মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হইয়া আছে—এইভাবে তাহার সবটুকুই সশব্দে বহির্গত হউক" (১.৩.৬) ;

(খ) "এইভাবে তোমার মূত্রনালীমুখ খুলিয়া দেওয়াতে, জলাধার হইতে মুক্ত বাঁধমুখে যে ভাবে জল নির্গত হয় সেইভাবে····· " (১.৩.৭) ;

(গ) "সমুদ্রের মত বিশাল জলাধার হইতে (সদ্য খোদিত) নালার মধ্যে যে ভাবে জল বাহির হয়, সেইভাবে তোমার মূত্রাশয়ের মুখ উন্মুক্ত হউক······" (১.৩.৮)।

অসময়ে গর্ভনাশের প্রতিষেধের জন্য একটি উদ্ভিদের উল্লেখ এবং তাহার সম্বন্ধে বিবরণে আছে—

(ক) "আমাদের আনন্দদায়ক এবং ভ্রূণের নাশকতার শত্রু বিচিত্রিত (Spotted) এই দৈব পত্র, কারণ ইহার দ্বারা অসময়ে গর্ভস্রাব প্রতিহত হয়," (৪.২৫.১) ;

(খ) "হে বিচিত্রিত পত্র, ভ্রূণখাদক এবং গর্ভনাশক রক্তপায়ী দৈত্য কণ্বকে তুমি দমন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দাও," (৪.২৫.৩) ;

(গ) "জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর কণ্বকে অন্ধকারের গন্তব্য স্থলে দূর করিয়া দাও, অনুপ্রবিষ্ট কণ্ব সেখানেই যাউক," (৪.২৫.৪)।

একই ভাবে প্রজনন ক্ষমতা-বর্ধক বীর্যস্তম্ভক আর একটি উদ্ভিদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তার সম্বন্ধে আছে—

(ক) "বরুণের প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াতে গন্ধর্ব যাহাকে খনন করিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছিল, সেই স্তম্ভক এবং ধারক তোমাকে আমরা খনন করিয়া তুলিয়া আনিয়াছি", (৪.৪.১) ;

(খ) "শ্বসনের প্রভাবে যে ভাবে দেহে তাপ সঞ্জাত হইয়া শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেইভাবে নিশ্চিতই এই ওষধি তোমার দেহে কার্যকর হইবে", (৪.৪.৩) ;

(গ) "হে ইন্দ্র, সর্বনিয়ন্তা এই ওষধির গুল্মের দ্বারা তাহার দেহে বৃষভসার এবং মানব-বৃষ্য

(প্রজনন-ক্ষমতা) একই সঙ্গে সঞ্চারিত কর", (৪.৪.৪)।

ভগ্নস্বাস্থ্য নিরাময়ক কয়েকটি ওষধির বিবরণও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

(ক) "যেগুলি বাদামী রঙের, যেগুলি শুক্র (উজ্জ্বল), যেগুলি লাল এবং চিত্রিত, যেগুলি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদের সকলকেই আমি আহ্বান করি", (৭.৭.১)

(খ) "ঘন শাখা পল্লবযুক্ত মুকুল ও প্রশাখা সমৃদ্ধ চিত্রিত কাণ্ডী, সকলকেই······" (৭.৭.৪);

(গ) "জল সিঞ্চনে বর্ধিত, অবকাবৃত তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ ওষধির দ্বারা সকল বাধা দূর হউক", (৭.৭.৩);

(ঘ) "মূলে মধু, কাণ্ডের মধ্যাংশে ও অগ্রে মধু, পল্লবে মধু, পুষ্পে মধু—সর্বত্র অমৃতবাহী ওষধি, তুমি পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়রূপে অগ্রাধিকার লাভ কর", (৭.৭.১২);

(ঙ) "ওষধি সংখ্যায় যতই বেশী হউক না কেন, সহস্রপর্ণীর দ্বারা আমার কষ্টের লাঘব ও মৃত্যু বারিত হউক", (৭.৭.১৭);

(চ) "পর্বত ও সমতলভূমিতে জাত, দুগ্ধ-নিঃসারী অগ্নিরসজাতীয় ওষধির প্রসাদে আমাদের অন্তরে পুলক আবির্ভূত হউক,"(৭.৭ ১৭);

(ছ) "অশ্বত্থ, দর্ভ এবং সোম, উদ্ভিদরাজ অমৃত-উপাস্য; ফলপ্রদ যবও দৈব ভেষজ", (৭.৭.২০);

(জ) "এইগুলি বরাহের পরিচিত এবং নকুলেরও এই সকল ফলপ্রদ ওষধি সুপরিজ্ঞাত," (৭.৭.২৩);

(ঝ) "অপর্যাপ্ত মুকুলিত, ফুলেফলে সমৃদ্ধ কিংবা ফলহীন যেগুলি, তাহারাও যুগ্ম মাতার ন্যায় এই মানবকে দুগ্ধ দান করুক" (৭.৭.২৭);

আরও কয়েকটি ফলপ্রদ ওষধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

(ক) "পুতুদ্রু (খদির)—দৈত্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী নাশে সক্ষম এবং রোগনিবারক", (৭.২.২৮);

(খ) "সিলাঞ্চী! যে তোমাকে পান করে, সে দীর্ঘজীবী হয়—নিরাময় হয় এবং তুমি সকলকে সুস্থ রাখ", (৫.৫.২);

"কামাতুরা কন্যার মত তুমি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উর্ধ্বোত্থিত হইয়া বিজয়িনীরূপে অধিষ্ঠিতা হও, সেই তোমার যোগ্য নাম", (৫.৫.৩);

"লগুড়াহত, তীরাহত কিংবা শিখাহত অবস্থায় তুমি যন্ত্রণার লাঘব কর," (৫.৫ ৬)।

"ইহারই অপর নাম লাক্ষা (৫.৫.৯)—স্বর্ণাভ, আদিত্যবর্ণ, অপরূপ (৫.৫.৬); অতিসুন্দর প্লক্ষ হইতে প্রাপ্ত এবং অশ্বত্থ, খদির, দর্ভ এবং মহান্যগ্রোধ হইতে উদ্ভূত পর্ণ", (৫.৫.৫)।

এইরূপ ওষধি, রশ্মি ও জল-চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়ুলাভ ও দৈহিক নিরাপত্তার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ—এই ত্রিধাতুময় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু ও কর্ণের 'বিশালপাক' দূরীকরণের জন্য কাষ্ঠময় কবচ ধারণের আদিম বিশ্বাসেরও উল্লেখ আছে ৫.১২৭.৩)।

প্রজনন-শক্তির আধার বীর্যনল দুইটিকে কাল্পনিক কীলকের দ্বারা ভেদ (৬.১৩৮.৪) এবং ভগ-হস্তের দ্বারা সঙ্গুণ বা কুস্থ ও অন্যান্য উপাদান সহ প্রস্তুত ঔষধের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত নারীকে বশীকরণের যাদু প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে (৬ ১০২.৩)।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, অথর্ববৈদিক যুগে দেহ-সংগঠন, শারীরবৃত্ত, কতকগুলি বিশিষ্ট রোগ এবং তাহাদের ফলপ্রদ ঔষধ সম্বন্ধে শুধু প্রাথমিক জ্ঞানই নহে, বিজ্ঞান-সম্মত ধারণারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদের কালে যেমন সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ব্রহ্মস্পতি, অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবগণকে মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান ও সন্তুষ্ট করিয়া শত্রুকে জয় এবং রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের বিশ্বাস ছিল (৯), অথর্ববেদের কালে দেখা যায়, সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস

আর নাই এবং তাহার পরিবর্তে দেখা দিয়াছে, স্বাস্থ্য ও রোগ সম্বন্ধে কতকটা বৈজ্ঞানিক ধারণা। যদিও মাঝে মাঝে রোগ নিরাময়ের জন্ম আদিত্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রের প্রকাশ দেখা যায়, তবু ঋগ্বৈদিক যুগের মত তাহাদের প্রাধান্য ও অত্যাবশ্যকীয়তার নিদর্শন যেন অনেকটা কম, এইরূপই মনে হয়। অথর্বন নামে একজন সম্পূর্ণ নূতন দেবতার উল্লেখ অথর্ববেদে বহু স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়—মানবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রকরূপে, ঋগ্বেদে তাহার কোন উল্লেখই নাই। এই অথর্ববেদের কাল হইতেই ধীরে ধীরে প্রাচীন আর্যদের স্বাস্থ্য, রোগ ও তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়া তাহারই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পঞ্চম বা একটি নূতন বেদের যে সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। তাই নিউবার্জার (১০) বলেন—"প্রাচীন ভারতীয়দের চিকিৎসাশাস্ত্র যদিও তাহাদের লব্ধ উৎকর্ষের উচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছায় নাই, তবুও তৎকালীন জ্ঞানের ভাণ্ডার, ধারণার গভীরতা এবং সুশৃঙ্খল সিদ্ধান্ত তাহা হইতে খুব বেশী দূরে ছিল না, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জিমারও (Zimmer) (১১) একই ভাবে বলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তির প্রামাণ্য দলিল, তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ এবং বিশেষতঃ অথর্ববেদের মধ্যেই নিহিত।

প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জী

(১) Tilak, B. G.—Arctic Home in the Vedas, 1925 (Poona).

(২) Dutt, R. C.—Civilisation of Ancient India, 1893 (London).

(৩) Farquhart—Outline of Religious Literature of India, 1928, (London).

(৪) Winternitz, M.—A History of Indian Literature, Vol. 1. Reprinted, 2nd. ed. 1959, (Calcutta University).

(৫) Jolly—Ancient Indian Medicine; Translated by C. G. Kashikar, 1951, (Poona).

(৬) দুর্গাদাস লাহিড়ি—অথর্ববেদ সংহিতা, ভূমিকা, 1302 B. S. (Howrah).

(৭) Kutumbia, P.—Ancient Medicine; Introduction.

(৮) Albutt, C.—History of Medicine, 1909, (London).

(৯) Pal. R. K. and Chakraborty, Ranes—"The concept of Health and Disease in the Rg Veda." (Xth International Congress of the History of Science, Ithaca and Philadelphia, U.S.A) 1962, Herman, (Paris).

(১০) Newburger, M.—History of Medicine, Vol. 1. Translated into English by Playfair, E. 1910, Oxford Press, (London).

(১১) Zimmer, H. R.—Hindu Medicine edited by Ludwig Adelstein, 1948 (Baltimore).

(১২) *General,*—(i) Whitney, M. D.—Atharva Veda Samhita (English) 1905, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

(ii) লাহিড়ি, দুর্গাদাস—অথর্ববেদ-সংহিতা (Sanskrit) 1893 (1302 B. S.), Howrah.

(iii) Hornele, A. F. A—Studies in Ancient Indian Medicine, J. R. Asiatic Society, 1906-1910.

প্লাজ্‌মা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

জয়ন্ত বসু

কঠিন, তরল ও বায়বীয়—পদার্থের এই তিনটি অবস্থার সঙ্গে আমরা সবাই সমধিক পরিচিত। পদার্থের একটি চতুর্থ অবস্থাও আছে—ঐ অবস্থায় পদার্থ থাকলে তাকে প্লাজ্‌মা নামে অভিহিত করা হয়।

কঠিন কোন পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তা সাধারণতঃ তরল পদার্থে পরিণত হয়। তরল পদার্থ উত্তপ্ত হলে পরিণত হয় বায়বীয় পদার্থে। বায়বীয় পদার্থকে উত্তপ্ত করলে শেষ পর্যন্ত তা প্লাজ্‌মায় পর্যবসিত হয়।

গত দশ বছরে প্লাজ্‌মা সম্পর্কে এত গবেষণা হয়েছে যে, পদার্থবিদ্যার বহুবিধ শাখার মধ্যে প্লাজ্‌মা-বিজ্ঞান এখন একেবারে প্রথম শ্রেণীতে অনায়াসে স্থান পেতে পারে।

প্লাজ্‌মা বলতে কী বোঝায়?

আমরা জানি, পরমাণুর মধ্যে একটি পজিটিভ বা ধনাত্মক বিদ্যুৎ-সমন্বিত কেন্দ্রীন থাকে, আর থাকে তার চতুর্দিকে পরিক্রমারত নেগেটিভ বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-সমন্বিত ইলেকট্রন। উত্তাপের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে যদি পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন নির্গত করা যায়, পরমাণুটি তাহলে একটি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। প্লাজ্‌মা ঐ রূপ ধনাত্মক আয়ন ও সমান সংখ্যক বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশ। প্লাজ্‌মার ভিতর বিপরীতধর্মী কণিকার সংখ্যা সমান হওয়ায় প্লাজ্‌মা বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। প্লাজ্‌মার ভিতর প্রতিটি আয়ন বা ইলেকট্রনের সন্নিকটে অবশ্য তার বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র বর্তমান। তবে ঐ কণিকার চতুর্দিকে ওর বিপরীতধর্মী কণিকাগুলি এমন ব্যূহ রচনা করে যে, কণিকাটি থেকে অল্প দূরেই ওর বৈদ্যুতিক প্রভাব নগণ্য হয়ে পড়ে। যে দূরত্ব পর্যন্ত ওর এই প্রভাব উল্লেখযোগ্য থাকে, প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী পিটার জোসেফ উইলহেল্‌ম্‌ ডিবাই-এর নাম অনুসারে তাকে 'ডিবাই দৈর্ঘ্য' বলা হয়। প্লাজ্‌মার ক্ষেত্রে 'ডিবাই দৈর্ঘ্য' যে কোন দিকে প্লাজ্‌মার আয়তনের তুলনায় বহুলাংশে ক্ষুদ্র।

প্লাজ্‌মার বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবহনের ক্ষমতা যথেষ্ট এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্লাজ্‌মাকে সহজেই প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। এর ভিতর ইলেকট্রনের গতিবিধির ব্যাপারে কঠিন ও তরল অবস্থার মাঝামাঝি জেলীর মত এর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর বিজ্ঞানী আর্ভিং ল্যাংমুয়্যার এই জাতীয় পদার্থকে বোঝাবার জন্যে 'প্লাজ্‌মা' নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, প্রাণীদেহের রক্তের তরল অংশকে বোঝাবার জন্য জীববিদ্যায় বহুকাল পূর্ব থেকেই প্লাজ্‌মা নামটি প্রচলিত আছে। জীব-বিজ্ঞানীরা তাই অনেক সময় অভিযোগ করেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানীরা ঐ নাম তাঁদের কাছ থেকে আত্মসাৎ করেছেন। আমেরিকার একজন পদার্থ-বিজ্ঞানী এর উত্তরে উপহাস করে বলেছেন, 'তোমাদের থেকে আমাদের টাকা অনেক বেশী; কাজেই নামটি অনায়াসে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কিনে নিতে পারি।' পদার্থ-বিদ্যার প্লাজ্‌মা সংক্রান্ত গবেষণায় সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তা সত্যই বিস্ময়কর।

যাহোক, বর্তমানে প্লাজ্‌মা-বিজ্ঞান বলতে পদার্থ-বিস্তার প্লাজ্‌মাকে বোঝানো হয়ে থাকে এবং এই প্লাজ্‌মা সাধারণতঃ গ্যাসীয়, যার মধ্যে ইলেকট্রন ও আয়ন ছাড়াও গ্যাসের অণু-পরমাণু বর্তমান থাকতে পারে। তবে কঠিন ও তরল অবস্থায় কণ্ডাক্টর ও সেমি-কণ্ডাক্টরের মধ্যে যে বন্ধনমুক্ত বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি থাকে, তাদের সমষ্টিকেও প্লাজ্‌মা বলে ধরা যেতে পারে।

বিশুদ্ধ প্লাজ্‌মা, যাকে যথার্থই পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা যায়, তাতে শতকরা ১০০ ভাগই বন্ধন-মুক্ত বিদ্যুৎ-কণিকার সমাবেশ। প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা ২০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে উঠলে অধিকাংশ প্লাজ্‌মাকেই এই বিশুদ্ধি লাভ করতে দেখা যায়।

প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কেন ?

বর্তমানে প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে আগ্রহ, তার প্রধান কারণ প্লাজ্‌মার মাধ্যমে পারমাণবিক সংযোজন চুল্লীর সম্ভাবনা। এই চুল্লীর বিষয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার এই বৎসরের জানুয়ারী সংখ্যায় 'পরমাণু কেন্দ্রীনের মিলন কাহিনী' নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এই চুল্লীর মূলে হলো পরমাণু-কেন্দ্রীনের সংযোজন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া সূর্যের অপরিমিত শক্তির উৎস। এই প্রক্রিয়া মানুষ হাইড্রোজেন বোমায় ব্যবহার করেছে, কিন্তু সংযোজনজনিত শক্তি মানুষ এখনো ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অত্যুত্তপ্ত প্লাজ্‌মার মাধ্যমে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী তৈরির সবিশেষ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের জিটা, রাশিয়ার ওগ্রা, আমেরিকার স্টেলারেটর প্রভৃতি যন্ত্রে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ও হচ্ছে। মানব-সভ্যতার শক্তির চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে শক্তির ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার সম্ভাবনা। সংযোজন-চুল্লীর পরিকল্পনা সার্থক হলে সমুদ্রের জলে সংযোজনের উপযোগী যে পরিমাণ জ্বালানী আছে, তাই ব্যবহার করে আগামী এক-শো কোটি বৎসরের মত সমস্যার সমাধান হবে।

শুধু শক্তি উৎপাদনের জন্য নয়, তাপ থেকে শক্তির বিদ্যুতে রূপান্তরের সময়েও প্লাজ্‌মাকে ব্যবহার করে শক্তির অপচয় কমিয়ে ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রের প্রয়োগে বিজ্ঞানীরা উৎসুক, তার নাম ম্যাগ্‌নেটো-হাইড্রোডাইন্যামিক (সংক্ষেপে MHD) জেনারেটর। থার্মাল ডি. সি. জেনারেটর বা তাপ-পরিচালিত সমপ্রবাহ বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রে উত্তাপজনিত বাষ্পের গতিশক্তি থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ-পরিবাহী কঠিন পদার্থের গতি, এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে কঠিন পদার্থের ঐ গতিশক্তি রূপান্তরিত হয় বিদ্যুৎ-শক্তিতে। MHD যন্ত্রে বাষ্পের পরিবর্তে প্লাজ্‌মা ব্যবহৃত হয়। প্লাজ্‌মা নিজেই বিদ্যুৎ-পরিবাহী হওয়ায় আর কোন কঠিন পদার্থকে চালনার প্রয়োজন হয় না, একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে প্লাজ্‌মার গতিশক্তি সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। সংযোজন-চুল্লীর পরিকল্পনা সফল হলে তা থেকে এই পন্থায় বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণের চেষ্টা করা হবে।

MHD প্রক্রিয়ার সার্থকতার জন্য প্লাজ্‌মার অত্যুচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। যে বায়ুকে উত্তপ্ত করে এই প্লাজ্‌মা সৃষ্টি করা হয়, তার সঙ্গে পটাসিয়াম বা ঐ জাতীয় রাসায়নিক কোন পদার্থ মিশিয়ে সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় MHD প্রক্রিয়া এপর্যন্ত কার্যকরী করা গেছে, তা হল প্রায় ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

যাহোক, MHD উৎপাদনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। সেজন্য ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদক সংস্থা সাউথহ্যাম্পটনের নিকট তাঁদের মার্কউড্‌ গবেষণাগারে প্রায় বিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি দশ-বারো মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন

MHD উৎপাদক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর বুকে প্লাজ্মা অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও পৃথিবীর বাতাবরণের আয়নমণ্ডলের স্তরগুলি প্লাজ্মা অবস্থায় রয়েছে। দূরপাল্লার বেতার-তরঙ্গের আদান-প্রদানে এরা সহায়তা করে বলে বেতার-বিজ্ঞানীরা এদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

সারা বিশ্বের বস্তুপুঞ্জের মধ্যে প্লাজ্মার নিঃসন্দেহে আধিপত্য। এই বস্তুপুঞ্জের শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী প্লাজ্মা অবস্থায় আছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন। নক্ষত্রলোকে তো প্লাজ্মার আধিপত্য বটেই, আন্তর্নক্ষত্র অঞ্চলেও এর উপস্থিতি সুস্পষ্ট। প্লাজ্মা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ঔৎসুক্য তাই স্বাভাবিক।

বর্তমান যুগকে বলা চলে 'সুদূরের পিয়াসী' বিজ্ঞানীদের মহাকাশ অভিযানের যুগ। এই অভিযানের পুরোভাগে যে মহাকাশযান, তার চালনার ব্যাপারে প্লাজ্মার উপযোগিতা খুব বেশী হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। জেট প্লেন যে গ্যাস জেটের সাহায্যে চলে, মহাকাশযানে প্লাজ্মা জেট হয়তো তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

মহাকাশ অভিযানে প্লাজ্মা অবশ্য বিপত্তিরও সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীতে ফিরে আসবার পথে কৃত্রিম উপগ্রহ যখন বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করে, তার চতুর্দিকে তখন একটি প্লাজ্মার সৃষ্টি হয়। উপগ্রহ থেকে মাটিতে বা মাটি থেকে উপগ্রহে সংবাদ পাঠাবার জন্য যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তা ঐ প্লাজ্মাকে ভেদ করতে পারে না—ঠিক যেমন, বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের প্লাজ্মার স্তরগুলি ভেদ করতে না পেরে প্রতিফলিত হয়। মাটির সঙ্গে উপগ্রহের বেতার-যোগাযোগ কিভাবে অব্যাহত রাখা যায়, তার উপায় উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট আছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের মত দ্রুতগামী পদার্থের সংযোগে বায়ুমণ্ডলে যে প্লাজ্মার সৃষ্টি হয়, কখনো কখনো তা বিজ্ঞানীদের সাহায্যও করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে গেলে তার গতিপথে যে প্লাজ্মার সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীরা বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে সেই প্লাজ্মা থেকে উল্কাপিণ্ডের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

প্লাজ্মার আরো নানাবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে যে থাইরাট্রন ও ডেকাট্রন ভাল্ভ্-এর ব্যবহার, যে ইগ্নিট্রন ভাল্ভ্-এর ব্যবহার বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রকৃতি পরিবর্তনে, সেইসব ভাল্ভ্-এর কর্মপদ্ধতিতে প্লাজ্মা একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। মাইক্রো-ওয়েভ বা ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ সংক্রান্ত নানান যন্ত্রপাতিতে প্লাজ্মা নিয়োগ করা হয়। তবে সবচেয়ে এর বেশী ব্যবহার বোধ হয় আমাদের বহু পরিচিত নিওন ও প্রতিপ্রভ বাতিগুলিতে। এই সব বাতির ভিতরের প্লাজ্মাই এদের আলোর উৎসস্থল।

নিওন ও প্রতিপ্রভ বাতিতে যে প্লাজ্মার ব্যবহার হয়, তার চাপমাত্রা অল্প। অপেক্ষাকৃত উচ্চ চাপমাত্রার দৃষ্টান্ত প্লাজ্মা টর্চ, যা থেকে আলোর পরিবর্তে প্লাজ্মা নিঃসরিত হয়। এই টর্চের মধ্যে চাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান বা তার চেয়েও বেশী হতে পারে। উচ্চশক্তি-সম্পন্ন বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে এর প্লাজ্মাকে এত উত্তপ্ত করে তোলা হয় যে, তার তাপমাত্রা ৬,০০০ থেকে ২০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে, অর্থাৎ তাতে যে উচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে, রাসায়নিক কোন দহন-প্রক্রিয়াতেই তা সম্ভব নয়। সেজন্য বৃহদাকৃতির কেলাসের প্রস্তুতি, ধাতব পদার্থের সংযোজন প্রভৃতি নানা জাতীয় কাজে এই টর্চের ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে ট্রম্বেতে পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কারিগরী পদার্থবিদ্যা বিভাগ যে প্লাজ্‌মা টর্চ তৈরি করেছেন, এখানে তার একটি আলোক-চিত্র দেওয়া হলো। একটি কোয়ার্ট্‌জ্‌-এর নলের মধ্যে এক দিক থেকে আর্গন বা নাইট্রোজেন গ্যাস ঢোকানো হয় এবং ছয় হাজার ওয়াটের এক বেতার-শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র একটি কুণ্ডলীর মাধ্যমে নলের ভিতর ঐ গ্যাসকে প্লাজ্‌মায় রূপান্তরিত করে তাকে অত্যুত্তপ্ত করে তোলে। নলের অন্য দিক থেকে প্লাজ্‌মার ধারা নিঃসরিত হয়। নলের মধ্যে রক্ষিত একটি গ্র্যাফাইট বা ট্যাণ্টালামের দণ্ড গ্যাসের রূপান্তরের সূত্রপাতে সাহায্য করে।

সম্প্রতি বৃটেনের সোয়ান্‌সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিউলিন জোন্‌স্‌ ও তাঁর সহকর্মী প্রাইস এমন একটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছেন, যার ফলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের প্লাজ্‌মা সম্পর্কে অবহিত হবার একটি নতুন কারণ ঘটল। রীলে, মোটর গাড়ির কন্‌টাক্ট-ব্রেকার বা সংযোগ-ছেদক, বৈদ্যুতিক সার্কিটে এই জাতীয় যে অসংখ্য সুইচের ব্যবহার, তাদের প্রত্যেকের ইলেকট্রোড দুটি যখনই বিচ্ছিন্ন হয়, সামান্য পরিমাণ ধাতু একটি ইলেকট্রোড থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এর ফলে সুইচগুলির আয়ুষ্কাল, বলা বাহুল্য, হ্রাস পায়। বায়ুশূন্য স্থানে সুইচ রেখে দ্রুতগতিসম্পন্ন আলোকচিত্রের সাহায্যে লিউলিন জোন্‌স্‌ এবং তাঁর সহকর্মী দেখিয়েছেন যে, ধাতুর এই স্থানান্তকরণ ঘটে ক্ষণস্থায়ী ঘন ক্ষুদ্রায়তন প্লাজ্‌মার মাধ্যমে। বায়ুপূর্ণ স্থানেও যদি এই ঘটনা পরীক্ষিত সত্য হয়, তাহলে ঐ প্লাজ্‌মাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অসংখ্য সুইচের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে ফেলা যাবে।

প্লাজ্‌মা টর্চ।

প্লাজ্‌মার বৈশিষ্ট্য

প্লাজ্‌মার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। প্লাজ্‌মার মধ্যে বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির নানারকম নিয়মিত দোলন (Oscillation) সম্ভব। আমরা জানি, গ্যাসের অণুগুলির যথেচ্ছ গতির মাধ্যমে

শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির দোলনকে প্লাজ্মার ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের একটি অতিরিক্ত উপায় বলা যেতে পারে।

প্লাজ্মার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, একই প্লাজ্মার অন্তর্গত ইলেকট্রন, ধনাত্মক আয়ন ও নিরপেক্ষ অণুর তাপমাত্রা এক নয়। প্লাজ্মার চাপ নিম্নমানের হলে ইলেকট্রনের তাপমাত্রা আয়ন বা অণুর তাপমাত্রা থেকে অনেক বেশী হয়, আয়নের তাপমাত্রা হয় অণুর তাপমাত্রা থেকে সামান্য বেশী। তবে প্লাজ্মার চাপ বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রার এই পার্থক্য হ্রাস পেতে থাকে।

চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্লাজ্মাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে প্লাজ্মাকে আবদ্ধ রাখতে হলে অনেক সময় তাই চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। প্লাজ্মার এই আবদ্ধ থাকবার ব্যাপারটি তার নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে; বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে 'Pinch Effect' বা 'নিষ্পেষণ প্রভাব' বলা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে নানারকম অদৃশ্য পিঞ্জর তৈরি করে বিজ্ঞানীরা সংযোজন-চুল্লীর অত্যুত্তপ্ত পলায়নপর প্লাজ্মাকে তাদের মধ্যে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করছেন।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের উপর প্লাজ্মার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ যদি প্লাজ্মার উপর আপতিত হয়, তবে ঐ তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় হলে তার যৎসামান্য অংশই প্লাজ্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে; ফলে তরঙ্গটি প্রতিফলিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছোট হলে কিন্তু ঐ তরঙ্গ প্লাজ্মাকে ভেদ করে যেতে পারে, অবশ্য যদিও প্লাজ্মার মধ্যে তার গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। রেডিও ও টেলিভিসনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের জন্যই আয়নমণ্ডলের প্লাজ্মার স্তর থেকে রেডিও-তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়ে দূরপাল্লার বেতার-যোগাযোগ স্থাপন করে, কিন্তু টেলিভিসনের ক্ষুদ্রতর তরঙ্গগুলির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় না।

প্লাজ্মার মধ্যে যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতি থাকে, তাহলে প্লাজ্মার উপর আপতিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সাধারণতঃ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়—একটিকে বলা হয় সাধারণ তরঙ্গ, অন্যটিকে অসাধারণ তরঙ্গ। চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে প্লাজ্মার মধ্যে তরঙ্গের যে প্রকৃতি, সাধারণ তরঙ্গের প্রকৃতি তার অনুরূপ; অসাধারণ তরঙ্গের প্রকৃতিতে, বলা বাহুল্য, বৈপরীত্য বর্তমান।

প্লাজ্মার অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটন

প্লাজ্মার ভিতরের বিভিন্ন প্রকারের কণিকার ঘনত্ব, গতিবিধি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করবার জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় নানান প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, প্রয়োগ আছে মাইক্রো-ওয়েভ বা অতি ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের ও আলট্রাসনিক ওয়েভ বা ক্ষুদ্র শব্দ-তরঙ্গের। প্লাজ্মার মধ্য দিয়ে এই সব তরঙ্গ পাঠিয়ে তাদের উপর প্লাজ্মার প্রভাব লক্ষ্য করা হয়। প্লাজ্মা থেকে নিঃসরিত নিউট্রন এবং আলোক ও বেতার-তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করাও প্লাজ্মার অন্তর্লোক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবার আর একটি উপায়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'প্লাজ্মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ' নামক প্রবন্ধে এই সব প্রক্রিয়ার কয়েকটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, প্লাজ্মা সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখনো অজানার অন্ধকারে। সেজন্য, গত প্রায় দশ বছর ধরে নিয়ন্ত্রিত সংযোজন-চুল্লীর উদ্দেশ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও বিজ্ঞানীরা এখনো প্লাজ্মাকে ইচ্ছামত আয়ত্তে আনতে পারেন নি। যে দিন তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সে হবে এক স্মরণীয় দিন।

সঞ্চয়ন

মানব-দেহে পশুর অস্থি সংযোজন

একটি নবজাতকের বিকৃত পায়ের চিকিৎসা নিয়ে আমেরিকার একদল শল্যচিকিৎসক খুবই সঙ্কটে পড়েছিলেন। পা-টাকে সোজা করবার জন্যে বিকৃত পায়ের অংশটুকু কেটে বাদ দেওয়া হলো এবং কাটা অংশটুকু কি দিয়ে পূরণ করা হবে এবং শিশুর দেহের ঐ অংশে কি সংযোজন করা হবে? এই প্রশ্নটি তখন তাঁদের সামনে খুব বড় হয়ে দেখা দিল।

ধাতব অথবা সংশ্লেষিত (সিনথেটিক) দ্রব্যাদি দিয়ে যে এই কাজ সন্তোষজনকভাবে হতে পারে না, তা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। এস্থলে কোন মৃত ব্যক্তির দেহের হাড় কেটে নিয়েও জোড়া দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুর দেহ তা গ্রহণ করবে না এবং পরিণামে জোড়া দেবার চেষ্টা ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হবে। কারণ ঐ হাড়ের দু-প্রান্তে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হবে।

চিকিৎসকের মতানুযায়ী আর একটি ব্যবস্থা হলো—শিশুর দেহের অন্য অংশের কোন হাড় কেটে নিয়ে ঐ বিকৃত অংশে জোড়া দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পায়ের শল্যচিকিৎসার তুলনায় দেহের অন্য অংশের হাড় তুলে নেবার বিষয়টি হবে শিশুর পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক ও কষ্টকর।

চিকিৎসকবৃন্দ এসব বিষয় বিবেচনা করে অন্য একটি প্রক্রিয়ার সাহায্য নেবার ব্যবস্থা স্থির করলেন। এরূপ ব্যবস্থা মাত্র কয়েক বার পরীক্ষিত হয়েছে। মানবদেহে বাছুরের হাড় সংযোজন করবার এই চেষ্টায় তাঁরা মাত্র কয়েক বার কৃতকার্য হয়েছেন। বাছুরের হাড় জোড়া দিয়ে দেখা গেল, বিকলাঙ্গ শিশুটি এক বছর পরেই অন্যান্য শিশুদের মত স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করছে। শিশুর দেহের ঐ অংশ বাছুরের হাড়টিকে গ্রহণ করেছে এবং ধীরে ধীরে তার নিজ দেহের ঐ অংশের হাড়টি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বাছুরের হাড়টিকে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে

আমেরিকায় এই শল্যচিকিৎসা ১৯৬০ সালে সম্পন্ন হয়। চিকিৎসা-জগতে এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এর পরে নিউজার্সির নিউব্রানস্উইকস্থিত স্কুইব ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে ডাঃ জেম্‌স্ এ. ডিংওয়ালের নেতৃত্বাধীনে এই বিষয়ে আট বছর ধরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এই শল্যচিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় বোপ্ল্যান্ট নামে বাছুরের হাড় আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্‌স্ নামে একটি মার্কিন ভেষজ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। পৃথিবীর যে কোন স্থানে শল্যচিকিৎসকগণ এই বোপ্ল্যান্ট ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পেতে পারেন।

পৃথিবীর ২৩টি রাষ্ট্রের ৫১টি মেডিক্যাল কলেজে এবং ৮০টি হাসপাতালে ৩৫০ জন শল্যচিকিৎসক ৫০০০ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের পর বোপ্ল্যান্ট প্রয়োগ করেছেন। শতকরা ৮২টি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকেরা কৃতকার্য হয়েছেন। বিকল্প চিকিৎসায় যে সাফল্য অর্জিত হয়ে থাকে, তার তুলনায় এই সাফল্যের পরিমাণ সমান সমান তো বটেই, বরং অনেক বেশী।

এই প্রক্রিয়ায় যে কতখানি সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। একমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি বছর এই প্রক্রিয়ায় সাত লাখ

রোগীর চিকিৎসা হয়ে থাকে; অর্থাৎ আঘাত বা রোগে যাদের অস্থি-র ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তাদের চিকিৎসা হয়ে থাকে।

পশুদেহের অস্থি মানবদেহে সংযোজনের কল্পনা মানুষের বহুকালের। কিন্তু প্রজনন-বিজ্ঞানের দিক থেকে মানবদেহের হাড় ও পশুদেহের হাড়ের গঠন-প্রণালীর পার্থক্যের দরুণ তা করা সম্ভব হয় নি। ভাইরাস অথবা অন্য কোন রোগবীজাণুর আক্রমণ হলে সুস্থদেহ যেমন বিরুদ্ধতা করে থাকে, তেমনই অ্যান্টিজেন নামক জৈব রসায়নিক পদার্থ সংযোজিত হাড়টিকে জুড়তে দেয় না, তাকে পৃথক করে রাখে।

এই সকল বাধা কৃত্রিম উপায়ে দূর করা হয়েছে। বাছুরের হাড়ের প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় দ্রব্যাদি সম্পূর্ণভাবে বের করে নেবার পরই ঐ বোপ্ল্যান্ট মানবদেহে সংযোজনের উপযোগী হয়ে থাকে। ঐ সকল দ্রব্য বের করে নেবার জন্যে হাড়টিকে দুর্বল করা হয় না এবং এর গঠন-প্রণালীরও কোন পরিবর্তন করা হয় না। ৩১ রকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাড়টিকে এই কাজের উপযোগী করে তোলা হয়। এজন্যে পাঁচ মাস সময় লাগে।

বাছুরের এই হাড় সযত্নে সংগ্রহ করে তাথেকে এই কাজের উপযোগী হাড়টি বেছে নিয়ে জৈব পরিষ্কারক দ্রব্যাদির সাহায্যে শোধন করে নিতে হয়।

হাড়ের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেও এই পরিষ্কারক বস্তু প্রবেশ করে। রক্তের জলীয় অংশ অর্থাৎ সিরাম এবং রক্তকণিকাসমূহ এই পরিষ্কারক দ্রব্য সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়।

এই হাড়কে তিনবার ষ্টেরিলাইজ বা বীজাণুমুক্ত করা হয়। তারপর হিমায়িত করে সেটিকে শুকিয়ে নেবার পর বীজাণুমুক্ত বায়ুহীন আধারে রাখা হয়। প্রত্যেকটি আধারে বিশেষ বিশেষ আকারের হাড় রাখা হয়। দেশলাইয়ের কাঠির মত হাড় থেকে বড় বড় আকারের হাড় এই সকল আধারে রক্ষিত থাকে। মেরুদণ্ডের হাড় স্থানচ্যুত হলে এই সকল দেশলাইয়ের কাঠের মত হাড়গুলি ব্যবহার করা হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মাথার খুলি, নাক বা চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে গেলে ঐ সকল ছোট ও বড় আকারের হাড়ের সাহায্যে চিকিৎসা হয়ে থাকে।

বোপ্ল্যান্টকে সাধারণ তাপমাত্রায় তিন বছর পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

অস্থি-র শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে 'বোন ব্যাঙ্ক'-এর প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির দেহের হাড় সংগ্রহ এবং ঠাণ্ডা স্থানে তাদের সংরক্ষণ খুবই কষ্টদায়ক এবং ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রায়ই দেখা যায়—অতি প্রয়োজনীয় হাড়টি পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ স্থলে বোপ্ল্যান্ট খুবই সহজলভ্য। কালে কালে হয়তো এটিই 'বোন ব্যাঙ্কের' স্থান গ্রহণ করবে।

মানুষের বন্ধু—সাপ

এই সম্বন্ধে 'সোভিয়েট আলোচনী'তে বলা হয়েছে—সাপকে কি পোষ মানিয়ে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করা যায়?

প্রশ্নটা বিদেশীয়দের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক, এই ভারতে সবাই ওস্তাদ সাপুড়েদের হাতে পোষমানানো সাপের খেলা আজন্ম দেখে আসছে। সাপের মত বিষধর প্রাণীকে পোষমানিয়ে তাকে নিয়ে এই খেলা

ভারতে যে স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে, তা সবাই জানে। ভারতেই যে প্রথম সাপুড়ের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাঘ-সিংহকে পোষ মানিয়ে তাদের নিয়ে খেলা করবার চেয়ে সাপকে বাগ মানিয়ে তাকে নাচানো মোটেই কম কঠিন বা কম বিপজ্জনক নয়।

কিন্তু তার চেয়ে ঢের বড় কথা হলো এই যে, বাঘ-সিংহের মত বৃহদাকার ভয়ঙ্কর প্রাণীর চেয়ে মানুষের কাছে সাপের উপযোগিতা ঢের বেশী। মানুষের নানাধরণের রোগ-নিরাময়ে সর্পবিষের কার্যকারিতার কথা আমাদের আয়ুর্বেদাচার্যেরা অতি প্রাচীন কালেই উল্লেখ করে গেছেন।

সাপের বিষ একটি অতি জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। দেশ-বিদেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী সর্পবিষ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু এখনও এর সব রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম, জৈব উপাদান ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নি। বহু জটিল ধরণের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা আজ লেবরেটরিতে সিন্থেটিক বা সাংশ্লেসিক পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন। কিন্তু যেগুলি তাঁরা এভাবে তৈরি করতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম হন নি, সেগুলির মধ্যে একটি হলো সাপের বিষ।

সাপের বিষ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবার জন্যে বিভিন্ন দেশে আজ বড় বড় সর্প-সংগ্রহ-শালা ও সর্প-পালনাগার গড়ে উঠেছে। তাশখন্দের সর্প-পালনাগার ও সর্পবিষ সম্পর্কিত গবেষণা-কেন্দ্রটি এক্ষেত্রে পৃথিবীর একটি বৃহত্তম কেন্দ্র।

কিন্তু বাঘ-সিংহ প্রভৃতি প্রাণীকে চিড়িয়াখানায় রাখবার মত সাপকে চিড়িয়াখানায় রাখবার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যারা বন্দী অবস্থায় বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। সাপেরও এমন কতকগুলি প্রজাতি আছে, যারা বন্দী অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করে না। এদের জন্যে বিশেষ রকমের ব্যবস্থা করতে হয়। অত্যন্ত যত্নশীল না হলে এরা বন্দী দশায় নির্বংশ হয়ে যায়।

সাধারণভাবে বিষাক্ত সাপ মাত্রেই খুব স্পর্শকাতর ও কোমল দেহবিশিষ্ট প্রাণী। অ্যাডার, কোব্রা (কেউটে, গোখরো, কালনাগ ইত্যাদি) এবং র‍্যাটল্ স্নেক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপও তাই। মৃদু প্রাকৃতিক আওয়াজ ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট সব রকমের জোরালো শব্দে সাপ ভয় পায় বলে দেখা গেছে—যদিও সাপের কান অর্থাৎ শ্রবণশক্তি আছে কি-না, তা এখনও সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বহু প্রাণী মানুষের শ্রুতির সীমা-বহির্ভূত আওয়াজ বা দর্শনশক্তির পাল্লার বাইরের আলোক-তরঙ্গ অনুভব করতে পারে এবং তার জন্যে তারা যে সব সময়ে কান বা চোখ ব্যবহার করে, তা নয়। এর জন্যে তাদের দেহে যে বিশেষ ধরণের 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়' গোছের একটা ব্যাপার আছে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ বিশেষভাবে গবেষণা চালাচ্ছেন। যেমন—প্রমাণিত হয়েছে যে, বাদুড়ের দেহে রেডারের মত এমন একটা ব্যবস্থা আছে, যার সাহায্যে তারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠাতে পারে এবং সেই প্রতিফলিত তরঙ্গের পথ ধরে দিকনির্ণয় করে। পাখীদের দেশান্তর গমনের সময় অর্থাৎ মাইগ্রেশনের ব্যাপারটাও সম্ভবতঃ অনুরূপ কিছু বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সাপেরও মানুষের শ্রবণশক্তির বহির্ভূত অতি সূক্ষ্ম শব্দ-তরঙ্গ অনুভব করবার ক্ষমতার পিছনে অনুরূপ কোন কারণ থাকতে পারে। মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর স্পর্শকে সাপ অত্যন্ত ভয় করে। এত বেশী ভয় করে বলেই সামান্যতম স্পর্শেও সাপ এমন বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারে।

সাপের বিষ সংগ্রহের পদ্ধতি অনেকেরই জানা আছে। মুখে খুব পাত্‌লা চামড়ার ঢাকনি বসানো একটা পাত্রের উপরে সাপকে ছোবল মারতে বাধ্য করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ পিচকিরির

মত কয়েক ফোঁটা বিষ তার বিষদাঁত থেকে বেরিয়ে এসে পাত্রে জমা হয়। মাসে একবার করে এক-একটি সাপের মুখ থেকে এইভাবে বিষ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটা সাপের দেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সমস্ত প্রক্রিয়াটা তাকে এত দুর্বল করে ফেলে যে, খাঁচায় রেখে তার সব রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যবস্থা করে এবং সবচেয়ে ভাল খাদ্য খেতে দিয়েও বন্দী অবস্থায় সাপকে মাত্র কয়েক মাসের বেশী বাঁচিয়ে রাখা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় সাপের আয়ু কয়েক বছর মাত্র। প্রজাতি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর সাপের আয়ুষ্কাল দু-তিন বছর থেকে ১০-১২ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। কয়েক শ্রেণীর সাপ অবশ্য ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

চিড়িয়াখানায় ও সর্প-পালনাগারে সাপকে তাই দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবার প্রধান উপায় হলো, যতদূর সম্ভব সেখানে তার স্বাভাবিক পরিবেশ, অর্থাৎ তাপাঙ্ক, আর্দ্রতা, মৃদু আলো, বাতাসে নাইট্রোজেন-অক্সিজেনের আনুপাতিক পরিমাণ প্রভৃতি—এমন কি, মাটির উপাদান পর্যন্ত সৃষ্টি করা।

তাশখন্দের সর্প-পালনাগারের কর্মীরা এদিক থেকে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। এক-এক প্রজাতির সাপের জন্যে এক-এক রকমের পরিবেশ তাঁরা নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখানকার সবচেয়ে স্পর্শকাতর সাপগুলি (যেমন—'অ্যান্সিস্ট্রডন হ্যালিস' নামে র‍্যাটল স্নেক-পরিবারভুক্ত এক জাতের সাপ) এখানে শুধু যে তাদের স্বাভাবিক আয়ু অনুযায়ী বেঁচে থাকে তাই নয়, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বংশবৃদ্ধিও করে।

এখানে কোব্রা পরিবারের বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সাপ নিয়মিতভাবে ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারাও সেখানে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেশ খাপ খাইয়ে নেয়। এখানকার প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ ওলেগ বোগদানফ বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য সর্প-বিশেষজ্ঞদের অন্যতম হিসেবে সম্মানিত। তিনি বলেন—ভারতীয় কোব্রার মত এমন 'ঘরকুণো' সাপও এই সুদূর শীতের দেশে এসে যে এত তাড়াতাড়ি নিজেদের মানিয়ে নেয়—তার কারণ, এখানে তারা সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রচুর খাদ্য পেয়ে থাকে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ এশীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলি অপেক্ষা কম শীতের অঞ্চলগুলিতে 'সর্পানুশীলন সমিতি' আছে। এই সমিতিগুলির সদস্যদের নেশা বা 'হবি' হলো সাপ সম্বন্ধে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজ চালানো—তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, চালচলন, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি লক্ষ্য করা ও সে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা।

এই সর্পানুশীলন সমিতিগুলি হলো প্রায় সবই আঞ্চলিক 'নেচার লাভার্স সোসাইটি'র বিভিন্ন শাখার অন্যতম। যেমন—পক্ষী-পর্যবেক্ষণ সমিতি, প্রজাপতি-সংগ্রহকারীদের সমিতি, পুষ্পপ্রেমিকদের সমিতি, মৎস্যানুশীলন সমিতি ইত্যাদির মতই এই-সব সর্পানুশীলন সমিতিও কাজকর্ম চালিয়ে থাকে। সদস্যেরা নতুন কিছু লক্ষ্য করলে সমিতির মুখপত্র, আলোচনা-চক্র বা বিশেষজ্ঞ-সংস্থার কাছে তা রিপোর্ট করেন। বেশীর ভাগ সদস্যই অপেশাদার এবং কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত।

আশ্কাবাদের এই রকম একটি সর্পানুশীলন সমিতির একজন খুব উৎসাহী ও নেতৃস্থানীয় সদস্য ভ্সেভোলোদ পোতোপোল্স্কি। পেশায় তিনি একজন টেলিভিশন-মিকানিক। কিন্তু সাপের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষজ্ঞদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এপর্যন্ত তিনি ৩০ হাজার সাপ ধরেছেন ও বিভিন্ন গবেষণাগারে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব একটি ছোট সর্প-পালনাগারও আছে।

সাপের বিষ যে সব রোগের চিকিৎসায় খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে রয়েছে উচ্চ

রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, শিরার আড়ষ্টতাজনিত রোগ (র‍্যাডিকিউলাইটিস), নানা ধরণের বাতব্যাধি প্রভৃতি। রোগ-চিকিৎসায় এবং সাপের কামড় থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সর্পবিষঘ্ন (অ্যান্টি-ভেনম) ওষুধ তৈরির কাজে সর্পবিষের উপযোগিতার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, কতকগুলি বিশেষ ধরণের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির কাজেও কেলাসিত (ক্রষ্টেলিন) সর্পবিষের দরকার হয়।

মানুষের পক্ষে সাপের আরেকটা বড় রকমের উপকারিতা হচ্ছে—শস্যের ক্ষতিকারক মেঠো ইঁদুর, রোডেন্ট, গেছো ইঁদুর, গোফার ইত্যাদি সাপের উপাদেয় খাদ্য; কাজেই সাপের অস্তিত্ব না থাকলে এরা মানুষের সমস্ত খাদ্যশস্য খেয়ে শেষ করে ফেলতো।

সাপ পোষ মানলে অন্য যে কোন পোষা প্রাণীর মত মানুষের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দেশে অনেক বসতবাড়িতে বাস্তুসাপের নির্বিরোধ অবস্থানের কথা সকলেই জানেন। তাছাড়া শিশুর সঙ্গে বিষধর সাপের নিরীহ কৌতুকক্রীড়ার নানা ঘটনার কথাও শোনা যায়—যার সবগুলিই নেহাৎ গল্প নয়।

মিলনের কালে কোব্রা জাতীয় স্ত্রী-সাপের দেহ থেকে বিশেষ এক ধরণের গন্ধ নিঃসৃত হয় এবং পুরুষ সাপ সেই গন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ সর্পিণীর সঙ্গে মিলনেচ্ছু ফণা-তোলা সাপের দেহের ঊর্ধ্বাংশ থেকে এক রকমের অদ্ভুত ভাস্বরতা (ফস্‌ফরেসেন্স) নির্গত হতে দেখা যায়। প্রজাতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর সাপের এই ভাস্বরতা কম-বেশী হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এরই ফলে সাপের মণির কল্পনাটা আমাদের রূপকথায় স্থান পেয়েছে।

প্লাষ্টিক কাঠ

গামা-রশ্মির সাহায্যে কোবাল্ট-৬০-এর দ্বারা শোধিত প্লাষ্টিক ও কাঠের সংমিশ্রণে নতুন এক ধরণের কাঠ তৈরি করা হয়েছে। ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশনের উদ্যোগেই এই নতুন ধরণের কাঠ উদ্ভাবিত হয়। এই জিনিষটি সাধারণ কাঠের তুলনায় অনেক বেশী শক্ত এবং মজবুত। কাঠের স্থান ইতিমধ্যেই লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাষ্টিক প্রভৃতি গ্রহণ করেছে। নতুন ধরণের এই কাঠ তার হৃত স্থান পুনরায় অধিকার করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ভার্জিনিয়ার আমেরিকান নোভড্ডি কোম্পানী এবং জর্জিয়ার লকহেড জর্জিয়া কোম্পানী বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্লাষ্টিক কাঠ উৎপাদন করছেন। এই কাঠের জল শুষে নেবার ক্ষমতাও সাধারণ কাঠের তুলনায় অনেক কম।

এই কাঠ উৎপাদনে রেডিয়েশন অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়া অনুঘটকের কাজ করে। পোলিমিথাইল মেথাক্রিলেট, পোলিভিনিলেকটেট, পোলিষ্টিরিন প্রভৃতি তরল প্লাষ্টিক এই কাঠ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এদের কোন একটির মধ্যে কাঠের টুক্‌রাসমূহ ভিজিয়ে রাখা হয়।

যে কাঠের প্লাষ্টিক তৈরি করা হয়, সেই কাঠের গুণ এই প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয় না, রং বা আঁশেরও কোন পরিবর্তন হয় না—সবই বজায় থাকে, অধিকন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে আরও সুন্দর হয়ে থাকে।

এই কৃত্রিম প্লাষ্টিক কাঠ খুব শক্ত ও মজবুত হলেও একে করাত দিয়ে কেটে নানা আকারের জিনিষ তৈরি করা যায়। খুব সুন্দর পালিশও হয়ে থাকে। এই প্লাষ্টিকে তৈরি কোন জিনিষের কোন অংশ পুড়ে গেলে বা পালিশ নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর শিরিষ কাগজ ঘষে নিলেই আবার সেই মসৃণতা ফিরে আসে। প্রয়োজনীয় রংটি তৈরির সময়ে এর উপকরণের সঙ্গে ঐ রং মিশিয়ে

দেওয়া হয় বলে ঐ রং এর প্রতিটি অণুতে মিশে যায়। সুতরাং রং হয় একেবারে পাকা। এতে তৈরি কোন উপকরণের কোন অংশ ক্ষয়ে গেলেও রং ঠিকই থাকে।

অগ্নি-নিরোধক হিসাবেও এই কাঠ তৈরি হতে পারে। এজন্যে এই প্লাষ্টিক কাঠের উপকরণের সঙ্গে কোন কোন রাসায়নিক উপকরণও মেশাতে হয়।

বর্তমানে আমেরিকায় পাইন, আপেল, ওক, বার্চ প্রভৃতি যে সব বৃক্ষ জন্মে, সে সব বৃক্ষ নিয়েই প্রধানতঃ এই বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন—যে কোন কাঠ থেকে প্লাষ্টিক কাঠ তৈরি হতে পারে। তবে কোন্ রকম প্লাষ্টিক কোন্ কাঠের উপযোগী এবং সেই কাঠ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, তা বিচার-বিবেচনা করেই সেই ধরণের প্লাষ্টিক কাঠ তৈরি করা যেতে পারে।

প্রধানতঃ পোলিমিথাইল মেথাক্রিলেট, পোলি-ভিনিলেকটেট এবং পোলিষ্টিরিন—এই তিন প্রকার প্লাষ্টিকের সঙ্গেই কাঠের সংমিশ্রণ হয়ে থাকে। এই কাঠে শীকারের হাতুড়ী থেকে আরম্ভ করে নানা রকম জিনিষ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া দরজা-জানালা, বাড়ীঘরের মেঝে প্রভৃতিও এই নতুন ধরণের উপকরণের দ্বারা নির্মিত হতে পারে।

নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায় ফেডারেল সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং একজিবিট ভবনের মেঝে এই নতুন উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়েছে। তৈরি করেছেন জর্জিয়া রাজ্যের ডসনভিলের লকহীড জর্জিয়া কোম্পানী।

তবে এই জিনিষটির আরও উন্নতিসাধনের চেষ্টা হচ্ছে উত্তর ক্যারোলিনার ডারহামস্থিত রিসার্চ ট্যাফেল ইনষ্টিটিউটে। এতে নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা করছে।

তবে আমেরিকার বহু প্রতিষ্ঠানই এই নতুন উপকরণ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং নানা দিক থেকে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সমীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাঁরা বলেছেন, আসবাবপত্র, শ্রম-শিল্পোপকরণ, খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং খেলনা প্রভৃতি নির্মাণের দিক থেকে এই নতুন প্লাষ্টিক-কাঠ খুবই উপযোগী হবে।

কৃত্রিম উপায়ে মরকত মণি উৎপাদন

পশ্চিম জার্মেনীর মণি-নগর ইডার ওবারস্টাইনের একটি সাধারণ গৃহে মরকত মণির উৎপাদন হচ্ছে। একথা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়; কিন্তু জনসাধারণকে সেখানে উপস্থিত করে প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ একটি গবেষণা-কক্ষে এই মরকত মণিগুলিকে বর্ধিত করা হয় এবং কক্ষটি চতুর্দিক থেকে বন্ধ থাকে—এমন কি, রসায়ন শালার সহকারীদের পর্যন্ত এই অনুমতি নেই যে, উক্ত কক্ষের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করতে পারেন। এভাবে একটি বিশেষ রহস্যময় পদ্ধতিতে প্রস্তুত মরকত মণির সবুজ রঙের টুক্‌রা-গুলি কি ভাবে ফুটন্ত চুনের জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তাও পর্যবেক্ষণের অধিকার একমাত্র মণি-প্রস্তুতকারী প্রধান ব্যক্তিরই আছে। কৃত্রিম উপায়ে মণি প্রস্তুতের পদ্ধতি অতি জটিল ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ভূগর্ভে আসল মরকত মণি প্রস্তুত হতে প্রায় ২০ কোটি বছর সময় লাগে। তাই প্রকৃতির রসায়নশালায় উৎপন্ন মরকত মণি এর সঙ্গে সময়ের দিক থেকে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠতার দিক থেকেও প্রকৃত ও কৃত্রিম মরকত মণির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় মানুষের সৃজনী শক্তির কাছে প্রকৃতি পরাজয় স্বীকার করেছে। যে কক্ষে মরকত মণি উৎপাদিত হয়, সেটিকে পরিষ্কার

করবার ভারও আবিষ্কারকের পত্নীই গ্রহণ করেছেন। কাজেই ভৃত্যদের দ্বারাও রহস্য উদ্ঘাটনের কোন সম্ভাবনা নেই। আবিষ্কারক বলেন—আমি আমার আবিষ্কারকে পেটেণ্ট হিসাবেও রেজিস্ট্রী করাই নি, কারণ তাহলে আমাকে মণি তৈরি করবার ফরমুলা লিখিতভাবে জমা দিতে হতো। আমি মণি তৈরির রহস্য প্রায় ১২ বছরের চেষ্টার পর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

ইডার ওবারস্টাইনের উক্ত মণি-আবিষ্কারক ১৯৫০ সালেই কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবান মণি তৈরি করবার কাজে হাত দিয়েছিলেন। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মেনীতে কৃত্রিম হীরা-জহরৎ প্রস্তুত হতো, কিন্তু সেকালের উচ্চমূল্যের জন্যে জহুরীরা কৃত্রিম রত্ন ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন না। আজ যদি তাঁরা সে মূল্যে পান, তাহলে সম্ভবতঃ তৎক্ষণাৎ ক্রয় করতে রাজী হবেন। গত দশকে মার্কিন রাজ্যেও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ এবং মণি-বিশেষজ্ঞ কৃত্রিম উপায়ে মরকত মণি তৈরির কাজ সুরু করেছিলেন। এই ব্যক্তিও তাঁর নিজস্ব এক রহস্যময় পদ্ধতিতে মণি প্রস্তুত করেন। কিন্তু তার উৎপাদিত মণিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মেনীতে প্রস্তুত মরকত মণির স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

আমেরিকায় প্রস্তুত এই মণিগুলি 'ছাতা মণি' নামে রত্নব্যবসায়ীদের মধ্যে সুপরিচিত। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এই মণির অভ্যন্তর থেকে সবুজ রঙের একটি আভা দেখা যায় ও প্রকৃত মণির সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। অবশ্য এই কৃত্রিম মণিও সহজলভ্য নয়। কারণ একটি মণি প্রস্তুত করতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগে। এই মণির প্রতি ক্যারেটের মূল্য ৫০০ জার্মান মার্ক, প্রকৃত মণির মূল্যের অর্ধেক। বর্তমানে প্রকৃত মরকত মণির মূল্য সাধারণতঃ প্রতি ক্যারেট ১০০০ মার্ক বা তারও উর্ধ্বে।

ইডার ওবারস্টাইনে প্রস্তুত মরকত মণি-পরীক্ষাও সেখানেই হয়ে থাকে। রসায়নাগারে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে মণি-আবিষ্কারক তাঁর সৃষ্ট মরকত মণির স্ফটিক স্তরগুলি পরীক্ষা করেন। ইতিপূর্বে কৃত্রিম উপায়ে যে সকল মণি প্রস্তুত হতো, তাতে সবুজ রঙের ক্ষীণ আভা দেখা যেত। তাতে মরকত মণি-সুলভ সবুজ উজ্জ্বল আভার কোন প্রকাশ ছিল না। আজকের যুগে মণি প্রস্তুতের কাজে আশাতীত সাফল্য লাভ হয়েছে এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে আধুনিক কৃত্রিম জার্মান মরকত মণির তুলনা শুধু মাত্র চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ মণি ইয়াতে ইটের সঙ্গে করা যেতে পারে।

বর্তমানে জার্মেনীতে প্রস্তুত মরকত মণি বহুমূল্য অলঙ্কারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মণিগুলি অনেক আসল রত্নের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর; কারণ আসল রত্নের সৌন্দর্যে কলঙ্কস্বরূপ কয়লার স্ফটিক স্তর, অন্য অবিভাজ্য প্রস্তরের প্রভাব এবং অন্যান্য দোষ থাকে। সম্প্রতি উক্ত মণি-আবিষ্কারক ইডার ওবারস্টাইনে আয়োজিত মণিবিশেষজ্ঞদের এক কংগ্রেসে নিজের কৃত্রিম মণির যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, তাতে দর্শকদের যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞ জহুরীগণ তাঁকে অভিনন্দিত করেন এবং এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেন। বিস্ময়ের আরো কারণ এই যে, কৃত্রিম মণি উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ গোপনে রয়েছে। স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই দিক থেকে যে, জার্মেনী শ্রেষ্ঠ মণি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র মার্কিন রাজ্যেই কৃত্রিম মণি প্রস্তুত হতো, অন্যত্র তা ছিল দুর্লভ।

চিত্র-সংরক্ষণ ও সংস্কার

শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত

শিল্পরসিক গুণীজনদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথা বাদ দিলেও দু-চারখানা জলরঙে আঁকা ছবি, পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র প্রভৃতি অনেকের বাড়ীতেই আছে। খানকয়েক ভাল ছবির প্রিন্টও বহুজনের কাছেই থাকে। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে, সংগ্রহের সময় যতখানি মনোযোগ দেখা যায়, সংরক্ষণের সময় ততখানি মনোযোগ প্রায়ই দেখা যায় না। ফলে এই সব ছবির অবস্থা শীঘ্রই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই প্রবন্ধে জলরঙের ছবি, প্রিন্ট, ড্রয়িং ইত্যাদি সংরক্ষণ ও সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। সত্য বটে সংস্কার কার্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাত দেওয়া উচিত নয়, তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য না নিলেও চলে। তাছাড়া উৎসাহী শিল্পরসিক, বিশেষ করে যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র, চেষ্টা করলে বিষয়টি মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারেন—আর সংরক্ষণে ঠিকমত নজর দিলে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও অনেক কমে যায়।

প্রথমেই ধরা যাক—এদের কি কি ক্ষতিকর প্রভাবের সম্মুখীন হতে হয়। প্রধানতঃ কাগজের উপরই এই সব ছবি আঁকা বা ছাপা হয়। কিন্তু কাগজ সহজেই নানাভাবে আক্রান্ত হয়। কাগজ পুরনো হলে অল্প-বিস্তর ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তুলা বা লিনেনজাত র‍্যাগ কাগজে এই ক্ষতিকর প্রভাব স্বল্প হলেও কাষ্ঠমণ্ডজাত কাগজের বিবর্ণতা ও ভঙ্গুরতা খুবই লক্ষণীয়। কাগজ পুরনো হলে তার অভ্যন্তরস্থ জলের মাত্রা কমে যায় এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। অবশ্য ভঙ্গুরতার আরও অনেক কারণ আছে। কাগজের মধ্যে সৃষ্ট অ্যাসিড কাগজের বিবর্ণতা ও ভঙ্গুরতার অন্যতম কারণ। সব কাগজেই (কেবল মাত্র ব্লটিং পেপার ছাড়া) সাইজ থাকে; সেই সাইজ কালক্রমে কাগজের মধ্যে অ্যাসিড সৃষ্টি করে। প্রায়ই ছবিগুলি কাগজের তৈরি মাউন্ট-বোর্ডের সঙ্গে আটকানো থাকে। মাউন্ট-বোর্ড সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাষ্ঠমণ্ড থেকে তৈরি হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাউন্ট-বোর্ডের সংস্পর্শে থাকবার ফলে ছবির কাগজের মধ্যে অ্যাসিডের পরিমাণ অধিকাংশ সময় বেশ কিছু বেড়ে যায়। আবার কখনও কখনও ছবিগুলি মাউন্ট-বোর্ডের সঙ্গে আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া থাকে। এই আঠায় যদি Alum জাতীয় কোন পদার্থ বর্তমান থাকে, তাহলে ছবির কাগজে অ্যাসিডের পরিমাণ কালক্রমে বেশ বেড়ে যায়। ছবির কাগজ বাতাস থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করতে পারে; ফলে কাগজের মধ্যে অ্যাসিডিটি দেখা দেয়। শিল্পাঞ্চল অথবা ঘনবসতির অঞ্চলের বাতাসের মধ্যে দহনজাত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস থাকে যথেষ্ট। এই সব অঞ্চলের বাতাসে ভাসমান ধুলাবালির মধ্যে লৌহকণাও থাকে। লৌহকণার অনুঘটনজনিত প্রভাবে কাগজে শোষিত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণতি লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবেও কাগজের ক্ষতি হয়—কাগজ ভঙ্গুর এবং লালচে বা হরিদ্রাভ হয়ে যায়। খবরের কাগজ রোদে ফেলে রাখলে যে হলদে এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, তা প্রায় সকলেরই জানা। অতিবেগুনী রশ্মি সেলুলোজের তন্তুগুলিকে জারিত করবার ফলেই এই বিবর্ণতা ও ভঙ্গুরতা দেখা দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, কাগজ বিবর্ণ

না হওয়া সত্ত্বেও অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে খুবই অমজবুত হয়ে পড়েছে। প্রিণ্ট, ড্রয়িং এবং জলরঙের ছবির ক্ষেত্রে বিবর্ণতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কাগজের জমির রং যদি বিবর্ণ হয়ে যায়. তাহলে ছবির Base-tone বা Colour-combination অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়—ফলে রসহানি ঘটে। যে কোন চিত্রশালায় গিয়ে লক্ষ্য করলেই উপরিউক্ত মতের সত্যতা বোঝা যাবে। অনেক সময় সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মি ছবির রঙের ঔজ্জ্বল্য কিছু পরিমাণে নষ্ট করে দেয়। সাধারণতঃ Vermillion, Maroon, মাঁদার অথবা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ রং, কোচিনীল এবং কোন কোন শ্রেণীর হলুদ, সবুজ ও কমলা রং অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ঔজ্জ্বল্য হারায়। ঔজ্জ্বল্য হ্রাসের অন্য কারণও অবশ্য আছে। বাতাসে যদি সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস অথবা ক্লোরিন গ্যাস থাকে (শিল্পাঞ্চলের বাতাসে এই দুটি গ্যাস লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান), তবে তাদের বিরঞ্জক ক্রিয়ায় ছবির কোন কোন রং ঔজ্জ্বল্য হারায়। যাহোক, ছবিকে সব সময় প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ থেকে দূরে রাখা দরকার। অনেকে এজন্যে জানালায় রঙীন কাঁচের সার্সি ব্যবহার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ রঙীন কাচ অতিবেগুনী রশ্মির প্রবেশ রোধ করতে পারে না—এজন্যে দরকার বিশেষ শ্রেণীর কাচ, যা আমাদের দেশে তৈরি হয় না। সব কাগজেই অল্প-বিস্তর কিছু লৌহ-যৌগ থাকেই—কালক্রমে ঐ লৌহ-যৌগ জারিত হয়ে ছবির কাগজে হলদে বা লালচে ভাব সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় ছাপার কালি বা রঙে লৌহ-যৌগ থাকে এবং কখনও কখনও ঐ যৌগ কাগজের অতিমাত্রায় ভঙ্গুরতার কারণ হয়ে ওঠে। এতক্ষণ যে সব ক্ষতিকর ক্রিয়ার কথা আলোচনা করা হলো, সে সব ক্ষেত্রে বিক্রিয়া ঘটাবার জন্যে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি প্রয়োজন। এছাড়া জলীয় বাষ্প আরও অনেক রকমে ছবির ক্ষতি করতে পারে। শোষিত জলীয় বাষ্পের প্রভাবে কাগজের মধ্য Sizing ও Loading বস্তুর পচন ঘটে; ফলে ছবির কাগজ অত্যন্ত অশক্ত হয়ে পড়ে ও সহজেই ছিঁড়ে যেতে থাকে। Sizing ও Loading বস্তুগুলি ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির কীট-পতঙ্গের প্রিয় খাদ্য। ছবি বা পুঁথি-পত্রের পয়লা নম্বরের শত্রু হিসাবে রূপালী-পোকা (Silver-fish) এবং উইপোকার কথা তো সকলেরই জানা। আর্দ্র জলবায়ুর দেশে ছত্রাক প্রায়ই ছবির উপর বাসা বাঁধে। বলা বাহুল্য, ছবির উপর ছত্রাক জন্মানো খুবই ক্ষতিকর। এতে যে ছবির সৌন্দর্যেরই ক্ষতি হয় তা নয়, ছবির কাগজটিও জীর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ ছত্রাকগুলি কাগজ থেকেই তাদের খাদ্য শোষণ করে। ছত্রাকের আক্রমণের প্রথম অবস্থায় লক্ষ্য না করলে অল্পদিনেই—বিশেষ করে আমাদের দেশের উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় সব রকম কাগজেই ছত্রাকের আধিপত্য ঘটে। সারা ছবিটি ছোট বড় অজস্র চাকা চাকা দাগে ছেয়ে যায় (দাগের রঙের রকমফের অনেক; প্রধানতঃ ছত্রাকের প্রজাতি এবং কাগজের উপাদানের উপরই এটি নির্ভর করে)। একেই বলে Foxing। আলো বাতাসহীন স্যাঁত-সেতে জায়গা ছত্রাক জন্মাবার পক্ষে খুবই অনুকূল; কাজেই এমন সব ঘরে ছবি রাখা উচিত নয় এবং স্যাঁতসেতে দেয়ালে কখনই ছবি টাঙাতে নেই। ছবির উপর ছত্রাক জন্মাতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে ফেলা উচিত এবং মুক্ত আলো-বাতাস ছবির গায়ে লাগতে দেওয়া কর্তব্য (তাবলে প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ নয়)। অল্প মাত্রায় ছত্রাক আক্রমণের পক্ষে মুক্ত আলো-বাতাস 'রোগমুক্তির" পক্ষে যথেষ্ট হলেও Thymol Fumigation করা অবশ্যই প্রয়োজন। নিরাপত্তার খাতিরে সব ছবিতে ছয়মাস অন্তর Thymol Fumigation করা বাঞ্ছনীয়। ছত্রাক-সৃষ্ট হাল্কা ধরণের দাগগুলি Chloramine

-T-এর মত মৃদু বিরঞ্জকের লঘু দ্রবণে (2%) তোলা যায়, কিন্তু মারাত্মক আক্রমণ-জাত দাগগুলি কাগজের গভীরে চলে যাবার জন্যে তোলা খুবই কষ্টকর। এছাড়া দাগলাগা স্থানে কাগজের সাইজিং উপাদান ছত্রাকেরা খেয়ে ফেলায় ঐসব দাগী জায়গায় কাগজ ব্লটিং পেপারের মত জল শোষণ ও ধারণের ক্ষমতা পায়—এটি ছবির পক্ষে ক্ষতিকর। এই ব্যাপার মারাত্মক রকমের হলে ছবিটি পুনরায় Sizing করা প্রয়োজন।

জলরঙের ছবিতে রঙের চোক্‌লা উঠে আসা খুবই সাধারণ ঘটনা। এই চোক্‌লা উঠে আসবার (Flaking of Pigments) ব্যাপারটির জন্যে দায়ী জলীয় বাষ্প। ছবিতে রঙের প্রলেপটি যদি পুরু হয় এবং রঙে যদি আঠালো পদার্থের ঘাট্‌তি থাকে (সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রঙের আঠালো ভাব কমে আসে) অথবা যদি Tonal effect সৃষ্টির জন্যে একটি স্তরের উপরে আর একটি স্তর আরোপিত হয়, তাহলে রঙের প্রলেপ কখনও কখনও খসে পড়ে। কাগজ আর্দ্র বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করায় তার আয়তন অল্প মাত্রায় বেড়ে যায়। আবার বাতাসে জলীয় বাষ্পের ঘাট্‌তি পড়লে ছবির কাগজ এই বাষ্প ত্যাগ করে সঙ্কুচিত হয়। সারা বছর ধরে প্রতিদিনই চলে সঙ্কোচন-প্রসারণের পালা। নতুন অবস্থায় রং কাগজের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দেয়। কিন্তু যতই পুরনো হতে থাকে, ততই সে পিছিয়ে পড়তে থাকে; তারই ফলে হয় Flaking।

অনেক সময় দেখা যায়, ছবি কোন চিত্রশালায় বা কোন ঘরে বহু বছর অক্ষত অবস্থায় টাঙানো ছিল, সেই ছবিই ঠাঁই বদল করবার ফলে Flaking-এর কবলে পড়েছে। এর কারণ, বহুদিন একই জায়গায় থাকবার ফলে ছবিটি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল—ঠাঁই বদলের ফলে সেই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্যে ঘর বদলের সময় দুই ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করা বাঞ্ছনীয়। প্রদর্শনীর জন্যে ছবি প্রায়ই ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে—এমন কি, বিদেশেও পাঠানো হয়। অনেকে আবার ছবি কেনেন নিজস্ব সংগ্রহের জন্যে। যেখান থেকে ছবি সংগ্রহ করা হলো এবং যেখানে সেটি টাঙানো হলো, সেই দুই স্থানের আবহাওয়ার তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাদের এই ভারতবর্ষেই আবহাওয়ার কত বৈচিত্র্য! বাংলা, বোম্বাই বা মাদ্রাজ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র—বর্ষাকালে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টিপাত হয়, বর্ষা দীর্ঘস্থায়ীও বটে। মাদ্রাজ উপকূলে আবার বছরে দু'বার বর্ষা। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছে জোর বাতাস—বাতাসে লবণের উপস্থিতি যথেষ্ট। উত্তর ও মধ্যভারতের জলবায়ু আবার মোটামুটি শুষ্ক—বার্ষিক তাপমাত্রায় যেমন রয়েছে বেশ তারতম্য (গ্রীষ্মে বেশ গরম শীতে আবার বেজায় ঠাণ্ডা), দৈনন্দিন তাপমাত্রায়ও ঠিক তেমনি বড় রকমের উঠা-নামা আছে। জয়পুর অঞ্চলের জলবায়ু তো খুবই শুষ্ক, প্রায় মরুসদৃশ। খুব বেশী রকমের তারতম্য ছবির পক্ষে ক্ষতিকর। বাংলা দেশ থেকে কোন ছবি যদি দিল্লী পাঠানো হয়, তবে দিল্লীর শুষ্ক আবহাওয়ায় ছবির কাগজের অভ্যন্তরস্থ সব জল শুষে নিতে চেষ্টা করে আর জলহারা সেই ছবিটি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে—রঙের চোক্‌লা উঠতে থাকে। দিল্লী থেকে আগত ছবির ক্ষেত্রে বাংলার আর্দ্র আবহাওয়াও ক্ষতিকর—Flaking এবং Foxing-এর ভয় থাকে পুরামাত্রায়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ছত্রাক অক্রমণের ভয় অল্প, তবে তার বদলে আছে মাছির উৎপাত। মাছির বিষ্ঠায় ছবির উপর বিশ্রী দাগ ধরে। কথাটা শুনতে অদ্ভুত হলেও বাস্তব সত্য।

স্থানান্তরিত করবার সময় দুই স্থানের আবহাওয়ার তারতম্য খুব বেশী হলে ছবিটি কাচের ফ্রেমে বাঁধাই করে, পিছনে জল-নিরোধক কাগজ বা পলিথিন চাদরের আস্তরণ দিয়ে

পাঠানো উচিত। কোন সময়েই ছবি প্যাকিং বাক্স থেকে বের করেই সঙ্গে সঙ্গে টাঙানো উচিত নয়। দু'চার দিন (প্রয়োজন হলে দু'এক সপ্তাহ—এমন কি, দু'চার মাস) স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে সাম্যাবস্থা অর্জনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। দূরপাল্লার দীর্ঘদিন বিদেশ-ভ্রমণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সে সময়ে যদি নানা ধরণের আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়, তবে প্যাকিং-এর সময় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত—যাতে যাত্রাপথে বাক্সের মধ্যে আর্দ্রতা ও উষ্ণতা মোটামুটি প্রায় একই রকমের থাকে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছাবার পর সাম্যাবস্থা রক্ষণের জন্যে ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষ ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব—যথাসম্ভব বিকল্প পন্থা ব্যবহারের চেষ্টা করা কর্তব্য।

এবার দেখা যাক, বাতাসের স্পর্শে ছবির কি কি ক্ষতি হয়। বাতাসের জারণ ও জলীয় বাষ্প-ঘটিত ক্ষতিকর প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। অন্যভাবেও বাতাস থেকে ছবির ক্ষতি হতে পারে। শুষ্ক বাতাস মাত্রেই ধূলাবালি ভর্তি থাকে। বাতাসের ধূলার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলের বাতাসে নানারকম ক্ষতিকারক গ্যাস ও সূক্ষ্ম ধূলিকণার সঙ্গে গন্ধক, অঙ্গার-কণা (Soot), ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম গুঁড়া ও বিভিন্ন লবণ পাওয়া যায়। ধূলাবালি ছবির উপর জমে কেবল যে সৌন্দর্য হানি ঘটায় তা নয়, ধূলাবালি সাধারণতঃ জলাকর্ষী হওয়ায় স্থানীয়ভাবে কাগজের স্যাঁতসেতে ভাব বাড়িয়ে তোলে। সাধারণতঃ ছবির পিছনেই ধূলা জমে বেশী এবং ঐ জায়গাগুলি ছত্রাক ও পোকা-মাকড়ের আস্তানায় পরিণত হয়। এছাড়া ধূলাবালি থেকে ছবিতে নানা ধরণের দাগ ধরে এবং অনেক সময় ছবির কোন কোন রং বিরঞ্জিত হয়ে যায়।

শিল্পাঞ্চলের বাতাসে নানারকম গ্যাস থাকে ; যথা—ক্লোরিন, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি। প্রথমোক্ত গ্যাস দুটি ছবির রং বিরঞ্জনের কারণ হতে পারে। হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস জলরঙে আঁকা ছবির Flake-white (Basic lead carbonate) রঙের সঙ্গে সহজেই রাসায়নিক ক্রিয়া করে কালো করে তোলে। এমন কি, Flake-white অন্য রঙের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকলেও তার হাইড্রোজেন সালফাইডের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সাদা White-lead রাসায়নিক ক্রিয়ায় কালো Lead sulphide-এ পরিণত হয়। অবশ্য হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রয়োগে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য আবার ফিরে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

গবেষণাগারে মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি

সোভিয়েট জীবাণুবিদ আনা জুকোভা এবং ইগর কোন্দ্রাতিয়েফের নির্দেশনায় তৈরি একটি বিশেষ ধরণের কক্ষে মঙ্গলগ্রহের অনুরূপ যাবতীয় অবস্থা ও পরিবেশ—অত্যন্ত তনূকৃত আবহমণ্ডল, অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ, একবারে অনেকখানি তাপাঙ্কের উত্থান-পতন (২৪ ঘণ্টায় ৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত), স্থানবিশেষে অতি-শূন্যতা ইত্যাদি—সৃষ্টি করা হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহের অবস্থায় পৃথিবীর জীবসমূহ কি ভাবে প্রভাবিত হবে ও তাদের জৈবক্রিয়ায় কি ধরণের পরিবর্তন ঘটবে, এতে তা জানা যাবে বলে এই বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

এর আগেকার পরীক্ষাগুলিতে মঙ্গলের আবহমণ্ডলের এক-একটি দিক, যথা—তাপাঙ্ক, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, চাপ প্রভৃতি আলাদা আলাদা-ভাবে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে জীবসমূহের উপর তাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়া অনুশীলন করা হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন মাঙ্গলিক কক্ষ যাঁরা ডিজাইন করেছেন, তাঁরা মনে করেন যে, মঙ্গল-গ্রহের আবহাওয়ার এই এক-একটি দিককে আলাদা আলাদাভাবে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি ও অনুশীলন করবার ফলে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, সেগুলি অধিকাংশই ভ্রান্ত।

অবশ্য মঙ্গলগ্রহের পরিবেশের কতকগুলি দিককে কৃত্রিম উপায়ে লেবরেটরির মধ্যে সৃষ্টি করা যায় না। এখনও পর্যন্ত মঙ্গলের অভিকর্ষ, তার চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া কিম্বা সেখানে কসমিক রশ্মি বিকিরণের অবস্থা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য এই নতুন কক্ষটিতে সূর্য থেকে মঙ্গলে যে শক্তিশালী বিকিরণ এসে পৌঁছায়, তার অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা গেছে।

বলা বাহুল্য, মঙ্গলের আবহমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও পর্যন্ত যৎসামান্য। সেই জন্যেই তা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা খুব কঠিন।

যতটা জানা আছে, সেই সব তথ্যের ভিত্তিতেই এই বিজ্ঞানী দুজন ৯৫.৫ শতাংশ নাইট্রোজেন, সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মাত্র ০.৫ শতাংশ অক্সিজেন মেশানো এক মিশ্র গ্যাস ব্যবহার করেন।

মঙ্গলের তাপাঙ্ক এবং তার ওঠা-নামা যতদূর সম্ভব হুবহু সৃষ্টি করা হয়েছে (০.৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও কম পার্থক্য)।

পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, মঙ্গলগ্রহের অবস্থায় জীবদেহের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে সৌরবিকিরণ। এই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, আদিম ধরণের জৈবপদার্থ মঙ্গলের পরিবেশ ঢের বেশী সহ্য করতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে, তাহলে এই লাল গ্রহটিতে হয়তো এই ধরণের জীবেরই আধিপত্য—কারণ, অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণজনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বেশ কিছুটা ক্ষমতা এদের আছে।

পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলিতে ব্যবহৃত জীবাণুবাহী মৃত্তিকার নমুনার বদলে জুকোভা ও কোন্দ্রাতিয়েফ সরাসরি ব্যাক্টিরিয়া ব্যবহার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই ধরণের পরীক্ষায় অ্যারিজোনা মরুভূমির মৃত্তিকা ব্যবহার করেছিলেন—কারণ তাঁদের মতে, ওই মৃত্তিকা মঙ্গলগ্রহের মৃত্তিকার প্রায় অনুরূপ।

বিজ্ঞানীরা যে সরাসরি ব্যাক্টিরিয়া ব্যবহার করেছেন, তার কারণ—জীবদেহের উপর মৃত্তিকার এক রক্ষাকারী প্রভাব আছে, যার ফলে পরীক্ষার ফল অন্য রকমের হতে পারে।

হৃদ্‌রোগ প্রতিকারে ইলেকট্রিক পেস্‌মেকার

হৃদ্‌রোগে যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা যাতে হৃৎপিণ্ডের কাজ অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ার ফলে মারা না যান, তার জন্যে একটা চেষ্টা চলছে। এক প্রকার নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ায় এই ধরণের রোগীকে অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।

এই যন্ত্রটি হলো ইলেকট্রিক পেস্‌মেকার। এই যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক অভিঘাত সৃষ্টি করে পেশীগুলিকে নিয়মিতভাবে উত্তেজিত করে পেশীর সংকোচন উৎপন্ন করে। পেস্‌মেকারটি দেহের বাইরেও বহন করা যায় অথবা আজকাল যা করা হচ্ছে, এটির এক অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ চামড়ার নীচে বসানো হয় এবং সেখানে এটি রোগীর দেহের একটি যান্ত্রিক অংশ হয়ে দাঁড়ায়। রোগী এই যন্ত্র-সংযোজনের কথা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে। পেস্‌মেকার থেকে অতি ক্ষুদ্র তারগুলিকে হৃৎপিণ্ডের পেশীর সঙ্গে যুক্ত করে হৃৎস্পন্দন উত্তেজিত করা সম্ভব হয়, অথবা ইলেকট্রোড হিসাবে ক্যাথিটার টিউবও ব্যবহার করা যায়। এই ক্যাথিটার টিউবগুলি দেহের বাইরের দিকে একটি শিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং চেম্বারগুলির (ভেন্ট্রিকল্‌) অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

লণ্ডনের ন্যাশান্যাল হার্ট হস্পিটালে চিকিৎসকেরা এখন অনিয়মিত হৃৎস্পন্দনের ব্যাপারে বিশেষভাবে পেস্‌মেকার ব্যবহার করে পরীক্ষা চালিয়েছেন। হৃৎপিণ্ডের এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যারিথমিয়া—গ্ল্যাণ্ড-সংক্রান্ত বিপর্যয়ের ফলে সাধারণতঃ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ন্যাশান্যাল হার্ট হস্পিটালের ডাঃ সোটন, এ. জি. লেথাম ও কার্সন তিনজনেই এই পেস্‌মেকার নিয়ে দুজন রোগীর উপর সম্প্রতি পরীক্ষা করেন। তাঁদের এই রোগী দুজনেরই হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত ছিল এবং প্রচলিত ঔষধপত্রে তাদের কোন উপকারই হচ্ছিল না। দুজনের অবস্থাই ছিল সঙ্কটজনক। কিন্তু পেস্‌মেকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভেষজ ব্যবহার করে চিকিৎসকেরা তাদের বাঞ্ছিত ফল পান। রোগী দুজনেরই হৃৎস্পন্দন নিয়মিত হয়।

১৪ মাস পরে পেস্‌মেকার সরিয়ে নিয়ে কেবল ভেষজ ব্যবহার করে উভয় রোগীই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়।

গবেষণাগারে চন্দ্রে যাত্রাপথের অবস্থা সৃষ্টি

চাঁদে যাবার পথে মহাকাশচারীকে যে সব অবস্থার, বিশেষতঃ তেজস্ক্রিয়াজনিত অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা লেবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে হুবহু সেই অবস্থা সৃষ্টি করে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

এই পরীক্ষায় তাঁরা সাদা ইঁদুর ব্যবহার করছেন। এর জন্যে এক বিশেষ ধরণের "জৈব কক্ষ" তৈরি করা হয়েছে। একটি টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে ওই কক্ষের ভিতরে ইঁদুরের অবস্থা-পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা হয়। ওই ইঁদুরগুলির উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকর্ষের শক্তিও ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হতে থাকে। দেখা গেছে, গোড়ার দিকে অল্পমাত্রায় (৫০-৬০ রণ্টগেন) তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করে ইঁদুরগুলিকে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত করে তোলবার পর আরও বেশী মাত্রায় তারা এই তেজস্ক্রিয়া সহ্য করতে পারে—জৈব প্রতিক্রিয়া অনেক কম হয়। মহাকর্ষশক্তি বৃদ্ধির ফলেও আয়ন-উৎপাদক তেজস্ক্রিয়ার (আয়োনাইজিং রেডিয়েশন) জৈব প্রতিক্রিয়াগুলি হ্রাস পায় বলে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে সৌর আগ্নেয় উদ্গীরণের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে ইঁদুরগুলিকে আকস্মিকভাবে সর্বাধিক মাত্রার তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার আগেই ইঁদুরগুলিকে

তেজস্ক্রিয়া-প্রতিরোধকারী এক বিশেষ ধরণের ইনজেকশন দেওয়া হয়। এর পরে মহাকাশযানটি মারাত্মক তেজস্ক্রিয়াধীন "বিপজ্জনক এলাকার" মধ্যে প্রবেশ করে এবং একটানা ২৪ ঘণ্টা ধরে তার মধ্য দিয়ে ধাবমান থাকে। পরীক্ষায় খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। ওই ইনজেকশন ইঁদুরগুলিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করেন—চাঁদে যাবার জন্যে মহাশূন্যদেশে তেজস্ক্রিয়ার মাত্রা এবং সেই সঙ্গে তেজস্ক্রিয় কণিকার শ্রেণী ও প্রকৃতি হিসেবের মধ্যে ধরে বৈজ্ঞানিক নীতির দিক থেকে যে কোন মহাকাশ-পথের মডেল তৈরি করা যেতে পারে।

পুস্তক-পরিচয়

সাপ - শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ ; শিক্ষা ভারতী—৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ; সুদৃশ্য মলাটে বাঁধাই, পৃষ্ঠা-৩০৮ ; মূল্য—আট টাকা।

সাপকে ভয় করে না, এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। আবার এমন অনেক লোকও আছে, যারা সাপ দেখা দূরের কথা, সাপের নাম শুনিলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সাপের অদ্ভুত আকৃতি, অদ্ভুত প্রকৃতি, অলক্ষ্য গতিবিধি, তাহাদের দংশনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এবং সর্বোপরি ভয় ও বিস্ময়োদ্দীপক নানারকম অলীক কাহিনী মানুষের মনে সর্পভীতি বদ্ধমূল করিয়া তোলে। ইহার ফলে অনেকে যে কোন সাপকেই বিষধর বলিয়া মনে করে—যদিও বিষধর অপেক্ষা নির্বিষ সাপের সংখ্যাই বেশী। কাজেই সাপ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অন্ততঃ একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতীয় বিষধর এবং নির্বিষ সাপের আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাহাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর বিবরণ এবং বিভিন্ন দেশের নানারকমের সাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। সর্বশেষে বিষধর সাপ চিনিবার উপায়, সাপ ধরিবার কৌশল, সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা, অ্যান্টিভেনিন প্রয়োগ—প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। আশাকরি, পুস্তকখানি পড়িয়া অনেকেই উপকৃত হইবেন।

ভূমিকম্প—সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; বিশ্ব-ভারতী ; ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭ ; মূল্য এক টাকা।

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন স্থানে অতি ক্ষীণ হইতে বড় রকমের ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া থাকে। প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্পের ভয়াবহতার বিবরণ কাহারও অজানা নাই। সুতরাং অনেকেরই ভূমিকম্প উৎপত্তির কারণ, তাহার বিস্তৃতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যাদির বিষয় জানিবার উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমিকম্প সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হইবার পর এই বিষয়ে তথ্যাদি জানিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হইয়াছে! এই সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে কেবল ভূপৃষ্ঠের অবস্থাই নয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা সম্ভব হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক এই সকল বিষয় সরল ভাষায় এবং গাণিতিক সমীকরণাদির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে ভূমিকম্পের প্রকৃতি, কেন্দ্র-উপকেন্দ্র, ভূকম্প-মাপক যন্ত্র, ভূকম্পনের তরঙ্গ ও গতিবেগ, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের গঠন, ভূমিকম্প উৎপত্তির কারণ, মহাদেশের অবস্থান পরিবর্তন, সমস্থিতিবাদ, অভিকর্ষের অসামঞ্জস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আগ্রহশীল পাঠকেরা বইখানি পড়িয়া অনেক কিছুই জানিতে পারিবেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

জেমিনী-৬ শূন্যপথে অ্যাজেনা টার্গেট যানের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে একসঙ্গে কক্ষপথ পরিক্রমার ব্যবস্থা হয়েছে। ছবিতে দেখানো হয়েছে (উৎক্ষেপণের পূর্বে) — অ্যাজেনার সঙ্গে সংলগ্ন হবার জন্যে জেমিনী-৬ এগিয়ে আসছে।

করে দেখ

ম্যাগ্‌ডিবুর্গ গ্লাস

'ম্যাগ্‌ডিবুর্গ হেমিস্ফিয়ার' নামে একটি বিখ্যাত পরীক্ষার কথা অনেকেরই জানা আছে। এটি বাতাসের চাপের সাধারণ একটা পরীক্ষা মাত্র। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর ম্যাগ্‌ডিবুর্গে লৌহ-নির্মিত দুটি শূন্যগর্ভ অর্ধগোলকের সাহায্যে বায়ুচাপের এই পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। অর্ধগোলক দুটিকে একত্রিত করে একটি গোলক তৈরি করবার পর অনায়াসেই আবার তাদের পৃথক করা যেত। কিন্তু গোলক তৈরি করে অভ্যন্তরস্থ বায়ু
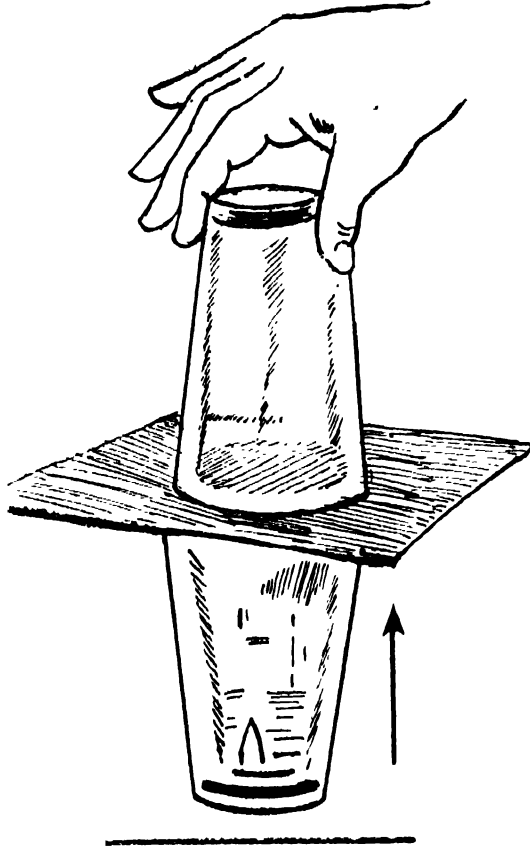
নিষ্কাশন করবার পর অর্ধগোলক দুটিকে পৃথক করবার জন্যে এক এক দিকে চারটি করে ঘোড়া জুতে টানতে হয়েছিল। এই হলো সেই বিখ্যাত ম্যাগ্‌ডিবুর্গ পরীক্ষা।

খুব ছোট্ট ভাবে এই পরীক্ষাটি তোমরাও করে দেখতে পার। একই মাপের দুটি কাচের গ্লাস এবং এক খণ্ড ব্লটিং পেপার সংগ্রহ কর। ব্লটিং পেপারখানা বেশ করে জলে

ভিজিয়ে নাও। এক সঙ্গে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেই জ্বলন্ত কাঠিগুলিকে একটা গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিয়ে ভিজানো ব্লটিং পেপারখানা গ্লাসের মুখে চাপা দাও। এবার অপর গ্লাসটিকে উবুড় করে ব্লটিং পেপারের উপর একটু চেপে বসিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে—ব্লটিং পেপার সমেত গ্লাস দুটি বেশ শক্তভাবে মুখে মুখে এঁটে বসে গেছে। উপরের গ্লাসটি টেনে তুললেই সঙ্গে সঙ্গে নীচের গ্লাসটিও উঠে আসবে।

ব্লটিং পেপার সচ্ছিদ্র হবার ফলে জ্বলন্ত কাঠিগুলি উপর ও নীচের উভয় গ্লাসের ভিতরকার অক্সিজেনই দহন করে ফেলবে; কাজেই ভিতরে চাপ হ্রাসের ফলে বাইরের বাতাসের প্রবলতর চাপ গ্লাস দুটিকে মুখে মুখে আট্‌কে রাখবে।

—গ—

রক্ত

রক্ত জিনিষটা তোমাদের কারোর কাছে অপরিচিত নয়। তথাপি রক্ত সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানতে নিশ্চয়ই তোমাদের কৌতূহল জাগে। তাই আজ তোমাদের কাছে রক্ত সম্বন্ধে কিছু বলছি।

মানবদেহের একটা অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো রক্ত, যাকে ইংরেজিতে বলে Blood। এটি উজ্জ্বল, গাঢ় লাল বর্ণের তরল পদার্থ।

রক্ত-প্রবাহ বা রক্ত সঞ্চালনই হলো জীবনের লক্ষণ, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া যদি বন্ধ হয় তাহলে মৃত্যু ঘটে। সুতরাং কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে আমরা নিশ্চয় বলবো না যে, তার শরীরে এখনও রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এর কাজ একটা পাম্পের মত। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সমস্ত শরীরে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনী (Artery), শাখা ধমনী, জালক বা কৈশিক নালী (Capillary) প্রভৃতির দ্বারা চালিত হয়ে রক্ত দেহের সমস্ত অংশে খাদ্য এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে কোষগুলিকে জীবিত রাখে। কেবল তাই নয়, কোষের দূষিত পদার্থ জালক, শিরা (Vein) প্রভৃতির দ্বারা হৃৎপিণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসবার আগে দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে শোধিত হয়।

পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, রক্তের মধ্যে তিনটি পৃথক উপাদান আছে। সেগুলি হলো:—১। লোহিত কণিকা (Red blood corpuscles), ২। শ্বেত কণিকা (White blood corpuscles) এবং ৩। রক্তরস (Plasma)।

লোহিত কণিকা:—এর উপাদান হিমোগ্লোবিন নামক লৌহের যৌগিক পদার্থ।

এর রং লাল। এই লাল রঙের জন্মেই আমরা রক্তকে লাল দেখি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) নাম তোমরা শুনেছ এবং কেউ কেউ দেখেও থাকবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে এই লোহিত কণিকাগুলিকে চ্যাপ্টা ও গোল দেখায়। লোহিত কণিকার প্রধান কাজ হলো, দেহের কোষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। শ্বাস নেবার সঙ্গে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। আমরা যে অক্সিজেন ফুস্ফুসে টেনে নিই, রক্তের লোহিত কণিকার সঙ্গে সেই অক্সিজেন দেহের প্রত্যেকটি কোষে পৌঁছে যায়। কোষনিঃসৃত দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডও লোহিত কণিকার সাহায্যে ফুস্ফুসে এসে পৌঁছায় এবং শ্বাস ফেলবার সঙ্গে আমরা তা ত্যাগ করি। অক্সিজেন দহনের ফলেই কোষের, তথা শরীরের উত্তাপ রক্ষিত হয়।

শ্বেত কণিকা ঃ—এই কণিকার নাম থেকেই মনে হয় যে, এর বর্ণ সাদা। কিন্তু এই কণিকাগুলি বর্ণহীন। এদের সংখ্যা লোহিত কণিকার চেয়ে অনেক কম, কিন্তু আয়তনে লোহিত কণিকা অপেক্ষা বড়। এদের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই।

রক্তে কোন জীবাণু প্রবেশ করলে আমাদের দেহে ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সে জন্মে ওই জীবাণুকে প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। রক্তে যে শ্বেত কণিকা থাকে, তাদের প্রধান কাজই হলো, কোন জীবাণু রক্তে প্রবেশ করলে তাদের প্রতিরোধ করা। কিন্তু তারা যখন প্রতিরোধ করতে পারে না অর্থাৎ জীবাণু-প্রতিরোধে যদি অক্ষম হয়, তাহলে সেই সুযোগে জীবাণু ব্যাধির সৃষ্টি করে।

রক্তরস ঃ—রক্তরসের প্রধান উপাদান হলো ফাইব্রিনোজেন নামে একপ্রকার তরল পদার্থ। এই রক্তরসের মধ্যেই লোহিত ও শ্বেত কণিকাগুলি ভেসে বেড়ায়। রক্ত বাইরের বায়ুর সংস্পর্শে এলেই তাথেকে ফাইব্রিন নামে একপ্রকার কঠিন পদার্থ তৈরি হয় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ফাইব্রিন তৈরি হবার পর যে তরল পদার্থ বের হয়, সেই তরল পদার্থের নাম সিরাম বা রক্তমণ্ড।

রক্তের ভিতর আর একপ্রকার কণিকা পাওয়া যায়। তার নাম হলো অমুচক্রিকা। এই কণিকা শ্বেত কণিকার মতই ক্ষুদ্রাকার। অমুচক্রিকা একপ্রকার রস নিঃসৃত করতে পারে। শরীরের কোথাও যদি রক্তপাত ঘটে, তবে এই রস নিঃসৃত হয়ে সিরামের সঙ্গে মিশে যায় এবং রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় পাঁচ-ছয় কিলোগ্র্যাম রক্ত থাকে।

পুলককুমার চট্টোপাধ্যায়

অ্যালেস্যান্‌দ্রো ভোল্‌টা

বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালেস্যান্‌দ্রো ভোল্‌টার নাম সর্বজন-পরিচিত। চার বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একেবারে বোবা ছিলেন। বাপ-মা তো ভেবেই আকুল—হায় হায়, এখনো ছেলের মুখে কথা ফুটলো না! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চার বছরে পদার্পণ করবার পর থেকেই একটি একটি করে তাঁর মুখে কথা ফুটতে লাগলো, আর বেশ চালাক-চতুরও হয়ে উঠলো। যখন তার বয়স সাত বছর, তখন স্কুলের ছেলেদের মধ্যে পড়াশুনা ও কথাবার্তায় সে-ই সেরা ছেলে বলে গণ্য হলো। বড় হবার পর এই ছেলের নামে সারা জগতে যখন সাড়া পড়ে গেল, তখন তাঁর পিতা বলেছিলেন—আমাদের ঘরে যে একটি রত্ন জন্মেছে, আমরা তা বুঝতেই পারি নি বহুকাল। অ্যালেস্যান্‌দ্রো ভোল্‌টার জন্ম হয়েছিল ১৭৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ইটালি দেশে।

আজকাল বিদ্যুতের খেলা সারা পৃথিবীময়। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, স্টোভ, চলার পথে বৈদ্যুতিক যান-বাহন, কলকারখানায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। এসব যেন আজ অতি সাধারণ ব্যাপার—সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায় বিদ্যুৎকে মিত্রভাবে। কিন্তু দু-শ' বছর আগে পৃথিবীর লোক জানতো, বিদ্যুৎ আছে সুদূর ঐ আকাশের মেঘের মাথায়, মারাত্মক শত্রুরূপে—মাঝে মাঝে মারণ-অস্ত্র হানে ভূতলে কড় কড় শব্দে। ইটালি দেশের এই ভোল্‌টা আকাশের বিদ্যুৎকে বহু গবেষণা, বহু সাধনার ফলে মানুষের আয়ত্তাধীনে আনবার প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন, তাকে বলা হয় ভোল্‌টায়িক ইলেকট্রিসিটি।

তাঁর সময়কালীন ঐ ইটালি দেশেরই আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যুতের ব্যাপার নিয়ে গবেষণায় মেতেছিলেন। তাঁর নাম লুইগি গ্যাল্‌ভ্যানী। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং শবব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার অধ্যাপক। তিনি তাঁর শবব্যবচ্ছেদাগারেই হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন—তারে ঝুলানো একটা মৃত ব্যাঙের পা দুটা হাওয়ায় দুলে একটা ধাতব রেলিং স্পর্শ করতেই অদ্ভুতভাবে নড়ে উঠলো। সেই থেকে তাঁর মনে হলো, প্রাণীর দেহে বিদ্যুৎ আছে এবং এই বিদ্যুতের নাম দিলেন তিনি 'অ্যানিম্যাল ইলেকট্রিসিটি' বা জৈব বিদ্যুৎ। একে তাঁর নামানুসারে 'গ্যাল্‌ভ্যানিক ইলেকট্রিসিটি'ও বলা হতো।

কিন্তু গ্যালভ্যানির এই মতকে ভোল্‌টা আমল দিলেন না। তিনি বললেন, বাইরের কোন অদৃশ্য বিদ্যুৎ-শক্তির প্রভাবে ব্যাঙের পা দুটা নড়ে গিয়ে থাকবে—ব্যাঙের

শরীর বিদ্যুৎ-উৎপাদক নয়, বিদ্যুৎ গ্রাহক বা বাহক (Conductor) মাত্র। বস্তুতঃ ভোল্টার এই মতটাই যে ঠিক, তা প্রমাণিত হয়ে যায় পরবর্তী পরীক্ষাদির দ্বারা।

ভোল্টা নিজে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেন দুটা বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে তরল পদার্থবিশেষের সংস্পর্শে, যে পদ্ধতিতে আজও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ব্যাটারী তৈরি হয়। বিদ্যুতের একটা প্রবাহ সৃষ্টি করা এই পদ্ধতির বিশেষত্ব। এই প্রবাহের শক্তিতে যন্ত্রপাতি চালিত হয়।

অপর দিকে গ্যাল্‌ভ্যানির নাম অমর হয়ে রইলো পরবর্তীকালে তাঁর আর একটি যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে। তাঁরই নামানুসারে সেই যন্ত্রের নাম হলো গ্যালভ্যানো-মিটার। এই যন্ত্রের দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব জানা যায়।

এদিকে ভোল্টা যখন তাঁর ভোল্টায়িক সেল আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ। এতকাল বিজ্ঞানের গবেষণায় মন তাঁর এতই মগ্ন ছিল যে, বিয়ের কথা ভাববার সময়ই পান নি। এই বার তিনি বিবাহ করে ঘর-সংসারে মন দিলেন।

অবশ্য একথাও এখানে বলা দরকার যে, বিদ্যুৎ উৎপাদক এই ভোল্টায়িক সেল আবিষ্কারের পূর্বেও কয়েক জন বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভোল্টার মত বিদ্যুতের স্রোত সৃষ্টি করতে পারেন নি। আজকাল বিদ্যুৎ-স্রোতের বলেই সব বৈদ্যুতিক কাজ চলছে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোন কোন পদার্থ অপর বিশেষ বিশেষ পদার্থের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় 'ফ্রিক্‌শগ্যাল ইলেকট্রিসিটি'। ১৬৬০ সালে বৈজ্ঞানিক অটো ভন গেরিক এই প্রকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৩৩ সালে ডুফে নামক একজন বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেছিলেন যে, রেশমের দ্বারা ঘর্ষণের ফলে দুটি কাচের রড যখন বিদ্যুৎ-শক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; অর্থাৎ কাছে টেনে না এনে দূরে ঠেলে দেয়। আর যদি পশমে ঘর্ষিত একটা গালার রডের কাছে ঐ কাচের একটা রডকে আনা যায়, তৎক্ষণাৎ তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে জোড়া লেগে থাকে। যাহোক এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে। একটাকে বললেন ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎ, অপরটার নাম দিলেন ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ। সমধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, আর বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এছাড়া আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে বিদ্যুতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন ভোল্টার প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তাঁর নাম বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন।

ভোল্টা যে শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন তা নয়, ছেলেবেলা থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য

তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, যার ফলে তিনি বহু কবিতা রচনা করে গেছেন। তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায় এবং লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এতে যেমন কবিত্ব ছিল, তেমনি আবার তাঁর পূর্ববর্তী বহু বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের প্রশস্তিও ছিল। কবিতাটি জোসেফ প্রিস্টলি, বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, জেম্‌স্‌ ওয়াট প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসায় পূর্ণ ছিল।

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ—
পিথেকান্‌থ্রোপাস ও সিনান্‌থ্রোপাস

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে প্রাচীনতম হলো পিথেকান্‌থ্রোপাস। পাঁচ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে এই এশিয়াতেই তাদের বাস ছিল। পিথেকান্‌থ্রোপাস ইরেক্টাসের ফসিলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল যবদ্বীপে। সেই কারণে সে জাভা-মানব নামেই সাধারণের কাছে বেশী পরিচিত।

পুরাতত্ত্ব আজ নানাক্ষেত্রে অ-বিশেষজ্ঞদের আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। ১৮৯১ সালে জাভা-মানবের ফসিলের আবিষ্কারও এই রকমের। ডুবোয়া নামে এক তরুণ ওলন্দাজ চিকিৎসকের কেমন করে যেন ছাত্রাবস্থাতেই ধারণা জন্মেছিল যে, সম্ভবতঃ আদি মানবের ফসিল পাওয়া যাবে ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে। সেনাদলে যোগ দিয়ে তিনি চলে এলেন সে দেশে। অবসর সময়টা ফসিলের খোঁজে কাটিয়ে কয়েক বছর পরে শেষে সত্যিই তিনি পেলেন এই অতিপ্রাচীন মানুষের মাথার খুলির কিয়দংশ, দাঁত আর উরুর হাড়—যবদ্বীপের ত্রিনিল নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে। পরে ঐ দ্বীপেই আরো হাড় পাওয়া গেছে এই জাতের মানুষের। বৈজ্ঞানিকেরা খুলি পরীক্ষা করে বলেছেন, মেরুদণ্ডের উপর মাথাটা কিভাবে বসানো ছিল। পায়ের একখণ্ড হাড় থেকে তাঁরা স্থির করেছেন, চলবার ধরণটা তাদের কেমন ছিল। সামান্য একটি দাঁত থেকে অনুমান করেছেন, তাদের খাদ্য কিরূপ ছিল।

পিথেকান্‌থ্রোপাসের দাঁতের আকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, বাদাম বা অন্যান্য কঠিন ফল ভাঙবার জন্যেই তারা প্রধানতঃ দাঁতের ব্যবহার করতো। তারা সম্পূর্ণ খাড়াভাবে হাঁটতে পারতো না, ঘাড় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকতো। বুদ্ধিতে তারা যে আধুনিক মানুষের চেয়ে খাটো ছিল, তার প্রমাণ তাদের মস্তিষ্কের আধারের

মাপ থেকেই বোঝা যায়। এর মাপ ৮৬০-৯৪০ সিসি। বর্তমান মানুষের মস্তিষ্কের আধারের মাপ ১২০০ সিসি; সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধিতে জাভা-মানব সবচেয়ে উন্নত বনমানুষ (গরিলা) আর বর্তমান কালের সবচেয়ে অনুন্নত মানুষের (অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী) মধ্যে অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছিল। দেহের উচ্চতা থেকেও তাকে 'মাথায় খাটো' বলা চলে। বর্তমান মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় অনুন্নত হলেও তাদের দেহ দুর্বল ছিল না মোটেই, তারা বেশ শক্তিশালীই ছিল।

পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ বন্য-পরিবেশে এই আদি মানবেরা শিকার খুঁজে বেড়াতো; প্রত্যহ তাদের মুখোমুখি হতে হতো বাঘ, গণ্ডার, হাতী, ওরাং, গিবন ইত্যাদি বন্য জন্তুর সঙ্গে।

জাভা-মানবের জন্মের কিছুকাল পরে এসেছে পিকিং-মানব, ওরফে সিনান্‌থ্রোপাস পিকিনেনসিস অর্থাৎ চীন-মানব। এদের দাঁত একটু ছোট, মাথাটি ছিল আরো কিছুটা আধুনিক মানুষের মত। তাদের মাথার খুলি ছিল বেশ গোল, কপাল আরো উন্নত; তার মানে অবশ্য বৃহত্তর মস্তিষ্ক। চারটি খুলি মেপে গড়ে আয়তন দাঁড়িয়েছে ১০৭৫ সিসি। সবচেয়ে বড়টির মাপ ১৩০০ সিসি।

পিকিং-মানব নাম দেবার কারণ—পিকিং শহরের ৩৭ মাইল দূরে শোকেতিয়েন নামক এক পাহাড়ের গুহায় তাদের প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায়। বিস্তৃতভাবে খনন-কার্য আরম্ভ হবার পর এসে গেল ১৯২৭ সাল। শুধু কয়েক খণ্ড পাথর আর একটি সন্দেহজনক দাঁতকে আশ্রয় করে অনুসন্ধানের তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। ছ-মাস খনন-কার্যের পর আরেকটি মাত্র দাঁত পাওয়া গেল। তবে সেটি যে মনুষ্য জাতীয় প্রাণীর, তা প্রমাণ করা সম্ভব হলো এবার। ঐ সামান্য নিদর্শন থেকে নতুন মানুষ সিনান্‌থ্রোপাসের ফসিল প্রাপ্তির সম্ভাবনা বুঝা গেল। পরবর্তী ১২ বছরে চল্লিশটিরও বেশী বিভিন্ন পিকিং-মানবের চিহ্ন মিললো। সেগুলি সমর্থন করলো ঐ একটিমাত্র দাঁতের সাক্ষ্য। এই আদি মানবেরা দুটি আশ্চর্য কীর্তির প্রমাণ রেখে গিয়েছিল তাদের গুহা-গৃহে। মানুষের হাতের হাতিয়ার সৃষ্টি ও আগুন ব্যবহারের প্রমাণ এই প্রথম সুস্পষ্টরূপে পাওয়া গিয়েছিল।

আগুন আবিষ্কারের পরে মাংস-ঝলসান ও শীত-নিবারণ—অন্ততঃ এই দুটি ক্ষেত্রে এর উপকারিতা বুঝতে গুহাবাসী মানুষের দেরী হয় নি।

পিকিং-মানবের খোলা উনুনের আশে-পাশে ঝলসানো হাড়গোড় বহু পড়ে ছিল, যা থেকে তাদের খাদ্য-তালিকার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। হরিণের মাংস ছিল প্রধান খাদ্য, তবে তারা অন্ততঃ ৭০ রকমের বিভিন্ন প্রাণী শিকার করেছে। সম্ভবতঃ নিজের জ্ঞাতিভাইদের খেতেও তাদের আপত্তি ছিল না। এই নরমাংস ভোজনের প্রবৃত্তির স্বপক্ষে যে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা খুব ভয়াবহ বলেই মনে

হয়। কতকগুলি ফাটা খুলির চেহারা দেখে সন্দেহ থাকে না যে, মাথাগুলি ফাটানো হয়েছিল পাথরের আঘাতেই।

খাদ্য ও বাসস্থলের আপেক্ষিক সুবিধা সত্ত্বেও পিকিং-মানবের আয়ু ছিল খুবই কম। এই গুহার চল্লিশটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র একজনের বয়স ৫০ থেকে ৬০, ১৫ জনের চৌদ্দরও কম। জীবন যে বিপদসঙ্কুল ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এথেকে যে, সবগুলি খুলিতেই ভোঁতা অথবা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতজনিত ক্ষতের চিহ্ন বিদ্যমান।

প্রধান অস্ত্র সম্ভবতঃ ছিল লাঠি ও পাথর—পাথর ভেঙে এরা নানারকম কাজের উপযোগী করে নিয়েছিল। মাংস ছাড়াও এরা (সম্ভবতঃ মেয়েরা) সংগ্রহ করতো বেরি, বাদাম, বুনো ঘাসের দানা। গুহার মুখে আগুন জ্বেলে এরা মাংস পোড়াতো, রাত্রিকালে শত্রুর বিরুদ্ধে এই আগুনই প্রধান ভরসা ছিল। শুধু পিকিং অঞ্চলেই নয়, উত্তর চীন থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সম্ভবতঃ ঘুরে বেড়িয়েছে সিনান্থ্রোপাস মানুষেরা।

জাভা-মানব ও পিকিং-মানবের প্রায় সমসাময়িক আরো পুরামানবের সন্ধান মিলেছে এশিয়াতে। আফ্রিকায়ও যে জাভা-মানবের মত লোকের বাস ছিল, তার প্রমাণ অ্যাটলান্থ্রোপাস।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা

বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত অগাষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা আয়োজিত হয়েছিল। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য তারপর বক্তৃতার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়। অদূর ভবিষ্যতে আবার বিদ্যালয়ে অনুরূপ বক্তৃতাদানের পরিকল্পনা পরিষদের রয়েছে। অনুষ্ঠিত বক্তৃতাগুলির স্থান, তারিখ, বিষয় ও বক্তার নাম নীচে দেওয়া হলো এবং সেই সঙ্গে দেওয়া হলো বক্তৃতানুষ্ঠানে যোগদানকারী বিদ্যালয়গুলির নামও।

স্থান : বেথুন কলেজিয়েট স্কুল
তারিখ : ১৪ই অগাষ্ট, ১৯৬৫
বিষয় : অণু-পরমাণুর জগৎ
বক্তা : শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
যোগ দেন যাঁরা : বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, হোলি চাইল্ড ইনষ্টিটিউট, সেণ্ট মার্গারেটস্ স্কুল ও শ্রীবিদ্যানিকেতন (বালিকা বিভাগ)

স্থান : ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়
তারিখ : ২০শে অগাষ্ট, ১৯৬৫
বিষয় : অণু-পরমাণুর জগৎ
বক্তা : শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগ দেন যাঁরা : ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়,

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট, শুঁড়া কন্যা বিদ্যালয় ও বীণাপাণি পর্দা গার্লস্ হাই স্কুল

স্থান: শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল
তারিখ: ২১শে অগাষ্ট, ১৯৬৫
বিষয়: মহাকাশ অভিযান
বক্তা: শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী

যোগ দেন যাঁরা: শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল, বাগবাজার হাই স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পার্ক ইন্‌ষ্টিটিউশন

স্থান: মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়
তারিখ: ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫
বিষয়: ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ
বক্তা: দীপক বসু

যোগ দেন যাঁরা: মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়, কমলা গার্লস্ স্কুল, ক্যালকাটা গার্লস্ অ্যাকাডেমী, বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয় ও কমলা চ্যাটার্জী স্কুল ফর গার্লস্

স্থান: স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল
তারিখ: ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫
বিষয়: অণু-পরমাণুর জগৎ
বক্তা: শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগ দেন যাঁরা: স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও কেশব অ্যাকাডেমী

দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচার ও অজ্ঞতা-কুসংস্কারের যে স্তূপীকৃত বোঝার ভারে আমাদের দেশ আজ জীবন্মৃত, সেই বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও তার প্রয়োগ অপরিহার্য। ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপারে দায়িত্ব অনেকখানি। তাদের সেই দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীজয়ন্ত বসু বক্তৃতাগুলির প্রারম্ভে বলেন যে, এজন্য ছাত্রছাত্রীদের ভালভাবে বিজ্ঞান শিখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সাধারণ মানুষকে, বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ সুবিধার যাদের একান্ত অভাব—বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি অন্ততঃ শেখাতে হবে। আর এই শেখা ও শেখানোর যোগ্য বাহন যে মাতৃভাষা, সেই সরল সত্যটি কখনো যেন ভুলে না যায়।

বক্তৃতাগুলির শেষে প্রশ্নোত্তরের পালার সময় শ্রোতাদের পক্ষ থেকে বহু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন তুলে ধরা হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেন বক্তারা এবং ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করেন যে, তাদের অন্যান্য প্রশ্ন থাকলে পরিষদের কার্যালয়ে সেইগুলি চিঠির মাধ্যমে তারা যেন জানায়—তাদের তাহলে যথাযথ উত্তর দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

বক্তৃতাগুলিকে প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য প্রত্যেকটি বক্তৃতায় স্লাইড দেখাবার ব্যবস্থা ছিল এবং বক্তৃতার বিষয় সংক্রান্ত চলচ্চিত্র দেখাবারও। চলচ্চিত্রগুলি বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম, ইউ. এস. আই. এস. ও বৃটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস-এর সৌজন্যে সংগৃহীত।

যে সব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বক্তৃতানুষ্ঠানে যোগদান করে, বিশেষতঃ যে বিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা আয়োজিত হয়, সেই সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য বিজ্ঞান পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

বক্তৃতামালার পরিচালনায় যাঁরা বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের নাম—সর্বশ্রী জয়ন্ত বসু, শুভেন্দুকুমার দত্ত, অনিলকুমার ঘোষাল, পঙ্কজ নারায়ণ রায়, দীপক বসু, শঙ্কর চক্রবর্তী, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্যামসুন্দর দে।

বিবিধ

১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

স্টকহোম থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে ১৯৬৫ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন মার্কিন ও একজন জাপানী বিজ্ঞানী।

তাঁরা হলেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুলিয়ান সুইংগার, ক্যালিফোর্ণিয়া প্রয়োগবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক রিচার্ড ফেম্যান ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিন-ইতিতো তোমোনাগা।

মৌলিক পদার্থকণার গতিবিধি ও অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে দূরপ্রসারী গবেষণার জন্যে তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এবারের পুরস্কারের নগদ মূল্য দু-লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এই টাকা তিনজনকে ভাগ করে দেওয়া হবে।

হার্ভার্ডের অধ্যাপক রবার্ট বার্ণস উড্‌ওয়ার্ড রাসায়নশাস্ত্রে গবেষণা ও নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনের জন্যে ১৯৬৫ সালের রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ফ্রান্সের পাস্তর ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, আঁদ্রে লোফ এবং জ্যাক মোনোকে ১৯৬৫ সালের জন্যে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এনজাইম ও ভাইরাস-এর উদ্ভব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁদের আবিষ্কারের জন্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক জ্যাকব এঁদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ। ১৯২০ সালে তাঁর জন্ম। অধ্যাপক মোনো জন্মেছেন ১৯১০ সালে এবং অধ্যাপক লোফ জন্মেছেন ১৯০২ সালে। তিনজনেই পাস্তর ইনষ্টিটিউটে নিযুক্ত আছেন। অধ্যাপক জ্যাকব কলেজ দ্য ফ্রান্সে 'জীবকোষ-উদ্ভব' বিষয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপক লোফ সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অণুজীববিদ্যা' বিষয়ের অধ্যাপক এবং অধ্যাপক মোনো ফ্যাকুল্‌তে দ্য সায়েন্সে 'জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর' বিষয়ের অধ্যাপক।

ব্রহ্মাণ্ডের নতুন সৃষ্টিতত্ত্ব

লণ্ডন থেকে ১০ই অক্টোবর '৬৫ এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল—যিনি ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের সঙ্গে একযোগে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করে পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজকে চমকিত করে দিয়েছিলেন—স্বীকার করেছেন যে, গত ২০ বছর ধরে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যা বলে এসেছেন, তাতে হয়তো ভুল ছিল।

বৃটিশ সাময়িক পত্র 'নেচারে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেন—মহাকাশে সঞ্চরমান শক্তি থেকে বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে এবং তাথেকেই ব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছিল বলে হয়েল-নারলিকার তত্ত্বে বলা হয়েছিল।

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে প্রান্তদেশে 'কোয়া-সার' রহস্য যতই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, ততই দেখতে পাচ্ছি, ওটাতে বড় রকমের ভুল ছিল।

ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ আমার সামনে ফুটে উঠছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি—কোটি কোটি বছর ধরে ব্রহ্মাণ্ড পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়ে চলছে।

আগেকার গবেষণার ন্যায় এবারও তাঁর সহায়তা করেছেন ডাঃ নারলিকার।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, ১৯৬৫

বিজ্ঞান কলেজ,
শারীরবৃত্ত বিভাগের বক্তৃতা কক্ষ।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫
শনিবার, অপরাহ্ন ৩-৩০ মিঃ

কার্য বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩১ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অধিবেশনের কার্যাদি পরিচালনা করেন। অধিবেশনের নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য আরম্ভ করিয়া কর্মসচিব মহাশয়কে পরিষদের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিবার জন্য আহ্বান জানান।

১। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিতে উঠিয়া প্রথমেই আলোচ্য বছরে পরিষদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী নিম্নলিখিত চারজন সদস্যের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন :

১। আজীবন সদস্য : স্বর্গতঃ হীরালাল রায় (আ-৩৬)

২। সাধারণ সদস্য : স্বর্গতঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (সা-১৪৫৫)

৩। আজীবন সদস্য : স্বর্গতঃ শচীন্দ্রনাথ মিত্র (আ-৩১)

৪। আজীবন সদস্য : স্বর্গতঃ ভগবানদাস আগরওয়ালা (আ-৩৩)

পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি উক্ত পরলোকগত সদস্যদের স্বর্গতঃ আত্মার অনন্ত শান্তি ও সদ্গতি কামনা করেন এবং উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের অমর আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানাইয়া কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টায় তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গত বৎসরে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়-করণের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ, জনপ্রিয় পুস্তকাবলী প্রকাশ, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দান, পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যাদি সম্পর্কে যথোচিত বিবরণ দেন। তিনি পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার অগ্রগতি ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যাদি সভায় পেশ করেন এবং আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত দান ও আর্থিক সাহায্যের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। এভাবে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দানের পর কর্মসচিব মহাশয় সভ্যগণের অধিকতর সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করিয়া তাঁহার বিবরণী শেষ করেন।

অতঃপর পরিষদের এই সপ্তদশ বার্ষিক বিবরণী উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক পরিষদের গত ১৯৬৪-১৯৬৫ সালের বিভিন্ন হিসাবের পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও বার্ষিক উদ্বৃত্ত-পত্র কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র মহাশয় সভায় উপস্থাপিত করেন। পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের এই সকল পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্ত-পত্র মুদ্রিতাকারে যথানিয়মে পূর্বেই সভ্যগণের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যগণ উল্লিখিত হিসাব-বিবরণীগুলি যথোচিত আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৬৪-৬৫ সালের উক্ত উদ্বৃত্ত-পত্র ও হিসাব-বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত হইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের ব্যয়-বরাদ্দপত্রগুলি, যাহা সভ্যগণের বিবেচনার জন্য ইতিপূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিল—তাহা কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনা ও বিবেচনার পরে উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক উক্ত ব্যয়-বরাদ্দপত্রগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

৩। কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে মনোনয়নের জন্য সাধারণ সভ্যগণের নিকট প্রেরিত মনোনয়ন পত্রগুলির প্রস্তাবিত নামগুলি এবং বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক সুপারিশসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের প্রস্তাবিত নামের তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। পরিষদের পরবর্তী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের উল্লিখিত তালিকা মুদ্রিতাকারে এই বৎসর পূর্বেই সভ্যগণের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ উক্ত তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এবং পরবর্তী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর বিভিন্ন পদে ও কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে তালিকায় উল্লিখিত নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়:

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—সভাপতি
শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়—সহঃ সভাপতি
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ " "
শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জী " "
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায় " "
শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র—কোষাধ্যক্ষ
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ—কর্মসচিব
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা—সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীজয়ন্ত বসু " "

কার্যকরী সমিতির সভ্য

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমহাদেব দত্ত
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীকিরণলাল ভট্টাচার্য
শ্রীশ্যামসুন্দর দে
শ্রীদীপক বসু
শ্রীশুভেন্দুকুমার দত্ত
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীমুক্তিসাধন বসু
শ্রীসন্তোষকুমার সেন
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষাল
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

সারস্বত সংঘ গঠন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে সারস্বত কর্তব্যাদি সম্পাদনের জন্য আলোচ্য বৎসরের সারস্বত সংঘ গঠন সম্পর্কে কর্মসচিব মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, নূতন সারস্বত সংঘ গঠনের কাজ এই বার্ষিক অধিবেশনে না করিয়া আপাততঃ পূর্বতন সারস্বত সংঘই বহাল রাখা হউক এবং পূর্বতন সংঘসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়কে বর্তমান ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য পুনর্নির্বাচিত বলিয়া গণ্য করা হউক। সংঘসচিব মহাশয় যথাসময়ে সারস্বত সংঘের সভা আহ্বান করিয়া সংঘ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিবেন।

হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য আগামী আর্থিক বৎসরের হিসাব-পরীক্ষক বা অডিটর নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গত বৎসরের হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে ইহার অন্যতম অংশীদার শ্রীপ্রভাসকুমার সরকার, চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট মহাশয় পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য পুনর্নির্বাচিত হইলেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে শ্রীপ্রভাস কুমার সরকার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট মহাশয় পরিষদের উক্ত বৎসরের হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য কার্যকরী সমিতির বিদায়ী ও নবনির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন :

১। শ্রীজয়ন্ত বসু
২। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৩। শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৪। শ্রীমুক্তিসাধন বসু
৫। শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জী

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত পাঁচ জন নির্বাচিত অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

সভাপতির ভাষণ

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভায় উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের প্রতি তাঁহাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি এই যুগে বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার উপরেই নির্ভর করে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাহার পূর্ণবিকাশ সম্ভব। অতঃপর তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মিত হইলে আমাদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা আরও ব্যাপক ও সুনিয়মিত করা সম্ভব হইবে। এরূপ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন।

সর্বশেষে শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয় পরিষদের উন্নতিকল্পে সভাপতি মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করেন এবং উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাঃ সত্যেন বোস	স্বাঃ পরিমলকান্তি ঘোষ
সভাপতি,	কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর

১। সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ৩। জয়ন্ত বসু
২। সুশীলকুমার মুখার্জী ৪। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৫। মুক্তিসাধন বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪/২/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, ১৯৬৫

বিজ্ঞান কলেজ
শারীরবৃত্ত বিভাগের বক্তৃতা কক্ষ।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫
শনিবার, অপরাহ্ণ ৩-৩০টা

কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আজ আমরা আমাদের বঙ্গীয়-বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার সতের বছর অতিক্রান্ত হয়ে এখন এর অষ্টাদশ বর্ষ চলছে। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার ধারা গত সতের বছর যাবৎ অব্যাহত রয়েছে এবং ধীরে ধীরে পরিষদ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে, এটা আমাদের সকলেরই গৌরব ও আনন্দের কথা। যাহোক, পরিষদের প্রতিষ্ঠানিক নিয়মানুসারে আছে—এই বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে আমাকে কর্মসচিব হিসাবে একটি বার্ষিক বিবরণী দিতে হবে।

এই বিবরণী দানের পূর্বে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, এবছর পরিষদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী কয়েকজন সদস্য পরলোক গমন করেছেন; এঁদের নাম:

১। আজীবন সদস্য: স্বর্গতঃ হীরালাল রায় (আ-৩৬)

২। সাধারণ সদস্য: স্বর্গতঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (সা-১৪৫৫)

৩। আজীবন সদস্য: স্বর্গতঃ শচীন্দ্রনাথ মিত্র (আ-৩১)

৪। আজীবন সদস্য: স্বর্গতঃ ভগবানদাস আগরওয়ালা (আ-৩৩)

পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা এঁদের পরলোক-গমনে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁদের স্বর্গতঃ আত্মার অনন্ত শান্তি ও সদ্‌গতি কামনা করছি। আসুন আমরা দণ্ডায়মান হয়ে এঁদের অমর আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে আমরা পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে গত ১৯৬৪-৬৫ সালের কাজকর্ম ও আর্থিক হিসাব-পত্রের পর্যালোচনা করে আপনাদের অনুমোদন প্রার্থনা করবো এবং পরবর্তী ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আপনাদের পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করবো। বস্তুতঃ পরিষদের সাধারণ সভ্যগণের এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক অধিবেশন; এর নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভাপতি মহাশয় অতঃপর এর কার্যপরিচালনা করবেন। অধি-বেশনের সেই নিয়মিত কার্যাদি আরম্ভের আগে পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে আমি আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের নিকট পেশ করছি।

সভ্যহিসাবে আপনারা পরিষদের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মোটামুটি বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করাই পরিষদের প্রথম ও প্রধান কাজ; তাছাড়া বিজ্ঞান-বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতাদান, বিজ্ঞান-পুস্তকের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনার

কাজও নিয়মিত ভাবে চলেছে। বর্তমানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ নবম সংখ্যা চলছে। গত বৎসরাধিক কাল পর্যন্ত এই পত্রিকা আমরা প্রতি মাসের ৭ তারিখে নিয়মিত প্রকাশ করে আসছি এবং সভ্য ও গ্রাহকগণকে ঐ নির্দিষ্ট দিনে পাঠাচ্ছি। নিজেদের প্রেস না থাকা সত্ত্বেও বাইরের প্রেস থেকে মুদ্রিত করে একটি মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশ করা সুব্যবস্থা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে গণ্য হবে। যাহোক, পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বাংলা ভাষায় নিছক বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকা; এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু প্রবন্ধ, তথ্যালোচনা, বিজ্ঞান সংবাদ প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে; ছোটদের জন্যে এর 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' অংশে বিভিন্ন বিষয় অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশিত হয় এবং এটি কিশোর ছাত্র ছাত্রীদের একটি বিশেষ আকর্ষণ। সম্প্রতি আমরা স্থির করেছি, বাংলায় বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে বিবিধ সুবিধা-অসুবিধা ও বাস্তব উপায়াদি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিজ্ঞতার আলোচনা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার একটি বিশেষ অংশ হিসাবে প্রকাশিত হবে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসারের পক্ষে এরূপ আলোচনা বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে মাসের পত্রিকা সেই মাসেরই ৭ তারিখে আমরা সকল সভ্য ও গ্রাহকগণকে যথারীতি বুকপোষ্টযোগে পাঠিয়ে থাকি। দেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও সেই পত্রিকা ১০।১২ তারিখের মধ্যে পৌঁছাবার কথা। সময় মত পত্রিকা না পেলে অবিলম্বে সেই অপ্রাপ্তির সংবাদ পত্রদ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে; মাসের ২০ তারিখের মধ্যেও সেই সংবাদ জানা গেলে ডাকের গোলযোগে এরূপ হয়েছে মনে করে আমরা তার প্রতিকার করতে পারি। অন্যথায় ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ কোন কোন মাসে পত্রিকা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, পত্রিকার প্রকাশ-সংখ্যা ইদানীং অনেকটা বেড়েছে; আমরা এখন এর ১৮৫০ কপি প্রকাশ করছি। মনে হয় পরবর্তী সংখ্যা থেকে ১৯০০ কপি প্রকাশ করা প্রয়োজন হবে।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশ করাও পরিষদের সাংস্কৃতিক কর্তব্যের অন্যতম। পরিষদ কর্তৃক এযাবৎ মোট ২৪ খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দিকের প্রকাশিত কয়েকখানা পুস্তক নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পরে আর পুনঃপ্রকাশিত হয় নি। তার পরিবর্তে নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচ্য বছরে 'রাজ শেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতার চতুর্থ বার্ষিক বক্তৃতাটি 'খাদ্য ও পুষ্টি' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে—বক্তা ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের। তাছাড়া ডক্টর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত 'কয়লা' শীর্ষক পুস্তকখানা কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের যুগ্ম সহযোগিতায় 'খাদ্য থেকে যে শক্তি পাই' এবং 'রোগ ও তার প্রতিকার' শীর্ষক দু'খানা পুস্তক প্রকাশের জন্যে প্রার্থিত অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। এই দু'খানা পুস্তক প্রকাশের বিধিব্যবস্থা এখন চলছে। গত ১৯৬১-৬২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল, তার দ্বারা উক্ত জীবনী পুস্তক নানা কারণে বহু বিলম্বে হলেও শীঘ্রই আমরা প্রকাশের ব্যবস্থা করছি।

যাহোক, পরিষদ প্রকাশিত পুস্তকাবলী বিক্রয়ের জন্যে ব্যবসায়ভিত্তিক ব্যবস্থা করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ ব্যবস্থায় যা বিক্রয় হয়, তা

তেমন আশাপ্রদ না হলেও কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানানুরাগী এই সকল পুস্তক পাঠে উপকৃত হচ্ছেন, তা-ও পরিষদের উদ্দেশ্যের সহায়ক বলে মনে করি। পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি সামান্য এক টাকা মূল্যে বিক্রীত হচ্ছে; বিক্রেতাগণকে উপযুক্ত কমিশনও প্রদত্ত হয়। আপনাদের নিকট প্রেরিত হিসাব-বিবরণী থেকে আপনারা জেনেছেন, আলোচ্য বছরে পুস্তক মোট বিক্রয় হয়েছে ১,২০৩'৭১ টাকা মাত্র।

পরিষদের সভ্যগণকে প্রকাশিত বিক্রয়মূল্যের উপরে ২৫% কমিশন বাদে দেওয়া হয়। আমরা আশা করি, আপনাদের পরিচিত ছাত্র-মহলে পরিষদের পুস্তকগুলির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন

পরিষদ পরিচালিত বিজ্ঞান-পুস্তকের গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের কাজ আশানুরূপ না হলেও মোটামুটি ভাবে চলছে। স্থানাভাব ও যথোপযুক্ত সুব্যবস্থার অভাবে এই গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যাও সামান্য; তদুপরি পাঠাগারের ব্যবস্থাও প্রয়োজনানুরূপ নয়। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানানুরাগী ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণকে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে আকৃষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে এসব অসুবিধা দূর করা যাবে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদির একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিসহ একটি প্রশস্ত পাঠাগার অবশ্যই আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

পরিষদের গৃহনির্মাণ সম্পর্কে কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখন আপনাদের নিকট পেশ করছি। আপনারা সকলেই জানেন, মধ্যকলিকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে সি. আই. টি পার্কের সংলগ্ন একখণ্ড জমি পরিষদের গৃহনির্মাণের জন্যে প্রায় তিন বছর পূর্বে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিষদের প্রস্তাবিত গৃহের পূর্ণাঙ্গ প্ল্যান তৈরির কাজও সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং কার্যকরী সমিতি কর্তৃক সেই প্ল্যান অনুমোদিত হয়ে এখন তা কলিকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়েছে। পরিষদের সভ্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীপ্রিয়রঞ্জন গুহ মহাশয়কে পরিষদ-গৃহের প্ল্যান তৈরি ও তা কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত করাবার ভার অর্পণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে শ্রীগুহের প্রচেষ্টায় কর্পোরেশনের অনুমোদন পাওয়া যাবে এবং আমরা গৃহনির্মাণের কাজে হাত দিতে পারবো।

গৃহনির্মাণ সম্পর্কে একটি আনন্দ-সংবাদ দিয়ে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। আলোচ্য বছরে আমরা কুমার প্রমথনাথ রায় চেরিটেবল ট্রাষ্ট থেকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকার দান লাভ করেছি, প্রধানতঃ পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলের সাহায্য হিসাবে। এই দানের চুক্তিপত্রের সর্ত অনুসারে পরিষদের গৃহনির্মিত হলে তার একটি তলার বহির্ভাগে স্মারক হিসাবে দাতার নাম লিখিত থাকবে।

আলোচ্য বছরে দানপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে আর একটি দানের কথা আপনাদের জানাচ্ছি। দক্ষিণ কলিকাতার গ্রোভলেন নিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের সাধারণ উন্নতিকল্পে ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেটে মোট ১১,০০০৲ টাকা দান করেছেন। এই সার্টিফিকেট পরিষদের নামে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'পাবলিক ডেট' অফিসে জমা আছে। পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে যে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হবে, তারই পরিপূরক হিসাবে দাতার অভিপ্রায় অনুসারে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলা হবে, যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ উপকৃত হতে পারে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিষদের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে জনপ্রিয়

বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা অন্যতম। এযাবৎ নিয়মিত-ভাবে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমি সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি কয়েকজন উদ্যোগী যুবক সদস্যের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় পরিষদের এই পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই নিয়মিত বক্তৃতা দানের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এক-একটি বড় বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী ৩।৪টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত করে এই বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'পরমাণু-জগৎ', 'বিদ্যুতের কথা' প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় অবলম্বনে এরূপ বক্তৃতা স্লাইড সহযোগে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন স্কুলে করা হচ্ছিল। বক্তৃতার পরে তৎসংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি কতকগুলি বিদ্যালয়ে পরিষদের ব্যবস্থাপনায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, পাঠাগার, সমিতি প্রভৃতি থেকে এরূপ বক্তৃতা দানের আহ্বান আসছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে একাজ আপাততঃ বন্ধ রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছি। স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে আমরা পুনরায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবো।

পরিষদের জনসংযোগ সমিতির মাধ্যমে এই বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সমিতির শ্রীজয়ন্ত বসু, শ্রীদীপক বসু, শ্রীঅনিল ঘোষাল, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ সকল সদস্যগণকে পরিষদের এই পরিকল্পনার কাজে তাঁদের উদ্যম ও উৎসাহের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যাহোক, পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দানের এখানে অবকাশ নেই। পরিষদের আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আমি আমার এই বিবরণী শেষ করবো। গত ১৯৬৪-৬৫ সালের বিভিন্ন হিসাব-পত্রের অডিটর কর্তৃক পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণীর মুদ্রিত কপি আমরা নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে আপনাদের পাঠিয়েছি। ঐ সকল বিবরণী থেকে আপনারা পরিষদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিস্তৃত তথ্যাদি সকলই অবগত হয়েছেন। পত্রিকা প্রকাশন সম্পর্কিত হিসাব-বিবরণী লক্ষ্য করলে আপনারা দেখে থাকবেন, পত্রিকা প্রকাশের হিসাবে পরিষদ এখনও তেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নি; এখনও ঘাটতি চলছে। অবশ্য সরকারী গ্রাণ্ট পেতে হলে এরূপ ঘাটতি থাকাও প্রয়োজন। যাহোক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা যাতে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—এর গ্রাহক ও পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তার জন্যে আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হতে হবে।

এবিষয়ে আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, বর্তমান বছরে পরিষদের শতাধিক নতুন সভ্য সংগৃহীত হয়েছে। এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীজয়ন্ত বসু, শ্রীদীপক বসু, শ্রীশ্যামসুন্দর দে প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী সদস্য ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক নতুন সভ্য সংগ্রহ করেছেন। উদ্যোগী সদস্য-গণের এরূপ আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আগামী বছরে পরিষদের সভ্য-সংখ্যা আরও অনেকটা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। আপনাদের সকলের নিকটই আমরা আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিচিত মহল থেকে ২।৪ জন নতুন সভ্য

সংগ্রহ করে পরিষদের কর্মপ্রসারে সহায়তা করবেন।

পরিষদের আর্থিক অবস্থা প্রসঙ্গে সরকারী সাহায্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই বিষয়ে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে আমরা গত বহু বছর যাবৎ নির্দিষ্ট ৩৬০০৲ টাকা পত্রিকা-প্রকাশনের সাহায্য হিসাবে পেয়ে আসছি। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় পত্রিকা-প্রকাশনের সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে লিখিত ও ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট আবেদন-নিবেদন করা হয়েছিল। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার্ষিক বরাদ্দ-বৃদ্ধিতে তাদের অক্ষমতা জানিয়ে ভারত সরকারের নিকট রাজ্যের প্রদত্ত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দের জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। ফলে গত বছরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে রাজ্যসরকারের সমপরিমাণ ৩৬০০৲ টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়েছি। সরকারী বার্ষিক সাহায্যের এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকলে পত্রিকা-প্রকাশনে বিশেষ কোন সঙ্কট দেখা দেবে না বলেই আশা করি।

প্রকৃতপক্ষে কেবল মাত্র সভ্য ও গ্রাহকবর্গের চাঁদা ও অনিয়মিত সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে এরূপ সাংস্কৃতিক জন-প্রতিষ্ঠানের কাজ চলতে পারে না। এর জন্যে সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং জনহিতৈষী বদান্য ব্যক্তিদের দান না পেলে এরূপ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার সুষ্ঠু পরিচালনা কখনও সম্ভব হয় না।

যাহোক, পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে আমি একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করলাম। এথেকে পরিষদের কিছুটা কর্মপ্রসার ও অগ্রগতির পরিচয় আপনারা আশা করি পেয়েছেন। আপনাদের শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় পরিষদ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হবে বলে আমরা আশা করছি। বর্তমানে দেশে যেরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাতে পরিষদ পরিচালনায় আমাদের অধিকতর সক্রিয় ও সতর্ক হতে হবে, একথা স্মরণ করিয়ে এবং আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতার ঐকান্তিক কামনা নিয়ে আমি আমার বিবরণী এখানেই শেষ করছি। ইতি

ভবদীয়

পরিমলকান্তি ঘোষ

কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাদশ বর্ষ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ দ্বাদশ সংখ্যা

মানুষের ভাগ্যলিপির রাসায়নিক ভিত্তি

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

অজানাকে জানবার, অদৃষ্টকে দৃষ্টিগোচর করবার, ভাবী জীবনের ভাগ্য সম্বন্ধে অবগত হবার কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। এরই প্রেরণায় মানুষ গড়ে তুলেছে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনমূলক সভ্যতা। এই প্রবৃত্তির বশে প্রাচীন যুগে সকল সভ্যদেশেই মানুষ সুরু করেছিল ফলিত জ্যোতিষের চর্চা এবং গবেষণা। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বিদ্যা হিসাবে ফলিত জ্যোতিষ অবজ্ঞাত এবং ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসকে গণ্য করা হয় কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস বলে। তথাপি আপন ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার ফলে আজ পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত সকল দেশেই ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব আছে অব্যাহত হয়ে, এমন কি, বিশেষ অর্থকরী ব্যবসায় হিসাবে। বর্তমানে প্রাচ্য ভূখণ্ডে ও আফ্রিকায় এর প্রচলন হচ্ছে সব চেয়ে বেশী।

বিজ্ঞানেরও সব কাজকারবার চলছে অজানাকে জানবার প্রচেষ্টায় এবং অদৃষ্টকে দৃষ্টিগোচর করবার প্রয়াসে। কিন্তু যেখানে ফলিত জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে মানুষের অন্ধবিশ্বাস, বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা যান্ত্রিক প্রমাণ—সত্যনির্ধারণে যার সাক্ষী হচ্ছে নিঃসংশয়ে নির্ভর-যোগ্য। বস্তু ও বহির্জগতের স্বরূপ নির্ণয়ই ছিল এতকাল যাবৎ বিজ্ঞানের প্রধান কাজ, যার ফলে জড়কণার কেন্দ্রস্থলে সে সন্ধান পেয়েছে অফুরন্ত শক্তির। এই শক্তিতে লাগাম দিয়ে মানুষ আজ চলেছে তার বিজয় অভিযানে—জলে, স্থলে,

অন্তরীক্ষে—গ্রহ-উপগ্রহ প্রদক্ষিণে। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এক সর্বগ্রাসী বিভীষিকার, এক বিশ্ব-ব্যাপী অভাবনীয় ধ্বংসলীলার আতঙ্কের—যদি কখনো অহঙ্কারে মত্ত মানুষ এই শক্তিকে দেয় তার বাঁধন থেকে মুক্ত করে।

অন্যদিকে জীবের অভিব্যক্তি ও মানবমনের স্বরূপ নির্ণয়ে বিজ্ঞান উদাসীন ছিল, একথাও বলা চলে না। জীববিজ্ঞানে ডারউইন-প্রবর্তিত অভিব্যক্তিবাদ এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একটি প্রধান কীর্তি। মনোবিজ্ঞানেও উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর-ব্যাপী জীব-বিজ্ঞানী, পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং রসায়ন-বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টায় জীব-বিজ্ঞানে যে-সব অসাধারণ তথ্যের আবিষ্কার ঘটেছে, তাৎপর্যে, গুরুত্বে ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় তা পরমাণুকেন্দ্রে নিহিত শক্তির আবিষ্কারকেও ছাড়িয়ে যায়। বস্তু-জগতে যেমন সকল শক্তির উৎস হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে, জীব-জগতেও অনুরূপ জীবের সকল শক্তি ও ধর্মের উৎস হচ্ছে জীবকোষের কেন্দ্র-প্রদেশে। বটের ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে ভবিষ্যতের বিশাল বটবিটপীর জীবনের সকল ইতিহাস; সেরূপ জীবকোষের কেন্দ্রস্থলে জীব-জীবনের নক্সার হয় সৃষ্টি, যাকে জীবের ঠিকুজী বা ভাগ্যলিপি বলা যায়। জীবের দেহ-মনের সকল-শক্তি ও সকল ধর্মের পরিচয় মিলে কেন্দ্রস্থ রাসায়নিক পদার্থের অণুর সংযুতি ও গঠন-কৌশলে। সৃষ্টি-রহস্যের সবচেয়ে বড় এবং নিগূঢ় রহস্য হচ্ছে জীবনের রহস্য। কি অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় পুং-বীজ বা শুক্রকোষে নিষিক্ত স্ত্রী-বীজ বা শোণিত-কোষ প্রথমে একটি অতি ক্ষুদ্র জীবকোষে পরিণত হয়ে অনুরূপ কোটি কোটি বিশিষ্টধর্মী জীবকোষের উৎপত্তি করে, যা থেকে বিচিত্রধর্মী দেহযন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠে, তার সন্ধান পেয়েছেন বর্তমানে বিজ্ঞানীরা। জীবনের চাবিকাঠি এখন বিজ্ঞানীদের হস্তগত, একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, জীবকোষের কেন্দ্রে নিউক্লিক অ্যাসিডঘটিত যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাদের অণুর আভ্যন্তরীণ পরমাণুবিন্যাস ও অবয়বের উপর মানবজীবনের ভবিষ্যৎ বিকাশের সকল বিবরণ থাকে আঁকা। এই অদ্ভুত রাসায়নিক পদার্থটি সম্বন্ধে—যাকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে DNA)—কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকগণের সুবিধার জন্যে গোড়ায় একটু ভূমিকার আবশ্যক হবে মনে করি। মানুষের দেহের একটি প্রাথমিক ও প্রধান উপাদান হচ্ছে আমিষ জাতীয় বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন প্রোটিন। আমাদের দেহের রক্ত-মাংস হলো এসব প্রোটিন জাতীয় পদার্থের উদাহরণ। কথায় বলে রক্ত-মাংসের শরীর। বহু কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন পরমাণু মিলে এক একটি প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে। কোন কোন প্রোটিনে আবার ফস্‌ফরাস এবং সালফার (গন্ধক) পরমাণুও বর্তমান থাকে। এক একটি প্রোটিন অণু ওজনে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ৫০০০ থেকে ৫,০০০,০০০ গুণ ভারী হয়। এই কারণে এদের বলা হয় অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকায় অ্যামিনো অ্যাসিড জাতীয় পদার্থের অণুর পরম্পর অনুক্রমিক সংযোগে এক একটি বিশাল দীর্ঘকায় প্রোটিন অণুর উৎপত্তি হয়। মোটের উপর বিশ প্রকারের অ্যামিনো অ্যাসিডের অস্তিত্ব জানা গেছে। এদের মধ্যে কতকগুলি আমাদের দেহের প্রোটিন গঠনে বিশেষ আবশ্যকীয়। দেহরক্ষার প্রয়োজনে খাদ্য হিসাবে আমরা যে সব প্রোটিনজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করি, যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি—আমাদের দেহের অভ্যন্তরে পরিপাক শক্তির প্রভাবে এসব

প্রোটিন পদার্থের অতিকায় অণু ভেঙ্গে ওর ঔপাদানিক একক অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়। পরে এসব অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুগুলি পুনরায় দেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নতুন শৃঙ্খলায় জুড়ে গিয়ে দেহের উপযোগী বিবিধ প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে। এই প্রোটিন সৃষ্টির কাজে DNA হচ্ছে প্রধান নিয়ন্তা বা অধ্যক্ষ। দেহে জীব-কোষের রাজ্যে DNA হলো রাষ্ট্রপতি বহু

১নং চিত্র

সহকারী আজ্ঞাবাহী কর্মীর দল সৃষ্টি ও নিযুক্ত করে DNA তার প্রোটিন সৃষ্টির কারখানায়। বিভিন্ন জাতীয় রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে RNA)—হচ্ছে এসব কর্মী। জীব-কোষের কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করে DNA তার কর্মচারীদল (RNA)কে পাঠিয়ে দেয় কোষের সকল প্রদেশে প্রোটিন সৃষ্টির কাজে। যেহেতু DNA হচ্ছে RNA-এর জন্মদাতা, সেহেতু উভয়ের অণুর সংযুতি ও গঠনবিন্যাসে নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। RNA বা রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড নাম থেকে বোঝা যাবে যে, রিবোজ (ribose)-জাতীয় একপ্রকার শর্করা হচ্ছে এর একটি প্রধান উপাদান। সুতরাং DNA বা ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিডে যে রিবোজ থাকে, তাতে একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে কম। ইংরেজী ডিঅক্সি (deoxy) শব্দটির অর্থ হলো—একটি অক্সিজেন পরমাণুবিহীন (minus an oxygen atom)।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বহু ক্ষুদ্রকায় অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুর পরস্পর সংযোগে এক একটি অতিকায় প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। এসব অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুর সংযুতি ও প্রোটিন অণুতে তাদের পারস্পরিক সমাবেশের তারতম্যে প্রোটিনের ধর্ম ও গুণাবলী যায় বদ্‌লে। দীর্ঘ ও অতিকায় প্রোটিন অণু সাধারণতঃ সরল-ভাবে অবস্থিতি করে না। একই প্রোটিন অণুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে হাইড্রোজেন বাঁধনের (hydrogen bond) দরুণ অণুগুলি চক্রাকারে গুটিয়ে থাকে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে স্ক্রু প্যাঁচের বা প্যাঁচানো লোহার সিড়ির আকার গ্রহণ করে (১নং চিত্র)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বা তিনটি প্রোটিন অণু পরস্পরের মধ্যে হাইড্রোজেন বাঁধনের দরুণ পাশাপাশি জুড়ে আরো একটি বৃহত্তর প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে। এই জাতীয় প্রোটিন অণুর দৃষ্টান্ত মিলে কোলাজেন (collagen) নামক চামড়া, সন্ধি-বন্ধনী (ligament) এবং মাংসপেশীর প্রোটিনে। এভাবে তিনটি অতিকায় অণুর শৃঙ্খলে গড়া কোলাজেন অণুর গঠনবিন্যাস ও অবয়ব প্রথম আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর রামচন্দ্রন।

পরিণত বয়সের কোন জীবদেহে, তথা মানুষের শরীরে, হাজার হাজার কোটি জীবকোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। এরা সবাই হচ্ছে তাদের আদিপুরুষ শুক্রগর্ভ শোণিতকোষের বংশধর। এই আদিম জীবকোষটি আপনাকে প্রথম দ্বিধাবিভক্ত করে জন্ম দেয় দুটি অনুরূপ নতুন জীবকোষের। এদের প্রত্যেকটিও আবার অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করে দুটি সদ্য জীবকোষের। এই প্রক্রিয়ার অবিরত পুনরা-বৃত্তির ফলে জীবকোষের সংখ্যা যায় ক্রমশঃ বহুগুণে বেড়ে। একে বলা হয় জীবকোষের বিভাজন

(cell division)। আভ্যন্তরীণ প্রোটিন পদার্থের সংযুতি ও ধর্মের তারতম্যে এসব জীবকোষের বহু প্রকার ভেদের সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার বিভিন্ন রকমের প্রোটিন থাকে, এসব জীবকোষের অভ্যন্তরে কোষকেন্দ্রের বহির্দেশে (cytoplasm)। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের জীবকোষের ক্রিয়া নির্ভর করে তাদের আভ্যন্তরীণ প্রোটিন পদার্থের প্রকার-ভেদ ও গঠনবৈশিষ্ট্যের উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মাংসপেশীর জীবকোষের ধর্ম—সঙ্কোচন-প্রসারণের কারণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অতিকায় ও হয়েছে: RNA এবং DNA। DNA থাকে জীবকোষের কেন্দ্রদেশে এবং RNA থাকে সাধারণতঃ কেন্দ্রের বহিঃস্থ চাইটোপ্লাজমে (cyto-plasm)। উভয়ের রাসায়নিক সংযুতি এবং গঠন-বিন্যাসে নিকট সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়ই দীর্ঘ অতিকায় অণুগঠিত বহুগুণক জাতীয় পদার্থ (high polymer)। ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও শর্করা অণুর ঘনসংযোগে উৎপন্ন একক যুক্তাণুর বহুগুণনের ফলে যে সুদীর্ঘ অতিকায় অণুর শৃঙ্খল গড়ে ওঠে, তার শর্করা উপাণুর পাশে
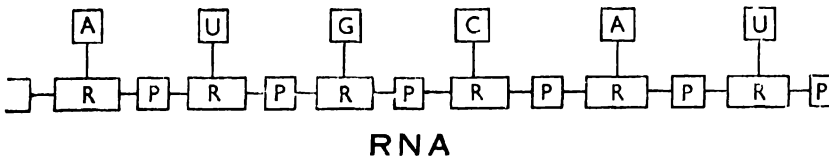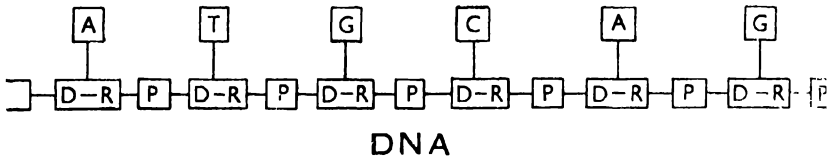
২ (ক) নং চিত্র—A = Adenine (এডেনিন), T – Thiamine (থায়ামিন), G – Guanine (গুয়ামিন), C = Cytosine (চাইটোসিন), U = Uracil (ইউরাসিল), R – Ribose (রিবোজ), D-R = Deoxyribose (ডিঅক্সিরিবোজ), P = Phosphoric acid (ফস্‌ফরিক এসিড)।

দীর্ঘ প্রোটিন অণুগুলি অবস্থাবিশেষে গুটিয়ে বা সরলভাবে থাকতে পারে। হাইড্রোজেন বাঁধনের দরুণ কোন কোন প্রোটিন অণু যে চক্রাকারে গুটিয়ে থাকে, একথা আগেই বলা হয়েছে।

অতএব বলা যায় যে, DNA হচ্ছে মানুষের দেহের প্রধান উপাদান প্রোটিন পদার্থের নির্মাণে এবং দেহের যাবতীয় প্রক্রিয়ার বিধান ও নিয়মনে একমাত্র নায়ক। জীবের জীবনের যে প্রধান লক্ষণ—জীবকোষের বিভাজন, তার মূলেও রয়েছে DNA-এর প্রেরণা এবং প্রতিপত্তি। কিভাবে DNA এত সব গুরুতর কাজ সম্পন্ন করে, সংক্ষেপে তারই কিছু বিবরণ দেওয়া হবে এখানে

দু-জাতীয় নিউক্লিক অ্যাসিডের কথা বলা পাশে কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় জৈব ক্ষারের অণু জুড়ে গিয়ে সৃষ্টি করে DNA এবং RNA-এর অতিকায় অণুর। DNA-এতে যে শর্করা থাকে, তাকে বলা হয় ডি-অক্সিরিবোজ এবং RNA-এর শর্করার নাম হলো রিবোজ—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২(ক) নং চিত্রে DNA ও RNA-এর অতিকায় অণুর নমুনা দেওয়া গেল। RNA এবং DNA-এতে যে সব জৈবক্ষার থাকে তাদের নাম হলো এডেনিন (Adenine), গুয়ানিন (Guanine) এবং চাইটোসিন (Cytosine); এই তিনটি ছাড়া আরো একটি জৈবক্ষার থাকে এদের প্রত্যেকটিতে—DNA-এর বেলায় থাকে থায়ামিন (Thiamine), এবং RNA-এর বেলায় থাকে ইউরাসিল (Uracil)।

DNA বা RNA-এর ফস্‌ফেট শর্করাঘটিত দীর্ঘ শৃঙ্খলের বা দণ্ডের পথে এসব ক্ষারাণুগুলি কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা অনুযায়ী অবস্থিতি করে না। অর্থাৎ ক্ষারগুলিকে যদি ক, খ, গ, ঘ নাম দেওয়া যায়, তাহলে DNA-এর দণ্ডের পথে ক খ গ ঘ, ক খ গ ঘ, ...এরূপ প্রতিসাম্য এদের মধ্যে দেখা যায় না। ক্ষারাণুগুলির এই আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ এবং গুরুত্ব আছে। বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের বিন্যাসের উপর যেমন শব্দের অর্থ নির্ভর করে, তদ্রূপ DNA ও RNA-এতে এই সব জৈবক্ষারের পারম্পরিক বিন্যাসের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাদের বিশিষ্ট ধর্ম এবং ক্রিয়া। অ্যাসিডের দুটি দীর্ঘ অতিকায় অণুর শৃঙ্খল স্ক্রুর প্যাঁচের আকারে বেঁকে পরস্পরকে জড়িয়ে DNA-এর এক একটি যুগ্ম অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে (২-খ নং চিত্র)। এতে একটি চেনের ক্ষারাণুগুলি অপর চেনের ক্ষারাণুর সঙ্গে হাইড্রোজেন বাঁধনের দরুণ যেন খাপে খাপে জুড়ে যায়। এরূপ সুসংযুক্তির সম্ভাবনা ঘটে যখন একটি চেনের কোন নির্দিষ্ট ক্ষারাণু অন্য চেনের এক বিশিষ্ট ক্ষারাণুর সোজাসুজি সম্মুখীন হয়। দেখা যায় যে, জৈবক্ষার গুয়ানিন কেবল মাত্র চাইটোসিনের সঙ্গে জুড়তে পারে; সেরূপ এডেনিন পারে শুধু থায়ামিনের সঙ্গে জুড়তে।
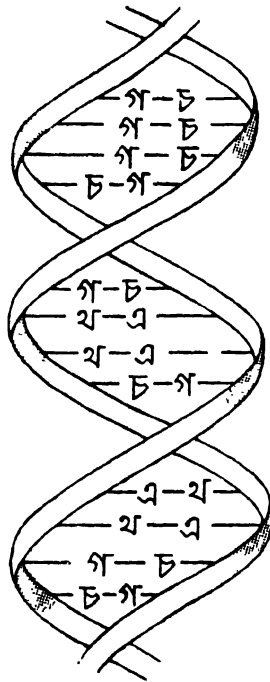
২ (খ) নং চিত্র—এ = এডেনিন, থ = থায়ামিন, গ = গুয়ানিন, চ = চাইটোসিন।

Electron microscope এবং X-রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, DNA হচ্ছে যুগ্মাণু-বিশিষ্ট পদার্থ; অর্থাৎ উপরে বর্ণিত চার প্রকার জৈবক্ষারাণুযুক্ত ডিঅক্সিরিবোজ-ফসফরিক একারণে DNA-এর যুগ্মাণুর কোন একটি চেনের জৈবক্ষারের পারম্পরিক বিন্যাস, সহগামী অপর চেনের ক্ষারাণুর অবস্থানের পারম্পর্য নির্ধারিত করে। DNA-এর অতিকায় যুগল অণুর আকার

হয় একটি প্যাঁচানো সিড়ির মত; বিপরীতমুখী চেন ছুটির ক্ষারাণুগুলি পরস্পর জুড়ে গিয়ে ঐ সিঁড়ির এক একটি ধাপের সৃষ্টি করে বলা যায়। RNA-এর গঠন-বৈশিষ্ট্যও DNA-এর অনুরূপ।

DNA-এর অতিকায় অণুর প্রকৃত আয়তন খুবই ছোট—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলা চলে। একটি প্রতি জীবকোষের কেন্দ্রে কোটি কোটি DNA-অণু থাকে ঘনসন্নিবেশে। জীবের ভাবী জীবনের দৈহিক ও মানসিক পরিণতির সংখ্যাতীত খবর বা তার জীবনলিপি থাকে এদের মধ্যে সঞ্চিত ও রক্ষিত। DNA-অণুর অন্তর্গত চার প্রকারের জৈবক্ষারাণু—এডেনিন, থায়ামিন, গুয়ানিন এবং চাইটোসিন—হচ্ছে এসব খবরের বাহক। এরা
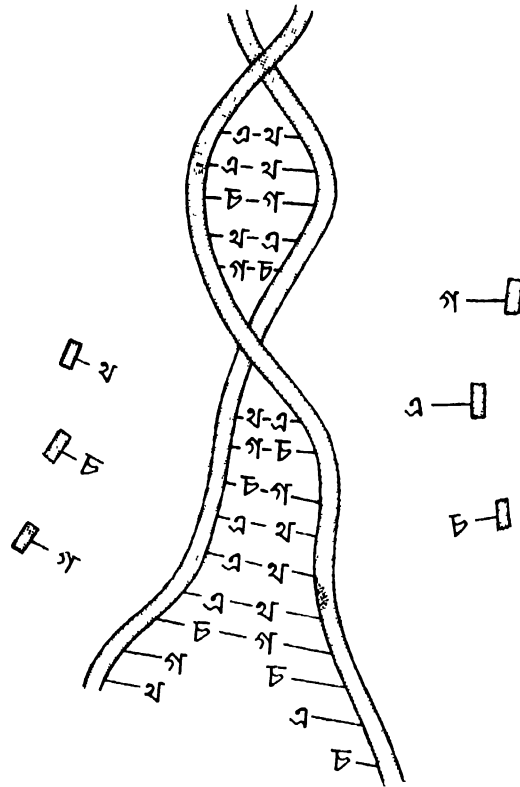
৩নং চিত্র

শুক্রগর্ভ শোণিতকোষের যাবতীয় DNA-অণুর সমষ্টিগত ওজন বিজ্ঞানীদের হিসাবে মাত্র $১০^{১৭}$ ভাগের ১ ভাগ গ্রামের সমান; অর্থাৎ ১০-এর পিঠে ১৭টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, তত ভাগের এক ভাগ গ্রামের সমান ওজন। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আয়তনের মধ্যে মানবজীবনের সকল রহস্য এবং ভাবী পরিণতি আছে সুপ্ত হয়ে। হলো জীবনের চার অক্ষরের বর্ণমালা। DNA-এর অতিকায় অণুতে এসব জৈবক্ষারের পারস্পরিক বিন্যাসের তারতম্যে জীবের প্রকারভেদের সৃষ্টি হয়—উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে জীবাণু, মাছ, পক্ষী, পশু, মানুষ অবধি। এতেই হয় জীবের বংশগত ধারার নির্ধারণ। ছুই ছুটি করে জৈব ক্ষারাণু পরস্পর জুড়ে গিয়ে DNA-এর অতি-

কায় অণুর সিঁড়ির এক একটি ধাপের সৃষ্টি করে; তাদের পারস্পরিক বিন্যাসের যে সংখ্যাতীত প্রকারভেদ হতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, DNA-এর অণুর দুই বাহুর মধ্যে কখ, কখ, খক, গঘ, সৃষ্টি করে আবার অপর এক জাতীয় DNA-এর (ক,খ,গ, ও ঘ যদি চারটি জৈবক্ষারাণুর সাঙ্কেতিক নাম হয়)। জীবের শরীরের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে DNA-এর সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

৪নং চিত্র

গঘ, গঘ, ঘগ, খক, কখ,······ইত্যাদিরূপে ক্ষারাণুর যোগাযোগের বিন্যাস এক জাতীয় DNA-এর সৃষ্টি করে; সেরূপ ঘগ, ঘগ, কখ, খক, খক, খক, গঘ······ইত্যাদি রূপে বিন্যাস

DNA-এর যুগ্মাণুর স্বতঃবিভাজনের ফলেই জীবকোষের বিভাজন ঘটে, একথা আগে বলা হয়েছে। কি প্রক্রিয়ায় এই বিভাজন ঘটে বিজ্ঞানীরা তা বর্ণনা করেছেন। DNA-এর অসাধারণ

ক্ষমতা হচ্ছে, সে নিজের অনুকৃতি নিজেই গড়ে তুলতে পারে। জীবের জীবনের এটাই হলো একটি প্রধান লক্ষণ। এই প্রজনন- (reproduction) ক্ষমতার দরুণই জীবের বংশ-বৃদ্ধি ঘটে ও তার বংশধারা সংরক্ষিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ DNA-এর যুগ্মাণুর এক প্রান্ত যায় খুলে (৩নং চিত্র)। ঐ প্রান্তের দুই বাহুর মধ্যে জৈবক্ষারাণুর পরস্পর সংযোগ যায় বিচ্ছিন্ন যথাযথভাবে এসব একক অণুস্থ তদোপযোগী ক্ষারাণু যায় জুড়ে (৪নং ও ৫নং চিত্র)। এভাবে একটি আদিম DNA-এ যুগ্মাণু থেকে অবিকল তারই অনুরূপ দুটি নতুন যুগলাণুর উৎপত্তি হয় (৬নং চিত্র)। DNA-এর অতিকায় অণুর এই স্বতঃদ্বিধাবিভক্তির ফলেই ঘটে জীবকোসের বিভাজন।

DNA-এর আর একটি বিশেষ কাজের

৫নং চিত্র

হয়ে। কোষকেন্দ্রে বিশিষ্ট জৈবক্ষারাণুযুক্ত ডি-অক্সিরিবোফসফেটের বহু একক অণু সর্বদা বর্তমান থাকে। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক এবং বিপাক থেকে এদের সৃষ্টি হয়। DNA-এর মুক্ত প্রান্তের দুই বাহুতে অবস্থিত ক্ষারাণুর সঙ্গে কথারও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাজ হলো দেহের প্রধান উপাদান প্রোটিন পদার্থের নির্মাণ বা সংশ্লেষণ। দেহে খাদ্যদ্রব্যের বিপাকের ফলে নানা অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়। এ সব অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু পরস্পর জুড়ে

গিয়ে পলিপেপটাইড ও প্রোটিনের অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টির কাজের নিয়ন্তা বা নায়ক হলো DNA ; এই কাজের কর্মী হলো RNA। DNA-এর পরিকল্পিত নক্সার অনুযায়ী RNA করে প্রোটিন অণুর সৃষ্টি। এক বিশিষ্ট সংযুতি ও গঠন-বিন্যাসের RNA-অণু কেবল মাত্র এক বিশিষ্ট সংযুতি ও গঠনের প্রোটিন অণুর সংশ্লেষণ করতে পারে। ৭নং ও পরবর্তী চিত্রে এই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নমুনা দেখানো হলো। জীবের প্রতি দেহকোষে অহরহ এই শত শত বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলেছে অব্যাহতভাবে।

৬নং চিত্র

জীবকোষের কেন্দ্রে DNA প্রথম সৃষ্টি করে RNA-অণুর। RNA হলো DNA-এর আজ্ঞাবহী দূত। কোষকেন্দ্রের বহির্দেশে RNA নিয়ে যায় DNA-এর আদেশ বহন করে। বিভিন্ন প্রকারের কাজের জন্য DNA বিভিন্ন প্রকারের RNA-এর সৃষ্টি করে। প্রোটিন নির্মাণ কাজে দুই জাতীয় RNA-এর আবশ্যক হয়। এদের নাম দেওয়া হয়েছে: বার্তাবাহী (Messenger) RNA এবং পরিবাহক (Transfer) RNA। বার্তাবাহী RNA প্রোটিন নির্মাণের সকল বিধিবিধানের নির্দেশ বহন করে। এক এক প্রকার প্রোটিন নির্মাণের জন্যে

এক এক প্রকার RNA-এর আবশ্যক ; সুতরাং মানুষের দেহে যত রকম প্রোটিন আছে, বার্তাবাহী RNAও থাকবে অন্ততঃ তত রকমের। আবার এক এক প্রকার পরিবাহক RNA শুধু এক এক রকম বিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে আকর্ষণ করতে ও ধরে রাখতে পারে। অতএব মানুষের শরীরে যত প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, অন্ততঃ তত রকমের থাকবে বিশিষ্ট পরিবাহক RNA। দেহ-

৭নং চিত্র

৮নং চিত্র

কোষে এসব RNA অহরহ প্রোটিন নির্মাণের কাজে নিযুক্ত আছে। জীবকোষের কেন্দ্রে বসে DNA এদের কাজের পরিচালনা করে তার অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের লাগাম দিয়ে। ৭—১১নং চিত্রে প্রোটিন নির্মাণ প্রক্রিয়ার নমুনা দেওয়া গেল। বার্তাবাহী RNA করে ড্রিল-মাষ্টারের কাজ। পরিবাহক RNA ঘুরেফিরে যথোপযোগী অ্যামিনো অ্যাসিড ধরে নিয়ে বার্তাবাহী RNA-এর সামনে হাজির করে এবং আপন দেহের ক্ষারাণুর সহায্যে বার্তাবাহী RNA-এর যথাযোগ্য ক্ষারাণুর সঙ্গে জুড়ে যায়। বিভিন্ন পরিবাহক RNA-এর দল এভাবে

৯নং চিত্র

বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু পাশাপাশি সাজিয়ে প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে। পরিশেষে প্রোটিন অণুটি বার্তাবাহী RNA-এর যুগ্মাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রোটিন অণুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যদি কোন ত্রুটি ঘটে, অথবা তার উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিডের পারস্পরিক বিন্যাসের কোন বিচ্যুতি হয়, তাহলে জীবের দেহে নানাবিধ গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। আবার আদিম DNA-এর গঠনবিন্যাসে কোন সামান্য ত্রুটি থাকলেও মানবশিশুর দেহমনের স্বাস্থ্য যায় ভেঙ্গে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সম্প্রতি জানা গেছে যে, দুঃসাধ্য বা তথাকথিত অসাধ্য ব্যাধি ক্যানসার (Cancer)-এর উৎপত্তি হয় DNA-এর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে। আরো অদ্ভুত খবর পাওয়া গেছে মানুষের স্মৃতিশক্তির উদ্ভব সম্বন্ধে। স্মৃতি বলতে বোঝায় সঞ্চিত জ্ঞান। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করবার ক্ষমতা হলো স্মৃতিশক্তি। মস্তিষ্কের কোষে সঞ্চিত থাকে এই অতীত জ্ঞান বা অতীত অভিজ্ঞতা এবং এর আধার হলো RNA। বিশিষ্ট জীবাণু এবং ক্ষুদ্র জীবের (ইঁদুর) উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, জীবকোষে RNA-এর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে জীবের পূর্বঅভিজ্ঞতা উজ্জীবিত করবার শক্তি যায় বেড়ে। এর পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে অপেক্ষাকৃত সরল ও ক্ষুদ্রকায় RNA-এর অণুর সংশ্লেষণ করে এবং জীবকোষে তার যোগান দিয়ে। ক্ষুদ্রকায় DNA অণুরও কৃত্রিম সংশ্লেষণে তাঁরা অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA)-এর সংযুতি ও গঠনবিন্যাস এবং জীবের দেহমনের যাবতীয় ধর্মের বিকাশে ও জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যরক্ষণে এদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানীরা এক অদ্ভুত-

পূর্ব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আবরণ উন্মুক্ত করেছেন। ফলে, মানবজীবনের রহস্যের সমাধানের পথে এক নতুন আলোক দিয়েছে দেখা। মানবজীবনের ভাগ্যবিধাতা যে রসায়নের বর্ণমালায় DNA-এর গঠনবিন্যাসে রূপান্বিত হয়ে উঠেছেন, এই তথ্যের মৃতসঞ্জীবনী সুধার (Vital Elixir of Life) অন্বেষণে আদিযুগের কিমিয়া (Alchemy) বিদ্যার সুরু হয়, ভবিষ্যতের রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে হয়তো হবে তার সার্থক পরিণতি।

জীবের অভিব্যক্তির (evolution) মূলে যে
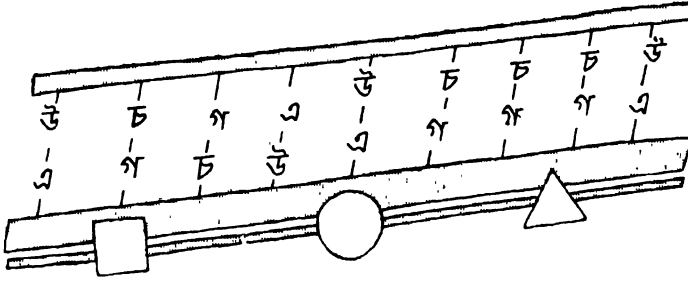
১০নং চিত্র

সন্ধান পেয়েছেন আজ বিজ্ঞানীরা। কালক্রমে আরো যে কত বিস্ময়কর তথ্যের আবিষ্কার হবে নিউক্লিক অ্যাসিডের গবেষণায়, তা কে বলতে পারে? পৃথিবীর সব সেরা বিজ্ঞানীরা আজ মেতে জীবকোষের আকস্মিক পরিব্যক্তির (mutations) প্রভাব দেখা যায়, ভবিষ্যতে হয়তো তা আর আকস্মিক বলে গণ্য হবে না। DNA-এর গঠনবিন্যাসেই হয়তো মিলবে তার সন্ধান।
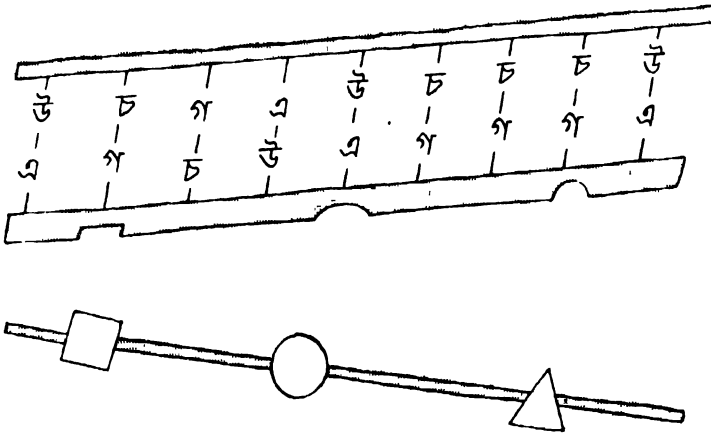
১১নং চিত্র

গেছেন এই জাতীয় গবেষণায়। জীবকোষে DNA অণুর গঠনবিন্যাসের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা হয়তো একদিন দেহের যাবতীয় ব্যাধি—এমন কি, বার্ধক্যের জরাকেও জয় করতে সক্ষম হবেন। যে বিজ্ঞানের পন্থার অনুসরণে DNA-এর গঠনবিন্যাসে তারতম্যের সৃষ্টি করে মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে প্রজনন-প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের এবং তার দেহ-মনের ধর্মের ইচ্ছামত পরি-

বর্তনের। নিজেকে স্বভাবতঃ দেবতা কিংবা অসুরে পরিণত করবার উপায় হবে মানুষের করায়ত্ত। ফলে, অগণিত কল্যাণের সঙ্গে দেখা দেবে হয়তো অপরিমিত অকল্যাণের। পরমাণুর কেন্দ্রে নিহিত অফুরন্ত শক্তির সন্ধান পেয়ে মানুষ আজ যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে, বিজ্ঞানের পন্থায় মানবজীবনের রহস্যের আবিষ্কারেও যে, সে একই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, এবিষয়ে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ সচেতন।

যেসব বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনায় মানবজীবনের রহস্য সম্বন্ধে উপরোক্ত বিস্ময়কর তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে এবং যাঁরা এবিষয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন আছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম কর্নবার্গ (Kornberg), অচোয়া (Ochoa), উইলকিনস (Wilkins), ক্রিক (Crick), ওয়াটসন (Watson), নিরেনবার্গ (Nirenberg), লেভিনথাল (Levinthal), টেইলার (Taylor), বারনেট (Burnet) প্রভৃতি। এদের মধ্যে প্রথম ৫ জন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁদের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে।

মানবজীবন দুঃখময়। মানুষের দুটি মহাদুঃখ, (১) দারিদ্র্য, (২) জরা এবং ব্যাধি। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষের প্রয়াস চলেছে অব্যাহত ভাবে। প্রাচীন যুগে মানুষ তাই সন্ধান করেছে পরশপাথরের (Philosopher's Stone), যার সংস্পর্শে সুলভ লোহা যাবে বহুমূল্য সোনা হয়ে। সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সঞ্জীবনী সুধা (Vital Elixir of Life) প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কারকল্পে, যা সেবন করে মানুষ ঠেকিয়ে রাখবে জরা-ব্যাধির আক্রমণ। একেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল কিমিয়াবিদ্যা (Alchemy)। পরবর্তী যুগে কিমিয়াবিদ্যা সংস্কৃত ও সংশোধিত হয়ে পরিণতি লাভ করে রসায়ন-বিজ্ঞানে। কিমিয়াবিদ্যার কর্মীদের স্বপ্ন ফলবতী হয় নি। পরশপাথর বা সঞ্জীবনী সুধার কোন সন্ধান তাদের মিলে নি। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীদের অসাধারণ কৃতিত্বে এই স্বপ্ন পরিণত হতে চলেছে বাস্তবে। আলফা (α), নিউট্রন, প্রোটন, ডয়টেরন ইত্যাদি কণিকার সংঘাতের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এখন তাঁদের পরীক্ষাগারে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তন করতে পারেন বিনা আয়াসে। ইউরেনিয়াম ধাতু থেকে প্লুটোনিয়াম প্রস্তুত করে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন অপরিমিত শক্তির উৎস এবং ভয়াবহ মারণ-অস্ত্র। বহু শক্তিশালী ঔষধিদ্রব্যের আবিষ্কার করে এবং DNA ও RNA সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করে তাঁরা জরা ও ব্যাধির আক্রমণ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার পথ পেয়েছেন খুঁজে।

কিন্তু পরিণামে মানুষের দুঃখনিবৃত্তি ঘটবে কি?—এই প্রশ্ন হচ্ছে স্বাভাবিক। অ্যাটম বোমার আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এ সংশয় উঠেছে বেড়ে। মানুষের চরম ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির পথ হয়তো এটি নয়। সে পথের সন্ধান মিলবে কি করে? বিজ্ঞানে কি প্রজ্ঞানে, না বিজ্ঞানসহ প্রজ্ঞানে?

[স্বীকৃতি :—এ প্রবন্ধের অধিকাংশ চিত্রের পরিকল্পনা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'Life' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের চিত্রাবলী থেকে গৃহীত। Science and Man ; Life, Vol, 35, 9, 33, 1963.]

কৃষির উন্নতি ও খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি ছোটখাট সহজ পরিকল্পনা

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

(১)

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে পেশা হিসাবে কৃষি গ্রহণ করিবার জন্য প্রায়ই আহ্বান করা হয়। স্থানে স্থানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণ পেশা হিসাবে কৃষি গ্রহণ করিয়া খুবই অকৃতকার্য হইয়াছেন এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জন করিতেছেন। ইহার বহু উদাহরণ আছে।

গ্রামে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণ ৩০।৪০ বিঘা জমিতে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকাজ অবলম্বন করিলে জীবিকা-অর্জন করিতে পারেন কিনা তাহার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত নাই। সরকার বর্তমানে কোটি কোটি টাকা কৃষির উন্নতি ও অধিকতর খাদ্য-উৎপাদন উদ্দেশ্যে খরচ করিতেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে কৃষিকার্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা নাই। অথচ এইরূপ পরিকল্পনা থাকিলে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে পেশা হিসাবে কৃষিকাজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলে উন্নত কৃষি-প্রণালীর দ্রুত প্রচলন সম্ভব এবং ইহার দ্বারা বেকার সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইতে পারে

৩০।৪০ বিঘা জমিতে স্থানীয় আবহাওয়া, জলমাটি প্রভৃতির উপযুক্ত উন্নত-প্রণালীতে কৃষিকাজ প্রদর্শন করিবার জন্য একটি অনাড়ম্বর কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক মহকুমায় অন্ততঃ ৪।৫টি এইরূপ কৃষিক্ষেত্র থাকা দরকার। প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রে লেখাপড়া জানা স্থানীয় ২।৩টি যুবককে শিক্ষানবিশ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত; শিক্ষানবিশী কালে তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে এবং তাহারা হাতে-কলমে কৃষিক্ষেত্রের সকল কাজ করিবে এবং কৃষিক্ষেত্রের যাবতীয় হিসাবপত্র তাহারা রাখিবে এবং উহা তাহাদিগকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অন্ততঃ তিন-চারি বৎসর যুবকগণ কৃষিক্ষেত্রের যাবতীয় কার্যকলাপ এবং হিসাব-নিকাশ দেখিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, উক্ত কৃষিক্ষেত্র কি পরিমাণ লাভজনক। যদি এইরূপ লাভজনক হয়, যাহার দ্বারা তাহারা জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে তাহা হইলে তখন তাহাদিগকে, তাহারা যদি রাজী হয়, উক্ত কৃষিক্ষেত্র নিজেদের দায়িত্বে চালাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে এবং জমির দাম, ঘরবাড়ী ও যন্ত্রপাতির দাম ইত্যাদি খুবই সস্তা কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে। দরকার হইলে মূল্যের অনেকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আবহাওয়া, জলমাটি প্রভৃতির উপযুক্ত লাভজনক এইরূপ কৃষিক্ষেত্র থাকিলে স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায় উহাদের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবে এবং স্থানীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণ নিজ নিজ জমিতে উক্ত ধরণের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে উৎসাহী হইবে। বর্তমানে সরকারী বৃহৎ বা ক্ষুদ্র আকারের কৃষিক্ষেত্রগুলির আয়-ব্যয় কত এবং উহারা ঠিক লাভজনক কিনা, তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই।

(২)

স্থানীয় আবহাওয়া, জলমাটি, জলসেচনের সুবিধা প্রভৃতি অনুসারে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাগে

বিভক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাগের জন্য স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। কৃষকদিগের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, এইরূপ পরিকল্পনা কৃষক সম্প্রদায়ের বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক শক্তিও আয়ত্তের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক ভাগের কৃষক সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহাদের সর্বাগ্রে কি দরকার; অর্থাৎ বীজের দরকার, না সারের দরকার, না সেচের জন্য জলের দরকার, না গবাদিপশুর দরকার, না কৃষিযন্ত্রের দরকার। তাহাদের যাহা সর্বাগ্রে দরকার তাহাই সর্বাগ্রে দিতে হইবে। একই ধরণের পরিকল্পনা রাষ্ট্রের সর্বত্র চালু করিবার চেষ্টা করিলে খুবই বিড়ম্বনা হইবে। বর্তমানে প্রধানতঃ এই পদ্ধতিতে কাজ চলিতেছে। একই পরিকল্পনা বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হইতেছে।

(৩)

রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ভাগের খাদ্য সরবরাহ উক্ত ভাগের অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে যথেষ্ট কিনা। খাদ্যের মধ্যে মাছও থাকিবে ... র্তমানে এইরূপ প্রত্যেক ভাগে কি পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে এবং উহা স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে কি পরিমাণ বাড়্তি বা ঘাট্তি, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহাও নির্ণয় করিতে হইবে যে, বিভিন্ন ভাগে বর্তমানে আবাদযোগ্য কি পরিমাণ জমি পতিত পড়িয়া আছে এবং আবাদযোগ্য পতিত জমিকে সংস্কার করিয়া উপযুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। মাছের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য পুরাতন, পরিত্যক্ত, পানা ও গুল্ম প্রভৃতিতে আবদ্ধ জলাশয়গুলির সংস্কার করিয়া মাছের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সহজ ও কার্যকরী আইন প্রস্তুত করা দরকার। বর্তমানের আইনগুলি জটিল।

(৪)

সার সম্বন্ধে প্রথমেই বলা দরকার যে, 'কম্পোষ্ট' প্রস্তুত, গোবর, গোমূত্র সংরক্ষণ এবং সবুজ সারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। এই সকল সার কৃত্রিম সার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে সহজভাবে প্রযোজ্য আইন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৫)

প্রত্যেক গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি বন থাকিবে। সেখানে জ্বালানীগাছ উৎপাদন করিতে হইবে। ইহার দ্বারা সার হিসাবে গোবর ব্যবহারের জন্য জ্বালানীর অভাব অনেকটা মোচন হইবে।

(৬)

মানুষের মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য প্রত্যেক গ্রামে স্থানে স্থানে পরিখা খনন করিতে হইবে। ইহার দ্বারা কেবল যে মূল্যবান সার পাওয়া যাইবে তাহা নহে, গ্রামের স্বাস্থ্যও অনেকটা উন্নত হইবে। গ্রামের শ্রী ও সৌন্দর্য বাড়িবে।

(৭)

বর্তমানে রাষ্ট্রের সর্বত্রই বীজ, সার প্রভৃতি খুব দেরীতে সরবরাহ করা হয়। ইহাও অভিযোগ আছে যে, অনেক স্থানেই অনুপযুক্ত বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক ঋতুতে শস্য বপনের বহু পূর্বে উপযুক্ত বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ করা একান্ত দরকার। গরু, কৃষি-যন্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য ঋণও সময়মত দিতে হইবে। বর্তমানে ঋণ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা উপযুক্ত পরিমাণ নহে এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা উক্ত ঋণ অন্য কার্যে খরচ করিয়া ফেলে।

(৮)

সর্বত্রই কৃষকেরা সেচের জন্য উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ জল চায়। সুতরাং সেচের জন্য ছোট ছোট পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। অনেক স্থানেই পুরাতন সেচের নালাগুলি বন্ধ হইয়া পড়িয়া আছে কিম্বা বুজিয়া গিয়া জমি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অতি অল্প খরচেই উহার সংস্কার করা যাইতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীরা এইরূপ পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।

(৯)

কয়েকটি গ্রাম লইয়া স্থানীয় আবহাওয়া, জল-মাটির উপযুক্ত একটি বীজ উৎপাদন-ক্ষেত্র থাকা দরকার। সেইরূপ একটি ফল গাছের চারা উৎপাদন-ক্ষেত্র থাকা দরকার।

(১০)

গ্রামে প্রত্যেক অধিবাসীর গৃহসংলগ্ন জমিতে শাক-সব্জির বাগান প্রবর্তন করা দরকার।

(১১)

শাক-সব্জির বাগান এবং মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য পরিখা গ্রামের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা দরকার।

(১২)

রাষ্ট্রের অনেক স্থানেই প্রতি বৎসর পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে মেলা হয়। এই সকল মেলাতে কৃষিবিভাগের উন্নত প্রণালীর প্রদর্শন করা হইলে উহাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে হইবে।

(১৩)

গ্রাম্য প্রদর্শনী প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই বিষয়ে গ্রামের অধিবাসীবৃন্দকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে এইরূপ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য এবং কি কি ফসলের জন্য কি পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহা বিস্তৃতভাবে ঘোষণা করা দরকার। প্রত্যেক প্রদর্শককে কি পরিমাণ জমিতে শস্য উৎপাদিত হইয়াছে, উহার ফলন কত হইয়াছে, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণপত্র দিতে হইবে।

(১৪)

উপযুক্ত প্রচার-পত্রিকার খুবই অভাব। সহজ সরল ভাষায় পাক্ষিক বা মাসিক প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে ও উহা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের বপন পঞ্জিকা অন্ততঃ একমাস পূর্বে উক্ত পত্রিকাতে থাকিবে এবং কৃষি-বিভাগ বীজ, সার, যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও উহাতে বর্ণিত থাকিবে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা অনেক পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না; উহাদের ব্যাপক প্রচার হয় নাই। উপরিউক্ত পত্রিকাতে ঐ সকল পরিকল্পনার বিবরণ থাকিবে।

(১৫)

গ্রামাঞ্চলে কৃষির উন্নতিই প্রধান "রাজনীতি" বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। ইহার জন্য প্রত্যেক গ্রামে "ভূমি-সেনার দল" থাকা দরকার।

উপরিউক্ত পরিকল্পনাগুলিকে সংশোধিত করিয়া কার্যকরী করা কঠিন নহে, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ-গুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। বর্তমানে কৃষি-বিভাগের প্রত্যেক স্তরের কর্মচারীর সংখ্যা খুবই বর্ধিত হইয়াছে। কৃষি খাতে প্রচুর অর্থব্যয় হইতেছে; কিন্তু সেই অনুপাতে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে না কেন? ইহার উত্তর সরকারী মহলই দিতে পারেন।

বায়ুমণ্ডল

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুর যে আবরণ আছে, তারই নাম বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর উপর পর পর বায়ুর অনেকগুলি স্তর আছে। উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর ক্রমাগত চাপ দেয়, সে জন্যে ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুস্তর ততই পাত্‌লা। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩½ মাইল (৫.৬ কিলোমিটার) অবধি বায়ুস্তর এত ঘন যে, সেখানে স্বচ্ছন্দে শ্বাসক্রিয়া চালানো যায়। এর উপরে ৭ মাইল (১১.২ কি. মি.) পর্যন্ত বায়ুস্তর ক্রমশঃ এত পাত্‌লা হয়ে গেছে যে, অক্সিজেনের অভাবে সেখানে শ্বাসক্রিয়া চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। আরো উপরে ৪৫ মাইল (৭২ কি. মি) অবধি যে স্তর, সেখানে বায়ুর পরিমাণ আরও কম। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রায় ২৫০ মাইল (৪০০ কি মি) অবধি বায়ুর খুঁটিনাটি অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কারো কারো মতে, উপর দিকে প্রায় এক হাজার মাইল (প্রায় ১৬০০ কি. মি.) পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত।

বায়ুমণ্ডলের অনেক খবর জানা দরকার; মানুষ তাই যতদূর সম্ভব উপরদিকে ওঠবার চেষ্টা আরম্ভ করলো। বেলুনে করে কিছুদূর ওঠা গেল। কিন্তু দেখা গেল, উপরের বায়ু ক্রমশঃ এত পাত্‌লা হয়ে গেছে যে, সেখানে শ্বাস নেওয়া যায় না। মানুষ বুঝলো, আরও উপরে উঠতে হলে শ্বাসক্রিয়ার জন্যে সঙ্গে করে অক্সিজেন নিতে হবে।

সুইস বিজ্ঞানী অধ্যাপক পিকার্ড এজন্যে একটা নতুন ধরণের বেলুন তৈরি করলেন। তিনি এতে করে অক্সিজেন এবং অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নেবার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে মে তিনি এই বেলুনে করে আকাশে ওঠলেন। আকাশের কয়েক মাইল উঁচু স্তরে নির্বিঘ্নে ওঠলেন এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করে মাটিতে নেমে এলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেলুনটা আল্পস পর্বতের তুষারাবৃত চূড়ায় এমন জায়গায় পড়লো যে, পিকার্ড এবং তাঁর সহকর্মী কোন প্রকারে এক পর্বতারোহীর তাঁবুতে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। বেলুনটাকে আর উদ্ধার করা গেল না। তবে পিকার্ড অনেক কষ্টে তাঁর মূল্যবান যন্ত্রগুলি সব উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

১৯৩২ সালের অগাষ্ট মাসে বিজ্ঞানী পিকার্ড আর একটা বেলুনে করে আবার আকাশে ওঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বেলুনটি হিমালয়ের উচ্চতাও ছাড়িয়ে গেল। এবারে তিনি প্রায় ১০ মাইল (১৬ কি. মি) উঁচুতে উঠে অনেক নতুন খবর জেনে আবার নির্বিঘ্নে নেমে এলেন।

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আরও কয়েকবার বেলুন ওড়ানো হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট রাশিয়ায় 'ইউ-এস-এস্-আর-১' নামক একটি বেলুন ওড়ানো হয়েছিল। এর সঙ্গে ঝোলানো ছিল দু-প্রস্থে বন্ধ দরজাওয়ালা এবং বায়ুপূর্ণ একটি কুঠুরি। এর মধ্যে বসেছিলেন তিনজন বিজ্ঞানী —প্রোকোফিয়েফ, সোদুনফ এবং বির্ণবাটম। বেলুনটি ১২ মাইল (১৯ কি. মি) উঁচুতে উঠেছিল। তখন পর্যন্ত এই ছিল রেকর্ড উচ্চতা।

এরপর ১৯৩৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর অ্যাণ্ডারসন ও ষ্টিভেন্স 'এক্সপ্লোরার-২' নামক বিশেষভাবে নির্মিত একটি বেলুনে করে প্রায় ১৪ মাইল (২২.৪ কি. মি.) অবধি উঠতে সক্ষম হন।

আজ পর্যন্ত এদিক দিয়ে রেকর্ড করেছেন মার্কিন বিমান বাহিনীর চিকিৎসক মেজর সাইমন্স্। ১৯৫৭ সালের ২০শে অগাষ্ট রাত্রি-বেলা তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা থেকে আকাশে ওঠেন; তখন তাঁর বয়স ৩৪ বছর। 'মাইলার' নামক এক নতুন ধরণের প্লাষ্টিকের দ্বারা নির্মিত একটি অতিকায় বেলুনের নীচে ৮ ফুট উঁচু এবং ৩ ফুট প্রশস্ত একটি অ্যালুমিনিয়ামের আধার ছিল, তারই মধ্যে মেজর সাইমন্স্ বসে-ছিলেন। তিনি প্রায় ৩২ ঘন্টা আকাশে ছিলেন এবং প্রায় ১৯.৩ মাইল (প্রায় ৩১ কি. মি) উঁচুতে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অভিযানে তিনি আকাশের খুঁটিনাটি এমন অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, যেগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

এই অভিযানকালে এক সময় তিনি বলেন—এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সুদূর মেঘরাশির উপরে ফিতার মত খানিকটা বায়ুস্তর অস্তগামী সূর্যের আভায় লাল বা শ্যামন-লাল হয়ে জ্বলছিল। ঐ শ্যামন জ্যোতির উপরে ছিল এক টুকরা নীলের কিরীট। এই রং ছিল পাত্‌লা অথচ তীব্র, যেন কেউ সাধারণ নীল আকাশের ঘোমটা খুলে দিয়েছে; তাই এত পরিচ্ছন্ন এত উজ্জ্বল। এই আকাশ ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক, একে আচ্ছন্ন করবার মত ধূলা বা বায়ু সেখানে ছিল না। আরও উপরে নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জ্বল হয়ে যেন ঝক্‌মক করছিল।

বিজ্ঞানীরা এখন রকেটের সাহায্যে বায়ু-মণ্ডলের আরও উচ্চ স্তরগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন। ১৯৪৯ সালে একটি রকেট ২৫০ মাইল (৪০০ কি. মি.) অবধি উঠেছিল। তারপর ক্রমশঃ রকেট-বিজ্ঞানের আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন একটি রকেট অনায়াসেই পৃথিবীর শত শত কিলোমিটার উপরে উঠে যায় এবং সেই রকেটে সংস্থাপিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম প্রদেশের নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এদিক দিয়ে রুশ এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা দিন দিন আরও অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা পর পর অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করেছেন। এগুলি মহাকাশের কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম প্রদেশ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয় বেতার মারফৎ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম প্রদেশের কত বিচিত্র খবরই যে বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করে চলেছেন, তার হিসেব কে রাখে!

বিজ্ঞানীরা আজ অবধি বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যে সব জ্ঞান লাভ করেছেন, তাতে বায়ুমণ্ডলকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়—ট্রপোস্ফিয়ার, ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার এবং বহির্মণ্ডল। তবে এই স্তরগুলির উচ্চতা এবং বেধ সব জায়গায় এক রকম হয় না, এসব নির্ভর করে যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, সেখানকার অক্ষাংশের (Latitude) উপর।

ভূপৃষ্ঠের উপরেই যে স্তরটি আছে, তার নাম ট্রপোস্ফিয়ার। নিরক্ষরেখার উপরে ১৬ থেকে ১৮ কিলোমিটার, আর মেরুর উপরে ৭ থেকে ৯ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি এই স্তর পরিব্যাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের উপর এর ব্যাপ্তি প্রায় ১১ কিলো-মিটার। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের যা ভর, তার প্রায় ০.৮ অংশ এই স্তরে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। জলীয় বাষ্পের প্রায় সবটাই থাকে এই স্তরে। ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যে উচ্চতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা কমে। আর শৈত্যের প্রভাবে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন হয়। তাই এখানে কুয়াশা এবং মেঘের সৃষ্টি হয়। এই স্তরে সব সময়ই তাপ ও চাপের নানারকম পরিবর্তন হয় বলে এখানে নানারূপ বায়ুপ্রবাহ দেখা দেয়। তার ফলে এখানে

আবহাওয়ারও নানারূপ পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণীবাত্যা তুষারঝঞ্ঝা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

এর উপরে বায়ুমণ্ডলের যে দ্বিতীয় স্তরটি অবস্থিত, তার নাম ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি এই স্তরটি পরিব্যাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের উপর এর ব্যাপ্তি ৬৪ কিলোমিটার অবধি।

ট্রপোস্ফিয়ার এবং ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মাঝে আর একটি স্তর আছে বলে অনুমান করা হয়, তার নাম ট্রপোপজ। এর বেধ ১ থেকে ৩ কিলোমিটার। ভূপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা সর্বত্র এক নয়। তাছাড়া ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই উচ্চতা বাড়ে-কমে। যেমন—শীতকালে যেখানে থাকে, গ্রীষ্মকালে থাকে তার চেয়ে বেশী উপরে। আগেই বলা হয়েছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপর দিকে ওঠা যায়, বায়ুর উষ্ণতা ততই কমতে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে হিসেব করে দেখা গেছে যে, উপর দিকে উঠতে থাকলে প্রতি ১০০ মিটারে মোটামুটি ০·৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড করে উষ্ণতা কমে। এই নিয়ম অবশ্য সব জায়গায় ঠিক একইভাবে খাটে না। নিরক্ষরেখার উপরে উষ্ণতা একটানা কমে ১৫ থেকে ১৮ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি, কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই উচ্চতা হয় ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার পর্যন্ত। তার উপরে উঠলে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার অবধি উষ্ণতা আর বাড়ে-কমে না। এখানকার উষ্ণতা প্রায় ৫৫° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু তারপরই উষ্ণতা আবার বাড়তে থাকে এবং ৫০ কিলোমিটারে গিয়ে উষ্ণতা দাঁড়ায় ১০° সেন্টিগ্রেড। তারপর ৬৫ কিলোমিটার অবধি উষ্ণতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তারপর আবার কমতে থাকে।

এতটা উপরে যে, উষ্ণ বায়ুস্তর থাকতে পারে, একথা আগে কেউ ভাবতেই পারে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল, বড় কামানের গর্জনের শব্দ ফ্রান্স থেকে শোনা না গেলেও অনেক সময় ইংল্যাণ্ড থেকে শোনা যায়। বিষয়টি কোন কোন বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভিৎকেভিচ মস্কোয় কামান গর্জনের শব্দের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে গবেষণা করেন। পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে, মস্কোকে কেন্দ্র করে ৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে যে বৃত্ত রচিত হয়, তার মধ্যে সব জায়গায় বিদারণের শব্দ সোজাসুজি শোনা যায়। এর বাইরে এবং ১৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধবিশিষ্ট যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, তার মধ্যে হলো দ্বিতীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিদারণের শব্দ মোটেই শানা যায় না। তার কারণ, পৃথিবীর বক্রতার দরুণ সেখানে শব্দ সোজাসুজি পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু এই অঞ্চলের বাইরে গিয়ে আবার বিদারণের শব্দ শোনা যায়। এথেকে বোঝা গেল যে, বিদারণের শব্দ বায়ুমণ্ডলের ৪০/৫০ কিলোমিটার উপরের স্তরে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী শ্রোতার কাছে পৌঁছায়।

শব্দ এভাবে প্রতিফলিত হয়ে আসে কেন? শব্দের প্রতিসরণ এবং প্রতিফলনের নিয়মাবলী অনুধাবন করে জানা গেল যে, কেবল একটি মাত্র কারণেই এরূপ হতে পারে—তা হলো এই যে, নীচের চেয়ে উপরের স্তরের উষ্ণতা নিশ্চয়ই বেশী। হিসেব করে দেখা গেল, উষ্ণতা অন্ততঃ পক্ষে ৪০/৫০ ডিগ্রী হওয়া চাই। এথেকেই বিজ্ঞানীরা উপরের বায়ুস্তরগুলি সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

৩৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এভাবে উষ্ণতা বেড়ে যাবার কারণ কি? বিজ্ঞানীরা এসম্পর্কেও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করেছেন। তার ফলে জানা গেছে যে, এর প্রধান কারণ

হলো—এই স্তরে ওজোন গ্যাসের উপস্থিতি। ওজোন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet rays) শোষণ করে, তাই এই স্তরের উষ্ণতা বেড়ে যায়। ওজোন হচ্ছে অক্সিজেনেরই একটি অপরূপ (Allotropic modification)। অক্সিজেনের একটি অণুতে দুটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে (O_2), কিন্তু ওজোনের অণুতে থাকে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু (O_3)। উপর দিকে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়ায় অনবরত অক্সিজেন থেকে ওজোন তৈরি হয়। ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার উপরে ওজোনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, আর ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার উপরে ওজোন নেই বললেই চলে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই পৃথিবীস্থ জীবন নিয়ন্ত্রণে ওজোন একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ওজোন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির বেশীর ভাগই শোষণ করে নেয়; তাই তার অতি সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পৌছাতে পারে। সজীব পদার্থের উপর এই রশ্মির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পরিমিত পরিমাণে এই রশ্মি মানুষের চামড়ার রঞ্জক পদার্থটি উৎপন্ন করে। কিন্তু বেশী পরিমাণে হলে এই রশ্মি সজীব পদার্থের ক্ষতি সাধন করে, কয়েক প্রকার ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংস করে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বায়ুমণ্ডলে যদি ওজোন না থাকতো, তাহলে এই পৃথিবীতে এখন যে রকম জীবন রয়েছে, সে রকম জীবন থাকতে পারতো না। অনেক রকম জীবই হয়তো মারাত্মক অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে মরে যেতো নতুবা ভয়ানকভাবে বিকৃত হয়ে যেতো।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে জলীয় বাষ্প বিশেষ নেই। তাই ট্রপোস্ফিয়ারে যে রকম মেঘ হয়, সে রকম মেঘ এখানে হতে দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কেবল রূপালী মেঘ এবং মুক্তা মেঘ দেখা যায়।

আজকাল জেট বিমানের প্রচলন হওয়ায় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল অনেক বেড়ে গেছে। তার কারণ, বায়ুর ঘনত্ব খুব কম বলে এখানে জেট বিমান অনেক দ্রুতবেগে চলতে পারে। তাছাড়া এই স্তরটি সব সময় মেঘমুক্ত ও নির্মল থাকে বলে বিমান চালনায় খুব সুবিধা হয়।

এর উপরে যে তৃতীয় স্তরটি আছে, তার নাম আয়নোস্ফিয়ার। এই স্তর আরম্ভ হয় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে এবং উপর দিকে ৪০০ কিলোমিটার তো বটেই, সম্ভবতঃ ৮০০ কিলোমিটার অবধি এর ব্যাপ্তি। এখানে বায়ু এত পাতলা হয়ে গেছে যে, একটি বায়ুশূন্য নলে (Vacuum tube) যে সামান্য পরিমাণ বায়ু থাকে এখানে তাও নেই, বায়ুর চাপও এত কম যে, যন্ত্রের সাহায্যে তা মাপাই যায় না। এখানে অনেক তড়িতাবিষ্ট কণা বা 'আয়ন' এবং মুক্ত ইলেকট্রন আছে বলে এই স্তর চমৎকার তড়িৎ-পরিবাহী। সূর্য এবং মহাশূন্য থেকে অবিরত অসংখ্য তাড়িতাবিষ্ট কণা ভীমবেগে ছুটে এসে বায়ুর কণাগুলিকে আঘাত করে তাদের আয়নিত করে দিচ্ছে; তাই এখানে আয়নিত কণার এত ভীড়।

উপর দিকে এইরূপ আয়নিত স্তর আছে বলেই বেতার-তরঙ্গগুলি সেখানে পৌছে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। বার বার ভূপৃষ্ঠ এবং আয়নোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে এগিয়ে যায় বলেই বেতার-তরঙ্গ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং অনায়াসে ভূ-গোলক প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে। এজন্যেই পৃথিবীর যে কোন একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেতার-অনুষ্ঠান পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে শোনা সম্ভব হয়।

বেতার-সঙ্কেত ঠিক লম্বভাবে উপর দিকে পাঠাবার পর তা প্রতিফলিত হয়ে যতক্ষণে

আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে, সেই সময়টুকু পরিমাপ করা যায়। আমরা জানি, বেতার-তরঙ্গ আলোর সমান বেগে চলে, আর আলোর বেগ হলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার (১৮৬,০০০ মাইল)। কাজেই যে স্তর থেকে বেতার-সঙ্কেত প্রতিফলিত হয়ে আসে, তার উচ্চতা অনায়াসে হিসেব করে বের করা যায়।

এভাবে অনুসন্ধান করে প্রধানতঃ দুটি আয়নীভূত স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। নীচের দিকে যে স্তরটি আছে, তা ৬০ কিলোমিটার থেকে সুরু হয়ে প্রায় ১২৮ অথবা ১৮০ কিলোমিটার অবধি পরিব্যাপ্ত। এর নাম হেভিসাইড-কেনেলি স্তর (Heaviside-Kennelly layer)। দীর্ঘ এবং মাঝারি মাপের বেতার-তরঙ্গ (Long and medium waves) এই স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে। এর উপরে যে আয়নীভূত স্তরটি আছে, তার নাম অ্যাপ্‌ল্‌টন স্তর (Appleton layer)। উপর দিকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে সুরু করে প্রায় ৪০০ অথবা ৮০০ কিলোমিটার অবধি এই স্তর পরিব্যাপ্ত। হ্রস্ব মাপের বেতার-তরঙ্গ (Short waves) এই স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে। কাজেই অধিক দূরবর্তী স্থানের মধ্যে বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই স্তরটির গুরুত্বই বেশী। এছাড়া ৫০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সীমার মধ্যে আর একটি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই স্তরটি দেখা দেয় শুধু দিনের বেলায়, আর এই স্তরটি বেতার-তরঙ্গ যত বেশী শোষণ করে তত প্রতিফলিত করে না।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, উপরে যে সব স্তরগুলির কথা আলোচনা করা হলো তাদের কোন স্পষ্ট সীমারেখা নেই; অর্থাৎ এগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীনভাবে রয়েছে, তা ভাবা যায় না—একটি আর একটির ভিতর অনবরত অনুপ্রবেশ করছে।

এবার বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ বহির্মণ্ডলের কথা আলোচনা করা যাক। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই স্তরটি প্রায় ৮০০ কিলোমিটার উপর থেকে সুরু হয়েছে। খুব সম্ভব হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিওন প্রভৃতি হাল্‌কা গ্যাসগুলিই এখানে আছে। তবে এখানে গ্যাসগুলি এত তনুকৃত (Rarefied) হয়ে আছে যে, তাদের কণাগুলি অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের বহিঃসীমা নির্ধারণ করা এক কঠিন সমস্যা। পৃথিবী অনবরত তার মেরুদণ্ডের উপর পাক খাচ্ছে, আর পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর বস্তুকণাগুলিও অবিরত ঘুরছে। এই অবস্থায় তাদের উপর দুটি শক্তি কাজ করে। একটি হলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তি, আর অন্যটি হলো কেন্দ্রাতিগ শক্তি। এরই প্রভাবে বস্তুকণাগুলি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যেতে চায়। কোন একটি উচ্চতায় এই দুটি শক্তি সমান হয় এবং তারপর থেকেই গ্যাসীয় কণাগুলি মহাশূন্যে চলে যেতে আরম্ভ করে। এখান থেকেই বহির্মণ্ডল সুরু হয়েছে বলা যায়। বাস্তবিক বহির্মণ্ডলের সুরু থেকেই গ্যাসীয় কণাগুলি মহাশূন্যে চলে যেতে আরম্ভ করে। তবে বহির্মণ্ডলের শেষ যে কোথায়, তা বলা খুব কঠিন। বিশেষ ধরণের পরিমাপ করে দেখা গেছে, ১০০০ থেকে ১১০০ কিলোমিটার উচ্চতায়ও মেরুজ্যোতি দেখা যেতে পারে। কাজেই একথা অনায়াসে বলা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের বহিঃসীমা অন্ততঃ ১১০০ কিলোমিটার অবধি নিশ্চয়ই বিস্তৃত রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, বায়ুমণ্ডলের কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই, তা ধীরে ধীরে মহাজাগতিক শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

তিমির কথা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

তিমি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী। ইহারা মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী ও মৎস্যাকৃতির বিশালকায় একপ্রকার জলজন্তুবিশেষ। প্রায় চার কোটি বৎসর পূর্বে ক্রমবিকাশের ফলে বিরাটাকৃতির জলচর তিমির উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, তিমির আদিপুরুষ প্রথমে স্থলে বিচরণ করিত; কিন্তু পৃথিবীর উপবিভাগ তাহাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল না হইবার ফলে তাহারা ক্রমশঃ স্থায়ীভাবে সমুদ্রবাসী জলচর জীবে পরিণত হইয়াছে। তিমি ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালাইয়া থাকে। এই জন্য উহারা আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা অন্তর জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া নাসারন্ধ্রের সাহায্যে নির্মল সমুদ্র-বায়ু গ্রহণ করে। কিন্তু প্রায় সকল রকমের মাছই তাহাদের কর্ণকূপের সাহায্যে জলে দ্রবণীয় অক্সিজেন সংগ্রহ করে।

তিমি প্রধানতঃ দুই উপবর্গে বিভক্ত—দন্তবিহীন নীল তিমি ও সদন্ত কৃষ্ণকায় তিমি। আকারে নীল তিমি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা ১০০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ এবং ওজনে প্রায় ৩০০০ মণ হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের পরিধিও প্রায় ৪৫ ফুট। একটি নীল তিমির ওজন প্রায় সাতাশটি হাতীর সমান। ইহাদের মস্তক শরীরের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে এক-চতুর্থাংশের মত। তিমির দেহের উভয় পার্শ্বের পাখ্‌নার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ফুট। এই পাখ্‌না ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে অস্থিময় পাঁচটি আঙ্গুলের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহা ছাড়া তিমির পশ্চাৎ পার্শ্বে বস্তির নিদর্শনস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিমি যে মাছ নয় জলজন্তুবিশেষ, তাহা এই সকল চিহ্ন হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

নীল তিমির শরীরের নিম্নদেশ সাদা কিম্বা ঈষৎ পীতাভ তিমির লেজের পাখ্‌না প্রায় ২১ ফুট চওড়া। এই প্রত্যঙ্গটি চক্রবাল রেখার সমান্তরালভাবে থাকে অত বড় প্রাণী যে নীল তিমি, তাহার খাদ্য কিন্তু ছোট ছোট এক ইঞ্চি লম্বা চিংড়িজাতীয় খোলসধারী প্রাণী। তিমির পাকস্থলীতে একসঙ্গে প্রায় ২৭ মণ খাদ্যদ্রব্য স্থান লাভ করে। তিমির কঙ্কালের ওজন প্রায় ৫৪০ মণ, মাংসপেশীর ওজন ১৩৫০ মণ, চর্বি ৬৭৫ মণ, হৃৎপিণ্ডের ওজন ১২ মণ, যকৃতের ওজন ১০ হইতে ১৪ মণ এবং জিহ্বার ওজন ৬৭ মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কখনও কখনও তিমির নাসারন্ধ্র দিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া ফোয়ারার মত জলধারা প্রায় ৫০ ফুট ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তিমি প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রে বিচরণ করে। স্ত্রী-তিমি প্রায় এক বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। সদ্যোজাত তিমি-শিশু প্রায় ২৪ ফুট লম্বা ও ১০০ মণ ভারী হয়। ইহারা শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া বড় হয়। তিমির দুধ ক্ষীরের মত ঘন। এই দুধে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ মাখন থাকে; সেই তুলনায় গরুর দুধে মাখনের পরিমাণ শতকরা মাত্র ৪ ভাগ। বাচ্চা তিমি রোজ প্রায় ৮ মণ মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। আট মাসের মধ্যে ইহারা স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং প্রায় বারো বৎসরে পূর্ণবয়স্ক হয়। তিমির আয়ু প্রায় পঞ্চাশ হইতে একশত বৎসর।

তিমির শরীরে প্রায় এক ফুট পুরু চর্বির আবরণ থাকে, এই চর্বির স্তর তিমির দেহকে ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করে এবং জলে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত তিমির রক্ত গরম। ইহাদের দৈহিক তাপমাত্রা ৯৬.৪° ফারেনহাইট।

দন্তহীন তিমির মুখে দাঁতের পরিবর্তে উভয় চোয়ালে চিরুণীর মত ঝালর থাকে। ইহারা মুখব্যাদান করিয়া জলের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছুটিতে থাকে। তখন চিংড়িজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য প্রাণী মুখগহ্বরে প্রবেশ করে; তারপর ইহারা মুখ বন্ধ করিয়া দেয় আর ঝালরের ফাঁক দিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবার পর আহার্য বস্তু উদরস্থ করে।

নীল তিমি প্রচণ্ড শক্তিশালী জীব। ইহার দৈহিক শক্তি প্রায় ১৫০০ হইতে ১৭০০ অশ্বশক্তির মত বলিয়া অনুমিত হয়। তিমি গভীর সমুদ্রে পৌনে এক মাইল পর্যন্ত নীচে নামিয়া যাইতে পারে সমুদ্রের মধ্যে ইহাদের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১২ হইতে ১৪ মাইলের মত।

নীল তিমি উপবর্গের মধ্যে ক্ষুরপৃষ্ঠ তিমি ৮২´, কুঁজো তিমি ৫০´, গ্রীনল্যাণ্ড তিমি ৫০´ ও ক্যালিফোর্ণিয়ার ধূসর তিমি ৪৫´-এর মত দীর্ঘ হইয়া থাকে। তবে ইহাদের মধ্যে কোনটিই নীল তিমির মত আকারে অত বড় হয় না।

এবার সদন্ত তিমির বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই জাতীয় তিমি প্রায় ৬০ ফুট লম্বা হয়, স্ত্রী-তিমির দৈর্ঘ্য ইহার অর্ধেক। ইহাদের মাথা শরীরের অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশ লম্বা। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণের, কিন্তু পেটের দিকের রং রূপালী সাদা। নীচেকার চোয়ালের দুই পাশে ৮ ইঞ্চি লম্বা ১৮ হইতে ২৮টি তীক্ষ্ণ দন্তের সারি আছে। উপরের চোয়ালে কোন দাঁত নাই। ইহাদের নাসারন্ধ্র একটি, মাথার উপর বাঁ-দিকে অবস্থিত। সদন্ত তিমি প্রায় ছয় সেকেণ্ড ধরিয়া ফোয়ারার মত জল উৎক্ষেপণ করিতে পারে। ইহারা জলের নীচে কিঞ্চিদধিক ৭০ মিনিট কাল নিমজ্জিত থাকিতে সক্ষম। ইহাদের সাধারণ গতি ঘণ্টায় তিন-চার মাইল, তবে তাড়া খাইলে ঘণ্টায় দশ-বারো মাইল বেগে পলায়ন করিতে পারে। পৃথিবীর সমুদ্রজলে সর্বত্র ইহাদের গতিবিধি আছে। এই জাতীয় স্ত্রী-তিমি ৩৬৫ হইতে ৪৮০ দিন গর্ভ ধারণ করে। সদ্যোজাত কৃষ্ণ তিমির বাচ্চা ১৪ ফুট লম্বা হয় এবং এক বৎসরের মধ্যেই দ্বিগুণ বড় হইয়া যায়। ইহারা ৮ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সদন্ত তিমি বহুপত্নীক বলিয়া জানা যায়। এক একটি পুরুষ তিমির অধিকারে প্রায় ২০ হইতে ৫০টি স্ত্রী-তিমি থাকে। সময় সময় স্ত্রীর অধিকার লইয়া দলপতির সহিত অন্য তিমির বিষম যুদ্ধ বাধিয়া যায়। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র হইল উহাদের বিরাট মস্তক। প্রায় ২০০০ মণ ওজনের দুইটি বিশালকায় তিমির ঘণ্টায় বারো মাইল বেগের সঙ্ঘর্ষ কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

সদন্ত তিমির মাথায় প্রায় ২৭ মণ পরিমাণ এক রকম তৈলাক্ত মোম থাকে। ইহাকেই স্পার্মাসেটি বলা হয়। এই মোমের জন্য বহুসংখ্যক তিমি শিকার করা হইয়া থাকে। ইহাদের অন্ত্র হইতে নিঃসৃত একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত পদার্থকে অ্যাম্বারগ্রিজ বা অম্বর বলা হয়। এই বস্তু হইতে নানারকম সুবাসিত সুরভি প্রস্তুত হয়। একবার প্রায় সাত মণ ওজনের একখণ্ড অম্বর পাওয়া গিয়াছিল। অম্বর খুব মূল্যবান দ্রব্য। এই জন্য নাবিকেরা ইহাকে ভাসমান স্বর্ণ বলিয়া অভিহিত করে। তিমির যকৃৎ ভিটামিনে পরিপূর্ণ। আড়াই হাজার মণ মাখনে যে পরিমাণ ভিটামিন-এ থাকে, সেই পরিমাণ ভিটামিন-এ একটি মাত্র তিমির যকৃৎ হইতে আহরণ করা যায়।

সদন্ত তিমির প্রধান খাদ্য সাধারণ মাছ, কাটল

মাছ ও অক্টোপাস। সদন্ত তিমি যে উপবর্গের অন্তর্গত, সেই উপবর্গের মধ্যে বোতলনাকী তিমি ৩০´, নারহোয়াল ১৬´, শিকারী তিমি ৩০´ এবং ছয় হইতে বারো ফুট লম্বা নানারকম শুশুক গণনীয়। শিকারী তিমি (Killer whale) ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির হইয়া থাকে। ইহাদের খাদ্য হইল বড় বড় তিমি, সিন্ধু ঘোটক, সিল ও নানাপ্রকার সামুদ্রিক পাখী। আমাদের পুরাণে বোধ হয় শিকারী তিমিকেই তিমিঙ্গিল বলা হইয়াছে। ইহারা দল বাঁধিয়া শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করে. কোন তিমি দেখিতে পাইলে প্রথম আক্রমণেই তাহার জিভ ও ঠোট কামড়াইয়া ধরে এবং পরে তাহাকে হত্যা করে। ইহারা এতই বলশালী হয় যে, বড় বড় বরফের চাঁই উল্টাইয়া সিল শিকার করিয়া থাকে।

তিমির দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখর। ইহারা জলের উপরে ও নীচে সমানভাবে ভাল দেখিতে পায়। তিমির অক্ষিগোলকের আচ্ছাদন খুব পুরু ও শক্ত, কেহ কেহ এই বস্তুর অংশবিশেষ শুষ্ক করিয়া লইবার পর ছাইদানি হিসাবে ব্যবহার করে। সদন্ত তিমি সময় সময় জলের মধ্যে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, গোঁ-গোঁ এবং শিস্ দেওয়ার মত শব্দ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইহারা অত্যুচ্চ কম্পনবিশিষ্ট স্বরগ্রাম উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই শ্রবণাতীত শব্দ যখন জলমগ্ন শৈল ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া আবার তিমির কাছে ফিরিয়া আসে, তখন তিমি ঐ পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হইয়া সাবধানে চলাফেরা করে। এইরূপ উচ্চ কম্পনবিশিষ্ট স্বরসমষ্টি ইহারা সেকেণ্ডে দশ হইতে চারিশত বার পর্যন্ত উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই উচ্চ কম্পনের শব্দ সাধারণ মানুষের কানে শোনা যায় না বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ উৎপাদিত হইলে তখন অনেকটা মরিচা-ধরা কব্জার আওয়াজের মত বোধ হয়। তিমি নিজেও সেকেণ্ডে আশি হাজার কম্পন-সম্পন্ন অতি-শব্দ বেশ শুনিতে পায় এবং জাহাজের ডেকে কোন বালতি বা কোন জিনিস পড়িবার সাধারণ শব্দ হইলেও জলের ভিতর হইতে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে।

তিমি খুবই বুদ্ধিমান জন্তু, ইহাদের মস্তিষ্কও সেই অনুপাতে ভাঁজ করা ও জটিল। ছোট জাতের তিমি খুব সহজে পোষ মানে। এক সময় একটি ছোট্ট তিমি এতই পোষা হইয়া গিয়াছিল যে, মানুষ সমেত একটি দড়ি-বাঁধা ভেলা সে জলের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইত। শিক্ষা পাইলে কোন কোন ছোট তিমি সার্কাসের নানারকম ক্রীড়াকৌতুক বেশ সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিতে পারে।

একটি মরা তিমির দাম প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মত হয়। তিমির তৈল, অস্থি ও মাংস মানুষের খাদ্য, জ্বালানী, ঔষধ ও প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য এবং কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। এই জন্য প্রাচীনকাল হইতে তিমি শিকার লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পৌনে দুই মণ ওজনের ক্ষুদ্রাকৃতি মানব কি করিয়া অবলীলাক্রমে তিন হাজার মণের অতিকায় তিমি শিকার করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সত্যই আশ্চর্য হইতে হয়। পূর্বকালে লোকে দড়ি-বাঁধা বর্শা ছুঁড়িয়া তিমি শিকার করিত। পরবর্তী কালে বন্দুক ও বারুদ আবিষ্কারের পর জাহাজ হইতে কামানের সাহায্যে ঐ বর্শা নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। তিমি শিকারের বল্লমকে হার্পুন বলা হয়, ইহার ওজন দুই মণ আন্দাজ হইবে। ইহার সহিত এক শত গজ লম্বা খুব মজবুত নাইলনের দড়ি বাঁধা থাকে। এই নাইলনের দড়ির সঙ্গে আবার আধ মাইল লম্বা ম্যানিলা রজ্জু সংলগ্ন করা হয়। এই কারণে তিমি বর্শাবিদ্ধ হইলেও সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় রজ্জুর টানে আট্‌কা পড়িয়া কিছুতেই পলাইয়া যাইবার সুযোগ পায়

না। বর্শার মুখে ৪টি তীক্ষ্ণ বাঁকানো কাঁটা ও বিস্ফোরক বোমা সংযুক্ত থাকে। এই বর্শা তিমির পৃষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেই ঐ বোমা বিস্ফোরিত হয়, আর বল্লমের কণ্টকাকীর্ণ ফলা প্রসারিত হইয়া আরও ভালভাবে গাঁথিয়া যায়। তিমি শিকারে যে বন্দুক (বা কামান) ব্যবহৃত হয়, উহার পাল্লা সাধারণতঃ ১০ হইতে ৩০ গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোন কোন নিপুণ শিকারী ৭০ গজ দূর হইতেও তিমি শিকার করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

১৮৯১ সালে তিমি কর্তৃক মানুষ উদরস্থ হওয়ার একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ বৎসর 'পুবদিকের তারা' নামের একটি জাহাজ যখন ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের নিকটে তিমির অন্বেষণে বিচরণ করিতেছিল, তখন একদিন হঠাৎ তিন মাইল দূরে একটি বিশাল সদন্ত তিমি দৃষ্টিগোচর হইল। জাহাজ হইতে তৎক্ষণাৎ লোকজনসহ দুইটি নৌকা নামাইয়া দেওয়া হইল এবং অনতিবিলম্বেই একজন বর্শাধাবী তিমিটিকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইল। দ্বিতীয় নৌকারোহীরাও ঐ তিমিকে সবেগে আক্রমণ করিল, কিন্তু উহার লেজের বিষম ঝাপ্‌টা খাইয়া তাহাদের নৌকা একেবারেই উল্টাইয়া গেল এবং নাবিকেরাও সমুদ্র-জলে নিপতিত হইল। জেম্‌স্ বার্টলী নামক একজনকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া গেল না। যাহা হউক, ঐ তিমিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার পর চর্বি নিষ্কাশনের জন্য যখন উহার দেহ কুঠার ও কোদালের সাহায্যে খণ্ড-বিখণ্ড করা হইতেছিল, তখন পাকস্থলীর মধ্যে কোন সজীব বস্তুর নড়াচড়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখা গেল, সেই জলমগ্ন নাবিকই অচৈতন্য অবস্থায় তিমির উদরে স্থানলাভ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহাকে জাহাজের ডেকে আনিয়া সমুদ্রের জলে স্নান করাইয়া দিবার পর সে কতকটা পুনর্জীবিত হইলেও নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া রহিল—প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া সে ক্ষিপ্তের মত আচরণ করিতে লাগিল। তাহার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া নিজের কাজে পুনরায় যোগদান করিতে পারিয়াছিল। তিমির পেটে পাচক রসে জারিত হইয়া তাহার মুখ, গলা ও হাত পার্চমেন্ট কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। বার্টলী বলিয়াছিল, প্রথমটা তিমির লেজের ঝাপ্‌টা লাগিবার পর তাহার মনে হইল যেন বিরাট অন্ধকারময় এক পিচ্ছিল সুড়ঙ্গের মধ্যে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যদিও সে তখন সহজেই শ্বাস লইতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু তিমির অভ্যন্তরের উষ্ণতা তাহার অবর্ণনীয় রকম ভয়াবহ বোধ হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন এই প্রচণ্ড তাপ তাহার জীবনীশক্তিকে শুষিয়া লইতেছে।

আর একবার একটি রজ্জু সংলগ্ন বর্শাবিদ্ধ আহত তিমি একটি রাশিয়ান জাহাজকে বরফের চাঁই ভর্তি সমুদ্রের মধ্য দিয়া অনেক দূর অবধি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন তাহার দেহ পরিশ্রান্ত ও জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইল, তখন তাহাকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হইয়াছিল।

১৯০৬ সালে নরওয়ে দেশের তিমি-শিকারীরা প্রায় ২০০০টি তিমি শিকার করে। ১৯২৩ সালে উহারাই উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ৮০০০ তিমির নিধন সাধন করে। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে জাপান প্রায় ২০০০০ তিমি নিঃশেষ করে। শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে সতের বৎসরের মধ্যেই প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার তিমি মানুষের হাতে প্রাণ হারায়। ১৯৫২ সালে একদল সোভিয়েট জাহাজ চার মাসের মধ্যে দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রে ২৭২৬টি তিমি শিকার করে। এই সময় টাপিকভ নামক একজন সুদক্ষ তিমি-শিকারী একাই ৩৭২টি তিমির প্রাণ সংহার করে। মানুষের স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পৃথিবী হইতে যাহাতে এই অতিকায় জীবের একেবারেই বংশবিলোপ না ঘটে, সেই জন্য আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তিমি-শিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সঞ্চয়ন

শামুক

আমাদের দেশে যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী, বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলে ছোট ছোট গাছ-পালার শত্রু শঙ্খের মত আকৃতির এক জাতীয় শামুক প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ইংরেজীতে এদের বলা হয় জায়েন্ট আফ্রিকান স্নেল। গ্রীষ্মমণ্ডলে বাগানের চারা গাছ এবং কচি ডালপালার এমন প্রবল শত্রু আর নেই বললেই চলে।

১৯৩৬ সালে তাইওয়ান থেকে হাওয়াই দ্বীপে দুটি নমুনা শামুক এনে ছাড়া হয়েছিল এবং এত দ্রুত এরা বংশবৃদ্ধি করেছিল যে, কয়েক বছরের মধ্যেই তারা ফসলের একটি গুরুতর শত্রু হয়ে ওঠে। সারাওয়াকে মুরগীর খাবার হিসেবে একে আনা হয় মালয় থেকে ১৯২৮ সালে এবং তিন বছরের মধ্যেই এরা ব্যাপক উপদ্রব সুরু করে। আমাদের দেশেও বর্ষায় এদের ব্যাপক আক্রমণ বহু জায়গাতেই দেখা যায়।

এই শামুকের আদি নিবাস দক্ষিণে নাটাল থেকে মোজাম্বিক এবং উত্তরে সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল। মনে হয়, ঐ সব জায়গা থেকে গত ১৫০ বছরে এরা বহু গ্রীষ্ম এবং উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার ব্যাপক এবং এটা ঘটেছে গত ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান থেকেও এদের বিস্তৃতির খবর পাওয়া গেছে। এদের খাদ্যমূল্যের জন্যে প্রধানতঃ মানুষের মাধ্যমেই সেই বিস্তার ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মালপত্র পরিবহন এবং গাছপালার মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে। খাদ্যমূল্যের জন্যে জাপানীরা গত মহাযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহু দ্বীপে এই শামুক নিয়ে গেছে।

ভারতে ১৮৪৭ সালে বেন্‌সন নামক এক শঙ্খ ও খোলা-বিশেষজ্ঞ এই শামুক মরিসাস থেকে নিয়ে এসে কলকাতার এক বাগানে ছাড়েন। তারপর ৩০ বছরের মধ্যে এদের বিস্তৃতি ঘটে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে ব্যারাকপুর থেকে রাজমহল পর্যন্ত। ১৯৪৬-৪৮ সালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় এই শামুক মহামারীর আকারে দেখা দেয়।

কিছুকাল আগে এগুলি অগণিত সংখ্যায় দেখা দেয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, যদিও একথা প্রথম শোনা যায় ১৯৫৬ সালে। শোনা যায়, প্রথমে এরা নিকোবরে ছিল এবং সেখান থেকে মানুষের সাহায্যে পোর্ট ব্লেয়ারে আসে।

আফ্রিকান জায়েন্ট স্নেল (অ্যাকাটিনা ফিউলিকা) বা শঙ্খ-শামুক স্থলচর। এরা বৃহৎ আকার, রাক্ষুসে ক্ষুধা এবং দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যে গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সর্বত্রই ফসলের মহাশত্রু বলে পরিগণিত। সাধারণতঃ এগুলি ২২½ - ২৭ সেন্টি-মিটার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০½ সেমি, পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। বয়স অনুসারে এদের খোলা ফিকে সাদা, হরিদ্রাভ বা ধূসর-বাদামী এবং তার উপর বাদামী থেকে লাল্‌চে-বাদামী রঙের সমান্তরাল রেখা থাকে। এই রেখাগুলি জন্মের পর প্রথম দিকে উজ্জ্বল থাকে। ধাড়ী শামুকের রং ধূসর-কালো। সাধারণতঃ এরা তিন বছর বাঁচে এরা নিশাচর এবং শাকসব্জি জাতীয় খাদ্য উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে। বাগানের গাছপালার ক্ষতিই এরা সবচেয়ে বেশী করে। মাঝারী তাপমাত্রায়

এরা বেশী সক্রিয় হয়, কিন্তু বৃষ্টি তাদের সকল প্রকার ক্রিয়াশীলতা, বিশেষ করে প্রজনন-ক্রিয়া সর্বাধিক বাড়িয়ে দেয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিকাংশ অঞ্চলেই গরম এবং শুক্‌নো সময়টা তারা গ্রীষ্ম-নিদ্রায় কাটায় এবং সেই জন্যেই এদের উৎপাত বছরের ৫-৭ মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশে বর্ষার সুরু থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত এরা উৎপাত করে। সিংহলে এরা আরাম করে দুই বর্ষার মাঝের সময়টায়। মালয়ে যেখানে বৃষ্টিপাত সারা বছরে প্রায় সমান, সেখানে এদের কোন নিয়মমাফিক ঘুমের সময় নেই। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রবল বর্ষায়ও এরা ধ্বংস হয় না, কারণ যদিও এরা স্থলচর এবং শ্বাসক্রিয়ার জন্যে বাতাস গ্রহণ করে, তবুও প্রায় ১২-২৪ ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখলেও এরা মরে না। হিসেব করে দেখা গেছে যে, ছাড়বার কেন্দ্র থেকে বছরে এরা ৮-১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তারলাভ করতে পারে।

সকল প্রকার গাছপালাই শামুকের খাদ্য, তবে সাধারণতঃ রসালো অংশই এরা পছন্দ করে বেশী। সকল প্রকার ফসলেরই চারা গাছের এরা প্রধান শত্রু। বাধাকপি, ফুলকপি, কুমড়ো এবং বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জির এরা বেজায় ক্ষতি করে। এরা নিশাচর, কাজেই আক্রমণ সাধারণতঃ রাত্রেই হয়, তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা বৃষ্টিবাদলার সময় দিনের বেলায়ও এরা গাছের পাতা খেতে থাকে। দিনের বেলায় সাধারণতঃ এরা ছায়াবহুল স্থানে অথবা কোন কোন সময় গাছ বেয়ে উঠে বিশ্রাম নেয়। প্রবল শীতের সময় এরা ঘুমিয়ে কাটায় এবং বিনা খাদ্যে পাঁচ মাস পর্যন্তও বেঁচে থাকতে পারে।

শামুক পূর্ণতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রজননক্ষম হয় যখন তাদের খোলা প্রায় ৮ সে. মি. লম্বা হয়ে যায়। ডিম ফোটবার পর খাবার পাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে। এই সময়টা—৫-৬ মাসও হতে পারে। শামুক উভলিঙ্গ এবং এদের বংশবৃদ্ধি বর্ষাকালেই সীমাবদ্ধ। জানা গেছে যে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এদের ডিম উৎপাদনের সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং এদের তিন বছরের জীবনে ২-৩টি বংশবৃদ্ধির কালে ৬ দফায় এরা ডিম পাড়ে এবং মোট এক হাজার ডিম পাড়তে পারে। অবশ্য প্রথম দফায় গড়ে ১০০টি ডিম হয় এবং দ্বিতীয় দফা থেকে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ ডিমগুলি মাটির নীচে গর্তে, আনাচে-কানাচে অথবা পাথরের নীচে ছাড়া হয়। যদি যথেষ্ট আর্দ্রতা এবং ঘন ঝোপে ঢাকা থাকে, তাহলে মাটির উপরেও ডিম পাড়তে পারে। এদের ডিম সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, লম্বাটে ধরণের, রং সাদা থেকে হরিদ্রাভ এবং ব্যাস ৪-৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডিম ফুটতে ৫-১০ দিন সময় লাগে। ফোটবার পর বাচ্চা শামুক উপরে আসবার আগে এক সপ্তাহ কি তারও বেশী মাটির নীচে থাকতে পারে।

জানা গেছে—ডিম ফুটে বাচ্চা হয়ে শতকরা ৮০টি শামুকই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় এক জোড়া শামুক তাদের ৩ বছরের জীবনে বংশবৃদ্ধি করে ১২০,০০০টিতে পরিণত হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনশীলতা এবং বহু সংখ্যায় বেঁচে থাকবার দরুণ গ্রীষ্মমণ্ডলে শামুক একটি ভয়ঙ্কর শত্রু বলে বিবেচিত হয়। একটি খবরে প্রকাশ, এদের আক্রমণের ঊর্ধ্বসীমায় ১৯৩১ সালে অক্টোবর মাসের এক পক্ষকালে ৫ লক্ষ শামুক এবং ২ কোটি ডিম ধ্বংস করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের সংখ্যার উপর তার কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় নি।

উড়িষ্যার বালেশ্বরে ১৯৪৬-৪৮ সালে শামুকের ভয়াবহ আক্রমণের সময় প্রায় ৬০০০ কেরোসিন টিন-ভর্তি প্রায় ৩৬ লক্ষ শামুক ধ্বংস করা হয়। আন্দামানে ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় সোয়া দুই কোটি শামুক ধ্বংস করা হয়।

শামুক হাত দিয়ে তুলে অথবা বিষাক্ত ওষুধ সিঞ্চন করে বা গুঁড়া ছিটিয়ে, বিষাক্ত টোপ দিয়ে অথবা এর স্বাভাবিক শত্রুর দ্বারা ধ্বংস করা যায়।

হাত দিয়ে তোলবার কাজ সাধারণতঃ ভোরে বা বিকালে করা হয় এবং শামুকের খোলা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেই এরা মরে যায়। তোলবার পর এদের উপর তুঁতের গুঁড়া বা লবণ ছিটিয়ে দিয়ে অথবা শতকরা ৪ ভাগ তুঁতে-গোলা জলে ডুবিয়েও ধ্বংস করা যায়। শামুক হাঁস-মুরগীর অতি উপাদেয় খাদ্য এবং এতে প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। কাজেই আক্রমণ হলে শামুক ধরে ভেঙ্গে হাস-মুরগীকে খাওয়ালে তারা প্রোটিন পাবে এবং ফসলও রক্ষা পাবে।

বিষাক্ত টোপের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, গন্ধের জন্যে বি. এইচ সি. এনড্রিন এবং প্যারা-থিয়ান শামুক বেশী গ্রহণ করে না। তবে শতকরা ৬ ভাগ লেড আর্সেনেট, ৫ ভাগ মেটাঅ্যালডিহাইড এবং ৩.৫ ভাগ প্যারিস গ্রীন শামুক দমনে সর্বাধিক কার্যকরী।

সাধারণতঃ বিষাক্ত টোপ তৈরির জন্যে উপাদান হিসাবে গম বা ধানের ক্ষুদ ব্যবহার করা হয়। মেটাঅ্যালডিহাইডে ৫৬ ভাগ ক্ষুদে ১ ভাগ এবং প্যারিস গ্রীনে ২৮ ভাগে ১ ভাগ বিষ ক্ষুদের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে প্রয়োজন-মত জল ব্যবহার করতে হয় ভিজাবার জন্যে। প্রায় ৩১½ কিলো বিষের টোপ এক হেক্টার জমির পক্ষে যথেষ্ট। এই টোপ জমিতে ছিটিয়ে দেওয়া যায় অথবা শামুকের চলবার পথে অল্প পরিমাণে রেখে দেওয়া যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় বৃষ্টি না হলেই প্রতি ৩১½ কিলো টোপের সঙ্গে ১.৭ কিলো মাওগুড় মিশিযে নেওয়া হয়।

স্বাভ.বিক শত্রুর দ্বারা শামুক দমন এখনও তেমন কার্যকরী হয় নি। তবে সিংহলে দেখা গেছে যে, জোনাকির শুককীট শামুক খায় এবং এর বৃদ্ধির সময়ে ২০-৬০টি পর্যন্ত শামুক ধ্বংস করতে পারে।

চাঁদে গিয়ে ফিরে আসা

মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপার এবং চার্লস কন্‌র‍্যাড সম্প্রতি জেমিনি-৫ মহাকাশযানে অন্তরীক্ষ সফর করে এসেছেন। তাঁরা আট দিন মহাকাশে থেকে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের পক্ষে চাঁদে গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসা আর অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদে গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে ঐ সময়ই লাগবে।

মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় ১৯১ ঘণ্টা থাকবার পরেও তাঁদের স্বাস্থ্য চমৎকারই ছিল। এই অবস্থায় তাঁদের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি। তাঁদের স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে লেক চ্যাম্পলেন নামে বিমানবাহী জাহাজের ডেকে তাঁদের তুলে নেওয়া মাত্র তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লাফালাফি সুরু করে দিয়ে-ছিলেন। জাহাজের ডেকে তোলবার পরই জেমিনির মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ হাওয়ার্ড মিনার্স তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় তাঁদের স্বাস্থ্যের কোন রকম ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নি। মাথা ঘোরা বা বমি বমি করবার মত তাঁদের কোন কিছুই দেখা যায় নি। মহাকাশচারীদের পৃথিবীতে অবতরণের পরই হিউস্টনে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ডাঃ চার্লস বেরী তাঁদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেছিলেন—আটলাণ্টিক মহাসাগর থেকে যে হেলিকপ্টার যোগে তাঁদের উদ্ধার করে যে জাহাজটিতে আনা হয়, সেই হেলিকপ্টার ও

জাহাজটিতে তাঁরা সোজা হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতই হাঁটাচলা করেছিলেন। এই মহাকাশ যাত্রার পূর্বে তাঁদের স্বাস্থ্য যেমন ছিল, যাত্রা-শেষেও তেমনই দেখা গেছে। এই ভ্রমণের কোন রকম খারাপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ তাঁদের দেহে দেখা যায় নি।

মহাকাশচারীদ্বয় গত ২১শে অগাষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে পঞ্চম জেমিনি-যোগে মহাকাশে যাত্রা করেন এবং ২৯শে অগাষ্ট সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটে অর্থাৎ ৭ দিন ২২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট মহাকাশে অবস্থানের পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময়ে তাঁরা ১২০ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এর আগে এত দীর্ঘ সময় আর কোন মহাকাশযাত্রী মহাকাশে অবস্থান করেন নি।

কুপার ও কনর‍্যাডের এই মহাকাশ-অভিযানকে হিউষ্টনের মনুষ্যবাহী মহাকাশযান কেন্দ্রের ডিরেক্টর রবার্ট গিলরুথ এক বিরাট সাফল্য বলে অভিনন্দিত করে বলেছেন—তাঁরা যে চন্দ্রলোকে যাওয়ার উপযুক্ত, তা এই অভিযানে প্রমাণিত হয়েছে। ভারশূন্য অবস্থা মানুষ সইতে পারে কি না এবং আট দিন মহাকাশে মানুষ সুস্থভাবে কাটাতে পারে কি না, তা পরীক্ষা করাই ছিল এই মহাকাশ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য। পৃথিবী থেকে এপোলো মহাকাশযানে চাঁদে গিয়ে তথ্যানুসন্ধান করে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে মোট ঐ আট দিন সময় লাগবে।

ফ্লাইট ডিরেক্টর ক্রিষ্টোফার ক্র্যাফ্‌ট এবং জেমিনির অন্যান্য কর্মচারীগণ বলেছেন যে, মহাকাশ-যাত্রার সুরুতেই এবং পরে পঞ্চম জেমিনিতে কিছুটা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেও মোটামুটি যন্ত্রপাতি-সমূহের কাজকর্ম ভালভাবেই সম্পাদিত হয়েছে।

এই মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের জন্যে এই প্রথম নতুন ধরণের ইন্ধন ব্যবহার করা হয়েছে, এজন্যে ভারী ব্যাটারী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় নি। জেমিনি প্রোগ্রাম-ম্যানেজার চার্লস ম্যাথুজ এই ইন্ধন সম্পর্কে বলেছেন—আরও এক মাস এই ইন্ধনেই মহাকাশযানে বিদুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যেতো।

যাত্রার প্রারম্ভে অক্সিজেন ট্যাঙ্কে চাপের পরিমাণ কম থাকায় অক্সিজেন সরবরাহের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে প্রথম কয়েক ঘণ্টার পরই এই ত্রুটি সংশোধিত হয়, চাপের স্থায়িত্ববিধান হয়। তারপর থেকে এই প্রক্রিয়ায় মহাকাশযানে যথেষ্ট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে যে ব্যবস্থা ছিল, তা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্রিত করেছে এবং তার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়েছে এবং উপজাত বস্তু হিসাবে পাওয়া গেছে জল। ঐ উপজাত বস্তু যে আধারে গিয়ে জমা হয়েছিল, তা যাতে ভরে উপ্‌চে না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে শেষের কয়েক দিন মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে হয়েছে।

অবশ্য চন্দ্রলোকে যাত্রার সময় এই জল যাতে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার জন্যে, মহাকাশযাত্রীরা যে কামরায় থাকবেন, সেই কামরায়ই ঐ জল সঞ্চয় করে রাখবার ব্যবস্থা করা হবে। এবারকার মত দীর্ঘকাল স্থায়ী মহাকাশ-যাত্রা এই প্রকার ইন্ধন ছাড়া সম্ভব নয়। পঞ্চম জেমিনিতে যদি ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হতো, তা হলে ঐ সকল ব্যাটারীর সাহায্যে মাত্র চার দিনের বেশী বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হতো না।

কুপার এর আগে মারকিউরী মহাকাশযানে ৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট মহাকাশে কাটিয়ে এসেছেন। এবারের অভিযান নিয়ে তিনি মহাকাশে মোট

২২৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিট কাটিয়েছেন। কুপারের সহযাত্রী কন্‌র‍্যাডের মহাকাশ সফরের এই প্রথম অভিজ্ঞতা। তিনিও আট দিন মহাকাশে ছিলেন। তাঁদের আর একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার কথা ছিল। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের যেস্থানে তাঁদের অবতরণের কথা, সে স্থানে ঝড়ের সম্ভাবনার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাঁদের পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার চন্দ্রলোকে মনুষ্য প্রেরণের পরিকল্পনা আছে। কুপার ও কন্‌র‍্যাডের এই সকল অভিযান চন্দ্রলোক যাত্রার কাজ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।

চামড়ার বিকল্প—করফাম

আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ডু পন্ট কোম্পানী সম্প্রতি একটি নতুন কৃত্রিম বস্তুর কথা জানিয়েছেন। এই নতুন বস্তুটি চামড়ার বিকল্প হিসেবে একটা বিপ্লব আনবে বলে মনে হচ্ছে।

কৃত্রিম বস্তু আবিষ্কারে ডু পন্ট কোম্পানীর কৃতিত্ব অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে। এর শ্রেষ্ঠ অবদান নাইলন। নাইলন একটি প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ, যা রেয়ন, রেশম প্রভৃতির জায়গা দখল করেছে। আধুনিক সভ্যজগতে নাইলন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিস্তৃত ক্ষেত্রে এর ব্যবহার। এর দ্বারা যেমন দাঁতের ব্রাস তৈরি হচ্ছে, তেমনি আবার মোটর গাড়ীর গিয়ার ও যন্ত্রপাতির বেয়ারিং পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু ডু পন্টের এই নতুন আবিষ্কৃত পদার্থটি যে ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করবে, সেখানে এতদিন কোন কৃত্রিম বস্তুর প্রচলন ছিল না। এই নতুন বস্তুটির নাম "করফাম"। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্য দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে, তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, করফাম চামড়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

রবারের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। রবারের জুতার একটা অসুবিধা এই যে, এর মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই রবারের জুতা পরলে স্বভাবতঃই একটা অস্বস্তি হয়। কিন্তু করফামের তৈরি জুতায় তা হবে না।

করফাম দিয়ে ১৫ হাজার জোড়া জুতা তৈরি করে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেগুলি সকল রকম পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। করফামের জুতা খুবই আরামদায়ক। করফামের জুতা অল্পব্যয়সাধ্য আর দীর্ঘদিন ধরে পরা চলবে। এর আরও কতকগুলি সুবিধা রয়েছে। করফাম চামড়ার চেয়ে স্থিতিস্থাপক, চামড়ার চেয়ে হাল্‌কা আর জলনিরোধক। চামড়ার চেয়ে করফামের জুতার গঠন অনেক বেশী দিন পর্যন্ত ঠিক থাকে। এতে ভাঁজ পড়ে না বা ছোপ ধরে না। চামড়ার জুতার মত করফামের ঘন ঘন পালিশ করবারও দরকার হবে না।

করফাম দেখতে ঠিক চামড়ার মত—মসৃণও হতে পারে, আবার অমসৃণও হতে পারে। তাছাড়া করফাম গন্ধহীন পদার্থ।

রাসায়নিকদের মতে, করফাম প্লাষ্টিকও নয়, অথবা প্লাষ্টিকের আবরণ মাখানো কোন তন্তুও নয়। এটি এমন এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, যা এর নিজস্ব উপাদান বজায় রেখেই আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে পরিবর্তিত হতে পারে; যেমন—করফামের তৈরি কোন বস্তুর একটি দিক সম্পূর্ণ মসৃণ হলেও ঐ একই বস্তুর অপর দিকটি

খস্খসে হতে পারে। এই নতুন পদার্থটি দিয়ে আরও নানাপ্রকার বস্তু তৈরি হতে পারে।

করফাম এক দিনে আবিষ্কৃত হয় নি। মানুষ চামড়ার ব্যবহার করতে করতে তার বহু দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করে। এজন্যে সে বহুদিন থেকেই এমন একটা বস্তুর সন্ধান করছিল, যা চামড়ার বিকল্প পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। করফাম আবিষ্কার করতে বহু সময় ও উদ্যম প্রয়োজন হয়েছে। দুটি লোক যদি প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা করে ১০০ বছর কাজ করে তাহলে যে সময় ব্যয় হয়, করফাম সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষায় সেই সময় লেগেছে।

প্রথমে একটি রসায়নাগারে এই বস্তুটি খুব অল্প পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। পরে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার জন্যে একটি পরীক্ষামূলক কারখানা নির্মাণ করা হয়। সেটি এক ধরণের অস্থায়ী কারখানা। রসায়নাগারের পদ্ধতিকেই কেমন করে কারখানায় অনুসরণ করা যায়, এখানে তারই পরীক্ষা হয়। টেষ্ট টিউবের মধ্যে কোন কিছু তৈরি করা এক জিনিষ, আর ঐ জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা আর এক জিনিষ।

পরীক্ষামূলক করফাম কারখানাটি চার বছর আগে নিউ ইয়র্কের নিউবার্গে স্থাপিত হয়েছে। পরীক্ষামূলক কারখানায় পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন সম্ভব হয় না। করফামের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, তা হলো উৎকর্ষের দিক থেকে প্রত্যেকটি উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে সমমান বজায় রাখা। প্রথম দিকে উৎপন্ন করফামের মধ্যে প্রতিদিনই পার্থক্য দেখা দিতে লাগলো। সমান পুরু করে তৈরি করা রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। প্রথম দিকে কোন কোন যন্ত্র আদৌ কাজ করছিল না।

যাহোক, যথাসময়ে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ব্যাপক পরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হলো।

বর্তমানে ডু পন্ট কোম্পানী এই নতুন পদার্থটি অধিক পরিমাণে উৎপাদনের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কারখানা নির্মাণ করেছেন। পরীক্ষা-মূলক কারখানায় করফাম উৎপাদন ও পরীক্ষা করে যে শিক্ষা লাভ করা গেছে, এখানে তা কাজে লাগবে। এই কারখানায় বড় বড় যন্ত্র স্থাপন করা হবে, আর যাঁরা এই পরীক্ষামূলক কারখানাটির উদ্ভাবন করেছেন, তাঁরা বৃহৎ কারখানাটিতে নিযুক্ত কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলবেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-সংবাদ আদান-প্রদান

সুশীলকুমার কর্মকার

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে মানুষ আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে লাগলো এবং কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উচ্চভাগ সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হলো। উপগ্রহের সাহায্যে আরও সম্ভব হলো, দূরপাল্লার বেতার-সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা। বেতার-সংবাদ আদান-প্রদানের ইতিহাসে ঘোষিত হলো এক নবযুগের সূচনা।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-সংবাদ আদান-প্রদানের বিষয় আলোচনা করবার আগে পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের সাহায্যে দূরপাল্লার বেতার-সংবাদ আদান-প্রদানের বিষয় কিছু বলা দরকার। পৃথিবীপৃষ্ঠের বেতার-প্রেরকযন্ত্র থেকে কোন বার্তা বহনকারী ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে পূর্ণ-প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ ও গ্রহণ স্থানের মধ্যে বেতার-যোগাযোগ স্থাপন করে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সমস্ত বেতার-তরঙ্গকেই কি আয়নমণ্ডলের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করানো সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাবে এক কথায় বলা যায় —না। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বগামী হলে আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের প্রতিসরণ হয়। প্রতিসরাঙ্ক বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশী হয়, প্রতিসরাঙ্কের মানও তত 'এককের' কাছাকাছি হয়। যে কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের জন্যে আয়নমণ্ডলের প্রতিসরাঙ্কের মান 'শূন্য' হয় সবচেয়ে বেশী, সেই কম্পাঙ্ক পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গকে আয়নমণ্ডলের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করানো সম্ভব। এই কম্পাঙ্ককেই আয়নমণ্ডলের সঙ্কট-কম্পাঙ্ক (Critical Frequency) বলে। আয়নমণ্ডলে আপতিত বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সঙ্কট-কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশী হলে বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলকে ভেদ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, আর পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে না।

আয়নমণ্ডলের সাহায্যে দূরপাল্লার বেতার-সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই সূর্যগ্রহণ, সৌর-বিস্ফোরণ ও চৌম্বক ঝটিকার সময় আয়নমণ্ডলের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে বেতার-সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থার অনুরূপ পরিবর্তন করতে হয়। কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে, এই সব প্রক্রিয়া চলতে থাকলে দূরপাল্লার বেতার-সংবাদের আদান-প্রদান একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বৈজ্ঞানিকেরা আয়নমণ্ডলের অনেক উপরে কক্ষপথে ভ্রাম্যমান অবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-যোগাযোগ স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই ধারণার মূল বক্তব্যটিকে এভাবে বলা যেতে পারে —পৃথিবীপৃষ্ঠে বেতার-প্রেরকযন্ত্র থেকে কোন বার্তাবহনকারী বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলকে ভেদ করে উপগ্রহের সাহায্যে দুটি স্থানের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন করে।

খুব সহজেই অনুমান করা যায়, এই উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদান কেবল আয়নমণ্ডলের সঙ্কট-কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশী কম্পাঙ্কের সাহায্যে

করা সম্ভব। দুটি উপায়ে এটা সম্ভব হতে পারে :

(১) ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলকে ভেদ করে উপগ্রহের উপরিতল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের গ্রাহকযন্ত্রে পৌঁছায়।

(২) উপগ্রহের মধ্যে রাখা যন্ত্রপাতি বেতার-তরঙ্গকে পুনঃসংযোজনা (Relay) করে পৃথিবী-পৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়।

প্রথম ক্ষেত্রে, বেতার-তরঙ্গ উপগ্রহের উপরি-তল থেকে দর্পণের মত প্রতিফলিত হয়। কেবল প্রতিফলনের কাজে উপগ্রহকে লাগানো হয় বলে
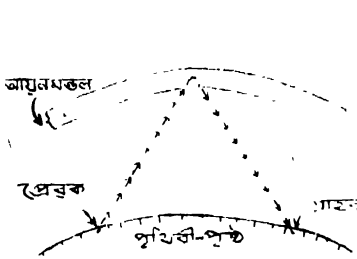
বেতার-তরঙ্গ সরলরৈখিক পথে চলে বলে দুটি পদ্ধতির যে কোনটির সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতে হলে উপগ্রহকে প্রেরণ ও গ্রহণ, এই উভয় স্থান থেকেই একসঙ্গে দেখতে পাওয়া দরকার। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহের উচ্চতা যত বেশী হয়, তত পৃথিবীপৃষ্ঠের বেশী দূরবর্তী স্থানের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। এছাড়া উপগ্রহকে বেশী উচ্চ কক্ষপথে ঘুরাতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে বলে কক্ষপথের উচ্চতা যত বেশী হয়, উপগ্রহের প্রত্যেক আবর্তনে তত বেশী সময়ের জন্যে দুটি স্থানের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন
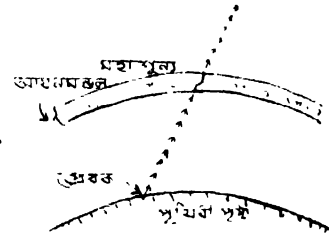
বামে—ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আয়নমণ্ডলের সঙ্কট-কম্পাঙ্ক থেকে কম হলে ঐগুলি আয়নমণ্ডল থেকে পূর্ণ-প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে আবার ফিরে আসে। ডাইনে—ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আয়নমণ্ডলের সঙ্কট-কম্পাঙ্ক থেকে বেশী হলে ঐগুলি আয়নমণ্ডলকে ভেদ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠে আর ফিরে আসে না।

বৈজ্ঞানিকেরা এগুলিকে "নিষ্ক্রিয় প্রতিফলক" (Passive Reflector) আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উপগ্রহের মধ্যে রাখা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বেতার-তরঙ্গকে গ্রহণ, পরিবর্ধন ও পুনঃপ্রেরণ (Retransmission) পদ্ধতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয় ও গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে বার্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের দুটি স্থানে মধ্যে বেতার-যোগাযোগ স্থাপনে এগুলি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বলে বৈজ্ঞানিকেরা এগুলিকে "সক্রিয় পুনঃসংযোজক" (Active Repeater) নাম দিয়েছেন। সহজেই বোঝা যায়, সক্রিয় পুনঃ-সংযোজক নিষ্ক্রিয় প্রতিফলকের চেয়ে জটিল।

সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১,৬০০ কিলোমিটার উচ্চে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহের সাহায্যে প্রত্যেক আবর্তনকালের (১২১·৬ মিনিট) মধ্যে আমেরিকার দুটি স্থান হল্মডেল ও গোল্ডষ্টোনের মধ্যে ১৬ মিনিটকাল বেতার-যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু বেতার-তরঙ্গ সসীম গতিবেগে চলে বলে উপগ্রহের উচ্চতা যত বেশী হবে, সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ-কালের পার্থক্যও তত বাড়বে। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭০০ কিলো-মিটার ঊর্ধ্বে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহের সাহায্যে সংবাদ-প্রেরণ ও গ্রহণকালের পার্থক্য ¼ সেকেণ্ড।

আগের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের ছুটি স্থানের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বেতার-সংযোগ স্থাপন করতে হলে যে কোন সময় অন্ততঃ একটি উপগ্রহকে ঐ ছুটি স্থান থেকেই একসঙ্গে দেখা যাওয়া দরকার।

আমেরিকার একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার হিসাবে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-যোগাযোগ স্থাপনে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের জন্যে কুড়ি থেকে পঁচিশটি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জন্যে পঞ্চাশটি উপগ্রহকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মাইল থেকে সাত হাজার মাইল উচ্চ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করানো দরকার। এই সংস্থার মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ছাব্বিশটি আদান-প্রদান কেন্দ্রের সাহায্যে ৬০০টি টেলিফোন-বর্তনী ও ১৩ জোড়া টেলিভিশন প্রচার-কেন্দ্রের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের আনুমানিক খরচ ১১০০ লক্ষ ডলার।

আগেই বলা হয়েছে যে, উপগ্রহের কক্ষপথের উচ্চতা যত বেশী হবে, তত অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বেতার-সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হবে। 'নাসা' (NASA—National Aeronautics and Space Administration —USA) নামক সংস্থার হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বেতার-সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে ১,৬০০ কিলোমিটার উচ্চ কক্ষপথের জন্যে কমপক্ষে ৪০০টি, ৮,০০০ কিলোমিটার উচ্চতার জন্যে ৪০টি এবং ৩৫,৭০০ কিলোমিটার উচ্চতার জন্যে ৩টি উপগ্রহের দরকার। আমেরিকার 'রেডিও কর্পোরেশন' নামক সংস্থার মতে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিসন ও টেলিগ্রাফের সংবাদ আদান-প্রদান পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭০০ কিলোমিটার উচ্চ কক্ষ-

ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আয়নমণ্ডলের সঙ্কট-কম্পাঙ্ক থেকে বেশী হলে ঐগুলি আয়নমণ্ডলকে ভেদ করে আয়নমণ্ডলের ঊর্ধ্বে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের ছুটি স্থানের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন করে।
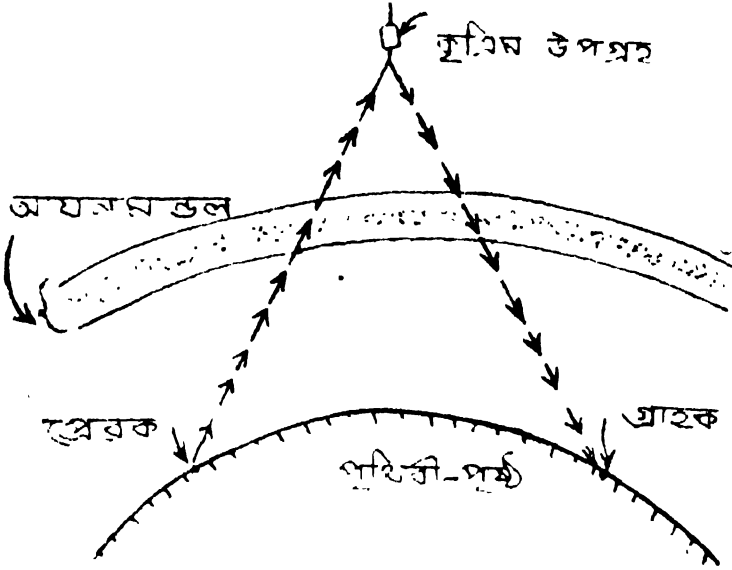
পথে প্রদক্ষিণরত ৩টি পুনঃসংযোজকের সাহায্যে করা সম্ভব।

বেতার-যোগাযোগ স্থাপনে দুই রকম উপগ্রহের তুলনামূলক আলোচনা করা যাক:

(১) সক্রিয় পুনঃসংযোজক উপগ্রহে পরিবর্ধন পদ্ধতিতে প্রেরিত একই শক্তিসম্পন্ন বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের চেয়ে পুনঃসংযোজনায় বেশী পরিমাণ শক্তির তরঙ্গ পৃথিবীপৃষ্ঠের গ্রাহকযন্ত্রে পৌছায়। কিন্তু সক্রিয় অংশ (যথা—পরিবর্ধক, পুনঃসংযোজক ইত্যাদি) আছে বলে বিশ্বস্ততা ও আয়ুষ্কাল নিষ্ক্রিয় প্রতিফলক অপেক্ষা অনিশ্চিত।

(২) সক্রিয় পুনঃসংযোজকের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক এককালীন বিভিন্ন সংবাদ অবিঘ্নিতভাবে আদান-প্রদান সম্ভব।

(৩) ভ্রাম্যমান স্থানে সংবাদ আদান-প্রদানে বহনোপযোগিতা ও সহজ গ্রাহকযন্ত্রের দরকারে সক্রিয় পুনঃসংযোজক অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় প্রতিফলকের ব্যবহার সুবিধাজনক।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে ঘোরবার তিন বছর আগেই (১৯৫৪ খৃঃ) আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক জন্ পিয়াস কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সম্ভাবনা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর আমেরিকার 'ইউ. এস সিগন্যাল কোর' সংস্থা কর্তৃক 'স্কোর' নামক উপগ্রহকে কক্ষপথে ঘোরানো হয়। এতে রেডিও ও টেপ-রেকর্ডার রেখে কক্ষপথে ভ্রাম্যমান অবস্থায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পূর্ব-গৃহীত বাণী পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরিয়ে এনে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সর্বপ্রথম কণ্ঠবার্তা আদান-প্রদান সম্ভব করা হয়েছিল।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ১২ই অগাষ্ট 'নাসা' কর্তৃক 'ইকো—১' নামক একশত ফুট ব্যাসের 'মাইলার' (Mylar) পদার্থের নির্মিত গোলকের (দশতলা বাড়ীর সমান উচ্চতাবিশিষ্ট) কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১,৬০০ কিলোমিটার উচ্চ কক্ষপথে ঘণ্টায় ২,৫৬,০০০ মাইল বেগে প্রদক্ষিণ করিয়ে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বার্তা ও প্রতিচ্ছবি আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে গৃহীত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গৃহীত সংবাদ স্থানীয় প্রচারকার্যের মতই সুস্পষ্ট হয়েছিল।
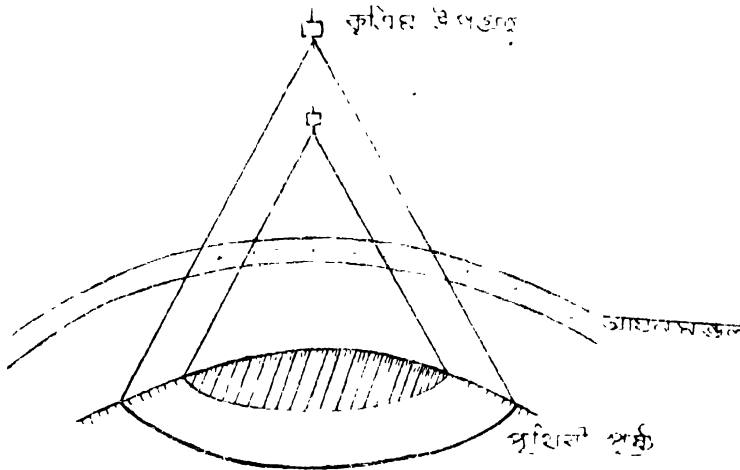
পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহের উচ্চতা যত বেশী হবে, পৃথিবীপৃষ্ঠের তত বেশী দূরত্বের স্থানের মধ্যে বেতার-যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে।

এর সাহায্যে প্রতিফলন পদ্ধতিতে শত শত বেতার-সংবাদ (যথা—টেলিটাইপ ফ্যাক্সিমিলি ও দ্বিপ্রান্তিক টেলিফোন) আটলান্টিক মহাসাগরের দুই তীরবর্তী স্থানের মধ্যে আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর ইউ এস. আর্মি কর্তৃক 'কুরিয়ার-১বি' নামক বিলম্বিত সক্রিয় পুনঃসংযোজক উপগ্রহকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১,০৫০ কিলোমিটার উচ্চে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। ৪টি প্রেরকযন্ত্র, ৪টি গ্রাহকযন্ত্র, ৫টি টেপ-রেকর্ডার সক্রিয় পুনঃসংযোজকের সাহায্যে ৬৪০ কিলোমিটার দূরত্বের দুটি স্থানের মধ্যে টেলিফোনের সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল। এর সাহায্যে আমেরিকার উড্ডীয়মান জাতীয় পতাকার টেলিভিশন প্রচারকার্য (৪৮ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত) স্থানীয় প্রচারকার্যের মতই সুস্পষ্ট হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে এটা ইউরোপ মহাদেশের ১৬টি দেশের ২৩টি শহরের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা ও আমেরিকা মহাদেশের ২৩টি শহরের মধ্যে টেলিভিশন প্রচারকার্যের ব্যবস্থার উপযোগী।
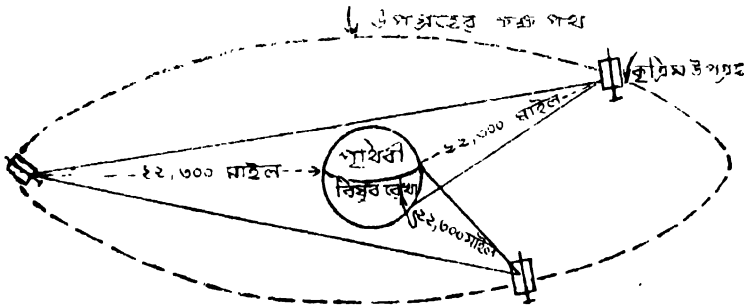
পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে, ২২,৩০০ মাইল উর্ধ্বে তিনটি (পরস্পর ১২০° কোণে অবস্থিত) উপগ্রহকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন করা যায়। উপগ্রহের গতি পৃথিবীর আপন অক্ষের চারদিকের গতির সমান হলে পৃথিবীপৃষ্ঠের যে কোন স্থান থেকে তাদের "স্থির" বলে মনে হয়।

রক্ষিত সৌরশক্তির দ্বারা চালিত বৈদ্যুতিক কোষ (Solar Battery) পূর্ণ এই উপগ্রহের সাহায্যে এক সঙ্গে ১৬টি পর্যন্ত বিভিন্ন দ্রুতগতিসম্পন্ন বেতার-সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল। প্রেরণ স্থানের উপরিভাগ থেকে অতিক্রম করবার সময় বার্তা বা লিখিত বাণী টেপ-রেকর্ডারে চিহ্নিত করে রাখতো এবং অন্য গ্রহণ-কেন্দ্রের আদেশ অনুসারে ঐ সংবাদ ফিরিয়ে দিত। দুই সপ্তাহ নির্ভুলভাবে চলবার পর ওটার কাজ করবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই 'টেলস্টার' নামক

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর 'রিলে-১' নামক সক্রিয় পুনঃসংযোজককে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করিয়ে শত শত আন্তর্মহাদেশীয় টেলিফোন, টেলিভিশন ও টেলিপ্রিন্ট বেতার-সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়েছিল। এটির সাহায্যে উল্লেখযোগ্য প্রচারকার্য হলো—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির স্যার উইনষ্টন চার্চিলকে আমেরিকার সম্মানীয় নাগরিকত্ব দানের বিলের স্বাক্ষর।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'সিনকম-১' নামক সক্রিয় পুনঃসংযোজককে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭০০ কিলোমিটার উচ্চে বিষুবরেখার সমান্তরাল

সমতলে কক্ষপথে পরস্পর ১২.° কোণে অবস্থিত রেখে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। ওর আবর্তনের সময় পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারদিকের আবর্তনের সময়ের সমান বলে পৃথিবীর কোন পর্যবেক্ষকের কাছে ওটা "স্থির" বলে মনে হয়।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই 'সিন্‌কম-২' নামক সক্রিয় পুনঃসংযোজককে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭০০ কিলোমিটার উচ্চ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। এর সাহায্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও নাইজিরিয়ার গভর্ণর জেনারেলের ফ্যাকসিমিলি ফটো আদান-প্রদান ছাড়াও আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের দুটি স্থানের মধ্যে (দূরত্ব = ১২,৩২০ কিলোমিটার) টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অগাষ্ট 'সিন্‌কম-৩' নামক পুনঃসংযোজককে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করিয়ে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিক খেলাধূলার টেলিভিশন প্রচারকার্য সম্ভব হয়েছিল। এজন্যে এটি 'অলিম্পিক তারকা' বলে বিশেষ পরিচিত।

পূর্ব-আলোচিত দুই রকম কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হয় বলে দুটির যে কোনটিকেই 'মহাশূন্য বেতার প্রচার কেন্দ্র' বলা যেতে পারে। এদের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সব রকম সংবাদ (যথা—দ্বিপ্রান্তিক টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিটাইপ ফ্যাক্‌সিমিলি, টেলিভিসন ইত্যাদি) আদান-প্রদান সম্ভব। আয়নমণ্ডলের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের তুলনায় এরা বেশী সংখ্যক এককালীন বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদানের উপযোগী। খরচের দিক থেকেও এটি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন বেতার-সংবাদ আদান-প্রদানের পরিবর্ত ব্যবস্থার চেয়ে অল্প ব্যয়সাধ্য। সুতরাং আশা করা যায় যে, সেই দিন হয়তো খুব বেশী দেরী নয়, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদান কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যেই করা হবে।

তথ্য-গণিতের ভূমিকা

কাজী মোতাহার হোসেন

পূর্ব পাকিস্তানের কলেজীয় শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে হইলে ছাত্রদের বুঝিবার সুবিধা হয় এবং অল্প প্রচেষ্টাতেই বিষয়াদি আয়ত্ত হইতে পারে, এই সম্বন্ধে সকলেই একমত। এই কথা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তথ্য-গণিতকে কলা ও বিজ্ঞান উভয় শ্রেণীতেই ফেলা যায়। ব্যবসায়, বাণিজ্য, জীবনবীমা, কৃষিকার্য, ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, অর্থনীতি, রাজনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, চিকিৎসা, জীব-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতেছে এবং ক্রমশঃ নূতন নূতন দিকে ইহার উপযোগিতা ও উপকারিতা আবিষ্কৃত হইতেছে

কিন্তু আমাদের পাঠ্যপুস্তক সমস্তই ইংরেজী ভাষায় রচিত; আর অনেকের মনেই অহেতুক সংশয় রহিয়াছে—বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে তথ্য-গণিতের মত একটি বিষয় কেমন করিয়া শিখান যাইবে? পরিভাষা কোথায়? বাংলা ভাষার সে সমৃদ্ধি কোথায়, যাহাতে বহু পৃথক পৃথক প্রায় সমার্থক পারিভাষিক শব্দের ব্যঞ্জনা

প্রকাশ করা যায়? কিন্তু তাই বলিয়া কি আরম্ভ করিতে হইবে না? আরম্ভ না করিলে কোথায় কোথায় জটিলতা রহিয়াছে, তাহা ধরা পড়িবে কেমন করিয়া? আর ধরা না পড়িলে অতিক্রমই বা করা যাইবে কি ভাবে? দৃশ্যতঃ এগুলি বেশ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিবার আহ্বান। কিন্তু ১৯৩৬/৩৭ সালের দিকেই খ্যাতনামা অধ্যক্ষ সত্যেন বসু মহাশয়ের সমর্থনে (আইনতঃ তাঁর যোগসাজশে!) বে-আইনী ভাবেই বাংলা ভাষায় পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—বি. এ. ও এম এ. ক্লাসে। তার কিছুদিন পরে, বোধ হয় ১৯৪৩/৪৪-এর দিকে উক্ত অধ্যক্ষ বসু মহাশয় সভাপতি হিসাবে নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনে ঝলকবাদ (Quantum theory) সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার বাংলা তর্জমা করিয়া প্রবাসী পত্রিকায় ছাপান গিয়াছিল। এই সকল কারণে আমার তখনই দৃঢ়প্রত্যয় ছিল এবং সে প্রত্যয় আরও দৃঢ়তর হইয়াছে যে, বাংলা ভাষা আর 'মূঢ়-মূক মুখের ভাষা' নাই, ইহা এখন 'বিবিধ রতনে' ভূষিত রীতিমত প্রগল্ভ ভাষা—ইহার রত্নসম্ভার সযত্নে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহার দ্বারা চিন্তারাজ্য ও ব্যবহারিক জীবনের সমুদয় ভাবই মানানসই রকমে প্রকাশ করা যায়। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহু ভিন্ন অঞ্চলীয় ও বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মস্থ হইয়া গিয়াছে—যাহার ফলে হ্যাটকোট, শেমিজ-কামিজ, সাবান-তোয়ালে, হুঁকো-কল্‌কে, স্কুল-কলেজ, চেয়ার-বেঞ্চ, আপিস-আদালত, আর্দালী-পিয়ন, সমন-জামিন, উকিল-মোক্তার, অ্যাটর্নী-অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট-জজ, সিপাহসালার, মেজর জেনারেল, লেপ্টেনান্ট, প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বাংলা হইয়া গিয়াছে। অতএব, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, প্লুটোনিয়াম, অ্যাটম বোমা প্রভৃতির উপর কারসাজি না করিয়া যতদূর পারা যায় বাংলা ভাষার প্রকৃতি বজায় রাখিয়া ইংরেজী বাক্যরীতিকে বাংলা ভঙ্গীতে, বাংলা ছাঁচে ঢালিয়া তাৎপর্য-হানি না করিয়া অবশ্যই তর্জমা করা যাইবে।

মনে রাখিতে হইবে, কোনও ভাষাতেই অন্য ভাষার সমুদয় বাক্যের হুবহু অনুবাদ করা সম্ভব নহে—তা সে যত সমৃদ্ধ ভাষাই হউক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, "পেট পুড়লে বাঘে ধান খায়" কিম্বা "আহা সন্দেশ গজা বুঁদে মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া, গড়েছ কি নিধি দয়াময় বিধি, কত না বুদ্ধি করিয়া।" কিম্বা "সখি, পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা, সখি দিসনে গোলাব ছিটে খাস লো মাথা।" এই সকল বাংলা বাক্যের যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ সম্ভব কিনা, তাহাই সন্দেহ; সম্ভব হইলেও ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা বেখাপ্পা ঠেকিবে। অতএব এই সকল ক্ষেত্রে ইংরেজী বাক্য-রীতি বজায় রাখিয়া অনুরূপ ভাব প্রকাশক সুপরিচিত চিত্র বা উপমাদির সাহায্য লইতে হইবে। ইহাতে ইংরেজী ভাষার দুর্বলতা প্রকাশ পাইবে না—উহার যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আসলে, কোনও ভাষাতেই মনের সকল ভাবের সম্যক প্রকাশ হয় না। তাহা প্রকাশ করা গেলে বোধ হয় পদ্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি চারুকলার প্রয়োজনই থাকিত না।

তাই ইংরেজী ভাষার অনেক শব্দ, যা গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত অনেক সঙ্কেত চিহ্ন ও শব্দ (সন্দেশ গজা বুঁদে মতিচুর ইত্যাদির মত) কখনও বা হু-ব-হু, কখনও বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হইয়াছে। মুদ্রার Head ও Tail আমাদের কাছে পরিচিত হইলেও বাংলা অনুবাদে মাথা ও লেজ চালান যায় না। এমন কি, মস্তক ও পুচ্ছ বলিলেও মানায় না। এই সকল স্থলে শব্দ Coin করিতে বা উদ্ভাবন করিতে হয়। পাকি-

স্থানী মুদ্রার তো মাথা-ই নাই; তাই হয়তো সোজাপিঠ ও উল্টাপিঠ, সুপিঠ ও কুপিঠ (সুমেরু কুমেরুর অনুকরণে), চাঁদাপিঠ ও আঁধাপিঠ বা ঐরূপ আর কিছু বলা যাইতে পারে। মোট কথা, এইরূপ অনেক শব্দ আমদানী করিতেই হইবে। ইংরেজী Table land, Adam's apple, Hot dog, Down toun, Hat trick ইত্যাদি শব্দ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিতে করিতে ইংরেজের কাছে উহা সেই সেই অর্থে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দগুলি যখন প্রথম ব্যবহৃত হইতে থাকে, তখন হয়তো এইগুলির অর্থ সকলের কাছে এত সুস্পষ্ট ছিল না। ভাষার সম্পদ বাড়াইতে হইলে এইরূপ সাহস করিয়াই ভাবানুসারী শব্দ উদ্ভাবন করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে কান-সওয়া হইয়া গেলে উহা স্বাভাবিক ভাবেই ভাষায় স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রথমেই কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন, পরিসংখ্যান থাকিতে আবার তথ্য-গণিত কেন? এস্থলে প্রধান কথা এই যে, বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করা হইতেছে, সংস্কৃত পরিভাষা নহে। পরিসংখ্যানের 'পরি' উপসর্গটার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, আর শব্দটাও যেন অতিমাত্রায় গুরুগম্ভীর। অবশ্য পরিসংখ্যানের মধ্যে সংখ্যা লইয়া বিশেষ কারবারের ধারণা রহিয়াছে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব (Theory of numbers), ব্যাঙ্কের হিসাব বহি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। এই জন্য সংখ্যার স্থলে গণিত বসাইয়া গণিতকে তথ্যের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে—ইহাতে সংখ্যা ও তথ্য উভয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। পাটিগণিত ও বীজগণিতের মত তথ্য-গণিতও একটি গণিতাশ্রিত শাস্ত্র, কিন্তু সংখ্যার দ্বারা প্রকাশযোগ্য তথ্যই ইহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। আশা করি, আমার পরম হিতৈষী শিক্ষাগুরু স্বনামধন্য প্রোফেসর মহলানবিশ ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের সাবেক পরিভাষা 'পরিসংখ্যান'-এর বিকল্প হিসাবে তথ্য-গণিতকেও স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ইংরেজীতে বিভিন্ন পরিমাণের পারস্পরিক পার্থক্য, ব্যবধান বা ছাড়াছাড়ি ভাব বুঝাইবার জন্য সাধারণভাবে Scatter ও Dispersion শব্দ এবং বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে এগুলির পরিমাপ বুঝাইতে Standard deviation (s.d.), Standard error (s. e.), Variance, Mean deviation, Range, Semi-interquartile range প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণভাবে Scatter ও Dispersion-কে বিস্তার ও বিক্ষেপ বলিতে পারি; আবার s. d.-কে পরিমিত (বা আদর্শ) বিস্তার, s. e.-কে পরিমিত (বা আদর্শ) বিচ্যুতি, Variance-কে বিস্তৃতি, Mean deviation-কে গড় ব্যবধান (বা বিচ্যুতি), Range-কে পরিক্ষেপ, Semi-interquartile range-কে আন্তঃচতুর্থক অর্ধ-পরিক্ষেপ বলিতে পারি। ইংরেজীতে Standard ও Normal শব্দ দুটি যে সর্বদাই বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা হয়, এমন নয়; তাই আমরা সচরাচর Normal ও Standard-এর স্থলে অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'পরিমিত' বা 'আদর্শ' শব্দ ব্যবহার করিব। Variance একটি বহু ব্যবহৃত

শব্দ, এই জন্য ইহার জন্য বিস্তৃতি শব্দটা বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। Error, Deviation, Difference প্রভৃতিকে সাধারণভাবে ব্যত্যয়, ভুল, ত্রুটি, পার্থক্য, ব্যবধান, বিচ্যুতি বলা যায়। বিশেষ করিয়া গড় হইতে বা নির্ভরণ রেখা হইতে ব্যত্যয়কে 'বিচ্যুতি' এবং হিসাবের ত্রুটিতে যে পার্থক্য হয়, তাহাকে ভুল বা ত্রুটি বলা যাইবে। Test of significance-কে পার্থক্যের যথার্থতা 'বিচার' বা যাথার্থ্য-নিকষ বলা যাইবে। সাধারণভাবে ভাষার প্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য বৈলক্ষণ্য, ব্যত্যয়, অন্তর, ব্যবধান—যেখানে যেমন খাটে, ব্যবহার করা যাইবে।

Value, Quantity, Magnitude প্রভৃতিকে সাধারণভাবে মান বা পরিমাণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন তথ্য হইতে সূত্রের সাহায্যে কোনও Statistic (যেমন গড়, মধ্যক, পরিমিত বিস্তার, পরিক্ষেপ প্রভৃতি) নির্ণয় করা হয়, তখন এই নির্ণীত মানকে বলা হইবে 'পরিমাপ'। আবার, যখন কোনও নমুনা হইতে 'তথ্য-বিশ্বের' (সচরাচর অজ্ঞাত) কোনও বৈশিষ্ট্য-সূচক মান 'নিরূপণ' করা হয়, তখন ইহাকে বলা হইবে 'পরামাপ' (Parameter); কিন্তু যখন বীজগাণিতিক কোনও সূত্রের 'Constant' নিরূপণ করা হইবে, তখন নিরূপিত মানকে বলা হইবে পরামাণ'; সাধারণভাবে Constant-কে 'অভিন্নক' এবং Variable বা Variate-কে 'বিভিন্নক' বলা হইবে।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলির দ্বারা শুধু এই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, শব্দ প্রয়োগে কোনও না কোনও নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম ব্যবহারের সময় হয়তো সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা করা যায় নাই। ক্রমে ক্রমে সুধীগণের সহানুভূতিমূলক আলোচনা, সমালোচনা ও পরামর্শ মত পারিভাষিক শব্দের অবশ্যই কিছু কিছু রদ-বদল হইবে। পরে, হয়তো আগামী দশ বছরের মধ্যেই তথ্য-গণিতের বাংলা পরিভাষা-কতকটা সুনির্দিষ্ট রূপ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। পুস্তকের প্রারম্ভেই ইহাতে ব্যবহৃত সমুদয় পরিভাষার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। এইগুলি আংশিকভাবেও ভাষা-রসিক বৈজ্ঞানিক সমাজে ও সাধারণ পাঠক সমাজের সমর্থন লাভ করিলেও আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। সহৃদয় পাঠকবর্গ মন্তব্য, সংশোধন, সদুপদেশ দিয়া বাংলা পরিভাষা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিবেন, এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।*

*"বাংলা উন্নয়ন বোর্ড"—ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিতব্য বি. এ. ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে লিখিত "তথ্য-গণিতের" ভূমিকা।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সাধারণ সর্দির রহস্য

সাধারণ সর্দির কারণ অনুসন্ধানে যাঁরা ব্যাপৃত, তাঁরা এখনও মাঝপথে রয়েছেন। সাধারণ সর্দি বলতে শুধু নাকের সর্দিই বোঝায়, কিন্তু এর সঙ্গে গলা, শ্বাসনালী ও বুকের নানাবিধ রোগও জড়িত। এই রোগগুলি একই ভাইরাস কর্তৃক সংক্রামিত কিনা, তা নিশ্চয় করে জানা যায় না। তবে নাকের সর্দির ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ভাইরাসগুলি নানা পরিবারের। একটি পরিবারের নাম মিক্সোভাইরাস (Myxovirus)। ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ শিশুরা এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আর একটি ভাইরাস পরিবার হলো রিনো-ভাইরাস (Rhinovirus)। ছোট বড় সকলেই এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই ভাইরাস সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে তোলে, রক্তে অ্যাণ্টিবডি তৈরি হয়। কিন্তু ৫০ রকমের রিনোভাইরাস আছে এবং রক্ত একবারে এক ধরণেরই অ্যাণ্টিবডি তৈরি করতে পারে। সে জন্যে বার বার সর্দিতে আক্রান্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

তাছাড়া রয়েছে পোলিওভাইরাস ও অ্যাডেনো-ভাইরাস। এরা গলাব্যথা, সর্দি ও নিউমো-নিয়ার জন্যে দায়ী।

কিন্তু সর্দিতে আক্রান্ত দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের কাছ থেকে কোন ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায় না, অন্ততঃ গবেষণাগারের পরীক্ষা পদ্ধতি-গুলির সাহায্যে ধরা যায় না।

এই পদ্ধতিগুলির অন্যতম টিস্যু-কালচার পদ্ধতি। কিন্তু সর্দির ভাইরাস সাধারণ টিস্যু-কালচারে বেড়ে ওঠে না। তবে মানুষ বা বানরের টিস্যুর ঠিক ঠিক সেল ব্যবহার করে অনেক রকম ভাইরাস জন্মানো সম্ভব হয়েছে। অনেকগুলি প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে এর ফলে; যেমন—সর্দির ভাইরাসগুলি শীতপ্রধান দেশে বেশী সাধারণ কিনা? এর উত্তর—বিশ্বের সর্বত্র এদের দেখা মেলে।

কেমন করে সর্দি ছড়ায়? সর্দির শ্লেষ্মা মাটিতে পড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু শতকরা ০·১ ভাগ বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়।

সর্দির কি কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্ভব? দেখা গেছে, রিনোভাইরাস অ্যাণ্টিবডিকে কাবু করতে পারে না। টিকার সাহায্যে অ্যাণ্টিবডি তৈরি করা সম্ভব এবং সম্প্রতি সলিসবেরীতে ২৮ জন স্বেচ্ছাসেবীর উপর এই টিকার ফল পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র একজন পরে সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। অবশ্য যথেষ্ট প্রতি-ষেধক ভাইরাস সমন্বিত কোন বস্তু এখনও পাওয়া যায় নি। ব্যবহারযোগ্য এমন দ্রব্য যে পাওয়া যাবে না, এমন কথা বলা যায় না। ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হতো, এমন রাসায়নিকের সন্ধান চালিয়ে যাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সৌরশক্তির সাহায্যে নৌকা চালাবার ব্যবস্থা

সূর্যের আলোককে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করে সেই সোলার সেলের সাহায্যে একটি

নৌকা চালানো হয়েছে এবং সর্বসমক্ষে তা প্রদর্শিতও হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় দুই প্রস্থ সোলার সেল সূর্যের আলোককে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করে। এক প্রস্থ নৌকার খোলের সঙ্গে আর এক প্রস্থ নৌকার অগ্রভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি নৌকায় রক্ষিত একটি মোটরে সরাসরি সরবরাহ করা যায়, অথবা ব্যাটারীগুলিকে বিদ্যুতায়িত করে সেই ব্যাটারীর সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি মোটরে সরবরাহ করা যেতে পারে।

ব্যাটারীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের সুবিধা এই যে, মেঘলা দিনে সূর্যের মুখ দেখা না গেলেও নৌকার চলা বন্ধ হবে না। কারণ ব্যাটারীতে যে বিদ্যুৎ-শক্তি জমা থাকবে, তারই সাহায্যে নৌকা চালানো যাবে; অর্থাৎ সূর্যের আলোর অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হলেও ঐ নৌকার চলাচলে কোন বাধা পড়বে না।

আবহাওয়া ভাল থাকলে এই দুই প্রস্থ সোলার সেলের মোট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ১৫০ ওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর অর্থ— গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অনুকূল আবহাওয়ায় ঐ দুই প্রস্থ সোলার সেলের সাহায্যে এক দিনে মোট ১০০০ থেকে ১৫০০ ওয়াট পর্যন্ত বিদুৎ-শক্তি উৎপন্ন হতে পারে; অর্থাৎ ঐ সকল অঞ্চলে দুটি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে নৌকাটিকে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল বেগে চালানো যাবে। এছাড়া এই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যোগাযোগ করবার যন্ত্রপাতি এবং ছোটখাটো অন্যান্য যন্ত্রপাতিও চালানো যাবে।

সোলার সেলের মূল্য অত্যধিক। তবে আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সস্তায় এই সেল তৈরির জন্যে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। এই নতুন ধরণের নৌকাটির উদ্ভাবক জন হোক নামে জনৈক আমেরিকান। ইনি নিউগিনির মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সুরিনামস্থিত দপ্তরের কর্মচারী। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহে সূর্যালোক প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ইন্ধনের খুবই অভাব। মিঃ হোকের ধারণা, তাঁর এই আবিষ্কার ঐ অঞ্চলবাসীদের খুবই কাজে লাগতে পারে।

সুমেরু অঞ্চলে একটি দ্বীপের মৃত্যু

সুমেরু অঞ্চলে একটি বরফের দ্বীপে ১৮ জন মার্কিন বিজ্ঞানী চার বছরেরও বেশী বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বীপটি ছিল দৈর্ঘ্যে চার মাইল, প্রস্থে দু-মাইল এবং এতে যে পাহাড় রয়েছে তার উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট।

এই ভাসমান দ্বীপটি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ দিকে ভেসে যেতে যেতে গ্রীণল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের মধ্যে উষ্ণ অঞ্চলে আসবার পর এর আয়তন প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। উষ্ণতর অঞ্চল দিয়ে যাবার সময়ে এটি সমুদ্রে একেবারেই বিলীন হয়ে যাবে, এরকম আশঙ্কাও দেখা দেয়। যে বরফের চাঁইটি ছিল ৮০ ফুট পুরু, তা যখন কমে ৫০ ফুটে এসে দাঁড়ালো, তখন বিজ্ঞানীরা সেটি ছেড়ে আসেন।

আলাস্কার পয়েন্ট বারোর ১৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই দ্বীপটি ১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত হয়। এর নামকরণ করা হয় দ্বিতীয় আরলিস—আর্কটিক রিসার্চ লেবরেটরী আইস ষ্টেশন-২। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান-কেন্দ্র থেকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা সুমেরু অঞ্চলের আবহাওয়া, সামুদ্রিক প্রাণী, বরফের গঠন-প্রণালী ও এদের চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে নানা তথ্য এবং সুমেরু সাগরের তলদেশ থেকে জীবাশ্ম এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করেন।

বিজ্ঞানীদের এখানকার জীবন ছিল এক-

ঘেঁষে। কিন্তু এই দ্বীপটি বহুবার বহু দিক পরিবর্তন করে ৫০০০ মাইলেরও বেশী ভেসে বেড়িয়েছে। এটি দেখতে ঠিক স্থলভূমির মত। এর আগে সুমেরু অঞ্চল আবিষ্কারে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও হয়তো এই ভুলই করে গিয়েছেন। বর্তমানে এটি যে দিকে চলেছে, তাতে এর অনিবার্য ধ্বংসের কথা ভেবে বিজ্ঞানীরা তথ্য-সন্ধানী যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে এসেছেন। রেখে এসেছেন মাত্র তিনটি স্বয়ংক্রিয় বেতার যন্ত্র। দ্বীপটির কি পরিণতি হয়, তা জানবার জন্যেই এই সকল বেতার যন্ত্র বিজ্ঞানীরা সঙ্গে নিয়ে আসেন নি।

অস্ত্রোপচারের অভিনব অস্ত্র

সুষ্ঠু অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় নতুন ধরণের একটি অস্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এর সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্রোপচার করা যাবে এবং আদৌ রক্তপাত হবে না। এটি হচ্ছে প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত একটি গ্যাসের ছুরি। এটি দেহ স্পর্শ করা মাত্র প্রচণ্ড তাপের ফলে দেহকোষের জল বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। এই বাষ্পে যে চাপের সৃষ্টি হবে, তাতে কোষসমূহ ফেটে গিয়ে সেই অংশ কেটে যাবে। এই ছুরির প্রচণ্ড তাপ দেহ স্পর্শ করা মাত্র টিস্যুর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে; ফলে কোন রক্তক্ষরণ হবে না। শল্য-চিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের বেশীর ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৮৫ ভাগ সময়ই রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে কাটে। এই নতুন অস্ত্রের সাহায্যে শল্যচিকিৎসায় রক্তক্ষরণ না হওয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে অস্ত্রোপচার করা যাবে। এই ভাবে অস্ত্রোপচার নিরাপদ। রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন বলে শল্যচিকিৎসকগণ বর্তমানে যকৃতের অস্ত্রোপচারে দ্বিধাবোধ করেন। এই নতুন অস্ত্রের সাহায্যে যকৃতে অস্ত্রোপচার করাও আর কঠিন হবে না।

এই নতুন অস্ত্রটির নাম প্লাজ্‌মা আর্ক স্ক্যালপেল। রক্তের জলীয় অংশকে প্লাজ্‌মা বলা হয়। সেই প্লাজ্‌মার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই প্লাজ্‌মা হলো এক প্রকার গ্যাস, প্রচণ্ড তাপে এর পারমাণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে প্লাজ্‌মা বিদ্যুৎ-শক্তি পরিবহন করে। আলো ও তাপ-শক্তির মাধ্যমে ঐ বিদ্যুৎ-শক্তির প্রকাশ ঘটে। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে এই প্লাজ্‌মা তৈরির প্রক্রিয়া শিখেছেন। সূর্য ও তারকার কেন্দ্র প্লাজ্‌মা দিয়েই গঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ২০০০০ ফারেন-হাইট তাপমাত্রার প্লাজ্‌মা শ্রমশিল্পে কঠিন ধাতু ও অন্যান্য বস্তু কাটবার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্লাজ্‌মা আর্ক স্ক্যালপেল নামে ছুরিটির অত্যুজ্জ্বল গ্যাসের আলোকচ্ছটা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এটি অতি সূক্ষ্ম আকারে একটি নালিকা থেকে নির্গত হয়ে থাকে। নিউইয়র্কস্থিত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লেবরেটরীর পদার্থ-বিজ্ঞানী চার্লস শিয়ারের নেতৃত্বাধীনে এই জিনিষটি উদ্ভাবিত হয়েছে। স্যানফ্রান্সিসকোর প্রেসবিটারিয়ান মেডিক্যাল সেন্টারের ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ ডাঃ রবার্ট এফ. শ পশুদেহে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবেন।

উত্তর মেরুবৃত্তে তাপ বৃদ্ধি

গত ২২শে সেপ্টেম্বর উত্তর মেরু-অঞ্চলে সোভিয়েট গবেষণা স্টেশন "ভোস্তক" থেকে একটি খুব উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাঠানো হয়েছে। সেখানে আকস্মিকভাবে শূন্যের নীচে ৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তাপাঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে শূন্যাঙ্কের নীচে ৪৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে; অর্থাৎ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা উত্তর মেরুবৃত্তের আবহাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এর ঠিক পরেই রস্ সাগর উপকূলে এক সাইক্লোনের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রায় একই সঙ্গে আরেকটি সাইক্লোন এগিয়ে আসতে থাকে স্কট দ্বীপের দক্ষিণ মুখে। মিরনি মানমন্দিরের পরিচালক জানান—উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের অনুপ্রবেশের ফলেই এই সাইক্লোন-কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে—যার ফলে তাপ বৃদ্ধি পায়, প্রচুর তুষারপাত ঘটে এবং প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মিটার বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

পঙ্গপাল দমনে নতুন যুগের সূত্রপাত

লণ্ডনের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা "ট্রপিক্যাল সায়ান্স"-এর একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে পঙ্গপাল দমনে নতুন যুগের সূত্রপাত হতে পারে।

শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের ডাঃ কে. সি. হাইনাম এবং ডাঃ হিল প্রমাণ করেছেন যে, পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে দুটি গ্ল্যাণ্ডের উপর। এই গ্ল্যাণ্ড দুটির একটিকে বিনষ্ট করতে পারলে পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। যেহেতু দ্রুত বংশবৃদ্ধিই পঙ্গপাল থেকে সর্বাধিক বিপদের কারণ, সেহেতু রাসায়নিক দ্রব্যাদি ছড়ানোর চেয়ে এই পদ্ধতি বেশী কার্যকরী হবে। এই পদ্ধতিতে গ্ল্যাণ্ড দুটির একটিকে কোন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে অক্ষম করে দিলেই চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি লণ্ডনের একটি অ্যান্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন একটি সুবিধামত রাসায়নিক দ্রব্যের সন্ধানের কাজ চালাতে হবে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপশক্তি সম্পর্কে নতুন তথ্য

সমুদ্রের তলায় যে সকল সম্পদ রয়েছে, কেবল মাত্র তার সন্ধানেই বিজ্ঞানীদের সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যাভিযানের সমাপ্তি ঘটে নি। তাঁরা আরও গভীরে সমুদ্রের তলদেশ ভেদ করে পৃথিবীর গঠন সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

১৯৬৩ সালে মার্কিন সমুদ্র-বিজ্ঞানী ডাঃ মার্ক ল্যাংসেথ এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের পর বলেছেন—

আমাদের এই পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবিরাম তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। তা না হলে এই পৃথিবী বহু পূর্বেই ঠাণ্ডা হয়ে যেত। পৃথিবীর অভ্যন্তরের ক্ষয়িষ্ণু তেজস্ক্রিয় উপাদানের তেজস্ক্রিয়ার ফলেই এই তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। ডাঃ ল্যাংসেথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই প্রক্রিয়ায় যে কেবলমাত্র তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে তা নয়, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কিছুটা শক্তিও ঐ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৬৫

১৮শ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা
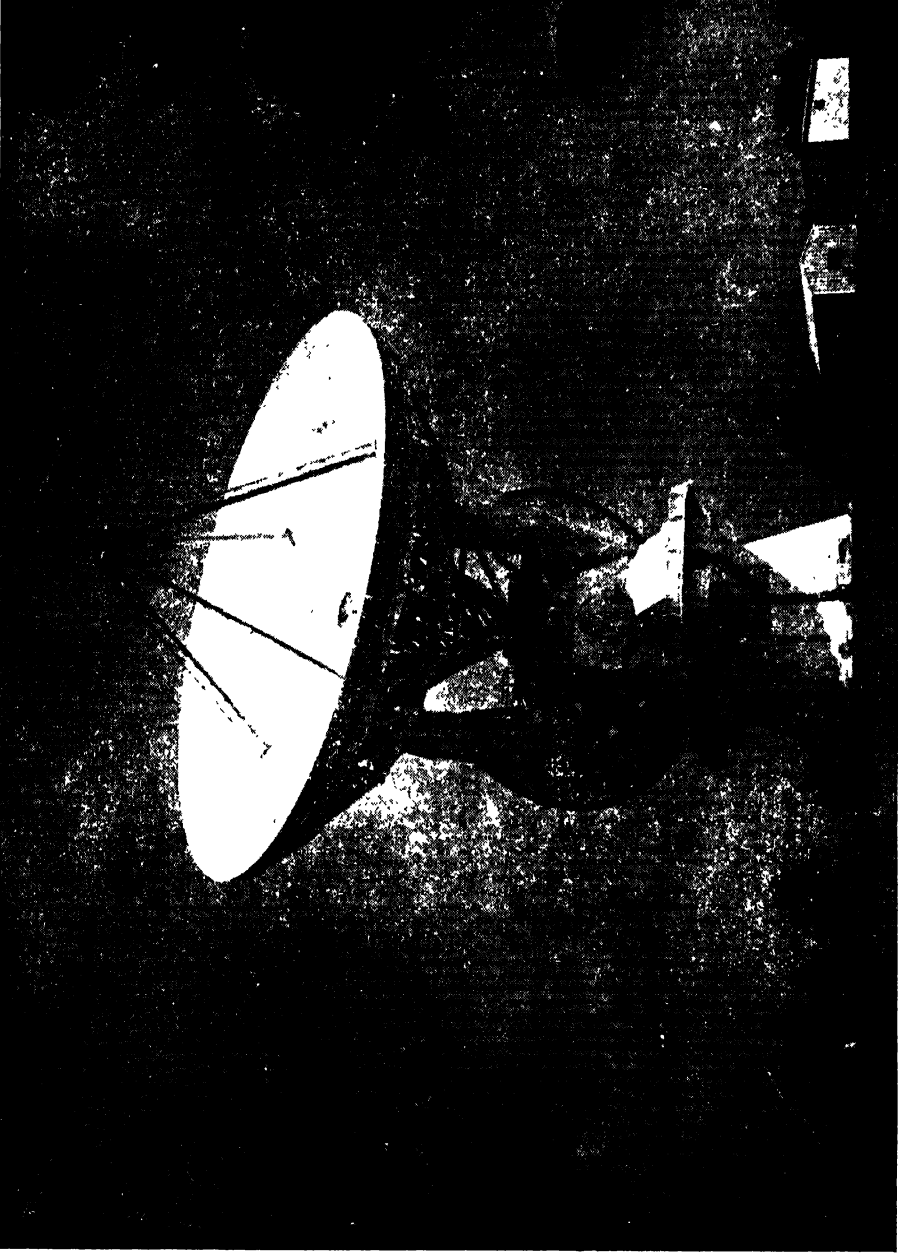
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাঙ্কের নিকটস্থ রেডিও অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল অবজারভেটরীতে এই বৃহত্তম বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে। এর রিফ্লেক্টর অর্থাৎ প্রতিফলকটির ব্যাস ১৪০ ফুট। এই যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশের দূরতম স্থান থেকে আগত রেডিও বিচ্ছুরণকে নিখুঁতভাবে পরিবর্ধিত করা যাবে।

করে দেখ

সাইফন ফোয়ারা

এর আগে তোমাদের সাইফন তৈরির কথা বলেছি। এবার সাইফনের সাহায্যে একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা তৈরির কথা বলবো। সাধারণ কয়েকটা জিনিষ দিয়েই এই ফোয়ারা তৈরি করতে পারবে।

মোটা মুখের বেশ সাদা একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। আর যোগাড় করতে হবে, বোতলের মুখের মাপমত একটা কর্ক, বা ছিপি, ৪ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি লম্বা দুটি সরু কাচের নল এবং ছোট ও বড় দুটি রাবারের নল।
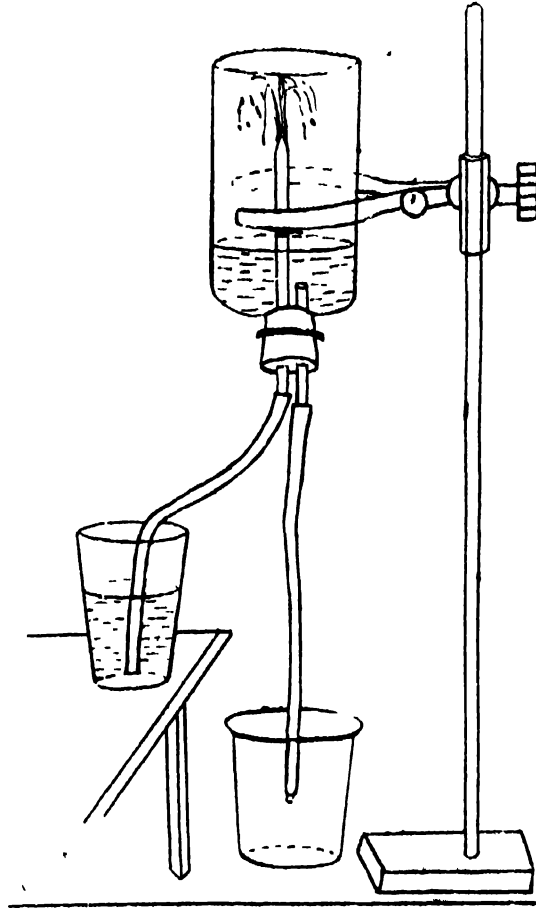
প্রথমে ছিপিটাতে কাচের নলের মাপমত দুটি ছিদ্র করতে হবে এবং ৪ ইঞ্চি লম্বা কাচের নলটার এক মুখ ড্রপারের মুখের মত সরু করে নিতে হবে।

কাচের নল দুটিকে বেশ আঁটভাবে ছিপির ছিদ্রের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন দুটি নলেরই আধ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ছিপিটার বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। ছোট কাচের নলটার বাইরে বেরিয়ে থাকা মুখে রাবারের বড় নলটা এঁটে দাও। আর বড় কাচের নলটার বাইরে বেরিয়ে থাকা মুখে ছোট রবারের নলটা লাগিয়ে দাও। বোতলের এক চতুর্থাংশ জল দিয়ে ভর্তি কর। এবার কাচের নল লাগানো ছিপিটাকে বোতলের মুখে এঁটে বসিয়ে দাও। টেবিলের উপর বড় একটা গ্লাস ভর্তি জল রাখ।

এবার বোতলটাকে উল্টো করে, অর্থাৎ বোতলের তলার দিকটা উপরে আর মুখের দিকটা নীচের দিকে করে টেবিলের চেয়ে উঁচু একটা ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে এঁটে দিয়ে ছোট রাবারের নলটার (যার সঙ্গে ড্রপারের মত সরু মুখের লম্বা কাচের নলটাকে জুড়ে দিয়েছ) খোলা মুখটা টেবিলের উপরে রাখা গ্লাসের জলের তলা অবধি ডুবিয়ে দাও। লম্বা রাবারের নলটার প্রান্তভাগ মেঝের উপরে রাখা খালি পাত্রটার মধ্যে রেখে দাও। দেখবে বড় নলটা দিয়ে বোতলের জল খালি পাত্রটার মধ্য এসে জমা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জল কাচের সরু-মুখ নলের ভিতর দিয়ে বোতলের খালি জায়গাটার মধ্যে ফোয়ারার মত ছিট্‌কে পড়ছে। গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেলে আবার জল ভর্তি করে অথবা গ্লাসের পরিবর্তে বড় পাত্রে বেশী জল রেখে যতক্ষণ খুসী ফোয়ারা চালু রাখতে পার।

—গ—

বাতিঘর

বাতিঘর কাকে বলে জান? অবশ্য যারা সমুদ্রের কাছাকাছি সহর-বন্দরে থাক কিম্বা জাহাজ-থামা সহর-বন্দরে গিয়েছ, তারা হয়তো বাতিঘরের কথা জান। বাতিঘর হচ্ছে—রাতের সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজকে সতর্কতার নিশানা স্বরূপ উপযুক্ত জায়গায় আলো জ্বালিয়ে রাখবার ঘর।

এই বাতিঘরের ইতিহাস অতি প্রাচীন, প্রায় মানুষের ইতিহাসেরই মত। সুদূর অতীতেই মানুষ জলপথে চলাচলের পন্থা আবিষ্কার করেছে—প্রথমে ভেলায়, তার পর ডিঙ্গিতে, তারপর নৌকায়, তারপর বড় নৌকায়, তারপর জাহাজে, তারপর আরও বড় জাহাজে। সমুদ্রে মানুষ যাতায়াত করছে বহু কাল থেকেই। তবে তারা কখনো বৃহৎ সমুদ্রে পাড়ি জমায় নি, সেটা করেছে ইদানীং কালে। ইতিপূর্বে তারা ঘোরাঘুরি করেছে কেবল তীরের কাছ দিয়ে এবং সেই কারণেই বাতিঘরের প্রয়োজন হয়েছে আরও

বেশী ; কারণ মাঝ সমুদ্রে ডাঙ্গা নেই, আর জলমগ্ন পাহাড়ও খুবই কম—যা আছে মাঝে মাঝে দু-একটা দ্বীপ। কিন্তু ডাঙ্গার কাছাকাছি প্রায়ই থাকে জলনিমগ্ন পাহাড় বা পাথর, যার উপরে জাহাজ গিয়ে পড়তে পারে সহজেই ; আর একবার পড়লে রক্ষা নেই—বিশেষতঃ এরূপ ক্ষেত্রে সেই সুদূর অতীতের কাঠের তৈরি জাহাজের কি অবস্থা ঘটতো, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অতীতের মানুষ সেই জন্যে এরূপ জলমগ্ন পাহাড়ের উপর লোহার শিকলীতে বেঁধে ভাসিয়ে দিত কাঠের তৈরি পাটাতন, আর তাতে কাঠের ফ্রেমে বাঁধা থাকতো বেশ বিরাট একটি ঘণ্টা। বাতাসের আঘাতে, সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে পাটাতনটি আন্দোলিত হবার ফলে ঘণ্টা অনবরত বেজেই চলতো, তাতেই বিপদ-বার্তা বুঝতে পারতো সেই অতীতের নাবিকেরা। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল দিনের বেলার ; রাত্রিতে ঘণ্টার শব্দ পাওয়া যেত বটে, কিন্তু তার উপরেও প্রয়োজন ছিল আলোর।

জাহাজ-ঘাটায় থাকে অনেক জাহাজ। সেই জন্যেই সাধারণতঃ জাহাজ-ঘাটা তৈরি করা হয় এমন সব জায়গাতেই, যেখানে সমুদ্র খানিকটা স্থলভাগের মধ্যে খাঁড়ির মত ঢুকে পড়েছে এবং পরে সেখানে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একে বলে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। কিন্তু অনেক সময় মানুষকে নাগরিক প্রয়োজনে কৃত্রিম পোতাশ্রয় সৃষ্টি করতে হয়েছে—সেটা হয়েছে প্রথমে মাটি ও পাথর, তারপর বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে সমুদ্রের ভিতর দু-দিক থেকে মোষের শিঙের আকারে দুটি দেয়াল গেঁথে। সমুদ্রের মাঝখানে এই ঘেরা জায়গার মধ্যে থাকে যত জাহাজ। তাদের রাত্রিতে ঐ জায়গায় ঢুকতে সাহায্য করবার জন্যে দুদিকে দেওয়া থাকে দুটি সুউচ্চ স্তম্ভের উপর বাতি—যা দেখে নাবিকেরা বুঝতে পারে তাদের পথ। এগুলি একেবারে বাতিঘর না হলেও জাহাজকে পথ দেখাবার বাতির নিশানা বটে!

অনেক সময় সমুদ্রের ভিতরে এগিয়ে যাওয়া ভূখণ্ড থাকে অনেক দূর পর্যন্ত। তার মাথায় থাকে বাতিঘর, সমুদ্রের ভিতরে পাড় থেকে দূরে থাকে দ্বীপ, তাতেও রাখা হয় বাতিঘর। সমুদ্রের ভিতরে জলমগ্ন পাহাড়েও তৈরি করা হয় বাতিঘর ; অর্থাৎ যেখানেই রাতে জাহাজ চলাচলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সেখানেই বাতিঘরের ব্যবস্থা করা হতো।

পৃথিবীর প্রাচীনতম বাতিঘরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলেকজাণ্ড্রিয়ার বাতিঘর। সে ছিল প্রায় দু-হাজার বছরেরও আগে। আমাদের দেশে দক্ষিণ ভারতে মহাবলীপুরমের পাহাড়ের উপরে একটি বাতিঘর আছে, সেটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো—কারণ এই মহাবলীপুরম পত্তন করেছিলেন পল্লব রাজারা, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। এই সব বাতিঘরে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো কাঠ দিয়ে।

বাতিঘরে আগুন জ্বালাবার জন্যে প্রথমে কাঠ ব্যবহার করা হতো। তারপর ধীরে ধীরে ব্যবহার হতে লাগলো তেল, মোম প্রভৃতির; তারপর কেরোসিন, প্যারাফিন এবং সর্বশেষে বিদ্যুতের ব্যবহার আরম্ভ হয়। বর্তমানকালে প্রায় সব বাতিঘরেই বিদ্যুতের ব্যবহার হয়, কেবল গভীর সমুদ্রের দ্বীপের বাতিঘর ছাড়া—যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার বা নিয়ে যাবার সুযোগ নেই। সে সব ক্ষেত্রে আজও তেল, কেরোসিন, বা প্যারাফিনের ব্যবহার হয়।

বাতিঘরের বাতি জ্বলবার ব্যাপারেও নানারকম তারতম্য করা হয়ে থাকে, যাতে সহজেই বোঝা যায় কোন্ ঘরটি কোন্ জায়গার অবস্থিত; যেমন—হয়তো কোন বাতি জ্বলে আর নেবে, কোনটা হয়তো কেবল জ্বলেই থাকে, কোনটা সমান মাত্রায় কিছুক্ষণ জ্বলে, আবার ঠিক ততক্ষণই নিবে থাকে। কোনটা কয়েক মুহূর্ত জ্বলে আর নেবে, তারপর বেশ কিছুক্ষণ জ্বলেই থাকে। কোনটার আলোর জ্যোতি ঘুরতে থাকে অনবরত।

দ্বীপের বাতিঘরে আজও জ্বালাতে হয় তেলের বাতি, আর সেখানে সর্বদাই জন কতক লোককে উপস্থিত থাকতে হয়। তাদের খাদ্য, বাতি জ্বালবার তেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দু-মাস বা তিন মাস অন্তর নৌকা করে দিয়ে আসতে হয় সেখানে। মাঝে মাঝে তারা ছুটি পায় একজন দু-জন করে, বাড়ী যাবার জন্যে।

অনেক সময় অনেক জায়গায় সমুদ্রের নীচে এমন সব জায়গা থাকে, যা জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক অথচ বাতিঘর তৈরি করবার মত কোন সুবিধা নেই। হয়তো সূক্ষ্ম-শীর্ষ পাহাড়ের চূড়া কিন্তু জলে ঢাকা, কিম্বা জলে নিমজ্জিত বালিয়াড়ি। সেখানে বাতিঘর তৈরি না করে বাতিওয়ালা ছোট জাহাজ রাখা হয়। এসব জাহাজকে বলা হয় বাতি-জাহাজ (Light ship)। সে সব জাহাজে সর্বদা লোকজন থাকে, সর্বদা বাতি ঠিক রাখবার জন্যে। কখনো কখনো কেবল একটি বাতি রাখা হয় বয়াতে। তবে সে সকল ঠিক রাখবার জন্যে প্রতিদিন লোককে নৌকা করে যেতে হয়, ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে। সন্ধ্যায় গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসে, আবার ভোরবেলায় গিয়ে নিবিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

বুমেরাং

বুমেরাং নামটা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছ। কাঠের তৈরি, ছুঁড়ে মারবার একপ্রকার অস্ত্রের নাম বুমেরাং। বিশেষ কায়দায় উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলে অনেক দূর ঘুরে আবার নিক্ষেপকারীর কাছেই ফিরে আসে। এটাই হলো এই অস্ত্রটির বিশেষত্ব। অবশ্য আরও কয়েক রকমের বুমেরাং আছে, যেগুলি নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের এই বুমেরাংই হলো প্রধান অস্ত্র। ছোটবেলা থেকেই তারা বুমেরাং তৈরি ও নিক্ষেপের কৌশল শিক্ষা করে। এশিয়া ও আমেরিকার কোন কোন আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও বুমেরাং ব্যবহারের প্রচলন ছিল বা এখনও আছে। তবে যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয়, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাই সর্বপ্রথম বুমেরাং উদ্ভাবন করেছিল। বুমেরাং-এর আকার অনেকটা ধনুকের মত বাঁকানো। নীচের দিক চ্যাপ্টা—কতকটা কুব্জপৃষ্ঠ একখানা বাঁকানো কাঠ দিয়ে বুমেরাং তৈরি হয়। ধনুকের আকৃতির এই কাঠখানার একটি বাহু অপর বাহু অপেক্ষা কিছুটা বড়। কাঠখানার বাঁক বা মোড়ের উপর এর ফিরে আসা বা না আসা নির্ভর করে। তাছাড়া বুমেরাং নিক্ষেপের কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়, তা না হলে ঠিকমত কাজ করে না।

বুমেরাং ব্যবহারকারী আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে—ভগবান নাকি শিকার করবার জন্যে তাদের পাঁচটি অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—বুমেরাং। বোর্নিয়ো, সিলিবিস, ভারত ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে 'লুইন' (Luin) নামে পরিচিত বুমেরাং-এর মত এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র দেখা গেছে।

প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক ষ্ট্রাবো বলেছেন—প্রাচীন গলরা পাখী শিকারের জন্যে বুমেরাং-এর মত একপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতো। প্রাচীন থিব্‌স্ নগরীর নানা চিত্র এবং কাঠ-পাথরের গায়ে এগুলির ক্ষোদিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিশরের কোন কোন আদিম অধিবাসী এখনও বুমেরাং-এর মত একপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বুমেরাংকে বলে কিলে (Kiley)। বুমেরাং-এর চ্যাপ্টা কাঠখানা সাধারণতঃ দুই থেকে চার ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কাঠখানার বাহু দুটি ৯০ থেকে ১২০ ডিগ্রী পর্যন্ত কোণ উৎপন্ন করে থাকে। যে সব বুমেরাং নিক্ষিপ্ত হবার পর ফিরে আসে, সেগুলি সাধারণতঃ পাখী শিকার ও খেলাধুলার উদ্দেশ্যে

ব্যবহার করা হয়। যে সব বুমেরাং নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না, সেগুলির উভয় দিকের বক্রতাই সমান। এসব বুমেরাং যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে অথবা বড় বড় জীবজন্তু শিকারে ব্যবহৃত হয়। এই বুমেরাংগুলি বেশ বড় এবং ভারী হয়ে থাকে। ছোঁড়বার পর সেগুলি ভোঁ ভোঁ শব্দে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় এবং লক্ষ্যবস্তুকে ভীষণ জোরে আঘাত করে। একজন বলিষ্ঠ লোক ১৮০ গজেরও বেশী দূরত্ব পর্যন্ত এই বুমেরাং ছুঁড়ে মারতে পারে। নিক্ষেপ করবার সুবিধার জন্যে কোন কোন বুমেরাং-এ হাতল লাগানো থাকে।

অধিকাংশ বুমেরাংই কাঠের তৈরি। কিন্তু কাঠ ছাড়া অন্যান্য জিনিষ দিয়েও বুমেরাং তৈরি হয়। দক্ষিণ ভারতে ছুরির মত আকৃতিবিশিষ্ট ইস্পাতের তৈরি একরকম বুমেরাং দেখা যায়। হাতীর দাঁত থেকে তৈরি বুমেরাংও দেখা গেছে। কোন কোন বুমেরাং ৬ ইঞ্চির বেশী বড় করা হয় না।

বুমেরাং আজকাল অনেক স্থানেই খেলার ব্যাপারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বুমেরাং খেলনা হিসাবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আজকাল এগুলি প্লাষ্টিক অথবা স্তরীভূত কাঠ থেকে তৈরি করা হয়।

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

বিবিধ

রামানুজন স্মারক গ্রন্থ

বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় গণিতবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজনের স্মরণে তাঁর জন্মস্থান মাদ্রাজ থেকে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। যে বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়ন করতেন, সেখানকার প্রাক্তন ছাত্রেরা এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রকাশনার জন্যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। সে কারণে উদ্যোক্তা কমিটি রামানুজনের গুণগ্রাহী দেশবাসীর কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। যে কোন প্রকার দান নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হবে। কোষাধ্যক্ষ, দি এম. এইচ এস. নাম্বার ফ্রেণ্ডস সোসাইটি, ওল্ড বয়েজ কমিটি, ৮৮ লিংঘি চেট্টি স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব

বোম্বাই থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—ট্রম্বের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একটি মালটিরাম নিউট্রন স্পেক্ট্রোমিটার তৈরি করে সেটাকে চালু করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীতে এই ধরণের যন্ত্র এই প্রথম চালু হলো।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর অবস্থান খুঁজে দেখবার জন্যে নিউট্রন প্রয়োগ করলে সেগুলি কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের শক্তির পরিমাণই বা কত, তা মেপে দেখবার জন্যে মালটিরাম স্পেক্ট্রোমিটার ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তরযুগের কবরখানা

মস্কো—অনুসন্ধানীদের কুঠারাঘাতে হঠাৎ প্রস্তরযুগের একটি কুঠারের সাক্ষাৎ মেলে। তারপর ধীরে ধীরে আস্ত একটা কবরখানাই মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়। অনুমান, এই কবরখানাটি ৬,০০০—৫,০০০ খৃষ্টপূর্ব কোন সময়ের। এই আবিষ্কারটি ঘটে লাটভিয়াতে। এই খবর প্রচার করেছেন রয়টার।

আবিষ্কর্তা আবিষ্কার

বুয়েনস এয়ার্স থেকে রয়টার ও এ. এফ. পি-এর এক খবরে প্রকাশ—কলম্বাস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি, করেছিলেন সানচেজ দি হুয়েলভা নামে একজন স্পেনীয় নাবিক।

স্পেনীয় ঐতিহাসিক ইয়ানেজ তাঁর গবেষণা-লব্ধ এই তথ্য প্রকাশ করে বলেন: হুয়েলভা ঝড়ের মধ্যে আমেরিকায় অবতরণ করেছিলেন। ইউরোপে ফিরে এসে তিনি কলম্বাসকে এই সংবাদটি দেবার পর কলম্বাস পর্তুগাল-রাজের কাছে 'সমুদ্রপথে ভারত যাত্রার' সংকল্প ব্যক্ত করে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।

নিউইয়র্ক থেকে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছেন, কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি, করেছেন জলদস্যুরা এবং কাগজপত্রেই সে প্রমাণ রয়েছে।

প্রমাণ হিসাবে তাঁরা ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে আঁকা একটি মানচিত্রও প্রকাশ করেছেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, মানচিত্রটি খাঁটি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমেরিকার উপকূলে অবতরণ করেন জলদস্যু এরিকসন। তিনি ইউরোপে ফিরে গিয়ে সংবাদ দিলে একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী উত্তর আমেরিকার প্রথম মানচিত্র এঁকেছিলেন। এর অনেক বছর পরে কলম্বাস এদেশে আসেন।

মানুষ গিনিপিগ!

লণ্ডন থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—বৃটেনের হারওয়েল পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে মানুষকে গিনিপিগরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্প্রতি এখানে একজন মহিলা এবং কয়েকজন পুরুষ স্বেচ্ছায় তেজস্ক্রিয় গ্যাসে শ্বাস গ্রহণ করেন। একটি টিউবের মধ্য দিয়ে গ্যাস নাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

পারমাণবিক চুল্লী হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়লে কিংবা কোন কারণে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন বাতাসে মিশে গেলে তার ফল কি হতে পারে—তা দেখবার জন্যেই এই পরীক্ষা।

৪৫ দিন পর মার্কিন জলচরদের উত্থান

ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—১০ই অক্টোবর প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভ থেকে মার্কিন জলচরদের শেষ দশজন ডাঙ্গায় উঠে এসেছেন। এরা ৪৫ দিন জলতলে কাটিয়ে এলেন। জলের নীচে থাকা যায় কিনা, মার্কিন সেনাবাহিনী সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। এঁরা ১২ ফুট চওড়া ও ৫৮ ফুট লম্বা একটি কেবিনে জলের ২০৫ ফুট নীচে ৪৫ দিন কাটান। নৌ-বাহিনীর এই পরীক্ষায় জানা গেছে যে, মানুষ দীর্ঘ সময় জলের তলায় অবস্থান করে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে

এস্কিমোদের মূল বাসভূমি এশিয়ায়

মিলান থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—এস্কিমোদের মূল বাসভূমি যে এশিয়ায় ছিল, তার নতুন প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন ইটালীয় এক পণ্ডিত। ইনি মেরু ভৌগোলিক পরিষদের ডিরেক্টর সিলভিও জাভাত্তি।

জাভাত্তি গ্রীণল্যাণ্ডের দু-হাজার বছরেরও বেশী পুরাতন একটি কুকুরের রেখাচিত্র আবিষ্কার করেছেন। এই সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধে

তিনি লিখেছেন যে, উত্তর সাইবেরিয়ায় বিশেষ এক ধরণের কুকুরের রেখাচিত্রের সঙ্গে এর অবিকল মিল আছে। এস্কিমোরা যখন দেশত্যাগ করে চলে আসে, তখন নিশ্চয় এই জাতীয় কুকুর সঙ্গে করে এসেছিল।

মানুষের প্রথম ক্ষৌরকর্ম

মস্কো থেকে এ পি. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—কখন কোন্ যুগে মানুষ প্রথম চুলদাড়ি কামাতে সুরু করেছিল, সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটির জবাব খুঁজে পেয়েছেন।

উত্তর ককেশাসে খননকালে তাঁরা ব্রোঞ্জের ক্ষুর পেয়েছেন, যা খৃষ্টপূর্ব দশম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল।

শুক্রগ্রহ অভিমুখে রুশ মহাকাশযান

মস্কো থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—রাশিয়া ১৬ই নভেম্বর শুক্রগ্রহ অভিমুখে নতুন একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছে—চার দিনে রাশিয়ায় এই দ্বিতীয় শুক্রাভিযান।

নতুন মহাকাশযানের নাম 'শুক্র-৩'। শুক্র-২-কে উৎক্ষেপণ করা হয় গত ১২ই নভেম্বর। ১৬ই নভেম্বর শুক্র-২ পৃথিবী থেকে ৭১৮১২৫ মাইল দূরে ছিল।

শুক্রগ্রহ অভিমুখে রাশিয়া প্রথম মহাকাশযান পাঠায় ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। মহাকাশযানটি ১৭৫০০০০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে শুক্র গ্রহের ৬২৫০০ মাইল দূর দিয়ে চলে যায়।

নতুন মহাকাশযানের শুক্রগ্রহে পৌঁছাতে সাড়ে তিন মাসের মত সময় লাগবে।

গাছের পাতা থেকে প্রোটিন উৎপাদন

নয়াদিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—ভারতের বহু সাধারণ গাছপালার পাতা থেকে সস্তায় ও ব্যাপক-ভাবে প্রোটিন তৈরি করা যেতে পারে। মহীশূরের সেন্ট্রাল ফুড টেকনোজিক্যাল ইনষ্টি-টিউটের বিজ্ঞানীরা একথা জানিয়েছেন।

বুনো গাছপালা ছাড়া ব্যবসায়িক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে যে সব উদ্ভিদের আবাদ করা হয়, সেই সব উদ্ভিদের পাতা থেকে প্রোটিন প্রস্তুত করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—পাট, আখ, কলা, ইত্যাদি গাছের পাতা থেকে প্রোটিন উৎপাদন করা যায়।

গোবি মরুভূমিতে উল্কাপিণ্ড

পিকিং থেকে ইউ. এন. আই এবং ডি. পি. এ. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—গোবি মরুভূমিতে ৩০ টন ওজনের একটি উল্কাপিণ্ড পাওয়া গিয়েছে। একটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম উল্কাপিণ্ড বলে দাবী করা হয়েছে। এই খবরটি দিয়েছে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি। উরুমচিতে এখন এই উল্কাপিণ্ডটি দেখানো হচ্ছে।

কেরোসিনের সাহায্যে মোটর চালনা

টোকিও থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'কিওডোর' এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানে কেরোসিন তেলের সাহায্যে মোটর গাড়ী চালাবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং পরীক্ষা করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়েছে।

টোকিওর অটোমোবাইল টেকনিক রিসার্চ ইনষ্টিউট এই উপায় উদ্ভাবন করেছে। এর ফলে ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে কেরোসিন তেলকে বাষ্পে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
৫০/১, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা-২৯

২। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১৭৫/এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

৩। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
রসায়ন বিভাগ,
কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

৪। মণীন্দ্রনাথ দাস
"সাধনালয়"
পুরুলিয়া রোড
রাঁচি, বিহার

৫। কাজী মোতাহার হোসেন
পরিসংখ্যান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, পূর্বপাকিস্থান

৬। শ্রীসুশীলকুমার কর্মকার
টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-৩২

৭। শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত
১০৬, পলিউবাজার থার্ড লেন
পোঃ ট্রিপ্লিকেন,
মাদ্রাজ-৫

৮। শ্রীঅনিল চক্রবর্তী
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা